India and Indology

PAST PRESENT AND FUTURE

ভারত ও ভারততত্ত্ব

অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ

Sukumari Bhattacharji Felicitation Volume

অধ্যাপক সুকুমারী ভট্টাচার্য সম্মাননা গ্রন্থ

Professor Sukumari Bhattacharji Felicitation Volume

অধ্যাপক সুকুমারী ভট্টাচার্য সম্মাননা গ্রন্থ

India and Indology

Past Present and Future

ভারত ও ভারততত্ত্ব

অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ

সম্পাদকমণ্ডলী

সভাপতি

রবীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক

দীপক ভট্টাচার্য

সহ সম্পাদকবৃন্দ

মইনুল হাসান, কুমকুম রায়

এবং

সোমনাথ ভট্টাচার্য

এন বি এ

ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড

India and Indology : Past Present and Future
Bharat O Bharat Tattwa : Atit Bartaman Abong Bhabishyat
(An Anthology of Articles on India and Indology)

ISBN – 81-7626-171-8

প্রকাশক
সলিল কুমার গাঙ্গুলি
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

Contact
National Book Agency Private Limited
12 Bankim Chatterjee Street
Kolkata – 700 073, India
Phone : +91-33-2241 6432/3376,
+91-33-2334 4530/6138
Fax No. : +91-33-2334 2769

বর্ণসংস্থাপন ও মুদ্রণ
এস পি কমিউনিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড
২৯৪/২/১ এ পি সি রোড
(ফেডারেশন হল, তৃতীয় তল)
কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রচ্ছদ
মনীষ দেব

প্রথম প্রচ্ছদের ছবি : কেম্ব্রিজ ১৯৬৮
শেষ প্রচ্ছদের ছবি : কলকাতা ২০০২ (অধ্যাপক যশোধরা বাগচী-র সৌজন্যে)

মুখবন্ধ

অধ্যাপক সুকুমারী ভট্টাচার্য আমাদের রাজ্যে শুধু নয়, সারা পৃথিবীর বিদ্বজ্জনের মধ্যে একটি উজ্জ্বল নাম। দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করেছেন। সারা পৃথিবী জুড়ে তাঁর ছাত্রছাত্রীরা ছড়িয়ে আছেন। এ রাজ্যের শিক্ষাজগত এবং শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর গভীর যোগাযোগ আছে। বিশেষত তাঁর দার্শনিক চিন্তা, ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে তাঁর গভীর অনুসন্ধান, ভারতবাসীর প্রতি তাঁর মমত্ববোধ নানাদিক দিয়ে আমাদের উপকৃত করেছে।

আমার থেকে তিনি বয়সে কিছুটা ছোট। ইদানিং তাঁর শারীরিক অবস্থাও ভালো নয়। এই সময়ে তাঁর সম্মানে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ আমাদের ন্যাশনাল বুক এজেন্সি থেকে প্রকাশিত হচ্ছে— যা খুবই আনন্দের বিষয়। এই সংকলনে ভারত ও ভারততত্ত্ব সম্পর্কে দেশ ও বিদেশের পণ্ডিতগণ তাঁদের নিজস্ব মতামত জ্ঞাপন করেছেন— ড. ভট্টাচার্যের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ হিসাবে। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি— এই ধরনের প্রকাশনা খুব বেশি করেনি বলেই আমি জানি। সুতরাং আমার দৃঢ় বিশ্বাস পুস্তকটি ড. ভট্টাচার্যের প্রতি যেমন শ্রদ্ধার্ঘ, তেমনই ন্যাশনাল বুক এজেন্সির কাছেও গর্বের বিষয়।

সুকুমারী ভট্টাচার্য একজন পৃথিবী বিখ্যাত ভারততাত্ত্বিক। প্রাচীন ভারতের বহুবিষয়, ভারতবাসীর জীবনচর্চা, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ, সামাজিক ঘটনাবলী, জনমানসের ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ তিনি করেছেন গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে। তাঁর এই কাজ ভারততত্ত্বকে যেমন নির্দিষ্ট মাত্রাতে পৌঁছে দিয়েছে, তেমনি তিনি জায়গা করে নিয়েছেন বিদ্বৎসমাজের পাশাপাশি অসংখ্য সাধারণ মানুষের হৃদয়ে। আমরা তাঁর জন্য গর্ববোধ করি।

প্রাচীন ভারতবর্ষ নানা কারণে এখন আলোচনার মধ্যে উঠে এসেছে। যে আলোচনা আমাদের অনুসন্ধানের, জিজ্ঞাসার কাজে আরও সাহায্য করতে পারতো— তা না হয়ে আমাদের ভারতের ইতিহাসটা অন্যভাবে শেখাবার প্রক্রিয়া চালু হয়েছে, যা নতুন প্রজন্মকে অসত্য কথাগুলো শেখাতে চায়। আমাদের দেশে প্রাচীনকালেও সামাজিক ঘটনাবলীতে যে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ ছিল, কেউ কেউ সেটাকে মিথ্যা করে দিতে চাইছে। তারই বিরোধিতায় ড. ভট্টাচার্য-র মতো পণ্ডিতরা বড় ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

অধ্যাপক ভট্টাচার্যের কাছে আমাদের ঋণ আরও এই কারণে যে, ভারতের মতো মহান দেশের সামাজিক বিন্যাসের প্রতি তিনি যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রবর্তন করেছেন, যে যুক্তিনিষ্ঠা নিয়ে নিবিড় অধ্যয়নে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন তার ফলে আগামী প্রজন্ম উপকৃত হবে শুধু তাই নয়, একটি নতুন দিশাও পাবে। তাঁরই সম্মানে যথার্থভাবে ভারত ও ভারততত্ত্বকে বিষয়বস্তু করে প্রবন্ধ সংকলন

প্রকাশিত হচ্ছে সেটাও অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। উদ্যোক্তারা কিছুটা দেরীতে হলেও এমন জরুরী একটি কাজ শেষ করতে পেরেছেন জেনে আমি খুশি হয়েছি। এই সম্মাননা গ্রন্থ প্রকাশের সময় আমি শুধু এইটুকু আশা করি যে, আরও অনেকদিন সুস্থ থেকে শ্রীমতী সুকুমারী ভট্টাচার্য আমাদের পড়ালেখার জগতকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলুন।

এই প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।

জ্যোতি বসু

Foreword

Professor Sukumari Bhattacharji is one of the brilliant scholars and teachers of our times. I have known her personally for many years. She had taught devotedly for a considerable period of time at Jadavpur University. Her pupils are spread all over the world. We have been greatly benefitted by her scholarship which embraces philosophy, Indology, literature etc. and reflects her commitment towards her country and her great love and sympathy for her countrymen.

Although she is a bit junior to me, she is not keeping well these days. I am particularly happy to know that an important publication is being brought out in her honour by National Book Agency. The volume includes papers and views by eminent scholars from India and abroad on various aspects of Indian culture, society and Indology. I know that National Book Agency has not published many a volume like this. So, the present publication may be justly regarded as an object of pride for the publishing house besides being a respectful tribute to Dr. Bhattacharji.

Sukumari Bhattacharji is a world-famous Indologist. Her interests range from the objective analysis of different aspects of ancient India to the probing study of Indian way of life, from a close analysis of ancient religious texts to essays of social relevance and scientific examination of the hopes and aspirations that dominate the social psyche.

Her contributions have not only given new directions to Indology but have also taken their place among the most popular writings of our times. We feel proud of her.

Studies on ancient India have become very relevant these days due to various reasons. It would have been a welcome development if such studies widened the scope of enquiry and inspired valued thinking. But for some time things are going the other way round. Efforts are being made to rewrite history, to distort facts with the ulterior motives to mislead the younger generation. The academicians must write authoritative accounts to make the people particularly the younger generation learn that the common people, the ordinary folk participated in the social movements even in the ancient times. They must be made aware that the annals of history can never be complete without these records of popular involvement. I am glad to note that the academic community led by Sukumari Bhattacharji and others are playing a much needed decisive role in this regard.

We are further indebted to Dr. Bhattacharji because she has always inspired through her writings and research a spirit of objective thinking and reasoning. As such, it is quite befitting that the contents of this volume concentrate on various aspects of India and Indology. I am glad that the organisers of this project have been finally able to bring out such an important publication. I wish Dr. Bhattacharji a long life free from ailments, so that she can go on contributing to the corpus of critical thought. I extend my sincere greetings to all the contributors and everyone else involved in this project.

প্রকাশকের কথা

প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ, বিদগ্ধ পণ্ডিত অধ্যাপক সুকুমারী ভট্টাচার্য-র সম্মাননা গ্রন্থ *India and Indology : Past Present and Future / ভারত ও ভারততত্ত্ব : অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ* প্রকাশ করতে পেরে আমরা গর্বিত। ইতিপূর্বেই অধ্যাপক ভট্টাচার্য-র লেখা *প্রাচীন ভারত* এবং *বাল্মীকির রাম : ফিরে দেখা* ন্যাশনাল বুক এজেন্সি থেকে প্রকাশিত হয়েছে — যা এই প্রকাশনা সংস্থাকে গৌরবান্বিত করেছে। সুকুমারী ভট্টাচার্য-র প্রজ্ঞা এবং অনুশীলন সারস্বত সমাজের এক অমূল্য সম্পদ। গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, মানবতা এবং প্রগতি সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়ন সুচেতনা-সম্পন্ন মানুষের কাছে এক যথার্থ পথনির্দেশ। তিনি সেই ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বদের অন্যতম যিনি বিদ্যাসাগর স্মৃতি পুরস্কার, আনন্দ পুরস্কার, রাহুল সাংকৃত্যায়ন পুরস্কার, মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ পুরস্কার গ্রহণ করেছেন সানন্দে অথচ আদর্শগত কারণে যাদের অপছন্দ করেন তাদের প্রস্তাবিত বহুমূল্য উপহার ফিরিয়ে দিয়েছেন ঋজু প্রত্যাখ্যানে। তাঁর বিখ্যাত বই *The Indian Theogony*-র ভারতীয় সংস্করণ প্রকাশ বন্ধ করে দেয় 'তৎকালীন' সাম্প্রদায়িক সরকারের অনুগত প্রকাশন সংস্থা। যদিও মাত্র এক বছরের ব্যবধানেই বইটি পুনঃপ্রকাশিত হয় আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আর একটি প্রকাশন সংস্থা থেকে। এ প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখ্য, এ ধরনের নানা বিভ্রাট এবং চাপের সম্মুখীন হয়েও তিনি মুহূর্তের জন্যও আত্মসমর্পণ করেননি। বরং প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করার অর্থই এগিয়ে চলা — এই প্রত্যয়কে পাথেয় করেই তিনি এগিয়ে গেছেন এবং আজও তাঁর সেই এগিয়ে চলা অব্যাহত। তাই বিভিন্ন সঙ্কটের মুহূর্তে তাঁর নির্ভীক উচ্চারণ আমাদের প্রেরণার উৎস।

এ হেন সুকুমারী ভট্টাচার্য-র প্রতি আমরা সততই শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু তাঁর প্রতি তাঁর অনুগত এবং গুণমুগ্ধদের শ্রদ্ধাকে একটি সুসংহত রূপ দেবার লক্ষ্যেই 'সুকুমারী ভট্টাচার্য সম্মাননা গ্রন্থ'।

এই গ্রন্থ পরিকল্পনার একটি প্রেক্ষাপট আছে। ২০০৩ সালের ১২ই জুলাই সুকুমারী ভট্টাচার্য ৮২ বছরে পদার্পণ করলেন। সেই সময় আমরা তাঁকে একটি যথাযোগ্য উপহার দেওয়ার কথা ভাবি। যে সুকুমারী ভট্টাচার্যের মস্তিষ্কের অক্সিজেন বই, তাঁকে দিতে হলে একটি উপযুক্ত বই-ই দেওয়া উচিত। কিন্তু তাঁর বিষয়ে পূর্বে প্রকাশিত এমন কোন্ বই আছে যা আমাদের জানা অথচ তাঁর পড়া নয়! এই ভাবনা থেকেই আসে একটি নতুন বই প্রস্তুতির পরিকল্পনা। যেখানে আনকোরা নতুন লেখা সুকুমারী ভট্টাচার্যকে উপহার দেবেন তাঁর গুণমুগ্ধ পণ্ডিতেরা; যার কোন লেখা পূর্বে প্রকাশিত নয় এবং যেগুলি এইমাত্র সুকুমারী ভট্টাচার্য-র কথা ভেবেই লেখা। এই ভাবনা থেকেই বর্তমান পরিকল্পনা।

এই দুরূহ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজটি যাঁর নেতৃত্বে হয়েছে তিনি বরেণ্য ভারততত্ত্ববিদ অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কীভাবে বইটি হওয়া উচিত সে ব্যাপারে সমগ্র ভাবনার রূপরেখাটি

তাঁরই পরিকল্পনা। যথেষ্ট অসুস্থতা সত্ত্বেও অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় যেভাবে সমগ্র কাজটির বৌদ্ধিক রূপটিকে সীমায়িত করে দিয়েছেন তা তাঁর পক্ষেই সম্ভব। আমাদের পরম কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধা অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে।

বইটির সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন আর এক বিশিষ্ট ভারততত্ত্ববিদ অধ্যাপক দীপক ভট্টাচার্য। তাঁর গভীর পারিবারিক বিপর্যয় সত্ত্বেও তিনি যেভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ তত্ত্বাবধানে সমগ্র কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন তা এক কথায় অনবদ্য। তাঁর প্রতি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

এছাড়া অধ্যাপক কুমকুম রায়, মইনুল হাসান এবং সোমনাথ ভট্টাচার্য বইটি নির্মাণের প্রতিটি পদক্ষেপ পরিচালনা করেছেন সহ-সম্পাদক হিসেবে। তাঁদের প্রকাশনা সংস্থার তরফে ধন্যবাদ জানাই।

এতদ্‌সত্ত্বেও এ বই প্রকাশ হতে পারত না, যদি না বইটির লেখকবৃন্দ তাঁদের নানা ব্যস্ততার মধ্যেও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেখা না দিতেন। তাঁদের প্রত্যেকের প্রতিই আমরা একান্ত কৃতজ্ঞ।

এছাড়াও বইটির প্রকাশনা পর্বে আরও অনেক মানুষ তাঁদের বুদ্ধি, পরামর্শ, মেধা, শ্রম দিয়ে কাজটিতে সাহায্য করেছেন। তাঁদের প্রত্যেককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রথমে পরিকল্পনা হয়েছিল সমগ্র বইটি বাংলাতেই হবে। কিন্তু অধ্যাপক সুকুমারী ভট্টাচার্য-র বহু গুণমুগ্ধ মানুষ, যাঁরা এই সংকলনে লিখবেন তাঁদের অনেকের পক্ষেই বাংলায় লেখা সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে বাংলা ভাষান্তরের ব্যবস্থা করলেও সেই সমস্ত মানুষেরা নিজেদের লেখাটি পড়তে পারবেন না। যা কখনই অভিপ্রেত নয়। এমতাবস্থায় স্থির হয়, যাঁরা বাংলা লিখতে জানেন তাঁরা বাংলাতেই লিখবেন এবং যাঁদের পক্ষে সেটা সম্ভব নয় তাঁরা ইংরেজিতে লিখবেন। এভাবেই পরিকল্পনা এগিয়েছে দ্বিভাষিক বইটির প্রস্তুতি পর্বে, যদিও এক্ষেত্রে কয়েকটি ব্যতিক্রম ঘটেছে। একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, এই বইয়ের জন্য লিখিত বিপান চন্দ্র এবং প্রভাত পট্টনায়কের লেখা দুটি সম্পাদকমণ্ডলীর অনুমতিক্রমে অতি সম্প্রতি *Social Scientist* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং এই লেখা দুটির মাধ্যমে পত্রিকাটি অধ্যাপক সুকুমারী ভট্টাচার্য-কে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

আমাদেরই কোন ত্রুটির কারণে বাংলাদেশের লেখকরা ইংরেজিতে তাঁদের লেখা পাঠান এবং পরে আমাদের পরিকল্পনার কথা বিশদ জানালে তাঁরা পুনরায় বাংলায় লেখা পাঠান। অনবধানতাবশত এই ঘটনার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। সেইসঙ্গে তাঁদের সশ্রদ্ধ অভিবাদনও জানাচ্ছি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক হাসান আজিজুল হক মহাশয় বাংলাদেশের লেখাগুলি সংগ্রহ করার প্রশ্নে যথাযথ পরামর্শ দেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এই সঙ্কলন গ্রন্থে লেখা দেওয়ার জন্য উদ্দীপিত করেন। যার ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের একগুচ্ছ লেখা এই সঙ্কলনে স্থান পেল। অধ্যাপক হক-কে সশ্রদ্ধ অভিবাদন।

লেখকের মূল লেখাটি সংকলনে যুক্ত করার প্রয়াস থেকেই অধ্যাপক ড. ড. ক্লাউস মিলিয়ুস-এর লেখাটি মূল জার্মানিতেই রাখা হয়েছে। যদিও ভারতীয় পাঠকদের সুবিধার কথা ভেবে যুক্ত করা হয়েছে তার ইংরেজি ভাষান্তর। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুদেষ্ণা চক্রবর্তী তৎপরতার সঙ্গে সেই কাজ সাঙ্গ করেন।

একটি ব্যতিক্রম উল্লেখ্য। অধ্যাপক উৎসা পট্টনায়ক তাঁর লেখাটি বাংলায় প্রকাশিত হোক এই ইচ্ছা ব্যক্ত করেন বইটির মূল পরিকল্পনার কথা জেনে। কিন্তু তাঁর নিজের পক্ষে যথাযথভাবে বাংলায় লেখা সম্ভব না হওয়ায় কলকাতার জয়পুরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ অর্থনীতির বিশিষ্ট শিক্ষক অধ্যাপক জয়ন্ত আচার্য অধ্যাপক উৎসা পট্টনায়কের পরামর্শক্রমে ভাষান্তরের কাজটি করেন।

অধ্যাপক সুকুমারী ভট্টাচার্য-র বৈদগ্ধ্যের প্রতি সম্মান জানাতে এভাবেই এগিয়েছে প্রতিটি পরিকল্পনা।

প্রাচীন পৃথিবীর অনেকেই আস্থাশীল ছিলেন বইয়ের পরিবর্তে মৌখিক পরম্পরায়। এর বিরুদ্ধে বইয়ের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য রিচার্ড দ্য ফুর্নিভাল (Richard de Fournival)। বই সম্পর্কে তাঁর এক বিখ্যাত উক্তি, *বই বর্তমানকে সমৃদ্ধ করে, অতীতকে পুনর্নির্মাণ করে এবং তার ফলে স্মৃতি বেঁচে থাকে ভবিষ্যতের জন্য*। ফুর্নিভালের সেই বক্তব্যের মূল সুরটিকে ভাবনায় রেখেই প্রস্তুত হলো *India and Indology : Past Present and Future / ভারত ও ভারততত্ত্ব : অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ*।

সম্পাদকমণ্ডলী বইটিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। সর্বপ্রথমে Quest For Harmony শীর্ষক অধ্যায়ে অধ্যাপক ড. ড. ক্লাউস মিলিয়ুস-এর জার্মান লেখা এবং তার ইংরেজি ভাষান্তর। এই নিবন্ধেই সমগ্র বইটির মূল সুরটিকে বেঁধে দেওয়া আছে। এছাড়া বাংলা এবং ইংরেজি বাকী প্রবন্ধগুলিকে *অতীত অন্বেষণ* এবং *সমকালভাবনা* ও *Enquiry into the Past* এবং *Current Topics* এই চারটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। সেইসঙ্গে বাংলায় নামের এবং ইংরজিতে পদবীর (Surname) আদ্যক্ষরের বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস অনুযায়ী লেখাগুলিকে সাজানো হয়েছে। বাংলা বিভাগের শুরু এবং শেষে ও ইংরেজি অধ্যায়ের শুরুতে অধ্যাপক সুকুমারী ভট্টাচার্য সম্পর্কে মোট তিনটে লেখা বর্ণানুক্রম ব্যতিরেকে সংযুক্ত হয়েছে।

দু'জন বরেণ্য ব্যক্তি আমাদের সব দিক থেকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

প্রথমজন শ্রী জ্যোতি বসু। তিনি বইটির মুখবন্ধ লিখেছেন।

দ্বিতীয়জন অধ্যাপক অমর্ত্য সেন। তিনি বইটি প্রকাশ করতে সম্মত হয়েছেন।

সমগ্র পরিকল্পনাটিতে নিরন্তর প্রেরণা জুগিয়েছেন শ্রী শ্যামল চক্রবর্তী।

পরিশেষে প্রকাশনা সংস্থা এবং বইটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেকের পক্ষ থেকে অধ্যাপক সুকুমারী ভট্টাচার্য-র সুস্থ এবং দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সব্যসাচী ভট্টাচার্য

রণবীর চক্রবর্তী

মাদাম আজুমা

জয়ন্ত আচার্য

নীলাঞ্জনা সিকদার দত্ত

রীতা ভট্টাচার্য

রামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

মানবেন্দু ব্যানার্জি

স্বপ্না ভট্টাচার্য

গৌতম রায়

বিদিশা ঘোষ দস্তিদার

বিপুল ভট্টাচার্য

তন্ময় ভট্টাচার্য

মুরারী মোহন মিত্র

জয়দীপ বসু

চন্দন চক্রবর্তী

মৌটুসী ব্যানার্জি

গৌতম মুখার্জি

প্রদীপ মাইতি

সন্ধ্যা বেরা

এস পি কমিউনিকেশনস্-এর কর্মীবৃন্দ

সূচিপত্র / Contents

সমকাল ভাবনা

Enquiring into the Past

Contemporary Topics

সম্পাদকীয়

পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে সুকুমারীদির নাম আমার কানে আসে বাড়িতে বাবার মুখে প্রশংসার সঙ্গে। একই সূত্রে আরো একজনের ঐ একই দৃষ্টির কথা শুনতাম। তিনি অধ্যাপক রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। প্রসঙ্গ জানতাম না। পরে কথা প্রসঙ্গে অধ্যাপক মুখোপাধ্যায়ের কোনো কোনো উক্তিতে অনুমান করেছি এই দুই সংস্কৃতজ্ঞ গুণগ্রাহীই সুকুমারীদির বৈদগ্ধ্যের স্বীকৃতি দানে উৎসাহী ছিলেন। কীভাবে সুকুমারীদির নাম প্রথম আমার কানে আসে সেটাই প্রায় পাঁচ দশকের পুরোনো কথাগুলি বলার কারণ নয়। কারণটি বলার আগে আমি নিজে সুকুমারীদির যে স্নেহ পেয়েছি সেটাও বলা উচিত। ইন্ডিয়ান থিওগনি পড়ার সময়ে ওর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। অনেক পরে মতবাদের উদারতা, বৈচিত্র্য ও পাণ্ডিত্যের আকর্ষণে তাঁর কাছাকাছি আসি ও অকারণ স্নেহ লাভ করি। গবেষণার মূল্যায়নের মানদণ্ড বজায় রাখার জন্য ওঁর সতর্কতাও আমার মনে প্রভাব ফেলেছিল। সুকুমারীদি আমার অতি সাধারণ লেখা পড়েও সাদায়-কালোয় উচ্ছ্বসিত প্রশংসার প্রমাণ রেখেছেন। আমার ওপর তাঁর এই অকারণ স্নেহের ধারা কোনোদিন শুকোয়নি।

২০০৩ সালের অক্টোবর মাসে তৎকালীন লোকসভার সদস্য শ্রী মৈনুল হাসান, শ্রী সোমনাথ ভট্টাচার্য এবং আরো কয়েকজন আমার বাড়িতে এসে সুকুমারীদির সম্বর্ধনা গ্রন্থের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হতে অনুরোধ না করলে এই পঙক্তিগুলো লিখতে হতো না। তখন পারিবারিক বিপর্যয়ে আমি অত্যন্ত বিব্রত ও নিরুৎসাহ। বেশ কিছুদিন হাতে প্রায় হাজার পৃষ্ঠা প্রুফ এবং প্রতিশ্রুতি দেওয়া আরো লেখার কাজ পড়ে আছে। কিন্তু মণিকোঠা থেকে স্মৃতিগুলো তো যায়নি। যাঁদের স্নেহ বা সমাদরের কথা বলা হল— দুর্গামোহন ভট্টাচার্য ও রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়— তাঁরাও দুজনেই আমার পরম শ্রদ্ধার পাত্র। অসম্ভব গুরুভার দায়িত্ব হলেও সব বিবেচনা করে আমার অস্বীকার করার কোনো রাস্তা ছিল না।

এই গ্রন্থ সঙ্কলনে অনুসৃত নীতি সম্বন্ধে কিছু বলার অবকাশ আছে।

সুকমারীদির মূল পরিচয়ই ভারততাত্ত্বিক হিসাবে। তাই সর্বকালের ভারতই এই সঙ্কলনের বিষয় নির্বাচিত হয়েছে। শুধু ভারতই নয়, ভারততত্ত্ব তথা প্রাচ্যতত্ত্ব বিজ্ঞান হিসাবে নিজেও তার বিচিত্র বিকাশের ইতিহাস নিয়ে প্রায়ই— কখনো কখনো উত্তপ্ত— আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সঙ্কলনের নামকরণে ভারতচর্চার এই দুটি দিকেরই প্রতিফলন রয়েছে।

সম্বর্ধনা গ্রন্থ প্রকাশে বেশ কিছু ভাল ফল আশা করা হয়ে থাকে। শুধু যে বিদ্যার স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে তা নয়, এক জাতীয় বিষয়ের ওপর পাঁচ মিশেলি রচনার সমাহার উৎসুক অনুসন্ধানীর কাছে গবেষকদের শেষ মতগুলি এনে দেয়। আরও একটি উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে। সেটি হলো মতবাদ

বা আদর্শে তফাৎ থাকলেও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে বাঞ্ছনীয় পেশাগত ভ্রাতৃত্বের দিকে তাঁদের নজর টানা। উক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অনুসন্ধান ও বিশ্বাসের মধ্যে সীমারেখা না ভেঙে মতবাদের বৈচিত্র্যকে এই সঙ্কলনে স্বাগত জানানো হয়েছে। আমাদের সৌভাগ্য যে এই সঙ্কলনের জন্য অধ্যাপক ক্লাউস্ মিলিয়ুস্ ভারততাত্ত্বিকদের পেশাগত ভ্রাতৃত্বের আদর্শ তুলে ধরেই একটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সঙ্কলনের গ্রন্থনায় এটি প্রথম স্থান পেয়েছে।

এই সঙ্কলনের আদর্শ বুদ্ধদেব বসু-র কটি উক্তিতে ফুটে ওঠে। এক জায়গায় তাঁর সম্পাদিত বাংলা কবিতার সঙ্কলন সম্বন্ধে তিনি যে কথাগুলি বলেছেন ও যে আদর্শ তুলে ধরেছেন সেগুলিই প্রাসঙ্গিক পরিবর্তন সহ এখানে পড়তে হবে।

"সকলের রুচি একরকম নয়, ব্যক্তিগত পক্ষপাতও সকলেরই আছে, তবু আমি পাঠককে অনুরোধ করি আধুনিক কবিতার কোনো একটি বিশেষ অংশের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ না করে ব্যাপারটাকে সমগ্রভাবে দেখতে। কোনো একটা 'যুগ' বা 'আন্দোলনের' চরিত্রলক্ষণ এক কথায় বলে দেওয়া অসম্ভব, চারদিক থেকে আলো ফেললে তবেই তার চেহারাটি ফুটে বেরোয়।" (**আধুনিক বাংলা কবিতা**, কোলকাতা ১৯৫৪ : ৮)। 'আধুনিক কবিতার' জায়গায় 'ভারততত্ত্বের' পড়লে এটা আমাদেরও বক্তব্য। বুদ্ধদেব বসু যখন বলছেন, "সুধীন্দ্রনাথের মনীষিতায় আমার মন যেমন নাড়া দেয়, জীবনানন্দের দৃশ্যগন্ধময় নির্জন কান্তারেও আমি তেমনি আনন্দে বিচরণ করি, বিষ্ণু দে-র অল্প-বলার চাতুরী আমাকে যেমন মুগ্ধ করে, তেমনি আমি কান পেতে শুনতে চাই অমিয় চক্রবর্তী-র নিচু গলার হার্দ্য উচ্চারণ।" তখনও তিনি আমাদের কথাই বলছেন, কারণ নামগুলো বদলে নিলে এই সঙ্কলনেও নির্জন এবং সজন কান্তারে বিচরণ, নিচু গলার উচ্চারণ এবং মনীষিতার ছাপ পাওয়া যাবে।

কয়েকটি কথা না বললে কর্তব্যের ত্রুটি হবে। সম্পাদকমণ্ডলীতে আমি ঐতিহাসিক শ্রদ্ধেয় ব্রতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের অনুবর্তী হয়ে থাকা সত্ত্বেও যোগাযোগ, লেখা সংগ্রহ ও প্রেস সম্পর্কিত প্রায় সব দায়িত্বই, এমনকি প্রুফ সংশোধনের ব্যবস্থার অনেকটা ভারই পালন করেছেন আমায় যাঁরা প্রথম অনুরোধ করেছিলেন তাঁরা, বিশেষতঃ শ্রী সোমনাথ ভট্টাচার্য এবং শ্রী মৈনুল হাসান। তাঁদের ও তাঁদের সহযোগীদের অক্লান্ত পরিশ্রম ছাড়া এই প্রকাশন সম্ভবপর হতো না।

দীপক ভট্টাচার্য

শান্তিনিকেতন
১৬ জুলাই, ২০০৪

Editorial

I first heard the name of Professor Sukumari Bhattacharji – Sukumaridi to her dear ones in the mid-fifties when my father spoke of her scholarship in family circles. From the same source I heard the name of another scholar, namely, Ramaranjan Mukherjee, who held similar ideas. I had not the faintest idea of why these names came. Later, while talking with Professor Mukherjee, I could just guess from stray utterances that at that time both the Sanskritists had been eager to see that Sukumari Bhattacharji got proper recognition of her scholarship.

The purpose of reminiscing on these five decade old facts is not merely telling how I came to know of Sukumaridi. Before going into that I should also tell of the affection and the encouragement to my work I was fortunate enough to get from her. I had no personal acquaintance with her when I read *The Indian Theogony*. It was the attraction of a scientific and liberal outlook and the variety it offered which brought me close to her. Also her emphasis on learning English, on French and German and on maintaining a high standard of research made me see eye to eye with her. Sukumaridi praised every work I sent to her, often in black and white and undeservedly. The source of kindness has not dried up over the years.

There would have been no occasion to write these lines if, sometime in last October, Mr. Moinul Hassan (MP), Mr. Somnath Bhattacharya and a few other intellectuals had not come to my house at Santiniketan with the request to be a member of the editorial board being formed to bring out a felicitation volume in honour of Sukumaridi. At that time I was quite unsettled and perturbed, rather shattered, by the severest and less than a month old tragedy in my life. A thousand page bundle of proof-sheets and promised unfinished papers had been lying shelved and unattended for months. I knew that it would be a heavy responsibility and that I might not be able to work up to it. But the memories haunted me. There was no way to escape through.

The main domain of the researches of Sukumardi has been India, ancient and modern. However, Indology itself, also Orientology, with the interesting history of its development as a science, has continuously been a topic of discussion, often of a hot one, involving all of us. Both these aspects of researches on India find reflection in the title of the collection.

A felicitation volume of this type serves more purposes that one. Apart from paying respect to a scholar, specialists furnish one with the latest views on inter-related topics from different angles of vision. This is for the enquiring reader. Equally important is the fact that attention is drawn to the noble ideal of professional fraternity among specialists that transcends the differences in their views and ideals. It is often in danger and remains mainly as an ideal. Towards that variety of opinion has been welcomed in this collection without, of course, obliterating the boundary line between science and faith. We are fortunate that the same ideal of professional fraternity has been highlighted by Professor Klaus Mylius in his contribution which has been given the premier place in this collection.

In a different context the above ideal was neatly articulated by the Bengali poet Buddhadeb Basu in his introduction to a collection of Bengali poems which has to be read *mutatis mutandis* here.

'Everyone has not got the same taste, personal likings too are characteristic of every individual, still I request the reader not to fix attention to a particular aspect of modern poetry and to see the phenomenon in its entirety. It is impossible to state the characteristic features of an age or a movement in a single definition. Only when light thrown from all angles its features are revealed'. (Translated from *Adhunik Bangla Kobita,* Kolkata 1954 : 8). If one read 'Indology' for 'modern poetry' it would not be different from what we have intended. When Basu states, 'My mind is moved by the deep thoughtfulness of Sudhindranath, but I roam with equal delight in the sightly and fragrant desolate fields of Jibanananda, Bishnu De's intelligence in telling with restrain charms me, but I am equally eager to hear the warmth-in-baritone of Amiya Chakrabarti'. (*ibid*) he ways what we want to. Only the names have to be changed, one shall find traces of roaming in desolate or crowded-fields, similar baritone and intellect in this collection too.

I shall be failing in my duty not to mention a few facts here. My name does occur as the Editor by the side of that of the eminent historian Bratindranath Mukhopadhyay, but the main responsibilities-contacting, collecting the papers, seeing the work through the press and even arranging for proof-correction-have been mostly borne by those who first approached me, particularly by Mr. Bhattacharya and Mr. Hassan. It would have literally impossible for me to bear the entire editorial responsibility. The untiring efforts of the two and of others who helped them have made this publication possible.

Dipak Bhattacharya

Santiniketan
16 July, 2004

Quest for Harmony

Für Freiheit und Kollegialität in der indologischen Forschung!

Klaus Mylius

Den Herausgebern dieser Festschrift ist in zweierlei Hinsicht Dank und Anerkennung zu zollen: einmal um der Würdigung von Professor Sukumari Bhattacharji willen; zum anderen, weil die gewählte Thematik die gegenwärtigen Grundprobleme and Hauptaufgaben der internationalen Indologie fokussiert. Es ist höchste Zeit, dass endlich einmal frei von Tabus dargelegt wird, welche Umstände die Entwicklung der Indologie behindern und wie man diese Umstände beseitigen kann and muss.

Es muss offen gesagt werden, das sich die Indologie fast überall absolut und im Gegensatz zu früheren Zeiten auch relativ in einer desolaten Lage befindet. Es ist angebracht, daran zu erinnern, dass im Jahre 1904 an jeder der damals destehenden deutschen Universitäten Sanskrit gelehrt wurde. Hermann Brockhaus (1806-1877) hatte im Kolleg über Sanskrit-Germmatik zeitweilig mehr als 40 Hörer! Aber gerade in Ländern, in denen einst die Indolgoe einen hohen Rang einnahm, wird ihr Wirkungsbereich immer weiter eingeshränkt. Beispiele bieten unter anderen die Niederlande, Großbritannien und Deutschland. Frei werdende Lehrstühle werden oft nicht wiederbesetzt oder herabgestuft. Es sind vor allem die rigorosen Sparmaßnahmen, die die Weiterentwicklung der Indologie und sogar die Bewahrung des Erreichten in Frage stellen. Insbesondere gilt dies für die sich ständig verschlechternden Perspektiven des wissenschaftlichen Nachwuchses. Eine der Folgen dieser restriktiven Handlungsweise besteht darin, dass in absehbarer Zeit eine harmonische Entwicklung aller Teilgebiete der Indologie nicht mehr gewährleiste sein wird.

Dazu muss aber in aller Deutlichkeit auf folgenden Umstand hingewiesen werden. Die Einschränkung der indologischen Forschung und Lehre in einem solchen Umfang ist nur möglich, weil die Indologen selbst nicht geschlossen auftreten. Sie vermögen es daher nicht, die Bedeutung ihres wissenschaftlichen Anliegens der Öffentlichkeit und den politischen Entscheidungsträgern zu verdeutlichen. Dieser die Kontinuität der indologischen Arbeit gefährdende Zustand soll hier an dieser würdigen Stelle vor der internationalen Fachwelt artikuliert werden.

Begonnen werden muss mit einem Blick in die Vergangenheit, denn es ist nun einmal nicht zu leugnen, dass die Indologie in gewisser Hinsicht eine beklagenswerte "Tradition" hat. Statt in Übereinstimmung mit dem Geist der Toleranz, der indische Philosophie und Religionen auszeichnete, zu handeln,

führten die Indologen nur zu oft gehässige Fehden gegeneinander. Wissenschaftlicher Meinugsstreit its selbstverständlich unerlässlich, doch sollte ebenso selbstverständlich sein, dass er in kollegialer Achtung and gegenseitigem Respekt geführt wird. Ein Blick auf eine lange zurückliegende Zeit, die Mitte des 19. Jahrhunderts, zeigt jedoch des Gegenteil. Erinnert sei an die Auseinandersetzungen zwischen Albrecht Weber und Theodor Benfey oder zwischen Weber und Albert Hoefer[1]. Über Jahrzehnte hinweg standen dem "Triumvirat"aus Otto von Böhtlingk, Rudolf von Roth and Albrecht weber die "Frondeurs", unter ihnen Theodor Goldstücker, martin Haug, Alfred Ludwig, Richard Pischel, in gewisser Weise auch Max Müller, gegenüber. Von den "Frondeurs" wurde des "Triumvirat" als "Sanskrit Insurance Company" verspottet. Aus dem Petersburger Wörterbuch bekannt sind die heftigen Worte Böhtlingks gegenüber Monier Monier-Williams.In der neueren Zeit haben sich diese "Gepflogenheiten" fortgesetzt. Immer wieder wurden Meinugsunterschiede mit verletzender Schärfe ausgefochten[2]. Noch 1999 musste sich Bernfried Schlerat wegen einer einem Fachkollegen nicht zusagender Rezension von diesem beleidigen lassen.[3] Erklären lässt sich eine solche, dem Geist der Indologie widersprechende Haltung einstweilenkaum. De folgenden Worten Lars Göhlers ist kaum etwas hinzuzufügen : "Es fällt schwer, für diesen verhängnisvollen Zug in der Geschichte der Sanskritistik eine hinreichende Erklärung zu finden. Auch die Feststellung, dass es sich hier um Spezialfächer handelte, die nur mit wenigen Gelehrten bestzt waren, vermag nicht zu überzeugen, da andere vergleichbare Fächer in weit geringerem Maße von solchen Zerwürfnissen heimgesucht wurden."4

Vor diesem düsteren Hintergrund wird es deutlich, wie bestimmte Klassen and Personen, verständlicheweise gerade in Deutschland, die Ereignisse nach 1989 nutzten, um auch im wissenschaftlichen Leben kapiltalistische Denkmuster durch zusetzen oder auch (und nich zuletzt) vulgäre Rechegedanken zu verwirklichen. Die sonst so mitteilsamen Madien berichteten darüber nur ganz am Rande und in Indian ist über diese Ereignisse fast ger nichts bekannt geworden. Daher wenden sich die folgender Ausführungen nicht nur an die Leser dieser Festschrift, sondern besonders an die indische Öffentlichkeit.

Es ist eine traurige, jedoch unumstößliche Tatsache, dass Pluralismus und Toleranz vielfach zur Irreführung bestimmte Schlagworte der Bourgeoisie geworden sind. An einigen Beispielen möge dies verdeutlicht werden. Die "offizielle" deutsche Indologie hat nicht einmal die selbstverständliche Pflicht erfüllt, anlässlich des 100. Geburtstages des großen Indologen Walter Ruben seiner zu gedenken (während in Indien Feiern und Kolloquien stattfanden!). Der eigentliche Grund einer solchen Halgun liegt darin, dass Ruben gegenüber dem kapitalistischen Gesellschaftssystem eine kritische Haltung einnahm and sich für sozialen Fortschritt engagierte. Der Autor möchte an dieser Stelle seine eigenen Wrote über Rubens Gegner wiederholen: "But one gets apprehensive when as it happens frequently in our days– discrimination replaces serious argumentation. Take the 'Einführung in die Indologie' (Introduction to Indology), edited by H.

Bechert and G. von Simson (Darmstadt). In its first edition F. Wilhelm in his contribtion on page 191 rates Ruben's work 'Die gesellschaftliche Entwicklung im alten Indien' (The Social Development in Ancient India), 6 volumes (Berlin 1967-1973) still as 'important'. The date was 1979. In the second edition of the work, published in 1993, the same author has this to say : 'The Indian history eludes the deterministic approach. A final judgement should now be passed on the wrong tracks pursued by the Marxist-Leninist indology (W. Ruben and other)' (page 290). Wilhelm who contradicts from an agnostic viewpoint Ruben's efforts to seriously explore and periodisise Indian history, simply denounces his methodological and research achievements as 'wrong tracks' without even attempting to produce any evidence."[5]

Wie sich die Verhältnisse an der Universität Leipzing (hier wirkten einst so berühmte Indologen wie Hermann Brockhaus, Ernst Windisch, Johannes Hertel und Friendrich Weller) nach 1989 gestalteten, beschreibt Lars Göhler : "Wer sich als 'Opfer' der DDR-Wissenschaftspolitik präsentieren konnte, dem wurde, auch wenn es durch die Qualifikation nicht gerechtfertigt war, die Möglichkeit, an der Universität zu bleiben and über die anderen Kollegen zu urteilen, eingeräumt. Der Rest galt praktisch als 'Täter' und würde größttenteils früher oder später wegen Bagatellen, Ereignissen, die im Nachhinein politisch gedeutet wurden, entlassen."[6]

In einer grundlengenden Studie[7] hat Arno Hecht nachgewiesen, dass mit der Intelligenz der DDR wie in einem kolonisierten Land verfahren wurde. Hecht demonstriert einige der Methoden, mit denen als nonkonformistisch betrachtete, der Etablierun kapitalistischer Produktionsverhältnisse abgeneigte oder sonstwie unerwünschte Wissenschaftler ausgegrenzt wurden. Zum Arsenal dieser Methoden gehörten in hohem Maße auch Rufmord, Diffamierung and Boykotthetze. Eine der finstersten Erscheinungen war die im Land Sachsen aufgestallte Schwarze Liste mit Namen unerwünschter Hochschullehrer. Nach 1989 wurden nicht weiger als 81.9% der sächsischen Hochschullerhrer entlassen!

Es muss an dieser Stelle die Bemerkung eingefügt werden, dass auch die Jubilarin dieser Festschrift persönlich Diskreditierung, Boykott und Ausgrenzung erfahren musste.

Doch zurück zur Situation in Ostdeutschland. Ähnlich wie im Hochschulwesen die Dinge an der Sächsischen Akademi der Wissenschaften, die traditionnell mit der Universität Leipzing eng verbunden war. Hierzu schreibt Göhler: "Nach der 'Wende' wurde... ein Prozess der 'innerer Selbstreinigung' eingeleitet. Das neue Präsidium... versuchet nach 1991 viele Mitglieder, die sich noch als politisch links bekannte, zu entfernen... (Dazu) setzte man einen 'Ehrenrat' ein, der auf demokratische Legitimation nicht mehr angewiesen war... Der 'Vorsitzende des Ehrenrate' hatte erklärt, dass die Akademiewürdigkeit eines Mitglieds durch Moments bestimmt werde, die außerhalb des Status stünden, nicht mit gesetzlichen Bestimmungen zu messen and damit auch nicht justitiabel seien.[8] Ein größeres Maß an Willkür hat es in der Geschichte der Akademie wohl nich gegeben."[9]

Manche besonders drastisch diskriminierte Gelehrte sahen den einzigen Auswes in Selbstmord. An einem dieser traurigen Schicksale lassen wir hier den Leser mit den Worten der englischen Zeitschrift "Nature" Anteil nehmen: "There was a tragic postscript last month to reunified German's policy of purging communist staff from universities in the former East Germany when Armin Erminsch, a professor of cell biology at the University of Leipzing... committed suicide... After reunification, all university staff were required to submit themselves to examination by such Personalkommissionen... The fairness of these committees has frequently been challenged, many critics arguing that the lack of checks allowed personal grievances to influence their recommendations." "Nature" zeigt dann, dass Ermisch den von ihm eingeleiteten Gerichtsprozess durch alle Instanzen gewann, dass er aber dennoch seinen Arbeitsplatz nich zurückerhielt: "But the science ministry countered gain with the argument that all vacancies had been filled." Und über die Haltung des sächsischen Hochschulministeriums wird berichtet : "The science ministry remains quiet on the issue, merely repreating that it has always followed the letter of the law, and that, if individual mistakes have been made, they do not outweigh the greater benefit of having quickly removed the powerful influence of communist from east German universities."[10]

Pluralismus und Toleranz der neuen herrschenden Klasses bestanden also in dem Vorsatz, den Einfluss des Kommunismus an den ostdeutschen Universitäten auszurotten. Ob sich die Vertreter dieser Klasse darüber klar waren, in welche gefährliche Nachberschaft sie sich damit begaben? Denn niemand anders als Adolf Hitler hatte verkündet: "Wenn ich vor 14, 15 Jahren und seitdem immer wieder vor der deutschen Nation erklärt babe, dass ich meine Aufgabe vor der deutschen Geschichte darin sehe, den Marxismus zu vernichten, dann ist mir das keine Phrase, sondern ein heiliger Sehwer, den ich erfüllen werde, solange ich überhaupt noch einen Atemzug tue."[11] Der Autor meint, dies nich mommentieren zu müssen und überlässt die Beurteilung der hier präsentierten Zitate dem Leser. Für den im Mittelpunkt dieser Betrachtungen stehenden wissenschaftlichen Bereich ist jedenfalls zu resümieren: Das Ausgrenzen und Diskreditieren von Fachkollagen, die sich außerhalb des "Mainstream" befinden, zeugt von mangelndem Plurlismusverständnis, von Tolerazdefiziten, von der Schwache der eigenen Position und last not least von einem Mangel an akademischer Würde.

Es genüge aber nicht, diese Erscheinungen lediglich anzuprangern. In einer wissenschftlichen Untersuchung mass auch nach ihren Quellen and Wurzeln gefragt werden. Auch bloße Kapitalismuskritik reicht nicht aus. Denn der Kapitalismus ist nicht nur ein ökonomisches Verhältnis, denn hinter dem Kapital stehen Menschen. Die Gebrechen des Kapitalismus haben also auch psychologische Wurzeln. Diese gilt es zu finden und es gibt keinen besseren Wegweiser als altindische philosophische und religiöse Lehren. Inhaltlich sind diese seit langem mehr oder weniger gut bekannt. Hier soll der Versuch unternommen werden, sie unter neuen Gesichtspunkten nach der Lösung der eben gestellten Aufgabe zu befragen.

Zwei Begriffe sind es, die wieder und wieder als Ursache des Leids und überhaupt alles Schlechten und Negativen sowohl in der Welt als auch in Individuum apostrophiert werden : lobha und tṛṣṇa. Aus der Fölle der Beispiele seien hier einige besonders repräsentative herausgegriffen. In buddhisti paticcasamuppāda, dem Gesetz von der ursächlichen Entstehung, kommt tṛṣṇa/ taṇhā als einer der Hauptursachen der ständigen Erneuerung des Leidens höchste Bedeutung zu. Im Dīghanikāya 2, 68 heiβt es : "Er hat welthiche Gier aufgegeben; er verharrt mit einem von Begierde frei gewordenen Gemiüt; von Gier reinight er den Sin." Gautama Buddha bekundet im Majjhimanikāya 22: "Als unheil voll wurden die Begierden von mir bezeichnet, als viel Leid, viel Mühsal bringend und noch mehr Elend." Im 82. Stück des Majjhimanikāya spricht der Mönch Raṭṭhapāla zu seinem Vater: "Wenn du, o Hausvater, nach meiner Rede handeln würdest, (dann) würdest du diesen Haufen von Gold and Goldschmuck auf Karren laden, wefahren und in der Mitte des Gangesflusses versenken lassen. Aus welchem Grund? Weil nämlich dir, o Hausvater, daraus (nur) Kummer, Jammer, Leid, Verzweiflung, Mühsal entstehen werden."

Gedanken ganz ähnlicher Art finden sich auch in Jaina-Kanon. Einige Zitate mögen auch hier genügen. Im Āyāraṁgasutta I, 2, 1, 1 heiβt es:" ...for different kinds of property, profit, meals, and clothes, Longing for these objects, people are careless, suffer day and night..., desire wealth and treasures, commit injuries and violent acts..." Und Sūyagadamgasutta I, 1, 2 besagt: "He who owns even a small property in living or lifeless things, or consent to others holding it, will not be delivered from misery."

In einer als epochal zu bezeichnenden Studie[12] hat Himmat Singh Sinha die Grundthesen der Bhagavadgītā und des Marxismus verglichen. Die Gītā erklärt in XVI, 21 lodha als eines der drei Tore, die zur Hölle Führen. Die ethisch motivierte Forderung mach aparighaha findet sich in IV, 21 und VI, 10. Sinha Stellt aufgrund seiner Stadies einige Thesen auf, die es verdienen, hier wiedergageben zu werden. "Through his theory of 'surplus value', Marx has exposed that greed, lust, and material attachment are the sole ingredients of explotation."[13] "Both Marx and the Gita agree that it is the freedom of greed that leads to real freedom "[14] Sinha stellt auf geradu zu genials Weise eine Verbindung zwischen der Gītā und dem Leninismus her; sie wird am besten an folgenden Thesen vedeutlicht: "In asking the society to control their consumption, Lenin is, as a matter of fact, preaching the lesson of pratyāhāra, which means withdrawal of senses from the objects of consumption... Lenin did not know that by introducing this measure, he was converting communism into the doctrine of 'anāsakti' i.e., the anāsakti yoga."[15]

Vorsorglich sei bemerkt, dass die Absage an Gier und Habsucht selbstver ständlich nicht gleichbedeutend mit dem Verzicht auf Selbsterhaltung ist. Bekanntlich hatte schon Buddha Selbstpeinigung und unnötige Askese als der Erlösung nicht förderlich abgelehnt.

Es muss um der historischen Gerechtigkeit und Vollständigkeit willen festgestellt werden, dass auch im ursprünglichen Christentum Gedanken enthalten waren, die den soeben vorgetragenen inhaltlich entsprachen. Dies wäre Jedoch

Gegenstand einer selbstständigen Studies; darum möge hier nur auf zwei Zitate rekurriert werden. "Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon" (Lukas 16, 13; Matthäus 6, 24) und "Wohlan nun, ihr Reichen, weinet und heulet über das Elend, das über euch kommen wird! Euer Reichtum ist verfault, eure Kleider sind von Motten zerfressen, euer Gold und Silber ist verrostet" (Jacobus 5, 1-3). Das von Gottfried Wilhelm Leibniz stammende Wort "Omnes adiuvare" (allen beistehen) kann unter den Bedingugen der Habsucht und Gier– also auch der kapitalistischen Profitgier– niemals verwirklicht werden.[16] Auch die Jubilarin dieser Festschrift hat in ihrem Werk "Fatalism in Ancient India" betont, dass die Konzentration des Kapitals in den Händen weniger multinationaler Konzerne die Volksmassen zu Fatalismus und Obskurantismus führt.[17] Die kapitalistische Gesllschaft, so legt der bereits erwähnte Arno Hecht treffend dar, "...stellt zugleich eine grudsätzlich ungerechte Gesellschaft dar, dasie den Menschen, trotz gegenteiliger Behauptung keine Chancengleichheit bietet, allein auf Maximalprofit orientiert und ihren Bürgern wesentliche soziale Menschenrechte vorenthält, wie das auf Arbeit, Bildung, Gesundheit und Tailnahme am kulturellen Leben."[18] Dieser Streifzug durch die traurige Geschichte menschlicher Gier und Habsucht– die schließlich in die kapitalistische Profitigier einmünden– mug mit der folgenden aktuellen Warnung beendet werden: "Die Weltwirtschaft als einen universalen freien Markt zu organisieren heißt, die Zukunft des Planeten auf die Annahme Zu gründen, all diese Probleme erledigten sich von selbst, wenn man nur dem Profitmotiv freien Lauf lasse. Fahrlässiger kann man kaum sein."[19]

Wie sich der Kampf der kapitalistischen gegen die sozialisitischen Ideologen in der Indologie auswirkt, wurde oben anhand einer Reihe von Beispielen dargelegt. Nut ist die Indologie eine Wissenschaftsdisziplin, so dass in erster Linie die Frage nach der Möglichkeit oder gar Notwendigkeit der Anwendung marxistischer Methoden in der indologischen Forschung zu stellen ist. Indische Geschichte, Philosophie, Religion, Literatur– sie alle sind so vielgestaltig und von solcher Komplexität, dass sie von einer einzigen methodologischen Linie nicht erfasst werden können. Was liegt näher, als ein möglichst umfassendes Forschungsinstrumentarium einzusetzen? Hier gebührt– nicht aus tages politischen Aspekten, sondern aus rein wissenschaftlichen Grüden– auch der marxistischen Methode, also dem dialektischen Materialismus, ein adäquater Platz. Übrigens kann man auch hier von alten Indien lernen, nicht nur hinschtlich der in Sarvadarsanasaṁgraha vertretenen pluralistischen Tendenz. Schon das Śatapatha-Brāhmana IV, 2, 4, 1 hatte postuliert, dass man aus verschiedenen Quellen lernen soll, soger von den Carakas (deren Ansichten über das Ritual bekanntlich von denen des Weißen Yajurveda vielfach abwichen). Beispiele für die Anwendung marxistischer Methoden in der Indologie gab Sukumari Bhattacharji selbst, indem sie schrieb: "... many changes in the conceptual world were generated by changes in the material life of the people."[20] Und sie schrieb weiter: "With the class division and with wealth and prosperity becoming the share of a handful, the masses chafed in misery. The primary producers passed their lives in grinding poverty while the leisure class whether priests, noble or intellectuals– who were

divorced from actual productive activity now sneered at manual labour and bacame parasites who lived on other labour."[21] Ein anderes Beispiel: den umstrittenen Begriff dakṣiṇa definierte sie richtig als "sacrificial fee".[22]

Um aber allen eventuellen Missverständinissen und Simplifizierungen vorzubeugen, muss auch Folgendes gesagt werden: Eben wegen der Komplexität der von der Indologie zu untersuchenden Sachverhalte wäre es unhaltbar und wider-sinning, sich auf eine einzige Methode– und sei es die des Marxismus– be schränken zu wollen. Um zwei Beispiele aus dem Jaina-Kanon zu wählen : zur Ermittlung der etymologischen Basis der Termini Rāyapasenaijja (Rājapraśnīya oder Rājaprasenajit) und Sūyagadaṁga (Sūtrakṛtāṅga oder Sūcākṛtāṅga) kann man nicht auf den Marxismus zurückgreifen. Wohl aber ist er unverzichtbar bei der bewertung der jinistischen Philosophie und der anderen altindischen Philosophiesysteme, zur Periodisierung der indischen Geschichte und zu vielen anderen Aspekten, zu denen die Jubilarin, wie erwähnt, selbst Beispiele beigebracht hat.

"Freiheit der Wissenschaft" bedeutet somit such die Freiheit in der Wahl der methodologischen Mittel– ohne Gefahr zu laufen, eben deswegen diskreditiert zu werden, wie es beispielsweise– das betreffende Zitat wurde schon erwähnt– Walter Ruben durch Friedrich Wilhelm geschah, Umgekehrt ist esgerade Ruben gewesen, der Bernhard Breloer, Walter Wüst and Erich Frauwallner mehrfach beifälling zitiert hat, obwohl die politisch-ideologische Haltung der Genannten von der Genannten von der seinigen weit entfernt war. Ein anderes positives Beispiel bietet eine Studie des Norwegers Lars–Martin Fosse.[23] Neben der wissen schaftlichen Bedueutung seines Buches verdient er Anerkennung dafür. dass er die Ansichten eines hohen Nazis– Walter Wüst– über die Chronologie des Rgveda nicht verschweigt, sondern sie angemessen und objektiv würdight. Damit behauptet und wahrt Fosse die Einheit der Wissenschaft. Gerade diese aber ist gegenwärtig durch politische Interessen and Machinationen so stark wie nie zuvor gefährdet.

Umso höher ist die tolerant Haltung von Fosse und Ruben zu bewerten. In der Reihe der positive herausgehobenen Namen darf der hervorragende Indogermanist und Indologe Bernfried Schlerath (1924-2003) keinesfalls fehlen. Obwohl dieser seine rechtskonservative Haltung state betont hatte, ließ er im fachilchen Meinungsstreit ausschließlich wissenschaftliche Argumente gelten und verurteilte jede politisch oder ideologisch motivierte Diskriminierung von Fachkollegen. Würde die Indologie seinem Beispiel folgen, wäre sie in einem weniger krisenhaften Zustand.

Schließlich soll an ein besonders eindrucksvolles Beispiel echter Kollegialität erinnert werden: die Zuarbeit vieler Fachkollegen, voran Albrecht Webers, zum Petersubrger Wörterbuch. Nur dann, wenn der damalige Geist echter Kooperation wieder die Herzen beseelt, hat die Indologie nach ihrer großen Vergen genheit auch wieder eine Zukunft!

Die Sicherung der Zukunft aber ist für die internationale Indologie dringlicher denn je. Denn des Forschungsgebiet der Indologie Befindet sich– ein Blick auf die

Wissenschaftsgeschichte lehrt das– in ständigem Wachsen und so steigh auch die Fülle der vor ihr liegenden Aufgaden. Lüngst reicht es nicht mehr aus, die Indologie als reine Geisteswissenschaft aufzufassen. Zu betonen ist vielmehr ihr komplexer Charakter: das Zusammenwirken von politischer, literarischer, philosophischer und ökonomischer Geschichtsforschung mit der Sprachwissenschaft, der Geographie, der Völkerkunde und weiteren Disziplinen. Es möge die Gelegenheit genutzt werden, hier einige der wichtigsten und nächst liegenden Aufgeben aufzuzählen; unter Verzicht auf die mittelindischen Sprachen und Literaturen möge dies flüchtige Skizze auf die eigentliche Sanskritistik beschräkt werden.

Gegenwärtig konzentriert men sich auf die Digitalisierung der grundlegenden Sanskrit– und Veda-Texte und leistet damit eine nützliche und unersetzliche Arbeit. Doch muss darauf aufmerksam gemacht werden, dass viele Werke der vedischen und Sanskrit-Literatur noch keine angemessene Ubersetzung erfahren haben. Eine den Anforderungen der Gegenwart genügende Übersetzung darf sich nicht auf die bloβe sprachliche Übertragung beschränken; sie muss auch Beiträge zur Interpretation, zum Verhältnis zu Paralleltexten usw enthalten. Gerade in der Vedistik sind grundlegende Texte nicht order nich vollständig übersetzt, so die katha-Saṁhitāa, dis Katha-Kapiṣṭhala-Saṁhitā, das Taittirīya-Brāhmaṇa, das Taittirīya-Āraṇyaka und des Hiraṇyakeśi-Śrautasūtra. Und die vorhandenen Überstzungen genügen oft nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Mit Recht schrieb daher Walter Ruben: "Wir müssen... die Texte, die die Indologen bisher benutzt haben, neu durcharbeiten... Ja, wir werden denselben Text immer wieder leasen müssen, denn bei jedem neuen Lesen werden uns neue, bisher unbeachtete Stellen auffallen."[24]

In der Lexkographie berechtigt das seit 1976 vom Sanskrit Dictionary Department und vom Department of Linguistics der Universität Pune herausgegebene Encyclopaedic Dictionary of Sanskrit on historical principles zu groβen Hoffnungen– unter der Voraussetzung freilich, dass es zügig weitergeführt wird. Für die Śāstras und Purāṇas ist die Herstellung von Konkordanzen erforderlich.

In der klassischen Literatur sollten vergleichende stilkritische Uatersuchungen der Texte zur Gewinnung tieferer Einsichten in die reletive and absolute Chronologie durchgeführt werden. Das seit langem umstrittene Problem der Genesis des indischen Dramas mass einer endgültigen Klärung zugeführt werden.

In der Religionsgeschichte fehlen Spezialuntersuchungen zum Opferkult. So zu den meisten ahīnas and sattras. Lücken bestehen auch hinsichtlich der sektarischen Richtungen innerhalb des Hinduismus. Ebenso steht die vollständige Erschlieβung der Tantra-Texte noch aus. Die heute vielfach von Unberufenen diskutierte Ideenwelt der Tantras wird erst dann wissenschaftlich bewertet werden können, wenn alle wichtigen Texte übersetzt vorliegen.

In der Philosophie geht es vorwiegend um eine gründliche Erforschung der frühen Phasen, etwa un die Klärung der Frage, ob und in welchem Ausmaβ schon für die Zeit des Ṛgveda bzw. Atharvaveda von Philosophie gesprochen werden

kann oder ob diese erst in den Upanisaden in Erscheinung getreten ist. Von den orthodoxen System ist bis in die Gegenwart die Mīmāṁsā vernachlässigt worden. Stärker als bisher mkuss die bedeutung der Philosophiesysteme Altindiens– nicht nur ber sarśanas– für die Bawältigung heutiger philosophischer probleme herausgearbeitat werden.·

Als ausgesprochener Schwerpunkt der künftigen Forschung hat dia Chronologie zu gelten. Es dürfte nicht verfehlt sein, zunächst das in zahllosen Aufsätzen und Abhandlungen verstreute Material zusmmenzustellen, um so feststellen zu können, was tatsächlich gesichertes Wissen ist und wo man nur von Vermutungen sprechen kann oder noch völlig im Dunkeln geht.

In methodologischer Hinsicht ist zu betonen, dass ein großer Teil des indologischen Forschungsspektrums einer Entwicklung "aus sich selbst heraus" nur noch begrenzt fähig ist und nach einer Ergänzung durch neue Methoden verlangt. Ohne Einbeziehung geographischer, ethnographischer, archäologischer und anderer Arbeitsmethoden wäre es aussichtslos, ein umfasendes Bild von des gesell scheftlichen Zuständen in den einzelnen Entwicklungsstufen des alten Indien zeichnen zu wollen. Die Einführung von Methoden aus der Musikwissenschaft (Sāmaveda), der Statistik (Chronologie) und der Philosophie (Ritualistik) hat schon jetzt zu bemerkenswerten Ergebnissen geführt.

Beachtung verdient schließlich auch die Wissenschaftsgeschichte. Analysen des historischen Prozesses einer Disziplin sowie Bilanzen der Erkenntniswege dienen in Verbindung mit mathematischen Methoden der Wissenschaftsprognostik.

Der Sanskitist sollte sich also nicht verstanden wissen als "ein stiller Mensch, der in weltenfernen Räumen toten Göttern dien".[25] Vielmehr wird die Indologie umso stärker aufblühen, je breiter sie ihre methodologischen Möglichkeiten entfaltet und je effektiver sie sich von einer rein philologischen zu einer Komplexwissenschaft umgestaltet.

Dies wird aber letztlich nur dann realisierbar sein, wenn man sich in der Fachwelt von kapitalistisch indoktriniertem Konkurrenzdenken löst und den Prinzipien der Freiheit der Forschung und der selbstlosen Kollegialität folgt. Die Jubilarin dieser Festschrift war und ist hierin ein Vorbild. Mit dem ihr geschuldeten Dank verbindet sich der Wunsch: tvaṁ jīva śaradaḥ śatam!

Anmerkungen

1. Weber, Albrecht : Herrn Hoefer zur Antwort. In: Indische Studien, vol. II Berlin und Leipzing 1853
2. Hierzu vgl. Wiener Zeitschrift für die Kunde Südasiens, vol. XXV (1981). S. 139-143.
3. Da der vorliegenda Artikel eine wissenschaftspolitische Analyse und damit die Untersuchung objektiver Gegebenheiten und Zusammenhünge beinhaltet, werden lebende Personen weder in positive noch in negative Hinsicht namentlich angeführt; anders wird selbstverständlich bei Bezugnahme auf Publikationen verfahren.

4. Göhler, Lars : Sanskritistik und Indische Altertumskunde in Leipzing. Historischer Abriss speziell der Jahre 1949 bis 1990. In: Sitzungsberichte der Leibniz-Sozietät, Band 48, Heft 5 (Berlin 2001), S. 119-133
5. Mylius, Klaus : Walter Ruben, Vedic Research– and a Few Questions of Principle. In: Indian Culture– Continuity and Discontinuity. In Memory of Walter Ruben (1899-1982), ed. by Joachim Heidrich, Hiltrud Rüstau and Diethelm Weidemann = Abhandlungen der Leibniz-Sozietät, Band 9 (Berlin 2002), S. 46
6. Göhler, a.a.0., s. 128
7. Hecht, Arno : Die Wissenschaftselite Ostdeutschlands. Feindliche Übernahme oder Integration? (Leipzig 2002)
8. Schreiben des Ehrenrates der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzing an das Präsidium und die Ordentlichen Mitglieder der Philologisch historischen Klasse vom 31. Mai 1994
9. Göhler, a.a.0., S. 129-130
10. Abbott, Alison : Leipzing professor's death stirs bitter feeling. In: Nature, vol, 378 (7. Dezember 1995), S. 530
11. Adolf Hitler auf dem Kongress der "Deutschen Arbeitsfront". Birlin,
10. Mai 1933, Zitiert nach Günther, Hans : Der Herren eigener Geist. Neudruck (Berlin 1983), S. 49
12. Sinha, Himmat Singh : Communism and Gita. A philosophico-ethical study (Delhi 1979)
13. Sinha, a.a.0., S.10
14. Sinha, a.a.0., S. 250
15. Sinha a.a.0., S. 242-243
16. Zitiert nach Holz, Hans-Heinz: Philosophie und Politik (San abbondio 2002), S. 29
17. Bhattacharji, Sukumari : Fatalism in Ancient India (Calcutta 1995), S. 337
18. Hecht, a.a.0., S. 82-83
19. Gray, John: Die falsche verheiβung. Der globale Kapitalismus und seine Folgen. 2. Aufl. (Berlin 1999), S. 273
20. Bhattacharji, a.a.0., p. IV
21. Bhattacharji, a.a.0., p. XIV-XV
22. Bhattacharji, a.a.0., S. 135
23. Fosse, Lars-Martin: The Crux of Chronology in Sanskrit Literature. Statistics and Indology. A Study of Method. Universitetet I Oslo=Acta Humaniora Nr. 21 (Oslo 1997)
24. Ruben, Walter : Einführung in die Indienkunde (Berlin 1954), S. 9
25. Lüders, Heinrich : Rede in der öffentlichen Sitzung der Preuβischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin am 29.1.1914

For Freedom and Co-operation in Indological Research

Klaus Mylius

The publication of this anthology deserves thanks and attention for two reasons: in the first place, it rightly honours Professor Sukumari Bhattacharji; in the second place, because the chosen theme focuses on the basic problems and chief works of international Indology. It is high time that we cast aside taboos and discussed plainly what circumstances are hindering the development of Indology and how they can and must be overcome.

It must be confessed openly that Indology is today in a depressing state, both in absolute terms and in comparison with earlier times. We should recall that in 1904 Sanskrit was taught in every German University that existed at that time. Hermann Brockhaus (1806-1877) sometimes had more than 40 listeners in his lectures on Sanskrit-Germatik! However, even in countries where Indology once attained a high rank, the subject is now in retreat. Among others, the Netherlands, Great Britain, Germany might be cited as examples. Professors' chairs in this subject which fall vacant are often not filled again or are downgraded. It is above all rigorous penny–pinching which puts further progress in the field of Indology in peril and even risk losing what has already been achieved. This is particularly the case in respect to the constantly working prospects of scientific progress. One of the results of this restrictive type of behaviours is that the harmonious development of different branches of Indology can no longer be expected in the foreseeable future.

In this context, the following circumstance must be clearly indicated. The scaling down of Indological research and learning has become possible, only because the indologists themselves have failed to take a firm stand. They have not been able to emphasize and publicize their scientific concerns and requests, making their importance sufficiently clear to those who make political decisions. This factor, which endangers the continuity of Indological work, should be articulated in this fitting place, in full view of the international world of our subject.

Let us begin with a glance towards the past. It cannot be denied that Indology, in a certain respect, has a deplorable 'tradition'. Instead of being in agreement with the spirit of tolerance which Indian philosophy and religions teach, Indologists often carried on unpleasant feuds against each other. It goes without saying that differences of opinion are permissible but it also goes without saying that such debates should be carried on in a friendly atmosphere, with mutual

respect. However, a glance towards a long distant past, the mid nineteenth century, presents a different picture. We should remember the quarrels between Albrecht Weber and Theodor Berfey or between Weber and Albert Hoefer.[1] A few decades later, we see the 'triumvirate', consisting of Otto von Bohtlingk, Rudolf von Roth and Albrecht Weber and the 'Frondeurs', among them Theodor Goldstücker, Martin Haug, Alfred Ludwig, Richard Pischel, in a certain manner, also Max Müller, in conflict with each other. The 'Frondeurs' mocked the 'triumvirate', calling it the 'Sanskrit Insurance Company'. Through the Petersburg dictionary, the strong words of Bohtlingk against Monier Monier-Williams have become well known. In more recent times, too, these 'customs' have continued, Debates are still carried on with a sharpness that wounds.[2] In 1999 Bernfried Schlerat was insulted by one of his colleagues sharing his subject because of a review which had not been promised. Such events explain the contradictory behaviour that sometimes marks the spirit of Indology. The following words of Lars Göhler might be noted : 'It is difficult to find a satisfactory solution for this unfortunate trend in the history of Sanskrit criticism. Even the knowledge that our special branch of learning includes only a few scholars has not been able to hide the fact that other comparable branches are far less troubled by such disputes.'

In this bleak background, it becomes significant, how particular classes and persons, for obvious reasons, most of all in Germany, are using the events since 1989 in order to impose the capitalist way of thinking on the world of learning. This is being done partly through obstructions and partly through vulgar cost benefit analysis. The media, so sympathetic to other causes, touches this matter only marginally, and very little about it, is known in India. Thus the following article is intended not only for the readers of this volume but for the Indian public in general.

It is a sad but now undeniable fact that certain slogans such as pluralism, tolerance are used by the bourgeoisie only to deceive. A few examples will make this clear. The 'official' German ideology did not even fulfil its absolutely clear duty of commemorating the 100th birthday of the great Indologue Walter Ruben, (while in India celebrations and discussions took place.) The real reason for such a gross omission was that Ruben had a critical attitude towards the capitalist social system and advocated social progress. The author would like to repeat here his own comment about the opponent of Ruben : "But one gets apprehensive when as it happens frequently in our days— discrimination replies serious argumentation. Take the 'Introduction to Indology' edited by H. Bechert and G. von Simson (Darmstadt). In its first edition F. Wilhelm in his contribution on page 191 rates Ruben's work 'The Social Development of ancient India', 6 volumes (Berlin 1967-73) still as 'important'. The date was 1979. In the second edition of the work, published in 1993, the same author has this to say : 'The Indian history' eludes the deterministic approach. A final judgement should now be passed on the wrong tracks pursued by the Marxist-Leninist Indology (W. Ruben and others) (Page 290). Wilhelm who contradicts from an agnostic viewpoint Ruben's efforts to seriously explore and periodise Indian history, simply

denounces his methodology and research achievements as 'wrong tracks' without even attempting to produce any evidence."[5]

Lars Göhler describes what took place in the University of Leipzig (where famous Indologists such as Hermann Brockhaus, Ernst Windisch, Johannes Hertel and Friedrich Weller once worked) after 1989 : " who ever could present himself as the 'victim' of the academic politics, of the GDR (German Democratic Republic) was given the chance of remaining in the University and judging his colleagues, even if his qualifications were not sufficient. The rest were practically labelled 'criminals' and for the most part, dismissed sooner or later for trifling matters, the real reason being rooted in politics.'[6]

In a path breaking study, Arno Hecht has shown that the intelligentsia of the GDR was treated as would have been the case in a colonized land. Hecht demonstrates some the of the methods of getting rid of those who are regarded as non-conformist, those who criticize the capitalist system or are otherwise considered undesirable. The arsenal of these methods include, in a large degree, attacks on reputation, defamation and incitement to boycott. One of the darkest examples of this trend might be seen in the province of Saxony, where a black list with the names of unwanted high school teachers was put up. After 1989, not less than 81.9% of Saxon high school teachers have been dismissed!

It must be stated here that the object of this volume (Sukumari Bhattacharji) has likewise experienced personal discrediting, boycott and marginalization.

Let us return to the situation in East Germany. What has taken place in the high schools might be paralleled by events in Saxon Academy of Sciences which has traditionally maintained close ties with the University of Leipzig. Göhler writes about this "After the 'turning point' (i.e. the change of political direction in 1989-90; *translator*) ... a process of 'internal self-purification' was carried out. The new Presidium... tried, after 1991, to remove many colleagues who were known to be leftist in politics.... (To this end) a 'Council of Honour', the basis of which lacked democratic legitimacy, was set up. ... The 'President of this Council of Honour' had stated clearly that the academic worth of a colleague would be judged by factors that lay outside the existing rules that had little connection with legal regulations and were therefore not subject to appeals in the court.[8] A more arbitrary measure had never been known in the history of the Academy.'[9]

Many scholars, subject to particularly drastic discrimination, have sought refuge in suicide. Let us give the reader a glimpse of one of these tragic events, in the words of an English journal, 'Nature' : 'There was a tragic postscript last month to reunified Germany's policy of purging communist staff from universities in the former East Germany when Armin Ermisch, a Professor of cell biology at the University of Leipzig ... committed suicide.... After reunification, all University staff were required to submit themselves to examination by such Personal commissions. The fairness of these committees has frequently been challenged, many critics arguing that the lack of checks allowed personal grievances to influence their recommendations. 'Nature' goes on to show that Ermisch, though he won in all instants the court cases which he had filed, did not succeed in being

restored to his post. 'But the science ministry countered again with the argument that all vacancies had been filled.' About the conduct of the high school ministry, we are told : 'The science ministry remains quiet on the issue, merely repeating hat it has always followed the letter of the law, and that, if individual mistakes have been made, they do not outweigh greater benefit of having quickly removed the powerful influence of communism from East German Universities.'[10]

In practice, the pluralism and tolerance of the new ruling classes consists of determined efforts to eradicate all communist influence from East German Universities. Do the representatives of this class realize clearly in whose company this sort of action is placing them? For none other than Adolf Hitler had declared: 'I have said 14, 15 years ago and continued ever since to stress this before the German nation. I consider that the destruction of Marxism is my role in German history. This is not a more catchword or slogan, but a holy vow, which I shall carry out as long as I draw breath.[11]

The author leaves the reader to draw his own conclusion from this quotation. Let us resume our range of discussion about the state of academic affairs. The discrediting and marginalizing of colleagues who share the same subject rises from a twisted view of pluralism and tolerance, from the weakness of their own position and last but not least from a lack of academic worth.

However, it is not enough simply to denounce these happenings sorrowfully. In a scientific investigation, their roots and causes must be investigated. It is not a cause of simply criticizing capitalism. For capitalism is not just an economic system. People stand behind capital. The crimes of capitalism thus have psychological roots. It is worthwhile discovering these and no better way exists than the philosophy and religious learning of ancient India. This, in fact, has been more or less well known for a long time. We shall try to examine the matter afresh, in the new historical context, in order to find solutions to problems which have been mentioned above.

Two things are apostrophized over and over again, as the source of all suffering, the root of all that is evil and negative in this world and the next : *lobha* and *trsna*. From numerous examples, a few representative ones might be presented here. In the Buddhist paticcasamuppāda, the law of the earliest origin, *trsna / tanha* appear as the chief sources of the renewal of the cycle of sorrow, this matter being given the highest significance. In Dighanikaya 2. 68 it is said : 'He has given up worldly goods; he has abided with a mind that is free from greed; he has purified his mind of greed.' Gautama Buddha declares in Majjhimanikya 22. 'Greed appears in my eyes unholy, bringing much care, grief and even more sorrow'. In 82, Paragraph of Majjhimanikya, the monk Ratthapala speaks thus to his father : 'If you, O master of the house, would take my advice, you would load all these gold and jewels into a cart, take them far away and throw them into the river Ganges. For what reason? Because, O master of the house, these can only be the source of grief, care, despair, worry and lamentation.'

Similar ideas appear also in Jaina-Kanon. A few quotations must be presented here. In Ayarāmgasutta I.2.1.1-we find; '... for different kinds of property, profit,

meals and clothes, longing for these objects, people are careless, suffer day and night ..., desire wealth and treasures, commit injuries and violent acts ...' And Sūyagadamgasutta 1.1.2 states : 'he who owns even a small property in living or lifeless things, or consent to others holding it, will not be delivered from misery.'

In an epoch making .study, Himmat Singh Sinha has compared the main theses of the Bhagavadgita and Marxism : The Gita states in XVI; 21 *lobha* as one of the three doors that lead to hell. The ethical motives for promoting *aparigraha* appear in IV, 21 and VI, 10. Sinha places in the forefront of his study a thesis that might be reproduced here : 'Through his theory of 'surplus value', Marx has exposed that greed, lust and material attachment are the sole ingredients of exploitation.[13] 'Both Marx and the Gita agree that it is the freedom of greed that leads to real freedom.'[14] Sinha puts forward, in a way that is worthy of genius, a link between the Gita and Leninism. This appears most clearly in the following thesis : 'In asking the society to control their consumption, Lenin is, as a matter of fact, preaching the lesson of *pratyāhāra* which means withdrawal of senses from the objects of consumption ... Lenin did not know that by introducing this measure, he was converting communism in to the doctrine of '*anasakti*' i.e. the anasakti *yoga.*[15]

It should be noted carefully that giving up greed does not mean renunciation of enough means to keep oneself alive. It is well known that Buddha did not consider self-torture and unnecessary excesses conductive to salvation.

For the sake of historical truth and justice it must be affirmed that early Christianity contains ideas similar to what has been stated above. These should be the subjects of an independent study; here only two quotations might be given. 'You cannot serve God and Mammon at the same time, (Luke 16, 13; Matthew 6, 24) and 'O rich people, weep and cry over the sorrow that is to overcome you! Your wealth is rotten, your clothes have been torn to pieces by moths, your gold and silver have rusted'. (John. 5, 1-3). The word originated from Gottfried Wilhelm Leibniz 'Omnes adiuvare' (all helping each other) can hardly be realized in the atmosphere of greed, including the capital it greed for profit[16]. Also the object of this volume has stated in her work, 'Fatalism in Ancient India' that the concentration of capital in the hands of a few multinational companies leads to fatalism and obscurantism on the part of the masses.[17] Capitalist society, as Arno Hecht declares in his already mentioned study, '... creates a basically unjust society, where equality of opportunity is denied, despite what is said to the contrary. Men are oriented only towards maximum profit and deprived of their human rights such as right to work, education, health and participation in cultural life.'[18] This conflict, which runs through the sad history of human greed and culminates with the capitalist greed for profit, might be concluded with the following words of warning : 'Organizing the world economy as a universal free market means acceptance of its ruin. All these problems are bound to increase automatically, if the profit motive is given free rein. We can hardly allow laissez faire.'

We can give a host of examples as to the way in which the struggle between capitalist and socialist ideologies is being carried on in the field of Indology.

Indology, being a scientific discipline, the basic question about the necessity or possibility of applying the Marxist methods in this case must be settled. Indian history, philosophy, religion, literature and so on are so many-sided, full of complexity, that it is impossible to fit them all within a single methodological line. What, however, comes closest to being a possible and useful instrument of research? Here Marxism, dialectical materialism must be given an adequate place, not because of the exigencies of day-to-day politics, but purely on scientific, academic grounds. Also we can learn from ancient India, not just as an abstract idea, Sarvadarsana Samgraha, the pluralist tendency. Already the Satpatha Brahmana IV, 2, 4 had stated that one should seek learning from various sources, including the charakas. (It is well known that the view of this text on rituals is a good deal removed from that of the white Yajurveda). Sukumari Bhattacharji herself has given examples of the use of Marxist methods in Indology. For instance, she has written, '... many changes in the conceptual world were generated by changes in the material life of the people.'[20] And she wrote further : 'With the class division and with wealth and prosperity becoming the share of a handful, the masses chafed in misery The primary producers passed their lives in grinding poverty while the leisure class whether priests, noble or intellectuals who were divorced from actual productive activity now sneered at manual labour and became parasites who lived on others labour.[21] Another example; she defines the controversial idea of dakshina as 'sacrificial fee.'[22]

In order to avoid all eventual misunderstanding and simplification, the following must be said : Because of the complexity of Indology, it would be self defeating to confine ourselves to a single methodology of research even if this is Marxism. To choose examples from Jaina-Kanon, in deciding the etymological basic of the term Rayapasenaijja (Rājapraśnīya or Rājaprasenjit) and Suyagadamga (Sutrakrtanga or Sūcākr tanga) Marxism can hardly be of much help. On the other hand, it is indispensable for evaluating Jain philosophy as well as other philosophical systems of ancient India for periodizing Indian history and many other aspects, of which the object of this volume has given examples herself.

'Freedom of knowledge' signifies also the freedom to choose a methodological device, without danger of being discredited. Such was the case– the relevant quotation can easily be found– of what happened to Walter Ruben because of Friedrich Wilhelm. Ruben has today been restored. Bernard Breloer, Walter Wüst and Erich Frauwallner have quoted him, even though their political and ideological views differ widely from his. Another positive example appears in a study by the Norwegian, Lars-Martin Fosse.[23] Besides the academic value of his book, he deserves special mention because instead of being silent about the views of a well known Nazi, Walter Wüst, about the chronology of the Rigveda, he (Fosse) evaluates them in an objective manner. In this way, Fosse holds above all the unity of learning. However this very matter is today more endangered than ever, through political interests and manipulation. The tolerant outlook of Fosse and Ruben is thus all the more praiseworthy. In the list of positively indicated names, the prominent Indogermanist and Indologue

Bernfried Schlerath (1924-2003) should certainly not be left out. Though he himself held right conservative views, in his debates concerning his subject he always confined himself to factual and scientific arguments, instead of unleashing a politically and ideologically motivated campaign of discrimination against his colleagues. If Indology had followed his example, it would not have entered such a great state of crisis today.

We should certainly remember a particularly striking example of true co-operation among colleagues : the collective work of many specialists concerning the Petersburg Dictionary. Only when the earlier spirit of co-operation fills our hearts, will Indology be able to add a bright future to its glorious past.

Making its future secure is today for Indology a matter of more pressing importance than ever. For while the research work of Indology– a glance at the history of science tells us this– is in a constant state of progress, the obstacles that lie before it are also daunting. It is no longer profitable, to present Indology, solely as a spiritual knowledge. Rather we should stress its complex character : the intermingling of political, literary philosophical and economic historical research, their link with linguistics, geography, popular information and further disciplines. This opportunity should be taken to emphasize one of the most important and proximate task by leaving aside middle Indian languages and literature, we can confine this accursed sketch only to the study of Sanskrit.

At present, people are concentrating on the digitizing of the basic Sanskrit and Vedic texts and this in certainly an useful and indispensable work. However, we must keep in mind the fact that many works of Sanskrit and Vedic literature have not yet been suitably translated. Translation projects that will fulfil the needs of the future should not be confined to literal translations of the texts. Interpretations, parallel texts etc., must be attended to, Even in the case of the Vedas, certain texts have not been translated, or fully so. For example, the Katha-Kapisthala-Samhita, the Taittiriya-Brāhmana,. The Taittirīya Āranyaka and the Hiranyakeri-Srautasutra. Moreover the existing translations are often not sufficient for study and research.

Walter Ruben once wrote correctly; 'We must carry on new work over texts which Indologist have used earlier, ... Yes, we will always re-read the same texts, for each reading will reveal to us new, hitherto unobserved aspects.[24]

In the lexicography, the fact that since 1976 the Sanskrit Dictionary Department of linguistics of the Puna University have brought out an Encyclopedic Dictionary of Sanskrit is a cause for hope. Of course, this assumes that the work will make further progress. The establishment of harmony is important for the sāstras and purānas.

In classical literature, we should compare different efforts of stylistic criticism of texts, in order to gain a deeper understanding of their relative and absolute chronology. The long disputed problem of the genesis of Indian drama should be solved, finally and satisfactorily.

In the history of religion, special investigation as regards sacrificial cults is lacking. The same thing can be said about most *ahinās* and *sattras*. Gaps also exist

views about the sectarian directions within Hinduism, Today the world of ideas of the Tantras remains the subject of obscure discussion and debates. Only after the important texts lie before us in translation is a scientific evaluation of their ideas possible.

In philosophy, basic research into the earlier phases is necessary, in order to clarify the question as to when, exactly, philosophy might be said to start. Can we speak of philosophy at the time of the Rigveda, Atharvaveda or is the term applicable only from the epoch of the Upanishadas? The orthodox still neglects Mimāmsa. The philosophical system of ancient India– not only the daŕsana should be utilized more widely than has so far been the case, in order to help solve present day philosophical problems.

Chronology might be considered the most important issue of future research. No effort should be spared to bring together the numerous essays and articles that have appeared on this subject. Only when the scattered material has been assembled will we be able to distinguish between scientific, completely certain fields of knowledge, areas where we are still dependent on guesswork and where we are completely in the dark.

In the matter of methodology it should be stressed that a large part of the Indological research spectrum is confined to a subjective kind of development. For a more complete understanding, new methods are required. Without the union of geographical, anthropological, archaeological and other methods of work, it would be useless to hope for a detailed picture of the development of social conditions in ancient India. The discovery of methods from the science of music (Sāmaveda), statistics (chronology) and philosophy (rituals) has produced worthwhile results.

The history of knowledge is another area that deserves attention. Analyzing the historical process of a discipline, as well as a balance of ways of attaining knowledge can be useful, while hand in hand with mathematical methods of scientific prognosis.

The Sanskrit scholar should no longer be regarded as 'a silent person, who worships dead gods, in a place far away from the world. 'Rather, the more Indology widens its methodological possibilities, the more it branches out from a more philological knowledge to a complex science, the more it will blossom forth.

However, this dream will be realized, only if we free ourselves in the academic world from the capitalist indoctrination that teacher us to think in terms of competition and follow the principle of freedom of research and selfless co-operation. The object of this volume, who is being honoured (Sukumari Bhattacharji), was and is an example. With my grateful thanks to her, mingles the following wish: [illegible]vam; jiva sāradah sātam.

Notes :

1. Weber, Albrecht : Answer to Herr Hoefer In ; Indian Studies vol II, Berlin and Leipzig, 18[illegible]3.
2. Additional volume, Viennese Periodical for South Asian Studies vol xxv (1981) S. 1[illegible]-143.

3. Since the above article attempts a scientific analysis and in order that the investigation might be carried out in a spirit of objective tradition and co-operation. I have named no living person, in a positive or negative sense. Certain names, of course, appear in the publications that have been mentioned.
4. Göhler, Lars : Sanskrit criticism and Knowledge of ancient India in Leipzig. Special Historical Abstracts in the years 1949 to 1990. In reports of the meetings of the Leibniz Society, volume 48, Notebook 5 (Berlin 2001, S 119-133).
5. Mylius Klaus : Watter Ruben, Vedic Research-and a Few questions of Principle, In : Indian culture Continuity and Discontinuity. In Memory of Walter Ruben (1899-1982) ed. by Joochim Heidrich, Hiltrud Rūstan and Diethelm Weidemann = Proceeds of the Leibniz Society. Vol. (Berlin 2002), S. 46.
6. Göhler a.a.O.S.128.
7. Arno Hecht : The Scientific Elite of East Germany. Hostile Treatment or Integration? (Leipzig 2002).
8. Writings of the Council of Honours of the Saxon Academy of Sciences in Leipzig to the Presidium and the Members of the Philological historical class of 31 May 1994.
9. Göhler, a.a.O.S. 129-130.
10. Abbott, Alirson, Leipzig professor's death stirs bitter feeling. In Nature, vol. 378 (7 December 1995) S. 530.
11. Adolf Hitler at the Congress of the "German Workers Front", Berlin.
12. May 1933, cited by Gūnther, Hans : The Master of his own soul, Reprint (Berlin 1983), S. 49.
13. Sinha, Himmat Singh : Communism and Gita. A philosophico-ethical study (Delhi, 1979).
14. Sinha, a.a.O. S : 250.
15. Sinha a.a.O., S 242-243.
16. Quoted by Holz, Hans-Heinz; Philosophy and Politics (San abbondio 2002), S. 29.
17. Bhatacharji, Sukumari : Fatalism in Ancient India (Calcutta 1995, S. 337).
18. Hecht, a.a.O., S. 82-83.
19. Gray, John; The false promise, Global capitalism and its results.2. Aufl. (Berlin 1999), S. 273.
20. Bhattacharji, a.a.O., P. IV.
21. Bhattacharji, a.a.O., p. XIV-XV.
22. Bhattacharji, a.a.O., S. 135.
23. Fosse, Lars-Martin : the Crux of chronology in Sanskrit literature, Statistics and. Indology, A Study of Method. University 1 Osto = Acta Humaniora Nr. 21 (Oslo 1997)
24. Ruben, Walter : Introduction to Indian Studies (Berlin 1954), S. 9.
25. Lüders, Heinrich; Speech in the Public Meeting of the Proussian Academy of Sciences in Berlin in 29.1.1914.

Translated by : ***Sudeshna Chakraborty***

অতীত অন্বেষণ

ভারত চিন্তার বিকল্প বয়ান

তপোধীর ভট্টাচার্য

কথামুখ

আমাদের পাঠ-অভিজ্ঞতা বলে, দীপ-পরম্পরা অব্যাহত রাখাই উত্তর-প্রজন্মের সবচেয়ে বড়ো দায়। পূর্বজেরা বিপুল মনীষা ও অধ্যবসায় দিয়ে যে নিবাত নিষ্কম্প আলো জ্বেলে গেছেন, আমাদের চারদিকে ঘনায়মান অন্ধকারে তা চিরস্থায়ী পথের দিশারি। বিশ্বাসহীন কেন্দ্রচ্যুত আপসমুখী সাম্প্রতিক পৃথিবীতে ঐ আলোকে অনির্বাণ রাখার প্রতিজ্ঞা করা এবং সেই প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী জীবনকে আলোকাভিমুখী করে তোলা সম্ভবত দুরূহতম এক ব্রত উদ্‌যাপন। কিন্তু সাম্প্রতিক এই কালপর্বে সত্য-প্রগতি-ইতিহাস-ভাবাদর্শ-ঐতিহ্য: সমস্তই যখন মহাসন্দর্ভ বলে উপহসিত ও প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে, বিশ্বাস-আলো-প্রতিজ্ঞার মতো শব্দাবলী কি বিবেচিত হবে অস্মীভূত জগতের বাতিল ও বিস্মৃতিযোগ্য স্মারক হিসেবে? বিশ্বব্যাপ্ত উদ্ধত প্রতাপের সাংস্কৃতিক রাজনীতি অজগর সাপের ঐক্যনীতি হিসেবে জেনে মানুষের পৃথিবী ও চিন্তাবিশ্বকে অটুট রাখার লড়াইতে সামিল হব : এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাদেরই। কোনো তাৎপর্যই সংগ্রাম ছাড়া অর্জনীয় নয়, এই কেন্দ্রীয় বোধ পরিচালিত করুক আমাদের প্রতিবাদে প্রতিরোধে বিকল্প সন্ধানে।

সাধারণভাবে মানবিকী বিদ্যাচর্চায় এবং বিশেষভাবে ভারত-চিন্তার উদ্‌ভাসনে আমরা পাঠ নিই চিরস্থায়ী পথের দিশারিদের কাছে। সুকুমারী ভট্টাচার্য (জন্ম ১২ জুলাই ১৯২১) এঁদের একজন। প্রাতিষ্ঠানিক মনীষার আশ্চর্য প্রতীক তিনি, উত্তর প্রজন্মের কাছে অক্ষয় প্রেরণা। অসামান্য বিদ্যাবত্তাই তার অভিজ্ঞান নয় কেবল, আপসহীন যুক্তিবাদী মনের অধিকারী হিসেবে তিনি বরেণ্য। ঋজু ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়ে হেলায় তুচ্ছ করে চলেছেন কঠিন পীড়াকেও। একটাই যখন জীবন আমাদের, দুর্লভ এই মানব-জন্মকে কাজ ও চিন্তার সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে তাৎপর্যবহ করে তুলতে হবে উত্তর প্রজন্মের কাছে— এই তার মুখ্য বার্তা। মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার অন্ধতা যখন ভারতীয় উপমহাদেশে ক্রমবর্ধমান, তিনি অচঞ্চল দীপশিখার মতো উপস্থিত আমাদের মধ্যে, অন্ধকারের মূঢ়তাকে প্রতিহত করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে। ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় রচিত তাঁর রচনা সম্ভার ইতিমধ্যে প্রতীকী আলোকস্তম্ভে রূপান্তরিত হয়েছে। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য :'The Indian Theogony' (১৯৭০) মৃচ্ছকটিকের বঙ্গানুবাদ (১৯৭৩) 'Literature in the Vedic Age' (২ খণ্ড : ১৯৮৪, ১৯৮৬) 'প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য' (১৯৮৮) ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৯১) 'ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য' (১৯৯১) Buddhist hybrid sanskrit literature', (১৯৯২) 'Classical sanskrit literature' (১৯৯৩) 'Women and Society in Ancient India' (১৯৯৪), 'নিয়তিবাদ : উদ্ভব ও ক্রম বিকাশ' (১৯৯৪) 'Fatalism in Ancient India', (১৯৯৫) 'Legends of Devi' (১৯৯৫) 'বিবাহ প্রসঙ্গে (১৯৯৬) 'বেদের যুগে ক্ষুধা ও খাদ্য (১৯৯৮) 'বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য' (২০০০) In those day (২০০১) ইত্যাদি।

এই বইগুলিতে নিছক বিদ্যাচর্চার জন্যেই বিদ্যাচর্চা কবা হয়নি। বরং বিভিন্ন বয়ান ও আনুষাঙ্গিক চিন্তা-প্রসূত পাঠ মন্থন করে ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রখর বস্তুবাদী ভাষ্য উপস্থাপিত করা হয়েছে। ইতিহাস-নৃতত্ত্ব-সমাজতত্ত্ব তুলনামূলক প্রত্নকথা ও ধর্মতত্ত্বের নিবিড় অধ্যয়নলব্ধ সংশ্লেষণী চিন্তার সাহায্যে ভারতীয় সাহিত্যকৃতির নতুন স্থাপত্য নির্মাণ করেছেন সুকুমারী। Text বার বার নতুন হয়ে ওঠে context এর সঙ্গে দ্বিরালাপে : এই সত্য তার প্রতিটি বয়ানে প্রমাণিত হয়েছে। স্বভাবত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কৃতি অনুশীলনের চিন্তায় কোনও প্রচলিত সীমান্তে তাঁর বিশ্বাস নেই। এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে ভারতচিন্তার প্রাতিষ্ঠানিক অচলায়তনে বয়ে গেছে অপ্রাতিষ্ঠানিক সুবাতাস। সুকুমারী ক্লান্তিহীনভাবে দেখিয়েছেন, যুগে যুগে আধিপত্যবাদী শক্তির স্বার্থ রক্ষার জন্যে সরকারি মতাদর্শের অনুকূল সত্য উৎপাদিত ও প্রচারিত হয়েছে। তৃণমূলস্তরে যারা বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেই অন্তেবাসীবর্গের বেসরকারি মতাদর্শ-প্রসূত জীবন-ঘনিষ্ঠ উচ্চারণ অবদমিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, কর্তৃত্ববাদী শক্তি সীমাহীন দম্ভে প্রান্তিকায়িত মানুষের সম্ভাব্য উচ্চারণকে নিজেরাই বানিয়ে নেয় এবং প্রচার-ব্যবস্থার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের সুবাদে সেইসব মিথ্যা স্বরন্যাসকে 'বাস্তব' বলে প্রতিষ্ঠাও দেয়। বহুযুগ ধরে পুঞ্জীভূত ছদ্মসত্যের প্রতারক ইমারত তবু যে যুক্তিগ্রাহ্য অন্তরীক্ষণের আলো সইতে না-পেরে বুদ্বুদের মতো ফেটে যায়, সুকুমারীর বইগুলোতে তার অজস্র অভ্রান্ত প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে সংস্কৃত মানে দেবভাষা, শিষ্টদানেব ভাষা, ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের ভাষা, এইসব ধাবণা বিনা প্রশ্নে গৃহীত হওয়াতে হিন্দু-পুনরুত্থানবাদের সবচেয়ে জোরালো হাতিয়ার হিসেবে তার দুষ্প্রয়োগ এড়ানো যায়নি। সাধারণভাবে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যচর্চার ভুবনে যারা জমায়েত হয়, এবা ক্ষুবধাব মননের বাহন হিসেবে সংস্কৃতকে গ্রহণ করে না। অজস্র কুসংস্কারের সহস্র শৈবালদামে বাঁধা স্থবির অচলায়তনকে ওরা সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে একাকার করে ফেলে। স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে ধাপে ধাপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় মৌলবাদী চিন্তার সর্বগ্রাসী প্রবণতা। এই ধারার বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে হিব্রু গ্রিক লাতিন প্রভৃতি প্রাচীন ভাষা ও সেইসব ভাষা বাহিত ধ্রুপদী সাহিত্য সংস্কৃতির অনেকান্তিক আলোচনা যেভাবে আন্তর্জাতিক বিদ্যাচর্চায় দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত, তেমনই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য বিশ্লেষণ করে ধ্রুপদী-শিল্পভাবনার সঙ্গে-সঙ্গে আবহমান জীবন ও চলমান মানুষের পুনরাবিষ্কার নিশ্চয় করা সম্ভব। অন্তত সুকুমারী ভট্টাচার্যের অমূল্য বইগুলি পড়তে পড়তে ভারতচিন্তার এই তাৎপর্যই তো স্পষ্ট হয় আমাদের কাছে।

তার মানে সংস্কৃত ভাষায় রচিত সাহিত্য দর্শন সহ অন্যান্য প্রতিবেদনকে কিছুতেই ধর্মান্ধ মৌলবাদী শক্তির ইজারাদারির কাছে সমর্পণ করা চলে না। তবে সেইজন্যে বস্তুবাদী ভাষ্যকারদের মতাদর্শগত ভিত্তি অত্যন্ত শক্ত হওয়া চাই। সুকুমারী প্রায়ই, ব্যক্তিগত আলাপচারিতায়ও যে 'স্থূনা নিখাত ন্যায়'-এর কথা বলে থাকেন, সেই জোরালো যুক্তি-গ্রাহ্য ও বহুস্তর-বিন্যস্ত অবস্থান নেওয়া আবশ্যিক। না-লিখলেও চলে, সুদীর্ঘ ও নিরবচ্ছিন্ন, প্রণালীবদ্ধ ও লক্ষ্যাভিমুখী অধ্যবসায় আর সংশ্লেষণের জন্যে প্রস্তুত মন ছাড়া তা অসম্ভব। সুকুমারী যে এই দুরূহ কাজেও চমকপ্রদ সাফল্য অর্জন করেছেন, এর কারণ, তাঁর গ্রহিষ্ণু মনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মণীষা সার্থকভাবে সমন্বিত হয়েছে। আর, তিনি সর্বদা মনে রেখেছেন যে নিছক বিদ্যাচর্চার জন্যে বিদ্যাচর্চা হয় না, হতে পারে না। আধিপত্যবাদী বর্গের প্রতাপকে সর্বত্রগামী করে তোলার জন্যে বর্গ-বর্ণ-লিঙ্গ বিভাজিত সমাজে সাংস্কৃতিক রাজনীতির যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জাল শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করাই সত্যনিষ্ঠ গবেষকের প্রধানতম কর্তব্য। তবে সেখানেই তাঁর দায় ফুরিয়ে যায় না। পাশাপাশি তিনি উন্মোচন করেন অবদমিত বর্গের বিকল্প বাস্তব আর বিকল্প বয়ান যাকে প্রতাপের অজস্র কৃৎকৌশল প্রয়োগ করেও মুছে ফেলা যায়নি।

উচ্চবর্গীয়দের নৈতিকতা ও মূল্যবোধের পোষকতা করতে গিয়ে সাধারণভাবে ভারতচিন্তা এবং বিশেষভাবে সংস্কৃতবিদ্যাচর্চা যে জীবন্ত মানুষের স্পন্দনময় জগৎকে উপেক্ষা করেছে, সুকুমারী ভট্টাচার্য নিজের গবেষণায় তা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। যারা নিম্নবর্গীয় দলিত এবং নারী তাদের নিরুচ্চার ও অবদমিত কণ্ঠস্বর তিনি শুধু আবিষ্কারই করেননি, শাণিত যুক্তি দিয়ে তাদের অস্তিত্বিক ও বৌদ্ধিক সম্ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। প্রধানত এই অবদানের জন্যেই তিনি অনন্যা এবং উত্তর-প্রজন্মের গবেষকদের কাছে পথের দিশারি। তাঁর সারস্বত সাধনা প্রকৃতপক্ষে সামাজিক সাধনা কেননা তাঁর প্রধান অন্বিষ্ট সেই দৃষ্টির উদ্ভাসন যা স্বভাবে আদ্যন্ত সামাজিক। আর, এই সূত্রে তিনি বিবর্তনশীল সমাজ-বীক্ষাকেও বুঝে নিতে চেয়েছেন সর্ব-মানবিক পরিসরের প্রেক্ষিতে। মন্থন করেছেন মানবিকী বিদ্যার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা। উত্তর প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন এই জরুরি বার্তা যে পাঠ সম্পূর্ণ হয় না কখনও, শুধু শাখা থেকে প্রশাখায় ছড়িয়ে যায় মাত্র। ১৯৭৯ সালে একটি চিঠিতে তিনি এই নিবন্ধকারকে লিখেছিলেন : 'ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজতত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যকে দেখতে পেলে তবেই তাকে পূর্ণাবয়ব রূপে দেখা যায়। পাশ্চাত্য সাহিত্যের বর্তমান সার্থক সমালোচনার ধারাটি এইগুলি অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে। শিল্পেই শিল্পের পরিণতি নয়, মানুষের নিকষ পাথরে তার শেষতম নিরীক্ষণ। এই কারণে মানুষের আত্মপ্রকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাহিত্যকে রেখে বিচার করলে সে-বিচার সমৃদ্ধতর হয়। সংস্কৃতির ইতিহাসকে পূর্ণাঙ্গভাবে জানা তাই একান্ত প্রয়োজন।' এই পূর্ণাঙ্গ ভাবে জানা যে কতদূর ব্যাপ্ত, তা তাঁর লিখন-বিশ্ব পরিক্রমা করলে স্পষ্ট বুঝতে পারি। আসলে ধ্রুপদী বিশ্বসাহিত্যের পরিশীলনে ঋদ্ধ বলেই তিনি বিশ্বাস করেন খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের কালজয়ী লাতিন কবি টেরেন্সের এই উচ্চারণ : 'Homo sum, humani nil a me alienum puto' অর্থাৎ মানুষ আমি, মানুষের পৃথিবীতে কোনও কিছুই আমার পক্ষে দূর নয়। এই উদ্ভাসনী দৃষ্টি মুখ্য প্রেরণা বলে তাঁর ভারত-অধ্যয়নও হয়ে উঠেছে মূলত মানুষের উৎসার, মানুষের প্রতিষ্ঠার আয়োজন।

এক

আজ থেকে ঠিক চৌত্রিশ বছর আগে প্রকাশিত 'The Indian Theogony' সুকুমারী ভট্টাচার্যকে এনে দিয়েছে বিপুল পরিচিতি ও বিশ্বব্যাপ্ত খ্যাতি। ভারতীয় দেবসংঘকে কেন্দ্র করে যে আকর্ষণীয় প্রত্নকথার ভাণ্ডার বৈদিক থেকে পৌরাণিক যুগে বিবর্তিত হয়েছে— এর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেশবিদেশের বিভিন্ন বিদ্যাপ্রস্থানে স্বচ্ছন্দ পরিক্রমা করেছেন তিনি। এই বই লেখার জন্যে দশ বছরের নিরবচ্ছিন্ন অধ্যবসায় ছিল তাঁর। উত্তর-প্রজন্মের গবেষকেরা এই সুদীর্ঘ প্রস্তুতি থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংকেত পেতে পারেন। তবে সবচেয়ে জরুরি কথা তো এই যে বিদ্যাচর্চার পক্ষে আবশ্যিক হলো 'ধৈর্য, নিষ্ঠা, একমুখিনতা ও ধারাবাহিক পরিশ্রম'। 'The Indian Theogony'-র মূল বয়ানে প্রবেশ করার আগে ২০ পৃষ্ঠা ব্যাপী ভূমিকাও পড়ে নিতে হয় আমাদের। পড়ে নিতে হয় এই কেন্দ্রীয় উপলব্ধি গড়ে তোলার জন্যে : উদ্দিষ্ট সত্যে পৌঁছাতে হলে বহু শাখাপথ ধরে এগিয়ে যেতে হয়। যেমন এই বই লেখার জন্যে লেখিকাকে নিরলস ও প্রণালীবদ্ধভাবে বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যের প্রধান গ্রন্থগুলি পড়ে নিতে হয়েছে এবং সেই পাঠ-অভিজ্ঞতার নির্যাস সূত্রাকারে লেখার নেপথ্য-ভূমিতে বিন্যস্তও করতে হয়েছে। মনে রাখা প্রয়োজন, কম্পিউটার যুগের সূত্রপাত হয়নি তখন। তাই তাঁকে মূলত নির্ভর করতে হয়েছে ধারাবাহিক অধ্যবসায়, মনন ও মেধাবী বিচ্ছুরণের উপরে।

ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ববাদের কেন্দ্রীয় প্রত্যয়কে সুকুমারী সার্থক ও সৃষ্টিশীলভাবে বহুদূর অবধি প্রসারিত করেছেন। যেহেতু তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ মাত্রেই প্রেক্ষিতের অকুণ্ঠ সমর্থন দাবি করে, তিনি ভারতীয় প্রত্নকথা

তত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্বের বিশ্লেষণকে সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের ব্যাপকতর পরিধিতে স্থাপন করেছেন। তাঁর জিজ্ঞাসা সঞ্চালিত হয়েছে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিদ্বৎবর্গের দ্বারা উদ্ভাসিত মানবিকী বিদ্যার বিচিত্র পরিমণ্ডলে। এভাবে ভারত-চিন্তাকে তিনি ঔপনিবেশিক মননচর্চার যুক্তিশৃঙ্খল থেকে মুক্ত করেছেন। প্রাগুক্ত ভূমিকায় তিনি যেসব বিশ্বখ্যাত পূর্বসূরিদের পথ প্রদর্শক গবেষণার উল্লেখ করেছেন, তাতে অন্তত এটা স্পষ্ট যে সংস্কৃত-চর্চার নামে কূপমণ্ডুকতার কোনও অবকাশ আর নেই। তিনি ভারতীয় প্রত্নকথা-ধর্মতত্ত্ব-সংস্কৃতি চর্যা-সাহিত্য কৃতিকে পর্যবেক্ষণ করেছেন মানববিশ্বের বিপুল পটভূমি থেকে। এই নিরিখে সুকুমারীকে বলা যায় রবীন্দ্রনাথ-সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ঘরানার চিন্তাবিদ। অকুণ্ঠভাবে প্রতীচ্যের বিচিত্র ও আশ্চর্য সমৃদ্ধ চিন্তা-প্রস্থানের দ্যোতনা আত্তীকরণ করেও তিনি তথাকথিত প্রাচ্যতত্ত্বের ঔপনিবেশিক প্রকল্প সম্পর্কে সতর্ক ছিলেন। ভারত-চিন্তার বিকল্প বয়ান সন্ধান এই নিরিখে বিশেষ প্রাসঙ্গিক।

সদ্যপ্রয়াত বিশ্ববিশ্রুত চিন্তাবিদ এডোয়ার্ড সাঈদ তাঁর 'Orientalism' বইতে ঔপনিবেশিক প্রতীচ্যের স্বাভাবিক ও অপরিবর্তনীয় 'অপর' হিসেবে প্রাচ্য ও প্রাচ্যতত্ত্বের নির্মাণকে জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি যথার্থই লক্ষ করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদী সাংস্কৃতিক রাজনীতির কৃৎকৌশল। তাঁর কিছু কিছু মন্তব্য সুকুমারী ভট্টাচার্যের মতো বস্তুবাদী গবেষকদের নিঃসন্দেহে নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করেছে। যাকে সাঈদ 'European representation of the orient' (১৯৯৫:১) বলেছেন, তার বিরুদ্ধেই দাঁড়াতে চেয়েছেন সুকুমারী। মানুষের চিন্তাবিত্তে আমাদের অধিকার স্বতঃসিদ্ধ, এইজন্যে প্রতীচ্যের প্রখর আলোক-দীপ্তি সম্পর্কে আমরা নিস্পৃহ থাকতে পারি না। কিন্তু সেই উদ্ভাসনকে ব্যবহার করতে হয় নিজস্ব পৃথিবীর অন্তর্গূঢ় পুনরাবিষ্কারের প্রয়োজনে। ভারতীয় সাহিত্য-দর্শন, সংস্কৃতি, সভ্যতা নিশ্চয় অনন্য; তবে মানববিশ্বের প্রেক্ষাপটে এবং নানাধরনের বিচারপ্রণালীর মানদণ্ডে যখন এই অনন্যতার পরিমাপ করি, বিদ্যাচর্চার তাৎপর্য আমূল পাল্টে যায়। যুক্তিহীন শ্রদ্ধা ও প্রশস্তি নয়, প্রাজ্ঞ বিচারবোধের কষ্টিপাথরে যাচাই না করলে প্রকৃত বিদ্যার প্রতিষ্ঠা হয় না। না-লিখলেও চলে, সুকুমারী এই ধারার মূর্ত প্রতীক। একটু আগে যে 'Representation' বা উপস্থাপনার সাংস্কৃতিক রাজনীতির কথা লিখেছি, তিনি যেন একাধারে তারই খাঁটি ভারতীয় ও সর্বমানবিক সংরূপ নির্মাণ করেছেন। ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি-নীতি অনুযায়ী ইউরোপ আমাদের যেভাবে দেখতে চায়, সেই প্রাচ্যতত্ত্বকে তিনি বিপুল মণীষা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

উনিশ শতকে ব্রিটিশ উপনিবেশ দৃঢ়ভাবে পত্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আধিপত্যবাদী শাসকের স্বার্থে ভারতীয় ঐতিহ্য অধ্যয়নের একটি বিশেষ ঘরানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। ইউরোপের অন্যান্য উপনিবেশগুলিতে যেমন ঘটেছিল, ভারতীয় ভাষা-সভ্যতা সংস্কৃতি চর্চায় প্রতীচ্যের বিদ্বানদের অভূতপূর্ব অবদান সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত অবধারিতভাবে প্রবল হয়ে উঠেছিল 'one of its deepest and most recurring images of the other' (তদেব)। ধীরে ধীরে ঔপনিবেশিক প্রাচ্যতত্ত্বের বিধি অনুযায়ী ভারত-চিন্তার যেসব প্রতিবেদন রচিত হলো, তাতে ঐতিহ্যের প্রতি মর্যাদাবোধের ছদ্মবেশে নির্বিচারে অতীতের প্রতি অন্ধ আনুগত্য ও প্রতিক্রিয়াশীল প্রবণতা প্রশ্রয় পেতে লাগল। এর সুদূর-প্রসারী নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকার জন্যে অপরিহার্য ছিল একদিকে ঐতিহাসিক বস্তুবাদে দীক্ষিত হওয়া এবং অন্যদিকে প্রতীচ্যের বিচিত্র মানবিকী বিদ্যার আলোয় উদ্ভাসিত হওয়া। কিংবা এর চেয়েও বেশি কিছু অধীত ও অনুভূত বিদ্যার সার্থক প্রয়োগ। আর, ঠিক এখানেই সুকুমারী ভট্টাচার্য অদ্বিতীয়। তিনি ঔপনিবেশিক প্রাচ্যতত্ত্বকে মনে রেখেছিলেন 'as a Western style for dominating, restructuring and having authority over the orient .... without examining

orientalism as a discourse one cannot possibly understand the enormously systematic discipline by which European culture was able to manage and even produce the orient politically, sociologically, Militarily, ideologically scientifically and imaginatively during the post-enlightenment period.' (তদেব : ৩)।

কোনো সন্দেহ নেই যে এই উপলব্ধিকে বিদ্যাচর্চার প্রধান সঞ্চালক হিসেবে গ্রহণ করে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি-দর্শন সাহিত্যের নিবিড় পাঠে তার সৃজনশীল প্রয়োগ খুব দুরূহ। কিন্তু সুকুমারী তা ধারাবাহিকভাবে করে যেতে সমর্থ হয়েছেন। বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিকোণের গুরুত্ব ভারত চিন্তার ক্ষেত্রে কতখানি, তাঁর প্রথম বই 'The Indian Theogony'-তে খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। পরীক্ষা ও পুনঃপরীক্ষার মধ্য দিয়ে পৌঁছাতে হবে ঈপ্সিত সত্যে, বলা ভালো সামাজিক সত্যে— তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে তিনি ক্লান্তিহীন চর্চার পক্ষপাতী। এ প্রসঙ্গে মানবিকী বিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাদের অবদান অনস্বীকার্য, তাদেরও পরিগ্রহণ করতে হবে নিরবচ্ছিন্ন পুনর্বিবেচনার মধ্য দিয়ে— তা তিনি সুলিখিত ভূমিকাতেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন। প্রাচীন প্রতিবেদনগুলি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই প্রাথমিক সত্য কিছুতেই ভোলা চলে না যে প্রাচীন ভারতেও 'mythological thinking existed side by side with rational thinking' (১৯৮৮:২)। এধরনের বিশ্লেষণে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট বিষয়ের ঘেরাটোপে চিন্তাকে রুদ্ধ রাখলে চলে না। নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, প্রত্নতাত্ত্বিক, গবেষণায় সাম্প্রতিক কালে কী কী নতুন প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, সে-বিষয়েও অবহিত থাকতে হয়। কেননা এইসব গবেষণা আমাদের কাছে পৌঁছে দেয় 'The requisite amount of data for the material infrastructure which threw up the mythological superstructure of ancient India.' (তদেব)।

দুই

অত্যন্ত পরিতাপের কথা, সুকুমারীর প্রজ্ঞাদীপ্ত সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও সাধারণভাবে ভারততত্ত্ব এবং বিশেষভাবে সংস্কৃত চর্চা মৌলবাদী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির দখলে রয়ে গেছে। এরা মানবিকী বিদ্যার বিভিন্ন চিন্তা-প্রস্থানে ঘটমান পুনরাবিষ্কার ও পুনরুদ্ভাসন থেকে কিছুমাত্র পাঠ নেয় না; 'অন্ধেনৈব নীয়মান যথান্ধাঃ' কুসংস্কার ও বিচারমূঢ়তার অচলায়তনে সামিল হয়। আর অচলায়তনের প্রাচীরগুলিকে অক্ষত রাখার জন্যে রূপান্তরশীল সময়কে প্রাণপণে অস্বীকার করে। এইসব পশ্চাৎপর ও বিদ্যাচর্চা বিরোধী শক্তিকে উপেক্ষা করতে হয় যেমন, তেমনই সতর্ক থাকতে হয় অধ্যয়ন প্রক্রিয়ার ভেতরকার কিছু কিছু শিথিলতা এবং অন্ধবিন্দু সম্পর্কেও। সুকুমারী সংকেত দিয়েছেন যে আমাদের ব্যবহার করতে হবে, 'The findings of all the allied and relevant disciplines in the field of mythology, avoiding the extremes of philological, historical, metaphysical and symbolic schools on the one hand and the unimaginative and comparatively barren approaches of many of the social anthropologist on the other,' (তদেব)। পর্যায়ে পর্যায়ে বৈদিক ও পৌরাণিক সংস্কৃতি কীভাবে বিকাশিত হয়েছে, একমাত্র এই সংশ্লেষণী বিচারধারার সাহায্যেই বুঝে নেওয়া সম্ভব।

তার মানে, সংস্কৃত চর্চা মুখ্যত বিশ্ববিদ্যার শরিক, যদিও এই দৃষ্টিভঙ্গি এখনও প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ্যক্রম সঞ্চালকদের মধ্যে সর্বতোগ্রাহ্য নয়। বিভিন্ন চিন্তাপ্রস্থানের আন্তঃসম্পর্ক পুনর্বিচার করতে করতে কীভাবে ভারত চিন্তা বহুধাবিকশিত হতে পারে, সুকুমারী দেখিয়েছেন। প্রাক্-আর্য, আর্য, অনার্য জাতিগোষ্ঠীর অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির নিরন্তর সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে অনবরত রূপান্তরিত সাহিত্য-দর্শন-আধিবিদ্যা-প্রত্নকথার কোনো প্রকৃত বস্তুনিষ্ঠ গবেষকই কেবল লক্ষ করেন 'projec-

tions of vital experiences of a people,' (তদেব)। আরও খুঁজে পান কেন্দ্রাভিমুখী ও অন্তেবাসী অস্তিত্বের কখনও প্রকাশ্য কখনও প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্ব এবং অবদমিত বেসরকারি মতাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত প্রতিবাদের বাচন। ইতিহাস নির্ধারণ করে দেয় ওই বাচন কতটা বিকল্প সন্দর্ভের প্রস্তাবক হতে পারে এবং কেনই বা পর্যায়ে-পর্যায়ে তাৎপর্য ও তাৎপর্যহীনতার প্রতীতি বদলে যায়। অজস্র শাখা-প্রশাখায় বিন্যস্ত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের প্রেক্ষাপটে যখন মাতৃতন্ত্র থেকে পিতৃতন্ত্রে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির বিবর্তন পর্যবেক্ষণ করি, প্রাগুক্ত প্রতীতিই বড় হয়ে ওঠে। 'The Indian Theogony'-এর মেধাদীপ্ত প্রতিবেদনের যৌক্তিক পরম্পরায় অজস্র অনুপুঙ্খ ও অনুষঙ্গের উপস্থাপনা তাই পঁয়ত্রিশ বছর পরেও পাঠককে মুগ্ধ করে। আর, বলা ভালো, ভারত-চিন্তার নতুন প্রকল্প গ্রহণে ও প্রায়োগিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে হয়ে ওঠে বিশ্বস্ত পথ-নির্দেশক।

বস্তুত নিবিড় পাঠের এই বস্তুনিষ্ঠ কেন্দ্রীয় প্রবণতা সুকুমারীর পরবর্তী প্রতিবেদনগুলিতে আরও প্রসারিত হয়েছে। তাঁর যুক্তি-বিন্যাস ও সিদ্ধান্তগুলি হয়েছে আরও শাণিত, অনুষঙ্গ-সন্ধানী ও বহুদ্যোতক। সাঈদের মতো তিনিও নিরন্তর বৌদ্ধিক ও ভাবাদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন 'cultural stereotypes, political imperialism, dehumanising ideology' (১৯৯৫ : ২৭) এর বিরুদ্ধে। সুকুমারীর প্রত্যয়দীপ্ত ঘোষণাও যেন মিশে গেছে সাঈদের উচ্চারণে 'The nexus of knowledge and power creating 'the oriental' and in a sense obliterating him as a human being is therefore not for me an exclusively academic matter. Yet it is an intellectual matter of same very obvious importance.' (তদেব)। দু'খণ্ডে রচিত 'literature in the Vedic Age' এবং এর সংক্ষেপিত অনুবাদ 'ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য' পড়তে পড়তে বুঝে নিই লেখিকা সুগভীর প্রজ্ঞা ও অধ্যবসায় দিয়ে সাংস্কৃতিক কর্তৃত্ববাদী রাজনীতির মোকাবিলা করেছেন। বৈদিক আর্যদের বিশ্ববীক্ষাকে কোনও আরোপিত মহত্ত্ব বা রহস্যের নিরিখে আলোচনা করার বদলে তিনি তাকে গ্রহণ করেছিলেন গ্রিক ও লাতিনের মতো পৃথিবীর অন্য প্রাচীন ভাষা ব্যবহারকারীদের মতো। ফলে সুকুমারীর আগে এবং পরে যারা বৈদিক আর্যদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়া-কলাপকে চূড়ান্ত অবৈজ্ঞানিকভাবে ব্যাখ্যা করে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে কাজে লাগিয়েছে এবং ভারতীয় সমাজের প্রগতির অভিমুখ্যকে বিধ্বস্ত করতে চেয়েছে— তার বইপত্র হয়ে উঠেছে সেইসব অন্ধলিপির প্রতিষেধক। এখানে আরও একটি কথা বলে নিতে চাই। Classic বা ধ্রুপদী সাহিত্য পাঠ মানে পুনঃপাঠ, এই উপলব্ধির শরিক হয়েও সুকুমারীর বিশ্লেষণ পুনঃপাঠের পরিধি ও তাৎপর্যকে বহুদূর অবধি প্রসারিত করেছে। এলিয়ট কারমোড ও ক্যালভিনোর মতো লিখিয়ে ও তত্ত্ববিদেরা ধ্রুপদী রচনা অধ্যয়নের যেসব দিক-নির্দেশ করেছেন, সুকুমারী তাদের প্রতিতুলনায় ভিন্ন পথগামী। দৃষ্টান্ত হিসেবে যদি ইতালো ক্যালভিনোর— 'Why read the classics'?' নামক প্রবন্ধের নির্যাস অনুসরণ করি, দেখব, সুকুমারীর বিশিষ্ট বৌদ্ধিক ও ভাবাদর্শগত প্রশিক্ষণ ও অবস্থানই তাঁকে ক্যালভিনোর ভাবনা-বিশ্ব থেকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছে।

প্রাগুক্ত নিবন্ধে ক্যালভিনো লিখেছেন : 'The person who derives maximum benefit from a reading of the classic is the one who skilfully alternates classic readings with calibrated doses of contemporary material : And this does not necessarily presuppose some one with a harmonious inner calm : it could also be the result of an impatient nervy temperament, of someone constantly irritated and dissatisfied. Perhaps the ideal would be to hear the present as a noise outside our window, warning us of the traffic jams and weather changes outside. while we continue to

follow the discourse of the classics which resounds clearly and articulately inside our room.' (১৯৯৯ : ৮)

ক্যালভিনো যে-দৃষ্টিতে ধ্রুপদী রচনাকে গ্রহণ করেন, সুকুমারীর পক্ষে সেভাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। বর্তমান যত খণ্ডিত ও অসমঞ্জস হোক না কেন, তাকে শুধুমাত্র কর্কশ কোলাহল বলে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। অন্যদিকে এমনও নয় যে প্রাচীন ভারতের ধ্রুপদী প্রতিবেদন শুধু নিঃসময়ের কুহেলিতে ভেসে বেড়ায়। আসলে সুকুমারীর বিশ্ববীক্ষা সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক বয়ানের বস্তুবাদী পাঠের তাগিদ এবং আধিপত্যবাদী বর্গের স্বার্থ-বুদ্ধি প্রণোদিত ভ্রান্তপাঠ নিরাকরণের সংগ্রাম যতক্ষণ উপলব্ধি না করছি, তাঁর ধ্রুপদী পাঠকৃতি সংক্রান্ত উপলব্ধি আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে না। প্রাচীন ভারতকে অযৌক্তিকভাবে মহিমান্বিত না-করেও সেই সময়কার ধ্রুপদী মনন-ঋদ্ধ ও সৃষ্টিশীল পাঠকৃতিগুলির মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আকর্ষণীয় উপাদান খুঁজে পাওয়া সম্ভব। শুধু মনে রাখতে হয় এই গোড়ার কথাটুকু যে স্পর্শভীরু নান্দনিক বিশ্লেষণে সত্যের পূর্ণাঙ্গ স্ফুরণ হয় না। সমাজতাত্ত্বিক-ঐতিহাসিক-নৃতাত্ত্বিক দার্শনিক প্রসঙ্গ ও অনুষঙ্গ কীভাবে নান্দনিক প্রতীতির উদ্ভব বিকাশ ও পরিণতি সম্ভব করে তোলে, তার নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ দিয়ে আমরা প্রাচীন ভারতের যথার্থ পরিচয় পেতে পারি।

তিন

দুর্বুদ্ধি-প্রণোদিত অপপ্রচার দিয়ে যারা ভারততত্ত্বকে কুসংস্কার যুক্তিহীনতা ও মৌলবাদী অন্ধতার প্রস্রবণ হিসেবে প্রতিপন্ন করতে চাইছে, সুকুমারীর ভারতচিন্তা যেন শাণিত খড়্গের মতো সেই সংঘবদ্ধ আঁধার মহিষকে প্রতিনিয়ত ছিন্ন-ভিন্ন করছে। তবু তাঁব ধারাবাহিক প্রয়াস সত্ত্বেও ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাস চর্চাকে চোরাবালিতে ডুবিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা কমছে না। এই নিবন্ধ যখন লিখছি, ঠিক তখনই বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর যুক্তিহীন, ইতিহাস-বিরোধী বক্তব্য প্রচারিত হয়েছে। এদেশের মুক্তমতি পণ্ডিতদের মতে সুকমারী ভট্টাচার্যও বাববার অকাট্য তথ্য-নির্ভর বয়ান পেশ করেছেন।

'প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য' 'বেদের যুগে ক্ষুধা ও খাদ্য', 'Literature in the vedic age' ইত্যাদি বইতে সুকুমারীও প্রমাণ করেছেন যে আগন্তুক আর্যরা ভারতবর্ষে প্রাগার্য জনগোষ্ঠীকে পরাস্ত করে বিন্ধ্যের উত্তর দিকে আর্যাবর্ত অধিকার করেছিলেন। তাঁর সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত হলো : 'আর্যরা যখন ভারতবর্ষে আসে খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ শতকের দিকে, তখন তারা যাযাবর পশুচারী কৌমবদ্ধ একটি জনগোষ্ঠী : একটিই সম্প্রদায় বলা যায়। তাদের জীবন-যাপন পদ্ধতি মূলত এক ছিল, ধর্মাচরণও ছিল যজ্ঞ-নির্ভর, যে-যজ্ঞে সমগ্র গোষ্ঠী মুখ্য বা গৌণভূমিকায় অংশগ্রহণ করত। এদের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ ঘটে প্রাগার্য অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়দের, যাদের জীবন-যাত্রা প্রণালী ছিল ভিন্ন ধরনের এবং যাদের ধর্ম-বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানও সম্ভবত পৃথক ছিল। এদের ওপরে আর্যদের প্রথম প্রভাব ছিল ধর্মীয়, অর্থনীতিক ও সাংস্কৃতিক তিন ক্ষেত্রেই কিছু কিছু চিহ্ন রেখে গেছে এ সংযোগ। যজুর্বেদে যে-ধর্ম, তার মধ্যে বেশ কিছু আগন্তুক উপাদান দেখা যায় যার উৎস প্রাগার্য ধর্মে, একথা মনে করলে ভুল হবে না। আর্যদের পশুচর্যার সঙ্গে মিলল প্রাগার্য কৃষিকাজ, যা আর্যরা শিখে নিল কিছুকালের মধ্যেই। সাংস্কৃতিক প্রভাবের কাল দীর্ঘায়ত, খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকের কাছাকাছি, যখন প্রথম লেখার পরিচয় পাই শিলালেখে, তখন দেখি ইন্দো-আর্য ভাষার ওপরে প্রাগার্য কথ্য ভাষার প্রভাব বাক্য বিন্যাসে, শব্দগঠনে এবং কিছু কিছু তদ্ভব শব্দের সন্নিবেশে।' (হিন্দু সাম্প্রদায়িক : ১৯৯৭ : ২৯)

অর্থাৎ গবেষণালব্ধ ও বহুধা পরীক্ষিত সত্য এই যে আর্যরা ভারতের ভূমিপুত্র নয়, তারা আগন্তুক। দ্বিতীয়ত আর্যদের রক্তের বিশুদ্ধতা নিয়ে স্পর্শকাতর হওয়ার প্রয়োজন নেই। কেননা বহু শতাব্দী ধরে

বিভিন্ন জনগোষ্ঠির অবাধ ও ধারাবাহিক মিশ্রণের ফলে আজকের ভারতীয়দের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। তৃতীয়ত ধর্ম বা সংস্কৃতি মানুষই নির্মাণ করে নিজের প্রয়োজনে, এতে কোনও কল্পিত ঈশ্বরের কিছুমাত্র ভূমিকা নেই। আর, ধর্মচিন্তায় বহু উৎসজাত উপাদানের সংশ্লেষণ অনিবার্য ঐতিহাসিক সত্য। চতুর্থত সংস্কৃত ভাষাও ঈশ্বরের সৃষ্টি নয়; বিভিন্ন পর্যায়ে ইতিহাস নির্ধারিত ভাষাতাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এর উদ্ভব হয়েছে। এইসব প্রাথমিক কথা যে এই ২০০৪ সালেও পুনরুক্তি করতে হচ্ছে, এর কারণ, বিজ্ঞান-বিরোধী, ইতিহাস-বিরোধী মৌলবাদী অপশক্তির সংঘবদ্ধ চক্রান্তে ভারতবর্ষের ইতিহাস সর্বনাশের অতলস্পর্শী খাদের কাছে এসে পৌছেছিল। মেকি ভারততত্ত্ব যাতে প্রাতিষ্ঠানিক মদতে তার নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া বেশিদূর প্রসারিত করতে না পারে, এইজন্যই সুকুমারীর প্রতিবেদনগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। এই মুহূর্তে ভারতচিন্তার কেন্দ্রীয় অন্বিষ্ট একটাই: পুঞ্জীভূত মিথ্যার সন্ত্রাস ও মেধাশূন্য ইতিহাস ঘাতকদের অসহিষ্ণুতাকে পর্যদুস্ত করে যথার্থ ভারতীয় ভাব পরম্পরার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। একাজে মুক্তবুদ্ধির বিকল্প নেই কোনো। আর বিকল্প নেই অদ্বিতীয় বিদূষী ও সক্রিয় সংগ্রামী আপসহীন সংস্কৃতি যোদ্ধা সুকুমারী ভট্টাচার্যেরও যিনি ভারত-চিন্তাচর্চাকে সময়বোধহীন পরিসরবোধহীন গজদন্তমিনারবাসী ও চর্বিত চর্বক পণ্ডিতদের কবল থেকে উদ্ধার করেছেন। সেইসঙ্গে জনস্বার্থবিরোধী প্রতিভাবাদর্শের অবাধ বিদূষণের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক ভাবে রুখে দাঁড়িয়েছেন। তিনি যেন খাপ-খোলা-তলোয়ার, তার হাতে অভিযাত্রীর মশাল যা ঘনায়মান প্রদোষ ও রাত্রির তিমির হনন করে।

চার

গ্রহীতার অবস্থানভেদে প্রতিবেদনের তাৎপর্য আলাদা হয়ে যায়। তাই বস্তুগত ভিত্তি ও যুক্তিশৃঙ্খলার উপরে প্রতিটি বিকল্প ভারত-চিন্তার প্রস্তাবনা করার সঙ্গে সঙ্গে সুকুমারীকে গবেষক-পাঠকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও দৃঢ় অবস্থান সম্পর্কেও সুস্পষ্ট অভিমত দিতে হয়েছে। তাঁর রচনাবলী জুড়ে এত অজস্র, মণিমুক্তা ছড়িয়ে রয়েছে যে বেছে নেওয়া শক্ত। তবু হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা নামক বয়ানের কিছু কিছু অংশ দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরছি :

ক. 'সাধারণ মানুষ যারা যজ্ঞের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত ছিল না, যাদের মধ্যে প্রাগার্য এবং অবৈদিক আর্যগোষ্ঠীর ধর্মমত ও আচরণ প্রচলিত ছিল, তাদের যজ্ঞবিরোধী বা যজ্ঞনিরপেক্ষ মত ও বিশ্বাসের নিদর্শন 'সেই সুদূর অতীত থেকে কিছু কিছু সংকলিত ছিল।' (১৯৯৭ : ১১)

অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক মতাদর্শের অনুগামী সরকারি প্রতিবেদনের সমান্তরাল ও প্রতিস্পার্ধী অপ্রাতিষ্ঠানিক মতাদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত বেসরকারি প্রতিবেদন সুদূব অতীতের ভারতীয় লোকসমাজেও প্রচলিত ছিল। সাম্প্রতিক গবেষকরা অন্তেবাসী বর্গীয় চেতনার স্বরূপ ও গুরুত্ব অধ্যয়ন করবেন— এটাই কাম্য।

খ. 'আর্যরা কোনো জাতিগোষ্ঠী নয়, ভাষা ও সংস্কৃতিগত সংহতির দ্বারা বিধৃত এক জনগোষ্ঠী। এই ইন্দো ইয়োরোপীয় ভাষাভাষী আগন্তুকরা ভারতবর্ষে এদেশের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে যখন বাস করতে শুরু করেন তখন সে অঞ্চলে সম্ভবত দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক ভাষাভাষী মানুষ বাস করত। আগন্তুকরা ভাষা, ধর্মবোধ ও আচার অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণ পৃথক, কাজেই কিছু সংঘাত অনিবার্যই ছিল।' (পৃ ১২)

সাম্প্রতিক ভারতবর্ষে ধর্মীয় ফ্যাসিবাদীরা আর্যদের 'ভূমিপুত্র' বলে দেখাতে চায়; তাদের যাবতীয় বক্তব্য প্রকাণ্ড মিথ্যার জাল বয়ন করে ইতিহাসকে নির্বাসন দেয়। সুকুমারী এখানে প্রমাণিত ইতিহাসের প্রতি তর্জনি সংকেত করেছেন।

গ. 'চিন্তার ক্ষেত্রে কতদূর পর্যন্ত সহাবস্থান যে প্রাচীন ভারতে সম্ভব হয়েছিল তা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। ..... 'শ্রৌত ও স্মার্ত' মানুষ যজ্ঞ ও পূজা করে পাশাপাশি বাস করেছেন। সাকার পূজা

ও নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা সহাবস্থান করেছে, এমনকি যারা যজ্ঞ বা পূজা কিছুই বিশ্বাস করে না, তারাও এদের সঙ্গে বিনা বিবাদে বাস করেছে। মতের ক্ষেত্রে যথেষ্টই বিরোধ ছিল, কিন্তু সেটা ছিল যুক্তি ও বুদ্ধির স্তরে। কোনো শাস্ত্র কখনোই বলেনি বিরোধী মতবাদকে ধ্বংস করতে, মত দিয়েই শুধু মতবাদীদের খণ্ডন করার কথা পড়ি, মতবাদীর ক্ষতি করার কোনো নির্দেশ নেই শাস্ত্রে।' (পৃ. ১৩)

অর্থাৎ ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর বাবরি-মসজিদ ধ্বংস করে যারা এক দশক পরে গুজরাটে গণহত্যার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল, তাদের উন্মত্ত অসহিষ্ণুতাকে প্রতিরোধ করার আয়োজন বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রেও আবশ্যিক : উদ্ধৃত মন্তব্যে এই সংকেত পাচ্ছি।

ঘ. সুদীর্ঘ সহস্রাব্দ কাল ধরে বহু জাতি তাদের বিশিষ্ট ধর্মবোধ, বিশ্বাস ও আচরণের আমূল পার্থক্য নিয়ে বারেবারে এদেশে প্রবেশ করেছে। কাজেই সমন্বয় প্রচেষ্টা সফল না হলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এদেশে রক্তগঙ্গা বইত। তা হয়নি। বৌদ্ধধর্মে সর্বমানবে মৈত্রীর বাণী কথ্য ভাষায় সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছেছিল।.... 'বহু মানুষের হিতের জন্যে, বহু মানুষেব সুখের জন্যে, জনসমূহের প্রতি অনুকম্পার জন্যে, বৃহৎ মানবগোষ্ঠীর প্রয়োজনে'। আজ স্বার্থসন্ধানীরা যতই দেশের বাতাসকে বিদ্বেষে বিষাক্ত করার চেষ্টা করুক না কেন এদেশের মর্মমূলে প্রবাহিত আবহমান কালের যে অন্তঃস্রোতা প্রাণধাবা, সর্বমানবমৈত্রী তার কেন্দ্রে বিদ্যমান। এদেশের প্রাচীন সাহিত্য ধর্মবিদ্বেষ শেখায়নি, শিখিয়েছে সর্বমানবের প্রতি সৌভ্রাত্র, মৈত্রী ও করুণা।' (পৃ ১৪)

এই বক্তব্য আজকের সূচিভেদ্য অন্ধকারে অচঞ্চল দীপশিখার মতো। কী খুঁজব প্রাচীন সাহিত্যে, কীভাবে পাঠ নেব ভারত-চিন্তার-তার হদিশ পাচ্ছি এখানে। এখন বিদ্যাচর্চার, বিশেষত ভারতবিদ্যার দায়িত্ব হলো পৌর সমাজ থেকে 'বিদ্বেষবিষাক্ততা' দূর করে জনমনে সহিষ্ণুতার প্রতিস্থাপন। লেখা উচিত ছিল, বৌদ্ধিক সমাজ, কেননা এই বর্গই বৃহত্তর পৌর সমাজেব উপরে নিজেদের মতান্ধতা চাপিয়ে দেয় এবং কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক সমাজের বরকন্দাজ বাহিনীতে রূপান্তারিত হয়।

ঙ. 'অতীত কাল থেকেই ভারতবর্ষ বহুজাতিক, বহুধর্মীয় বহুভাষিক। এদের মধ্যে নানা নৃতত্ত্বস্বীকৃত জাতিগোষ্ঠী তাদের ভিন্ন বিচিত্র বিশ্বাস আচরণের ধারা বহন করে চলেছে; এদের মধ্যে কার ইতিহাস লেখা হবে, অর্থাৎ কাকে বাদ দিয়ে কাকে গ্রহণ করা হবে?' (পৃ ৫৪)

এই মৌলিক প্রশ্নেব মীমাংসা-প্রয়াস দিয়ে শুরু হতে পারে ভারত-চিন্তার পুনর্বিবেচনা এবং প্রচলিত সন্দর্ভগুলির পুনঃপাঠ। সুকুমারী আজীবন তাঁর গবেষণায় এই সংশ্লেষণ-সন্ধানী ভারতবর্ষকে মনে রেখেছেন। তাকে অনুসরণ করে উত্তর-প্রজন্মের পড়ুয়ারাও এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজুন . 'ইতিহাস কার লেখা হবে? কেনই বা হবে?' (পৃ ৫৫) আর বুঝে নিন, 'যদি এদেশে সম্পূর্ণ সমাজব্যবস্থা, ধর্মসংস্থান, দর্শনপ্রস্থান, নৈতিক মূল্যবোধ ইতিহাস-সচেতনতার প্রতিকূল,' (পৃ ৫৮) হয়ে থাকে তাহলে ভারত-চিন্তা চর্চা এগোবে কোন পথ ধরে। কতখানি সতর্কতা অবলম্বন করবে কিংবা ভাষ্য বিশ্লেষণের জন্যে মানবিকী বিদ্যার অনন্ত উদ্ভাসনকে কীভাবে কাজে লাগাবে। কীভাবেই বা ধর্মান্ধদের ইতিহাসহননকে প্রতিহত করে আবারও নতুন পথ রচনার কাজ শুরু হবে? সুকুমারীর বয়ানে বরং আর একবার ফিরে যাই :

চ. 'বেদে গোমাংস ভক্ষণের বিধানই শুধু ছিল না, বহুপ্রচলিত সর্বজনীন আচার ছিল এটি। আর আজ? পারবে কেউ গলার জোরে এইসব ভেঙে বৈদিক প্রথার প্রতিষ্ঠা করতে? অপুত্রিকা বা নিঃসন্তান স্ত্রীকে কয়েক বৎসর পরে ত্যাগ করবার বিধান দেয় বেদ, চেষ্টা করে দেখুক না বেদবাদীরা এই কারণে আজ স্ত্রী ত্যাগ করতে? কাজেই বেদের বিধি ও নিষেধ আজ সম্পূর্ণ অবান্তর, অপ্রয়োজনীয় এবং একান্তই অর্থহীন। সারস্বত চর্চার ক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র, অর্থাৎ জীবনের প্রয়োগিক ক্ষেত্রে এসব বিধিনিষেধের প্রতি সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক উপেক্ষাই হবে স্বাস্থ্যকর, যুক্তিযুক্ত ও বাঞ্ছনীয়।' (পৃ ৬৭-৬৮)

সুতরাং বেদ কিংবা অন্য কোনো ধর্মশাস্ত্রের দোহাই দিয়ে, তাদের প্রামাণিকতা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিয়ে, না সাম্প্রতিক জীবনে যাপনবিধি তৈরি করা যায়, না সারস্বত চর্চাকে এগিয়ে নেওয়া যায়। কেননা এখন সময় অতি দ্রুত অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির মধ্যে পালাবদল ঘটিয়ে দিচ্ছে। বৈদিক ও পৌরাণিক এবং অন্যসব স্থিরীকৃত আপ্তবাক্য ও বিধিনিষেধ এখন অবান্তর। 'বেদের যুগে ক্ষুধা ও খাদ্য' এবং 'বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য' যখন অভিনিবেশ দিয়ে পড়ি, এই সত্য স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। প্রথমোক্ত বইয়ের ভূমিকায় লেখিকা বুঝিয়ে দিয়েছেন, প্রাচীন সাহিত্যের প্রত্যক্ষ পাঠ-ই জরুরি; তাহলে অনেক বহুল প্রচারিত 'রূপকথা' থেকে ইচ্ছাপূরণের আঙরাখা খসে পড়বে। যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী জনই সার্থক পাঠক হতে পারেন। তিনি লিখেছেন : 'যে ধরনের নির্লজ্জ, উলঙ্গ মিথ্যা প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস বলে জড়ানো হয়েছে তারই কিছু প্রতিকার ঘটুক প্রকৃত তথ্য থেকে এ বাসনা এই বইটি রচনার পিছনে কার্যকরী ছিল। বৈদিক যুগে অধিকাংশ মানুষ পেট ভরে খেতে পেত না, এটা তথ্য। বিজ্ঞান তখন খুবই পশ্চাৎপদ ছিল, শস্য উৎপাদনের কৃৎকৌশল অনুন্নত ছিল, শস্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা ছিল না, প্রাকৃতিক দুর্যোগে শস্যহানি ঘটত, এসবের জন্যে যে-অভাব তা সার্বত্রিক ছিল এবং তার মধ্যে গ্লানির কিছু নেই। আবার বৈদিক ইতিহাস অনুধাবন করতে করতে দেখি, আর্যরা আসার চার-পাঁচ শতাব্দীর মধ্যে উৎপাদন ব্যবস্থায় কৌশলগত প্রকরণে বিপ্লব এসে যাওয়ায় উৎপাদনে বৃদ্ধি ঘটেছে, প্রয়োজনকে ছাপিয়ে কিছু উদ্বৃত্তও থাকছে। কিন্তু ঠিক তার সঙ্গেই সমাজে শ্রেণীবিভাগও দেখা দিয়েছে এবং উদ্বৃত্ত জমা হতে লাগল মুষ্টিমেয় ধনীর হাতে। তারা তা নিরন্ন মানুষের মধ্যে বণ্টন না করে ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি বাড়ানোর জন্যে পণ্য হিসেবে তাকে ব্যবহার করল স্বদেশে ও বিদেশে। ফলে নীচের তলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের ক্ষুধার অন্ন কোনোদিনই মিলল না।

উপনিষদের যুগে দেখা দিল জন্মান্তরবাদের তত্ত্ব এবং তার কিছু পরে কর্মবাদ। কাজেই খেটে-খাওয়া মানুষের অর্ধাহার অনাহারের পুরো ব্যাখ্যা মিলল। মানুষ যেহেতু মৃত্যুর পরে বারে বারে জন্মায়, তাই এজন্মের এই যে অন্নাভাব এ তার পূর্বজন্মের দুষ্কৃতিরই ফল। পূর্বজন্মের দুষ্কৃতিটা এজন্মের অগোচরে, এজন্মের সুকৃতি দিল, তার প্রতিকার ঘটবে যে পরজন্মে, সে-ও তার অগোচরে। ফলে মেনে নেওয়া ছাড়া এবং সমাজের কর্তাব্যক্তিদের শ্রীচরণ সেবা করা ছাড়া অভুক্ত দরিদ্রের আর করবার কিছুই রইল না। কাজেই দুঃখ দারিদ্র্য যথাপূর্বম্ রইল, ব্যাখ্যা রইল, আর রইল নিষ্প্রতিকার ক্ষুধা।' (১৯৯৮ : ৮)

পাঁচ

এই বয়ানই সুকুমারী ভট্টাচার্যের অনন্যতার অভিজ্ঞান, সেইসঙ্গে বস্তুবাদী ভারত-চিন্তারও। আর, বইয়ের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে তাঁর নিবিড় অনুপুঙ্খ পাঠ ও সেই পাঠভিত্তিক ভাষ্যের নিদর্শন। কেন সংশয়, কেনই বা নাস্তিক্য, কেন জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদের নাগপাশে বাঁধা নিয়তিতত্ত্ব : ঐ বয়ানে অন্তর্বৃত যুক্তিশৃঙ্খলায় অনিবার্যভাবে উঠে আসে এই প্রশ্নমালা। এবং বস্তুবাদী ভারতচিন্তার আলোয় এইসব কিছুই যে প্রণালীবদ্ধ মীমাংসায় পৌঁছায়, সুকুমারী আমাদের কাছে তা স্ফটিকস্বচ্ছ করে তুলেছেন। বিশেষত তাঁর 'নিয়তিবাদ; উদ্ভব ও বিকাশ' এবং তার ইংরেজি ভাষান্তর 'Fatalism in Ancient India' বৌদ্ধিক দীপ্তি, ক্ষুরধার যুক্তিনিষ্ঠ ভাষ্য ও লিখননৈপুণ্যে ভারত-চিন্তাবিশ্বের দুটি অক্ষয় আলোকস্তম্ভ। এদের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে লেখিকার আশ্চর্য পাণ্ডিত্য ও ভাষ্য-ক্ষমতার অসামান্য নিদর্শন'। 'The Indian theogony'-তে যে প্রবণতার সূচনা হয়েছিল, এবার তা সম্পূর্ণতা অর্জন করল যেন। আর, অভ্রান্তভাবে প্রমাণিত হলো, ভারতচিন্তা সীমাহীন মানববিশ্বের অপরিহার্য

অঙ্গ। ধর্মতত্ত্ব-দর্শন-ইতিহাস-সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের তুলনামূলক পর্যালোচনা কোন্ শিখরে পৌঁছাতে পারে, সুকুমারীর প্রতিবেদন তারই চমৎকার দৃষ্টান্ত। 'Literature in the Vedic Age' না পড়লে যেমন বৈদিক সাহিত্যের অধ্যয়ন লক্ষ্যাভিমুখী হতে পারে না, তেমনই নিয়তিবাদ বিষয়ক বইটি (এবং ইংরেজি Fatalism ও যেহেতু এই দুইয়ের মধ্যে একটুখানি স্বাতন্ত্র্য আছে) না-পড়লে ভারতীয় জীবন-দর্শন সংক্রান্ত অনেক কুহক-কথার নিরাকরণ হয় না।

'নিয়তিবাদ, উদ্ভব ও বিকাশ' এর ভূমিকার অন্তিম অনুচ্ছেদটি প্রমাণ করে বিষয়বস্তু উপলক্ষ মাত্র, লক্ষ্য মানববিশ্ব ও মানবিকী বিদ্যার মুক্তি; 'মানুষ জীবনে একবারই মাত্র বাঁচে এবং পূর্বজন্মের কোনো সঞ্চিত কর্মফলের বোঝা তার পিঠে চেপে নেই, তার জীবনের গতিপ্রকৃতি মূলত নির্ধারণ করে সে নিজে আর তার সামাজিক পরিবেশ এবং এই একটিমাত্র জন্মেই কোনো অজ্ঞেয় শক্তি তার ভাগ্য নিরূপণ করে না, তার ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রশ্নাতীত, এবং এটি তার একটি অনপনেয় অধিকার, যা কেউ কেড়ে নিতে পারে না। একবার এই অবস্থান গ্রহণ করলে মানুষ তার স্বাধীনতার ও সর্বাঙ্গীণ সুখবিধানের সপক্ষে দাঁড়াবে, যার মধ্যে নিহিত আছে মানবিক সীমার বোধ, কিন্তু যা তাকে নিয়তির আতঙ্ক থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেয়। সমগ্র মানবজাতির পক্ষে মানুষের এই গর্ব প্রকাশের অধিকার রয়েছে যে ইচ্ছা করা এবং সে ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করাব শক্তি ও স্বাধীনতাও তার আছে। তথাকথিত নিয়তিব ওপরে তার সামান্যতম জয়ও সমগ্র মানব জাতির আত্মিক সংগ্রামকে মহিমান্বিত করবে।' (১৯৯৪ : ছত্রিশ) পডতে পড়তে অনুভব করি, এ কোনো সাধারণ উচ্চারণ নয়; প্রতিবেদনের প্রয়োজনে ব্যবহৃত তাৎক্ষণিক কোনো শব্দাবলীও নয়। এই বাচন গভীর গভীরতর বিশ্বাস-মথিত যার ধ্রুবপদ সুকুমাবীর বড়ো প্রিয়, বহুবাব উচ্চারিত, মহাভারতের ভীষ্মবাক্য; 'নাহি মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ' [মহাভারত : ১২; ২৮৮; ২০]। কেন শ্রেষ্ঠ মানুষ? কেননা একটাই জীবন মানুষের আর তাতে সত্য শুধু বন্ধন মুক্তির আয়োজন, নিরন্তব এগিয়ে যাওয়া আর মানব-অস্তিত্বের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা।

প্রকৃত ভারতবিদ্যা তাই শেষ পর্যন্ত মানবিকী বিদ্যাব তথ্যনিষ্ঠ যুক্তিনিষ্ঠ অভিব্যক্তি এই মৌল বার্তা অনুরণিত হয় সুকুমারীর লিখনবিশে। তাঁর কাছে এই পাঠ নিয়ে উত্তর-প্রজন্ম এগিয়ে যাক মানব-সত্যের নতুন নতুন উন্মোচনে। সেই উন্মোচন স্বতশ্চল ভাবে উদ্ধত প্রতাপের প্রতিস্পর্ধী হবে, চতুর মিথ্যাকে প্রতিহত করবে। পাণ্ডিত্যের অর্থই আমূল বদলে যাবে তখন। ফলে গবেষকদের জন্যে রচিত 'ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস বা 'Buddhist Hybrid Sanskrit literature' পড়ি অথবা সাধারণ পাঠকের উপযোগী 'বিবাহ প্রসঙ্গে' বা 'মন্থন' পড়ি — বড়ো হয়ে ওঠে এই ধ্রুববিন্দু, ভাবাদর্শবিহীন পাঠ হতে পারে না। আর, ভারত-চিন্তা কেবল ঐতিহ্য-অনুসৃতি নয়, তা বর্তমানকে দেয় দিশা আর ভবিষ্যৎকে লক্ষ্যাভিমুখিনতা। তাতে মানুষ কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হয়, আরোপিত সব অতিরেক ঝরে যায়।

তাই অজস্র তথ্য ও তত্ত্বের দুরূহ ও শ্রমসাধ্য পথ পেরিয়ে সুকুমারী ভট্টাচার্য আজও ভাবতে পারেন না 'consummatum est' কিংবা 'The rest is silence'! তিনি বিশ্বাস করেন বরং, পথ থেকে পথান্তরে আর শাখা থেকে প্রশাখায় অনবরত জড়িয়ে যায় পথিকের যাত্রার তৃষ্ণা। ভারত-চিন্তাকে অতীত অনুষঙ্গে রুদ্ধ না-রেখে বর্তমানের পুনর্গঠনে প্রবাহিত করে দিতে হবে তাই। সুকুমারী ভট্টাচার্যের পাঠকৃতি মানে যুদ্ধক্ষেত্র, এই জেনে সামূহিক যুদ্ধকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। অতএব 'নিয়তিবাদ'-এর সমাপ্তি-বাচনকে ভরতবাক্য হিসেবে ব্যবহার করি।'

'এখন মানুষ জানে যা কিছু নিয়তি-নিরূপিত বলে সে জানত, তার অনেকটাই ক্ষমতাসীন সম্প্রদায়ের হাতে তৈরি মানুষের দুর্গতি এবং তার প্রতিকার আছে। এই জানাটার দামই মানুষের

ইতিহাসে বহুমূল্য।... এই সংগ্রামে প্রত্যেকটি জয় নিয়তিবাদের ভিত্তি থেকে একটি করে পাথর টলিয়ে দিচ্ছে।... মানুষের নিরন্তর সংগ্রাম চলবে জীবনকে প্রকৃতিকে মহাবিশ্বকে মানবসমাজকে আরও গভীরভাবে, আরও সানুপুঙ্খভাবে জানবার; যে জ্ঞান তার হাতে অস্ত্র তুলে দেবে সংগ্রামের।... নিয়তিকে পদদলিত করে ক্রমেই জয়যুক্ত হতে থাকবে পুরুষকার।' (১৯৯৪ : ৩৩৫-৪৬)

এই নিবন্ধের শুরুতে জ্ঞান ও প্রতাপের যে পীড়ন-মূলক সম্পর্কের কথা লক্ষ করেছি, এভাবেই তার পুরোনো সমীকরণ আমূল পাল্টে দিয়ে ভারত-চিন্তার বিকল্প বয়ান নির্মাণ করে গেছেন সংগ্রামী চিন্তাবিদ্ সুকুমারী ভট্টাচার্য।

মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় রেনেসাঁ

অমলেন্দু দে

চতুর্দশ শতক থেকে ষোড়শ শতকের সময়কালে প্রাচীন সাহিত্য ও শিল্পের (বিশেষ করে প্রাচীন গ্রিক ও ল্যাটিন) পুনরভ্যুদয়ের প্রভাবে ইউরোপীয় সাহিত্য ও শিল্পের নবজীবন লাভ ঘটে। তাকে 'ইউরোপীয় রেনেসাঁ' বলা হয়। নতুন করে গ্রিস ও রোমের শিল্পকলা ও সাহিত্যের চর্চা হওয়ায় মানুষের চিন্তায় ও জীবনে পরিবর্তন ঘটে। মানুষ অনুসন্ধিৎসু হয়। তার মধ্যে ঔদার্যবোধ জাগ্রত হয়। বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিশীল মননের অধিকারী হওয়ায় মানুষ সব ঘটনাই যুক্তি দিয়ে বিচার করতে শেখে। তাদের মনে স্বাধীন চিন্তার উদ্ভব হয়। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাপ্তিলাভ করে। মানুষ আর আগের মতো মধ্যযুগীয় ধর্মীয় বিধিনিষেধ মেনে চলতে সম্মত নয়। বৈজ্ঞানিক সত্য ও যুক্তি প্রয়োগ করে যা গ্রহণযোগ্য তা তারা গ্রহণ করে। মানুষ আর পরকালের প্রতি আগ্রহবোধ করেনি। কোনো প্রচলিত বিধি ব্যবস্থাকেই মানুষ আর আগের মতো গ্রহণ করতে পারেনি। রেনেসাঁর সূচনা থেকে পণ্ডিত ও লেখকরা খোলামনে, যুক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে ও সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে জীবন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে শুরু করেন। বিভিন্নভাবে তাঁদের মানবিক অনুরাগ ব্যক্ত হয়। 'হিউম্যানিজম' শব্দটির দ্বারা চিন্তাবিদদের এই বিশেষ মনোভাব উল্লেখ করা হয়। 'হিউম্যানিজম' হলো একটি দার্শনিক ও সাহিত্যিক আন্দোলন। আর এই আন্দোলনের প্রধান বিষয় হলো মানুষ ও তার কর্মক্ষমতা। এই সময়ের হিউম্যানিজমে প্রাচীন গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মানুষ ও তার কর্মক্ষমতাকে অবলম্বন করেই রেনেসাঁর সময়কালে মানবতাবাদের উদ্ভব। চিত্রকলায়, সাহিত্যে, ধর্মে ও বিজ্ঞানে মানবতাবাদের প্রভাব লক্ষ করা যায়। এইভাবে নবজাগরণের ফলে মানুষ মধ্যযুগের গোঁড়ামি ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত হয়। তারা তাদেরই হারিয়ে যাওয়া গৌরবোজ্জ্বল অতীতকে আবিষ্কার করে। হোমার, সফোক্লিস, অ্যারিস্টটল প্রমুখ গ্রিক মনীষী তাদের মানসপটে জীবন্ত হয়ে ওঠেন। এইভাবে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে রেনেসাঁ মানুষের সৃজনশীলতা বিশ্বসভ্যতাকে নবরূপ দান করে। ঔপনিবেশিক আমলের ভারতেও ইউরোপীয় রেনেসাঁর প্রভাব পড়ে। এই সময়ে ব্রিটিশ শাসনের ওপর নির্ভরশীল ইংরেজি শিক্ষিত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব ঘটে। এই শ্রেণি ইউরোপীয় রেনেসাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভারতের জীবনধারা পরিবর্তনে উদ্যোগী হয়। বাংলায় ও অন্যান্য রাজ্যে ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলনে তা লক্ষ করা যায়। এই আন্দোলনের ফসল হলো 'ভারতীয় রেনেসাঁ'। বাংলায় তা 'বেঙ্গল রেঁনেসা' নামে উল্লিখিত। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই 'ভারতীয় রেনেসাঁ' আলোচনায় ইউরোপের প্রভাবই বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। কিন্তু মধ্যযুগের ভারতীয় ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে 'ভারতীয় রেনেসাঁ' অথবা 'বেঙ্গল রেনেসাঁ' পর্যালোচনা না করলে বোঝা যাবে না, কিভাবে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির গতি ধারাও 'ভারতীয়' বা 'বেঙ্গল রেনেসাঁ'কে সমৃদ্ধ করে। সুতরাং 'ইউরোপীয় রেনেসাঁ'র প্রভাবের সঙ্গে ভারতের নিজস্ব জীবনধারার প্রভাব আলোচনা করলে এবং একই সঙ্গে 'ইসলামিক রেনেসাঁ'র

প্রেক্ষিতটি মনে রাখলে 'ভারতীয় রেনেসাঁ' অথবা 'বেঙ্গল রেনেসাঁ' সম্বন্ধে আমাদের ধারণা আরো স্বচ্ছ হতে পারে। আলোচ্য নিবন্ধে তারই প্রয়াস করা হয়েছে।

প্রাচীনকাল থেকেই 'বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যে'র পথ ধরে ভারতীয় জীবনধারা গড়ে ওঠে এবং ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিকশিত হয়। বহু জাতি গোষ্ঠীর সংমিশ্রণেই ভারতীয় জাতির উদ্ভব ঘটেছে। এই সংমিশ্রণের ফলেই ঐক্যের ভাবনাটি রূপ ধারণ করেছে। ভারতে ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকে ভারতীয় জীবনধারা প্রধানত তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় : (১) সংঘাত (Conflict), (২) পরস্পরের গুণের সমাদর (Mutual appreciation) ও (৩) সদৃশকরণ (Assimilation)। প্রথম দিকে রাজ্যজয়ের ও আধিপত্য স্থাপনের সময়ে সংঘাতের উপাদানগুলিই শক্তিশালী ছিল। কিন্তু রাজত্ব স্থাপনের পর রাজ্যশাসনেই প্রয়োজনে হিন্দুদের সঙ্গে বহিরাগত মুসলমানদের যোগাযোগ ঘটে। একই রাজ্যে পাশাপাশি বাস করার ফলে পরস্পরের মধ্যে পরিচিতি ঘটে। ত্রয়োদশ শতক সমাপ্ত হওয়ার সময়ে এই যোগাযোগের সূত্রপাত লক্ষ করা যায়। চতুর্দশ শতক থেকে ষোড়শ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত সময়ে এক সম্প্রদায়ের প্রভাব যে অন্য সম্প্রদায়ের ওপর পড়ছে তার এক স্বচ্ছ চিত্র পাওয়া যায়। সংঘাতের ক্ষেত্রটি সংকুচিত হতে থাকে এবং পরস্পরের গুণের সমাদর ও সদৃশকরণের উপাদানগুলি ক্রমবর্ধমান হতে থাকে। তারফলে ভারতীয়ত্বের রূপ (Indianism) পরিস্ফুট হয়। একই সময়ে মুসলিম জনবিন্যাসে (Muslim Demography) পরিবর্তন ঘটে। বিদেশ থেকে আগত মুসলমানরা ভারতেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন। ইসলামের সাম্য নীতির আকর্ষণে বর্ণভেদ প্রথায় পীড়িত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। ধর্মান্তরিত হিন্দুদের সঙ্গে মুসলিম জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের ওপর পরস্পরের প্রভাব পড়ায় উত্তর ভারতের অনেক জায়গাতেই তাঁরা একটি 'হিন্দুস্থানী জীবনধারা' গড়ে তোলেন। তারফলে 'একটি মিশ্র ভারতীয় সংস্কৃতির' উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। এই সংস্কৃতি 'বিশুদ্ধ হিন্দু' অথবা 'আরব উদ্ভূত বিশুদ্ধ ইসলামীয়' নয়। তা ছিল 'ভারতীয় হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি'। ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে বাবর যখন ভারতে এলেন তখন তিনি এখানকার জীবনধারায় এমন কিছু দেখেননি যাকে কেবলমাত্র হিন্দু অথবা মুসলিম বলা যায়। তিনি লক্ষ করেন, ভারতে সব কিছুই চলছে 'হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে'।

খ্রিস্টীয় নবম শতক থেকেই হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে মুসলিম বুদ্ধিগত উপলব্ধি সম্বন্ধে বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় দশম শতকে 'ইসলামিক রেনেসাঁ'র অন্যতম কেন্দ্র ছিল বাগদাদ। এই শহরকে কেন্দ্র করে যেসব আরব পণ্ডিত পর্যটক ও ভূগোলবিদ ছিলেন তাঁদের ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে গভীর আগ্রহ ছিল। তাঁদের রচনায় হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়। তাঁরা ভারতে প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান নিয়েও আলোচনা করেন। ৮০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বহু মুসলিম ভূগোলবিদ ও পর্যটকরা ভারত ভ্রমণ করে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইবন আন-নাদিম, মাসুদি, ইবন খুরদাদবেহ, আল-বালাধুরি, ইয়াকুবি, হামাধানি, ইসটাখরি, ইবন রুস্তা, মাকদিসি, ইবন হাওকাল, কাজওয়ানি, অলবিরুনী, ইদ্রিসি, মারভাজি এবং শাহরাস্তানি। তাঁদের অবদানের ফলে ইসলামীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয় এবং স্বাভাবিকভাবেই তা বিশ্বসভ্যতার অগ্রগতিতেও সহায়ক হয়। একদিকে যেমন 'ইসলামিক রেনেসাঁ'র বিকাশে মধ্যযুগের ভারতের প্রভাব লক্ষ করা যায়, অন্যদিকে 'ইসলামিক রেনেসাঁ'ও ভারতকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। তাই 'ভারতীয় রেনেসাঁ'র ইতিহাস আলোচনায় 'ইসলামিক রেনেসাঁ'র গুরুত্ব অনস্বীকার্য। স্বভাবতই 'ইসলামিক রেনেসাঁ'র প্রেক্ষাপট থেকে 'ভারতীয়

রেনেসাঁ'র বিশ্লেষণের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। এখানে উল্লিখিত মুসলিম পণ্ডিত, ভূগোলবিদ ও পর্যটকদের ভারতের বিভিন্ন ধর্ম, ধর্মীয় গ্রুপ ও আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা পর্যালোচনা করলেই 'ইসলামিক রেনেসাঁ' সম্বন্ধে আমাদের ধারণা স্পষ্ট হতে পারে।

'ইসলামিক রেনেসাঁ'কে যাঁরা সমৃদ্ধ করেন তাঁদের কয়েকজনের কথা এখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে। ইবন আন-নাদিম বাগদাদে শিক্ষালাভ করেন। তাঁর আরবি ভাষায় রচিত Kitab al-Fihrist নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় তিনি ধর্মের ও ধর্মীয় গ্রুপের ইতিহাস সম্বন্ধে আগ্রহী ছিলেন। তাই তাঁর রচনায় প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও ধর্মীয় গ্রুপের আলোচনা পাওয়া যায়। আরবি কবিতাও তিনি খুব পছন্দ করতেন। ইবন আন-নাদিম নিজের প্রকৃত মুসলিম সত্তা অক্ষুণ্ণ রেখে অন্যান্য সকল ধর্মের প্রতিই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি এই গ্রন্থ রচনার কাজ সমাপ্ত করেন। চিকিৎসা শাস্ত্র, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষিবিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল, ধর্মতত্ত্ব, ব্যবহারশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ে মুসলিম পণ্ডিতদের কি অবদান ছিল তা ইবন আন-নাদিম তাঁর গ্রন্থে আলোচনা করেন। বহু আরবি ভাষায় রচিত গ্রন্থের উল্লেখ তাঁর গ্রন্থে পাওয়া যায়। ফারসি ও সংস্কৃত ভাষা থেকে আরবি ভাষায় যেসব গ্রন্থ অনুদিত হয় তার তালিকা থেকে জানা যায়, তর্কশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, অধিবিদ্যা ও নীতিশাস্ত্র বিষয়ক বহু গ্রন্থই আরবি ভাষায় তখন অনুদিত হয়। ইবন আন-নাদিমের রচনা থেকে এই কথাও জানা যায়, তখন গ্রিক দর্শন ও দার্শনিকদের রচনা ও জীবনী আরবি ভাষায় অনুদিত হয়। তাঁর গ্রন্থের দুটো অধ্যায়ে প্লেটো ও অ্যারিস্টটল সম্বন্ধেই বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। তখন মানব সভ্যতার সমস্ত শাখাতেই মুসলিম পণ্ডিতদের অবদান লক্ষ করা যায়। এই কারণে দশম শতককে 'ইসলামের গৌরবময় যুগ' বলা হয়। আর এই সময়েই ইবন আন-নাদিমের মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়।

খোয়ারিজম অথবা খিভা অঞ্চলের অলবিরুনী (৯৭৩-১০৪৮ খ্রিঃ) ভারতে এসে সংস্কৃত ভাষায় দক্ষতা অর্জন করে হিন্দুধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি খুবই যত্ন সহকারে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, হিন্দুদের চরিত্র, আচার-আচরণ ও প্রথা সম্বন্ধে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে রাখেন। তার ফলে তিনি 'তাহ্যাকেক-ঈ-হিন্দ' নামে বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করতে সমর্থ হন। এই গ্রন্থখানি 'অলবিরুনীর ভারত' নামেও পরিচিত। ভিনসেন্ট স্মিথ বলেন, অনেক পরে এই গ্রন্থের অনুকরণে আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরী' রচনা করেন। অলবিরুনী ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে অনেক গভীর মন্তব্য করেন। এই গ্রন্থখানিতে তৎকালীন ভারতীয় জীবনের স্বচ্ছ চিত্র পাওয়া যায়। অলবিরুনী ভারতীয় দর্শন, বিশেষ করে 'ভাগবৎ গীতা' পড়ে মুগ্ধ হন। সাধারণ মুসলমানদের যেসব কুসংস্কার ছিল তা থেকে তিনি মুক্ত ছিলেন। সত্যের সন্ধানে তিনি হিন্দুশাস্ত্র চর্চা করতে কোনোই দ্বিধা করেননি। অলবিরুনী যেসব বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন তা হলো জ্যোতির্বিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র, অতীত ঘটনাবলীর সময়ানুক্রম, গণিতশাস্ত্রীয় ভূগোল, পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র এবং খনিজবিদ্যা। এইসব বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা আছে। ইতিহাস জানা বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনি ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধি সম্পন্ন বিজ্ঞানী। তাঁর কিছু রচনা হারিয়ে গেলেও অন্য সব রচনা পাওয়া গিয়েছে। 'প্রাচীন জাতি সমূহের ঘটনাবলীর সময়ানুক্রম' নামে যে গ্রন্থ তিনি রচনা করেন তা খুবই মূল্যবান।

ইবন সিনা (৯৮০-১০৩৭ খ্রিঃ), যিনি ইউরোপে আভিসিনা নামে সুপরিচিত, আরব্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের সবচেয়ে খ্যাতিমান পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত 'কানুন ফিল-টিব' (Canon of Medicine) চিকিৎসাশাস্ত্রের বিরাট বিশ্বকোষ ছিল। এই গ্রন্থে তিনি সেই সময়ের সকল প্রকার ওষুধের বর্ণনা ও তাদের গুণাগুণ, মানবদেহের বিভিন্ন ব্যাধি ও তার চিকিৎসার পদ্ধতি বিশদভাবে আলোচনা করেন। প্রায় ছয় শত বছর তাঁর রচিত 'কানুন ফিল টিব' গ্রন্থ সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে ও ইউরোপে 'চিকিৎসা বিদ্যার

সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক গ্রন্থরূপে' সমাদৃত হয়। বহু ভাষায় এই গ্রন্থ অনুদিত হয়। তাছাড়া এই গ্রন্থের 'অগণিত টীকা ও ভাষ্য' রচিত হয়। সপ্তদশ শতক পর্যন্ত এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তা লক্ষ করা যায়।

এই বিশাল গ্রন্থ ছাড়াও ইবন সিনা আরো পনেরটি চিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর গবেষণার পরিধি খুবই ব্যাপ্ত ছিল। চিকিৎসাশাস্ত্র ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে গবেষণা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি দর্শন, জ্যোতিষ, গণিত, রসায়ণ, ভাষাতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধেও শতাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত 'কিতাব আল্-শিক্ষা' দর্শনের এক বিরাট বিশ্বকোষ হিসেবে সমাদৃত হয়। তিনি এই গ্রন্থে ইসলাম ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রফা করে অ্যারিস্টটলের দর্শন আলোচনা ও ব্যাখ্যা করেন। তাছাড়া তিনি অ্যারিস্টটলের যুক্তি অনুসরণ করে পদার্থবিদ্যা, গণিত ও অধিবিদ্যা সম্বন্ধেও এই গ্রন্থে আলোচনা করেন। এমন কি সঙ্গীত সম্বন্ধেও ইবন সিনা অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। এই বিষয়ে তাঁর রচিত 'আল্-শিফা' গ্রন্থে আলোচনা পাওয়া যায়। আল্-ফারাবি 'আরব্য সঙ্গীতশাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ' হিসেবে সম্মানিত ছিলেন। ইবন সিনার সঙ্গীত বিষয়ক রচনা আল্ ফারাবির রচনা থেকে শ্রেষ্ঠ বলে অনেকে মনে করেন। খ্রিস্টীয় নবম, দশম ও একাদশ শতকে আরও যেসব দার্শনিক, চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানী ইসলামিক রেনেসাঁকে সমৃদ্ধ করেন তাঁদের সকলের কথা আলোচনা করতে গেলে এই রচনা দীর্ঘ হয়ে যাবে। তাই আরব্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার সূত্রপাত কিভাবে হলো সেই বিষয়ে কয়েকটি কথা সংক্ষেপে বলছি। হজরত মহম্মদ (৫৭০-৬৩২ খ্রি:) নিজেই তাঁর অনুগামীদের জ্ঞান-চর্চায় উৎসাহিত করেন। 'জ্ঞান আহরণের জন্য যদি চীন দেশে যেতে হয় তাহলে যেও'—হজরত মহম্মদের এই বাণী দ্বারা তাঁরা তখন অনুপ্রাণিত। তাই সভ্যতায় উন্নত দেশগুলি থেকে আরবরা বিপুল জ্ঞান ভাণ্ডার সংগ্রহ করেন। গ্রিক, পারসিক, ইহুদি, হিন্দু প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর দানে আরব সভ্যতা ও সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় আরব পণ্ডিতদের অবদান উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া হজরত মহম্মদ তাঁর সময়কালে মদিনা সনদ (৬২২ খ্রি:) ও হুদাইবিয়ার সন্ধির (৬২৯ খ্রি:) মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতা ও মানবিকতার উপাদান বিকশিত করার প্রয়াস করেন। হজরত মহম্মদের সঙ্গে কোরেশদের যে হুদাইবিয়ার শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হয় তাতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান গুরুত্ব পায়। শেষ পর্যন্ত তাঁর এই প্রয়াস পূর্ণাঙ্গ রূপ না পেলেও ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত। উল্লেখ্য এই, ইহুদি, নেষ্টোরীয় ও মনোফিজাইট পণ্ডিতদের প্রচেষ্টার ফলেই আরবরা গ্রিক জ্ঞান ভাণ্ডারের ঐশ্বর্যের সঙ্গে পরিচিত হন। অন্যদিকে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় পারসিক ও ভারতীয় পণ্ডিতদের মাধ্যমেই আরবদের মধ্যে প্রচারিত হয়। খলিফারা গ্রিক ও ভারতীয় পণ্ডিতদের দ্বারা রচিত জ্ঞান-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থসমূহ আরবি ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করে আরব্য বিজ্ঞানচর্চার পথ সুগম করেন। আরবদের মননশীলতার ব্যাপ্তি ঘটে। তারফলে মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে আরব্য প্রতিভার অভূতপূর্ব সাফল্যলাভ ঘটে। আরব্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা এবং তাতে ভারতীয় পণ্ডিতদের অবদান যেভাবে ইসলামিক রেনেসাঁকে পরিপুষ্ট করে তার প্রভাব মধ্যযুগের ভারতে জ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে কতটা পড়ে তা নিয়ে যথার্থ পর্যালোচনা না করলে মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় রেনেসাঁর বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এই দিক থেকে 'ভারতীয় রেনেসাঁ' অথবা 'বেঙ্গল রেনেসাঁ' আলোচনা করলে আমাদের ভাবনাকে আমরা আরও ব্যাপ্ত ও স্বচ্ছ করতে পারি।

মধ্যযুগের ভারতে স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রিয় কাঠামোর মধ্যে ধর্মান্ধতা সত্ত্বেও জ্ঞান চর্চার যে ধারাটি ক্রমশ প্রবহমান হয় এবং সহনশীলতার পরিমণ্ডল তৈরি হয়, তাতে ভারতীয় রেনেসাঁর উন্মেষ লক্ষ করা যায়। সুলতানী আমলের (১২০৬-১৫২৬ খ্রি:) কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে তা বোঝা যায়। 'শরিয়ত' বা ইসলামি আইন অনুকরণ করে দেশ শাসনের জন্য সুলতানদের ওপর গোঁড়াপন্থী উলেমাদের প্রচণ্ড

চাপ থাকলেও কোনো কোনো প্রভাবশালী সুলতানরা ব্যক্তিগত প্রজ্ঞা প্রয়োগ করে দেশ শাসন করতেন। তাঁরা কোরানের 'ইজ্‌তিহাদ' সুরার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন কিনা সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না। আলাউদ্দীন খলজী (১২৯৬-১৩১৬ খ্রি:) অভিজাত ও উলেমা কাউকেই তাঁর নীতি প্রভাবিত করতে দিতে চাননি। তিনি তাঁদের সুলতানের আজ্ঞাবাহী ভৃত্যে পরিণত করেন। তিনি প্রথম তুর্কি সুলতান যিনি 'শরিয়ত' বা ইসলামী আইন অনুকরণ করে দেশ শাসন করেননি। তিনি জাগতিক বিষয়ের ক্ষেত্রে জাগতিক বিবেচনাকেই প্রাধান্য দেন, ধর্মীয় নির্দেশকে নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই তিনি দেশ শাসন করেন। আলাউদ্দীন খলজীর মতো মহম্মদ বিন তুঘলুক (১৩২৫-১৩৫১ খ্রি:) নিষ্ঠাবান সুন্নী হলেও, 'শরিয়ত' বা ইসলামের বিধান অনুযায়ী রাজ্য পরিচালনা করেননি। তিনি বৈষয়িক ব্যাপার বৈষয়িক দৃষ্টিতেই বিচার করতেন। মহম্মদ বিন তুঘলুক শাসন ব্যবস্থাকে উলেমাদের প্রভাবমুক্ত করেন। তাতে রক্ষণশীল মুসলিম ধর্মশাস্ত্রবিদ্‌দের রাজনৈতিক প্রভাব ক্ষুণ্ণ হয়। তিনি শাসনতন্ত্রে ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে এক উদাহরণ সৃষ্টি করেন। তাঁর কোনো ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না। তিনি হিন্দুদের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করেন। তিনি সতী প্রথা বন্ধ করে হিন্দু সমাজের সংস্কার সাধনেরও চেষ্টা কবেন। তিনি বহু হিন্দুকে শাসন ব্যবস্থায় উঁচু ও দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত করেন। দক্ষতা ও সততাই ছিল তাঁর শাসনব্যবস্থার মূল কথা। ন্যায় বিচারের প্রতি সুলতানের বিশেষ নজর ছিল। তাঁর রাজত্বকালেই ইবন বতুতা ভারত পর্যটনে আসেন এবং তাঁর রাজসভায় আসন লাভ করেন। ইবন বতুতার রচনায় সুলতানের ন্যায় বিচার সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

মহম্মদ বিন তুঘলুকের চরিত্রে স্ববিরোধী উপাদানের সংমিশ্রণ থাকলেও তিনি সংস্কৃতিবান ও বিদ্বান ব্যক্তি হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। দর্শন, জ্যোতিষ, গণিত ও বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ছিল অসাধারণ। তিনি ফার্সি ভাষায় সুন্দর কবিতাও রচনা করেন। তাছাড়া তিনি সুবক্তাও ছিলেন। তাঁব বদান্যতা সম্বন্ধে অনেক কাহিনীই প্রচলিত ছিল।

অবশ্য তাঁদের এই প্রয়াস বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফিরোজশাহ (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রি:) ধর্মান্ধ সুন্নী মুসলমান ছিলেন। তিনি আলাউদ্দীন খলজী ও মহম্মদ বিন তুঘলুকের মতো জাগতিক বিষয়ের ক্ষেত্রে জাগতিক বিবেচনাকে প্রাধান্য দেবাব নীতি অনুসরণ না করে 'শরিয়ত' বা ইসলামের বিধান অনুযায়ী রাজ্য পরিচালনা করেন। ফিরোজের ধর্মনীতিব ফলে শুধু হিন্দুরা নয়, শিয়া ও অন্যান্য সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানবাও নির্যাতন ভোগ করেন। এমন কি সুফিরাও নির্যাতিত হয়। এই নীতির ফলে জ্ঞান চর্চা ব্যাহত হয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতির পথটি প্রশস্ত হতে পারেনি।

১৪১৩ খ্রিস্টাব্দে দিল্লীতে তুর্কি সুলতানদের রাজত্বকাল শেষ হয়। তুঘলুক বংশের পতনের পর প্রদেশগুলিতে স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়। এইসব স্বাধীন রাজ্য নিজ নিজ অঞ্চলে কেবলমাত্র নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখেনি, এই রাজ্যগুলি শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রেও পরিণত হয়। তাদেব মধ্যে উল্লেখযোগ্য রাজ্য ছিল বাংলা, জৌনপুর, মালব, গুজরাট ও কাশ্মীর। এই সময়েই দাক্ষিণাত্যে ব্যাহমনী রাজ্য এবং দক্ষিণ ভারতে বিজয়নগব রাজ্য সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। ইলিয়াস শাহ্ (১৩৪২-১৩৫৭ খ্রি:) ও তার পরবর্তী সুলতানদের সময়ে এবং হোসেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি:) ও নসরৎশাহের (১৫১৯-১৫৩২ খ্রি:) আমলে বাংলাব সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নতি ঘটে। দেশে শান্তি ও ও সমৃদ্ধি বিরাজ করে। হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতি বজায় ছিল। স্থাপত্যের নিদর্শন থেকে সুলতান সিকন্দর শাহের সমৃদ্ধি সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। তিনি ১৩৬৮ খ্রিস্টাব্দে মালদহ জেলার পাণ্ডুয়াতে 'আদিনা মসজিদ' নির্মাণ করেন। এই মসজিদটি ভারতে মুসলিম শাসনের সময়কার একটি বিখ্যাত স্মৃতিচিহ্ন। সুলতান গিয়াসউদ্দীন আজমশাহ্ কবি হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর সঙ্গে বিখ্যাত পারস্য দেশের কবি হাফিজের পত্রালাপ

ছিল। চীনের সম্রাটের সঙ্গেও গিয়াসউদ্দীনের বন্ধুত্বপূর্ণ পত্রালাপ হতো। ১৪১০-১৪১১ খ্রিস্টাব্দে মহারত্ন ধর্মরাজ নামে বিখ্যাত বৌদ্ধ ভিক্ষু চীন দেশে যান এবং ভারতের সঙ্গে চীনের প্রাচীন সাংস্কৃতিক যোগাযোগ পুনরুজ্জীবিত করেন। ধর্ম, বাঙালি সংস্কৃতি ও সাহিত্যের দিক থেকে পনেরো শতককে বাংলার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য শতক বলা যায়। হোসেন শাহ্ প্রজারঞ্জক শাসক ছিলেন এবং তিনি হিন্দু ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন। তাঁকে মধ্যযুগের বাংলার শ্রেষ্ঠ শাসক বলা হয়। তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাঁর রাজত্বকালেই শ্রীচৈতন্যের (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রি:) আবির্ভাব হয় এবং শ্রীচৈতন্য প্রচারিত ধর্মের ফলে বাঙালি হিন্দু সমাজে ও ধর্ম জীবনে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। হিন্দুদের প্রতি হোসেন শাহের উদার মনোভাবকে এই সময়ে বাংলায় নবজাগরণের ক্ষেত্রে অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। হোসেন শাহের ব্যক্তিত্ব, ন্যায়পরায়ণতা, শিষ্টাচার ও বদান্যতা এমন ধারণার সৃষ্টি করে যে একজন হিন্দু লেখক তাঁকে 'কৃষ্ণের অবতার' বলে উল্লেখ করেন। সুলতানের আগ্রহে ও আনুকূল্যে কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচিত হয়। রূপ গোস্বামী 'বিদগ্ধ মাধব' ও 'ললিত মাধব' রচনা করেন। পরাগল খাঁ ও চুটি খাঁ ছিলেন হোসেন শাহের ও নসরৎ শাহের অধীনে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা। তাঁদেরই উদ্যোগে কবীন্দ্র নামে এক কবি প্রথমে 'পাণ্ডব-বিজয় কথা' অথবা 'বিজয়-পাণ্ডব কথা' নামে মহাভারতের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ বাংলায় করেন। তারপর শ্রীকরনন্দী মহাভারতের অনুবাদ করেন। পনেরো শতকের শুরু থেকেই বাংলায় 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' গ্রন্থের কাহিনী এবং শ্রীকৃষ্ণের কাহিনী বাংলায় বলার প্রচলন হয়। এই সময়ে সংস্কৃত পণ্ডিতরা বাংলায় সংস্কৃত চর্চাকে সমৃদ্ধ করেন। হোসেন শাহের আমলেও স্থাপত্য শিল্পের উন্নয়নের ধারাটি অব্যাহত থাকে। তাঁরই আমলে গৌড়ে 'ছোট সোনা মসজিদ' নির্মিত হয়। নসরৎ শাহের আমলে গৌড়ে নির্মিত হয় 'বড়ো সোনা মসজিদ'। এই দুটো মসজিদই সে যুগের উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন। ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে নসরৎ শাহ গৌড়ে 'কদমরসুল ভবন' নির্মাণ করেন। এই ভবনের প্রকোষ্ঠে একটি মঞ্চ এবং তার ওপরে হজরত মহম্মদের পদচিহ্ন সংকলিত একটি কালো কারুকার্য খচিত মর্মর বেদী নির্মিত হয়। এইভাবে শ্রীচৈতন্য প্রচারিত ধর্ম আন্দোলন, বাংলা ভাষার চর্চা, সংস্কৃত ভাষার সমৃদ্ধি ও স্থাপত্য শিল্পের উন্নয়নকে মধ্যযুগের বাংলার রেনেসাঁ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগর রাজ্যেও (১৩৩৬-১৫২৯ খ্রি:) হিন্দু সমাজ কাঠামোর মধ্যে ধর্মীয় সহনশীলতা ছিল এবং শিল্পকলা ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধি ঘটে। এই রাজ্যের শাসকরা ধর্মপ্রবণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন! কিন্তু তাঁরা অন্য ধর্মাবলম্বীদের নির্যাতন করতেন না। রাজা কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৯-১৫২৯ খ্রি:) বিজয়নগরের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসে একজন বিখ্যাত রাজা হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। তিনি নিজেই ছিলেন একজন পণ্ডিত ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। অন্যান্য রাজারাও বিদ্যানুরাগী ছিলেন এবং পণ্ডিত ও কবিদের তাঁরা সমাদর করতেন। রাজারা সংস্কৃত, তেলেগু, তামিল ও কানাড়া ভাষার ও সাহিত্যের বিকাশে আনুকূল্য প্রদর্শন করেন। পণ্ডিতদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন বেদের বিখ্যাত টীকাকার সায়ন ও তাঁর ভাই মাধব। সায়ন দ্বিতীয় হরিহরের মন্ত্রী ছিলেন। মাধবও রাজাদের উপদেষ্টা ছিলেন। বহু পণ্ডিত ও কবি কৃষ্ণদেব রায়ের রাজসভা অলঙ্কৃত করেন। কৃষ্ণদেব রায় নিজে সংস্কৃত ও তেলেগু ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত 'অমুক্তমাল্যদ' একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। স্থাপত্য শিল্পেরও আকর্ষণীয় নিদর্শন পাওয়া যায়। রাজারা বিশাল মন্দির নির্মাণ করেন। কৃষ্ণদেব রায় যে বিখ্যাত 'হাজারা মন্দির' নির্মাণ করেন তাকে শিল্প সমালোচকরা হিন্দু স্থাপত্য শিল্পের নিঁখুত নিদর্শন হিসেবে অভিহিত করেন। 'ভিট্টলস্বামী মন্দিরে'ও চমৎকার স্থাপত্য নিদর্শন পাওয়া যায়। অঙ্কন শিল্পেরও উন্নতি ঘটে। রাজারা বিশেষভাবে সঙ্গীত চর্চায়

উৎসাহ দান করেন। নাট্যশালারও বিকাশ হয়। বিজয়নগরের সাহিত্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে 'দক্ষিণ ভারতীয় সংস্কৃতির একটি মিশ্রিত রূপ' পাওয়া যায়। একে মধ্যযুগের ভারতীয় রেনেসাঁর একটি আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য বলা যায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বাংলা ও বিজয়নগরের কথাই শুধু এখানে আলোচনা করা হলো।

মধ্যযুগে সমগ্র ভারতবর্ষে এক নতুন ধর্মচিন্তার উদ্ভব হয়। ধর্মনির্ভর ঔদার্যবোধ, মানবিকতাবোধ ও যুক্তিশীলতা ভক্তি আন্দোলন ও সুফি আন্দোলনের ফলে শক্তিশালী হয়। হিন্দু ও মুসলমানের নৈকট্য বৃদ্ধি পায়। ধর্মের ক্ষেত্রে উদার মনোভাবের সৃষ্টি হয়। ভক্তি আন্দোলনের ফলে হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম ধর্মের কঠোরতা হ্রাস পায়। ভক্তিতত্ত্ব বিভিন্ন অঞ্চলেব ভাষাতেই সাধকরা জনসাধারণের কাছে ব্যক্ত করেন। তারফলে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্য বিকশিত হয়। ভাবতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হওযাব পূর্বে পঞ্জাবে সুফিবাদ প্রচারিত হয়। বারো শতকের শেষে বিখ্যাত সুফী সাধক শেখ মৈনুদ্দিন চিস্তী আজমীরে বাস কবতেন এবং এখানেই ছিল চিস্তী সুফী সম্প্রদায়ের কেন্দ্র। তেরো শতকে পঞ্জাবে সোহ্‌রাওয়ার্দি সুফী সম্প্রদায়ের প্রভাব বিস্তৃত হয়। পনেরো শতকে ভারতে কাদিরি, শাত্তারি ও নকশবন্দী নামক আরো তিনটি সুফী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়। এখানে উল্লিখিত পাঁচটি সুফী সম্প্রদায় সাধারণভাবে শরিয়ত (অর্থাৎ ইসলামের বিধি) মান্য করলেও, ধর্মীয় আচার আচরণের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল। তবে কালন্দর প্রভৃতি কয়েকটি মুসলিম সম্প্রদায় শরিয়তকে সাধারণভাবে অগ্রাহ্য করেই চলতেন। চিস্তী সাধকরা মানবসেবার ওপরই গুরুত্ব আবোপ করেন। সুফী সাধকদের উদার ব্যবহারে এবং তাঁদের প্রচারিত ইসলামেব সামাজিক সাম্যের বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে হিন্দু সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। সুফী ধর্ম চিন্তার সঙ্গে ভক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দু ধর্ম চিন্তার সংযোগ স্থাপন ভাবতবর্ষে সহনশীলতার পরিমণ্ডল রচনায় সহায়ক হয়। চিস্তী ও শাত্তারি সুফী সাধকরা, সোহ্‌রাওয়ার্দি ধর্মীয় গ্রুপের শেখ জালালউদ্দিন তাবরেজি, কাদিরি ধর্মীয় গ্রুপের মিঞান মীর ও মুল্লাহ্ শাহ্ বাদাকসি উদার দৃষ্টিভঙ্গির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। সুফী ধর্মতত্ত্বের মাধ্যমে ইসলামে ঔদার্যবোধ প্রকাশিত হওয়ায় ভারতেব মতো বহুধর্মীয় দেশের আধ্যাত্মিকতা নতুন রূপ ধারণ করে। ভারতীয় রেনেসাঁর উন্মেষে ধর্মতত্ত্বের এই অবদান উল্লেখযোগ্য।

সুলতানী আমলে হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্য শিল্পের সমন্বয়ে ভারতীয় স্থাপত্য শিল্প নবরূপ ধারণ করে। স্যাব জন মার্শাল এই স্থাপত্য শিল্প সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ইসলামের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানরা বিভিন্ন দেশের শিল্পরীতি আয়ত্ত করে নিজেদের শিল্পরীতিকে উন্নত কবেন। ভারতে আসার আগেই সাবাসিনীয় (Saracenic) স্থাপত্য শিল্প সমৃদ্ধ ছিল। তাঁরা হিন্দু শিল্পীদের আকর্ষণীয় উপাদানগুলি, যথা— দৃঢ়তা (Strength) ও কোমলতা (Grace) আয়ত্ত করেন। এই স্থাপত্য রীতিকে ইন্দো-সারাসিনীয (Indo-Saracenic) বলা হয়। দিল্লীতে এই স্থাপত্য রীতির পূর্ণ ঐশ্বর্য ও বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। কুতুবমিনার হলো মুসলিম স্থাপত্যরীতির উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। ফার্গুসন এই স্তম্ভের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। আলাউদ্দীনের আমলে নিজামউদ্দীন আউলিয়ার সমাধির ওপর নির্মিত মসজিদ এবং আলাই দরওযাজা সৌধ ইসলামি স্থাপত্য রীতির চমৎকার নিদর্শন। গিয়াসউদ্দীন তুঘলুক নির্মিত তুঘলুকাবাদ শহরের স্থাপত্য রীতিও আকর্ষণীয় ছিল। লোদী স্থাপত্য রীতিতে হিন্দু প্রতিভার সংমিশ্রণ হওয়ায় 'প্রাণের ও ভাবের' সঞ্চার ঘটে। এই ধারাটি মুঘল যুগে আরো ব্যাপ্তিলাভ করে।

একই সময়ে কোনো কোনো প্রদেশে বিশিষ্ট শিল্পরীতির উদ্ভব হয়। প্রদেশের শাসনকর্তাদের মধ্যেও অনেক শিল্পানুরাগী ছিলেন। বাংলার গৌড় ও পাণ্ডুয়ার এবং বিজয়নগরের স্থাপত্য শিল্পের ও সংস্কৃতির কথা আগেই বলা হয়েছে। বাংলায় ইট ও পোড়ামাটির কাজের অপূর্ব শিল্প নিদর্শন পাওয়া

যায়। অবশ্য গৌড়ের শিল্প রীতির চেয়ে গুজরাটের রীতি অনেক বেশি উন্নত ছিল। আহম্মদ নগরের জামি মসজিদ ও অন্যান্য সৌধ শিল্পরীতির সুন্দর নিদর্শন হিসেবে গণ্য। গুজরাটের শিল্প রীতিতে হিন্দু প্রভাব ছিল। কিন্তু মালবে ইসলামি রীতির প্রভাবই ছিল বেশি। দিল্লী ও মাণ্ডুর স্থাপত্য রীতির মধ্যে সাদৃশ্য ছিল। উত্তর ভারতের জৌনপুর স্থাপত্য শিল্পের একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল। দাক্ষিণাত্যে ইসলামি শিল্পকলা নিজ বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার চেষ্টা করে। বাহমণী রাজ্যের সামরিক স্থাপত্যে ইউরোপীয় ও পারসিক প্রভাব লক্ষ করা যায়। গুলবর্গা ও বিদরে অনেক মসজিদ ও সমাধিভবন নির্মিত হয়। দৌলতাবাদ দুর্গ মধ্যযুগের ভারতে দুর্গ নির্মাণ পদ্ধতির এক আশ্চর্য নিদর্শন।

উত্তর ভারতে হিন্দু স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় রাজস্থানে। মেবারের রাণা কুম্ভ নির্মিত চিতোরের জয়স্তম্ভের কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি এই জয়স্তম্ভের তিন তলায় ও আট তলায় যথাক্রমে আরবি ভাষায় 'আল্লাহ' নয়বার ও আটবার খোদাই করেন। পারস্পরিক বোঝাপড়ার অনেক দৃষ্টান্তই সুলতানি আমলে পাওয়া যায়। স্থাপত্য শিল্পে তার প্রতিফলন ঘটে। ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দে বোধগয়ায় মহাবোধি মন্দির পুননির্মিত হয়। দুর্ভিক্ষের সময়ে মহম্মদ বিন তুঘলুক যখন রাজধানী দিল্লী থেকে নতুন এক জায়গায় স্থানান্তরিত করেন তখন সংস্কৃত ভাষায় এই কেন্দ্রের নামকরণ করেন 'স্বর্গদুয়ারি'। তিনি তো হিন্দুদের সঙ্গে হোলি খেলে আনন্দ পেতেন এবং যোগীদের সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করতেন। তিনি জৈন সন্ন্যাসীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতেন। ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্য সুলতান ফিরোজ তুঘলুক সমালোচিত হন। কিন্তু তাঁর রাজত্বকালে ১৩৫২ খ্রিস্টাব্দে গয়ায় যে সূর্য মন্দির নির্মিত হয় তাতে সুলতানের নাম সংস্কৃত ভাষায় দুবার খোদিত হয়। হিন্দু শাসকরাও একই প্রকার সহনশীলতার পরিচয় দেন। ১২৪৬ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটের ভেরাওয়াল নামক স্থানে চালুক্য রাজা অর্জুনদেবের পৃষ্ঠপোষকতায় হোরমুজের নুরউদ্দীন ফিরোজ একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। এইসব প্রয়াস সহনশীলতার পরিবেশ গড়ে তোলায় সহায়ক হয়।

সুলতানি আমলে যে ফার্সি ও সংস্কৃত ভাষার পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে তারফলেও নতুন চেতনার উন্মেষ লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মাতৃভাষায় সাহিত্য রচিত হয়। আগেই বলেছি, ধর্মীয় আন্দোলনের ফলে এইসব ভাষায় সাহিত্যের বিকাশের পথ খুলে যায়। এখনো তামিলনাড়ুতে তেরো শতকের ভিল্লিপুত্তুর রচিত মহাভারতের তামিল সংস্করণ 'ভারতম' জনপ্রিয়। এরোপ্রগড তেলেগু ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন। তাছাড়া তিনি মহাভারতের কিছু অংশও রচনা করেন। কানাড়ি ভাষাতেও রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত অনুদিত হয়। কেরালায় চর্তুদশ শতকে রচিত 'রামচরিতম' মালয়ালাম সাহিত্যের সূচনা করে। অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষাতেও রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ রচিত হয় এবং তারফলে সেই সব অঞ্চলের সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। প্রসঙ্গত বাংলা, অসমীয়া, ওড়িয়া ইত্যাদি ভাষার কথা বলা যায়।

সুলতানী আমলে দিল্লীর সুলতানরা এবং প্রদেশের শাসনকর্তারা ফার্সি সাহিত্যের পৃষ্টপোষকতা করেন। এমন কি প্রাদেশিক শাসনকর্তারা অনেকে আঞ্চলিক ভাষার বিকাশেও সাহায্য করেন। ফার্সি ভাষাতে বহু গ্রন্থ রচিত হয়। ফার্সি ভাষায় কয়েকটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয়। ফার্সি ভাষার লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কবি আমীর খসরু (মৃত্যু : ১৩২৫ খ্রি:)। হিন্দু ধর্মের প্রতি চিস্তী ভাবনাকে আমীর খসরু তাঁর কবিতার মাধ্যমে ব্যক্ত করেন। তিনি তাঁর একটি কবিতায় ফার্সি ভাষায় যে কথা বলেন তার বাংলা অনুবাদ করলে এই ভাব ব্যক্ত হয় ঃ 'যদিও ধর্মে হিন্দু আমার মতো নয়, কিন্তু তিনিও আমার মতো একই জিনিসে বিশ্বাস করেন।' 'তোমরা যারা হিন্দুর প্রতিমা-উপাসনা ব্যঙ্গ কর, তারা কিভাবে উপাসনা করে তা থেকে তোমরা শেখ।' অন্য ধর্মের প্রতি চিস্তী সুফী সাধকদের

ঔদার্যবোধ তাঁর কবিতায় পাওয়া যায়। আমীর খসরু নিজে একজন সুফীও ছিলেন। 'নুহ সিপিহ্‌র' নামক গ্রন্থে আমীর খসরু ভারতের ঐতিহাসিক ঐতিহ্য গভীর স্বদেশ হিতৈষণার মনোভাব নিয়ে লেখেন এবং ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির দিকে তিনি নিজের ঐতিহ্যের অংশ হিসেবেই তাকান।

লক্ষণীয় এই, হিন্দুদের রাজনৈতিক প্রাধান্য হ্রাস পেলেও সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য চর্চা অব্যাহত থাকে। রামানুজ, পার্থসারথি মিশ্র, জীব গোস্বামী, জীমূতবাহন, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিতরা সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম, দর্শন, আইন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন। সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সি ভাষাতেও অনুদিত হয়। মুসলমানদের মধ্যে খুবই অল্প কয়েকজন সংস্কৃত ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন। এই যুগে হিন্দী ভাষারও উন্নতি হয়। কবীরের দোঁহাগুলি হিন্দী ভাষায় রচিত। শিখদের ধর্মগ্রন্থ 'গ্রন্থসাহেবে'র বেশির ভাগ অংশ হিন্দী ভাষায় রচিত।

এই সময়ে তুর্কি ও মধ্য এশিয়ার জনগোষ্ঠীর সঙ্গে হিন্দুদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন প্রয়োজনে যোগাযোগের ফলে একটি সাধারণ ভাষার উদ্ভব হয়। প্রথমে এই ভাষাকে বলা হতো 'জবান-ই-হিন্দভী', তারপর বলা হলো উর্দু। উর্দু ছিল মূলত দিল্লী ও মীরাটে কথিত পশ্চিমাঞ্চলীয় হিন্দীর এক আঞ্চলিক রূপ। সৌরসেনী প্রাকৃত হতে এই ভাষার উদ্ভব। ফার্সি ও আরবি শব্দের প্রভাবে উর্দুভাষা নানা বৈশিষ্ট্য লাভ করে। কবি আমীর খসরুই প্রথম উর্দু ভাষাতে কবিতা রচনা করেন। তুর্কি শাসকরা উর্দু ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা করেননি। তাঁরা ফার্সি ভাষারই পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও সমন্বয়ী ধারার উদ্ভব ঘটে। প্রাক্-ইসলামীয় আরব দেশে সঙ্গীত তুলনামূলকভাবে উন্নত ছিল। বাজ্যজয়েব ফলে ইসলামের যখন বিস্তার ঘটে তখন বাইজানটাইন ও ইরানীয় সঙ্গীতেব ওপর প্রাক্-ইসলামীয় আরবীয়-সঙ্গীতের প্রভাব পড়ে। সঙ্গীত বিষয়ক তত্ত্ব ও তাকে অনুষ্ঠানেব মাধ্যমে রূপদানের বিষযে আরবি ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন আল-কিন্দী, আল-ফারাবি ও ইবন সিনা। বারো শতকের শেষে ফার্সি ভাষায় সঙ্গীত সম্বন্ধে দুটো গ্রন্থ রচিত হয়। নৃত্যও একটি শিল্প হিসেবে স্বীকৃত ছিল। বারাণীর বিবরণ থেকে তা জানা যায়। আমীর খসরুর মতে, ভারতীয় সঙ্গীত অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক উচ্চ পর্যায়ের ছিল। উল্লেখ্য এই, আরবদের দ্বারা ইরান জয়ের আগেই পারস্য-আরব এবং ভারতী সঙ্গীতে মিশ্রণ শুরু হয়। সাসানীয় রাজা বাহরাম গুর (৪২১-৪৩৯ খ্রি:) তাঁব রাজ্যে হিন্দুস্তান থেকে দশ হাজার সঙ্গীতজ্ঞ ও নৃত্যশিল্পী এনে কয়েকটি উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁরাই জিপসীদের পূর্বপুরুষ, যাঁরা পরবর্তীকালে বাইজানটাইন ও ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েন। তেরো শতকে বহু হিন্দু সঙ্গীতজ্ঞ ও শিল্পী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। যদিও রাজদরবার থেকে সঙ্গীতজ্ঞদের ভরণপোষণ করা হতো, তাহলেও বহু সঙ্গীতজ্ঞ সুফীদের সেবা করাই পছন্দ করেন। কারণ সুফীরা ছিলেন সঙ্গীতের গুণগ্রাহী পণ্ডিত। বহু বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ সুফী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে আয় করেন ও ধর্মীয় মর্যাদা লাভ করেন। তেরো শতকের প্রারম্ভে সুফী সাধকরা ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীত ও কবিতাকে ফার্সি ভাষায় রচিত সঙ্গীত ও কবিতা থেকে বেশি ফলপ্রসু মনে করেন। অবশ্য পারস্য দেশীয় সঙ্গীত ও কবিতাকে কখনো অবহেলা করা হয়নি। প্রধানত আমীর খসরুর প্রয়াসেই নতুন ধরনের সঙ্গীতের উন্নয়নের জন্য সুযোগ-সুবিধার দুয়ার খুলে যায়। সঙ্গীতের এই ধারাটিকে 'ইন্দো-পারসিয়ান ধারা' বলা হয়। আমীর খসরু কর্ণাটক স্কুলের ধ্রুপদী 'দাক্ষিণাত্য সঙ্গীত' গভীরভাবে অধ্যয়ণ করে এই প্রাচীন ভারতীয় ধারার সঙ্গীতের বিশুদ্ধতা সংরক্ষণ করেন। আমির খসরু উনিশটি সুস্বর সংক্রান্ত রীতির উদ্ভাবন করেন। তারমধ্যে 'খেয়াল', 'তারানা' ও 'কাওল' উল্লেখযোগ্য।

ফিরোজশাহর রাজত্বকালেও ভারতীয় ও পারস্য সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহ অব্যাহত থাকে। গুজরাটের গভর্ণর মালিক আবু রাজা উভয় সঙ্গীতের গুণগ্রাহী ছিলেন। তিনি তাঁর রাজদরবারে বিশিষ্ট

সঙ্গীতজ্ঞদের আমন্ত্রণ করে ভারতীয় ও পারস্য সঙ্গীত সম্বন্ধে আলোচনার ব্যবস্থা করেন। পনেরো ও ষোল শতকের আঞ্চলিক রাজ্যের শাসকরাও সঙ্গীতের মস্তবড়ো পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১৪২০ খ্রিস্টাব্দে রচিত সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ 'সঙ্গীত শিরোমণি' জৌনপুরের ইব্রাহিম শাহ শারকির নামে উৎসর্গিত হয়। হোসায়ন শাহ শারকি (১৪৫৮-১৪৭৯ খ্রি:) একজন সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তিনি সঙ্গীতের স্বরগ্রামের উচ্চতাদির মান, সুর ইত্যাদি বিষয়ে যেসব পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন তা 'হোসায়নি' অথবা 'জৌনপুরি ঘরানা' নামে খ্যাত। তিনি 'খেয়াল'-এরও উন্নতি সাধন করেন। কাশ্মীরের সুলতান জয়নুল আবিদিনও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর উৎসাহে 'সঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থের ওপর টীকা সংকলিত হয়। গোয়ালিয়রের রাজা মান সিংহ টোমার (১৪৫০-১৫২৮ খ্রি:) কেবলমাত্র সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন না, তিনি নিজেও একজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তিনি ধ্রুপদ সঙ্গীতের হিন্দিতে স্বরপরিবর্তন করান। ধ্রুপদের সঙ্গীত সংক্রান্ত ছন্দের সঙ্গে গ্রিক কবিতার ছন্দের ও ল্যাটিন ষড়মাত্রিক কবিতার সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। এই সঙ্গীত-সংক্রান্ত ছন্দের রীতিকে 'চৌতালা' বলা হয়। রাজা মান সিংহ টোমারের অনুপ্রেরণাতেই তাঁর দরবারের সঙ্গীতজ্ঞরা 'রাগ' সঙ্গীতের নিয়মকানুন নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করেন। তাঁদের এই গবেষণার কাজ 'মান কৌতূহল' গ্রন্থে সংকলিত হয়। মান সিংহের সঙ্গীতজ্ঞরা ভারতের অন্যান্য রাজ দরবারে 'রাগ' বিষয়ে তাঁদের ফলাফল প্রচার করেন। বাইজু নামক একজন সঙ্গীতজ্ঞ গুজরাটের বাহাদুর শাহর দরবারে যোগদান করেন। তিনি যে সঙ্গীত রচনা করেন তা তাঁর পৃষ্ঠপোষকের নামে 'বাহাদুরি' বলে উল্লেখ করেন।

পনেরো শতকে ভক্তিমূলক সঙ্গীতের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে। কবীর রচিত সঙ্গীত থেকে একটি ধ্রুপদী রীতির উদ্ভব লক্ষ করা যায়। এই সঙ্গীত 'কবীরাই' নামে উল্লিখিত। সঙ্গীতে আর একটি বিশেষ ধারা হলো 'বৈষ্ণব সঙ্গীত' যা 'বিষ্ণুপদ' বলে পরিচিত। গুরুনানক রচিত স্তবগানেও আর একটি সমন্বয়ী ধারা পাওয়া যায়। তাঁর মুসলমান শিষ্য মারাদোনারও ভক্তিমূলক সঙ্গীতে পারদর্শিতা ছিল। দিল্লীর শেষ সুলতানরা ও মুঘল শাসকরা সঙ্গীতের পৃষ্টপোষকতা করেন। ধ্রুপদী সঙ্গীতের বিকাশে সুলতান সিকন্দরের বিশেষ অবদান ছিল। তাঁর সময়েই 'লাহজাত-ই সিকন্দরী' নামে সঙ্গীতের বিখ্যাত গ্রন্থ রচিত হয়। উল্লেখ্য এই, তেরো শতকের প্রারম্ভ থেকেই সুফীরা তাঁদের সঙ্গীত সভার জন্য ('সামা' বলা হতো) হিন্দী কবিতা রচনা করতে শুরু করেন। পরিমার্জিত হিন্দী সঙ্গীতের সঙ্গে পারস্য দেশীয় শিল্প দক্ষতা মিশ্রিত হওয়ায় ভারতীয় 'সুফী সামা সঙ্গীত' গভীরতা ও নতুন রূপ ধারণ করে। স্থানিক ভাষা আয়ত্ত করায় সুফীরা আধ্যাত্মিক আনন্দ লাভ করেন এবং হিন্দু ভক্তদের ভাবনার অংশীদার হন। তারফলে হিন্দু ভক্ত ও হিন্দী সুফী কবিরা সমস্ত রকম গোঁড়ামি, ভণ্ডামি ও নির্বুদ্ধিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তাঁরা ধর্মান্তরিতার পথে না গিয়ে, পরস্পরের ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগ্রত করতে এবং বিভিন্ন ধর্মমত উপলব্ধি করতে প্রয়াসী হন।

১৫৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রয়াত হওয়া পর্যন্ত ভারতের বিশাল অঞ্চলে আফগান নেতা শের শাহর প্রাধান্য ছিল। তিনি রাস্তাঘাট নির্মাণ করে যোগাযোগের ব্যবস্থা উন্নত করেন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটান। তিনি চারটি সড়ক নির্মাণ করেন : সিন্ধু নদীর কাছে রোটাস থেকে পূর্ববঙ্গে ঢাকার কাছে সোনারগাঁও; আগ্রা থেকে বুরহানপুর; আগ্রা থেকে চিতোর; লাহোর থেকে মুলতান। এইসব সড়কের পাশে বৃক্ষরোপণ ও বিশ্রামগৃহ তৈরি করা হয়। তিনি অভ্যন্তরীণ শুল্ক বাতিল করে একস্থান থেকে অন্যস্থানে জিনিসপত্রের যাতায়াত সহজ করে দেন। তিনি মুদ্রারও সংস্কার করেন। তিনি হিন্দুদের প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করেন এবং সেনাবাহিনীতে বহু হিন্দু নিয়োগ করেন। এই সব ব্যবস্থার মাধ্যমে শের শাহ একটি ঐক্যবদ্ধ সংহত রাষ্ট্র স্থাপনে প্রয়াসী হন। তাঁর আমলে স্থাপত্য

শিল্পেরও উন্নতি ঘটে। সাসারামে শের শাহের 'সমাধিভবন' তাঁর স্থাপত্য শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। শের শাহের প্রবর্তিত ব্যবস্থাকে আরো উন্নত করেন মুঘল সম্রাট আকবর।

দীর্ঘকাল ধরে মুঘল সাম্রাজ্যে শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় থাকায় শিল্পকলার ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটে, ভারতীয় সাংস্কৃতিক জীবন সমৃদ্ধ হয়। বাবর থেকে শাহজাহান পর্যন্ত (১৫২৬-১৬৫৮ খ্রি:) সব কয়জন মুঘল সম্রাটই এই বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আকবরের দরবারে সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে নারী ও পুরুষ উভয়েই ছিলেন। হিন্দু, ইরানি, তুরানি ও কাশ্মীরি সঙ্গীতজ্ঞদের প্রাধান্য ছিল। আবুল ফজলের রচনা থেকে ৩৬ সঙ্গীতজ্ঞের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁদেব মধ্যে দশজন ছিলেন গোয়ালিয়রের। তাঁরা সাতটি সারিতে (rank) বিভক্ত ছিলেন। অন্যতম সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন গোয়ালিয়রের মিঞা তানসেন (১৫৫৫-১৬১০ খ্রি:)। আবুল ফজলের মতে, গত এক হাজার বছরে ভারতে তাঁর মতো সঙ্গীতজ্ঞের আবির্ভাব ঘটেনি। তাঁর প্রবর্তিত 'দীপক রাগ' সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় তাতে চমৎকৃত হতে হয়। সেকালের লোকেরা বিশ্বাস করতেন, তানসেন তাঁর সঙ্গীতের মাধ্যমে বর্ষা ঋতুর বাইরেও বৃষ্টির আগমন ঘটাতে পারেন এবং তাঁর সঙ্গীতের 'রাগ' মোমবাতি প্রজ্জ্বলিত করতে পারে। অবশ্য হিন্দু সঙ্গীতে পারসিক প্রভাবের প্রবর্তন করায় তিনি সমালোচিত হন।

শাহজাহানও দরবারে সঙ্গীত অব্যাহত রাখেন। রাজত্বের প্রথম দশ বছর ঔরঙ্গজেবও সঙ্গীত পছন্দ করেন এবং সঙ্গীতজ্ঞদের পুরস্কৃত করেন। ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ঔরঙ্গজেব সঙ্গীতের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। ১৭১২ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঔরঙ্গজেবের পৌত্র প্রিন্স মুহম্মদ মুইজুদ্দীন জাহান্দর শাহ রাজত্ব করেন। তিনি সঙ্গীত প্রিয় ছিলেন। তাঁর জন্য মির্জা মুহম্মদ ইবন ফাকরুদ্দীন মুহম্মদ সঙ্গীত বিষয়ক বিখ্যাত তত্ত্ব গ্রন্থ 'তুফহাতুল-হিন্দ' রচনা করেন। মুহম্মদ শাহর রাজত্বকালে (১৭১৯-১৭৪৮ খ্রি:) মুঘল সামরিক ও রাজনৈতিক মহিমা দ্রুত অস্তগামী হলেও, সঙ্গীত উচ্চস্তরে উন্নীত হয়। সম্রাট নিজে সঙ্গীতে ও নৃত্যে দক্ষ ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের রাজদরবারেও সঙ্গীত ও নৃত্য সমাদৃত হতো। বিজাপুরের শাসক দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহ নিজে কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁর কবিতাসমূহ 'কিতাব-ই-- ওরাজ' (সংস্কৃত নবরস) গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়। তাঁর এইসব কবিতা বিভিন্ন 'রাগ'-এ পারস্যো-আরবিক পদ্ধতিতে পরিবেশন করা হতো। এই 'রাগ' কে বলা হয়। 'মকম্‌স' (maqams) বা রীতি। পারসো-আরবিক সঙ্গীত বিশেষভাবে বিজয়নগর রাজদরবারের 'দক্ষিণী কর্ণাটক' সঙ্গীতকে প্রভাবিত করে। পনেরো শতকের মধ্যভাগে কল্লিপা রচিত 'সঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থে তার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। বিজয়নগরের বাজা রাম রায়ের মন্ত্রী রামময় লিখিত বিখ্যাত 'স্বরমেলাকালনিধি; (১৫৫০ খ্রি:) গ্রন্থেও তার উল্লেখ আছে।

এই সময়ে স্থাপত্য ও চিত্র শিল্পেও সমৃদ্ধি ঘটে, ভারতীয় ও বিদেশী রীতির সংমিশ্রণ ঘটে। আকবর সচেতন ভাবেই হিন্দু ও মুসলিম রীতির সামঞ্জস্যপূর্ণ সংমিশ্রণ করে ভারতীয় স্থাপত্য রীতির ভিত্তি স্থাপন করেন। স্থাপত্যশিল্প সম্বন্ধে আকবরের নিজস্ব ধারণা ছিল এবং রাজপ্রাসাদ, মসজিদ, সমাধিসৌধ, দুর্গ ইত্যাদির নকশা তিনি নিজেই করেন। আকবর নিজেই একজন স্থপতি ছিলেন। এজন্য তিনি একটি সরকারি পূর্ত বিভাগ স্থাপন করেন এবং তাঁর পরিকল্পনাগুলি রূপ দেবার দায়িত্ব দেন স্থপতি ও ইঞ্জিনীয়ারদের। আগ্রায়, লাহোরে ও এলাহাবাদে আকবর তিনটি মস্তবড়ো দুর্গ নির্মাণ করেন। আগ্রার দুর্গ গঠনে রাজপুতদের দুর্গ গঠন রীতির প্রভাব রয়েছে। এলাহাবাদে হিন্দু রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। আকবরের স্থাপত্য কীর্তির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য হলো ফতেপুর সিক্রিতে নির্মিত তাঁর নতুন রাজধানী। এই মনোরম নগরী নির্মাণ করতে এগারো বছর (১৫৬৯-১৫৮০ খ্রি:) লেগেছিল। ফার্গুসন বলেন, ফতেপুর সিক্রি শহর হলো একজন 'মহান ব্যক্তির মনের প্রতিবিম্ব'। গুজরাট বিজয়ের

স্মরণে আকবর যে 'বুলন্দ দরওয়াজা' নির্মাণ করেন তাকে এক অপূর্ব স্থাপত্য কীর্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। জনসাধারণের সুবিধার জন্য আকবর বহু সরাই নির্মাণ করেন এবং পুকুর ও কুয়ো খনন করেন। তিনি বহু বিদ্যালয় ও উপাসনাগৃহও নির্মাণ করেন। আকবরের রাজত্বকালে অম্বর, বিকানীর, যোধপুর ইত্যাদি স্থানে যেসব রাজপ্রাসাদ নির্মিত হয় তাতে মুঘল প্রভাব পড়ে। এমন কি হিন্দু মন্দির নির্মাণেও মুঘল রীতির প্রভাব লক্ষ করা যায়।

বাবর রচিত আত্মজীবনী 'বাবর নামা' চাঘতাই-তুর্কি ভাষায় লিখিত হয়। এই গ্রন্থ বহু ভাষায় অনুদিত হয় এবং সর্বযুগের সাহিত্য সম্ভারে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত হয়। প্রকৃতি-প্রেমী বাবর ভারতের নানা প্রকার প্রাণীকূল ও উদ্ভিদকূল দেখে আনন্দলাভ করেন এবং তার বিস্তৃত বিবরণ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। এই কারণে বাবরকে ভারতের 'প্রথম প্রাকৃতিক ইতিহাস বিজ্ঞানী' বলা হয়। গোঁড়া মুসলমানরা মনে করেন, ঈশ্বরের সৃজনশীলতা অনুকরণ করে চিত্রশিল্পীরা ঈশ্বর নিন্দার মতো গর্হিত অপরাধ করেন। তাই তাঁরা চিত্র শিল্পের বিরোধিতা করেন। সুতরাং চিত্র শিল্পের ক্ষেত্রে কোনো ধর্মীয় অনুমোদন না থাকলেও শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে ইরানের দীর্ঘকালের ঐতিহ্যগত ধারা ছিল। তেরো শতকে যাযাবর মোঙ্গলদের ইরান অভিযানের ফলে সেখানকার শিল্পে চীনের প্রভাব পড়ে। চৌদ্দ শতকে ইরানের চিত্রশিল্পীরা চীনা প্রাকৃতিক দৃশ্য অনুকরণ করেন। চীনা শিল্পীদের অনুকরণেই ইরানি শিল্পীরা ইতিহাস, মহাকাব্য ও রম্যরচনায় ব্যাখ্যাকর ও শোভাবর্ধক চিত্র আঁকেন। পনেরো শতকে দক্ষিণ ইরানের শিরাজ শিল্পের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। বহু চিত্রশিল্পীরা প্রথমে সেখানে যান। তারপর সেখান থেকে তাঁরা গুজরাট, মালব, জৌনপুর ও দাক্ষিণাত্যের ভারতীয় মুসলিম রাজদরবারে যান। শিরাজি ও ভারতীয় শিল্প পদ্ধতির সংমিশ্রণে ভারতীয় চিত্রশিল্প নতুন রূপ ধারণ করে। 'নিমত-নামা' গ্রন্থকে পার্সো-ইসলামিক চিত্রকলার দৃষ্টান্ত বলা যায়। ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে মালবে এই গ্রন্থের শোভাবর্ধন করা হয়। ইরানিয় চিত্রকলা পদ্ধতির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটে।

বিহজাদ (১৪৫০-১৫৩৬ খ্রি:) হিরাটের সুলতান হোসায়ন মীর্জার তিমুরিদ রাজদরবারের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ছিলেন। তাঁর আঁকা চিত্রে মানুষ ও জীবজন্তু স্বাভাবিকভাবেই প্রতিফলিত হয়। তাঁর শিষ্যরা বিহজাদের অঙ্কন পদ্ধতিকে আরো উন্নত করেন। বিহজাদের চিত্রশিল্পকে কেন্দ্র করে যে ধারাটি বিকশিত হয়, তা উৎকৃষ্ট ধারার প্রতিনিধিত্ব করে। হুমায়ুন যখন ইরানে নির্বাসিতের জীবনযাপন করেন তখন এই ধারার শিল্পীরা তাঁর কাছে এসে সমবেত হন। তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ছিলেন সৈয়দ আলি, মুল্লা আবদুস সামাদ ও মুল্লা দোস্ত মুহম্মদ। হুমায়ুন তাঁর পুত্র আকবরের জন্য আবদুস-সামাদকে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। আকবর চিত্রশিল্প চর্চায় গভীর আনন্দলাভ করেন।

বিখ্যাত আরব্য মহাকাব্য 'হামজা-নামা' ফার্সি ভাষায় অনুদিত হয়। ১৫৬৭ খ্রিস্টাব্দে আকবর এই পুঁথিকে ব্যাখ্যাকর ও শোভাবর্ধক চিত্রে এঁকে রাখার ব্যবস্থা করেন। তারজন্য আকবর সৈয়দ আলি ও আবদুস সামাদের পরিচালনায় একশত শিল্পীকে নিযুক্ত করেন। এই পরিকল্পনা কার্যকর করতে পনেরো বছর লেগেছিল। ভারতীয় শিল্পীরা যাঁরা 'মুঘল স্কুল' স্থাপন করেন তাঁরা 'হামজা-নামা' পুঁথি চিত্রিত করার কাজে যুক্ত থাকায় নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারেন। ষোড়শ শতকের শেষে তাঁরা ভারতীয় শিল্প পদ্ধতির সঙ্গে বিহজাদ স্কুল প্রবর্তিত পদ্ধতির সমন্বয় সাধন করতে সক্ষম হন। বারো খণ্ডে রচিত 'হামজা-নামা' পুঁথির ১,০০৪ পৃষ্ঠা চিত্র শিল্পীদের দ্বারা অঙ্কিত হয়। ভারতে মুঘল চিত্রকলার চর্চায় এই পুঁথিকে এক আকর্ষণীয় গ্রন্থ বলা যায়। আকবরের রাজত্বের দ্বিতীয়ার্ধে চিত্রকলা ভারতীয় বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে 'তুতি-নামা' পুঁথি চিত্রশিল্পীদের দ্বারা অঙ্কিত হয়। তাতে শিল্পীরা গাছপালা, ফুল, জীবজন্তু ও মানুষের ছবি স্পষ্ট করে আঁকেন। মালব ও জৌনপুরের প্রাদেশিক

শাসনকর্তারাও দরবারের শিল্পীদের দ্বারা পুঁথি অঙ্কিত করেন। এইসব তথ্য থেকে বোঝা যায়, চিত্রশিল্প ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। আকবর কর্তৃক পৃষ্ঠপোষকতা প্রদর্শনের ফলে বহু স্থানীয় শিল্পী এসে দরবারে সমবেত হন। আবুল ফজলের রচনা থেকে জানা যায়, তখন সমগ্র পৃথিবীতে তাঁদের সমকক্ষ খুব কম শিল্পীই ছিলেন। ইউরোপের রেনেসাঁ শিল্পীদের সঙ্গে এই সব ভারতীয় শিল্পীদের তুলনামূলক আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ আছে।

আকবর বহু হিন্দু ও মুসলিম শিল্পীদের সাহায্যে 'বাবর-নামা' গ্রন্থ চিত্রিত করে রাখেন। 'পেইনটিংস অব দি বাবরনামা' গ্রন্থ বিশ্ব সভ্যতার এক অমূল্য সম্পদ। আকবরের দরবারের বিখ্যাত শিল্পীর নাম ছিল দসওয়ানথ। তাঁর দক্ষতা লক্ষ করে আকবর ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁকে আবদুস-সামাদের কাছে শিক্ষালাভের জন্য পাঠান। আকবরের নির্দেশে দসওয়ানথ ফার্সি ভাষায় অনুদিত 'মহাভারত' চিত্রিত করেন। 'মহাভারত'-এর ফার্সি সংস্করণের শিরোনাম ছিল 'রজম-নামা' (Razm-nama)। তাঁর মতো আর একজন শিল্পীর নাম ছিল বসওয়ান। আবুল ফজল বলেন, মানুষের প্রতিকৃতি আঁকায় ও অন্যান্য শাখায় বসওয়ান-এর দক্ষতা উল্লেখযোগ্য ছিল। আকবর একশতেরও বেশি শিল্পীকে নিযুক্ত করেন। 'আকবর-নামা' ও ফার্সি ভাষায় অনুদিত 'রামায়ণ', 'নলদমন', 'কালিয়াদমন' ইত্যাদি গ্রন্থের পৃষ্ঠাও শিল্পীদের দ্বারা অঙ্কিত হয়। আকবরের সময়কালের চিত্রশিল্পকে হিন্দু ও মুসলিম শিল্পীদের যৌথ প্রয়াসের ফসল বলা যায়। তৈমুরের রাজত্বকাল থেকে আকবর পর্যন্ত বহু চিত্র সঙ্কলিত করে 'তিমুরিদ অ্যালবাম' রচিত হয়।

জীবনধারার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুঘল ও রাজপুতদের মধ্যে যে সমন্বয় ঘটে তার প্রতিফলন চিত্র শিল্পেও লক্ষ করা যায়। রাজপুত রাজদরবারের শিল্পীরা তাঁদের ঐতিহ্যগত ধারাকে আরো উন্নত করেন। আকবরের রাজত্বকালের শেষ দিকে তাঁর দরবারের শিল্পীরা ইউরোপীয় ক্ষুদ্রকায় চিত্রের সঙ্গে পরিচিত হন। জাহাঙ্গীরের সময়কালের চিত্রশিল্পী আবুল হাসান, মনোহর, বিষুন দাস, গোবর্ধন, মনসুর ও দাওলাত ইউরোপীয়, ভারতীয় ও ইরানীয় শিল্প পদ্ধতির সংমিশ্রণে চিত্রশিল্পকে উন্নত করেন। জাহাঙ্গীরের দরবারের বিখ্যাত শিল্পীরা প্রায় সবাই শাহজাহানের দরবারে ছিলেন। শাহজাহানের সময়কালের বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ছিলেন কল্যাণ দাস, অনুপ ছিতর, রাই অনুপ, মনোহর, মুহম্মদ নাদির সমরকন্দী, মীর হাসিম ও মুহম্মদ ফকরুল্লাহ খান। সম্রাট শাহজাহানের পুত্র দারা শিকোহ ইউরোপীয় শিল্পের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং তাঁর শিল্পীরা ইউরোপীয় শিল্পরীতির দ্বারা প্রভাবিত হন। হিন্দু ও মুসলিম রীতির সামঞ্জস্যপূর্ণ সংমিশ্রণ স্থাপত্য ও চিত্র শিল্পের এক উল্লেখযোগ্য দিক বলা যায়। ইন্দো-পারসিক শিল্প রীতির সমন্বয় মধ্যযুগের ভারতের শিল্পকলার ইতিহাসকে নতুন রূপ দান করে।

উল্লেখ্য এই, ইসলামের গোঁড়া অনুগামীরা চিত্র শিল্পের বিরোধী ছিলেন। স্বভাবতই তাঁরা চিত্র শিল্পের প্রতি আকবরের আগ্রহ ও সম্রাট কর্তৃক শিল্পীদের উৎসাহদান সমালোচনা করেন। তাঁদের সম্বন্ধে সম্রাট আকবরের মনোভাব আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে এইভাবে লিপিবদ্ধ করেন, 'One day at a private party of friends, His majesty, who had confessed on several the pleasure of drawing near him, remarked : 'There are many that hate painting; but such men I dislike. It appears to me as if a painter had quite peculiar means of recognizing God; for a painter in sketching anything that has life, and in devising its limbs, one after the other, must come to feel that he cannot bestow individuality upon his work, and is thus forced to think of God, the giver of life, and will thus increase in knowledge.'

আকবরের দরবারে ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্মের তত্ত্ববিদদের নিয়ে আলোচনা হতো। সেইসব আলোচনায় সম্রাট আগ্রহভরে অংশগ্রহণ করতেন। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে

অজ্ঞতা দূর করবার উদ্দেশ্যে সম্রাট 'মকতবখানা' স্থাপন করে রামায়ণ, মহাভারত, যোগ বশিষ্ঠ ইত্যাদি গ্রন্থ ফার্সি ভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা করেন। আবুল ফজল নিজে ফার্সি ভাষায় অনুদিত 'মহাভারত' গ্রন্থের দীর্ঘ মুখবন্ধ রচনা করেন। আমরা এখনো এই মূল্যবান মুখবন্ধটি বাংলায় অনুবাদের ব্যবস্থা করতে পারিনি। আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। তাছাড়া তিনি হিন্দু ও জৈন দর্শন সম্বন্ধেও এই গ্রন্থে অনেক তথ্য অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি খোলা মনে মুসলমান পাঠকদের হিন্দুদের জ্ঞানচর্চার সঙ্গে পরিচিত হতে বলেন। ধর্মতত্ত্ব নিয়ে যে বিতর্ক রাজদরবারে চলে তাতে আকবরের আধ্যাত্মিক জীবনে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। আকবর বিশ্বাস করেন, সব ধর্মেই কিছু সত্য আছে এবং এই বিষয়ে ইসলামেরই বিশেষ অধিকার আছে তা নয়। তিনি এই কথাও বিশ্বাস করেন, অবিরত আত্ম-সমীক্ষা হলো একটি গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্যায়াম এবং কোনো কাজই প্রগাঢ় যুক্তি ছাড়া করা উচিত নয়। এই ভাবেই সম্রাট তাঁর প্রজাদের ধর্মীয় বিরোধ দূর করতে প্রয়াসী হন। আবুল ফজল রচিত 'আকবর-নামা' গ্রন্থ থেকে এই কথাও জানা যায়, আকবরের দরবারে বিভিন্ন ধর্মের সাধক ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা সমবেত হতেন। দরবারে সকল ধর্মের ভাল উপদেশাবলী স্বীকৃত হয়। তাছাড়া সম্রাট নিখুঁতভাবে সহনশীলতা, 'সুলহ্-ই-কুল' অর্থাৎ 'সকলের সঙ্গে শান্তি' স্থাপনে প্রয়াসী হন। 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থ থেকে এই কথাও জানা যায়, 'Akbar believed that their were sensible men in all religions, and abstemious thinkers and men endowed with miraculous power among all nations. Islam, therefore, possessed in his opinion no superiority over other forms of worship.'

আকবর যে ধরনের রাজতন্ত্র স্থাপন করতে প্রয়াসী হন, তার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করতে হলে আমাদের এগারো শতকের সূচনায় ফিরে তাকাতে হয়। ১০১০ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত ইরানীয় কবি ফিরদৌসীর 'শাহনামা' রচনার কাজ শেষ হয়। এই বিখ্যাত গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি শাসক ও রাজনৈতিক তত্ত্ববিদদের চিন্তাকে এক নতুন দিকে প্রবাহিত করেন। তারফলে ইসলামিক রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। রাজতন্ত্রের আলোচনায় বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বলা হয়, রাজা ততদিনই ঐশ্বরিক আনুকূল্য লাভ করেন যতদিন না তা ঈশ্বর তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেন। এই গ্রন্থে প্রাচীন ইরানের রাজাদের শৌর্য-বীর্যের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। জামসিদ নামে একজন বিখ্যাত রাজা ইরানে ছিলেন। তিনি বলেন, তিনি ঐশ্বরিক অনুগ্রহ লাভ করেছেন। তিনি এই কথাও বিশ্বাস করেন যে, একই সঙ্গে তিনি রাজা ও পুরোহিত। তাঁর দায়িত্ব হলো, দুর্বৃত্তদের দমন করে প্রজাদের রক্ষা করা, আর পাপীদের সৎপথে পরিচালনা করা। সুতরাং ঐশ্বরিক আনুকূল্য লাভের অধিকারী রাজা একজন সুশাসক হিসেবেই বিরাজ করবেন। প্রাচীনকালে ইরানে রাজতন্ত্র সম্বন্ধে এই ধারণাই গুরুত্ব পায়। 'অবেস্তা' ধর্মগ্রন্থেও এই তত্ত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়।

রাজতন্ত্র সম্বন্ধীয় এই তত্ত্ব এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, আবু হামিদ মুহম্মদ অল-ঘাজালির (১০৫৮-১১১১ খ্রি:) মতো গোঁড়াপন্থী পণ্ডিতও তা অগ্রাহ্য করতে পারেননি। আরবি, ফার্সি ও অন্যান্য সূত্র থেকে জানা যায়, এগারো-বারো শতকে রাজার প্রধান কর্তব্য কী, এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত আলোচনা চলে। এই কথা বলা হয়, রাজার প্রধান কর্তব্য হলো ন্যায় বিচার সাধন করে রাজ্যকে সমৃদ্ধশালী করা। এই আলোচনায় অনেকেই অংশ গ্রহণ করলেও যে দুজন পণ্ডিতের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন তাঁরা হলেন নিজামউল-মুলক টুসি (১০১৮-১০৯২ খ্রি:) ও আবু বকর মুহম্মদ বিন অল-ওয়ালিদ অল টুরটুসি (১০৫৯-১১২৭ খ্রি:)।

তৈমুর ও আকবরের রাজত্বকালের মধ্যে রাজনৈতিক তত্ত্বের দুটো প্রধান ধারা দানা বাঁধে—একটি হলো ঘাজালিয়ান এবং অন্যটি হলো দার্শনিক। দ্বিতীয় ধারাটিকে আরো সজীব করেন দার্শনিক ইবন

সিনার (৯৮০-১০৩৭ খ্রি:) বিখ্যাত টীকাকার খাজা নাসিরউদ্দীন টুসি (১২০১-১২৭৪ খ্রি:)। ঘাজালিয়ান তত্ত্বের সঙ্গে নাসিরিয়ান রাজনৈতিক দর্শনের সমন্বয় সাধন করেন আবুল ফজল (১৫৫১-১৬০২ খ্রি:)। সম্রাট আকবরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই আবুল ফজল বিভিন্ন ধর্মের প্রজা যাতে শান্তিতে বসবাস করতে পারে তার জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে যুক্তিসঙ্গত রূপদানে উদ্যোগী হন এবং রাজনৈতিক আদর্শের বিভিন্ন ধারাকে সমন্বয় করে নবরূপ দান করেন। তিনি ন্যায়নীতির ওপর রাজতন্ত্রকে স্থাপন করেন। সকলের পক্ষে উপযোগী করে প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে গড়ে তোলার ফলে অ-মুসলমানরাও মুঘল শাসনকে মেনে নেয়। প্রশাসন ব্যবস্থায় দায়িত্বশীল পদেও হিন্দুরা অধিষ্ঠিত হন। মুঘল সম্রাটরা নিজেদের 'ভারতীয়' বলে মনে করেন এবং তাঁরা 'হিন্দুস্থানের সম্রাট' এই পদবী ধারণ করে গর্ববোধ করেন। আর তাঁদেরই প্রয়াসে ভারতে 'একটি সুসংহত প্রশাসনিক ঐতিহ্য' গড়ে তোলা সম্ভব হয়। রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যেই আকবর 'সুলহ্-ই-কুল' বা সর্বজনীন ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতি অবলম্বন করেন। ইবন আল-আরাবির (১১৬৫-১২৪০ খ্রি:) দর্শনের অনুগামীরা যে ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনের সূত্রপাত করেন তার উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় বিরোধ দূর করা। আকবর এই আদর্শকে তাঁর রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করেন। তাঁর বিশ্বজনীন নীতির ভিত্তিও হলো এই আদর্শ। তাকে অবলম্বন করে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এই কারণে বাইরে থেকে যে সব মুসলমান তখন ভারতে আসতেন তাঁরা এই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা লক্ষ্য করে মনে করতেন, 'এখানে ইসলামের তরবারি চালনা করছে হিন্দুরা'। স্বৈরতন্ত্রকে শাসনতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থার মধ্যে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হওয়ায় মুঘল সম্রাটদের কর্তৃত্ব দীর্ঘকাল অব্যাহত থাকে। এই কথা মনে রাখা দরকার, আকবরের সময়কালে ইউরোপে ও ভারতের বাইরে মুসলিম দেশগুলিতে ধর্মীয় গোঁড়ামি ও অসহিষ্ণুতা প্রবল ছিল, কিন্তু মুঘল সম্রাটের অধীনে ভারতের চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। স্বৈরতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে ভারতীয় রাজতন্ত্রের এই রূপটি ভারতীয় রেনেসাঁর বৈশিষ্ট্য আলোচনায় যথেষ্ট গুরুত্ব পেতে পারে।

সম্রাট আকবর জ্ঞান চর্চার যে চিত্রটি তৈরি করেন তাকে আরো ব্যাপ্ত করেন যুবরাজ দারা শিকোহ (১৬১৫-১৬৫৯ খ্রি:)। দারা শিকোহ ছিলেন একজন সাংস্কৃতিক গুণসম্পন্ন পণ্ডিত, দক্ষ সৈনিক, প্রেমিক এবং চারুকলার বিশিষ্ট বিচারক। তাঁর চরিত্রে ছিল বুদ্ধিগত ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির এক চমৎকার মিশ্রণ। উল্লেখ্য এই, ষোল ও সতেরো শতকের ভারতে একজন সংস্কৃতিবান মুসলমান, আরবি, ফার্সি, কিছুটা সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষা আয়ত্ত করে সাহিত্যের যা কিছু মহৎ ও মূল্যবান জিনিস তা আয়ত্ত করতেন। এইভাবে নৈতিক উৎকর্ষযুক্ত মননের অধিকারী হতেন। দারা শিকোহ ছিলেন এই রকম একজন সংস্কৃতিবান মুসলমান। তাঁর আয়ত্তের মধ্যে ছিল এমন চার-পাঁচ জাতির সংগৃহীত জ্ঞান আহরণ করে তিনি নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেন।

দারা শিকোহ ছিলেন একজন প্রকৃত সুফী। তিনি মানবজাতির ঐক্যের জন্য সত্যের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অন্যান্য ধর্ম অধ্যয়ন করেন। বিভিন্ন ধর্মের দেশ ভারতে সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্ম যাতে বিভেদের প্রাচীর গড়তে না পারে, ধর্ম যাতে ভালোবাসার প্রীতির সম্পর্ক গড়তে সহায়ক হয়, এই উদ্দেশ্যে দারা শিকোহ ধর্মতত্ত্বের চর্চায় মিলনের উপকরণগুলি উদ্ধারে সচেষ্ট হন। তিনি নয়খানি গ্রন্থ রচনা করে, সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করে ফার্সি ভাষায় উপনিষদ ও ভাগবৎ গীতা অনুবাদ করেন, পারস্য দেশীয় কবিদের জীবনী সংকলন করেন, 'অ্যালবাম'-এর ভূমিকা লেখেন এবং সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ বহু পত্রও লেখেন। তিনি নিজে কবি হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেন। 'ইকসির-ই-আজম' নামে তিনি একটি 'দিওয়ান' রচনা করেন। এই কাব্য গ্রন্থে 'তৌহিদ' সম্বন্ধে বহু তথ্য আছে।

চারুকলার অনুরাগী হিসেবে দারা শিকোহর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তাছাড়া তিনি ছিলেন সুপরিচিত ক্যালিগ্রাফার। তাঁর সুন্দর হস্তাক্ষর অনেক গ্রন্থাগারে সযত্নে সংরক্ষিত আছে। চিত্রশিল্পের টেকনিক ও মূল্য সম্বন্ধে একজন দক্ষ বিচারকও তিনি ছিলেন। যে 'অ্যালবাম' বা 'আলেখ্য-কুঞ্চিকা' তিনি তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী নাদিরা বেগমকে উপহার দেন তাতে দারা শিকোহ্ নিজের হাতে লেখেন এবং এই 'অ্যালবাম' মুঘল শিল্পকারে মূল্যবান সম্পদ হিসেবে সমাদৃত। পার্সি ব্রাউন তাঁর ভারতীয় চিত্র শিল্প সম্বন্ধীয় গ্রন্থে দারা শিকোহর 'অ্যালবাম'-এর শিল্প সৌন্দর্য সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন।

১৬৪০-১৬৪১ খ্রিস্টাব্দ থেকেই দারা শিকোহ্ বিভিন্ন ধর্মের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। তিনি খ্রীস্টধর্ম ও হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে গভীরভাবে জ্ঞান সঞ্চয় করেন। 'সাফিনাত-উল-আউলিয়া' (১৬৪০ খ্রি:) গ্রন্থে দারা শিকোহ্ ইসলাম ধর্মের সাধকদের বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। 'সাকিনাত-উল-আউলিয়া' (১৬৪২-১৬৪৩ খ্রি:) গ্রন্থে তিনি মিয়ান মীর নামক বিখ্যাত সাধকের জীবনী আলোচনা করেন। 'রিসালা-ই-হক-নামা' (১৬৪৫ খ্রি:) নামক ত্রিশ পাতার সুফী পুস্তকে তিনি 'সত্যের পরিধি' নিয়ে আলোচনা করেন। এই সময়ে তাঁর নিকট 'তৌহিদ' বা একেশ্বরবাদ এবং 'ইবফান' বা পবিত্র জ্ঞান স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। দারা শিকোহ্ প্রচলিত ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গ্রন্থসমূহ পড়ে খুশি হতে পারেননি। অনেক সময় ভাবাবেশে সুফী সাধকেরা যেসব কথা বলেন সেইসব বাণী তিনি 'সাথীয়াত বা হাসানাত উল-আরিফিন' (১৬৫২ খ্রি:) গ্রন্থে সঙ্কলিত করেন। এই সব সত্য কথা তাঁর নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। কিন্তু এই সঙ্কলিত গ্রন্থখানি ইসলামের গোঁড়া তত্ত্ব লঙ্ঘন করে।

দারা শিকোহ্ দেখতে পান 'একেশ্বরবাদ' তত্ত্ব 'বেদ' ও 'উপনিয়ত' বা 'উপনিষদ' গ্রন্থে রয়েছে। এই বিষয় নিয়ে বাবা লাল বৈরাগী নামে পাঞ্জাবের এক বিখ্যাত হিন্দু সাধকের সঙ্গে তাঁর গভীর আলোচনা হয়। তাঁদের আলাপ-আলোচনা সবটাই 'মুকালিমা-ই-দাবা শিকোহ্ উয়া বাবালাল' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। হিন্দু সাধক বাবা লাল বলতেন, 'সত্য কোনো একটি ধর্মের একচেটিয়া অধিকারে নেই।' 'সাথীয়াত বা হাসানাত-উল-আরিফিন' গ্রন্থে দারা শিকোহ্ বাবালাল-এর এই বাণী উদ্ধৃত করেন। 'মাজমা-উল-বাহরাইন' বা 'দুই সমুদ্রের মহামিলন' (১৬৫৪-৫৫ খ্রি:) গ্রন্থে দারা শিকোহ্ খুব স্পষ্ট করেই বলেন, সত্য উপলব্ধির উচ্চস্তরে হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের সমন্বয় সাধন করার উদ্দেশ্যেই তিনি এই গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি এই দুই ধর্মের মিলনের সূত্রগুলি উন্মোচন করেন। ১৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে দারা শিকোহ্ 'যোগবাশিষ্ঠ' ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি উপনিষদের পঞ্চাশটি অধ্যায় সংস্কৃত থেকে ফার্সি গদ্যে 'সির্‌র-ই-আকবর' এই শিরোনামায় অনুবাদ করেন। 'ভগবৎগীতা' গ্রন্থখানিও তিনি সংস্কৃত থেকে ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করেন। তিনি 'বেদ'-কে প্রত্যাদেশ মূলক গ্রন্থ (revealed book) বলেন। তিনি এই কথাও বলেন, 'বেদ'-এ কোরান গ্রন্থের সন্দেহাতীত নিগূঢ় সমস্যা সমূহের বিশদ ব্যাখ্যা রয়েছে। এই ভাবে তাঁর রচনার ফলে বাহ্যিক পার্থক্য সত্ত্বেও দুই ধর্মের অন্তর্নিহিত ঐক্যেব ভাবটি স্পষ্ট হয়। কিন্তু গোঁড়া মুসলমান নেতৃবৃন্দ দারা শিকোহর উদার-যুক্তি ধর্মীয় ধর্ম ব্যাখ্যার বিরোধিতা করেন। তাঁরা দারা শিকোহকে স্বধর্মত্যাগী বলেন।

মধ্যযুগের এক অনন্য পণ্ডিত হলেন দারা শিকোহ্। তাঁর রচনাবলী ধর্মনির্ভর ঔদার্যবোধের, মানবিতাবোধের ও যুক্তিশীলতার পথকেই প্রশস্ত করে। এক অর্থে দারা শিকোহ্ ছিলেন আধুনিক এবং তাঁর ভাবনাচিন্তার মধ্যে সর্বজনীনতা লক্ষ করা যায়। উপনিষদের মর্মবাণী তাঁর মাধ্যমেই সুদূর ইউরোপে প্রচারিত হয়। আধুনিকতার ও ভাবনাচিন্তার সর্বজনীনতার যে ভিতটি স্থাপন করেন দারা শিকোহ্, পরবর্তীকালে রাজা রামমোহন রায় তাকেই আরো সুস্পষ্ট করে তোলেন।

বোধিসত্ত্ব অথবা বোধিসত্ত্ব?

গৌরীশ্বর ভট্টাচার্য

সম্প্রতি জার্মান অধ্যাপক ডিটার শ্লিংলোফ্ (Dieter Schlingloff) তিন খণ্ডে তাঁর গভীর গবেষণাপূর্ণ 'অজন্তা' গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। অধ্যাপক শ্লিংলোফ্-এর দায়িত্বপূর্ণ এবং সচেতন পাণ্ডিত্য সম্পর্কে সুধীমহলে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এই গ্রন্থে তিনি বরাবর বোধিসত্ব শব্দটি একটি 'ত' দিয়ে ব্যবহার করায় আমি খবব পেলাম যে পাশ্চাত্যের পণ্ডিত মহলে বেশ বিভ্রান্তিব সৃষ্টি হয়েছে। ভারতবর্ষেও নিশ্চয়ই তা হবে। তবে বইটি জার্মান ভাষায় লেখা বলে হয়তো দেরি হবে। (দ্রষ্টব্য : অজন্তা : হ্যান্ডবুক্ দে মানারাইএন্ : হ্যান্ডবুক্ অব্ পেইন্টিংস, হারাস্পোভিট্জ্ ভেরনাগ্)।

এর আগে অবশ্য অধ্যাপক শ্লিংলোফ্ ইংবাজিতে লেখা তাঁর 'অজন্তা' গ্রন্থে এইভাবেই বোধিসত্ব শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

শ্লিংলোফ্ মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধ পুঁথিব পাঠোদ্ধার ও সম্পাদনা করেছেন। এই পুঁথিগুলি সংস্কৃত? (বৌদ্ধসংস্কৃত)-এ ও গুপ্ত-ব্রাহ্মীতে লেখা। এই পুঁথিগুলিতে সর্বত্র 'বোধিসত্ব' এই বানান রয়েছে, কখনও বোধিসত্ত্ব নয়। শুধু শ্লিংলোফ্ নন, অন্য খ্যাত জার্মান এ্যাপিগ্রাফিস্ট ও সংস্কৃতজ্ঞ, অধ্যাপক অস্কার ফন্ হিনউবার (Oskar Von Hinuber) ও 'বোধিসত্ব' শব্দটি একটি ত দিয়ে লেখেন।

ভারতবর্ষের পণ্ডিতেরা কিন্তু সব সময় 'বোধিসত্ত্ব' শব্দটি দু'টি ত দিয়ে লেখেন। বোধহয় সংস্কৃতে 'সত্ত্ব' শব্দটি দু'টি ত দিয়ে লেখা হয় বলে। অবশ্য বেশ গণ্ডগোল পাকিয়ে গেছেন বিখ্যাত সংস্কৃত-ইংরাজি ডিক্শনারির রচয়িতা মনিয়ার মানয়ার-উইলিয়ামস্। তিনি 'বোধিসত্ত্ব' শব্দটি দু'টি ত দিয়েই লিখেছেন (পৃষ্ঠা ৭৩৪-এ), যদিও 'বোধিসত্বাংশ' ও 'বোধিসত্বাবদান-কল্পলতা' একটি ত দিয়েই লিখেছেন, কিন্তু তার গুরুত্ব উপলব্ধি করেননি।

কিন্তু মারাত্মক অপরাধ করেছেন ফ্রাংলিন্ এজ্গারটন্ (Franklin Edgarton)। তিনি বুদ্ধিষ্ট হাইব্রিড্ স্যানস্ক্রিট গ্রামার ও ডিক্শনাবিতে (Buddhist Hybrid Sanskrit Grammar and Dictionary) বহুবার 'বোধিসত্ত্ব' শব্দ এই বানানেই ব্যবহার করেছেন (পৃষ্ঠা ৪০৩), আর অত্যন্ত অসাবধানতাবশত যে সব বৌদ্ধগ্রন্থের নাম করেছেন সেগুলিতেও 'বোধিসত্ত্ব' ব্যবহার করেছেন, যা উচিৎ হয়নি।

এ্যাপিগ্রাফির ক্ষেত্রে বিখ্যাত এ্যাপিগ্রাফিষ্ট এবং সংস্কৃতজ্ঞ ল্যুডারস্ সাহেব (Heinich Lüders) বেশ গণ্ডগোল পাকিয়ে গেছেন। ব্রাহ্মণী অনুশাসনগুলির তালিকায় (A List of Brahmi Inscriptions) তিনি 'বোধিসত্ব' পাঠ করে তাকে 'বোধিসত্ত্ব' এ শুদ্ধ করেছেন (৬৮৫নং, ৯১৮নং)। কিন্তু তাঁর ইনডেক্স (Index)-এ 'বোধিসচ' ও 'বোধিসত্ব'-এর টাইটেল দিয়েছেন 'বোধিসত্ত্ব'। এরপর অধ্যাপক জানার্ট (Janert) সম্পাদিত তাঁর মথুরা অনুশাসনে (মথুরা ইন্সক্রিপসনস্, ১৯৬১) তিনি 'বোধিসত্ব'র পাঠ 'বোধিসত্ত্ব' বলে শুদ্ধ করেননি (পৃষ্ঠা ১১৬) তবে

ইংরেজি অনুবাদে 'বোধিসত্ত্ব' (১৬৬ পৃষ্ঠা)। ল্যুডার্স তাঁর মথুরা ইনস্ক্রিপসনস্-এ 'সত্ব' শব্দটি 'সত্ত্ব' বলে শুদ্ধ করেননি (পৃষ্ঠা ৬৫, ৭৪ ইত্যাদি)।

আমার গুরু প্রখ্যাত এ্যাপিগ্রাফিস্ট দীনেশ চন্দ্র সরকার (ডা. সরকার) 'সত্ব' শব্দটি প্রাকৃত ভেবে সর্বত্র 'সত্ত্ব' বলে সংশোধন করেছেন। তিনি কুষাণ অনুশাসনগুলির ভাষার সর্বত্র সংস্কৃত করেছেন এবং সর্বত্র 'বোধিসত্ব' 'বোধিসত্ত্ব' হিসেবে সংশোধিত করেছেন। এই অনুশাসনগুলির ভাষা তাঁর মতে সংস্কৃত প্রভাবান্বিত প্রাকৃত। তাঁর বহুপ্রচলিত গ্রন্থ, সিলেক্ট ইন্স্ক্রিপসন্স্ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৬, ১৩৭ ইত্যাদি। খরোষ্ঠী অনুশাসনগুলির ভাষাকে উনি প্রাকৃত প্রভাবাপন্ন সংস্কৃত বলে বলেছেন এবং সেখানেও সর্বসত্বসং শুদ্ধ করে সর্বসত্ত্বানাং লিখেছেন (পৃষ্ঠা ১৪০)। মথুরা অনুশাসনে (পৃষ্ঠা ১৪৬) 'বোধিসত্বং' ও 'সর্বসত্বনং' 'বোধিসত্ত্বং' ও 'সর্বসত্ত্বানাং' করেছেন।

ডা. সরকার সর্বত্র অনুশাসনগুলিতে 'সত্ব' ও 'তত্ব', সত্ত্ব ও 'তত্ত্ব' বলে সংশোধন করেছেন।

কিন্তু অত্যন্ত সচেতন জার্মান মহিলা পণ্ডিত, গ্রিট্লি ফন্ মিত্তের বালনার (Gritli Von Mitter Wallner) 'বোধিসত্ব' এই বানানই ব্যবহার করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় থিও দামষ্টিগ্ট্ (Th. Domsteegt) তাঁর গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ, এ্যাপিগ্রাফিক্যাল্ হাইব্রিড্ স্যানস্ক্রিট (Epigrphical Hybrid Sanskrit etc., 1978)-এ সর্বত্র 'বোধিসত্ত্ব' এই বানানই ব্যবহার করেছেন, যেটা এই ধরনের বিশিষ্ট গ্রন্থে অসংগত হয়েছে। অবশ্য তিনি মন্তব্য করেছেন (পৃষ্ঠা ১৫৮) যে মথুরার মিড্ল ইন্দো এরিয়ান্ (MIA) ডায়ালেক্ট-এর গবেষণায় এই অনুসন্ধান গুরুত্বপূর্ণ।

বিহার-বাংলার পাল অনুশাসনে 'বোধিসত্ব' এই বানানই ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন দেবপালদেবের মুংগের তাম্রশাসনে 'বোধিসত্ব' ইব সৌগতং পদং (গৌড়লেনমালা: পৃষ্ঠা ৩৭)। আশ্চর্যের বিষয়, অক্ষয় কুমার মৈত্রের বাংলা অনুবাদে 'বোধিসত্ব' এই বানানই ব্যবহার করেছেন (পৃষ্ঠা ৪৩)। বীরদেবের ঘোষরাবাঁ অনুশাসনে 'সত্ব' 'তত্ব' এই বানান ব্যবহার করা হয়েছে (গৌড়লেনমালা, পৃষ্ঠা ৪৬), অক্ষয় মৈত্রেয় ভুল করে করে 'তত্ত্ব' পড়েছেন) এবং বাপাদিত্য প্রস্তরলিপিতে (১ম মহীপালদেবের ১১ রাজ্য বৎসরের) 'সর্বসত্বরাশের্' ব্যবহার হয়েছে (পৃষ্ঠা ১০৩)। মহেন্দ্রপালের জগজীবনপুর বা জগজ্জীবনপুর তাম্রশাসনে 'বোধিসত্ব' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে দুইবার (দ্রষ্টব্য, এ্যাপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা ৪২, পৃষ্ঠা)।

অশোক চন্দ্রদেবের বোধগয়া অনুশাসনে (লক্ষ্মণ সেন সংবৎ ৭৪ = আ. ১২৫৬ খ্রিস্টাব্দ) কিন্তু এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। 'বোধিসত্ত্ব' (পংক্তি ৪) এবং 'শকনসত্ত্ব' (পংক্তি ৬) এই বানান ব্যবহার করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য : এ্যাপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা ১২, পৃষ্ঠা)। এর কারণ সম্ভবত লিপিকারের অজ্ঞতা কিংবা বিহারের ঐ অঞ্চলে এই বানানের ব্যবহার।

এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে বৌদ্ধ সংস্কৃত পুঁথিগুলির দৃষ্টান্ত। ভারতবর্ষে বৌদ্ধ সাহিত্য বিশেষজ্ঞরা বৌদ্ধগ্রন্থ সম্পাদনাকালীন তাঁদের দায়িত্ব পালনের কথা ভাবেননি। পুঁথিতে নির্দিষ্টভাবে 'বোধিসত্ব' এই বানান থাকা সত্ত্বেও তাঁরা 'বোধিসত্ত্ব' দুই ত দিয়ে ব্যবহার করেছেন। পি এন বৈদ্য সম্পাদিত এবং বহুল প্রচারিত গ্রন্থগুলির এই দুর্দশা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে আর্যশূর-এর জাতক মালার। ওঁ নমঃ শ্রীসর্ববুদ্ধ বোধিসত্ত্বেভ্যঃ, অথবা বোধিসত্ত্বঃ কিলায়ং ভগবান ইত্যাদি।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এর ব্যতিক্রম হচ্ছেন পণ্ডিত বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ। ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দে মধ্য এশিয়ার প্রজ্ঞা পারমিতা'র অংশবিশেষ সম্পাদনার সময় তিনি পুঁথির দেওয়া বানান 'বোধিসত্ব'ই ব্যবহার করেছেন। এই পুঁথির ভাষাকে তিনি সংস্কৃত বলেছেন এবং লিপিকে আপরাইট গুপ্ত ক্যালিগ্রাফি (Upright Gupta Calligraphy)। (দ্রষ্টব্যঃ Memoir of the Arch. Survey of India, No. 32)।

সম্প্রতি জার্মানিতে দুই বিশেষজ্ঞ, লোরে সান্ডার (Lore Sander)-এর এর্নস্ট বাল্‌ডস্মিথ্‌ (Ernst Waldschmidth) তুরফান সংগ্রহের সংস্কৃত পুঁথির সম্পাদনা করার সময় সর্বত্র পুঁথিতে লেখা 'বোধিসত্ব' ও 'মহাসত্ব' এই বানানই ব্যবহার করেছেন। শুদ্ধ (?) করে 'বোধিসত্ত্ব' ও 'মহাসত্ত্ব' ব্যবহার করার প্রয়োজন বোধ করেননি। এই পুঁথির লিপিকে লোরে সান্ডার 'মধ্য এশিয়ার গুপ্ত লিপির ধরনের ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীর লিপি' বলে বর্ণনা করেছেন (দ্রষ্টব্য : Lore Sander and Ernst Waldschmidth : Sanskrit handschriften an dem Turfan funden, Part IV, Wisboden 1980)।

আমার দৃঢ়ধারণা যে বিখ্যাত 'সাধনমাসা'র পুঁথিতে সর্বত্র 'বোধিসত্ব' এই বানানই রয়েছে যাকে বিনয়তোষ ভট্টাচার্য 'বোধিসত্ত্ব' বলে শুদ্ধ করে পড়েছেন যার কোনো দরকার ছিল না। বিনয়তোষ ভট্টাচার্য আরও অন্যান্য ভারতীয় পণ্ডিতদের মতো সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেননি।

বৌদ্ধ মিশ্রসংস্কৃত

(*দিব্যাবদান* অবলম্বনে)

জ্যোতিভূষণ চাকী

গৌতম বুদ্ধের জন্ম খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত যুগের বিস্তার বৈদিক যুগের আবির্ভাবকাল পর্যন্ত। পৌরাণিক ও তার পরবর্তী যুগেও বৌদ্ধ দর্শন ও বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রভাব লক্ষ করা যায়। বুদ্ধদেব কোন্ ভাষায় শিষ্যদের উপদেশ দিয়েছিলেন তা বিতর্কের বিষয়। তবে, অধিকাংশ পণ্ডিতের মত, তিনি সংস্কৃত জানলেও লৌকিক পালি ভাষাতেই উপদেশ দান করেছেন। এই লৌকিক পালিকে অনেকসময়ে মিশ্রপালি বলা হয়েছে প্রাকৃতের প্রভাবের জন্যে। যে-বিপুল বৌদ্ধ সাহিত্য সংগৃহীত হয়েছে তা প্রধানত সংস্কৃত ও মিশ্রসংস্কৃত। এই মিশ্রসংস্কৃতকে বৌদ্ধ সংস্কৃত বা মিশ্র বৌদ্ধ সংস্কৃত বলা হয়েছে। এই ভাষায় সংস্কৃত প্রাধান্য নিয়ে থাকলেও তা অনেকক্ষেত্রেই অপাণিনীয়। এ-ভাষার 'মিশ্র' আখ্যা এইজন্যেই। স্বীকৃত সংস্কৃতের সঙ্গে এই ভাষার তফাত প্রধানত শব্দসম্ভারে, শব্দরূপ ও ধাতুরূপে এবং মূল সংস্কৃতের বিকৃতিতে। ভাষাবিদ ফ্রাংকলিন এডগার্টন তাঁর গবেষণা-গ্রন্থ মিশ্রসংস্কৃতের ব্যাকরণে এই ভাষার বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর এই গ্রন্থে ভাষা-বিশ্লেষণের কিছু ত্রুটি থাকলেও তা বিতর্কিত। মূলত এই গ্রন্থটি অবলম্বন করেই গবেষকেরা এই মিশ্র বৌদ্ধ সংস্কৃতে লেখা সাহিত্যের অনেক ভাষাগত বৈচিত্র্যের সন্ধান পেয়েছেন।

আমরা *দিব্যাবদান* গ্রন্থটি অবলম্বনে এই মিশ্রতার পরিচয় দেবার চেষ্টা করব। অবদান-শীর্ষক রচনা বৌদ্ধ সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। খ্রিস্টীয় অব্দের প্রথম দিকে এগুলি রচিত। *দিব্যাবদান* এই অবদান-সাহিত্যেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। খাঁটি সংস্কৃতের সঙ্গে অপাণিনীয় বা অসংস্কৃত প্রয়োগ এই কাব্যে প্রত্যক্ষ। আমরা ১. ব্যাকরণ ২. বাগ্‌ভঙ্গি ৩. গাথা ও ৪. শব্দসম্ভার—এই চারটি বিভাগে এর প্রয়োগবৈচিত্র্য আলোচনা করব।

১. ব্যাকরণ

(ক) ধাতুরূপ : আত্মনেপদ, পরস্মৈপদ ও গণ বিভাগে অনিয়ম প্রায়ই দেখা যায়; যেমন, বর্ততি < বর্ততে, বর্তামি < বর্তে।

স্বার্থে ণিচ্-এর বহুল প্রয়োগ; যেমন, আগময় < আগচ্ছ।

ঈক্ষ্ ধাতু আত্মনেপদে প্রযুক্ত। তাই, প্রেক্ষতি < প্রেক্ষতে—যঃ প্রেক্ষতি দুঃখম (১৩৮.২৮)। √গম্-এর আত্মনেপদী ব্যবহার—গচ্ছস্ব < গচ্ছ : কথয়তি স্থাপয়িত্বা গচ্ছস্বেতি (৫৫.২৫)। এই রকমেরই বদস্ব < বদ: এবং সর্বকালং বদস্ব নমো বুদ্ধায় (৬১.১৪-১৫)। সনন্ত √জ্ঞা আত্মনেপদ, কিন্তু এখানে পরস্মৈপদ : অদ্য জিজ্ঞাস্যামি < জিজ্ঞাস্যে (১৮৮.১৩)।

ভিদ্যতে এবং ভিদ্যতি একই শ্লোকে প্রযুক্ত। দুরন্যস্তো ভিদ্যতে মন্ত্রঃ প্রীতির্ভিদ্যতি লোভতঃ (১৭.২৩)। √ভক্ষ্ চুরাদিগণীয়। কিন্তু এখানে ভ্বা দিগণীয় হিসেবে ব্যবহৃত : আর্য ভক্ষত্বামপি তাবৎ (১৪৭.১২)। রূপে রূপান্তর : দদস্ব < দৎস্ব (২১২.১৪)।

(খ) প্রত্যয় : √রুদ্ : রুদিতুম্ < রোদিতুম্।

পরা-√জি : পরাজয়িতুম্ < পরাজেতুম্ (১৭৬.২৫)।

√অর্দ্ : অর্দিয়মান < অর্দ্যমান।

এখানে ইয়-সন্নিবেশ লক্ষণীয়। 'গৃহীত্বা'র জায়গায় সর্বত্র 'গৃহ্য' (ধনুর্গৃহ্য)। ণিজন্ত বা প্রযোজক রূপের ব্যবহার সর্বত্রই লক্ষণীয়।

'করোতি'র জায়গায় কারয়তি : রাজ্যং কারয়তি (৩৭.২৯)।
এইরকম, 'প্রসূতা'র জায়গায় প্রসবাপিতা : সা প্রসবাপিতা (৪২৭.১০)।

'উপ্যতে'র জায়গায় বাপয়তে : যাদৃশং বাপয়তে বীজম্ (৩৩২.৩)।

একটি গাথায় ণমুল্ (অম্) একটি অদ্ভুত প্রয়োগ দেখুন :

যে মাং নিরীক্ষম্ জনয়ন্তি তুষ্টিম্ (২৬৭.২)।

এখানে 'নিরীক্ষ্য' পদটির জায়গায় 'নিরীক্ষম্' হয়েছে।

'খাদ্যে ন' 'ভোজ্যে ন'—এ-দুটি পদের জায়গায় দেখা যাচ্ছে, 'খাদনীয়-ভোজনীয়েন' (১৭৬.১৬)। বিশেষ্যের সঙ্গে অনীয়-প্রত্যয়যোগে শব্দগঠন কৌতূহলোদ্দীপক :

সার্থবাহস্য ভোজনীয়েন স্বহস্তম্ সন্তর্পয়তি (৬৮.৩০)।

বিভিন্ন অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় 'ক' এসেছে :

পঞ্চক, জীবক, স্নিগ্ধক, ভাবক, বুভুক্ষিতক, দুঃখিতক, বৃত্তক ইত্যাদি।

তদ্ধিত হিসেবে 'ল'-এর প্রয়োগও দেখা যায় :

পঙ্ক + ল = পঙ্কল > পঙ্কলিকা (৪২৮.৬)।

এই ইকা-প্রত্যয় ক্ষুদ্রতাবাচক। বিশেষ্যের সঙ্গে স্বার্থে 'তা' : ধর্ম অর্থে ধর্মতা, জ্ঞান অর্থে জ্ঞানতা, কারুণ্য অর্থে কারুণ্যতা। তেমনই : খেদতা, তৃপ্তিতা ইত্যাদি।

সন্ধি ॥

১. সন্ধিদ্বিত্ব : সঃ + এষ = স এষ > সৈষ।
সঃ + ইদানীম্ = স ইদানীম্ > সেদানীম্

২. বিসর্গলোপ : স্রোতঃ + আপত্তি = স্রোতাপত্তি (১৩৯.২৯)।
মনঃ + আপ = মনাপ (৪৬.২০)।

এগুলোকেও সন্ধিদ্বিত্বেরই উদাহরণ বলা যায়।

৩. স্বরবর্ণের আগে অনুস্বার : কিম্ অর্থে > কিং অর্থে।

লিঙ্গ ॥

'মৃত্যু' শব্দটিকে *দিব্যাবদান*-এ ক্লীবলিঙ্গে ধরা হয়েছে, তাই 'মৃত্যোঃ'র পরিবর্তে পাচ্ছি 'মৃত্যুনঃ'।
'বর্ষ' শব্দটিকে পুংলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ দু-লিঙ্গেই ব্যবহার করা হয়েছে :

দ্বাদশ বর্ষা অতিক্রান্তাঃ (৯.১৬)।

পিতুঃ দ্বাদশা বর্ষাণি কালং গতস্য (১০.৭)।

'বিধি' পুংলিঙ্গ, কিন্তু এখানে দেখি স্ত্রীলিঙ্গ হিসেবে—

স চেদ্ এতাং বিধিং নানতিষ্ঠতি (৬৫.২৪)।

পুরুষ ও ক্রিয়ায় গরমিল

অহং স্যাৎ (৬৯.৬)।

অহং বাসবগ্রামকে ব্রাহ্মণী আসীৎ (৮,১২)। ইত্যাদি

'মা' অব্যয়ের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার

(১) 'পাছে' অর্থে : মা অধর্মেন রাজ্যং কারয়, মা নরকপরায়ণো ভবিষ্যসি (৩৬.৩)।

(২) প্রশ্ন করতে : মাসি তৃষিতো বুভুক্ষিতো বা (৬.১)—তুমি তৃষ্ণার্ত বা ক্ষুধার্ত নও তো? এইভাবে সন্দেহ, ভয়, অনুগ্রহ, দয়া ইত্যাদি বোঝাতে 'মা' অব্যয়ের প্রয়োগ দেখা যায়। বলা বাহুল্য, শুদ্ধ সংস্কৃতে 'মা' অব্যয়টি শুধু নিষেধার্থেই প্রযোজ্য।

বিভক্তি॥

বিভক্তির ক্ষেত্রে একটি বৈশিষ্ট্যই উল্লেখ করব। শুদ্ধ সংস্কৃতে ভাবে সপ্তমী সুপরিজ্ঞাত কিন্তু এখানে ঈপ্সিত সপ্তমীর জায়গায় প্রথমা বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে :

মম স্বামী ন পরিভুক্তে কথং অহং পরিভুক্ষ্যে (৮৩.৬-৭)

—আমার স্বামী অভুক্ত থাকতে আমি কী করে খাই? (শুদ্ধ সংস্কৃতে এখানে স্বামিনি ঈপ্সিত)

বাগ্‌ভঙ্গি

(১) শব্দবর্জন :

কিম্ অভবৎ তস্য

এই বাক্যটি দাঁড়াচ্ছে, 'কিং তস্য?' এখানে 'অভবৎ' শব্দটি বর্জিত হয়েছে।

তস্য মনসি এতদ্ অভবৎ

এর জায়গায় 'তস্য এতদ্ অভবৎ'। এখানে 'মনসি' বর্জিত।

জীবিতাৎ ব্যবরোপিতা > ব্যবরোপিতা

এখানে 'জীবিতাৎ' বর্জিত।

(২) কোনো প্রশ্নের উত্তরে কর্তা, কর্ম ইত্যাদি অনুল্লিখিত :

দৃষ্টান্তে আনন্দ অয়ং গোবৃষঃ? দৃষ্টোভদন্ত (৮৭.১৭)।

সমস্ত প্রশ্নোত্তরেই এই সংক্ষেপণ দেখা যায়।

(৩) কোনো বালক জন্মগ্রহণ করেছে, এই আনন্দসংবাদ দিতে বালককে বিশেষিত করা হবে নানান বিশেষণে। যেমন,

দারক জাতঃ, অভিরূপ দর্শনীয়ঃ প্রাসাদিকো গৌরাঃ কনকবর্ণঃ ছত্রাকারশিরাঃ

তেমনই, 'গৃহপতি' অথবা 'সার্থবাহঃ' এইভাবেই বিশেষিত হন (৫.২-৩)। এতে বোঝা যায়, একটি বালককে বা গৃহপতিকে অথবা সার্থবাহকে তখনকার মানুষ কেমন দেখলে খুশি হতেন। আর 'বুদ্ধ' স্বয়ং কোনো বাক্যে এলে তো কথাই নেই, বিশেষণের আতিশয্য ঘটবেই। এই বিশেষণগুলি সচরাচর দ্বাত্রিংশৎমহাপুরুষলক্ষণযুক্ত, সূর্যরশ্মিসমপ্রভ ইত্যাদি।

সমাস ব্যবহার॥

সাধারণত বড়ো সমাস এড়ানোই হয়। তবে, ২২ ও ৩৮ নম্বর কাহিনিদুটিতে সমাসবাহুল্য দেখা যায়।

'গঙ্গানদী' এই সমাসবদ্ধ পদটি হয়ে উঠছে 'নদীগঙ্গা'। 'তূষ্ণীম্ভাবেন' শব্দে দেখি 'ম' লোপ—'তূষ্ণীভাবেন'। 'নির্মম' শব্দের জায়গায় দেখি 'অমম' : কিং চাপি তে মনুষ্যা অমমা অপরিগ্রহাঃ (১৩৩.১৪)।

পাণিনিসিদ্ধ 'সূর্যাচন্দ্রমসৌ' এখানে হয়েছে 'সূর্যচন্দ্রমসৌ' : ইমৌ সূর্যচন্দ্রমসৌ ভাসতঃ (৯৭.৩২)।

বাগ্‌বিধি॥

যত্রতত্র বিশিষ্টার্থক বাগ্‌গুচ্ছ রচনার মাধুর্য বাড়িয়েছে। যেমন, লিপ্যাম্ উপন্যস্তঃ (অক্ষরজ্ঞানের পাঠ দেওয়া হচ্ছে এমন) কালধর্মেন যুক্তাঃ বা, কালংগতঃ বা, কালংকরোতি (প্রয়াত হয়েছে)।

অলংকার॥

অলংকার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপমাত্মক।

জঙ্গমম্ ইব পর্বতম্
ত্রিভুবনপ্রদীপম্
তৃষ্ণাগলবদ্ধানাম্ (তৃষ্ণারূপ আগলে বদ্ধ)

'ব্যতিবেক'-এর সন্ধানও মেলে। যেমন,

চন্দ্রস্য প্রভা নিষ্প্রভীকৃতা

'অর্থান্তরন্যাস'-এর ব্যবহারও লক্ষণীয়। যেমন,

বলশ্রেষ্ঠা হি বাজানঃ
বহুকিল্বিষকারিনো হি রাজানঃ
অল্পঃ শূরঃ বহবঃ কাতরাঃ (বীর অল্পই, ভীরুই বেশি)

সম্বোধন॥

সম্বোধন পদ হিসেবে 'আর্য' 'ভদ্রমুখ' ইত্যাদির সঙ্গে 'মার্ষ' শব্দটির প্রয়োগ চোখে পড়ে। 'মার্ষ' সম্ভবত 'মারিষ' শব্দেব সম্প্রকর্ষ। বুদ্ধ অথবা প্রখ্যাত বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সম্বোধন 'ভদন্ত'।

গাথা

গাথা দু-রকমের ১) গল্পেরই অঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত ২) গল্পের নীতি হিসেবে ব্যবহৃত।

গাথার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

(১) স্ববসন্ধিবর্জন · যেমন, অদ্য ইব < অদ্যৈব (৮৪.১৮), সার্থবাহে অনুত্ত রে (৩০৬.৬)।

(২) একই গাথার পুনরাবৃত্তি : যেম·

ন প্রণশ্যন্ত কর্মাণি...

তেমনই, সর্বেক্ষয়ান্তা নিচয়াঃ

অনেক গাথাই *চাণক্যশ্লোক, পঞ্চতন্ত্র* বা *মহাভারত*-এর অন্তর্গত। গল্পের শুরুতে কোনো গাথার ব্যবহার হয়নি। ব্যতিক্রম, পাংশু প্রদানাবদান (২৬ নং)

অনেকসময়ে যেখানে দুটি গাথা সেখা‍ে প্রথমটি প্রশ্ন, দ্বিতীয়টি তার উত্তর। যেমন,

চরতঃ পিণ্ডপাতম্ হি কাশ্যপস্য মহাত্মনঃ।
কুত্রাসৌ মোদতে নারী কাশ্যপাচা মদ্যায়িকা॥ (৫২.২২)

এটি ইন্দ্রের জিজ্ঞাসা। উত্তর দিচ্ছেন স্বয়ং বুদ্ধ —

তুষিতা নাম তে দেবা সর্বকাম সমৃদ্ধয়াঃ।
যত্রাসৌ মোদতে নারী কাশ্যপাচা মদ্যায়িকা॥ (৫২.২৫)

অনেকসময়ে প্রশ্নোত্তর মালার মতো গাঁথা৲

কিম্ দুঃখং দারিদ্র্যম্
কিম্ দুঃখতরম্ তদেব দারিদ্র্যম্
মরণসমানং দারিদ্র্য (১৮৩.৭-৮)।

দুঃখ কী?—দারিদ্র্য
দুঃখতর কী?—দারিদ্র্য
মৃত্যুতুল্য কী?—দারিদ্র্য।

শব্দসম্ভার

দিব্যাবদান-এ ব্যবহৃত শব্দসম্ভারকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে :

১. মা ধ্রুপদি সংস্কৃতি অর্থে ব্যবহৃত, যেমন—বল্লরী (লতা), অহিতুণ্ডিক (সাপুড়ে), শকল (মাছের আঁশ)।

২. যা প্রকৃতি-প্রত্যয়ের অর্থ ছাড়িয়ে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত, অর্থাৎ যোগরূঢ়, যেমন : নির্দেশ্য (ভৃত্য), সপ্তক (সপ্তাহ)।
ব্যাখ্যা : 'নির্দেশ্য' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—যা আদেশ পালন করে; যোগরূঢ় অর্থ—ভৃত্য। তেমনই, 'সপ্তক' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—সাতটি জিনিসের সমবায়; কিন্তু, শব্দটি 'সাতটি দিনের সমবায়' এই অর্থে যোগরূঢ়।

৩. যা প্রকৃতি-প্রত্যয়জাত অর্থে আদৌ ব্যবহার না হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নার্থে প্রযুক্ত, যেমন : অপীড়ক (মাল্য), অনন্তর্য (পাপ), অভিনিবেশ (কুসংস্কার), সন্ততি (অনুভূতি)।

৪. যা পরিভাষা হিসেবে গৃহীত। অভিজ্ঞা (উচ্চতর জ্ঞান), আভাস্বর (দ্বিতীয় ধ্যানভূমির দেবতা)।

৫. আলংকারিক শব্দ যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্মিত—যেমন : অবলোকনক (জানালা), কাকাভিলীনক (পুরাতন গৃহ), পণ্যপরিণীতা (রক্ষিতা), লঘুত্থানতা (স্বাস্থ্য বা সুস্থতা), নিবেশন (বিবাহ), আত্মমন (আনন্দিত)।

৬. কৌতুকশব্দ—যেমন, কুতুককুঞ্চক (কৃপণ)।

৭. অনুকারশব্দ যা অন্য শব্দের অনুকরণে গঠিত—যেমন : 'মেধাবী' 'মায়াবী' ইত্যাদি বিন্-প্রত্যয়জাত শব্দের অনুকরণে কৃতাবী (কৃত + আবিন্)।

দিব্যাবদান-কে প্রাচীন চম্পূ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। কারণ, এই অবদানের রচনা গদ্যপদ্যময়ী। 'এবং ময়া শ্রুতম্' অনেক কাহিনি শুরু হয়েছে এইভাবে। তাতে বোঝা যায়, কাহিনিগুলি লোকপরম্পরাগত। ফ্রাংকলিন এডগার্টনের অভিধানে সব শব্দ নেই, তাই এই অভিধান হাতে নিয়েও *দিব্যাবদান*-যাত্রা বেশ দুরূহ। আমি মোটামুটিভাবে এই অবদানের মিশ্রভাষার কিছু পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা করলাম। সূক্ষ্মতর অধ্যয়নে আরও অনেক রহস্যই উদ্‌ঘাটিত হতে পারে।

বৈদিক দীক্ষা : অনার্য প্রভাব

দীধিতি বিশ্বাস

দীক্ষা শব্দটির পরিচিত অর্থ হলো মন্ত্রোপদেশ, অর্থাৎ দীক্ষার মধ্য দিয়ে গুরুর কাছ থেকে শিষ্য কোনো একটি বিশেষ মন্ত্র গ্রহণ করেন আজীবন পালন করার শপথ নিয়ে। কিন্তু ভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শব্দটির অর্থের প্রসারণ ঘটেছে আর তার প্রয়োগের ক্ষেত্রও হয়েছে প্রসারিত। তাই ধর্মীয় তাৎপর্য ছাড়াও, যে কোনো কাজে সুনিশ্চিতভাবে ব্রতী হওয়াকেও দীক্ষা বলা হয়। যেমন, সৈন্যরা দেশরক্ষার কাজে দীক্ষিত হয়েছেন ইত্যাদি। তবে বর্তমান নিবন্ধের 'দীক্ষা' শব্দটির তাৎপর্য একটু স্বতন্ত্র। বৈদিক আচারে দীক্ষা হলো সোমযাগ সম্পাদনকারী যজমানের দীক্ষা। অর্থাৎ যে ব্যক্তি সোমযাগ করতে মনঃস্থ করতেন তিনি সোমযাগের সুষ্ঠু সম্পাদনের জন্য এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কয়েকটি নিয়ম পালনের শপথ গ্রহণ করতেন। সোমযাগে এই দীক্ষা গ্রহণের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দীক্ষা সংক্রান্ত এই অনুষ্ঠানের বর্ণনা পাওয়া যায় কয়েকটি বৈদিক গ্রন্থে। এদের মধ্যে আছে তৈত্তিরীয় সংহিতা (৬.১.১-৪), ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (১.১), কৌষীতকি ব্রাহ্মণ (৮.১-৪) এবং শতপথ ব্রাহ্মণ (৩.১.১.১-২.২.৩০)। এছাড়া পরবর্তী কালের শ্রৌতসূত্র গ্রন্থেও দীক্ষার বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু বর্তমান নিবন্ধের সমীক্ষা এই মূল বৈদিক গ্রন্থগুলির আলোচনার মধ্যেই সীমিত থাকবে।

সোমযাগ বৈদিক জীবনে ধর্মীয় জীবনচর্যায় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যজ্ঞ। এই যজ্ঞ একদিনেই করা যেত, আবার একবছর ধরে বা একহাজার বছর ধরেও করা যেত। বলা বাহুল্য, একহাজার বছরের যজ্ঞ কতটা বাস্তবসম্মত তা ভাবতে হবে। আসলে কতদিন ধরে যজ্ঞ হবে তা নির্ভর করে যজমানের ইচ্ছা, সামর্থ ও প্রয়োজনের ওপর। যজ্ঞ যতদিনেরই হোক না কেন যজমানকে যজ্ঞের জন্য প্রথমে দীক্ষিত হতে হবে। আর এই দীক্ষায় উপদিষ্ট নিয়ম সোমযাগ শেষ হওয়া পর্যন্তই পালন করতে হয়। বর্তমানের ধর্মীয় দীক্ষার যেমন গুরুর উপদেশ সারা জীবন পালন করা হয় বৈদিক দীক্ষার তা নয়। তাই একই ব্যক্তি যখন পরবর্তীকালে আবার সোমযাগ করেন তখন তাকে আবার দীক্ষিত হতে হয়। সোমযাগ শুরু হওয়ার চারদিন আগের থেকেই যজ্ঞের আয়োজন ও আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যেত আর তার প্রথম দিনই থাকত দীক্ষা গ্রহণের অনুষ্ঠানটি। উপরে উল্লিখিত চারটি উৎস গ্রন্থ থেকে দীক্ষার যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তার একটি রূপরেখা এখানে দেওয়া যেতে পারে। এই চারটি গ্রন্থের কিছু পারস্পরিক মত পার্থক্যও এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়।

দীক্ষা গ্রহণের দিন চুল, দাড়ি, নখ প্রভৃতি কেটে যজমান স্নান করবেন এবং একটি পরিষ্কার শ্বেত বস্ত্র পরে একটি যজ্ঞ করবেন। এই যজ্ঞের নাম দীক্ষণীয়েষ্টি। এই যজ্ঞে অগ্নি-বিষ্ণু এই যুগল দেবতার উদ্দেশে একটি পুরোডাশ এগারোটি ছোট ছোট মাটির খাপড়ায় সেঁকে আহুতি দিতে হতো। এই মাটির খাপড়াগুলিকে বৈদিক গ্রন্থে 'কপাল' বলা হয়েছে। পুরোডাশ হলো চালের বাটা দিয়ে তৈরি একরকমের পিঠে। এই ধরনের ইষ্টিযাগ বৈদিক ধর্মীয় জীবনে খুবই পরিচিত। কিন্তু দীক্ষার অনুষ্ঠানটি এখানেই শেষ হয় না। এরপর তাকে দিয়ে আরো কয়েকটি কাজ করানো হতো। যেমন, তাকে নবনীত বা মাখন

মাখানো হতো। চোখে কাজল পরানো হতো, দেহে দর্ভগুচ্ছ বুলিয়ে তাকে পরিশুদ্ধ করা হতো। তারপর তার শ্বেতবস্ত্রের ওপর একটি কৃষ্ণাজিন পরিয়ে দেওয়া হতো। তারপর যজমান হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ করে 'প্রাচীনবংশশালা' নামে একটি নির্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ করতেন। এই ঘরটি আগেই তৈরি করে রাখা হতো। শতপথ ব্রাহ্মণে (৩.২.১.১৬) আরও বলা হয়েছে যে যজমানের মাথাটি ঢেকে দিতে হবে। এই ব্রাহ্মণ গ্রন্থটি এখানে পাঁচটি ঘৃতাহুতিরও বিধানও দিয়েছে (৩.৩.১.৪)। এই আহুতিগুলির রাহস্যিক (mystic) তাৎপর্য নিয়ে পরে আলোচনা করা হবে। সূর্যাস্ত পর্যন্ত যজমান মৌনব্রত অবলম্বন করতেন ও সূর্যাস্তের পর স্নান করতেন। দীক্ষিত যজমানকে যজ্ঞ সমাপ্তি পর্যন্ত সত্য কথা বলতে হতো, তার আহার্য ছিল শুধু দুধ—তাও নির্দিষ্ট পরিমাণে। শুধু সোমযাগের দিন তিনি প্রসাদের মতো আহুতি দ্রব্যের কিছু অংশবিশেষ আহার করতে পারতেন। যজমানের পালনীয় এই অনুষ্ঠানগুলিকে দীক্ষাসংস্কার বলা হয়।

প্রসঙ্গত বলা ভালো যে বৈদিকযজ্ঞের তিনটি উপাদান ছিল—দ্রব্য, দেবতা ও ত্যাগ বা উৎসর্গ (দ্রব্যং দেবতা ত্যাগঃ-কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র ১/২/২) অর্থাৎ দেবতার উদ্দেশে দ্রব্য উৎসর্গ করাই হলো যজ্ঞ। কিন্তু সোমযাগের দীক্ষানুষ্ঠানে দেখা যায় যে যজ্ঞ ছাড়াও যজমানের এই যে দীক্ষাসংস্কার হতো তা কিন্তু যজ্ঞের এই প্রথাগত উপাদান অর্থাৎ দ্রব্য-দেবতা-ত্যাগের থেকে স্বতন্ত্র। প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে এই দীক্ষা সংস্কারগুলির মধ্যে প্রতীকধর্ম আরোপিত হয়েছে। বৈদিক ভাবনা অনুসারে দীক্ষা যজমানকে নবজন্ম দান করে। সদ্যোজাত শিশুর মতো নিষ্পাপ হতে হবে যজমানকে। তাই যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাস্তবে একটি শিশু জন্মগ্রহণ করে সেই প্রক্রিয়াগুলিকে দীক্ষাসংস্কারের মাধ্যমে এক ধরনের অভিনয়ের সাহায্যে উপস্থাপন করা হতো। তাই এই দীক্ষা সংস্কারগুলি ছিল প্রতীকধর্মী। যেমন, যজমানকে জল দিয়ে স্নান করানো রেতঃসেকের মতো। যজমান ভ্রূণস্বরূপ, যে শ্বেতবস্ত্র তিনি পরিধান করতেন তা ভ্রূণের উল্ব (caul), কৃষ্ণাজিনটি জরায়ু এবং প্রাচীনবংশশালা হলো মাতৃগর্ভ। ভ্রূণ যেমন মাতৃজঠরে অবস্থান করে মুষ্টিবদ্ধ অবস্থায়, যজমান সেইরকম ভাবে প্রাচীন বংশশালায় অবস্থান করেন এবং মুষ্টিবদ্ধ হয়েই স্নানের জন্য নির্গত হন। দীক্ষা বা তৎসংশ্লিষ্ট এই অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে কোনো অবৈদিক প্রভাব পড়েছে কিনা তা নিয়ে চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে।

প্রথমেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই অনুষ্ঠানের দেবতা। দীক্ষণীয়েষ্টির প্রধান যজ্ঞের দেবতার নাম অগ্নি-বিষ্ণু। বৈদিক দেবতাদের মধ্যে যুগল দেবতার স্তুতি দেখা যায়। যেমন, মিত্রাবরুণ, ইন্দ্রাগ্নি, অশ্বিদ্বয় ইত্যাদি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে ঋগ্‌বেদের কোনো মন্ত্রে একই সঙ্গে অগ্নি ও বিষ্ণুর স্তুতি নেই। এই বিষয়টি যাস্কাচার্যের (খ্রি.পূ. ৭০০) দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি পরিষ্কার বলেছেন 'আগ্নাবৈষ্ণবং হবির্ন ত্বৃক্ দাশতয়ীষু বিদ্যতে' অর্থাৎ অগ্নি-বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে আহুতি নিবেদিত হয়। কিন্তু এই যুগ্মদেবতার কোনো মন্ত্র দাশতয়ী বা ঋগ্‌বেদে নেই। আমাদের প্রশ্ন জাগে যে সোমযাগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈদিক অনুষ্ঠান, সেই যাগের দীক্ষা অনুষ্ঠানে এমন দেবতাযুগলের উদ্দেশে হবিঃ নিবেদিত হচ্ছে কেন যে দেবতাদের উদ্দেশে মন্ত্র রচনার ঐতিহ্য ঋগ্‌বেদে নেই? এর সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দুটি।

প্রথমত, মন্ত্রটি ঋগ্‌বেদের এমন কোনো শাখায় ছিল যা যাস্কের সময়ই হারিয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ আচরণটি থাকলেও মন্ত্র হারিয়ে গিয়েছে। আর হয়তো সেই শাখাটির অন্তর্গত ছিল ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, কারণ এই ব্রাহ্মণগ্রন্থে মন্ত্রটির প্রথম পাদের উল্লেখ আছে মাত্র। অর্থাৎ মন্ত্রটি এই ব্রাহ্মণের অনুগামীদের কাছে এতই পরিচিত যে সম্পূর্ণ মন্ত্রটি পাঠের কোনো প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করেননি। মন্ত্রটির পূর্ণাঙ্গ উদ্ধৃতি পাওয়া যায় আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্র নামে একটি পরবর্তী গ্রন্থে।

দ্বিতীয়ত, দীক্ষা বা দীক্ষা সংস্কার সোমযাগে একটি পরবর্তী সংযোজন যা কোনো অনার্য আচারের বৈদিকায়নের ফলশ্রুতি। এই সম্ভাবনাটি আরো দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড়ায় যখন আমরা দীক্ষা শব্দটির

প্রাচীনত্বের সন্ধান করি অর্থাৎ শব্দটির প্রাচীনতম প্রসঙ্গ কোথায় আছে, শব্দটির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কোনো বিশেষ তাৎপর্য ব্যক্ত হয়েছে কি না ইত্যাদি অনুসন্ধান করি। এই অনুসন্ধানের ফলে দীক্ষার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়।

প্রথমেই উল্লেখ করা যায় যে দীক্ষা শব্দটির কোনো প্রসঙ্গ বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্‌বেদসংহিতায় নেই। সোমযাগ বৈদিক ধর্মচর্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। সেই যজ্ঞের সূচনা ঘটে দীক্ষণীয়েষ্টি বা যজমানের দীক্ষা সংস্কারের মধ্য দিয়ে। কিন্তু দীক্ষা শব্দটির সম্বন্ধে ঋগ্‌বেদের নীরবতা এবং সেখানে অগ্নি-বিষ্ণুর যুগ্মস্তুতির অনুপস্থিতি উভয়ই বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এখানে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন ওঠে যে আদৌ ঋক সংহিতার সংকলনের সময় দীক্ষার প্রচলন ছিল কিনা, অথবা সংকলনকর্তারা দীক্ষার বা তৎসংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানেব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন কি না।

বৈদিক সাহিত্যের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ অথর্ববেদ সংহিতা। ভাষাপ্রয়োগ, ছন্দ ও ভৌগোলিক বিবরণের ভিত্তিতে এই গ্রন্থটি ঋক্‌সংহিতার উত্তরকালীন হলেও বিষয়ের নিরিখে এই গ্রন্থের কিছু অংশ খুবই প্রাচীন, প্রায় ঋক্‌সংহিতার সমসাময়িক বলে মনে করা হয়। অথর্ববেদ সংহিতার মধ্যে দীক্ষা শব্দটির একাধিকবার সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। এই উল্লেখ যজ্ঞবহির্ভূত প্রসঙ্গে। দীক্ষার প্রশংসা করে এখানে বলা হয়েছে যে দীক্ষাই ধরণীকে ধারণ করে (১২.৫ ৩)। অন্যত্র বলা হয়েছে ঋষিরা মঙ্গল কামনা কবে দীক্ষা ও তপস্যার সেবায় উপবেশন করলেন আর তখন উদ্‌ভূত হলো রাষ্ট্র, বল, ওজস্ ইত্যাদি।

ভদ্রমিচ্ছন্ত ঋষয়ঃ স্বর্বিদস্তপো দীক্ষামুপনিষেদুরগ্রে।
ততো রাষ্ট্রং বলমোজশ্চ জাতং তদস্মৈ দেবা উপসংনমন্তু।। (১৯.৪১.১)

দীক্ষাকে অথর্ববেদে যে অতি উচ্চ মহিমায় স্থাপন করা হয়েছিল সেই সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে অথর্ববেদের বৈশিষ্ট্য হলো অবৈদিক বা লোকসংস্কৃতির সঙ্গে তার সংযোগ। প্রাচীন গ্রন্থ ঋক্‌সংহিতায় দীক্ষার অনুল্লেখ এবং অথর্ববেদ সংহিতায় দীক্ষার ভূয়সী প্রশংসা— এই দুটি ঘটনা যুক্তির নিরিখে বিচার করলে দীক্ষাকে একটি অবৈদিক তথা লোকসংস্কৃতির অঙ্গ বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে।

সংহিতা গ্রন্থের মধ্যে তৈত্তিরীয় সংহিতাতেও দীক্ষা বা দীক্ষনীয়েষ্টির বর্ণনা আছে। কিন্তু বলা বাহুল্য যে এই গ্রন্থটি বৈদিক যজ্ঞাদির বর্ণনা সম্বলিত এবং ঋক্‌সংহিতার উত্তরকালীন। এই গ্রন্থে দীক্ষা সংস্কারকে দার্শনিক দৃষ্টিতেও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কৃষ্ণাজিনকে ব্রহ্মার সঙ্গে একাত্ম করে তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হয়েছে কৃষ্ণাজিনের দ্বারা যজমানকে দীক্ষিত করার অর্থ হলো যজমানকে ব্রহ্মার সঙ্গে মিলিত করা— কৃষ্ণাজিনেন দীক্ষয়তি ব্রহ্মণো বা এতদ্‌রূপং যৎকৃষ্ণাজিনং ব্রহ্মণৈবৈনং দীক্ষয়তি... (৬.১.৩.২)।

সংহিতারও পরে এসেছে ব্রাহ্মণ সাহিত্য। রচনাকালের দিক থেকে ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলির পৌর্বাপর্য থাকলেও তারা যে সংহিতার উত্তরযুগের রচনা তা নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। দীক্ষার রাহস্যিক (mystic) দিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলি। যে তিনটি ব্রাহ্মণ গ্রন্থে দীক্ষার প্রসঙ্গ আছে তাদের মধ্যে ঋগ্‌বেদের কৌষীতকি ব্রাহ্মণ প্রাচীনতম[১]। এখানে (৭.৩) দীক্ষার মহিমা কীর্তন করে বলা হয়েছে যে, দীক্ষিত ব্যক্তি অগ্নির মতো ক্ষমতাসম্পন্ন। তাই দীক্ষিত ব্যক্তিকে নাম ধরে কেউ সম্বোধন করেন না। উপরন্তু এই ব্যক্তি যদি তাঁর শত্রুর নাম উল্লেখ করেন তবে সেই শত্রু তৎক্ষণাৎ নিহত হন। শুধু তাই নয় দীক্ষিত ব্যক্তি যা বলেন তাই সত্য হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দীক্ষাকে

সত্য ও ঋত-র সমমর্যাদায় স্থাপন করা হয়েছে। ঋগ্বেদের এই ব্রাহ্মণটি অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের। এই তিনটি ব্রাহ্মণের মধ্যে শতপথ ব্রাহ্মণ সর্বাপেক্ষা নবীন। এই গ্রন্থটিও দীক্ষার মধ্যে রাহস্যিক গুরুত্ব আরোপ করেছে।

আমরা আগেই বলেছি যে দীক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্য হলো যজমানকে শোধিত ও সুসংস্কৃত করা। প্রাচীন বংশশালায় যজমানের প্রবেশের সময় পাঁচটি আহুতি প্রদানের বিধান দেওয়া আছে শতপথ ব্রাহ্মণ (৩.১.৪.১) এবং কৌষীতকি ব্রাহ্মণে (৭.৪)। এই আহুতিগুলিকে 'ঔদ্‌গ্রভণ' বলা হতো। শতপথ ব্রাহ্মণ এই আহুতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেছে যে এই অনুষ্ঠানের দ্বারা যজমানের উত্তরণ ঘটে (উদ্‌গৃভ্ণীতেহস্মাল্লোকাদ্দেবলোকমভি— যো দীক্ষতে) অর্থাৎ মর্তের মানুষ ভূষিত হয়ে ওঠে দিব্যগুণে। এই আহুতির দ্বারা যজমানের শুধু কায়শুদ্ধি ঘটে না, ঘটে অন্তঃশুদ্ধিও। উদ্‌গ্রভণ নামক এই অনুষ্ঠানের প্রসঙ্গ কৌষীতকি ও শতপথ ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না। অবশ্য এই দুটি গ্রন্থের মধ্যে পঞ্চ আহুতির তাৎপর্য নিয়ে মত পার্থক্য আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে যে পাঁচটি আহুতির কথা বলা হয়েছে তাঁদের মধ্যে প্রথম তিনটির দেবতা হলেন আকূতি, মেধা, মনন, দীক্ষা তপস্যা, সরস্বতী, পুষা। শতপথ ব্রাহ্মণের ভাষায় এই তিনটি আহুতি 'অদেবক', কারণ এই আহুতিগুলির দেবতারা প্রথাগত ইন্দ্র, সোম, অগ্নি প্রমুখদের মতো প্রতিষ্ঠিত নন, ফলে এই আহুতিগুলিও অপ্রতিষ্ঠিত—অনদ্ধেবৈতা আহুতয়ো হূয়ন্তে— অপ্রতিষ্ঠিতা অদেবকাস্তত্র নেন্দ্রো ন সোমো নাগ্নিরিতি (৩.১.৪.১০)। বস্তুত আকূতি, মেধা ইত্যাদি দেবতার উদ্দেশে আহুতি প্রদানের বিষয়টি বৈদিক ধারার অনুগামী নয়। তাই শতপথ ব্রাহ্মণ বিধান দিয়েছে যে এই দেবতাদের উদ্দেশে আহুতি দেওয়ার সময় শেষে বলতে হয় অগ্নয়ে স্বাহা। যেমন মেধায়ৈ মনসেহগ্নয়ে স্বাহা ইত্যাদি। কাবণ সম্ভবত উদ্দিষ্ট দেবতারা বৈদিকধারা বহির্ভূত হলেও অগ্নি বৈদিক দেবতা এবং অগ্নির নামের উল্লেখের দ্বারা এই আহুতি তথা উদ্দিষ্ট 'অপ্রতিষ্ঠিত' দেবতারাও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। চতুর্থ আহুতিটির দেবতা হলেন জল, দ্যুলোক-ভূলোক এবং বৃহস্পতি। এই আহুতিটি যজ্ঞের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী— এতেন হৈষা নেদীয়ো যজ্ঞস্য (৩.১.৪.১৫)। তাই বোধহয় আহুতি নিবেদনের সময় আর অগ্নির উল্লেখের দরকার হয় না, কারণ এই দেবতারা বৈদিক যাজ্ঞিকদের অপরিচিত নয়। পঞ্চম আহুতিটির মন্ত্রে বলা হয়েছে 'বিশ্বো দেবস্য নেতুর্মতো বুরীত সখ্যম্' ইত্যাদি (বাজসনেয়ী সংহিতা ৪.৮) অর্থাৎ 'প্রত্যেক মানুষ স্বর্গীয় নেতার কাছে সখ্যতা প্রার্থনা করুক, যশ কামনা করুক, ধন প্রার্থনা করুক যাতে সে সমৃদ্ধ হতে পারে।' এই পঞ্চম আহুতি প্রদানের মধ্য দিয়ে মর্তের মানুষ ও স্বর্গের দেবতার মধ্যে সখ্য ও সমতা স্থাপিত হয়েছে। 'ঔদ্‌গ্রভণ' আহুতির চরম ও পরম প্রাপ্তি এই দেব মানুষের মিলন।

কৌষীতকি ব্রাহ্মণেও দেখা যায় বহিরিন্দ্রিয়ের সঙ্গে সঙ্গে যজমানের অন্তরিন্দ্রিয়েরও দীক্ষা যেমন হচ্ছে সেই সঙ্গে দীক্ষিত যজমানের প্রাণের বা অন্তর্নিহিত সত্তার উত্তরণ ঘটছে। যজমান মন্ত্র পাঠ করে বলছেন—'মনো মে মনসা দীক্ষতং স্বাহেতি প্রথমাং বাঙ্‌মে বাচা দীক্ষতমিতি দ্বিতীয়াং প্রাণো মে প্রাণেন দীক্ষতং স্বাহেতি তৃতীয়াং, চক্ষুর্মে চক্ষুষা দীক্ষতমিতি চতুর্থীং শ্রোত্রং মে শ্রোত্রেণ দীক্ষতমিতি পঞ্চমীম্...।' অর্থাৎ দীক্ষাকৃত পরিশোধন যে শুধু বহিরিন্দ্রিয়ের হচ্ছে তা নয়, প্রাণ মন চক্ষু প্রভৃতি সব কিছুই পার্থিব সত্তা থেকে দৈবী সত্তায় রূপান্তরিত হচ্ছে। দীক্ষার মধ্য দিয়ে দীক্ষিত যজমান নতুন চেতনায় সঞ্জীবিত হচ্ছেন।

প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে যে এইপ্রকার দীক্ষার সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায় তন্ত্রের দীক্ষার। কুলার্ণব তন্ত্রের মতে দীক্ষা সাত প্রকার। তাদের মধ্যে বাগ্‌দীক্ষা ও দৃষ্টির দীক্ষার অবস্থান লক্ষণীয়। জন উড্রফ (John Woodroffe) এই সপ্ত দীক্ষার ব্যাখ্যা করে বলেছেন—'Altogether, dīkṣā, initiation

that gives liberation is said to be of seven kinds : dīkṣā through ritual, through letter, through special imanation (Kalā), through touch, through sight, through thought?[২]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে শৌনকীয় অথর্ববেদেও (৮.৯.১৭) সপ্তদীক্ষার উল্লেখ আছে। কিন্তু সেখানে সপ্তদীক্ষার কোনো বিবরণ বা তাৎপর্যের উল্লেখ নেই। তাই অথর্ববেদের সপ্তদীক্ষার সঙ্গে কুলার্ণবতন্ত্রের সপ্তদীক্ষার আদৌ কোনো যোগ আছে কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। তাছাড়া তন্ত্রের এই গ্রন্থটিও অনেক পরবর্তীকালের। তাই অথর্ববেদের দীক্ষা ও কুলার্ণবতন্ত্রের দীক্ষা একই কি না অথবা এই দুটি দীক্ষার শুধু নামগত সাদৃশ্য আছে— তাও বলা কঠিন। আবার এমনও হতে পারে সে উভয়েরই উৎস কোনো অবৈদিক ধারা যা তান্ত্রিক শ্রুতি বলে বিবেচিত হতে পারে।[৩]

তবে অথর্ববেদের বিষয় যে যতটা বৈদিক তার থেকে অবৈদিক বেশী তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তান্ত্রিক ধারার যে কৃষ্ণ ষট্‌কর্ম অর্থাৎ মারণ, উচাটন, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ ও স্বস্ত্যয়ন আছে তার প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় অথর্ববেদের black magic-এর মধ্যে। এই যাদু বিদ্যার জন্যই বৈদিক যুগের ঐতিহ্যে অথর্ববেদের কোনো স্থান ছিল না। বরং বেদ বলতে তখন বোঝাত 'ত্রয়ী'কে অর্থাৎ ঋক্, সাম ও যজুর্বেদকে। অন্যদিকে তন্ত্রের সঙ্গে অথর্ববেদের এই নৈকট্যের জন্য শুক্রনীতিসার নামে এক গ্রন্থে বলা হয়েছে যে তন্ত্র আসলে অথর্ববেদের একটি উপবেদ—আথর্বণং চোপবেদস্তন্ত্ররূপং স এব হি (৪.৩.৩৯)।

বস্তুত, তন্ত্রের ইতিহাস বহু প্রাচীন। তন্ত্র যে কোথায় কবে আবির্ভূত হয়েছিল তা নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। অনেকেই মনে করেন যে তন্ত্র হলো বেদব্যাখ্যানের একটি ধারা। কিন্তু তন্ত্রে যে রকম দেবী পূজার প্রাধান্য আছে বৈদিক ধর্মে তা নেই। তাই অনেকের মতে তন্ত্র মাতৃকেন্দ্রিক দ্রাবিড় সমাজের থেকে উদ্ভূত। আবার মহেঞ্জোদরো হরপ্পার মাতৃমূর্তি থেকে মনে করা হয় যে তন্ত্র সম্ভবত প্রাগ্‌বৈদিক কোনো একটি ধর্ম।[৪] এই ধর্মাচার বৈদিক সভ্যতার অগ্রগতির সময়ও আর্যেতর জাতির মধ্যে চর্চিত হত। পরে অনেক তান্ত্রিক আচারের সংস্কৃতায়নের মধ্য দিয়ে তন্ত্রকে আর্যধারার মূল স্রোতের মধ্যে নিয়ে আসার প্রয়াস ঘটে— নানা সময় নানা ভাবে। এর ফলশ্রুতিস্বরূপ পূজা, অর্চনা যাগযজ্ঞের মধ্যে ক্রমে বৈদিক প্রভাব ক্ষীণ হয়ে গিয়ে তান্ত্রিক পূজা অর্চনার পদ্ধতিই প্রভাবশালী হয়ে ওঠে।

যাইহোক আর্যায়নের পথে আর্যেতর ভাবধারা, দেবতা, বিশ্বাস, ধর্মমত—অনেক কিছুই বৈদিক ধারার সঙ্গে মিশে যায় আর সেইসঙ্গে বৈদিক ধারারও রূপান্তর ঘটে। অপরদিকে বৈদিকরা এই অবৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের অবস্থানকে যুক্তিগ্রাহ্য করার জন্য তার মধ্যে প্রতীকধর্ম আরোপিত করলেন। রাধাকৃষ্ণান এই প্রসঙ্গে বলেছেন— 'When new communities possesesing strange beliefs were freshly taken into Aryan fold, the old Vedic culture had to undergo a new transformation agreeable to the new horders... It had... to expand and remodel its own religion to accommodate new beliefs... and tried to allegorise the myth and symbol, the fable and legend in which the new tribes delighted'.[৫]

আর্যায়নের ইতিহাসটি খুবই আগ্রহোদ্দীপক। এই আর্যায়ন প্রক্রিয়ার একটি নিদর্শন দীক্ষা বা দীক্ষণীয়েষ্টি। দীক্ষায় ইষ্টিযাগটি বৈদিক—কিন্তু দীক্ষার প্রতীকময় mystic বৈশিষ্ট্যটি অবৈদিক। আর্য ও আর্যেতর ভাবনার একটি সার্থক সমন্বয় ঘটেছে এই অনুষ্ঠানে। তাই দীক্ষা শব্দটিও ঋক্‌সংহিতার সমকালীন নয় বরং আর্যায়নের পরবর্তীকালীন প্রক্রিয়ায় সোমযাগে তার সংযোজন ঘটেছে। সেই সঙ্গে চিকিৎসাবিদ্যার যে প্রতিফলন পাওয়া যায় দীক্ষা সংস্কারে তার সঙ্গে অথর্ববেদের চিকিৎসাবিদ্যাবিষয়ক মন্ত্রগুলির সাদৃশ্যও বেশ লক্ষণীয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, যে যে গ্রন্থে দীক্ষার আনুষ্ঠানিক বর্ণনা

পাওয়া যায় সেই গ্রন্থগুলির আবির্ভাবকালে আর্যদের পূর্বদিক বিজয় প্রায় সম্পূর্ণ। শতপথ ব্রাহ্মণে তো কাশী, কৌসাম্বী, মগধ প্রভৃতি অঞ্চলের সুস্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে ভারতের পূর্বদিকে— এইরকম বিশ্বাসও অনেকে পোষণ করেন।[৬] তবে পূর্বভারতে যে তন্ত্রের প্রভাব বেশি সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। তান্ত্রিক ধারায় দীক্ষা ছিল একটি অপরিহার্য ও গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। তন্ত্রের সপ্তদীক্ষার আভাস পাওয়া যায় কৌষীতকি ব্রাহ্মণের বাক্, চক্ষু প্রভৃতির দীক্ষার মধ্যে। আবার শতপথ ব্রাহ্মণে বিহিত দীক্ষার ঔদ্‌গ্রভণ আহুতির বিমূর্ত দেবতারা বৈদিক দৃষ্টিতে তথাকথিত 'অপ্রতিষ্ঠিত' বলে আহুতির মন্ত্রে বৈদিক অগ্নির নাম যুক্ত করার বিধান দেওয়া হয়েছে।

পরিশেষে বলা যায় যে বৈদিক দীক্ষার অর্বাচীনত্ব, তান্ত্রিক ধারার সঙ্গে তার সাদৃশ্য, তন্ত্রে দীক্ষার গুরুত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে বৈদিকযাগে দীক্ষাকে তন্ত্রের প্রভাব সঞ্জাত একটি পরবর্তী সংযোজন বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সেই সঙ্গে বলা যেতে পারে যে এর মধ্যেই নিহিত আছে আর্যায়নের পথে দীক্ষা নামক একটি আর্যেতর ভাবনার বেদিকীকরণের ইতিহাস।

নির্দেশিকা :

১। A. A. Macdonell, A History of Sanskrit Literature, New Delhi, 1971, [First published in 1899], p. 172.

২। Sir John Woodroffe, Kulārṇava Tantra, New Delhi, 1984, p. 104.

৩। কুল্লূক ভট্ট মনুসংহিতার (২/১) টীকায় বলেছেন—'শ্রুতিশ্চ দ্বিবিধা বৈদিকী তান্ত্রিকী চ'।

৪। N. N. Bhatacharya, History of Tantric Religion, New Delhi, 1982, p. 159.

৫। S. Radhakrishnan, Indian Philosophy, Vol. I, 1977, [First published in 1923], p. 477.

৬। M. Winternitz, History of Indian Literature, Vol I, Part II, Translated into English by Mrs. S. Ketkar, University of Calcuta, 1963, p. 519.

cf. B. Bhattacharya, Indian History Quarterly III, p. 744।

মৌনী নগর

দীপক ভট্টাচার্য

[§১. গ্রাম হস্তিনাপুর। §২. প্রথম বসতি। §৩. কৌরবদের রাজধানী। §৪. সাংস্কৃতিক আর্য। §৫. হস্তিনাপুর-কৌশাম্বী থেকে ঐতিহাসিক যুগ। §৬. উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলাল। §৭. শ্রেষ্ঠীদের শহর। §৮. কৌলাল বিচার। §৯. রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ (১) : খাসজমি, পণ্য ও বাণিজ্য। §১০. রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ (২) : নতুন বসতি নিবেশ ও খাজনা বৃদ্ধি। §১১. ছোট চাষির জন্ম। §১২. কৌটিল্য-বিচারে রাষ্ট্রীয় ও তাত্ত্বিক কাঠামো। §১৩. সমৃদ্ধতম যুগ। §১৪. হস্তিনাপুরের লোপ। §১৫. পরবর্তী সাহিত্যে হস্তিনাপুর ও অন্যান্য নগর (১) : ভর্তৃহরি। §১৬. পরবর্তী হস্তিনাপুর ও অন্যান্য নগর (২) : কালিদাস, ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ §১৭. অবক্ষয় সম্বন্ধে অন্য মত। §১৮. প্রসঙ্গ কোসম্বি। গ্রন্থসূচনা]

§১. গ্রাম হস্তিনাপুর

মহাভারতে কৌরবদের রাজধানী হস্তিনাপুর (উ. ২৯°৯, পৃ ৭৮°৩) বর্তমানে মেরঠ জেলার একটি গ্রাম মাত্র। নগরের ছোঁয়াচ বর্জিত— সদর মেরঠ থেকে উত্তরপূর্বে পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার দিল্লী থেকে প্রায় একশ কিলোমিটার দূরে ঢিবিতে ঘেরা গ্রাম। পাণ্ডববর্জিতই ছিল, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা আশ্রয়ার্থীদের কল্যাণে গত পাচ দশকে একটু কোলাহলমুখব। এক কালে পাশ দিয়ে গঙ্গা বইত, এখন সে আট কিলোমিটার পূর্বে বিজনোর ও মোরাদাবাদের সঙ্গে পশ্চিমের মেরঠের বিভাজক। ঢিবির ওপর উঠে দাঁড়ালে যেন অনেক দূরে চোখে পড়ে। প্রাচীন মূল স্রোত ছোট নদী বুড়ি গঙ্গা এখনো অদূরে বয়ে চলেছে।

মহাভারতের চরিত্র ও কাহিনীগুলি এতই জনপ্রিয় ও জনসাধারণের মানসে তাৎপর্যবাহী যে হস্তিনাপুর ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিদদের কৌতূহল উৎপাদন না করে পারেনি। স্বাধীনতার পরই ভারত সরকার উদ্যোগ নেয়। ১৯৫০ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত উৎখনক বি.বি. লালের পরিচালনায় বেশ কিছু খোঁড়ার কাজ হয়। ভারত ইতিহাস চর্চায় এই উৎখনন এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং এরই কল্যাণে অতি প্রাচীন হস্তিনাপুর মহাকাব্য ও নাটকের মোড়ক থেকে বেরিয়ে এসে বাস্তব হয়ে উঠেছে। নগরের উত্থান-পতন সম্বন্ধে কিছু ধারণা করাও সম্ভব হয়েছে।

লাল (১৯৫৪) মূলত উৎখননের বিবরণ দিয়েছেন। উৎখনন তথ্যকে তিনি সাহিত্যের সঙ্গে যেটুকু মিলিয়েছেন তা খুব গুরুত্বপূর্ণ হলেও বেশি হতে পারেনি। লালের পক্ষে সম্পূর্ণ উৎখনন লব্ধ তথ্যকে পদ্ধতিমূলক ভাবে বা নীতিগত ভাবে সাহিত্যের সঙ্গে মিলিয়ে কাজ করা সম্ভব ছিল না। প্রথম উৎখনকের কাছে ঐ আশাও করা যেত না। একটি স্তরের বিশেষ প্রয়োজনেই তাঁকে সাহিত্যলব্ধ তথ্যের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। এখানে সাহিত্যের সঙ্গে মেলানোর কাজে আর একটু এগোনোর চেষ্টা করা হয়েছে। কয়েকটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্নও তোলা হয়েছে। সাহিত্যের সঙ্গে না মিলোলেও কয়েকটি বিস্ময়কর

ব্যাপার চোখে না পড়ে থাকে না। যেমন, তৃতীয় শতাব্দীতে শহরটি আটশ বছরের জন্য হঠাৎ চুপ হয়ে যায়। কেন এমন হল? এরকম আরো প্রশ্ন আছে।

§২. প্রথম বসতি

ওপর থেকে নীচে খুঁড়ে পাঁচটি বসতির স্তর পাওয়া গেছে। সবচেয়ে নীচের অর্থাৎ প্রথম স্তরের পরিচয় অস্পষ্ট। ব্যবহার্য মৃৎপাত্র অল্প পোড়ানো এবং রাঙামাটি (ochre) দিয়ে হালকা রঙ করা। কয়েকটিতে চকচকে ভাব আনার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। ব্যবহৃত পাত্র অনুসারে সংস্কৃতির নাম দেওয়া হয়েছে কৃষ্ণাভ লাল কৌলাল (Ochre-coloured Ware)। একে কৌলাল বললেও এরা কুমোরের চাকার (কুলালচক্র) ব্যবহার জানত কিনা তা বোঝা যায়নি। কোনো ধাতব দ্রব্য পাওয়া না গেলেও উৎখনক অনুমান করেন যে এরা তামার ব্যবহাব জানত। কারণ উত্তরপ্রদেশের ওই অঞ্চলেই অন্ততঃ তিন জায়গায় অনুরূপ কৌলালের সঙ্গে কখনো কখনো তামার হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে। একটি গঙ্গার পূর্ব তীরে সমরেখ বিন্দুতে অবস্থিত (২৯°৯′, ৭৮°১০′) রাজপুর পরসুতে, একটি দক্ষিণপূর্বে বুদাউন জেলায় (প্রাচীন পাঞ্চাল) অহিচ্ছত্রার কাছে, অপরটি উত্তর-পশ্চিমে সাহারানপুর জেলায় বাহাদরাবাদে। এর ভিত্তিতে (লাল ১৯৫৪:১১, ১৯৬৪: ১৭৩-১৭৪) 'Copper Hoard' নামে পরিচিত জড়ো করা তামার হাতিয়াবের রাশি— অঙ্কুশমুখ বর্শা, শুঁড়ওলা বর্শা, অনুরূপ ছুরি, কুড়ুল, পুতুল ইত্যাদি বিশিষ্ট এক সংস্কৃতির সঙ্গে একে অভিন্ন বিবেচনা করেছেন। তাঁব মতে এই স্তর খ্রিষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীতেই শেষ হয়।

কৃষ্ণাভ লাল কৌলাল সংস্কৃতির রচয়িতাদের পরিচয় অস্পষ্ট। বাহাদরাবাদের উৎখনক শর্মার (১৯৬৪: ১১-১৩) মতে এরা নব্য প্রস্তরযুগীয় নয়। তিনি এবং আবো কেউ কেউ এদের হরপ্পা সভ্যতার দীন অবশেষ বলে মনে করেছেন। কিন্তু সাহিত্যের কোনো বিবরণ থেকে কেউ এদেব পবিচয় বার করতে পারেননি। ফলে ভারতের ইতিহাসে এদের অবদান থাকাব সম্ভাবনা সত্ত্বেও এবা প্রাগৈতিহাসিক বলে চিহ্নিত।

কয়েকটি তথ্য এখানে প্রাসঙ্গিক হতে পারে। কৃষ্ণাভ লাল কৌলাল সংস্কৃতি প্রাচীন কুরুদেশে পাওয়া গিয়েছে। এখন, ঋগবেদে, অথর্ববেদে ও পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে রুশম নামটি পাওয়া যায়। ঋগবেদ ও অথর্ববেদের (খিলসূক্ত ও কুন্তাপসূক্ত) একটি বর্ণনায় রুশমরা কুরুদেশবাসী এবং দানশীল (নীচে § ৩ দ্র.)। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে (২৫.১৩) ইন্দ্রের সঙ্গে রুশমাব পৃথিবী পরিক্রমণ প্রতিযোগিতা হয়। ইন্দ্র বিশ্বভুবন পরিক্রমণে যান আর রুশমা শুধু কুরুক্ষেত্র পরিক্রমণ করেন। কুরুক্ষেত্রের এতই মাহাত্ম্য যে দুজনেই জয়ী ঘোষিত হন। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ঋগবেদ ও অথর্ববেদের পরে কুরুক্ষেত্রে রচিত হয়। সম্ভবতঃ রুশম জাতি ততদিনে কুরুদের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। একটি নারীর নামে তাদের স্মরণ করা হয়েছে। এই স্মৃতি মূল রুশমদের মাতৃতান্ত্রিক সমাজের স্বাক্ষর বহন করতে পারে। বৈদিক সাহিত্যে কৃষ্ণাভ লাল কৌলাল সংস্কৃতির কোনো পরিচয় যদি থেকে থাকে তাহলে রুশমজাতি ছাড়া আর কারোর সঙ্গে তাদের মেলানো যায় না। এই মত কেউ প্রকাশ করেছেন বলে আমার জানা নেই।

§৩. কৌরবদের রাজধানী

কৃষ্ণাভ লাল কৌলালের পর যারা বসতি করে উৎখননের পরিভাষায় তাদের সংস্কৃতির নাম চিত্রিত ধূসর কৌলাল (Painted Grey Ware)। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকের পূর্বার্ধের এই সংস্কৃতির অবশেষ উত্তর ভারতের আরো অনেক জায়গাতেই পাওয়া গেছে। জায়গাগুলির মধ্যে আছে মেরঠ জেলাতেই

হস্তিনাপুর ও মেরঠের মাঝামাঝি সৈনি, দক্ষিণপূর্বে বিসরাখ, উত্তর-পশ্চিম বর্ণাওয়া (বারণাবত) ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাঘপত (ভাগপ্রস্থ), পশ্চিমে বাঘপতের খুব কাছে অন্য জেলায় সোনেপত (শোণপ্রস্থ), বর্ণাওয়ার উত্তরে অন্য জেলায় পানীপত, আরো উত্তরে কুরুক্ষেত্র, দক্ষিণে ইন্দরপত বা পুরানো কিলা, তিলপত, অহিচ্ছত্রা, কাম্পিল ইত্যাদি। শেষ দুটি প্রাচীন পাঞ্চাল দেশে বাকি সবই কুরু রাজ্যে। এই দুই অঞ্চলের বাইরেও নিদর্শন মিলেছে।

নামগুলি অনেকগুলিই হয় মহাভারতে পাওয়া যায় অথবা এগুলি পুরাণে বা লোককথায় কৌরবপাণ্ডবদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। মহাভারতের সঙ্গে জড়িত এতগুলি জায়গাতে এক সমকালীন সংস্কৃতির অস্তিত্ব আবিষ্কাবের বলে মহাভারতের মূল কাহিনীর ঐতিহাসিকতা এবং সেই কাহিনীর সঙ্গে ওই জায়গাগুলির সম্পর্কও অনুমান করা যায়। অবশ্য মহাভারত সম্পূর্ণ রূপেই ঐতিহাসিক গ্রন্থ এ কথা বলার কোনো সুযোগ নেই। কারণ উক্ত মূল কাহিনী কি ছিল মহাভারত বা অন্য কোনো গ্রন্থ থেকে তা বার করা অসম্ভব। তার নিজের উক্তি অনুসারেই মহাভারত প্রথমে ৮৮০০ শ্লোকে, তারপর ২৪০০০ শ্লোকে এবং শেষে একলক্ষ শ্লোকে রচিত হয। অসম্ভব নয় যে ৮৮০০ শ্লোকের মহাভারত চারণদের মুখে মুখে ফিরত। মহাভারতের মূল কাহিনীর ঐতিহাসিকতা স্বীকার করা মানে সেই হারিয়ে যাওযা চারণগাথার একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি স্বীকার করে নেওয়া। মূল কাহিনীর সেই ঐতিহাসিক ভিত্তিটি যে চিত্রিত ধূসর কৌলাল সংস্কৃতির বাহকরা সৃষ্টি করেছিল এ বিষয়ে সন্দেহ থাকা উচিত নয়। কিন্তু ঐতিহাসিক ভিত্তিটি কি তা আমরা ঠিক জানি না। কেউ কেউ অনুমান করেছেন যে মূল কাহিনীটি কুরুপাণ্ডবদের নয় কুরুপাঞ্চালদের কোনো বিয়োগান্তক কাহিনী হতে পারে। উৎখননও সেই ইংগিতই দেয়। কারণ হরিয়ানা ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের যে অঞ্চল জুড়ে চিত্রিত ধূসর কৌলাল সংস্কৃতির বেশি বিস্তার ঘটেছিল সেইটিই প্রাচীন কুরুপাঞ্চালদেশ। পঞ্চপাণ্ডব— অন্ততঃ রূপকরহস্যবাহী যুধিষ্ঠির, অর্জুন ও ভীম— হয়ত মূল মহাভারতের চরিত্র নয়।

উৎখনন থেকে মূল মহাভারতের কিছু নিশ্চিত পবিচয়ও মেলে। পরিচয় হয়ত নেতিবাচক। কিন্তু অন্ততঃ প্রচলিত মহাভারত থেকে তার পার্থক্য অনুমানের সহায়ক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যবাহী। উৎখননের কল্যাণে মহাভারত যুগের সন্ধি, প্রাচীনতা, বিস্তার ইত্যাদি সম্বন্ধে কল্পনাবর্জিত ধারণা করা সম্ভব হয়েছে। চিত্রিত ধূসর কৌলাল সংস্কৃতির বিকাশ লক্ষ্য কবলে প্রচলিত মহাভারতে খাণ্ডবপ্রস্থের অর্থাৎ ইন্দ্রপ্রস্থের যে বর্ণনা আছে (আদিপর্ব ২২৬) অথবা স্ফটিকের সোপান ও মণিরত্নযুক্ত সরোবর সহ ময়দানব রচিত যে পাণ্ডবসভার কথা আছে (সভাপর্ব ৩) ঐ স্তরে তা অসঙ্গত ঠেকে। অবশ্য ইন্দ্রপ্রস্থের যৎসামান্যই উৎখনন হয়েছে। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের রাজাদের এক জায়গায় সমবেত হওয়ার প্রশ্নও ঐ স্তরে ওঠে না। ভারতবর্ষের বৃহত্তম অংশে তখনও নব্য প্রস্তর যুগ বিরাজমান। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে মহাভারতের যুদ্ধ খ্রিষ্টপূর্ব ৩১০০ অব্দ নাগাদ ঘটে। কিন্তু খ্রি.পূ.একাদশ শতকের আগে চিত্রিত ধূসর কৌলাল সংস্কৃতির আবির্ভাব হয়নি।

চিত্রিত ধূসর কৌলাল সংস্কৃতি কৃষ্ণাভ লাল কৌলালের চেয়ে অনেক উন্নত এবং বিস্তৃত। প্রথমতঃ পরিসরে হরপ্পার সমান না হলেও অন্য যে কোনো পূর্ববর্তী সংস্কৃতির চেয়ে এটি বেশি বিস্তৃত। প্রথমে শতদ্রু ও প্রাচীন সরস্বতী (বর্তমান ঘগ্‌গর) উপত্যকায়, অল্প পরে গঙ্গা-যমুনা উপত্যকায় এর বিস্তার ঘটে। লোহার ব্যবহার গঙ্গা-যমুনা উপত্যকায় প্রবর্তিত হয় (শর্মা ১৯৬৪: ১০ এবং ৮)। বি.বি. লালের (১৯৫৪: ১৩৮-১৪০) বিবরণী তৈরির সময়েই পাঞ্জাব, রাজস্থান ও পশ্চিম এবং মধ্য উত্তরপ্রদেশ জুড়ে উত্তরে ছজ্‌জা (উ. ৩১°৭′ পূ. ৭৬°৩৩′ হোসিয়ারপুর, পাঞ্জাব) এবং পশ্চিমে চক ৮৬ (উ. ২৯°১৪′ পূ. ৭৩°১৪′, গঙ্গানগর, রাজস্থান) থেকে দক্ষিণ-পূর্বে কাম্‌পিল (উ. ২৭°১৬′ পূ. ৭৯°১৬′

ফারুখাবাদ, উ.প্র.) পর্যন্ত এই সংস্কৃতির বিস্তার লক্ষ্য করা গিয়েছিল। পরে পুরোনো সংগ্রহ থেকে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে আরো উত্তর পশ্চিমে পাকিস্তানের লখিয়ো পিরেও চিত্রিত ধূসর কৌলাল সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছিল (লাল ১৯৬৪: ১৭৫)। খ্রি. পূ. নবম শতকে হস্তিনাপুর বন্যায় ভেসে গেলে অধিবাসীরা যমুনার তীরে বর্তমান প্রয়াগ থেকে কিছু দূরে কৌশাম্বীতে (নীচে ৫) এবং দক্ষিণ পশ্চিমে উজ্জয়িনী ও দক্ষিণ-পূর্বে লিচ্ছবি-সদর বৈশালীতে এই সংস্কৃতির দীনতর রূপ নিয়ে পৌঁছেছিল (লাল ১৯৬৪: ১৭৫)। লালের পর বিস্তারের আরো পরিচয় পাওয়া গিয়েছে (ত্রিপাঠী ১৯৭৬)। গহড়বাল-শ্রীনগরের কাছে অলকানন্দার উত্তর তীরে থাপলিতে চিত্রিত ধূসর কৌলাল বসতি আবিষ্কার হয়েছে (নৌটিয়াল ইত্যাদি ১৯৭৮, নীচে দ্র.)।

মূল মহাভারতের প্রেরণার উৎস হলে ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর এর প্রশ্নাতীত প্রভাবও অনস্বীকার্য হয়ে পড়ে।

তৃতীয়তঃ জীবনযাত্রার মানে ও ব্যবহার্য হাতিয়ারেও এরা আগের চেয়ে উন্নত। পশুপালন ও কৃষিকার্যের ওপর নির্ভরশীল জীবনযাত্রার এই স্তরে যা পাওয়া গিয়েছে তার মধ্যে রযেছে যার নামে সংস্কৃতির পরিচয় সেই চিত্রিত ধূসর কৌলাল— তথাকথিত চীনামাটির আদিম নিদর্শন- প্রধানতঃ বাটি ও থালা, কিছু হাতে গড়া, কিছু কুমোরের চাকিতে; ছাই রঙের পাতলা গায়ের ওপর কালো রঙে বিন্দু বা রেখা গিয়ে আঁকা নকশা। চাল ও বন্য আখের নিদর্শন মিলেছে। পালিত জন্তুর মধ্যে ঘোড়া, মোষ, গোরু, ছাগল, ভেড়া, হাতি ও শুয়োরের অবশেষ পাওয়া গেছে। বিশ্লেষক (ভোলা নাথ; লাল ১৯৫৪. ১১৬) খাদ্যবস্তু হিসেবেই মোষের ব্যবহারের প্রমাণ পেয়েছেন, কৃষিকর্মের জন্য মোষ পালন করা হতো মনে করেননি। চাষে মোষের ব্যবহারের প্রবর্তন সম্ভবত পরের কথা। কিন্তু হস্তিনাপুরে ভারবাহী পশু হিসেবে মোষের ব্যবহার ও পালন নিশ্চয়ই ছিল (নীচে দ্র.)। আরও পাওয়া গিয়েছে পোড়ামাটির অলংকার, কম দামি রত্ন, কাচ, হাড়ের ও হাতির দাঁতের জিনিষ ও তামার হাতিয়ার - নরুন, শাবল ও বাণমুখ। সুর্মামিশ্র ধাতব দণ্ড বেশ কিছু পাওয়া গিয়েছে। এগুলির উপযোগিতা ও মিশ্রণের বাকি উপাদানেব রাসায়নিক বিশ্লেষণ এই দুই বিষয়ে কোনো মন্তব্য বা তথ্য নেই। ধাতব দ্রব্য নির্মাণে বা রঙ করায় সীসা, রাঙ ইত্যাদির মিশ্র সহ এগুলির ব্যবহার বিদিত। শরের ওপর মাটি লেপে, পুড়িয়ে ঘরবাড়ি তৈরির কিছু সামান্য নিদর্শনও রয়েছে। পোড়ানো ইঁটের টুকরো কিছু পাওয়া গিয়েছে। সোয়া দু-ইঞ্চি উচ্চতা, বাকি মাপ বোঝা যায়নি।

কাচের ব্যবহার প্রমাণিত হওয়ায় কিছু প্রচলিত ধারণা বদলে যাওয়া উচিত। দুটি নিদর্শনে চুড়ি তৈরির উপযোগী কাচ দেখা গেছে। রাসায়নিকের বিশ্লেষণ অনুসারে অত্যন্ত ভঙ্গুর এবং আদিম প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত এই কাচের মূল উপাদান সোডা-চুন (দ্র. লাল ১৯৫৪: ১৩) অর্থাৎ আদিম কিন্তু প্রকৃত কাচই পাওয়া যাচ্ছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত মহলে এখনো একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে বৈদিক ও বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লিখিত কাচ প্রকৃত কাচ নয় কম দামি রত্ন। প্রাচীন পারস্যে 'কাসক' নামের কাচের সদৃশ কোনো দ্রব্যের ব্যবহার ছিল। তার ভিত্তিতে এও বলা হয়েছে (হফমান ১৯৮৬) যে ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের কাচ আমদানি করা দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার কম দামি রত্ন। খ্রি. পূ. প্রথম সহস্রকের গোড়ায় অর্থাৎ হখমনীয় বংশের রাজত্ব শুরুর আগেই হস্তিনাপুরে কাঁচের নিদর্শন মেলার পর এই ধারণাগুলি বদলানো উচিত ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই মনে হয় যে ঐ সময়ে ভারত কাচ আমদানি করত না, বরং পারস্যেই হস্তিনাপুরের মতো শহর থেকে কাচ রপ্তানি করা হতো।

একেবারে প্রথম দিকে লোহার ব্যবহার ছিল না। ওপরের স্তরে কিছু লোহার আকর ও লৌহপিণ্ড (স্ল্যাগ; লাল ১৯৫৪: ১৩) পাওয়া গেছে। গাঙ্গেয় সমভূমিতে লোহার আকর পাওয়া যায় না। বিন্ধ্যের

দক্ষিণে পশ্চিম, মধ্য অথবা পূর্ব ভারতে হস্তিনাপুরবাসীর অথবা কোনো মিত্র গোষ্ঠীর লৌহ সন্ধানের অভিযান কল্পনা করতে হয়। উজ্জয়িনীতে খ্রি. পূ. অষ্টম শতাব্দী থেকে বসতি গড়ে উঠেছিল। প্রথম থেকেই লোহার ব্যবহারের প্রমাণ আছে। বসতি গড়ে ওঠার অল্প পরেই একটি প্রাচীর দিয়ে শহর ঘেরা হয়। এর আগেই উজ্জয়িনীতে চিত্রিত ধূসর কৌলালের উপস্থিতির প্রমাণ আছে (শর্মা ১৯৬৪:৬৯) তাহলে বন্যায় ভেসে যাওয়ার আগে হস্তিনাপুরে পশ্চিম-মধ্য ভারত থেকে লোহার আকর এসেছিল আন্দাজ করা যায়।

অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে (শৌনকসংহিতা ১০.৬.৬) লাঙলের ফলাকে উগ্র খদির অর্থাৎ খয়ের কাঠে তৈরি বলা হয়েছে। এ মন্ত্র নিশ্চয়ই খ্রি.পূ. নবম শতাব্দীর আগে রচিত হয়েছিল।

চিত্রিত ধূসর কৌলাল স্তরে হস্তিনাপুরের রাজতন্ত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক। রাজা কারা ছিলেন? কি রকম রাজতন্ত্র ছিল সেখানে? কুরুদেশের প্রাচীন অধিবাসী রুশমদের কথা ওপরে বলা হয়েছে। ঋগবেদে (৫.৩০.১২-১৫) তাদের রাজার নাম ঋণঞ্চয়। ঋগবেদের কবি বভ্রুর উক্তি, "হে অগ্নি, চার হাজার গরু দান করে রুশমরা এই কল্যাণ করে। মানুষের শ্রেষ্ঠ নেতা ঋণঞ্চয়ের-দান আমরা গ্রহণ করেছি। হে অগ্নি, রুশমরা আমার জন্য সহস্র গাভী সহ সুন্দর ঘর (অস্ত) করে দেয়। ... .সর্বব্যাপী যে রাত্রি তা রুশমদের রাজা ঋণঞ্চয়ের কাছে উষা হয়েছিল। ছুটন্ত ঘোড়ার মতো লঘুপদে শীঘ্রগামী বভ্রু চার হাজার গরু লাভ করেছিল। হে অগ্নি, রুশমদের কাছে চার হাজার গরু পেয়েছি।" কুরুদেশের রুশমদের নাম আবার এসেছে ঋগবেদ ও অথর্ববেদের পরিশিষ্টে। তারপর আর এদের কথা শোনা যায়নি। রুশমরা সম্ভবতঃ কুরুদের সঙ্গে মিশে যায়।

বরণাবতী নামটি অথর্ববেদে (শৌনক সংহিতা ৪.৭.১) একবার এসেছে— 'বরণাবতীতে অধিষ্ঠিত এই জল (বিষ) নিবারণ করুক।' শব্দের মানে খুব স্পষ্ট নয়। তবে হস্তিনাপুরের নিকটবর্তী বসতি বারণাবতের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক খুঁজে বার করা যায় না। বরণ একরকম ওষুধের গাছ। বরণাবতী নদীর নাম হতে পারে, বসতির নাম বলে কোনো পণ্ডিত মত প্রকাশ করেননি। প্রসঙ্গ থেকেও বসতির নাম হওয়ার সম্ভাবনা কম মনে হয়। কুরুদের নাম অথর্ববেদের মূলভাগে নেই। ঋগবেদের শেষ পর্যায়ে রচিত দুটি মন্ত্রে (১০.৩২.৯, ৩৩.৪) কুরু-শ্রবণ নামে এক রাজার নাম পাওয়া যায়। এই দুটি বেদের মূলভাগ রচনার সময়ে চিত্রিত ধূসর কৌলাল সংস্কৃতি বিকশিত হয়নি বলে মনে হয়।

হস্তিনাপুরে পরিক্ষিতের (পুরাণে 'পরীক্ষিৎ') পরবর্তী এই কজন রাজার নাম পুরাণে পাওয়া যাচ্ছে— জনমেজয়, শতানীক, (অশ্বমেধদত্ত) অধিসীম(সোম?)কৃষ্ণ ও নিচক্ষু। হস্তিনাপুর বন্যায় ভেসে গেলে শেষজন কৌশাম্বীতে চলে যান (নীচে ৫)। 'কৌরব্য' রাজা পরিক্ষিতের নাম ঋগবেদের সঙ্গে পরে জোড়া পরিশিষ্ট খিলসূক্তে (৫.৮-১০, পাওয়া যায়। অথর্ববেদের কুন্তাপ সূক্তেও (শৌনকসংহিতা ২০.১২৭; এগুলিও পরে জোড়া) প্রায় একই ভাষায় বর্ণনা মেলে। আরম্ভেই প্রশংসা, "হে জনগণ শোনো, মানুষের স্তুতি করা হবে। ষাট হাজার নব্বইটি (গাভী?) কৌরবের কাছে রুশমদের দেশে পেয়েছি, যার বহনকারী বধূমান উষ্ট্র কুড়িটি, রথের শৃঙ্গ (উঁচুতে) উঠে যায়, ছুটে আকাশ ছোঁয়।"' তারপর একশ নিষ্ক, দশটি মালা, তিনশ ঘোড়া ও দশ হাজার গরু লাভের কথা আছে। পরিক্ষিতের বিশেষণ 'বিশ্বজনীন' ও 'বৈশ্বানর'। বলা হয়েছে, "পরীক্ষিৎ আমাদের মঙ্গল করেছেন।" "'কৌরব্য কুলায় তৈরি করে দেন।' স্বামী স্ত্রীর সঙ্গে (এই কথা) বলেন। রাজা পরিক্ষিতের রাজ্যে স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন 'তোমার জন্য কি নিয়ে আসি বল। দৈ, ঘোল, ছাঁকা (?পরিশ্রুৎ)? 'পাকা যব এগিয়ে যায় সূর্যালোকের মতো পথের বিল (গর্ত) অবধি।" ঋণঞ্চয় ও পরিক্ষিতের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে সন্দেহ করা যায় না। এগুলি নারাশংস স্তুতি যার ঐতিহাসিক তথ্যবহুলতা সকলেই স্বীকার করেন।

উৎখনন করে পুরাণে বর্ণিত গঙ্গায় বন্যারও সমর্থন মেলে। লালের মতে চিত্রিত ধূসর কৌলাল স্তর খ্রি. পূ. অষ্টম শতাব্দীর গোড়ায় শেষ হয়। পরিক্ষিতের কাল তার একশ বছর আগে নবম বা দশম শতাব্দীতে গিয়ে পড়ে। ঋণঞ্চয়ের কাল তার অনেক আগে।

মহাভারতের আরো কটি নাম নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক। অথর্ববেদের পরবর্তী যজুর্বেদের কাঠক সংহিতায় (১০.৬) বিচিত্রবীর্যের ছেলে কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে নিয়ে একটি কাহিনী আছে। নৈমিষারণ্যের কজন যজ্ঞ করে কুরুপাঞ্চাল দেশে সাতাশটি বাছুর পেয়েছিল। বক দাল্‌ভি নামে এক যাজ্ঞিক আরো পাওয়ার আশায় ঐ সাতাশটি বাছুরে ভাগ বসাতে চান না; বিচিত্রবীর্যের ছেলে তাঁকে ঘর তৈরি করে দেবেন এই আশায় ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গিয়ে দান চেয়ে তিনি দুর্ব্যবহার পান। বক দাল্‌ভি ধৃতরাষ্ট্রের রাজ্যের নানা ক্ষতি করে প্রতিশোধ নেন। পরে ধৃতরাষ্ট্র ব্যাপারটা মিটিয়ে নেন। মহাভারতেও (শল্যপর্ব ৪১) এই কাহিনী আছে। (ঐরাবত ধৃতরাষ্ট বলে একটি নাম অথর্ববেদে পাওয়া যায়। সেটি কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র নয়।)

ঘটনাগুলি নানা কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। নৈমিষারণ্য দক্ষিণ পাঞ্চালের শেষে প্রায় কোশলের উত্তর সীমায়। বক দাল্‌ভির প্রতিশোধের গল্পে কুরু পাঞ্চাল দ্বন্দ্বের কিছু পরিচয় থাকতে পারে। তথ্যগুলিতে পরিক্ষিতের রাজত্বে কৃষি ও পশুপালনের নতুন সমৃদ্ধির খবর আছে। তার সম্ভাব্য কারণ লাঙলে লোহার ফালের ব্যবহার। ওপরে বলা অথর্ববেদের কাঠের ফলার যুগ থেকে চিত্রিত ধূসর কৌলাল সংস্কৃতি অনেক এগিয়েছিল। রুশমরা বভ্রুকে অস্ত (আবাস) তৈরি করে দিয়েছিল কিন্তু তার সঙ্গে কৃষিসমৃদ্ধির কোনো খবর ছিল না। ধৃতরাষ্ট্র ও পরিক্ষিতের রাজ্য আরো উন্নত। পরিক্ষিতের কুলায় করে দেওয়া ও ধৃতরাষ্ট্রের ঘর করে দেওয়ার মধ্যে নতুন আবাদি ও গৃহপতি শ্রেণীর আশু আবির্ভাবের (নীচে §§১০, ১১) সঙ্কেত আছে। কৌরবদের বা পরিক্ষিতের দান কুড়িটি ভারবাহী 'উষ্ট্র'ও কম তাৎপর্যময় নয়। হস্তিনাপুরে উটের চিহ্ন মেলেনি। এখন, উনবিংশ শতাব্দীতেই সন্দেহ করা হয়েছিল যে বেদে উষ্ট্র মানে মোষ (দ্র. হফমান ১৯৪০:২)। হস্তিনাপুরে মোষের অবশেষ মেলায় সেই মত সমর্থিত হলো। অর্থাৎ ঋগবেদ ও অথর্ববেদে পরিক্ষিতের কুড়িটি মোষ দানের প্রশংসা করা হয়েছে, উটের প্রশ্ন আসছে না। এও মেনে নিতে হবে যে হস্তিনাপুরে শুধু খাওয়ার জন্য মোষ পালন করা হতো না।

ঋগবেদের ও অথর্ববেদের পরিশিষ্টে হস্তিনাপুরের চিত্রিত ধূসর কৌলাল স্তরের মানুষ ও ঘটনারই বিবরণ আছে, কিন্তু কোথাও হস্তিনাপুরের নাম নেই। বেদে রাজ্যের নাম পাওয়া যায়, ঋগবেদেই গ্রাম শব্দটিও মেলে, বিপক্ষের পুরের কথাও আছে। অথর্ববেদে একটু উন্নতি দেখা যায়। রহস্যবাদী দৃষ্টিতে দেহকে আটটি চক্র ও নটি দ্বার সমন্বিত দেবতাদের অযোধ্যা (=অপরাজেয়) পুর বলা হয়েছে (নীচে §১৬)। কিন্তু কোথাও নগরের কথা নেই। ঋগ্বেদের সঙ্গে সম্পর্কিত ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭.১৫) রাজা হরিশ্চন্দ্রের গ্রামের কথা আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেই (৬.৩২) রাজা পরিক্ষিতের প্রশংসা সংবলিত খিল-সূক্তগুলোর কথাও আছে। কিন্তু হস্তিনাপুরের নাম নেই। ঋগবেদীরা নিশ্চয়ই হস্তিনাপুরকে কুরুদের গ্রাম বলে মনে করতেন। শতপথ (১৩.৫.৪.২) ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণের (৮.২১) একটি গাথায় আসন্দীবানে জনমেজয়ের অশ্বমেধ যজ্ঞের উল্লেখ আছে। এটি হস্তিনাপুরের প্রাচীন নাম কিনা বলা যাচ্ছে না। এর পরবর্তী গ্রন্থ তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১.১১.৭) বিশেষ একটি উপাসনার পর নগরে প্রবেশ বারণ করা হয়েছে। যদিও হস্তিনাপুরের উৎখনন প্রমাণ করে যে নগরের সূত্রপাত বৈদিক যুগের শেষেই হয়ে গিয়েছিল, পুরোনো গ্রামগুলো যে কবে জনপদ থেকে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে নগরে পরিণত হয়ে গেল তা কেউ খেয়াল করেনি।

এই ব্যাপারটা কবে ঘটেছিল তা অনুমান করা শক্ত নয়। হস্তিনাপুরের দ্বিতীয় স্তর শুরু হওয়ার সময়ে গ্রাম আর শহর আলাদা ছিল না। ঋগবেদের পরিভাষায় এই জাতীয় বসতির নাম গ্রাম। বড় দরজা সহ রক্ষার ব্যবস্থা অর্থাৎ প্রাচীর ও অস্ত্রশস্ত্র থাকলে অথর্ববেদের বসতি পুর। বর্তমান মেরঠ অঞ্চলেই ১০০০ খ্রি. পূ. নাগাদ এই রকম অন্তত পাঁচটি গ্রাম গড়ে ওঠে। কুন্তাপসূক্তের কথোপকথনরত দম্পতিরাও এই রকম কোনো বসতিতেই থাকত। নাম থেকেই বোঝা যায় যে এর মধ্যে হস্তিনাপুর বিচিত্রবীর্যের পুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও পরিক্ষিতের মতো রাজাদের পুর ছিল। পরবর্তী কালে পুর বা নগর ও জনপদ অনেকটা শহর ও মফস্বলের অর্থ বহন করে। নগর কথাটি বিনয়পিটকে ও জনপদ সূত্রপিটকে পাওয়া যায়। জনপদের উল্লেখ বৃহদারণ্যক (২.১.১৮) ও ছান্দোগ্য (৫.১১.৫, ৮.১.৫) উপনিষদেও পাওয়া যায়। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের কথাও ওপরে বলা হয়েছে। এর থেকে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী বা তার কিছু আগে নগর আর জনপদ আলাদা হতে শুরু করেছিল বোঝা যায়। অর্থাৎ এই সময়ে মেরঠ জেলায় পাঁচটি চিত্রিত ধূসর কৌলাল বসতির বাইরেও ছোট ছোট গ্রামের আবির্ভাব হয়। তার আগে ঐ বসতিগুলির বাইরে কোনো আলাদা গ্রাম ছিল না। মহাভারতের কাহিনী অনুসারে (উদ্যোগ, ৩১) পাণ্ডবরা বারণাবত সহ পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করেছিল। এই কাহিনী সত্যি হোক মিথ্যে হোক এতে কোনো কালাতিক্রমণ দোষ নেই। খ্রিষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে কোনো শহর ছিল না।

হস্তিনাপুরে এত রাজা রাজত্ব করলেও কৌটিল্য কুরুরাজ্যকে রাজতন্ত্র বলে স্বীকার করেননি। অর্থশাস্ত্রে সঙ্ঘ ভাঙার বিবরণে (১১ = ১৬০,১৬১) লিচ্ছিবিক এবং বৃজিক সহ আরো কয়েকটি সঙ্ঘের সঙ্গে কুরু-পাঞ্চালদের নামও আছে। বহু আলোচিত লিচ্ছবি (লিচ্ছিবি) ও বৃজিদের নাম বৌদ্ধশাস্ত্রে সঙ্ঘবাসী হিসাবেই মেলে। মনে করা হয় এরা রাজতন্ত্রের বদলে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বাস করত। অনেকেই মনে করেছেন যে ট্রাইবস্তরে থাকায় এদের মধ্যে রাজতন্ত্র তখনো বিকশিত হয়নি। অর্থশাস্ত্রে এদের ও কুরুদের একই রকম রাষ্ট্রীয় শাসনের অধীন বলে কেন মনে করা হলো তা স্বাভাবিক প্রশ্ন। কুরুরা রাজতন্ত্র থেকে প্রজাতন্ত্রে ফিরে গিয়েছিল এই মতও প্রকাশ করা হয়েছে (লাহা ১৯৫৩:১১)। এই মত গ্রহণ করা যায় না, কারণ তা হলে পুরাণে বা বৌদ্ধশাস্ত্রে এর কোনো না কোনো ইঙ্গিত থাকত।

সম্ভবতঃ কৌটিল্য ঠিকই বলেছেন। তাঁর চোখে লিচ্ছবি-কুরু পাঞ্চালরা যেমন ঠেকেছে তিনি তাই বলেছেন। লিচ্ছবিদেরও রাজা থাকত। কিন্তু সেই রাজার সঙ্ঘের কথা শুনে চলতে হতো। বৈদিক যুগেও সেই পদ্ধতিই ছিল। সভা ও সমিতির কথা প্রাচীনতম সংহিতা থেকেই শোনা যায়। আবার সেখানে রাজার কথাও বারবার বলা হয়েছে। কৌটিল্যের মন্তব্যের মানে এই যে কুরু জনপদে হস্তিনাপুর, বারণাবত, ভাগপ্রস্থ, তিলপ্রস্থ, ইন্দপ্রস্থে পরেও প্রাচীন বৈদিক শাসনতন্ত্র প্রচলিত ছিল, যেখানে রাজার সঙ্গে সভা সমিতির প্রাধান্যও বজায় ছিল। লিচ্ছবিদেরও তাই ছিল। রাজনীতিতে দুটির তফাৎ ছিল না বলেই কৌটিল্য দুটিকে এক জাতীয় বলেছেন। খাস মগধে সব বদলে গিয়ে দোর্দণ্ড প্রতাপ সম্রাটের শাসনের উদ্ভব হয়েছিল। কৌটিল্য তাঁর আদর্শ রাজ্যের জন্য দোর্দণ্ড প্রতাপ রাজার-বর্ণনাই দিয়েছেন। মগধের সঙ্গে পার্থক্যটা সদাই চোখে পড়ত বলে বৌদ্ধশাস্ত্রে লিচ্ছবি-বৃজিদের মগধের থেকে আলাদা দেখানোর জন্যই সঙ্ঘজীবী বলা হয়েছে। এই সঙ্ঘশাসন আর বৈদিক রাজশাসনের মধ্যে কোনো তফাৎ ছিল বলে মনে হয় না। মগধের চোখে কেউই যে রাজা ছিল না তার আর একটি প্রমাণও রয়েছে। সম্রাট অশোক একজন ভারতীয় রাজারও নাম করেননি। তাঁর আগে পর্যন্ত স্বাধীন কলিঙ্গেরও নয়। অশোকের উল্লিখিত রাজারা সকলেই বিদেশী। বাস্তব যাই হোক, মগধের চোখে বাকি ভারতে সঙ্ঘশাসন বা আরণ্যক জীবন প্রচলিত ছিল। উদয়ন, প্রদ্যোত, প্রসেনজিতের কথা

ছেড়ে দিলে রাজনীতিতে মৌর্যশাসিত মগধের সঙ্গে তার আগের ভারতের, বিশেষতঃ কুরু-পাঞ্চাল অঞ্চলের, আকাশ পাতাল তফাৎ হয়ে গিয়েছিল।

§৪. সাংস্কৃতিক আর্য

সংস্কৃতির শেষ পর্যায়ে লোহার ব্যবহার এলে এই পর্যায়ে চিত্রিত ধূসর কৌলাল সংস্কৃতির বাহকরা জঙ্গল কেটে পূর্ব ভারত ও দাক্ষিণাত্যে সভ্যতার বিস্তারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল অনুমান করা যায়। বৈদিক যুগের অন্তিম পর্যায়ের গ্রন্থ শতপথ ব্রাহ্মণে (১.৪.১.১০-১৪) সরস্বতীর তীর থেকে অগ্নিমুখ বিদেঘ মাথবের মাটি পুড়োতে পুড়োতে পূর্বগামী অগ্নির পেছন পেছন সদানীরা (গণ্ডক?) নদী পর্যন্ত যাত্রার গল্প আছে। অগ্নির যাত্রায় বৈদিক যজ্ঞের ইঙ্গিত থাকায় শতপথ ব্রাহ্মণের গল্পটি যে বৈদিক সংস্কৃতির প্রাচ্যপ্রসারের কাহিনী একথা শিখিয়ে দিতে হয় না। শতপথ ব্রাহ্মণেরই শেষ অংশ বৃহদারণ্যক উপনিষদে বিদেহ (=মিথিলা) রাজ জনকের সভায় যাজ্ঞবল্ক্য ও গার্গীর সুবিদিত তর্কটির বিবরণ মেলে। এখন চিত্রিত ধূসর কৌলালের অবক্ষীণ পর্যায়ের নিদর্শন বৈশালীতে মিলেছে এ কথাও ওপরে বলা হয়েছে। সুতরাং চিত্রিত ধূসর কৌলালের শেষ পর্যায়ে বিদেঘ মাথবের কাহিনীর উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা অস্বীকার করা যায় না।

আর একটু এগিয়ে অন্য কয়েকটি কথা ভাবা যায়। চিত্রিত ধূসর কৌলালের পরে উত্তর ও পূর্ব ভারতে অনেক উন্নত মানের উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলাল (Northern Black Polished Ware) সংস্কৃতির (নীচে §৬, ৮ দ্র.) আবির্ভাব ঘটে। হস্তিনাপুরে এটি কমবেশি তিনশ বছরের দীর্ঘ সময় ধরে থাকে। এখন শতপথ ব্রাহ্মণেই পুরুষমেধ যজ্ঞেরও বিস্তৃত বিবরণ আছে। কৌশাম্বীতে এক পুরুষমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে (নীচে দ্র.)। এই ঘটনায় যদি শতপথ ব্রাহ্মণের ঐতিহ্যের সঙ্গে কৌশাম্বীর কোনো বিশেষ যোগাযোগের আভাস থেকে থাকে তা হলে যাত্রা শুরুর আগে বিদেঘ মাথবের অন্য কোনো অঞ্চলের চেয়ে কৌশাম্বী অঞ্চলের সঙ্গে যোগের বেশি সম্ভাবনা মানতে হয়। কৌশাম্বীতেও অবক্ষীণ চিত্রিত ধূসর কৌলাল সংস্কৃতির নিদর্শন মিলেছে (নীচে দ্র.)। কাজেই বিদেঘ মাথব কৌশাম্বীর এই পর্যায়ের অথবা উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলাল সংস্কৃতির আদি পর্যায়ের মানুষও হতে পারেন। যেহেতু হস্তিনাপুর থেকেই চিত্রিত ধূসর কৌলালের মানুষেরা কৌশাম্বীতে এসেছিল, তৎকালীন সংস্কৃতির প্রসারের কাহিনীতে আমাদের শহর অপ্রাসঙ্গিক নয়।

যে সংস্কৃতি গড়ে উঠছিল এবং ছড়িয়ে পড়ছিল তাকে কি নামে ডাকা যাবে এ বিষয়ে একটু আলোচনা প্রয়োজন।

উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলাল সংস্কৃতি বৌদ্ধযুগের সমকালীন। অবশ্য একে শুধু বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গেই জড়ানো যায় না। সমকালীন ভারতবর্ষে - প্রধানতঃ উত্তর ভারতে বৈদিক ধর্মও প্রচলিত ছিল। এবং প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন লব্ধ বৈষয়িক সংস্কৃতির বিচারে বৈদিক ও বৌদ্ধ বলে বিভাজন রেখা টানার কোনো উপায় বা প্রয়োজন নেই। ধর্মীয় মতে আলাদা হলেও বৈদিক ও বৌদ্ধ মানুষ এক অভিন্ন সংস্কৃতিরই ধারক। উৎখননে পাওয়া উক্ত দুই বৈষয়িক সংস্কৃতির নথি যে সংস্কৃত ও পালি ভাষায় রচিত সাহিত্যের মাধ্যমে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে এ বিষয়ে সন্দেহ করা উচিত নয়। অর্থাৎ উত্তরবৈদিক সাহিত্য— যজুর্বেদ, উপনিষদ ও বেদাঙ্গের প্রাচীনতর গ্রন্থাবলী— যে চিত্রিত ধূসর কৌলাল ও উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলাল সংস্কৃতির মানুষের এবং প্রাচীনতম পালি গ্রন্থগুলি যে উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলাল সংস্কৃতির মানুষের সৃষ্টি এ কথা অস্বীকার করা যায় না। এখন এই দুই বৈষয়িক সংস্কৃতি যে একই বিকাশ ধারার দুটি স্তর এ কথা স্বতঃসিদ্ধ হয়ে রয়েছে। প্রত্যেক স্থলেই উদীচ্য

কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলাল সংস্কৃতির আবির্ভাব চিত্রিত ধূসর কৌলালের অবলুপ্তির অনতিকাল পরেই ঘটেছে। উৎখননের তথ্যকে যার সঙ্গে না মিলোলে ইতিহাসের অর্ধেকই অন্ধকার থাকে সেই সাহিত্যলব্ধ নথির সাক্ষ্যও সমকালীন সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতারই ইঙ্গিত দেয়। কারণ বৌদ্ধ ধর্মের মূল মতবাদগুলিতে তাদের আবির্ভাবের আগেই উত্তরবৈদিক— প্রধানতঃ ঔপনিষদিক ধারণাগুলির আবির্ভাব ও প্রভাব বিস্তারের ইঙ্গিত পাওয়া যায় (ওল্ডেনবার্গ ১৯১৫)। মানস ও বৈষয়িক বিকাশের নিখুঁত সমান্তরালতা প্রতিষ্ঠার স্থূলতা বর্জন করেও বলা যায় যে যে অর্থে বৈদিক ভাবনা থেকে বৌদ্ধ ভাবনার বিকাশ এক অবিচ্ছিন্ন ক্রমিক বিকাশধারার অঙ্গ সেই অর্থে চিত্রিত ধূসর কৌলালের পরেই তারই উত্তর স্তর হিসাবে উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলাল সংস্কৃতির আবির্ভাবও এক ধারাবাহিকতার অঙ্গ। সম্ভবতঃ এসব কারণেই এদুটি যে একই বিকাশধারার দুটি নিকটতম স্তর এ বিষয়ে কেউ অন্যরকম মতও প্রকাশ করেননি। এখন, একই বিকাশধারার দুটি স্তর হওয়ায় এবং এ দুটির সাংস্কৃতিক পারম্পর্য ও অন্তর্নিহিত ঐক্য বোঝানোর জন্য একটি নামও দরকার। কি নামে এদের অভিহিত করা যাবে সেটি একটি সমস্যা। এই যুগের জন্য হিন্দু নামটির ব্যবহার অবৈজ্ঞানিক হবে। দামোদর ধর্মানন্দ কোসম্বি (১৯৫৬-৭৫: ৮০...) সহ কেউ কেউ সাহিত্যিক নথির মাধ্যমে জানা উত্তর ভারতের সমসাময়িক সংস্কৃতিকে 'আর্য' আখ্যা দিয়েছেন। আলোচ্য উৎখনন-সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের মাধ্যমে ইতিপূর্বেই জানা উত্তর ভারতের সমসাময়িক সংস্কৃতিকে অভিন্ন ধরেই আমরা এগোচ্ছি। তাই কোসম্বির প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত মনে করলে 'আর্য' নামটি আলোচ্য উৎখনন-সংস্কৃতি দুটিকে বোঝাতেও প্রয়োগ করা যেতে পারে। একথা নিশ্চিতই বলা যায় যে ভাষা ও সংস্কৃতির বিচারে আমাদের আলোচ্য যুগ বৈদিক সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী এবং বৈদিক মানুষ নিজেদের আর্য বলে জানতেন। তাই চিত্রিত ধূসর কৌলাল ও উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলাল সংস্কৃতির অবিসংবাদিত অন্তর্নিহিত ঐক্যের সংকেতের প্রয়োজনে 'আর্য' নামটির ব্যবহার সুবিধাজনক। কিন্তু নানা কারণে বৈজ্ঞানিক আলোচনায় এই বহুল প্রচলিত শব্দটির ব্যবহারে খুবই সাবধান হওয়া দরকার।

এখানে উৎখনকের নিজের মতটি লক্ষ্য করলেই সাবধানতার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যাবে। চিত্রিত ধূসর কৌলাল সংস্কৃতির সঙ্গে মহাভারতের ঘটনাবলীর যোগের সম্ভাবনার কথা বলেও তিনি এখানে 'আর্য উপনিবেশের' অনুমান করেছেন। আর্য বলতে লাল ভারতে সদ্য প্রবেশকারী আর্যদের বুঝিয়েছেন। একেবারেই ভুল ধারণা নিয়ে এগিয়ে ভুল পদ্ধতির বিশ্লেষণ এবং দুর্ভাগ্যজনক। আর্য শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহারে কতো অবৈজ্ঞানিকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় এটি তার একটি নিদর্শন। এগুলি যে আদিম আর্য বসতি নয় তার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য চিত্রিত ধূসর কৌলাল পর্যায়ে চালের অস্তিত্বের প্রমাণ। এতদিন উত্তর বৈদিক সাহিত্যে চালের উল্লেখ পাওয়া গেলেও চালের এত পুরোনো উৎখনন সাক্ষ্য পাওয়া যায়নি। লাল সেই সাক্ষ্য এনে দিয়েছেন। ঋগবেদে ধান বা চালের উল্লেখ নেই, পরবর্তী অথর্ববেদ ও যজুর্বেদে আছে। এখন ঋগবেদই রচিত হয় আর্যরা ভারতে ঢোকার অনেক পরে। তারও অনেক পরে বৈদিক সংস্কৃতিতে ধানের প্রবেশ। এক্ষেত্রে যারা ১৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ বা তার আগে ভারতে ঢুকেছে সেই আর্যদের ১০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ হস্তিনাপুরে উপনিবেশ গড়ার তত্ত্ব অসম্ভব হতে বাধ্য। কাজেই সেই তত্ত্ব খাড়া করতে গিয়ে উৎখনককে কিছু প্রচলিত মতের আশ্রয় নিতে হয়েছে। এখানে সেগুলির অবতারণার প্রয়োজনই নেই।

এই রকম ভুল হওয়ার কারণ এই যে আমরা আর্য শব্দটিকে জাতি ও সংস্কৃতি এই দুটো আলাদা অর্থে বুঝি। ঋগবেদের রচয়িতারা নিজেদের আর্য বলে অভিহিত করতেন ঠিকই। কিন্তু ঋগবেদের রচনাকাল ১২০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের পরে বলে কেউ মনে করেন না। আর্যরা ভারতে প্রবেশ করে তারও

বেশ কয়েকশ বছর আগে। তারপর সিন্ধু-গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। বিশুদ্ধ 'আর্য'দের সঙ্গে ভারতীয় রক্তের ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ঘটেছে। এর ফলে যে নতুন সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে ঋগবেদেই তাকে বোঝানোর জন্য আর্য শব্দের 'অভিজাত' অর্থে প্রয়োগ আরম্ভ হয়েছে (ক্যয়্পার ১৯৯১: ৫-৭)। পরে তো এইটাই একমাত্র মানে হয় দাঁড়িয়েছে। শকুন্তলা যখন দুষ্যন্তকে 'অনার্য' বলছেন তখন শব্দটি জাতিবিশেষকে বোঝাচ্ছে না। 'অসভ্য' বললে যা বোঝায় শব্দটির অর্থ তাই। এই মানে বদলানো যে ঋগবেদেই শুরু হয়েছে সেটা বেশ কিছু পণ্ডিতের (বিশেষতঃ কয়্পার ১৯৯১) চোখেও পড়েছে। প্রয়োগের সময় আলগা কথোপকথনে যা চলতে পারে তা বৈজ্ঞানিক আলোচনায় অনুমোদিত নাও হতে পারে। ইতিহাসের সূক্ষ্ম আলোচনায় প্রয়োগের সময়ে সে বিষয়ে সচেতন না হলে ভুল তথ্যের পরিবেশনা ঘটে। জ্ঞানে অজ্ঞানে এই কাজটি অনেকেই করে থাকেন। ফলে যাঁরা অন্য বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ইতিহাস আলোচনায় বিশেষতঃ আর্য জাতি ও সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য না টেনে ভুল— এবং দুর্ভাগ্যক্রমে প্রভাববিস্তারে সক্ষম— মত প্রচার করেন। লাল আর্য বসতি বলতে আর্য নামধারী যে জাতি আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকের প্রথমার্ধে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল সেই জাতির বসতিকে বুঝিয়েছেন। আর্য শব্দের এই মানে উনবিংশ শতাব্দী থেকে চালু আধুনিক এবং প্রধানতঃ, পাশ্চাত্য গবেষণার দান। কিন্তু ঋগবেদের অন্তিম ভাগ থেকে আর্য শব্দ যে অর্থে ভারতবর্ষে চালু ছিল আমরা সেই অর্থেও অর্থাৎ বিশিষ্ট সংস্কৃতি বোঝানোর জন্যও শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। কোসম্বি সংস্কৃতি বোঝানোর জন্যই আর্য শব্দের প্রয়োগ করেছেন এবং ঠিকই করেছেন। কিন্তু একথা লাল সম্বন্ধে বলা যায় না।

মনে হতে পারে যে আমাদের আলোচনা ইতিহাসের বস্তু ছেড়ে শব্দের সূক্ষ্ম বিচারে চলে যাচ্ছে। ব্যাপারটা তা নয়। আর্য শব্দের মানে যে ঋগবেদেই বদলে যাচ্ছিল সেটা একটা মানস ব্যাপার মাত্র নয়। ইতিহাসের বাস্তব জগতেই কিছু ঘটনা ঘটেছিল। ভারতবর্ষের পূর্ববাসী মানুষের সঙ্গে বহিরাগত আর্যদের সাংস্কৃতিক ও রক্তের সংমিশ্রণের ফলে ঋগবেদের কালেই এক নতুন জাতি ও সংস্কৃতির জন্ম হচ্ছিল। এই জন্যই আর্য শব্দের মানে বদলে যায়। পরবর্তী কালে আর্য শব্দ দিয়ে যাদের বোঝানো হয়েছে তারা নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে একটি গোষ্ঠী নয়। যদি কোনোদিন ঐরকম নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী থেকেও থাকে ঋগবেদ রচনার আগেই বা মধ্যকালে তারা ভারতবর্ষের পূর্ববাসীদের সঙ্গে মিশে যায়। এটা স্বীকার করেই ঐতিহাসিকদের এগোতে হবে। কাজেই আর্য শব্দকে জাতি বোঝানোর জন্য প্রয়োগ করে এবং ফলতঃ বহিরাগত আর্য ও মহাভারতের 'আর্য'দের একাকার করে লাল এক অসম্ভব তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন।

§৫. হস্তিনাপুর-কৌশাম্বী থেকে ঐতিহাসিক যুগ

মহাভারতের সঙ্গে চিত্রিত ধূসর কৌলাল সংস্কৃতির যোগের পাশাপাশি একে আর্য সংস্কৃতি বলে চিহ্নিত করার মতো অতি বিতর্কসাপেক্ষ মত প্রকাশ করলেও বি.বি. লালের মূল কাজের মূল্য কমে যায়নি। তিনি উৎখননের তথ্যের সঙ্গে পুরাণের কিছু উক্তির সম্পর্কের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা সহ কয়েকটি মূল্যবান মন্তব্যও করেছেন। পুরাণের একটি উক্তি অনুসারে অভিমন্যুর ষষ্ঠ বা সপ্তম পুরুষ নিচক্ষুর রাজত্বকালে হস্তিনাপুর গঙ্গায় ডুবে যায় এবং নিচক্ষু কৌশাম্বী নগরে (আধুনিক কোসম, এলাহাবাদের প্রায় ৫০ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে) রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। লালের মতে (পৃ. ১৯৫৪: ১৪৯) উৎখনন পুরাণের ঐ উক্তিকে সমর্থন করে। লাল দেখিয়েছেন যে বসতির ফলে ভূমিতলে যখন দু-মিটারের মতো আস্তর জমেছে তখন গঙ্গার এক প্রবল বন্যার ফলেই হস্তিনাপুরে চিত্রিত ধূসর

কৌলাল সংস্কৃতির অবসান ঘটে। বন্যার চিহ্ন প্রাচীন দেয়ালের গায়ে খুব স্পষ্ট। শুধু তাই নয় সমকালীন কৌশাম্বীতে এক নতুন সংস্কৃতির সূত্রপাতও ঘটে এবং সবচেয়ে বড় কথা কৌশাম্বীর এই সংস্কৃতির একটি উপাদান হস্তিনাপুরের চেয়ে নিকৃষ্ট এক চিত্রিত ধূসর কৌলাল। লাল প্রথমে (১৯৫৪: ২২, ১৪৪) খুব সাবধানে ইঙ্গিত দিয়েছেন, পরে (১৯৬৪: ১৭৫; ওএব সাইট পৃ. ২৩ দ্র.) নিশ্চয়তা নিয়ে বলেছেন যে কৌশাম্বীর এই নতুন সংস্কৃতি বন্যায় বাস্তুচ্যুত হস্তিনাপুর থেকে নবাগত বাসিন্দাদের চিত্রিত ধূসর কৌলাল সংস্কৃতিরই দীনতর রূপ।

হস্তিনাপুরের ঘটনা এবং সমকালীন কৌশাম্বীর ব্যাপারটি একসঙ্গে বিবেচনা করলে এত আকর্ষক ও কৌতূহল উদ্দীপক হয়ে দাঁড়ায় যে একটু বিবরণী এখানে দেওয়া উচিত। লাল হস্তিনাপুরের উৎখননে হাত দেওয়ার কিছু আগে থেকেই এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে জি.আর.শর্মা প্রাচীন কৌশাম্বীর ধ্বংসাবশেষের উৎখননে হাত দেন। কৌশাম্বী সম্বন্ধে যা জানা গেছে তার কৃতিত্ব এই উৎখনকের। ষষ্ঠ শতাব্দীতে হূণদের আক্রমণে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত অবিচ্ছিন্ন বসতির সাক্ষ্যবাহী ১৬ মি. জমা স্তূপের খননকে উৎখনক ২৪টি স্তরবিশিষ্ট (structural phase) চারটি বসতি যুগে ভাগ করেছেন। মোট বসতিকালের সীমার হিসেব হয়েছে আনুমানিক খ্রি. পূ. ১১৬৫ অব্দ থেকে খ্রিষ্টিয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত। বিশিষ্ট লাল কৌলাল ব্যবহারকারী প্রথম যুগকে চেনা অর্থাৎ বর্গীকৃত করা যায়নি। দ্বিতীয় যুগে এক চিত্রিত ধূসর কৌলাল সংস্কৃতি মিলছে। উৎখনকের মত অনুসারে এই স্তরের বিস্তারকাল খ্রি. পূ. ৮৮৫ থেকে ৬০৫ অব্দ অবধি। লালের মতে এই সময়েই বিধ্বংসী বন্যার ফলে হস্তিনাপুরে চিত্রিত ধূসর কৌলাল সংস্কৃতির অবসান ঘটে। কৌশাম্বীতে খুব দীন পর্যায়ের চিত্রিত ধূসর কৌলালের চিহ্ন পাওয়া যায় একথাও ঠিক। চিত্রিত ধূসর কৌলালের অন্তিম স্তরের মতো কৌশাম্বীর এই স্তরেও লোহার ব্যবহার চালু ছিল। কাজেই পুরাণে পাওয়া হস্তিনাপুর ভেসে যাওয়ায় নিচক্ষুর কৌশাম্বীতে রাজধানী নিয়ে যাওয়ার কাহিনীর যথার্থতা এবং হস্তিনাপুর থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে আসা মানুষদের কৌশাম্বীতে নতুন বসতি গড়ে তোলার কথা স্বীকার করতে হয়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে (৩.৩.১) একটি প্রশ্ন তোলা হয়েছে, 'পরিক্ষিতের বংশধরেরা কোথায় গেল?' কোসম্বি (১৯৫৬-৭৫: ১২৬-১২৭) 'উপনিষদের ধাঁধা'টিকে কুরুদের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সর্বনাশ ও পরবর্তীকালীন ইতিহাসের অস্পষ্টতার কারণে উদ্ভূত মনে করেছেন। পুরাণেই ধাঁধাটার উত্তর দেওয়া ছিল, উৎখনন তাকে নিশ্চিত করেছে।

এখানে একটা আপত্তি ওঠে যে কৌশাম্বীর কাল বিস্তার বেশ দীর্ঘায়িত। শহর হূণ আক্রমণে ধ্বংস হয়। কাজেই শেষ বছরগুলি যে ষষ্ঠ শতকে পড়ে তা ঠিক। বাকি হিসেবে কিছু ভুল থাকতে পারে। কারণ প্রতি স্তরের জন্য গড়ে ৭০ বছর ধরে ২৪টি স্তবের মোট কাল ১৬৮০ বছর হিসাব করা হয়েছে। অনেক বিশেষজ্ঞই এত বিস্তৃত কাল অনুমানের পক্ষে নন। মোট কালের পরিমাপ সম্ভবতঃ বেশ কম হবে। যাই হোক কৌশাম্বীর বসতির শুরু ১০০০ খ্রি. পূর্বাব্দের আশেপাশে— সম্ভবতঃ কিছু আগে— ধরলে খুব ভুল হবে না মনে হয়। কিন্তু এতে হস্তিনাপুর ছেড়ে কৌশাম্বীতে বসতি স্থাপনের মতের কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। কারণ এ ক্ষেত্রে প্রতি স্তরের গড় বিস্তার ৭০ বছরটাও কমিয়ে আনতে হবে। কাজেই হস্তিনাপুরের চিত্রিত ধূসর কৌলালের অবসান ও কৌশাম্বীর দ্বিতীয় বসতির শুরুর সমকালীনতার সম্ভাবনা সমানই থেকে যাচ্ছে।

আর একটি সংশয়ও প্রকাশ করা হয়েছে। হস্তিনাপুরে দ্বিতীয় বসতির ওপরের স্তর থেকে রেডিও কার্বন পরীক্ষায় গড়ে খ্রি. পূ. ৬৫০ ও ৩৫০ তারিখ পাওয়া গিয়েছে। এই তারিখ ঠিক হলে আরম্ভ ও শেষ দুটির সময়ই কমবেশি ২০০ থেকে ৪০০ বছর নেমে আসে এবং বিস্তৃতি কাল ৮০০ থেকে

৪০০ অবধি দাঁড়ায়। কিন্তু নমুনাগুলিতে ঘাসের শেকড় মিশে থাকায় এই তারিখ ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি (লাল ১৯৬২:২২১)। পরেও তারিখ নিয়ে লাল (ওএব সাইট পৃ. ১;) তাঁর মত বদলাননি। অত্রাঞ্জিখেড়ার চিত্রিত ধূসর কৌলাল নমুনা রেডিও কার্বন পরীক্ষায় খ্রি. পূ. ১০২৫ অব্দ গড় তারিখ পাওয়া গিয়েছে। এও হস্তিনাপুরের তারিখ অত নামিয়ে আনার বিরুদ্ধ সাক্ষ্য (অন্য মতের জন্য দ্র. ঘোষ ১৯৭৩: ৫; ১০০০-৫০০ খ্রি. পূ.— চট্টোপাধ্যায় ২০০৩ (২০০১): ১০)। তারিখ নির্ধারণে নিশ্চিত হওয়া যায়নি এটা দুঃখের কথা।

খ্রিষ্টপূর্ব নবম বা অষ্টম শতাব্দীতে কৌশাম্বীতে রাজধানী স্থানান্তরীকরণের ঘটনা যদি সত্য হয় তা হলে ভারতের লিখিত ইতিহাসের শুরুর তারিখ ও স্থান বদলে গিয়ে খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মগধমুখী পূর্ব ও মধ্য ভারত থেকে দুশ থেকে তিনশ বছর আগের উত্তর ভারতে চলে যায়। পরিক্ষিৎ বা ঋণঞ্চয় থেকে লিখিত ইতিহাস না ধরলেও, অন্ততঃ আনুমানিক ৮০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নিচক্ষুর হস্তিনাপুর থেকে কৌশাম্বীতে রাজধানী নিয়ে যাওয়া থেকে ভারতের লিখিত ইতিহাস শুরু করতে হয়। মহাভারত ও পুরাণের মধ্যে যে বেশ কিছু ঐতিহাসিক উপাদান আছে তারও নিশ্চিত প্রমাণ মেলে। কিন্তু ভারতে উৎখনন ও সাহিত্যভিত্তিক গবেষণার মধ্যে বাঞ্ছনীয় সংযোগ গড়ে না ওঠায় এখন পর্যন্ত মহাভারত ও বেদ গবেষণায় লালের কাজের প্রভাব দেখা যায়নি।

§৬. উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলাল

গঙ্গার বিধ্বংসী বন্যায় খ্রিষ্টপূর্ব নবম বা অষ্টম শতাব্দীতে দ্বিতীয় বসতি পরিত্যক্ত হওয়ার কিছু কাল পরে হস্তিনাপুরের তৃতীয় বসতি গড়ে ওঠে। এই স্তরে হস্তিনাপুর প্রত্ন ইতিহাস থেকে অবিসংবাদিত ঐতিহাসিক যুগে প্রবেশ করে। তিনটি উপস্তরে বিভক্ত তৃতীয় স্তরের গভীরতা ৫ থেকে ৯ ফুট। উৎখনকের (পৃ. ২২) অনুমান খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত এর বিস্তার কাল। এই স্তরের বৈশিষ্ট্য উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলালেব কথা আগেই বলা হয়েছে। প্রধানতঃ কালো বা নীল রঙের, অত্যন্ত মসৃণ ও ধাতুর মতো— উৎখনকের ভাষায় (১৫) আয়নার মত-চকচকে। গা দিয়ে আলো ঠিকরে পড়ে। উন্নত চীনামাটির এই কৌলালের জন্য প্রাচীন ভারত গর্ব করতে পারত। রসায়নবিদের মত অনুসারে প্রথম পোড়ানোর পর ঠাণ্ডা রঙ তারপর আবার পোড়ানো এইরকম একাধিকবার করার ফলে দীর্ঘস্থায়ী ঔজ্জ্বল্য দান সম্ভব হয়েছে। ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্রে নীলঘটের উল্লেখ মেলে। তার উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলালের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে। গাঙ্গেয় উপত্যকায় এই কৌলাল বেশি পাওয়া গেছে। এই সময়ে ভারতীয় সভ্যতার মাধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রই ছিল বিশেষতঃ পূর্বভারতের গাঙ্গেয় সমভূমি— বর্তমান বিহার ও পূর্ব উত্তরপ্রদেশ, প্রাচীন মগধ, কাশী, বঙ্গ, কোশল ইত্যাদি। কাজেই উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলালের উদ্ভব পূর্ব ভারতে হওয়াই স্বাভাবিক। তবে ধনীদের পক্ষেই এই কৌলাল ব্যবহারের সামর্থ্য ছিল। সাধারণের জন্য অনেক নিকৃষ্টমানের ধূসর ও লাল পাত্র তৈরি হতো।

এ ছাড়া পিটোনো তামা বা রুপো থেকে হাতে চালানো যন্ত্রে কাটা ও রাষ্ট্রের ছাপ দেওয়া পাঞ্চ-মার্ক্ট কয়েন্ নামে পরিচিত মুদ্রার এবং ছাঁচে ঢালাই করা মুদ্রারও কয়েকটি নিদর্শন নিদর্শন পাওয়া গেছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে এই জাতীয় মুদ্রাকে পণ ও ছাপটিকে লক্ষণ বলা হয়েছে। মুদ্রায় লেখা কিছু নেই। যন্ত্রছাপ মুদ্রা মিলেছে তিনটি— দুটি রুপোর, একটি তামার। দুটির একদিকের ছাপ একেবারেই উঠে গিয়েছে, অন্যটিতেও অস্পষ্ট। মুদ্রা বিষয়ে উৎখনক বিশেষ মন্তব্য না করলেও দুটি ব্যাপার লক্ষ্য করা দরকার। প্রথমতঃ যন্ত্রছাপ মুদ্রাগুলির শুধু ছাপই অস্পষ্ট হয়ে আসেনি ওজনও দাঁড়িয়েছে ৩৬.০৫, ৩৮.৬৫ গ্রেন (চতুর্থ স্তর) এবং তামারটির ৩৪.৫ গ্রেন। ওজনের ব্যাপারটি বেশ

তাৎপর্যপূর্ণ। পরবর্তী কালে খ্রিষ্টিয় ২য়-৩য় শতাব্দীতে যন্ত্রছাপ মুদ্রাকে ধরণ বা পুরাণ নামে অভিহিত করা হয়েছে। মনুসংহিতা (৮.১৩৫-১৩৬) অনুসারে এগুলির ওজন ৩২ রতি অর্থাৎ ৫৭.৬ গ্রেন হতো। কৌটিল্য ধরণ নামক মুদ্রার উল্লেখ করেছেন। কৌটিল্য খুব স্পষ্ট নন, কিন্তু তাঁর মতও আলাদা নয় বলেই মনে করা হয় (কৌ. ২.১৯ =৩৭; দ্র. কাংলে ১৯৬৩: ১৫৩-৫৪)। তাহলে প্রাপ্ত মুদ্রার ওজন এত কম কেন? এই সমস্যা অবশ্য হস্তিনাপুরের একার নয়। এ নিয়ে কিছু আলোচনাও হয়েছে (দুর্গা প্রসাদ ১৯৩৪; ৫-৬, কোসম্বি ১৯৫৬: ১৭১-১৮৪ ইত্যাদি)। এর দুটো ব্যাখ্যা হতে পারে। দীর্ঘকাল অতিরিক্ত ব্যবহারে মুদ্রার ওজন কমে গিয়েছিল (কোসম্বি) এই ব্যাখ্যাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে অকুস্থলে বিনিময় প্রথা প্রায় উঠে গিয়েছিল বলে স্বীকার করতে হতে পারে। উঠে যেতে পারে এ কথা ঠিক। কিন্তু তবুও ৫৭ গ্রাম থেকে ৩৮ বা ৩৪ গ্রাম হওয়া একটু অস্বাভাবিক। তাই অন্য আর একটি সম্ভাবনার কথাও বিবেচনা করা উচিত। কেউ কেউ (দ্র. দুর্গা প্রসাদ ১৯৩৪) অনুমান করেছেন যে মনুসংহিতা বলা ৩২ রতি ওজনের ধরন পরবর্তী কালে প্রবর্তিত হতে পারে। 'পুরাণ' নাম থেকেই বোঝা যায় যে মনুসংহিতার রচনার অনেক আগেই এগুলো প্রবর্তিত হয়। উক্ত দ্বিতীয় মত অনুসারে প্রথম প্রবর্তনের সময়ে ধরনের মানক ওজন ২৪রতি অর্থাৎ প্রায় ৪৩ গ্রেন হওয়া অসম্ভব নয়। প্রকৃত পক্ষে খুব কম ব্যবহৃত ৪৩ গ্রাম ওজনের ধরণের নিদর্শনও আছে। এগুলি প্রথম যুগের ধরণ এই রকম মতও প্রকাশ করা হয়েছে। এখন মুশকিল এই যে দ্বিতীয় যুক্তিটি মেনে নিলেও সমস্যা যায় না। কারণ ৪৩ গ্রেন থেকে ক্ষয় পেয়ে ওজন ৩৪ গ্রেনে নেমে এলেও শতকরা ২০ ভাগ ক্ষয় স্বীকার করতে হয়। এক্ষেত্রেও দীর্ঘকাল ধরে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিনিময় ব্যবস্থার বদলে টাকার ব্যবহার বিপুলভাবে চালু ছিল স্বীকার করতে হয়। তাছাড়া একেবারে নীচের স্তরে অর্থাৎ বসতির শুরুতেই মুদ্রাগুলি মেলে। এটিও তাৎপর্যপূর্ণ। এ থেকে তৃতীয় স্তরের আদিপর্বেই বিনিময় প্রথার প্রভাব কমে যাওয়ার ও তার জায়গায় অন্তত: কিছু পরিমাণে মুদ্রাভিত্তিক বিপণন অর্থনীতির আবির্ভাব ও বাণিজ্যের ইঙ্গিত মেলে।

হস্তিনাপুরে মুদ্রা ব্যবস্থার গভীর প্রসার থেকে এও অনুমান করা যায় যে বিশেষ বাণিজ্যিক গুরুত্বের বলেই বন্যা বিধ্বস্ত শহরটি দু-তিনশো বছর বাদে আবার আরো সমৃদ্ধি নিয়ে প্রতিষ্ঠা ফিরে পেয়েছিল। দিল্লী থেকে গঙ্গার তীরে পড়ে হরিদ্বার হয়ে উত্তরাঞ্চল যাওয়ার পথ কল্পনা করলে হস্তিনাপুর পথে পড়বে। দক্ষিণ কুরুদেশ থেকে অমন কোনো পথ প্রাচীন কালে ছিল কিনা এরকম গবেষণার কথা আমার জানা নেই। কিন্তু হিমালয়ের বনসম্পদ সমভূমিতে নিয়ে আসার পথে হস্তিনাপুর গঞ্জের কাজ করতে পারত এ কথা নিশ্চিত বলা যায়। তাছাড়া শহর গঙ্গার তীরে অবস্থিত হওয়ায় জলপথে পূর্বভারতে এবং বঙ্গোপসাগরে পড়ে বৈদেশিক বা উপকূল বাণিজ্যেরও বিশেষ সুবিধা অনুমান করতে অসুবিধা হয় না। হিমালয়ে ভেষজ আহবণের কথা বৈদিক সাহিত্যেও পাওয়া যায়। অথর্ববেদে (পৈপ্পলাদসংহিতা ৭.১০.৮.৯, ১.৩১.২ শৌনকসংহিতা ৫ ৪.৫,৮) অনুসারে হিমালয়ের চূড়া থেকে জ্বর সারানোর জন্য কুষ্ঠ নামক ওষধী প্রাচ্যে ও মৎস্য প্রভৃতি দেশে নিয়ে যাওয়া হতো। অথর্ববেদেই (শৌনকসংহিতা ১০.৪.১৪, ১৫) পর্বতের সানুদেশে কিরাতকন্যার ভেষজ সংগ্রহ ও সেই প্রসঙ্গে সাপের মহাশত্রু এক যুবক চিকিৎসকের আবির্ভাবের কথাও আছে। পাহাড় থেকে ভেষজ সংগ্রহের এই রকম ইঙ্গিত অথর্ববেদে একাধিকবার আছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক প্রভাবশালী ব্যাপার না হলে অথর্ববেদে এগুলির উল্লেখ থাকত না। উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলালের সময় খ্রি. পূ. ষষ্ঠ থেকে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত। এটি উত্তরবৈদিক যুগের শেষভাগ বলে পরিচিত। এই যুগে অথর্ববেদের প্রথা চালু থাকাই স্বাভাবিক। রোমের ঐতিহাসিক ভারত থেকে পরবর্তী কালে বন্য প্রাণী আমদানির গল্পও লিখে গেছেন।

হস্তিনাপুর উত্তরাঞ্চলের হিমালয় থেকে নিয়ে আসা বনজ সম্পদ নিয়ে বাণিজ্যের গঞ্জ হিসাবে গুরুত্ব অর্জন করেছিল এই মত প্রকাশ করেছেন কিনা জানি না। নানা কারণে মতটি বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। একটি কারণ হলো এই যে বর্তমান উত্তরাঞ্চল প্রদেশে অলকানন্দা নদীর তীরবর্তী থাপলিতে (নৌটিয়াল ইত্যাদি ১৯৭৮; নীচে ১৪ দ্র.) উৎখনন থেকে চিত্রিত ধূসর কৌলাল সংস্কৃতির অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। এ থেকে বাণিজ্যের শুরু দ্বিতীয় স্তরেই হয়েছিল মনে হয়।

এখানে একথা স্বীকার করে নেওয়া উচিত যে সমসাময়িক সাহিত্যে— যার মধ্যে বিনয় ও সুত্তপিটক পড়ে— হস্তিনাপুরের বিশেষ উল্লেখ নেই। হস্তিনাপুর ষোড়শ মহাজনপদের অন্তর্গত কুরুদেশে অবস্থিত ছিল। ভাগবত এবং বিষ্ণুপুরাণে হস্তিনাপুরকেই কুরুদের রাজধানী বলা হয়েছে কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রে কুরুদের রাজধানী হিসাবে ইন্দ্রপ্রস্থের নাম পাওয়া যায়। দুই তথ্যের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, কারণ পুরাণে নিচক্ষুর রাজধানী স্থানান্তরীকরণের আগের কথা বলা হয়েছে, বৌদ্ধশাস্ত্রে বলা হয়েছে তার পরের কথা। নিচক্ষুর নতুন রাজধানী হস্তিনাপুর থেকে প্রায় সাতশ কিলোমিটার দূরে। একটা শহরই ভেসে গিয়েছিল। কুরুদেশবাসী সবাই নিচক্ষুর সঙ্গে যায়নি। বৌদ্ধশাস্ত্র থেকে পাওয়া তথ্য অনুমান করতে সাহায্য করে যে কুরুরা ইন্দ্রপ্রস্থে নতুন রাজধানী গড়ে তুলেছিল। ইন্দ্রপ্রস্থে তেমন কিছু উৎখনন না হওয়ায় এর চেয়ে খুব বেশি কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে দিব্যাবদানে (৩০ = সুধনকুমার অবদান) হস্তিনাপুরকে উত্তর পাঞ্চালের রাজধানী বলা হয়েছে। অন্যত্র অহিচ্ছত্রার নাম পাওয়া যায়। শহরটি উত্তর পাঞ্চালের দখলে চলে যাওয়া এবং অন্ততঃ কিছুকালের জন্য তাদের রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়া অসম্ভব নয়। ব্যাপক উৎখনন হয়ত রহস্যের ওপর আলোকপাত করতে পারে।

প্রাচীন হস্তিনাপুরের সঙ্গে জৈন ধর্মের কিছু সম্পর্ক থেকে থাকতে পারে। জৈন সাহিত্য থেকে সামান্য কিছু তথ্য মেলে। ১৭শ এবং ১৮শ তীর্থঙ্কর হস্তিনাপুরে জন্মেছিলেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। হস্তিনাপুরে অন্ত্য মধ্যযুগে জৈন মন্দির গড়ে ওঠে। এখনও জৈন মন্দির আছে। প্রাচীন জৈন সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডার এখনো অনেকটা অপ্রকাশিত বলে খুব বেশি তথ্য জানা নেই।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলি প্রাচ্যকেন্দ্রিক হওয়ায় তাতে হস্তিনাপুরের সমৃদ্ধির উল্লেখ না থাকাটা অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু হস্তিনাপুর কুরুদের রাজধানী না হলে পরবর্তী কালে এর সমৃদ্ধির বিশেষ তাৎপর্য স্বীকার করতে হয়।

সাহিত্যের নীরবতা বা তথ্যের অপ্রতুলতা ও উৎখননের ফাঁকগুলি পূরণের জন্য উভয়কে পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে যথাসম্ভব কাজে লাগানো উচিত। উৎখননের পরিসর খুব বড় নয় এ কথা আগেই বলা হয়েছে। ঢিবিগুলো গঙ্গার ধার দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে আধ মাইল ও পূর্ব-পশ্চিমে সিকি মাইল অর্থাৎ প্রায় ৩৫ লক্ষ বর্গফুট জায়গায় ছড়ানো। এককালে এগুলি অবিচ্ছিন্ন ছিল এও উৎখনকেরই ধারণা। তার ওপর অনেকটাই প্রাচীন বন্যায় ভেসে গিয়েছিল। পুরো শহরটি কলকাতার গঙ্গার ধারে ধারে বাগবাজার ও শোভাবাজারের মিলিত এলাকার চেয়ে ছোট ছিল না বোঝা যায়। এর পরিচয় উদ্ধারের জন্য চারটি অসম গর্ত (ট্রেঞ্চ) খোঁড়া হয়। দুটিতে শেষ মধ্যযুগীয় সুলতানি আমলের অবশেষ মেলে। বাকি দুটিতে আলোচ্য প্রাচীনযুগের ভগ্নাবশেষগুলি মিলেছে। একটি গর্তে খোঁড়া জায়গায় ক্ষেত্রফল ২১ X ৫৩০ = ১১১৩০ বর্গফুট, অপরটিতে ৪৮০ বর্গফুটেরও কম। মোট খোঁড়া জায়গাকে বর্গক্ষেত্রে পরিণত করলে এক একটি বাহু ১০০ ফুটের কিছু বেশি হয়। তার মানে গঙ্গার গর্ভে ভেসে যাওয়া অংশ সহ ধরলে প্রাচীন হস্তিনাপুর শহরের ৩৫০ ভাগেরও কম খোঁড়া হয়েছে।

এত কম জায়গাতেও সমৃদ্ধির কি পরিচয় পাওয়া গেছে দেখা যাক। অতি উচ্চমানের কৌলালের কথা আগেই বলা হয়েছে। বৈষয়িক সংস্কৃতিতে সবচেয়ে বড় ঘটনা অবশ্য লোহার

ব্যবহারের বিকাশ। আগে বলা যন্ত্রচ্ছেদ পণও (পাঞ্চ মার্ক্ড কয়েন) লোহার বাণিজ্যিক ব্যবহারের নিদর্শন। পাওয়া হাতিয়ারের মধ্যে বাণমুখ, উকো, বাটালি এবং কাস্তের উল্লেখ করা চলে। উৎখনকের মতে (১৬) লোহার নিয়মিত ব্যবহার আগের যুগের তুলনায় "লক্ষণীয় কারিগরি অগ্রগতি এবং জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত করে।" পোড়া মাটির ইঁট চিত্রিত ধূসর কৌলালের সঙ্গে কমই পাওয়া গেছিল। তৃতীয় যুগে বাস্তুকার্যে ব্যাপকভাবে পোড়া ইঁট ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণ আকারের ইঁট ছাড়া পাতকুয়োর বলয়ের গা বাইরের দিক থেকে মজবুত করার জন্য তৈরি হতো চক্রাংশ আকারের বিশেষ ইঁট। ব্যাপক খননের অভাবে রাস্তাঘাটের পরিকল্পনা বোঝা যায়নি। তবু দুটো পয়ঃপ্রণালীর অবশেষ পাওয়া গেছে। তার মেঝে পোড়া ইঁটের। একটির গভীরতা বোঝা গেছে— তিন ফুট। এই জলনিকাশী ব্যবস্থা শহরের জন্য সম্ভবতঃ পৌরশাসনের। বাড়ির আবর্জনা নিকাশ ও জলের ব্যবস্থার জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগই লক্ষ্য করা গেছে। বাড়ির মধ্যে পাতকুয়ো ছাড়া আরও একটি ব্যবস্থা দেখা গেছে গভীর গর্ত করে লম্বা ঘড়ার ওপর ঘড়া সাজিয়ে দেওয়া। ঘড়াগুলি প্রত্যেকটির তলাতেই ফুটো। স্পষ্টতই এর উদ্দেশ্য মাটিতেই আবর্জনার শোষণ। এটাই শৌচাগার ব্যবস্থা মনে হয়।

একটা কথা মনে রাখা দরকার। এই সময় অবধি বাড়ি তৈরিতে কাঠের ব্যবহারই বেশি ছিল ইঁটের বা পাথরের নয়। পরবর্তী পাথরের শিল্পকাজে এর প্রভাব চোখে পড়ে। সমাজ ব্যবস্থাতেও কাঠের ব্যাপক ব্যবহারের পরোক্ষ প্রভাব পড়েছিল মানতে হবে। রাজা ও ধনীদের আসবাব ও গৃহ নির্মাণে কাঠ বেশি ব্যবহার হলে সূত্রধর শ্রেণীর প্রয়োজনীয়তা বেড়ে যেতে পারে। খুব সম্ভবতঃ এরই ফলে সমাজে এই শ্রেণীর স্থান তুলনীয় অন্য বৃত্তিধারীদের চেয়ে ওপরে ছিল। এদের কারো কারোর যজ্ঞ করার অধিকার ছিল।

অতি সামান্য খোঁড়া থেকে সমৃদ্ধির যে পরিচয় পাওয়া গেছে তা দিয়ে সমাজের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসতে গেলে ভুলের সম্ভাবনা থেকে যায়। কয়েকটি সাধারণ সিদ্ধান্ত সম্ভবতঃ করা চলে। হস্তিনাপুর কোনোদিনই গোয়ালিয়র, ফতেপুর সিক্রি বা লালকেল্লার মতো মধ্যযুগীয় দুর্গনগর বা সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল না। এই শেষোক্ত শ্রেণীর নগরের বাসিন্দা হতো রাজা ও পারিষদবর্গ। 'এশিয়াটিক' সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা অনুসারে ঐজাতীয় নগরকে ঘিরে থাকত প্রায় নব্যপ্রস্তরযুগের মানের কৃষিজীবী বা যাযাবর গ্রামবাসীরা। সামান্য বাণিজ্য কর্ম যা হতো তা অতি অভিজাত সীমিত ক্রেতাবর্গের জন্য। সেখানে ব্যাপক হারে গৃহনির্মাণের প্রশ্নও উঠত না। হস্তিনাপুরের সামান্য উৎখননও প্রমাণ করে যে এই শহর কেবল রাজা ও অভিজাতদের জন্য নির্মিত দুর্গ ছিল না, আর্থসামাজিক কারণে আগত সমৃদ্ধি ও নগরায়ণের ফল স্বরূপ বিপণনবহুল অর্থনীতিসম্পন্ন এক ***জনবসতি*** হিসাবে গড়ে উঠেছিল। যদি রাজা ও অভিজাতবর্গই এই ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধির সুফলের ভোক্তা হতো তা হলে তামার মুদ্রা পাওয়া যেত না, উচ্চমানের শিল্পকর্মযুক্ত সোনার মুদ্রা পাওয়া যেত— যেমন ব্যাক্ট্রীয় শাসনে, গুপ্তযুগে বা মধ্যযুগে ও মুঘল আমলে পাওয়া গেছে। অতি সাধারণ মুদ্রা মানেই সেটার ব্যবহারকারী সাধারণ মানুষ। মুদ্রার অস্বাভাবিক ক্ষয়ও এই সিদ্ধান্তের দিকেই নির্দেশ করে। কাজেই উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলালের হস্তিনাপুরকে বিপণনবহুল অর্থনীতিসম্পন্ন জনবসতি হিসাবেই স্বীকার করে নিতে হয়। এই জাতীয় অনেক ক্রমবর্ধমান শহরের অস্তিত্ব এও দেখিয়ে দেয় যে ভারতবর্ষে অন্তত তখন পর্যন্ত তথাকথিত অচলায়তন, অনড় 'এশিয়াটিক' সমাজব্যবস্থার প্রসারও হয়নি এবং উক্ত ধারণার মধ্যেই অনেক ভুলও আছে ও নতুন করে চিন্তা করারও প্রয়োজনীয়তা আছে। এসব ব্যাপারে আমরা আরো আলোচনার সুযোগ পাব।

খ্রি. পূ. তৃতীয় শতাব্দীতে এক সর্বনাশা অগ্নিকাণ্ডে হস্তিনাপুর আবার ধ্বংস হয়ে যায়। তাই তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরের মাঝখানে শুধুই পোড়ামাটি আস্তর দেখা গেছে। এই অগ্নিকাণ্ডের কারণ নিয়ে কেউ আলোচনা করেছেন বলে আমার জানা নেই। খ্রি. পূ. তৃতীয় শতাব্দীর শেষে বা দ্বিতীয় শতাব্দীর গোড়ায় ভারতের মাটিতে বাহ্লীক (ব্যাক্ট্রীয়) এবং সেলুকাসের উত্তরাধিকারী পরবর্তী এশীয় গ্রীকদের আক্রমণের প্রমাণ আছে। খ্রি. পূ. দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে মগধরাজ পুষ্যমিত্রের সভায় বসে পতঞ্জলি (মহাভাষ্য ৩.২.১১১) বলেছেন যে যবনেরা সাকেত ও মধ্যমিকা অবরোধ করেছিল। গার্গী বা গর্গসংহিতার অন্তর্গত যুগপুরাণে (৪৭) যবনদের হাতে সাকেত, পাঞ্চাল, মথুরা এবং পাটলিপুত্র অবরোধের কথাও আছে। মালবিকাগ্নিমিত্র নাটকে কালিদাস মগধরাজ পুষ্যমিত্রের (খ্রি. পূ. ১৮৭-১৫১) পৌত্র বসুমিত্রের হাতে যবনদের পরাজয়ের কথা বলেছেন। ঐতিহাসিক স্ত্রাবোও দেমেত্রিউসের ভারত আক্রমণের কথা বলেছেন। পুরাণেও কলিযুগের শেষে আটজন যবনরাজার ৮০ বা ৮৭ বছর রাজত্ব, অত্যাচার এবং পরে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণের কথা আছে। মেনন্দরের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের কাহিনীও সুবিদিত। পাঞ্চাল এবং সাকেত আক্রমণের সময়ে হস্তিনাপুরের পথে পড়াই স্বাভাবিক। সম্ভবতঃ, যুগপুরাণ রচনার সময়ে (দ্বিতীয় শতাব্দী?) কুরুদের গুরুত্ব কমে গিয়েছে বলে কুরু-পাঞ্চাল বুঝোতে শুধু পাঞ্চালের নামই করা হয়েছে। আলেকজাণ্ডারের সময় থেকে গ্রীকরা নগর পুড়োনোর জঘন্য নজিরও রেখে গেছে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগতে পারে যে হস্তিনাপুরের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের নায়ক আক্রমণকারী গ্রীকরা হতে পারে কিনা।

এখন ভারতে এশীয় গ্রীক আক্রমণের ঘটনা খ্রি. পূ. ২০৬ অব্দে সেলুকাসের ছেলে তৃতীয় আন্তিওখুসের সঙ্গে ব্যাক্ট্রীয় রাজা বা ক্ষত্রপ দেমেত্রিউসের সন্ধি হবার আগে হয়নি। কাজেই উৎখনকের দেওয়া তারিখের সঙ্গে গ্রীক আক্রমণেব ফলে উক্ত অগ্নিকাণ্ডের তত্ত্বটি মেলে না। উৎখনকের মতে পুড়ে যাওয়ার পর প্রায় একশ বছর ধরে স্থানটি অনধ্যুষিত থাকে এবং খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে আবার বসতি গড়ে ওঠে। তাহলে অগ্নিকাণ্ডের তারিখ গিয়ে পড়ে খ্রি. পূ. তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে।

তারিখ নির্ধারণে রেডিও-কার্বন পদ্ধতির আশ্রয় নেওয়া হয়নি। (নেওয়া হলেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যেত কিনা সন্দেহ আছে।) উৎখনকের মন্তব্য (১৯৫৪: ২১) থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে অন্যান্য স্থানে উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলালের কালের সঙ্গে খাপ খাইয়ে হস্তিনাপুবের তৃতীয় স্তরের বর্সাত অগ্নিকাণ্ডের সময় ঠিক করা হয়েছে। তাঁব ভাষায় (২১) "তৃতীয় স্তরের সময়সীমা উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলালের তারিখ এবং উত্তরভারতের আদি ঐতিহাসিক যুগের আনুষঙ্গিক সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করে।" পদ্ধতিটি এই রকম। চতুর্থ স্তরের আরম্ভের সময়টি ঐ স্তরে পাওয়া মথুরা শাসকদের নামে ছাপা মুদ্রাগুলি থেকে উৎখনক মোটামুটি নিশ্চিত ভাবে খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে ফেলেছেন। তারপর (২২) স্পষ্ট স্বীকার করেছেন যে তৃতীয় স্তরের অগ্নিকাণ্ডের পর জায়গাটা কতদিন অনধ্যুষিত ছিল তা নির্ধারণ করা খুব শক্ত। "What could be the duration of the a ıt is very difficult to say." চতুর্থ স্তরে কৌলালের চরিত্র সম্পূর্ণ বদলে যাচ্ছে একমাত্র এই যুক্তির বলে তিনি সাবধানেই বলেছেন, "তৃতীয় স্তরের অবসান সম্ভবত খ্রি. পূ. তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধের কোথাও ফেলতে হবে।" অর্থাৎ একশ বছরের অবকাশ ধরে দেওয়া হচ্ছে।

এই তারিখ একেবারেই আন্দাজের ওপর নির্ভর করে ঠিক করা। অন্যত্র লাল (১৯৬৪:১৭৪) কৌশাম্বী, তক্ষশীলা ইত্যাদির সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করে উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলালের তারিখ নির্ধারণ করেছেন খ্রি. পূ. ষষ্ঠ থেকে দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত। হস্তিনাপুরেও দুই স্তরের মধ্যে সময়ের অবকাশ যদি

তিরিশ বছর ধরা হয় তাহলে তৃতীয় স্তরের অবসান ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি গিয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে গ্রীক আক্রমণে হস্তিনাপুরের তৃতীয় বসতি ধ্বংস হওয়ার যুক্তিটা প্রবল হয়ে ওঠে। সাহিত্যলব্ধ প্রতিষ্ঠিত সাক্ষ্যের সাহায্য না নেওয়ায় এইখানে প্রকৃত তারিখ উৎখনকের অনুমানের সঙ্গে হয়ত নাও মিলতে পারে।

খ্রি. পূ. তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত কাঠের বাড়ির আধিক্যের কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু এমন সর্বগ্রাসী আগুন কেবল অসতর্কতা জনিত দুর্ঘটনার ফলে হতে পারে না। খুব স্বাভাবিক প্রশ্ন এই যে শহর এমন ভাবে কি করে পুড়ে গেল যে অধিবাসীদের সাময়িকভাবে শহর ছেড়ে চলে যেতে হলো। কৌটিল্যের সময়ে এবং মৌর্য শাসন প্রবল থাকা কালে তো যুদ্ধে পরাজয় ছাড়া এ রকম সর্বগ্রাসী আগুন লাগা অসম্ভব ছিল। কারণ কৌটিল্য (২.৩৬ = ৫৬) শহরে আগুন লাগার বিরুদ্ধে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করার বিস্তৃত নির্দেশ দিয়েছেন।

আর একটি ব্যাপার। ফিরোজ শাহ তুঘলক চতুর্দশ শতাব্দীতে অশোকের একটি স্তম্ভলেখ মেরঠের 'আশপাশ থেকে' (হুল্‌ট্‌স ১৯২৪ ৬৯:১৭) দিল্লীতে নিয়ে এসেছিলেন। স্তম্ভলেখটি খ্রি. পূ. ২৪২-২৪৩ অব্দে প্রবর্তিত। মেরঠ অঞ্চলে বর্তমান সদর শহর থেকে প্রায় সমান দূরত্বে অন্তত ছটি চিত্রিত ধূসর কৌলাল বসতি গড়ে উঠেছিল— হস্তিনাপুর, বর্ণাওয়া (বারণাবত), সৈনি, বিসরাখ, বাঘপত (ভাগপ্রস্থ) ও সোনেপত (৩ দ্র.)। ছয় শহরের ও দক্ষিণ কুরুদেশের জনপদের রাজপুরুষদের উদ্দেশ্য করে স্তম্ভলেখটি হয়ত কোনো চতুষ্পথে খাড়া করা হয়েছিল। কিন্তু লেখে হস্তিনাপুরের ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের কোনো আভাস নেই। শাসনলেখ প্রবর্তনের স্থান সম্বন্ধে অশোকের সচেতনতা থাকত। ধৌলিতে (স্বতন্ত্র শাসন ১) তোসলি নগরের, জৌগড়ায় (গিরিশাসন ১) খপিঙ্গলপর্বতের নাম করেছেন; সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে ওড়িশায় কলিঙ্গ শাসনের বদলে অন্য শাসন প্রবর্তনে। তাই ইতিমধ্যে হস্তিনাপুরের অগ্নিকাণ্ড ঘটে গিয়ে থাকলে তার সঙ্গে দিল্লী-মেরঠ স্তম্ভলেখের ভাষা যেন ঠিক খাপ খায় না। মনে হয় যে খ্রি. পূ. ২৪২ অব্দের আগে পর্যন্ত হস্তিনাপুর অগ্নিকাণ্ডের জন্য সাময়িক পরিত্যক্ত হয়নি। অশোকের সংস্কারের ফলে তাঁর শাসনকাল শেষ হয়ে যাওয়ার পর কিছুদিনের জন্য প্রশাসন শিথিল হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু প্রশাসন শিথিল হয়ে গেলেও বিনা আক্রমণে সারা শহর আগুনে ধ্বংস হয়ে যাওয়া অবিশ্বাস্য ঠেকে। সন্দেহের কাঁটা আক্রমণকারী গ্রীকদের দিকেই ঘুরে থাকে।

তৃতীয় বসতি সম্বন্ধে আরো অনেক প্রশ্ন থাকা স্বাভাবিক। এই স্তরে হস্তিনাপুর কোন রাজা বা সাম্রাজ্যের অধীন ছিল? শহর কি করে গড়ে উঠল? শহরের বাসিন্দা কারা ছিল? উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলাল কারা ব্যবহার করত? উৎপাদন সম্পর্ক কি রকম ছিল?

প্রথম প্রশ্নটির উত্তর সুবিদিত। পুরাণ, বৌদ্ধশাস্ত্র এবং গ্রীক ঐতিহাসিকদের বিবরণের ভিত্তিতে পণ্ডিতরা একমত যে খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে উত্তর ভারত মগধের শাসনাধীন ছিল। রঙ্গভূমিতে উত্তরপাঞ্চালের আবির্ভাবের কথা ওপরে বলা হয়েছে। সেটা মৌর্যশাসনের আগে না পরে নিশ্চিত করে বলা যাবে না। সম্ভবত পরে। উৎখনকের মত মানলে অগ্নিকাণ্ডটি সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে তাঁর রাজ্যেই ঘটেছিল মানতে হয়। নচেৎ মৌর্য সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে যাওয়ার পর ঐ ঘটনা মানতে হয় (বর্তমান লেখকের মত)। বাকি প্রশ্নগুলির আলোচনা আরো পরে ছাড়া করা যাবে না।

§৭. শ্রেষ্ঠীদের শহর

অসাধারণ প্রাণশক্তি বলে শহর হস্তিনাপুর কয়েক দশকের মধ্যে আবার আরও সমৃদ্ধি নিয়ে ফিরে আসে। এই দ্বিতীয়বার হস্তিনাপুর সব শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও পুনর্জন্ম নিল। কুরু-পাণ্ডবদের কথা

লোকের মুখে মুখে ফেরে। কিন্তু এইভাবে মরে গিয়ে বেঁচে উঠে 'দিগন্ত দ্রুত সাড়ায়' ভরিয়ে দিয়ে হস্তিনাপুরবাসী যেখানে সত্যিই বীরত্ব দেখিয়েছিল, যেন কবির আফশোষকে সত্য প্রমাণ করার জন্য সেই কাহিনী বিশেষজ্ঞের গ্রন্থের বাইরে পা বাড়ায়নি।

চতুর্থ স্তরে হস্তিনাপুরে উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলালের মতো কোনো ঝলমলে আসবাব পাওয়া যায়নি। আর্যজাতি বা মহাভারতের মতো কোনো ডাকসাইটে আত্মীয়তার দাবিও এই স্তরের নেই। উৎখনকও যেন এই স্তরের বিবরণ দিতে আগের স্তরগুলির মতো উৎসাহী নন। কিন্তু তার পুরো ইতিহাসে চতুর্থ স্তরের হস্তিনাপুর সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। এর বিস্তৃতি কাল দীর্ঘতম— খ্রি. পূ. তৃতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে খ্রি. তৃতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত কিছু কম পাঁচশ বছর। একটানা এত দীর্ঘকাল বসতির নজির প্রাচীন ভারতে বেশি নেই। জীবনযাত্রাতেও অনেক উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়। কৌলাল, গৃহনির্মাণ, বসতির ঘনত্ব ও পরিকল্পনা এবং মুদ্রার ব্যবহার— প্রত্যেকটিতেই তাৎপর্যময় পরিবর্তন চোখে পড়ে।

দ্বিতীয় স্তরেই মাটির পাত্রের জন্য কুমোরের চাকার প্রচলন হলেও এতদিন কখনো কখনো হাতে গড়া নিকৃষ্ট মানের পাত্রও পাওয়া গেছে। চতুর্থ স্তরে পাওয়া পাত্রগুলি কিন্তু সবই কুমোরের চাকায় তৈরি। আগের স্তরে দুরকমের কৌলাল দেখা গিয়েছিল— উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলাল এবং একটি নিকৃষ্ট মানের ধূসর কৌলাল। বর্তমান স্তরে দুটিরই ব্যবহার সম্পূর্ণ উঠে যায় ও মজবুত গঠনের এক লাল কৌলালের ব্যাপক প্রচলন হয়। এই লাল কৌলালের কোনো কোনো নিদর্শনে অবশ্য পাত্রের গা চকচকে করার চেষ্টা দেখা গেছে।

গৃহনির্মাণের বিস্তার ও পরিকল্পনা ঢঙ থেকে উৎখনক সাতটি ভিত্তিস্তরে গঠনকার্য অনুমান করেছেন। এক জায়গায় পুরোনো দেয়ালের ওপর দুবার নতুন দেয়াল উঠেছে। এর থেকে বর্ধমান জনসংখ্যার চাপ এবং বাড়ি তৈরির জন্য দীর্ঘকাল ধরে জমির চাহিদা বজায় থাকা— দুটিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বসতিও খুব ঘন হয়ে গড়ে উঠেছিল। কাঠের ব্যবহারের বিশেষ ছাপ নেই। আগের স্তরে রোদে শুকোনো ইঁটেও বাড়ি তৈরি হয়েছে, কিন্তু এই স্তরে নয়। সবই পোড়ামাটির ইঁটের বাড়ি। পরিকল্পনাও নিখুঁত। বাড়ির দেয়াল মূল দিকগুলির বরাবর গাঁথা, কোণাকুণি নয়। একটি ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা খোঁড়া হয়েছে। তার পার্শ্বস্থ একটি বাড়ির খানিকটা বেশ বোঝা গেছে— একদিকে ১২ ফুট ও অপরদিকে আরো দীর্ঘ দেওয়াল সমন্বিত একটি ঘর ছিল। লাগোয়া স্নানঘরটি একটু ছোট। পাশেই জলনিকাশের ছোট নালা।

এই স্তরের একটি ব্যাপার উৎখনকের কাছে (পৃ. ১৮) উল্লেখযোগ্য ঠেকেছে। চতুর্থ স্তরে একটি মাত্র পাতকুয়োর সন্ধান মিলেছে। উৎখনক এর কোনো ব্যাখ্যা দেননি। আপাতত, এটি একটি অসঙ্গতি। সব দিকেই যখন হস্তিনাপুরের উন্নতি হচ্ছিল তখন অভাব বা দারিদ্র্যের কারণে এটা হয়েছিল একথা বলা যায় না। উৎখননের অপ্রতুলতার জন্য নিশ্চিত ভাবে মত প্রকাশ করাও অসম্ভব। বিস্তৃততর উৎখনন হলে হয়ত ধারণা বদলাতে পারে। একটা সন্দেহ প্রকাশ করা যায়। পশুশক্তি দিয়ে গিয়ার পদ্ধতিতে চালানো জলযন্ত্র অরঘট্ট (হিন্দী রহেট) ভারতবর্ষে খ্রিষ্টাব্দ শুরুর আশেপাশেই প্রচলিত হয়ে গেছে। অরঘট্ট দিয়ে বড় ইঁদারা থেকে পাতকুয়োর চেয়ে অনেক বেশি জল তোলা সম্ভব। পৌরনিগম এই ভাবে জল তোলার ব্যবস্থা করতে পারে। ভারীকে দিয়ে সেই জল ঘরেও নিয়ে আসা যায়। ভারীরা খুব প্রাচীন শ্রেণী। অন্য উৎস থেকেও তাদের দিয়ে সর্বসাধারণের জন্য জলের ব্যবস্থা হয়ে থাকতে পারে।

গয়নাপত্রের ও অন্যান্য সবকিছু খুঁটিনাটির পরিচয় দেওয়া এখানে সম্ভব নয়। উল্লেখযোগ্য পাওয়ার মধ্যে মথুরা, যৌধেয় ও কুষাণরাজ বাসুদেবের অনেক মুদ্রা ও অভয়মুদ্রাবিশিষ্ট মৈত্রেয় বোধিসত্ত্বের একটি মূর্তির নাম করা যেতে পারে।

উৎখনক সমস্ত মুদ্রার বিবরণী দেননি। অধিকাংশই এত ক্ষয়ে গিয়েছে যে পরিচয় উদ্ধার করা অসম্ভব। পাওয়া ৮৫টির মধ্যে ২৯টি বর্ণনা করার মতো অবস্থায় হাতে এসেছে। এর মধ্যে একটি তাম্রমুদ্রা তৃতীয় না চতুর্থ স্তরের তা বোঝা যায়নি। বাকিগুলির ৬টি তৃতীয়, ২১টি চতুর্থ ও একটি পঞ্চম স্তরের। তৃতীয় স্তর সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েছে। চতুর্থ স্তরের মুদ্রাগুলির অধিকাংশই মথুরার বা যৌধেয়গণের প্রবর্তিত অথবা কুষাণরাজ বাসুদেবের নামাঙ্কিত। হস্তিনাপুরের রাজনৈতিক ইতিহাস এত অপরিজ্ঞাত যে শহর কখনো ঐ রাজ্যগুলির অধীনে ছিল কিনা জানা নেই। ওপরে বলা হয়েছিল যে শহর কখনো উত্তরপাঞ্চালের রাজধানী হয়ে থাকতে পারে। যদি আর কেউ রাজত্ব না করে থাকে তাহলে মুদ্রাগুলো হরিয়ানা ও শূরসেন অঞ্চল থেকে সওদা করতে আসা মানুষের খরচ করা। একটি রৌপ্য ধরণ (৩৮.৬৫ গ্রেন, ওপরে বলা) ছাড়া সবই তামার। বিপণন অর্থনীতির প্রাধান্য দুটি ব্যাপার থেকে বোঝা যায়। অধিকাংশ মুদ্রাই তামার। দুই সহস্রকে বহু দামি মুদ্রা লুঠ হয়ে গিয়েছে ধরেও বলা যায় যে ব্যবহারকারীদের মধ্যে অনেকেই সাধারণ মানুষ ছিল। এর ওপর প্রায় ৭০ শতাংশ মুদ্রা এত ক্ষয়ে গিয়েছে যে কোনো পরিচয়ই দেওয়া যাচ্ছে না। এর কারণ দীর্ঘকাল হাতে হাতে ঘোরা।

উৎখনকের মতে খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে শহর পরিত্যক্ত হয়। কারণ জানা যায়নি। এরপর আটশ বছর হস্তিনাপুরে কোনো বসতির পরিচয় নেই। একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে নতুন বসতি হয়; পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত বজায় ছিল। উৎখনকের মতে এই যুগের স্থাপত্যের কিছু নিদর্শন পাওয়া গেলেও তাতে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু নেই। একটি বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়। শেষ স্তরটি প্রাচীন স্তরগুলিতে লক্ষিত ধারাবাহিকতা ও ক্রমিক বৈষয়িক অগ্রগতির অঙ্গ হিসাবে আসেনি।

§৮. কৌলাল বিচার

হস্তিনাপুরকে নিয়ে অনেক প্রশ্ন তোলা যায়। শহর গড়ে ওঠার কিছু প্রশ্ন ওপরে রাখাও হয়েছিল। শহর লুপ্ত হয়ে যাওয়ার প্রশ্নও সমানই গুরুত্বপূর্ণ। হস্তিনাপুর কেন পরিত্যক্ত হলো এবং পরিত্যক্ত হওয়ার পর দীর্ঘ আটশ বছর কেন কোনো বসতি গড়ে উঠল না? দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে ঐজাতীয় শহর বিলোপের কোনো স্মৃতির আভাস আছে কিনা। এগুলির আগে ষষ্ঠ অনুচ্ছেদের শেষে তোলা শহর গড়ে ওঠার প্রশ্নগুলির আলোচনা করা দরকার।

তৃতীয় স্তরে হস্তিনাপুর শহরের বাসিন্দা কারা ছিল? উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলাল কারা ব্যবহার করত? তৎকালীন উৎপাদন সম্পর্ক কি রকম ছিল? এর সঙ্গে আরেকটি প্রশ্নও জুড়তে হবে: তৃতীয় স্তরে উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলালের সঙ্গে অনেক নিম্নমানের একটি ধুসর কৌলালের ব্যবহার দেখা গিয়েছিল। তিনশ বছর একটানা পাশাপাশি ব্যবহারের পর কয়েক দশকের অবকাশের পর একরকম হঠাৎই চতুর্থ স্তরে দুটিই উঠে গিয়ে এক নতুন মাঝারি মানের কিন্তু অত্যন্ত মজবুত কৌলালকে জায়গা করে দিল। শুধু হস্তিনাপুরেই নয় যেখানেই তার তৃতীয় স্তরের সংস্কৃতির অনুরূপ সংস্কৃতি চালু ছিল সেই সব জায়গাতেই ঐ ব্যাপার ঘটল। এর পেছনে কি রহস্য আছে?

উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলালের ব্যবহারের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। লাল (পৃ. ১৫) এটিকে পরম বিলাসময় আসবাব (‘*ware de luxe*’) বলে বিশেষিত করেছেন। ঐতিহাসিক রাম শরণ শর্মাও (১৯৮৫:৭৬৭) এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এই কৌলাল ব্যবহার করা সাধারণ মানুষের ক্ষমতার বাইরে ছিল। খুব বড়লোকরাই এগুলি ব্যবহার করতে পারত। তারা কে ছিল?

রাম শরণ শর্মার মতে ঐ কৌলাল পাওয়া গেছে পালি ও সংস্কৃত শাস্ত্রে বর্ণিত মহাজনপদগুলিতে। এই জনপদগুলিতে পুরোহিত, যোদ্ধা ও গৃহপতিদের নিয়ে সমাজের উচ্চস্তর গঠিত হয়েছিল এবং

তারাই ঐ বিলাসবহুল আসবাব ব্যবহার করতে পারত। শর্মা পালি গ্রন্থ ও ধর্মসূত্র থেকে উক্ত উচ্চস্তর গঠিত হওয়ার যুক্তি দিয়েছেন।

এখন, উল্লিখিত শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে তৎকালীন সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির প্রাধান্যের পরিচয় পাওয়া যায় এ কথা ঠিক। সেই পরিচয়ের ভিত্তিতেই শর্মা তাঁর উক্তি করেছেন। কিন্তু ঐ ব্যাপার ভারতীয় সমাজে আলোচ্য কালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, ওটি সাবেকি ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য। পরবর্তী কালে যখন অচলায়তন তথাকথিত এশিয়াটিক সমাজ সর্বব্যাপী হয়ে উঠেছে তখনও ঐ তিনটি বর্ণেরই প্রাধান্য বজায় থেকেছে। এর মাঝখানে উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলাল হঠাৎ এলোই বা কোন শ্রেণীর দৌলতে এবং অনেক পরে দূরে থাক চতুর্থ স্তরে হস্তিনাপুরের জীবদ্দশাতেই প্রায় হঠাৎই উঠেই বা গেল কেন? শর্মার উক্তি থেকে এগুলো স্পষ্ট হয় না।

উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলাল ব্যবহার করার মতো অর্থ যাদের হাতে আছে সেই তৎকালীন অভিজাত সমাজের পরিচয় পালি ধর্মগ্রন্থ ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকে পাওয়া যায়।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে (৫ ৩=৯১) রাজা কাকে কত বৃত্তি দিয়ে পালন করবেন তার তালিকা আছে। ঋত্বিক্, আচার্য, মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি, যুবরাজ, রাজমাতা ও রাজমহিষী প্রত্যেকে ৪৮০০০। বার্ষিক না মাসিক হিসেব বলা হচ্ছে তা কৌটিল্য বলেননি। দেওয়া হিসেব বার্ষিক হলে মাসে ৪০০০ দাঁড়ায়। সবচেয়ে হীন অবস্থাতেও বৃত্তি অন্ততঃ রৌপ্য পণ অর্থাৎ ধরণে দেওয়া হয় ধরে নেওয়া উচিত। তামার পণ হলে কৌটিল্য নিশ্চয়ই সে কথা আলাদা করে বলতেন। অশোকের সময় অবধি সেরকম দুরবস্থা কল্পনা করা যায় না। কৌটিল্যের দেওয়া হিসাব অনুসারে এক একটি ধরণ ৩.৮৫৮ গ্রাম। সে ক্ষেত্রেও রুপোয় খাদের হিসেব করে মাসিক বৃত্তি ২০০৪ সালের ১লা জানুয়ারির দরে একলক্ষ সাতচল্লিশ হাজার টাকার কিছু কম দাঁড়াচ্ছে। যদি কৌটিল্য ৪৮০০০ মাসিক হিসাব দিয়ে থাকেন অথবা যদি মৌর্য রাজ্যে সোনার মুদ্রায় বৃত্তি দেওয়া হতো তাহলে মাসিক বৃত্তির মূল্য আজকের হিসেবে ১৮ লক্ষ বা তার চেয়ে অনেক বেশি দাঁড়াত বলাই বাহুল্য।

যদিও আধুনিক যুগের সঙ্গে এই রকম তুলনা দিয়ে সেই যুগের বাস্তব চিত্রটা ধরা পড়ে না, তবু উক্ত পরিমাণের বিপুলত্ব আন্দাজ করা শক্ত নয়। ৪০০০ ধরণ মানে পক্ষে ন্যূনতম খাদ মেশানো ১৫ কেজির ওপর রুপো। মাসিক বৃত্তির পক্ষে এই পরিমাণ অনেক এটা স্বীকার করতেই হয়। দ্বিতীয়তঃ কৌটিল্যের পিরামিড আকৃতির বৃত্তি-কাঠামোটি অনুধাবন করেও উক্ত বৃত্তির তুলনামূলক বিশালত্ব আন্দাজ করা সম্ভব।

শুধু এদেরই নয়, উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলাল কেনার সামর্থ্য ধরে এমন আরো রাজকর্মচারীর আয়ের কথা অর্থশাস্ত্রে মেলে। দৌবারিক-যে অভ্যাগতদের রাজার কাছে নিয়ে যেত, মুখ্য অন্তঃপুরপ্রহরী, প্রশাস্তা (শ্রমিক পর্যবেক্ষক?), সন্নিধাতা ও সমাহর্তা ২৪০০০ করে পেত। এদের প্রত্যেকের ওপরই প্রশাসনের গুরু দায়িত্ব ছিল সন্দেহ নেই। কার দায়িত্ব কি সবটা ঠিক বোঝা যায় না। অত্যন্ত কেন্দ্রীকৃত প্রশাসন ছিল। সন্নিধাতার ওপর রাজকোশ, পণ্যগৃহ, অস্ত্রাগার, কারাগার ইত্যাদি নির্মাণ ও দেখাশোনা করার ভার থাকত এবং সমাহর্তার ওপর রাজস্বের উৎসগুলির ভার থাকত (কৌ. ২.৫,৬ = ২৩, ২৪)।

রাজপুত্র, অন্য রানীরা, শহরের ভারপ্রাপ্ত শাসকরা, রাজার কারখানার অধ্যক্ষরা ১২০০০ করে। এরও নীচে শ্রেণীমুখ্য এবং অশ্ব, হস্তি ও রথমুখ্যরা ৮০০০ করে। শ্রেণী শব্দটি সাধারণতঃ প্রাচীন ভারতের শিল্পকার্য ও পণ্যোৎপাদনের প্রধান সংগঠন— ইংরিজিতে গিল্ড নামে পরিচিত— কারুজীবীদের সঙ্ঘকে বোঝায়। সঙ্ঘগুলি স্বাধীন ভাবেই উৎপাদন করত বলে বিবরণ পাওয়া যায়।

তাদের রাষ্ট্রের খরচে মুখ্যের বেতন লাভ করাটা ভাল বোঝা যায় না। অশ্ব, হস্তী ইত্যাদির মুখ্যের সঙ্গে উল্লিখিত হওয়ায় কাংলে 'Heads of banded troops' শব্দে অনুবাদ করেছেন। সে ক্ষেত্রে শ্রেণীশব্দটি যুদ্ধের জন্য চুক্তিবদ্ধ ট্রাইব গোষ্ঠীকে বোঝাচ্ছে। অবশ্য যুদ্ধের জন্য ছাড়াও অশ্ব, হস্তী এবং রথ লাগতে পারে। এই জন্তুগুলির দেখাশোনা করার জন্য বা সরবরাহের জন্য যাদের সঙ্গে চুক্তি করা হতো অশ্বমুখ্য ইত্যাদি শব্দে তাদের কথাও এখানে বলা হতে পারে। সেক্ষেত্রে শ্রেণীমুখ্য শব্দে উৎপাদনের জন্য চুক্তিবদ্ধ কারুজীবীদের সঙ্ঘের মুখ্যকে বা রাজার নিযুক্ত পরিদর্শককে বোঝাতে পারে। অবশ্য এই ব্যাখ্যাও ত্রুটিমুক্ত নয়। যদি শ্রেণী শব্দে এখানে কারুজীবীদের সঙ্ঘের মুখিয়াকে বোঝায় তাহলে রাজার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধতা, অর্থাৎ সঙ্ঘ যে এক্ষেত্রে বাজার অনুসারে স্বাধীনভাবে উৎপাদন করছে না তা স্বীকার করতে হয়। হস্তিনাপুরের উৎখনন বিবরণীতে বর্তমান আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা আমরা পরে দেখব।

নীচের দিকে রয়েছে স্থায়ী চরেরা— ২৫০; গ্রামভৃতক (ধীবর, নাপিত ইত্যাদি?), রাজার হয়ে বিবিধ কাজ যারা করে দেয়— বিষপ্রয়োগ, ছোটখাট খবর আনা— ৫০০ ইত্যাদি। কৌটিল্যের (১.১১, ৫.৩) বর্ণনা অনুসারে গৃহপতি অর্থাৎ চাষি, তাপস, বৈদেহক অর্থাৎ ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে যাদের অর্থাভাব আছে তাদের লোভ দেখিয়ে সারা রাজ্যে ১০০০/- বেতনের গুপ্তচরের কাজে লাগানো হতো। রাজার খরচের সিংহভাগ চলে যেত নানা শ্রেণীর এই বিশাল গুপ্তচর বাহিনী পুষতে। এদের মাইনে যতই কম হোক গ্রামে গ্রামে গুপ্তচর পুষতে গিয়ে এদের জন্য যে রাষ্ট্রের বিশাল ব্যয়ভার বহন করতে হতো এ বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।

এতক্ষণ রাষ্ট্রের নিরাপত্তার সঙ্গে কোনো না কোনো ক্রমে জড়িতদের বেতনের কথা বলা হল। সম্ভবতঃ সেজন্য এদের মাইনে একটু ভালো। আরো কম পেত রাজকার্যে নিযুক্ত অদক্ষ শ্রমিক ও কারুজীবীরা। "(কৃষি-অধ্যক্ষ) সবজি, ফলের বাগান ও গোরুর পাহারাদার এবং দাস ও কর্মীদের কজন ব্যক্তির লাগবে (অর্থাৎ কত জন তাদের ওপর নির্ভরশীল) তাই দেখে ভাত দেবেন এবং মাসে সোয়া পণ মাইনে দেবেন। কারুজীবীদের কাজ দেখে মাইনে দেবেন।" (অর্থশাস্ত্র ২.২৪=৪২) খাসজমির এই কাজ রাজপ্রাসাদের ভোগের জন্য হতোনা বরং রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের জন্য হতো এই অনুমানের সঙ্গত যুক্তি আছে। কারণ, প্রাসাদের প্রয়োজন চাষির কাছ থেকে আদায় খাজনার আয়েই মিটে যাওয়া উচিত। অর্থশাস্ত্রে এক অতি উদ্যোগী রাষ্ট্রের বর্ণনা পাওয়া যায় (§৯, ১০)। তাই অনুমান করা যেতে পারে যে শেষোক্ত শ্রেণীর বেতনভুকই বেশি ছিল।

খাওয়া সহ সোয়া পণের কর্মীর সঙ্গে পট্টমহিষী ও আরো কয়েকজনের জীবন যাপনের সব খরচ সহ মাসিক ৪০০০ ধরণ বৃত্তির তুলনা করলে প্রথমোক্তরা কত ওপরে তা বোঝা যায়। কাদের পক্ষে উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলাল ব্যবহার করা সম্ভব ছিল তা আর বলে দিতে হয় না।

লক্ষ্য করার মতো বিষয় হচ্ছে শর্মা যে গৃহপতি অর্থাৎ বৈশ্যের কথা বলেছেন কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের রাষ্ট্রে তাদের কোনো সম্মানের স্থান বা জীবিকা নেই। গৃহপতিদের নাম কয়েকবার এসেছে কারণ গ্রামে গ্রামে গৃহপতির ছদ্মবেশে রাজার চর থাকত। এদের গৃহপতিকব্যঞ্জন বলা হতো। শ্রেষ্ঠী শব্দটি সারা অর্থশাস্ত্রে একবারও উল্লিখিত হয়নি। শ্রেষ্ঠী মানে বণিকসঙ্ঘের প্রধান। বণিকরা কারুজীবীদের উৎপাদিত পণ্য নিয়ে বাণিজ্যব্যবসা করত। সেই ব্যবসাতে শ্রেষ্ঠীদের বড় ভূমিকা থাকা উচিত। যদি তাদের সঙ্গে রাষ্ট্রের কাজ চালানোর মতো কোনো সম্পর্ক থাকত তাহলে নামটা অন্ততঃ একবার পাওয়া যেত, যেমন শ্রেণীমুখ্যের নাম পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু শুধু বেতনভুক্‌দের তালিকায় নয় সারা অর্থশাস্ত্রে কোথাও তাদের নাম নেই। উল্টে বণিক ও কারুজীবীদের সম্বন্ধে কৌটিল্য একবার মন্তব্য করেছেন এরা যাদের চোর বলা হয় না সেই রকম চোর।

জাতকে ছবিটা বদলে যায়। কুরুধম্ম জাতকে (২৭৬) ইন্দ্রপ্রস্থ নগরে কুরুরাজের নিকটবর্তী হিসাবে এই কজনের নাম পাওয়া যায়— রাজমাতা, রানী, কনিষ্ঠভ্রাতা-উপরাজ, পুরোহিত-ব্রাহ্মণ, রজ্জুগ্রাহক, অমাত্য-সারথি, শ্রেষ্ঠী, শস্যভাণ্ডারিক, মহামাত্যদৌবারিক, পুরসুন্দরী গণিকা। এই বিবরণ গদ্যে লেখা। এর পরেই ছন্দোবদ্ধ গাথায় একটু অন্যরকম তালিকা আছে— রাজা, রাজমাতা, রাজমহিষী, উপরাজ, রাজপুরোহিত, রজ্জুক (রাজপুরুষ বিশেষ = সম্রাট অশোকের রাজুক) সারথি, শ্রেষ্ঠী, শস্যভাণ্ডারিক, দৌবারিক সুপণ্ডিত এবং গণিকা— মোট এগার জন।

অর্থশাস্ত্রে সবচেয়ে ওপরে তের জন ছিল— ঋত্বিক্, আচার্য, মন্ত্রী, পুরোহিত, সেনাপতি, যুবরাজ, রাজমাতা ও রাজমহিষী, দৌবারিক, মুখ্য অন্তঃপুরপ্রহরী, প্রশাস্তা সমাহর্তা ও সন্নিধাতা। আচার্যের ওপর যজ্ঞসম্পাদক ঋত্বিক, সেনাপতি, সমাহর্তা ও সন্নিধাতার নাম জাতকে নেই, জাতকের যে নামগুলি অর্থশাস্ত্রে মেলে না তার মধ্যে আছে শ্রেষ্ঠী। জাতক অশোকের রাজত্বের উত্তরকালে সংকলিত হয়। তাতে কুরুরাজ্যকে মৌর্যদের অধীন দেখানো হয়নি। ছোট রাজ্যের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে বলে কম নাম থাকতে পারে। কিন্তু শ্রেষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি সামাজিক পরিবর্তনের সূচক। এরা কখন কি ভাবে অভিজাতত্ত্বের স্বীকৃতি পেল সেটা অনুসন্ধান যোগ্য।

এত বিবরণ দেওয়ার একটি উদ্দেশ্য সাধারণ গৃহপতি দূরে থাক শ্রেষ্ঠীরাও যে অর্থশাস্ত্রের সময়ে রাষ্ট্রের কাছে সামাজিক স্বীকৃতি পায়নি সেই দিকে নজর টানা। দ্বিতীয়তঃ, এর মানে প্রথমদিকে বলা রাজকর্মচারীদেরই উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলালের প্রধান ব্যবহারকারী হওয়া সম্ভব ছিল। পরবর্তীকালের ইতিহাস থেকে তারা বিদায় না নিলেও তাদের গুরুত্ব এবং আর্থিক প্রতিপত্তি অন্ততঃ সাময়িকভাবে কমে গিয়েছিল। সেইজন্যই উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলালের ব্যবহারও শূন্যে এসে দাঁড়িয়েছিল।

প্রশ্ন হতে পারে— উচ্চ আয়বিশিষ্ট রাজপুরুষদের কোনো কারণে অবলোপ হলেও শ্রেষ্ঠীরা তো লোপ পায়নি, তাদের উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলাল ব্যবহারে কি বাধা ছিল? এই প্রশ্নের বিবেচনায় ভুললে চলবে না যে অশোকের পর মৌর্য প্রশাসনের অনেক হাল্কা হয়ে যাওয়ার অবশ্যম্ভাবিতাটা স্বতন্ত্রভাবে দেখানো যায় (নীচে)। তাই শ্রেষ্ঠীদের বিষয়ে প্রশ্নটি মৌর্য প্রশাসনের পরিণতির সঙ্গে না জড়িয়ে নিরপেক্ষভাবে বিবেচনা করতে হবে। অবশ্য 'কেন হয়েছে' এই প্রশ্নের বিবেচনা যেমন করা যায় 'কেন হয়নি' এই প্রশ্নের আলোচনা সব সময়ে সেই রকম হতে পারে না। তবু অভিজ্ঞতা থেকে এ কথা বলা খুব অন্যায় হবে না যে কোনোদিনই ভারতের সাবেকি বণিক শ্রেণীর ব্যক্তিগত বিলাসের কারণে অমিতব্যয়িতার দুর্নাম নেই। সরকারের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে সদা আগ্রহী এই শ্রেণী ধর্মীয় কারণে এবং সাধু, সন্ত, মহাত্মাদের জন্য যত খরচ করেছে ব্যক্তিগত বিলাসের জন্য ততটা নয়। কিন্তু উক্ত দুর্নাম রাজা-মহারাজা, নবাব, দেওয়ান ও রাজপুরুষদের আছে। চরিত্রগত এই বৈশিষ্ট্য প্রাচীন যুগেই অর্জিত হয়নি এ কথা ভাবা অন্যায় হবে।

অবশ্য মন্তব্যগুলি মোটের ওপর ঠিক হলেও গাণিতিক সিদ্ধান্ত নয়। এবং এ দিয়ে সব কিছুর ব্যাখ্যাও হয় না। হস্তিনাপুরের চতুর্থ স্তরের সমকালীন গ্রন্থ দিব্যাবদানে (দ্বিতীয় শতক?) পাঁচশ অশ্বপণ্যের সার্থ নিয়ে মথুরায় ব্যবসা করতে এসে উত্তরাপথের (আফগানিস্তান-পাকিস্তান সীমান্ত) বণিকের গণিকাসন্ধানের কথা (পাংশুপ্রদান, বাসবদত্তার উপাখ্যান) আছে। সমকালীন কিছু পূর্ববর্তী গ্রন্থ মহাবস্তুতে উত্তরাপথেরই অশ্ববণিক বজ্রসেন ও বারাণসীর গণিকা শ্যামার কাহিনীটি পাওয়া যায়। দিব্যাবদানের কাহিনীতে মথুরায় পাঁচশ পুরাণ পরিচর্যা মূল্যের গণিকার গৃহে শহরের শ্রেষ্ঠীর ছেলে খুন হওয়ার কথাও আছে। মহাবস্তুর গল্পেরও একটি চরিত্র গণিকার ষড়যন্ত্রে নিহত শ্রেষ্ঠীর ছেলে। লাম্পট্যে শ্রেষ্ঠিপুত্র ও বণিকরা নগরজীবনে নেতৃত্ব দিত মনে হয়। এদের আগে একাজ রাজা ও তার

নিকটবর্তীদের একচেটিয়া থাকতে পারে। এতে খুব খরচ ছিল ঠিকই। হতে পারে যে উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলালের সঙ্গে কোনো অতিরিক্ত অন্য জাতীয় যোগসূত্র ছিল যেটা ধরা যাচ্ছে না। অশোকের শাসনের সঙ্গে যে প্রথা বা অনুষ্ঠানগুলি লোপ পেয়ে যায় উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলালের ব্যবহারের সঙ্গে সেগুলির কারোর সম্পর্ক থাকতে পারে মনে হওয়া স্বাভাবিক। এই জাতীয় একটি অনুষ্ঠান ছিল যজ্ঞ। যজ্ঞে কলশ লাগত এও ঠিক। কিন্তু নিশ্চিতভাবে উক্ত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে গেলে যে প্রমাণ লাগে তা দেওয়া অসম্ভব। উৎখনন আরো ব্যাপক হলে রহস্য একটু পরিষ্কার হতে পারে। কারণ কৌশাম্বীতে উৎখনক জি. আর. শর্মা পুরুষমেধ যজ্ঞের প্রমাণ পেয়েছেন বলে দাবি করেছেন। এ নিয়ে যৎসামান্যই আলোচনা হয়েছে।

চতুর্থ স্তরে কৌলালের চরিত্রটা বদলে যায়। আগের স্তরে ঝলমলে উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলালের পাশে ছিল অনেক নিচু মানের ছাই রঙের প্রধানতঃ মোটা কানাওলা একাধিক গড়নের থালা ও বাটি এবং চকচকে নয় এমন লাল হাঁড়ি, ঘড়া ইত্যাদি। নকশা আঁকা খুবই কম। অহিচ্ছত্রা থেকে রাজগির পর্যন্ত সর্বত্রই উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলালের সঙ্গে এগুলি মেলে। দু-জাতীয় পাত্রের গুণগত পার্থক্য থেকে ব্যবহারকারী অর্থাৎ নগরবাসীর মধ্যে বেশ আর্থিক বৈষম্যের অস্তিত্ব ও পরে অনুমান করা হয়েছে। এই প্রকট বৈষম্যের জায়গায় চতুর্থ স্তরে একটা সমতা চোখে পড়ে। উৎখনকের দেওয়া তথ্য তাঁর ভাষায় (৬৩) এই রকম,

'চতুর্থ স্তরের মৃৎপাত্র সবই কুমোরের চাকায় তৈরি এবং সম্পূর্ণ লাল। গঠন মাঝারি থেকে সূক্ষ্ম। অধিকাংশই অবশ্য শুধু একবার (রঙ)-ধোয়া। যে আকারের পাত্র বেশি পাওয়া গেছে তা হলো জামবাটি, কালির দোয়াতের মতো ঢাকনা, বোতলের মতো গলাওলা লম্বা গুঁড়ো ছড়ানোর শিশি... আগের স্তর দুটিতে যার বাহুল্য দেখা গিয়েছিল সেই থালা জাতীয় পাত্র এই স্তরে নেই এটা চোখে পড়ে।''

আধুনিক হাতলের চল ছিল না। পাত্র ধরার জন্য শুঁড় থাকত। চিত্রিত পাত্র খুব কম। যে সামান্য কটি মিলেছে তাতে উজ্জ্বল লাল গায়ের ওপর কালো রঙ সাধারণতঃ পাত্রের কানায় বা কাঁধে আঁকা— যা রাজস্থানেও পাওয়া গিয়েছে। আঁকার বদলে এসেছে কারুকার্য। ছাঁচে ছাপা নানা মঙ্গলচিহ্ন— মাছ, ত্রিরত্ন, চক্র ইত্যাদি। এগুলি সবই উন্নতির সূচক। সমতা এসেছে গড়নে। সব পাত্রের একই রঙ, পুড়িয়ে শক্ত করার ঢঙ একই, ছাঁচ থেকে মঙ্গল চিহ্ন নেওয়াতেও কোনো ইতরবিশেষ নেই। অতি সামান্য কয়েকটিতে আঁকার বা রঙ-ধোয়ার পর চকচকে করার (পৃ. ১৭) প্রয়াস আছে। অর্থাৎ একই কৌলাল সবাই ব্যবহার করত, তবে সম্ভবতঃ বড়লোক আর গরিবদের কথা ভেবে সামান্য পার্থক্য রেখে দুরকম মান বজায় রাখা হতো। কিন্তু তৃতীয় স্তরে উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলালের পাশে অন্য জাতীয় এক অতি নিম্ন মানের ধূসর কৌলাল পাওয়া গিয়েছিল এবং দুয়ের মধ্যে ছিল আকাশ পাতাল তফাৎ। চতুর্থ স্তরের আসবাবে সেরকম কোনো উঁচু নিচুর প্রকট বৈষম্য চোখে পড়ে না।

এখন, উৎখনন এত কম হয়েছে যে ওপরের পর্যবেক্ষণ থেকে নির্ভুল সিদ্ধান্ত টানার নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও চোখে পড়ার মতো বিষয় থাকলে বলতেই হয়। এখানে তাই হয়েছে। অশোকের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী হস্তিনাপুরের তফাৎ দেখলে যে কেউ ভাবতে বাধ্য হয় যে মানুষের জীবনযাত্রার একটা শুভ পরিবর্তন এসেছিল, সমৃদ্ধিও বেড়েছিল বৈষম্যও কমেছিল।

ইতিহাসের অধিকাংশ অনুমানের মতোই এই উক্তির সবটা অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু কৌটিল্য থেকে অশোকের সময় অবধি পরিবর্তনটি অনুধাবন করলে আমাদের ওপরের সিদ্ধান্তে আসার কারণ বুঝতে অসুবিধা হবে না।

§৯. রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ (১) : খাসজমি, পণ্য ও বাণিজ্য

কৌটিল্যের রাষ্ট্রের সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো বৈশিষ্ট্য এই রাষ্ট্র উদ্যোগী। উদ্যোগ কৃষি, পণ্যোৎপাদন এবং বাণিজ্য তিনটিতেই ছিল। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে বস্ত্রোৎপাদনের দীর্ঘ বর্ণনা (২.২৩) মেলে।

"সূত্রাধ্যক্ষ সুতো, বর্ম, কাপড় ও দড়ির ব্যবসা ঐ বিষয়ে দক্ষ পুরুষদের দিয়ে করাবেন। বিধবা, বিকলাঙ্গ স্ত্রী, ঘর ছেড়ে চলে আসা মেয়ে ও যারা ব্যক্তিগত শ্রম দিয়ে জরিমানা পূরণ করতে চায়, রূপোপজীবিনীদের মা, বৃদ্ধা রাজদাসী, যে দেবদাসীরা আর পেশাগত কাজ করতে পারে না— এদের দিয়ে পশম, বল্কল, কাপাস তুলো, শণ ও ক্ষৌম (তিসির ছাল?) বস্ত্রের সুতো কাটাবেন। সুতো সরু, মোটা না মাঝারি মানের তা দেখে মজুরি ঠিক করবেন। বেশি না কম করছে তাও দেখবেন। .

যেসব কারুজীবী কাজের পরিমাণ, সময় ও মজুরির চুক্তিতে কাজ করে এসেছে তাদের দিয়ে (কাপড় তৈরির) কাজ করাবেন এবং তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে চলবেন। ক্ষৌম, দুকূল, রেশম, রঙ্কুমৃগের লোম এবং কাপাস তুলোর কর্মশালা চালু করার সময়ে (কারুজীবীদের) সুগন্ধ, মালা এবং অন্যান্য উপহার দিয়ে খুশি করবেন।..."

সোনারুপোর গয়না, মণিমুক্তো, বনজ এবং কিছু কৃষিজ পণ্যেও রাষ্ট্রের উৎপাদন ও বাণিজ্য উদ্যোগ ছিল। বনজ দ্রব্যের তালিকা (২.১৭ = ৩৫) বিশাল। "বনজ দ্রব্যের অধ্যক্ষ পণ্য-অরণ্যের রক্ষীদের দিয়ে বনজ দ্রব্য (শহরে) আনাবেন। পণ্য-অরণ্যের কর্মশালাও (কর্মান্ত = কারখানা) তৈরি করাবেন। (খরা ইত্যাদি) কষ্টের সময় বাদ দিয়ে পণ্য-অরণ্য থেকে যারা (কাঠ ইত্যাদি) কেটেছে তাদের কাছ থেকে প্রাপ্য ও জরিমানা ঠিক করবেন।" নানা রকম কাঠ। জানা নামের মধ্যে অর্জুন, শাল, শিশু, শিরীষ, খয়ের, সরল, তাল ও আম পড়ে। বাঁশ, বেত, শণ, অতসী, মুঞ্জঘাস, তালপাতা, ভূর্জপত্র, কন্দ, ফলের গাছ, নানা রকম বিষ, হাড়, দাঁত, চামড়া ও অন্যান্য প্রাণী-অঙ্গের নাম মেলে। এর জন্য যন্ত্রপাতি যা লাগবে তারও আভাস কৌটিল্য দিয়েছেন। তাঁর উপদেশ (অধ্যায়ের শেষ শ্লোক) বনজ দ্রব্য যাদের জীবিকাব অবলম্বন তাদেব জন্য এইরকম অনেক কারখানা শহরের বাইরে ও ভেতরে তৈরি করতে হবে।

যদি এই কার্যক্রমের উদ্দেশ্য রাজার পোষ্যবর্গের পালন মাত্র হয় তাহলে ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে এর কোনো বিশেষ তাৎপর্যই থাকে না। কিন্তু কোনোক্রমেই ঐ কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য শুধু রাজপ্রাসাদ হতে পারে না। অর্থশাস্ত্রে আগেই (নীচে ১০ দ্র.) আলাদা করে আদায় করা খাজনার কথা বলা হয়েছে। তার জন্যেও স্বতন্ত্র প্রকারের উদ্যোগ ছিল। ওপরের অনুচ্ছেদে বলা কাজগুলির উদ্দেশ্য রাজপ্রাসাদ হলে বানী, রাজকুমার ইত্যাদি পোষ্যবর্গ, ঋত্বিক ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের জন্য বৃত্তি বা মাইনের ব্যবস্থাও ব্যর্থ হয়ে যায়। বাজার থেকে কেনার জন্যই টাকা ধরে বৃত্তি দেওয়া হতো। তৃতীয়তঃ, কৌটিল্য স্পষ্টই তাঁর উদ্যোগ যে রাজার আয় বাড়ানোর জন্য এ কথা বাববার বলেছেন। যদি বনজ দ্রব্য উৎপাদনের উদ্দেশ্য পোষ্যবর্গকে খাওয়ানো হতো তা হলে সে কথা অবশ্যই বলতেন। অনেক মাইনে দেওয়া হতো ঠিকই। কেন দেওয়া হতো তাও কৌটিল্য (৫.৩) বলে গিয়েছেন। 'এত টাকা মাইনে পেলে এদের ষড়যন্ত্র বা বিদ্রোহে মতি হবে না।' অনর্থক কোনো খরচের ব্যবস্থা কৌটিল্য করেননি। যখন অপবাহন করে নিত্যই খাজনা বাড়ানো যাচ্ছে (নীচে ১০) শুধু ভোগের জন্য রাষ্ট্রীয় উৎপাদন তাঁর ব্যবস্থায় অকল্পনীয়।

এই কথাগুলি বারবার বলতে হচ্ছে কারণ যদিও চিরন্তন 'এশিয়াটিক সমাজে'র ধারণা বেশ কিছু বুদ্ধিজীবীর মনে ধর্মীয় বিশ্বাসের মতো গেঁথে আছে, হস্তিনাপুরের বিকাশের মতো অর্থশাস্ত্রের পণ্যোৎপাদী, পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের ছবিও এশিয়াটিক সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে খাপ খায় না। সেই 'এশিয়াটিক সমাজ' পরবর্তী কালে, মধ্যযুগে ভারতবর্ষে এসেছিল (নীচে ১৬, ১৭)।

খাস জমিতে কৃষিপণ্যের জন্যও এইরকম উদ্যোগের বর্ণনা (২.২৪) পাওয়া যায়। "সীতাধ্যক্ষ কৃষিতন্ত্র, গুল্ম ও বৃক্ষবিজ্ঞান জেনে বা সেইরকম বিশেষজ্ঞের সহায়তায় উপযুক্ত ঋতুতে সবরকম ধান, ফুল, ফল, শাক, কন্দ, মূল, লতা, ক্ষৌম ও কাপাসের বীজ সংগ্রহ করবেন। বহুবার চাষকরা নিজ জমিতে দাস, শ্রমিক ও যারা ব্যক্তিগত শ্রম দিয়ে জরিমানা পূরণ করতে চায় তাদের দিয়ে বীজ বপন করাবেন।" এর পর খুঁটিনাটি দীর্ঘ বর্ণনা। খালি জমি রয়ে গেলে অর্থাৎ 'দাস, শ্রমিক ও যারা ব্যক্তিগত শ্রম দিয়ে জরিমানা পূরণ করতে চায়' তাদের দিয়ে সবটা কাজ না হলে খাসজমিতে অর্ধেক, চারভাগের বা পাঁচভাগের একভাগ দিয়ে ভাগচাষ বা খেতমজুর দিয়েও চাষ হতো। এই চাষ খাস জমির চাষ। খাজনার জমিতে চাষি বসানোর বর্ণনা আলাদা করে আছে। খাস জমির উৎপাদন পণ্য হিসাবে বাজারে আসত। কৌটিল্য তার আরম্ভটা বলেছেন। "যথাকালে শস্য ইত্যাদি উৎপন্ন দ্রব্য (ভাণ্ডারে) এনে রাখবেন। জ্ঞানী লোক খেতে কিছুই ফেলে রাখেন না, তুষ পর্যন্ত নয়।" বাজারে যাওয়াটা ব্যবসা-বাণিজ্য বর্ণনা থেকে জানতে হবে।

এর পর সুরা ব্যবসা ও উৎপাদনের বর্ণনা (২.২৫ = ৪২)। সুরাধ্যক্ষ দুর্গ, জনপদ বা যেখানে শিবির স্থাপিত হয়েছে সেখানে সুরা ও তাড়ি ব্যবসায়ীদের দিয়ে, দরকার হলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, ব্যবসা করাবেন। বহুকক্ষ বিশিষ্ট পানাগার তৈরি হতো, এই সময়ে গুপ্তচরদের কাজও বেড়ে যেত। অন্য পণ্যের মতো সুরার উৎপাদনও রাষ্ট্র ছাড়া ব্যক্তিগত উদ্যোগেও হতো। উৎসবের সময়ে ঘরে ঘরে সুরা তৈরির অনুমতি দেওয়া আছে। সুরার ব্যক্তিগত ব্যবসা সম্বন্ধে কৌটিল্যের নির্দেশ

"যারা সরকারের তৈরি নয় এমন পণ্য বিক্রি করছে তারা (বিক্রির) শতকরা পাঁচ ভাগ কর দেবে।"

খনিজ দ্রব্য, মণিমুক্তো, সমুদ্রজাত উৎপাদন ইত্যাদিব বর্ণনাও আছে।

প্রত্যেকটি উৎপাদনে এবং বাণিজ্যে রাষ্ট্রকে ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হতো। এবং প্রায় প্রত্যেক উদ্যোগেই রাষ্ট্র ভাগ নিতে আসত। উৎপাদনে ভূমিকা না থাকলে চড়া হারে কর নিত। যেমন নুনে। "লবণাধ্যক্ষ যথাকালে শুকিয়ে গেলে নুনের ভাগ ও প্রক্রয় (বিক্রয় কর? ভাড়া?) নেবেন। বিক্রয় থেকে পরিদর্শন মূল্য ও উপরিকর নেবেন।" বাণিজ্য বর্ণনা থেকে ছবিটা আর একটু পরিষ্কার হয়।

বাণিজ্য পরিচালনার ভার ছিল পণ্যাধ্যক্ষের (২.১৬ = ৩৪) ওপর। দুরকম পণ্য নিয়ে নির্দেশ আছে— রাজপণ্য এবং পররাজ্য থেকে আমদানি পণ্য। কিন্তু পণ্যের আরো উৎস ছিল। কারুজীবীরা সঙ্ঘ নিয়মে পুঁজি খাটিয়ে পরিশ্রম করে পণ্যোৎপাদন করত। তার কারুজীবীদের ওপর নিশ্চয়ই সঙ্ঘের হুকুম চলত। কারণ শ্রেণীর অর্থাৎ সঙ্ঘের সঙ্গে চুক্তি করে রাষ্ট্রীয় উৎপাদনের কথাও অর্থশাস্ত্রে (৪.১ = ৭.৬) আছে। এ ক্ষেত্রে পুঁজি মক্কেলের (কারুশাসিতা) কাছ থেকে আসতে পারে। প্রয়োজনে সঙ্ঘ শ্রমিক বা দাস নিয়োগ করত কিনা জানা নেই। কবলেও বোধহয় তার বিরুদ্ধে বিশেষ বলার কেউ ছিল না। পণ্যের খুব চাহিদা না থাকলে সে প্রশ্ন যে উঠতে পারত না এটা খেয়াল রাখা দরকার। রোমে সঙ্ঘে ক্রীতদাস নিয়োগের উল্লেখ পাওয়া যায়। কৌটিল্য (৩.১৩ = ৬৫) আর্যের দাসভাব হয়নী বলেছেন। সে নিয়ম সঙ্ঘগুলির কথা মাথায় রেখে করা হয়েছিল কিনা জানি না। আর্য বলতে চতুর্বর্ণকে বোঝাত কিন্তু বনচরদের নয়। বণিকদেরও সঙ্ঘ ছিল। নানা নামে সঙ্ঘ ও সঙ্ঘোৎপাদনের উল্লেখ পালি গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়। এরা স্বাধীনই ছিল। এদের উৎপাদনের বা বাণিজ্যের সঙ্গে রাষ্ট্রের কোনো অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক ছিল না। তাই কৌটিল্য এদের নিজস্ব উৎপাদন বা কাজ সম্বন্ধে কোনো নির্দেশ দেননি। রাজার সঙ্গে যখন কোনো যোগসূত্র হয়েছে তখনই এদের নাম এসেছে। প্রায় নিশ্চিত

ভাবেই বলা যায় যে একটি সঙ্ঘ একটি জাতিরই (কাস্ট) হতো। প্রাথমিক স্তরে এরা রাষ্ট্রের বিস্তৃত ও ব্যাপক উৎপাদন ও বাণিজ্য ব্যবস্থা সত্ত্বেও বিকাশ লাভ করেছিল। প্রথম অবস্থায় এদের যে প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে এগোতে হয়েছিল তাতে এদের ইংরিজি ভাষার *আণ্ডারডগ্* নামটি দিয়ে অভিহিত করলে অন্যায় হবে না। কৌটিল্য এদের অপরাধী বলে বিবেচনা করতেন একথা আগেই বলা হয়েছে। এদের নাম সবচেয়ে বেশি এসেছে অপরাধ দমনের ওপর দুটি অধ্যায়ে (৪.১,২ = ৭৬.৭৭)।

সঙ্ঘোৎপাদন সম্ভবতঃ ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন পণ্যোৎপাদন ব্যবস্থা এবং এখনও শিথিল ভাবে তাঁতিদের মধ্যে এবং আরো অন্য জাতিভিত্তিক উৎপাদনে রয়েছে। এদের মহাজনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হয়। অনুমান করা যায় যে প্রাচীন কারুজীবীদেরও বণিকদের সঙ্গে তাই রাখতে হতো।

ওপরে বলা হয়েছে যে বাণিজ্যে রাষ্ট্রকে ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হতো। এর প্রমাণ কৌটিল্যই (৪.২ = ৭৭) দিয়ে গিয়েছেন। আর্ধ পল অর্থাৎ ৩৮.৫৮ গ্রাম পর্যন্ত ওজনে হেরফেরে দোষ ধরা হতো না। তার ওপর হলে কঠোর শাস্তি। এইরকম খুব ভাল নিয়ম আরো আছে। যেমন "কারুশিল্পীরা একত্র হয়ে উৎপাদন মানের অপকর্ষ ঘটালে অথবা (বাজারের) বিক্রয় বা ক্রয় (প্রক্রিয়ায়) ব্যাঘাত সৃষ্টি করলে ১০০০ (পণ) দণ্ড। বৈদেহক (=বণিক)রা একত্র হয়ে পণ্য অবরোধ (=মজুত) করে অন্যায় মূল্যে বিক্রি করলে বা কিনলে ১০০০ (পণ) দণ্ড।" চাহিদার সঙ্গে দামের সম্পর্কটি তাত্ত্বিকভাবে ব্যক্ত না করলেও কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে যে দাম বাড়ানো যায় তা কৌটিল্য খুব ভাল করে লক্ষ্য করেছিলেন স্বীকার করতেই হবে। সঙ্ঘবদ্ধভাবে যে উৎপাদনের গুণমান নামিয়ে আনা যায় এও তাঁর নজরে ছিল। বণিকরা বা সঙ্ঘবদ্ধ কারুশিল্পীরা যাতে এই কাজ না করতে পারে সেদিকে তাঁর নজরও প্রশংসার দাবি রাখে। তাঁর উপদেশও (৪.১ = ৭.৬) মনে রাখার মতো, "এইভাবে চোর নামে অভিহিত না হলেও যারা চোরই সেই বণিক, কারু, কুশীলব, ভিক্ষুক, কুহক ও অন্যান্যদের দেশপীড়ন থেকে নিবৃত্ত করা দরকার।" কিন্তু এই সুশাসন একটা জায়গায় এসে থেমে যায়— রাজপণ্য নিয়ে বাণিজ্যে। পণ্যাধ্যক্ষের কাজের উপদেশের (২.১৬ = ৩৪) গোড়ার দিকেই বলা হচ্ছে, "যে পণ্য প্রচুর হয়ে গেছে সেগুলি একত্র করে দাম ফেলবেন। দাম পেলে নতুন দাম রাখবেন।" আগেই দেখেছি যে বণিকদের ক্ষেত্রে অবরোধ অর্থাৎ বেআইনি মজুত করে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে দাম বাড়ানোর অপরাধে কঠোর জরিমানার বিধান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রাজার পণ্য এক জায়গায় করে দাম ঠিক করা এবং সেই দামে পৌঁছে গেলে নতুন দাম ঠিক করাও যে সেই কাজই হচ্ছে এ কথা কৌটিল্যের মনে হচ্ছে না, একে তিনি অবরোধও বলছেন না। না বললেও এর একটি উদ্দেশ্য যে কৃত্রিমভাবে উঁচু দাম বাজায় রাখা তার প্রমাণ কৌটিল্যই রেখে গিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গেই (২.১৬) বলছেন "স্বভূমিজাত রাজপণ্যের এক জায়গায় ব্যবসা চালু করতে হবে। পরভূমিজাত পণ্যের বহু জায়গায়।" ভাষা থেকে মনে হয় স্বভূমিজাত রাজপণ্যের এক জায়গায় ব্যবসা চলবে বলার মধ্য দিয়ে স্বভূমিজাত বেসরকারি উৎপাদনের যে বহু স্থানে ব্যবসা চলবে তা বলা হয়ে যাচ্ছে। তাই শুধু বিদেশ থেকে আমদানি করা পণ্যের বিক্রির জন্যে এই নিয়মটা স্পষ্ট করে বলে দিতে হচ্ছে। রাজপণ্যের ব্যবসা শহর বা জনপদের নির্দিষ্ট একটি জায়গায় চালু রাখার নিয়ম দিয়ে দুটো উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে। নানা জায়গায় ব্যবসা চললে তত্ত্বাবধান বেশি করতে হয়। এর ফলে কর্মচারীদের চুরি ধরা এবং এক জায়গায় করে উঁচু দাম ধার্য করা, সুবিধা মতো নতুন দাম ফেলা— এ সবই অপেক্ষাকৃত জটিল হয়ে পড়ে। এগুলি মাথায় রেখেই কৌটিল্যের ঐ বিধান এ ধারণা করা অন্যায় হবে না। কারণ কৌটিল্য (২.৩৫=৫৫) রাজপণ্যের দামের ওপর লক্ষ্য রাখার ব্যবস্থাও করেছিলেন। "এইভাবে ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশধারীরা স্বভূমিজাত খনি, বাঁধ, কর্মান্ত এবং খেতে উৎপণ্য রাজপণ্যের পরিমাণ ও দাম জানবেন।"

§১০. রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ (২) : নতুন বসতি নিবেশ ও খাজনা বৃদ্ধি

কৌটিল্যের রাষ্ট্রের পণ্য উৎপাদন ও বাণিজ্যের উক্ত উদ্যোগের ভিত্তিটা কিন্তু শহরে ছিল না; ছিল জনপদে— রাষ্ট্রের উদ্যোগে নতুন বসতি স্থাপনের মাধ্যমে নিয়ত বর্ধমান কৃষি ও খাজনায়। খাজনায় থেকেই রাষ্ট্রীয় উৎপাদন ও ব্যবসায় উদ্যোগের প্রাথমিক পুঁজিটি আসে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ করা চলে না। কৌটিল্যের খাজনা বাড়ানোর পদ্ধতিকেও উদ্যোগই বলতে হয়। কারণ অন্য বহু রাষ্ট্র তথা ভারতের পরবর্তীকালের রাষ্ট্রও খাজনার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হলেও কৌটিল্যের রাষ্ট্রই নতুন বসতি স্থাপনের মাধ্যমে খাজনার ক্ষেত্র বৃদ্ধি করে রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধির চেষ্টা করত। এই খানে পরবর্তীকালের রাষ্ট্রের সঙ্গে কৌটিল্যের রাষ্ট্রের পার্থক্য।

পরবর্তীকালের রাষ্ট্রের এই চরিত্র অর্থাৎ নতুন বসতি স্থাপনের মাধ্যমে কৃষিজমি ও খাজনা বাড়ানোর উদ্যোগ অনেক ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। তাদের খাজনা বাড়ানোর প্রধান উপায় ছিল পররাজ্য দখল করে অধিকৃত রাজ্যের কৃষিজমি থেকে পরাজিত রাজার চালু খাজনার ওপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। প্রচুর যুদ্ধ হতো ঠিকই। কিন্তু তাতে অর্থনীতি বা জনসাধারণের অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন আসতে পারত না। পরবর্তী কালের গ্রামগুলির কিছু অন্তর্নিহিত অচরিষ্ণুতাও অনিবার্যভাবে এসেছিল (§১৬, ১৮)। পরবর্তী এই সমাজের অর্থনীতিকে মার্ক্স অনড় এশিয়াটিক সমাজের উৎপাদন পদ্ধতি বলেছেন। কৌটিল্যের রাজ্যবিস্তার নীতি থেকে স্পষ্ট হয় যে তাঁর সময় অবধি ভারতবর্ষে ঐ সমাজ ও তার উৎপাদন পদ্ধতি শেকড় গাড়তে পারেনি।

কৌটিল্য (২.১) উক্ত উদ্যোগের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনার সূত্রপাত হয়ে গিয়েছে। দামোদর ধর্মানন্দ কোসম্বি (১৯৫৬-৭৫: ৭ ও ৮ অধ্যায়, ১৮৫ থেকে ২৯৪ পৃ.) কৌটিল্যের বিবরণীতে যে মগধরাষ্ট্রের যুদ্ধের মাধ্যমে দেশ জয় ও বিজিত জাতিকে দিয়ে নতুন জনপদনিবেশের মাধ্যমে কৃষির বিস্তারের পরিচয় পাওয়া যায় এই তত্ত্ব বিশ্বাসযোগ্যভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তিনি এও দেখিয়েছেন যে অশোকের সংস্কার তাঁর পূর্বপুরুষদের অনুসৃত এই নীতির প্রত্যাহার। অশোকের পরে ভারতীয় রাষ্ট্রের চরিত্রও বদলে যায়। এই তত্ত্বের দ্বারাই কোসম্বি কৌটিল্যের প্রামাণিকতার বিরুদ্ধ যুক্তিগুলিকে খণ্ডন করেছেন। কোসম্বির এই তত্ত্ব ভারতীয় ইতিহাস পদ্ধতিতে এখনো আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি না পেলেও এটিকে কেউ খণ্ডন করতে পেরেছে বলে আমার জানা নেই। সুতরাং এটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য আলাদা করে বিস্তৃত আলোচনা এখানে করা হবে না। কিন্তু হস্তিনাপুরের সমৃদ্ধির ও বিশেষতঃ লোপ পাওয়ার কারণের আলোচনায় বিষয়টি প্রাসঙ্গিক। তাই কৌটিল্য থেকে আনুষঙ্গিক তথ্যগুলি দেওয়া দরকার। দ্বিতীয়তঃ কোসম্বি এই জাতীয় আলোচনার পথিকৃৎ। তাঁর আলোচনা অনবদ্য হলেও বেশ কিছু স্থানে দ্বিতীয় বার বিবেচনা করার অবকাশ আছে। তারও কিছু আলোচনা প্রয়োজনীয়।

কৌটিল্যের (২.১) ভাষায় এই ভাবে কৃষিযোগ্য জমি বাড়াতে হবে:

"(রাজা বিজিত) পরদেশ থেকে অপবাহন করে অথবা স্বদেশের উপচে পড়া (মানুষদের) নিয়ে আগে বসতি ছিল এমন অথবা বসতিহীন দেশে জনপদ নিবেশ করবেন। যেন কম করে একশ বেশি করে পাঁচশ চকে খেতের কাজ হয়, শূদ্র এবং কৃষিজীবীই বেশি থাকে, এক ক্রোশ থেকে দু-ক্রোশ সীমা হয় এবং একটা গ্রাম যেন পাশের গ্রামের রক্ষায় সহায়তা করতে পারে এমনি গ্রাম স্থাপনা করবেন। গ্রামের সীমানার শেষে থাকবে নদী, পাহাড়, অরণ্য, উষরভূমি, বেহড়, বাঁধ, শিমুল গাছ, শমী গাছ বা বট-অশ্বত্থ জাতীয় গাছ।" তারপর আটশ, চারশ, দুশ ও দশটি গ্রামের প্রশাসনিক ভাগ, জনপদের সুরক্ষা এবং অরণ্যচরদের হাতে দুই জনপদের অন্তরাল ভূমির রক্ষার দায়িত্বের ব্যবস্থা। তারপর যাজ্ঞিক, শিক্ষক ও পুরোহিত ব্রাহ্মণের জন্য নিষ্কর উত্তরাধিকার সম্পন্ন ভূমিদান; বিভাগীয় অধ্যক্ষ,

হিসাব পরীক্ষক, গ্রামরক্ষক, চিকিৎসক, হস্তী ও অশ্বপালক এবং পেশাগত দূতদের ভোগস্বত্ব সম্পন্ন ভূমিদান। খাজনার জমির কথা বলা হল। খাজনাকে ভাগ (কৌ ২.৬) বলা হতো। শস্যের ছয় ভাগ খাজনার (কৌ. ২.১৫) রীতি খুব পুরোনো মনে হল। এছাড়া রয়েছে একপুরুষ ভোগস্বত্বের অধিকারীদের টাকায় কর দেওয়া জমি। এগুলির বিশেষ উপযোগিতা স্পষ্ট নয়। সম্ভবতঃ এগুলি গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের জন্য নয়। রাষ্ট্রের লক্ষ্যে থাকত জমি যেন খালি পড়ে না থাকে। যদি কেউ উদ্যোগ নিয়ে ঊষর ভূমিকে কৃষিযোগ্য করে তোলে তার কাছে থেকে জমি না নিয়ে নেওয়ার উপদেশ আছে। ফেলে রাখলে গ্রামরক্ষক, ব্যবসায়ী বা অন্য কাউকে জমি দিয়ে দেওয়া হতো। অথবা চাষিকে খাজনার ক্ষতি পুরিয়ে দিতে হতো।

অর্থশাস্ত্রের অপবাহন করে জনপদনিবেশকে নতুন আবাদির জন্য জবরদস্তি চাষি বসানো বলা যেতে পারে। এর বর্ণনায় কোসম্বি অর্থশাস্ত্রের বাইরে যাননি। মনে হয় কোসম্বি একে মগধ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য মনে করেছেন। কিন্তু অর্থশাস্ত্রেই এর প্রথম একমাত্র পূর্ণ বিবরণ পাওয়া গেলেও এই প্রক্রিয়া যে অর্থশাস্ত্র রচনার আগে বৈদিক যুগেই শুরু হয়েছিল তার প্রমাণ আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২.১.১৮) একটি উপমা দেওয়া হয়েছে "যেমন মহারাজা জনপদের মানুষদের নিয়ে যেমন ইচ্ছা পরিবর্তন করায়..."। এই যেমন ইচ্ছা পরিবর্তন করানো অপবাহন পূর্বক আবাদিতে বসানোই বুঝোতে পারে। কথাগুলি বলছেন কাশীর রাজা অজাতশত্রু। এর থেকে এটুকু অন্ততঃ অনুমান করা যায় যে ভারতব্যাপী মগধ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল।

আলোচ্য যুগে এই প্রক্রিয়ায় জনপদের বিস্তার ঘটেছে, গ্রামের পত্তন হয়েছে, কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ বেড়েছে, রাজার খাজনা বেড়েছে এবং গৃহপতি শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে। আর্য সংস্কৃতির প্রসার বলে যে কথাটি এখন চালু আছে তারই একটি প্রক্রিয়ার নিখুঁত বর্ণনা করেছেন কৌটিল্য। 'জনপদনিবেশ' প্রকরণে (২.১) বর্ণিত এই খাজনার জমির বিস্তার এবং চাষকে 'সীতাধ্যক্ষ' প্রকরণের (কৌ. ২.২৪ ওপরে ৭) খাসজমির পণ্য-উৎপাদন থেকে আলাদা করে দেখতে হবে। দুটির তুলনা করলেই এটা স্পষ্ট হয়ে যায়। খাসজমির নাম সীতা। সীতা মানে হাল চালানো জমি। সীতাধ্যক্ষের কর্তব্যের মধ্যে বহুবার-চাষকরা যে জমি তাতেই দাস, শ্রমিক ইত্যাদিদের দিয়ে রাজপণ্য উৎপাদনের নির্দেশ আছে। "বহুবার চাষকরা নিজ জমিতে দাস, শ্রমিক ও যারা ব্যক্তিগত শ্রম দিয়ে জরিমানা পূরণ করতে চায় তাদের দিয়ে বীজ বপন করাবেন।" ইতিমধ্যেই যে জমিতে হাল চালানো হয়ে গেছে সেই জমিতে পণ্যোৎপাদন করলে ঝুঁকি কম। নিশ্চয়ই সেই কারণে তৈরি জমিতে রাজপণ্য উৎপাদনের ব্যবস্থা। অপরপক্ষে জনপদনিবেশ প্রকরণে 'অভূতপূর্ব' জনপদকেও কৌটিল্য লক্ষ্যে রেখেছেন। এখানে চাষি বসানো হচ্ছে। সে মূলতঃ রাজার দাস বা কর্মচারী নয়। সেই চাষি যাতে সফল হয় কৌটিল্য সেদিকে লক্ষ্য রেখেছেন। তাঁর নির্দেশ (২.১) 'এদের (অর্থাৎ বসানো চাষিদের) তিনি শস্য, পশু এবং টাকা দিয়ে সাহায্য করবেন যা তারা সুবিধামতন ফেরৎ দেবে। তাদের এমনভাবে সুবিধা এবং ছাড় দেবেন যাতে রাজকোষেরই বৃদ্ধি হয়।' একথাগুলো নিজ জমিতে চাষকরা চাষির ক্ষেত্রেই খাটে, খাসজমির শ্রমিকের ক্ষেত্রে নয়।

এখানে বলা দরকার যে জনপদনিবেশের মাধ্যমে আর্য সংস্কৃতির প্রসার ঘটেছে বলা মানে অন্য প্রক্রিয়াতে তা হয়নি বলা নয়। সীতাধ্যক্ষ প্রকরণে কৌটিল্যের উপদেশ (ওপরে §৯) অনুসারে বনজ দ্রব্য যাদের জীবিকার অবলম্বন তাদের জন্য অনেক কারখানা শহরের বাইরে ও ভেতরে তৈরি করতে হবে। এর ফলে নিশ্চয়ই যাযাবর বনচরদের, ঝুম চাষিদের স্থায়ী বৃত্তি লাভের মাধ্যমে বিগণীকরণ (detribalisation) ত্বরান্বিত হতো। আর্যীকরণের আরো প্রক্রিয়া ছিল (§১৬, ১৮)।

§১১. ছোট চাষির জন্ম

জনপদনিবেশ সম্বন্ধে এতগুলো কথা বলা হলো দুটি কারণে। সম্ভবতঃ অনবধানতা বশতঃ বা অন্য কোনো কারণে কোসম্বির গ্রন্থে খাসজমি এবং খাজনা জমির মধ্যে তফাৎ করা হয়নি। কোসম্বির মতে (১৯৫৬-৭৫ পৃ. ২০৫) মানুষকে অপবাহিত করা হতো খাস জমিতে বসানোর জন্য। 'প্রকৃতপক্ষে শ্রমিকদের খাস জমি থেকে পরিত্রাণ ছিল না।' (পৃ. ২৩০)। এই মত কেন এখানে গ্রহণ করা হয়নি তা ওপরের বর্ণনাতেই স্পষ্ট।

বিস্তৃতভাবে বলার দ্বিতীয় কারণ হস্তিনাপুর সহ তৎকালীন ভারতবর্ষের বহু শহরে বিপণন অর্থনীতি গড়ে ওঠার ভিত্তিটা দেখানো। বিপণন অর্থনীতি চিরকাল ছিল না এবং লৌহযুগের বৈশিষ্ট্য হিসাবেই এসেছিল। এর জন্য উদ্বৃত্তসঞ্জাত পুঁজিও লেগেছিল। উদ্বৃত্তেব মূল কারণ অবশ্যই কারিগরি উন্নতি— লাঙলেব ফলা, কুড়ুল, কোদাল, শাবল ইত্যাদি উৎপাদন যন্ত্রে কাঠ বা পাথরের বদলে লোহার ব্যবহার। লালই বলেছেন (§৬) যে লোহার ব্যবহার অর্থনীতিতে যুগান্তরের সৃষ্টি করেছিল। রাজার খাজনা যে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পুঁজির উৎস এ বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। কিন্তু সেই পণ্য কেনার ক্ষমতা ধরে এমন ক্রেতা ছাড়া বাজার তৈরি হয়নি। এই ক্রেতাবা কোথা থেকে এল এ প্রশ্ন খুবই সঙ্গত। ওপরে (§৮) দেখানো হয়েছে যে শর্মা (১৯৮৫: ৭৬৭) যে গৃহপতি শ্রেণীর উদয় দিয়ে উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলালের আবির্ভাবেব ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন তা অসঙ্গত। এই ব্যাখ্যা অসঙ্গত হলেও গৃহপতি অর্থাৎ ছোটো চাষি শ্রেণীর উদয়ের গভীর গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। কারণ এই শ্রেণীর আবির্ভাবকেই বাজারের অভ্যুদয়ের প্রাথমিক কারণ হিসাবে স্বীকার করতে হয়। কৌটিল্য যাদের নিয়ে খাজনা জমির পরিমাণ বাড়িয়ে যাওযার উপদেশ দিয়েছেন তারাই গৃহপতি এবং আদিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী। হস্তিনাপুরের প্রথম পণ্যবাজার গড়ে ওঠার পেছনে বয়েছে এই মধ্যবিত্তের প্রথম হাতে আসা উদ্বৃত্ত।

এশিয়াটিক সমাজ নিয়ে প্রচলিত ধারণায ভারতের কৃষিপদ্ধতি ও গ্রাম সমাজকে ভারতে অচলায়তন সমাজ প্রবর্তনের জন্য দায়ী করা হয়। তা যদি সত্য হতো তা হলে হস্তিনাপুরে এক ক্রমবর্ধমান পণ্যের বাজার আটশ বছর ধরে টিকে থাকতে পারত না। চাষি বলতে ভারতবর্ষে এক বিশেষ শ্রেণীকে বুঝোনো হয়। বড়লোকই হোক বা গরিবই হোক অতি রক্ষণশীল, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন এবং শহরের বিত্তবানদেব থেকেও গ্রামে জমিতে স্বত্ব বা অন্য অধিকারহীন শ্রমিকদের থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে অতি সচেতন এই শ্রেণী যে ভারতের ইতিহাস ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ স্থানেব অধিকারী একথা কখনোই ভোলা যায় না। উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলালেব যুগেই গৃহপতি নামে এদের ব্যাপক বিকাশ শুরু হয়। বর্তমান ভারতের আর্থসামাজিক বিকাশে এদের আলো-আঁধারি ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও প্রবল মগধ সাম্রাজ্যের নানা বিধিনিষেধ সত্ত্বেও এদের ক্রমোন্নতি এবং হস্তিনাপুরের মতো তৎকালীন বহু পণ্যোৎপাদী নগরের গড়ে ওঠার প্রাথমিক পর্যায়ে নিঃশব্দ এবং অসচেতন অবদানকে অস্বীকার করা মূর্খতা হবে।

চিত্রিত ধূসর কৌলাল স্তরের শেষে লোহার ব্যবহার শুরু হয়ে গিয়েছে দেখা গিয়েছিল। অরণ্য ধ্বংস করে ঝুম চাষের জায়গায় লোহার হাতিয়ার দিয়ে পরিকল্পনা মাফিক বন কেটে কৃষিকর্ম ও কৃষিতে প্রাচীন কাঠের ফলার জায়গায় লোহার ব্যবহার উৎপাদনে যুগান্তর আনে এটা বুঝতে কষ্ট হয় না। ফল স্বরূপ ট্রাইবাল স্তরের গণকৃষির জায়গায় ব্যক্তিগত কৃষি, রাজা ও ব্যক্তির হাতে উদ্বৃত্ত এই দুইয়ে মিলে হরপ্পার পর ভারতবর্ষের দ্বিতীয় অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটায়। এই অবধি বোঝা গেলেও গৃহপতি শ্রেণী এবং দুভাবে উদ্যোগী রাষ্ট্রের সমকালীন উদ্ভবটাও এখানে প্রাসঙ্গিক।

মুশকিল এই যে উক্ত উদ্ভবের ইতিহাসটা স্পষ্ট নয়। বৈদিক যুগের প্রথম ভাগে গৃহপতি শ্রেণীর অন্ততঃ এই নামে অস্তিত্বের প্রমাণ নেই। হস্তিনাপুরে চিত্রিত ধূসর কৌলাল স্তরে অর্থাৎ বৈদিক যুগের শেষ ভাগে বৈষয়িক বিকাশের চিহ্ন ওপরে (§৪) দেখানো হয়েছে। গৃহপতি নামটি তখনো পাওয়া যায়নি। তখন অবধি গৃহপতি মানে গৃহের দেবতা অগ্নি। কিছু আগের গ্রন্থ অথর্ববেদে, প্রধানতঃ পৈপ্পলাদ শাখায় কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য আছে। তথ্যগুলি নীচে দেওয়া হলো।

পৈপ্পলাদসংহিতা ৯.৮.২: 'দেবতারা যখন সরস্বতীর কাছে যব চাষ করেছিলেন ইন্দ্র ছিলেন সীরপতি, মরুদগণ ছিলেন কীনাশ।' ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনাও আছে— ৬.১৫.৩: 'খেতে তোমার যা সীতাভগ, যা ফলন, যা বপন করা হয়। এর পর খেতে যা পড়ে থাকে...।' ধান বা যবের স্তূপীকৃত রাশিকে ইন্দ্ররাশি বলা হতো এবং পবিত্র বলে বিবেচনা করে হতো। সেই ইন্দ্ররাশি সম্বন্ধে অদ্ভুত কতকগুলি উক্তি আছে যা নিয়ে এখন পর্যন্ত কোনো আলোচনা হয়নি। ১১.১১.৯: 'কীনাশের শ্রম ও ঘাম থেকে ইন্দ্ররাশির জন্ম হয়েছে।' ১০ : 'কীনাশের তপ্ত ঘাম যখন (তার) গায়ের ওপর দিয়ে বয়ে যায়, তৃষ্ণার্ত গরু যেমন জল লাভ করে সেও তেমনি করে ইন্দ্ররাশিকে পায়।'' ১১.১১.১: 'সীরপতি যদি রাগের বশে কীনাশকে লাঠি দিয়ে মারে... তা (=তার বেদনা) ইন্দ্ররাশিতেই গিয়ে পড়ে।'

মন্ত্রগুলি থেকে যে তথ্য উদ্ধার করা যায় তা এই : হালচালানো জমির নাম সীতা, সীর মানে হাল। পবিত্র বলে বিবেচিত স্তূপীকৃত শস্যের নাম ইন্দ্ররাশি। খেতে চাষের অধিকারীকে সীরপতি বলা হয়েছে। ইন্দ্রও সীরপতি। বীজ, যন্ত্রপাতি সীরপতির। ফসলে সীরপতির ভাগের নাম সীতাভগ। যে শ্রমিক হাল ধরে অতি পরিশ্রমে চাষ করে ফসল ফলাত তার নাম কীনাশ। তার সঙ্গে সীরপতির প্রায় দাস-মালিকেরই সম্পর্ক। সীরপতি যে কীনাশের ওপর অত্যাচার করত অথর্ববেদে সেটা ভাল চোখে দেখা হয়নি। এটা অথর্ববেদের পৈপ্পলাদসংহিতার চোখে পড়ার মতো বৈশিষ্ট্য।

পরে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এবং বৌদ্ধশাস্ত্রে সীরপতির জায়গায় গৃহপতির নাম পাওয়া যাচ্ছে। অর্থশাস্ত্রে সীতা নামটি রাজার নিজস্ব জমিকে বোঝাচ্ছে। সীতাভগের জায়গায় ভাগ শব্দটি রাজার ভাগ বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। বৈদিক যুগের ছোট সীরপতি থেকে রাজার মালিকানা প্রতিষ্ঠার হওয়ার মাঝখানের সেই ইতিহাস স্পষ্ট নয়। ট্রাইব্ স্তরের একটি বৈশিষ্ট্য সামূহিক অধিকার। সেই অধিকার কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে রাজাতেই বর্তেছে। এতে সীরপতির গৃহপতিতে রূপান্তরিত হওয়া আটকায়নি। জমিতে গৃহপতির বংশানুক্রমিক অধিকার এবং সীরপতির যা থাকতে পারে না সেই বিক্রয়স্বত্ব ছিল বলেই মনে হয়। কারণ কাদের জমি বিক্রয়যোগ্য নয় এবং কাদেরটা উত্তরাধিকার বর্জিত তা কৌটিল্য স্পষ্ট বলে গিয়েছেন। এদের মধ্যে গৃহপতির নাম নেই। অর্থশাস্ত্রে (২.১) বিভাগীয় অধ্যক্ষ, হিসাব পরীক্ষক, গ্রামরক্ষক, চিকিৎসক, হস্তী ও অশ্বপালক এবং পেশাগত দূতদের বিক্রয় এবং গচ্ছিত রাখার অধিকারহীন জমি দেওয়ার নির্দেশ আছে। এ ছাড়া রয়েছে এক পুরুষ ভোগস্বত্বের অধিকারীদের টাকায় কর দেওয়া জমি যা চাষ না করলে কেড়ে নেওয়া যেত। কিন্তু খাজনা দেওয়া গৃহপতির জমি সম্বন্ধে এমন কোনো নির্দেশ নেই। বৈদিক সাহিত্যের শেষভাগে (শতপথব্রাহ্মণ ১৩.৭.১.১৫ এবং অন্যত্র) এবং বৌদ্ধ সাহিত্যেও অর্থাৎ কৃষি বিকাশের প্রথম যুগে ভূমিতে ব্যক্তিগত স্বত্বের বিরুদ্ধে মত মেলে। এটি ট্রাইব স্তর থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া এক আদিম নীতি। লঙ্ঘনের উদাহরণও শতপথব্রাহ্মণের ঐ অংশেই আছে। ঐ গ্রন্থের ভৌগোলিক সীমায় চাষের জমিতে স্বত্ব বিরল ছিল বোঝা যায়। তবে অর্থশাস্ত্রে বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়া জমি বিক্রির ওপর নিষেধ না থাকায় বিক্রয় অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলেই মনে করা স্বাভাবিক।

অধিকাংশ ঐতিহাসিক জমি বিক্রির প্রশ্ন নিয়ে নানা মন্তব্য করেছেন বলে কথাগুলি বলা হল। অন্ততঃ, বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত জমির স্বত্ব ও বিক্রির অধিকার নিয়ে নানারকম ধারণা ছিল। কিন্তু এ আলোচনাটা নিরর্থক। কারণ জমি বিক্রির প্রশ্নটা সমসাময়িক স্থানীয় অর্থনীতিতে বিপণনের গুরুত্বের সঙ্গে জড়িত। পণ্যের অত্যন্ত বেশি চাহিদার জন্য গ্রীস ও রোমে দাসরাও পণ্য হয়ে গিয়েছিল। হতে পারে যে কোনো কারণেই হোক ভারতবর্ষে গ্রীস বা রোমের মতো উদ্বৃত্ত সঞ্চয় হয়নি, পণ্যায়নের মাত্রাও এখানে প্রাচীন ইউরোপের মতো চড়া হয়নি। এটাই প্রচলিত বিশ্বাস। রোমে ব্যক্তিগত মালিকানায় বাগিচা চাষে দাস নিয়োগ করা হতো। ভারতবর্ষে সে ব্যাপার দেখা যায়নি। কিন্তু যৎসামান্য তথ্যের ভিত্তিতে উদ্বৃত্ত ও পণ্যায়ন নিয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা উচিত নয়। রোম বা গ্রীসের সঙ্গে তফাতের অন্য ব্যাখ্যাও থাকতে পারে। যাই হোক সাধারণভাবে বিপণনের মাত্রা বেশি হলে জমিও পণ্যে পরিণত হতো না এমন মনে করা অযৌক্তিক। উদ্বৃত্ত বেশি হলে তা হতেই পারত। এর নথিবদ্ধ প্রমাণও আছে। পূর্বসূরিদের মত ও গ্রন্থ বিবরণী সহ সংক্ষিপ্ত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য সরকার : ১৯৮২, বিশেষত, পৃ. ৬৬।

অর্থশাস্ত্রের রাজা ট্রাইবের অধিকারগুলি পেয়েছে একথা ওপরে বলা হয়েছে। উৎপাদন ব্যবস্থাতেও ট্রাইবের গভীর প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। গ্রামে চাষি হওয়ার অধিকার মূলতঃ বৈশ্যেরই ছিল। কৌটিল্য (১.৩.৪) বৈশ্যের পেশার মধ্যে কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্যের নাম করেছেন। এগুলির পারিভাষিক নাম *বার্তা*। শূদ্রেরও এগুলিতে অধিকার আছে। কিন্তু শূদ্রের বেশি কাজ দ্বিজাতির শুশ্রূষা ও কারুকুশীলবকর্ম। এদের অনেকেই অপবাহিত হয়ে নতুন দেশে বসানো চাষি বা খেত মজুর। শূদ্রদের মধ্যে থেকেই যে মজুররা আসবে তা কৌটিল্যের পেশার পরিগণন থেকেই স্পষ্ট হয়। এরা এবং গ্রামের পুরোহিত সাধারণতঃ জাতি অনুসারেই বৃত্তি অনুসরণ করত। ট্রাইব যেমন অন্তর্বিবাহের নিয়মে বাঁধা এই জাতিগুলিও তাই। হারিয়ে যাওয়া ট্রাইবের ছাপ শহরের কারুকুশীলবকর্মে রত শূদ্রদের শ্রেণী অর্থাৎ কারুজীবীদের নিজস্ব সঙ্ঘের সংগঠনের মধ্যেও পড়তে বাধ্য। ভেঙে যাওয়া ট্রাইবগুলির কারুজীবীরা ছাড়া শহরের সঙ্ঘগুলি গড়ে উঠতে পারত না। পরবর্তীকালের কারুজীবীদের সঙ্ঘগুলিও জাতির নিয়মে বাঁধা থেকেছে।

§১২. কৌটিল্য-বিচারে রাষ্ট্রীয় ও তাত্ত্বিক কাঠামো

এই অনুচ্ছেদটি বন্ধনীর মধ্যে ধরতে হবে। এর অবতারণা শুধু এই কারণে যে আমাদের সব যুক্তিই ব্যর্থ হয়ে যায় যদি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে মৌর্য শাসনের প্রতিফলন না থাকে। অর্থশাস্ত্রের প্রামাণিকতার বিরুদ্ধে শেষ বড় যুক্তি দিয়েছেন হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী (১৯৫৩: ২৮৫-২৮৭)। তারও পরে প্রামাণিকতার পক্ষে মত দিয়ে পূর্ববর্তীদের প্রায় সব যুক্তিই খণ্ডন করেন কোসম্বি (১৯৫৬: ২০৯-২১৩)। কোসম্বিকে কেউ খণ্ডন করেছেন বলে আমার জানা নেই। রায়চৌধুরীর মতে অর্থশাস্ত্র খ্রি. পূ. তৃতীয় শতকের পূর্ববর্তী হতে পারে না। তার কারণ চীন নামটি এতে পাওয়া যায়। চীন শব্দটি কি করে তৃতীয় শতকের আগে কৌটিল্য ব্যবহার করতে পারেন কোসম্বি (২১২) তা দেখিয়েছেন। কোসম্বির খণ্ডন করা মতগুলি আবার অবতারণার দরকার নেই। কিন্তু রায়চৌধুরীর মতের কথা কোসম্বি বলেননি। কৌটিল্য (২.৬ = ২৪) তারিখ লেখার একটা পদ্ধতি বলেছেন। রায়চৌধুরীর আপত্তি অশোক অনুশাসন জারি করার সময়ে কৌটিল্যের নীতি অনুসরণ না করে পারস্যের হখমনীয় সম্রাটদের মতো তারিখ দিয়েছেন। রায়চৌধুরী পারস্যের পদ্ধতির সঙ্গে কোথায় অশোকের সাদৃশ্য স্পষ্ট করে না বলায় তাঁর মত সম্বন্ধে মন্তব্য করা শক্ত। হখমনীয় সম্রাটরা কোনো ঘটনা বলতে গেলে সালের নাম ও তারিখ দিয়ে কাল

নির্দেশ করতেন। যেমন "অরকদ্রি নামক পাহাড়, বিয়খ্ন মাসের চোদ্দ দিন বিগত হলে সেখান থেকে সে উঠেছিল।" দারয়বৌস, বেহিস্তান, ৩৭-৩৮ পঙক্তি। "অনামক মাসের দু'দিন চলে গেল, তারপর আমরা যুদ্ধ করলাম।" ঐ, শেষ পঙক্তি (কেন্ট ১৯৫৩: ১১৭, ১১৮)। অশোক তাঁর রাজত্ব কালকে মানক ধরে সময় বলেছেন। কৌটিল্যও সবার আগে রাজার রাজত্বের কাল উল্লেখের নির্দেশ দিয়েছেন। সাদৃশ্য তো কৌটিল্যের সঙ্গেই বেশি। কিন্তু কৌটিল্যের সঙ্গে অবিকল সাদৃশ্য আশা করা অন্যায় হবে। তিনি (২.৬) হিসাব রাখার পদ্ধতির বলার সময়ে মাস ও পক্ষ সহ তারিখ লেখার কথা বলেছেন, গিরিশাসন বা স্তম্ভশাসন লেখার জন্য নয়। এগুলির প্রবর্তক অশোক স্বয়ং (দ্র. দিল্লী তোপরা সপ্তম স্তম্ভশাসন)। কৌটিল্যও (২.১০=২৮) শাসনের কথা বলেছেন। কিন্তু সেগুলো গিরিশাসন বা স্তম্ভশাসন নয়, চিঠির আকারে ছোট ছোট বিজ্ঞপ্তি, নির্দেশ ইত্যাদি। সেখানে তারিখ লেখার নির্দেশ নেই। পাহাড়ে বা পাথরের গায়ে সবার চেয়ে পড়ে এমন অনুশাসন জারি করার পদ্ধতি ভারতবর্ষে অশোকের আগে ছিল এমন কোনো প্রমাণ নেই। কিন্তু পারস্যে এই রীতি খ্রি. পূ. সপ্তম শতাব্দীতে শুরু হয়। অশোকের অনুশাসন রচনার শৈলীতে পারস্যের কোনো প্রভাব যদি দেখাও যেত সেটা অস্বাভাবিক হতো না।

রায়চৌধুরীর আর একটি আপত্তি এই যে গ্রীক ঐতিহাসিকরা মেগাস্থেনেসের বিবরণীর ওপর নির্ভর করে পাটলিপুত্র সহ নদীতীরবর্তী নগরগুলি কাঠের প্রাচীরে ঘেরা থাকত বলেছেন। অপরপক্ষে কৌটিল্য দেয়ালের শক্ত ভিতের ওপর কাঠের বদলে পাথর বা ইঁটের প্রাকার গড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। রায়চৌধুরী যখন লিখেছেন তখনো উৎখননগুলির বিবরণী প্রকাশিত হয়নি। উজ্জয়িনীতে সমকালীন প্রাচীরের অবশেষ মিলেছে। খ্রি. পূ. ৫০০ অব্দের আগে একবার কাঠ দিয়ে দেয়াল শক্ত করা হয়েছিল, পরে আর নয়। কাঠের প্রাকারের অবশেষের কোনো খবর নেই। কৌশাম্বীতে খ্রি. পূ. প্রথম সহস্রকের গোড়ায় প্রাচীর গড়া শুরু হয়। অনেকবার মেরামতিও হয়। কাঠের প্রাকারের খোঁজ নেই। গ্রীক পর্যটক বা ঐতিহাসিকরা যা বলে গেছেন তা সারা ভারতের সর্বত্র বরাবর চালু ছিল এমন ভাবা উচিত নয়। উৎখনন লব্ধ সাক্ষ্য গ্রীক বিবরণীর চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। সেই সাক্ষ্য অন্য রীতির অস্তিত্বের জানান দেয়। কৌটিল্যও অন্য রীতির পক্ষে মত দিয়েছেন।

কৌটিল্যের আলোচনায় অধিকাংশ পণ্ডিতই সামূহিক দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন না করে টুকরো শব্দ, প্রথা ইত্যাদিকে বিচারের ভিত্তি করেছেন। একমাত্র কোসম্বিই কৌটিল্যের বর্ণিত রাষ্ট্রের সঙ্গে বৌদ্ধশাস্ত্রে বর্ণিত যে মগধ রাষ্ট্র ও উত্তর বিহারের ট্রাইবাল সঙ্ঘগুলির হিংস্র সংঘর্ষ চলেছিল তার তুলনা করে কৌটিল্যের প্রামাণিকতার বিচার করেছেন। কৌটিল্য (১১.১ = ১৬০, ১৬১) ঐরকম অনেক ট্রাইবের নাম করেছেন। তাদের মধ্যে বৌদ্ধশাস্ত্রে বর্ণিত লিচ্ছবি আর বৃজিদের নামও আছে। কিভাবে গুপ্তচরের মাধ্যমে তাদের ভাঙার ব্যবস্থা করা হতো কোসম্বি তাও দেখিয়েছেন। অশোক এই ব্যাপারটিই বন্ধ করেছিলেন। সে বিবরণী দিতে গেলে পুনরুক্তি হবে। দুঃখের ব্যাপার পাঠ্য বা সাবেকি ঐতিহাসিকদের বইগুলিতে এই ঐতিহাসিক সঙ্ঘর্ষের বিবরণী এখনো বিশেষ জায়গা পায়নি।

কোসাম্বি অজান্তেই এক নতুন পদ্ধতির দিশারি হয়েছেন। কৌটিল্য মৌর্য রাষ্ট্রের বর্ণনা করবেন বলে অর্থশাস্ত্র রচনা করেননি, তাঁর মতে যেটা আদর্শ রাষ্ট্র তারই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তাঁর চিন্তার কাঠামোয় যে রাষ্ট্রের ছবি ফুটে উঠেছে তার সঙ্গে খ্রি. পূ. প্রথম সহস্রকের সাম্রাজ্যবাদী মগধ রাষ্ট্রেরই মিল এটা কোসম্বি দেখিয়েছেন। ফলে তাত্ত্বিক কাঠামোবাদী না হয়েও কোসম্বি বৌদ্ধশাস্ত্রের বর্ণনাপ্রসঙ্গ থেকে অনুমিত মগধের রাষ্ট্রীয় কাঠামো এবং কৌটিল্যের আদর্শ রাষ্ট্রের কাঠামোর সাদৃশ্যের ভিত্তিতেই দুই-এর অভিন্নতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করেছেন। বৌদ্ধ সাহিত্য অবগাহন করলে মৌর্য রাষ্ট্রের সঙ্গে অভিন্ন গঠনের আরো মানস কাঠামো চোখে পড়বে। লেবি স্ত্রোসের মতো কাঠামোবাদীরা নিজেদের

ইতিহাস বিরোধী বলে দেখাতে চেয়েছেন। কিন্তু আর্থসামাজিক চিন্তার কাঠামোর পর্যবেক্ষণ যদি ইতিহাসকে জানতে সাহায্য করে তাহলে নতুন ঐতিহাসিকরা এই পদ্ধতিকে আরো উন্নীত করে ধর্মীয় চিন্তার কাঠামোকেও আলোচনার আওতায় এনে আরো এগোতে পারেন ও উক্ত বিরোধের মতো অনেক সাবেকি বিরোধকেই অলীক প্রতিপন্ন করতে পারেন।

§১৩ সমৃদ্ধতম যুগ

এ অবধি হস্তিনাপুরের গড়ে ওঠার কারণ নিয়েই বিবেচনা করা হয়েছে। উৎখননের বিবরণীতে বলা হয়েছিল খ্রি. পূ. তৃতীয় শতাব্দীতে সম্ভবতঃ শতাব্দীর শেষ ভাগে এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ঘটে, কিন্তু অচিরেই নগরের পুনর্নির্মাণ হয়। এর পর সমৃদ্ধতম যুগটি আসে। ইতিমধ্যে অশোকের ধর্মবিজয় নীতি প্রবর্তিত হয়। রাজ্যাভিষেকের আট বছর পর আনুমানিক খ্রি. পূ. ২৬০ অব্দে কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি দেখে তৃতীয় মৌর্য সম্রাট অশোক যুদ্ধের জায়গায় ধর্মবিজয় নীতি প্রবর্তন করেন। নতুন নীতিতে কৌটিল্যের অপবাহন প্রক্রিয়া একেবোরে বর্জিত হয়। ত্রয়োদশ মুখ্য গিরিশাসনে বলা হয়েছে যে কলিঙ্গযুদ্ধে দেড় লক্ষ লোক অপবাহিত হয়েছিল, দেড় লক্ষ নিহত হয়েছিল ও পরে আরো দেড় লক্ষ মারা গিয়েছিল।

"কলিঙ্গবিজয়ের পর দেবগণের প্রিয়ের অনুশোচনা আসে। কারণ অবিজিত রাজ্য জয় করা মানে হত্যা, মৃত্যু এবং অপবাহন। দেবগণেব প্রিয়ের পক্ষে এটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং গুরুতর। আরো বেদনাদায়ক এই কারণে যে সেখানে ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, অন্য মতাবলম্বীরা এবং গৃহস্থরা বাস করেন, যাঁদের মধ্যে গুরুজন শুশ্রূষা, মাতাপিতার শুশ্রূষা, গুরু শুশ্রূষা, বন্ধু, সঙ্গী এবং সহায়ক আত্মীয়, দাস ও ভৃত্যদের প্রতি সম্যক আচরণের বিধি ও দৃঢ় আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত। তাদের আসে আঘাত, নিধন এবং প্রিয়জনের কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়া।... ... ... তাই কলিঙ্গে যত বন্দী আহত, নিহত বা অপবাহিত হয়েছিল তার একশ ভাগও, সহস্র ভাগও আজ দেবগণের প্রিয়ের কাছে গুরুতর ব্যাপার।"

একটি তথ্য উহ্য থেকে গিয়েছে— কলিঙ্গবাসীর প্রবল প্রতিরোধ। সেদিন তারা অজ্ঞাতে সারা ভাবতের ট্রাইবালদের জন্য লড়াই করেছিল— যারা সঙ্ঘজীবী ও যারা বনচর তাদের জন্য, ছোট চাষির জন্যও। এই লড়াইএর কোনো পরিভাষা নেই। 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ উলুখড়ের প্রাণ যায়' প্রবাদটি এ লড়াই এ প্রযোজ্য নয়, কারণ যুদ্ধটাই উলুখড়েব জন্য। তখন কলিঙ্গের কোনো রাজা ছিল না। মগধের লক্ষ্য ছিল মানুষগুলো, বিজিত মানুষদের অপবাহন। প্রচলিত পরিভাষায় এটা শ্রেণী সংগ্রাম ছিল না। কোন শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম? কোনো মার্ক্সবাদী একে শ্রেণী সংগ্রাম বলেছেন বলে আমাব জানা নেই। তবু এই লড়াই ভারতবর্ষের ইতিহাসের গতিতে শুভ পরিবর্তন এনে দিয়ে এক নতুন যুগ প্রবর্তন করেছিল। এর জন্য পবিভাষার দরকার আছে।

যুদ্ধ, হত্যা এবং অপবাহন তিনটিই অশোক নীতিগত ভাবে বর্জন করেন। এর ফলে রাষ্ট্রের উদ্যোগী চরিত্রের ওপর বড় আঘাত আসতে বাধ্য। এতদিন পর্যন্ত রাষ্ট্রের অস্তিত্বের ভিত্তিই ছিল যুদ্ধ। খুব বড় কাজ ছিল ট্রাইবালদের পরাভূত ও অপবাহিত করে নতুন দেশে নিয়ে গিয়ে অনাবাদি ভূখণ্ডে আবাদির মাধ্যমে নিয়ত আয় বৃদ্ধি করে যাওয়া এবং সেই আয় পণ্য উৎপাদনে বিনিয়োগ করা। এর জন্য কি করে গুপ্তচর লাগিয়ে ট্রাইবদের সঙ্ঘ ভাঙতে হবে তার উপদেশও কৌটিল্য (১১=১৬০, ১৬১) দিয়ে গিয়েছেন। কলিঙ্গ জয় করে যে তিনি পরাজিতদের অপবাহন পূর্বক নতুন দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন তা অশোক নিজেই বলে গেছেন। তাঁর সংস্কারে মগধের ঐ নীতির মূলেই আঘাত পড়ল। রাজনীতিতে খুব তাড়াতাড়িই এর ফল ফলেছিল। অশোকের মৃত্যুর অল্প পরেই গ্রীক আক্রমণ হয়।

তারপর খ্রি. পূ. ১৮৭ অব্দে শেষ মৌর্য সম্রাট তাঁর সেনাপতি পুষ্যমিত্রের হাতে নিহত হন। মগধের আধিপত্যের দিনও শেষ হয়ে যায়।

কিন্তু অর্থনীতিতে অশোকের সংস্কারে কোনো বিরূপ প্রভাব পড়েনি, বরং ভালই হয়েছিল। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার পরেও হস্তিনাপুরের পুনর্নির্মাণ এবং তার পর ক্রমাগত সমৃদ্ধিই তার প্রমাণ। তৃতীয় শতাব্দীতে অজানা কারণে পরিত্যক্ত হওয়ার পর হস্তিনাপুরের পুনর্নির্মাণ না হওয়ার পেছনে কিন্তু অশোকের সংস্কার পরোক্ষভাবে কাজ করে থাকতে পারে। সে প্রসঙ্গে পরে আসা যেতে পারে।

তিনটি ঘটনা বিবেচনা করতে হবে: (১) অশোকের নীতি প্রবর্তিত হওয়ার পর হস্তিনাপুরে সমৃদ্ধতম যুগের আবির্ভাব। (২) সাড়ে চারশ বছরের সমৃদ্ধতম যুগের পরই হস্তিনাপুরের হঠাৎ পরিত্যক্ত হওয়া। (৩) নগরের পুনর্নির্মাণ না হওয়া।

প্রায় সব ঐতিহাসিকই লক্ষ্য করেছেন যে খ্রি.পূ. দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠ যুগ। এর কারণ অনুমান করা শক্ত নয়। অশোকের সংস্কারের ফলে আবাদিতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ পরিত্যক্ত হওয়ায় রাষ্ট্রের আয় কমে যেতে বাধ্য ছিল। নথিবদ্ধ রাজনৈতিক ঘটনাগুলি এও দেখিয়ে দিচ্ছে যে পুরো প্রশাসনেই শিথিলতা এসেছিল। সম্রাট অশোক বলপ্রয়োগ যথাসম্ভব বর্জন করেন এবং প্রথম কল্যাণকামী রাষ্ট্রের ধারণা দেন। এরই ফলে কোষ শূন্য হয়ে যায়। এটা অনুমান মাত্র নয়। অশোকের কোষ যে শূন্য হয়ে গিয়েছিল সে কথা আনুমানিক ২০০ অব্দে বা কিছু আগে রচিত অশোকাবদানে (দিব্যাবদান ২৯) মনে রাখা হয়েছে। চক্রবৃদ্ধিহারে দুর্নীতি বিস্তারেরও এই সময়। তারও নথিবদ্ধ প্রমাণ আছে। খ্রি. পূ. দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দী নাগাদ সংকলিত জাতকে *লঞ্চ* শব্দটি কয়েকবার এসেছে। এর মানে ঘুষ। *লঞ্চখাদক* 'যে ঘুষ খায়', *লঞ্চগাহ* 'ঘুষ নেওয়া' , *লঞ্চবিত্তক* 'ঘুষ নিয়ে বড়লোক'। শিথিল প্রশাসন পণ্য উৎপাদনের জটিল যন্ত্রটিকে ঝাঁঝরা করে দেওয়ার মতো রাজপুরুষদের অভ্যুদয়ের পক্ষে অনুকূলতম পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল অনুমান করা যায়। পরবর্তীকালে উত্তর ভারতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পণ্য উৎপাদনের নজির নেই। অর্থাৎ সেটি এই সময়েই কালগত হয়। এর পরেও রাষ্ট্রের হাতে কারুজীবী ও বণিকদের ওপর খবরদারি করার ক্ষমতা তথা প্রয়োজন কতটা থেকে যায় তা অনুমান করার জন্য বেশি হিসেবের দরকার হয় না। অর্থাৎ ঘটনাবলীর সাক্ষ্য অনুসারে উৎপাদন ও বাণিজ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগের বিস্তার হস্তিনাপুরের সমৃদ্ধতম যুগ নিয়ে আসে।

এটি ইতিহাসের একটি সম্মুখ পদক্ষেপ, পশ্চাদগামী নয়। কৌটিল্যের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া মূলত ট্রাইবস্তরের ব্যাপার। নিজেদের মধ্যে ট্রাইব কঠোর নৈতিকতা পালন করে ঠিকই। কিন্তু অন্য ট্রাইবের ক্ষেত্রে সেটা মানতে হবে এমন কথা নেই। দাসরা পরাজিত অন্য ট্রাইব থেকে আসে। পরের জমি দখল করে আবাদি প্রবর্তনের নীতিও ট্রাইবের আদিম নীতিরই উন্নত সংস্করণ। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ট্রাইব নৈতিকতা থেকে একটা পশ্চাদগমনও রয়েছে। নৃতাত্ত্বিকদের মতে ট্রাইবের ভূমিস্বত্ব সামূহিক। যুদ্ধে অর্জিত ট্রাইবের সম্পত্তিও সামূহিক। দলপতির বণ্টনের অধিকার থাকতে পারে, স্বত্ব নয়। কিন্তু সীতায় উৎপন্ন পণ্য রাজার। ট্রাইবের অধিকারটি রাজা নিয়ে নিয়েছেন। অর্থশাস্ত্র বর্ণিত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের উৎপাদন রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। সামূহিক স্বত্বের জায়গায় ব্যক্তিগত স্বত্ব এসেছে ঠিকই, কিন্তু প্রশাসনের শীর্ষে যে রয়েছে সেই একজন ব্যক্তির হাতে সীমাবদ্ধ এই স্বত্ব ব্যক্তিগত স্বত্বের বিকৃতি ছাড়া কিছু নয়। এটার বহুজনের মধ্যে ছড়ানো দরকার ছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে ট্রাইব থেকে পাওয়া একটি বিকৃত উত্তরাধিকারের সমাপ্তি ঘটল। ফলে যেটা অবশ্যম্ভাবী সেই ব্যক্তিগত উদ্যোগের সামনের সবচেয়ে বড় বাধাটি দূর হয়ে গেল।

§১৪. হস্তিনাপুরের লোপ

আগেই বলা হয়েছে যে তৃতীয় শতাব্দীতে হস্তিনাপুরের বসতি হঠাৎ কেন পরিত্যক্ত হলো উৎখনক তা বলেননি। বসতি পরিত্যাগের এই প্রশ্নকে হস্তিনাপুরের পুনর্নির্মাণ না হওয়ার প্রশ্ন থেকে আলাদা করে দেখতে হবে। তার কারণ এই যে হস্তিনাপুরের অবলুপ্তির অল্প পরেই সমৃদ্ধ শহরগুলির একটা অবক্ষয় চোখে পড়ে। বৈশালী ৫০০ অব্দ নাগাদ ক্ষীণ হয়ে যায়। এই সময়েই মহেশ্বরে (মাহিষ্মতী?) এক স্থূল, অমসৃণ কৌলালের প্রবর্তন হয় যা অবক্ষয়ের সূচক। ৫১৫ অব্দে হূণরা কৌশাম্বী নগর ধ্বংস করে, নগর আর গড়ে ওঠেনি। কিন্তু কোনো আক্রমণের ইতিহাস না থাকলেও এক সহস্রক ধরে ভারতের শ্রেষ্ঠ নগর পাটলিপুত্র ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রায় জঙ্গলে পরিণত হয়। উত্তর পাঞ্চালের রাজধানী অহিচ্ছত্রায় অষ্টম শতাব্দী থেকে অবক্ষয় দেখা যায়। সম্ভবত অসাধারণ বাণিজ্যিক গুরুত্বের কারণে একমাত্র উজ্জয়িনী অনেক দিন টিকে থাকে। অবশ্য এই নগরগুলির সবকটাই হস্তিনাপুর পরিত্যক্ত হওয়ার পরেও অনেক দিন সজীব ছিল। অর্থাৎ এদের অবক্ষয়টা ধীরে আসে। কোসম্বি এই অবক্ষয়ের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। পরে সে আলোচনায় আসা যাবে।

কথিত অবক্ষয় হস্তিনাপুরের পুনর্নির্মাণ না হওয়ার কারণ হতে পারে, লোপের নয়। কারণ উক্ত নগরগুলি অনেক পরে লুপ্ত হয়ে ছিল, তাও ধীরে ধীরে। কয়েকটি নগর অবশ্য হস্তিনাপুরের সঙ্গেই লোপ পায়। যেমন নাসিক ২০০ অব্দ, নেবাসা ৩০০ অব্দ, অরিকমেডু ২০০ অব্দ (শর্মা ১৯৬৪: ৭৪-৭৬, ৮৪)। তৃতীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে সাতবাহন সাম্রাজ্য শেষ হয়। কুষাণ সাম্রাজ্যও এই সময়ে শেষ হয়ে গিয়েছিল। ২২০ থেকে ৩০০ অব্দ অবধি ভারতবর্ষে বলার মতো কোনো শাসন.ছিল না। এতে নিশ্চয়ই অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু তাতে বাণিজ্যে আঘাত আসতে পারে কিন্তু নগরগুলো সঙ্গে সঙ্গে পরিত্যক্ত হতে পারে না। লোপের কারণ হিসাবে এটা অসম্ভব কল্পনা হবে। এগুলো তো রাজধানী ছিল না। আর মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর তো কোনো অবক্ষয় দেখা যায়নি। সম্ভবতঃ এগুলির লোপের কারণ সমসাময়িক ভারতবর্ষের কোনো ঘটনা নয়। কুষাণ ও সাতবাহন সাম্রাজ্যের অবসানের চেয়ে বরং তৃতীয় শতাব্দীর প্রথমার্ধে রোমান সাম্রাজ্যের পতন বেশি প্রাসঙ্গিক। প্রথমোক্ত দুই নগর পশ্চিম ভারতের বাণিজ্য নগরী। নেবাসায় রোমান সম্পর্কের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। পণ্ডিচেরির নিকটবর্তী অরিকমেডুতেও রোমানদের সঙ্গে বাণিজ্যের অনেক প্রমাণ মিলেছে। অরিকমেডুর অবলোপ প্রায় নিশ্চিত ভাবেই রোমান সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে যুক্ত। রোমান সাম্রাজ্যের পতন সে যুগে আন্তর্জাতিক বাজারে ভীষণ ঘটনা। সেই যুগে ভারতবর্ষ থেকে রোমে পণ্য রপ্তানির কাহিনীও ঐতিহাসিক প্লিনির কল্যাণে সর্বজনবিদিত। অন্য কোনো ব্যাখ্যা যখন মিলছে না রোমের পতনকেই হস্তিনাপুরের পতনের প্রত্যক্ষ কারণ বলে মানতে হচ্ছে। তাহলে এও অবশ্য স্বীকার করে নিতে হয় যে হস্তিনাপুর এবং নাসিক, নেবাসা ও অরিকমেডুর অস্তিত্ব অতিরিক্ত মাত্রায় বৈদেশিক রপ্তানির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল।

কৌতূহল হয় হস্তিনাপুর থেকে বিদেশে কি রপ্তানি হতে পারত। যদিও নিশ্চিত কোনো প্রমাণ দেওয়া সম্ভব নয় তবু সমকালীন বসতি বিস্তারের মানচিত্র থেকে খানিকটা অনুমান করা যায়। ওপরে বলা হয়েছিল যে তেহরি-গহড়বালে অলকানন্দার তীরে থাপলিতে (উ. ৩০°১২′ পূ ৭৮°৪৭′) চিত্রিত ধূসর কৌলাল সংস্কৃতির একটি বসতির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে (নৌটিয়াল ইত্যাদি ১৯৭৮)। হস্তিনাপুরে এবং দিল্লী ও হস্তিনাপুরের মাঝামাঝি আলমগিরপুরে (দ্র. লাল ১৯৬৪ পৃ. ১৭৪) চিত্রিত ধূসর কৌলাল স্তরের শেষ পর্যায়ে লোহার ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। থাপলিতে অন্যরকম হওয়ার কোনো কারণ নেই। লোহা ছাড়া হিমালয়ের আদিম অরণ্য কেটে বসতি স্থাপনের ক্ষমতা

অর্জনও সম্ভবপর নয়। থাপলি হরিদ্বার থেকে প্রায় একশ কি.মি. পূর্ব-উত্তরপূর্বে দেবপ্রয়াগ ও রুদ্রপ্রয়াগের মাঝামাঝি অলকানন্দার উত্তর তীরে অবস্থিত। থাপলি থেকে সমতলে আসতে গেলে হরিদ্বার এখন পথে পড়ে। অলকানন্দা-গঙ্গা ধরে এলে প্রাচীন কালেও একই পথে আসতে হতো। হরিদ্বার হস্তিনাপুর থেকে সোজা উত্তরে প্রায় এক ডিগ্রির কম তফাতে। দূরত্ব একশ কি.মি-র বেশি হওয়া উচিত নয়। আড়াই হাজার বছর আগে নদীপথে ২০০ থেকে ২২৫ কি.মি-র মধ্যে অবস্থিত হস্তিনাপুর থাপলির নিকটতম লৌহযুগীয় বসতি ছিল। এ কথা মনে রাখলে নগরের বাণিজ্যিক উপযোগিতাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হস্তিনাপুরের দ্বিতীয়বারের উদয় যে হিমালয়ের বনজ পণ্যের গঞ্জ হিসাবেই হয়েছিল এই অনুমানের ভিত্তিটাও খুব শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। আধুনিক কালে ঐজাতীয় পণ্যের মধ্যে এসেছে হাতির দাঁত ও হাড়ের জিনিষ, পশম, পশু; নানারকম ওষধী, পাইন কাঠ ও তেল, সরল কাঠ, রজন, গন্ধ, শিলাজতু ও বিবিধ শৈলজ অজৈব রাসায়নিক, দামি ও কম দামি পাথর ইত্যাদি। অথর্ববেদে নানা গিরিজাত ওষধীর এবং নৌকো করে ওষধী সমতলে নিয়ে আসার কথা আছে এ কথা আগে বলা হয়েছে। হস্তিনাপুরে কুর্চির অবশেষ পাওয়া গিয়েছে। আমাশয়ের ওষুধ তৈরিতে লাগে— হিমালয়ে ৪০০০ ফুট ওপর পর্যন্ত মেলে (চৌধুরী-ঘোষ=লাল ১৯৫৪: ১৩৪)। গজদন্ত সহ অন্যান্য পশুর হাড়ের দ্রব্যের ১৪টি নিদর্শন হস্তিনাপুরে মিলেছে (লাল ১৯৫৪-৫৫: ১০৫-৬)। পম্পেই এর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ভারত থেকে আমদানি গজদন্তের নারীমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। রোমের আমদানির মধ্যে মসলিন যেমন ছিল বাঁদরও বাদ যেত না। সুতরাং আমাদের অনুমানের বিপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই।

§১৫. পরবর্তী সাহিত্যে হস্তিনাপুর ও অন্যান্য নগর (১) ভর্তৃহরি

হস্তিনাপুর সহ যে নগর সভ্যতার বিকাশ ও লোপের কথা আলোচনা করা হলো তার কোনো স্মৃতি ভারতীয় সাহিত্যে আছে কি? অনেকগুলি নগর গড়ে উঠল, হাজার বছর সগৌরবে রইল, তারপর লুপ্ত হয়ে গেল— এটা কোনো সাধারণ ঘটনা নয়। সংশ্লিষ্ট মানুষগুলোর বিন্দুমাত্রও সংবেদনশীলতা থাকলে দেশের সাহিত্যের কোথাও না কোথাও ঐ ইতিহাসের বিষাদস্মৃতির চিহ্ন থেকে যাওয়া উচিত। কিন্তু আছে কি?

সাহিত্যের অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে নেই। হরপ্পার পরে প্রাচীন ভারতের মধ্যেই যে কোনো বড় মাপের উত্থান-পতন হয়ে থাকতে পারে সংস্কৃত সাহিত্যের গবেষকরা দূরে থাক কোসম্বির আগে কোনো সাধারণ ঐতিহাসিকও তা কল্পনা করেননি। কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ বা বাম-রাবণের যুদ্ধে যে হস্তিনাপুর আর লঙ্কার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছিল এ বিশ্বাস অনেক উচ্চশিক্ষিত মানুষের মনেও গভীরভাবে প্রোথিত। কিন্তু ঐতিহাসিক যুগে যে এরকম ঘটনা ঘটে যেতে পারে এবং তার ছাপ সংস্কৃত সাহিত্যে থাকতে পারে কোসম্বির পূর্ববর্তী এবং অধিকাংশ পরবর্তী বুদ্ধিজীবীর এ জাতীয় কোনো চিন্তার কথা আমার জানা নেই। গিবন থেকে গর্ডন চাইল্ড অবধি এবং তার পরেও যাঁরা পশ্চিমের প্রাচীন ইতিহাস লেখায় হাত দিয়েছেন কেউই উত্থান ও পতনের সত্যকে এড়িয়ে যাননি। অধিকাংশ ভারতীয় বুদ্ধিজীবী তথা ঐতিহাসিকের ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীতটাই দেখা যায়। এরই ফলে সাহিত্যে যে উত্থান-পতনের স্মৃতি থাকতে পারে এ চিন্তাও আসেনি। বরং অবক্ষয়ের যে ধারণা গত পাঁচ দশকে কেউ কেউ স্বীকার করেছেন তার বিরুদ্ধে মত প্রকাশিত হয়েছে (সরকার ১৯৮২: ৪৫-৫৯)। এ বিষয়ে কিছু আলোচনা নীচে আছে।

সংস্কৃত সাহিত্যের মূল্যায়নের প্রশ্নে ভারতের ওপর পশ্চিমী লেখকদের সম্বন্ধেও প্রায় একই কথা খাটে। সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহাসিক আর্থার বেরীডেল কীথের কাছে (১৯২৮, ১৬.২) সংস্কৃত সাহিত্যে

হারানো সভ্যতার স্মৃতির এই অভাব পশ্চিমের প্রাচীন সাহিত্যের তুলনায় লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য বলে ধরা পড়েছে।

"মোহমুক্ত আলেকজান্দ্রিয়ানদের তুলনায় অথবা আউগুস্তের পরবর্তী একটু যেন বিষাদগ্রস্ত কবিদের তুলনায় প্রাচীন ভারতীয় কবিদের জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী বেশ সুখের। এঁদের জগৎ ছিল সরল; রাজনৈতিক সমস্যায় বিচলিত হওয়ার প্রয়োজন এঁদের ছিল না। হারানো কোনো স্বাধীনতার স্মৃতিও এঁদের উৎপীড়িত করত না। যে সামাজিক ব্যবস্থার অংশভাক্ তাঁরা ছিলেন, জীবনের যে ছকে তাঁরা বিশ্বাস করতেন তা ভার্জিলের অনাগত পৃথিবীর স্বপ্নের মতো চমৎকাবিতা সৃষ্টিতে অক্ষম ছিল, তবে এপিকিউরিয়াসের সুখবাদ বা স্টইকবাদের চেয়ে বৈচিত্র্যময় কিছু দান করেছে।"

কীথের এই লেখা এত কাঁচা হাতের যে সমালোচনাব যোগ্য মনে হয় না। শেষ পংক্তিগুলিতে কাব্য এবং দর্শনের পার্থক্য করতে পারেননি। মুদ্রারাক্ষস এবং রিস ডেভিডসের বৌদ্ধ ভারত নিশ্চয়ই তাঁর পড়া ছিল। তা সত্ত্বেও তিনি হেগেল ও মার্ক্স থেকে চিন্তা ধার করে 'এঁদের জগৎ ছিল সরল' ইত্যাদি কথা বলেছেন। সর্বোপরি কীথ ভর্তৃহরি ও শিলহণ মিশ্রের কথা ভুলে গিয়ে 'হারানো কোনো স্বাধীনতার স্মৃতি' ইত্যাদি কথা বলেছেন। ভর্তৃহবির নীচেব শ্লোকগুলি কীথেব বক্তব্যকে নাকচ করে দেয়।

'সেই সুন্দর নগরী, মহান সেই রাজা, সেই সামন্তবর্গ, তার পাশে সেই বিদ্বৎমণ্ডলী, আর সেই চন্দ্রমুখীর দল, মদমত্ত সেই রাজকুমার বর্গ, সেই বন্দীরা, সেই কাহিনীগুলি— সবই যার মহিমায় স্মৃতিপথে চলে গিয়েছে সেই মহাকালকে নমস্কাব।' (শতকত্রয় ১৬৯)

বিষাদে মাখা শ্লোকটির মধ্যে এক হাবানো সভ্যতার স্মৃতি রয়েছে যাকে নস্টালজিয়া আখ্যা দিতে দ্বিধা হয় না। ক্ষুব্ধ কবির হারানো স্বাধীনতার স্মৃতি না থাকলেও— আধুনিক দৃষ্টিতে খুঁজতে গেলে প্রাচীন রোমেও স্বাধীনতার হদিশ মিলবে না— হারানো সম্মানের স্মৃতি খুবই আছে।

যাদের কাছে সম্মান হারিয়েছেন তাদের কথা প্রথমে বলেছেন

'প্রাচীনকালে বিপুলহৃদয়, ধন্য কেউ কেউ জগতেব জন্ম দিয়েছেন, অন্যেরা পালন করেছেন, তৃণের মতো বিজয় করে অন্যেরা দান করেছেন। এই জগতে অন্য বীরেবা চতুর্দশ ভুবন ভোগ করছেন। তাহলে কটা পুরেব আধিপত্য পেয়ে লোকগুলোর এই খেপে ওঠা কেন?' (শতক ১৬২)

'তুমি রাজা, আমাদেরও পূজিত গুরুর কাছে পাওয়া জ্ঞানের কারণে সম্মান বোধ আছে। তুমি ধনসম্পদের জন্য খ্যাত, আর আমাদের খ্যাতি দিকে দিকে কবিরা ছড়িয়ে দেন।' (শতক. ১৬৩)

বক্তব্য পরিষ্কার। হারিয়ে যাওয়া রমণীয় নগরীতে প্রতাপশালী সম্রাটরা একদিন কবিদের সম্মান জানিয়েছেন। গ্রাম্য ছোট রাজাদের যুগে সেই সম্মান নেই। কবির নিজের বচনার স্থান সম্ভবতঃ প্রথম সহস্রকের তৃতীয় চতুষ্কের আর্যাবর্ত যেখানে একপুরুষের রাজারা ধূমকেতুর মতো উঠছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে। পূর্বে পালেদের মতো অথবা দক্ষিণে চালুক্য, পল্লব বা গঙ্গদের মতো 'অন্য বীরেরা' হয়ত তখনো 'চতুর্দশ ভুবন ভোগ করছেন'। তাঁর স্মৃতিতে রয়েছে কুরু বা পাঞ্চাল শাসিত হস্তিনাপুর অথবা সাতবাহন শাসনের অন্ধ্র ও প্রতিষ্ঠান (শেষ ৩য় শতক)। গুপ্ত শাসনের কৌশাম্বী বা পাটলিপুত্র (শেষ ষষ্ঠ শতক), হয়ত বা ক্ষীণ হয়ে যাওয়ার আগে উজ্জয়িনী, বারাণসী বা মাহিষ্মতীও থাকতে পারে। কীথ কি এগুলো পড়েননি?

§১৬. পরবর্তী সাহিত্যে হস্তিনাপুর ও অন্যান্য নগর (২) : কালিদাস, ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ

ভর্তৃহরি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উদারতাবাদী স্রোতের মধ্যেই পড়েন। শক্তিশালী আর একটি স্রোতও ছিল এবং তা অন্যরকম ছিল।

অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলাকে নিয়ে হস্তিনাপুরে দুষ্যন্তের সভার আগত শাঙ্গরব সঙ্গী শারদ্বতকে নগর সম্বন্ধে বলেছেন— *মহান রাজা নিশ্চয়ই স্থির শাসক, নীচরাও কেউ বর্ণ নিয়ম ভঙ্গ করছে না। তবু নির্জনতায় অভ্যস্ত আমার মন। তাই এই জনাকীর্ণ জায়গাকে আগুনে ঘেরা বাড়ির মতন মনে হচ্ছে। শারদ্বত সম্মতি জানান— স্নান করে তেলমাখা মানুষকে দেখে, শুচির অশুচিকে, জাগ্রতের সুপ্তকে, মুক্তের বন্ধকে দেখে যেমন লাগে সেই চোখে সুখে আসক্ত এখানকার মানুষদের দেখছি।*

কালিদাসের কাল চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দী ধরা হয়। তা সত্যি হলে তিনি জীবন্ত হস্তিনাপুরকে দেখেননি। কালিদাস নিজে অতি পরিশীলিত ছিলেন। বোঝা যায় যে তিনি নগরজীবনে অভ্যস্ত ছিলেন এবং এই জীবনকে ভালবাসতেন। উক্তিটিতে হস্তিনাপুরকে তিনি কোনো কটাক্ষ করেননি, নগরজীবন সম্বন্ধে তৎকালীন ব্রাহ্মণদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীটি যথাসম্ভব মার্জিত রূপে তুলে ধরেছেন।

যাঁরা ধর্মীয় নীতিগুলি রচনা করেছিলেন তাঁরা বা পুরাণকাররা অবশ্য আমাদের আলোচ্য কাল সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সমালোচনার কঠোরতায় কোনো কার্পণ্য করেননি। তাঁদের পরম ধিক্কার এবং বিদ্রূপ থেকে বোঝা যায় যে যার আলোচনা এতক্ষণ করা হলো— ভারতবর্ষে লৌহযুগের প্রথম হাজার বছর ধরে পণ্যোৎপাদন ও বাণিজ্য সহ হস্তিনাপুরের মতো অনেক নগর ও নগরজীবনের বিস্তার— তা উদীয়মান গ্রামকেন্দ্রিক মধ্যযুগীয় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পরিপন্থী ছিল। এই ব্যাপারে বৌদ্ধদের সঙ্গে ধর্মসূত্র ও পুরাণের তফাৎ খুব স্পষ্ট।

"কৌশিকসূত্রে (১৪১ ৩৯) এবং বসিষ্ঠধর্মসূত্রে (১৩ ১১) নগবে বেদপাঠ নিষেধ করা হয়েছে। নগরজীবনকে ধিক্কার দিয়ে বৌধায়ন (ধর্মসূত্র ২.৩.৬.৩৩) মন্তব্য করেছেন যে নগরে বাস করলে সংযত-ইন্দ্রিয় ধার্মিক পুরুষও মুক্তি পেতে পারবেন না। কারণ তাঁর সারা দেহ কলুষিত হয়ে যাবে এবং চোখ ও মুখ নগরের ধুলোয় ভরে যাবে।... ... আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে (১.১১.৩২.২১) স্নাতকদের বারবার নগর গমন নিষেধ করা হয়েছে।" (রামগোপাল ১৯৫৯:১৫০)।

শহরের প্রতি এই বিদ্বেষ বৈদিক সংস্কৃতিব বিশ্বজনীন বৈশিষ্ট্য নয়। ঋগবেদে পুরন্দর ইন্দ্রের পুর ধ্বংস করার কথা আছে। ঐ কাহিনী হয়ত হরপ্পীয় নগর ধ্বংসের স্মৃতি বহন করছে। সেখানে পুব মানে দুর্গ বা শহর। অনেক পরবর্তী গ্রন্থ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (১.২৩) বা পুরাণে ত্রিপুবধ্বংসেব কাহিনীতে উক্ত কাহিনীর ছাপ থাকতে পারে। কিন্তু তাতে নগরজীবনের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ পায়নি। অথর্ববেদে রহস্যবাদ অবতারণা করে (শৌ. ১০.২.২৮-৩১) বিশ্বভুবনকে ব্রহ্মের পুর ও দেহকে দেবগণের 'অযোধ্যা (=অপরাজেয়) পুর' বলা হয়েছে। ঐ বেদেই (৫.২৮.১০.১১) আকাশ, অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীকে দেবতাদের তিনটি পুর বলা হয়েছে। হস্তিনাপুরের মতো বসতিকে লক্ষ্য করে ঐ উক্তি কিনা তা বলা শক্ত। বেদে গ্রাম মানে বসতি। ঋগবেদে (১০.১৪৬.১) তার সঙ্গে অরণ্যের তফাৎ করা হয়েছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭.১৫) রাজা হরিশ্চন্দ্রের নিবাসকেও গ্রাম বলা হয়েছে। নগরগুলির সূত্রপাত এই সময়ে হয়ে যাওয়া উচিত। তার সঙ্গে গ্রামের তফাৎ তখনো তেমন চোখে পড়ার মতো হয়নি অনুমান করতে হয় (ওপরে §৩)। চোখে পড়ার মতো হওয়ার পরেও খ্রি.পূ. দ্বিতীয় শতকের মাঝামাঝি পাটলিপুত্রে পতঞ্জলি (পা. ৭.৩.১৪) নগরজীবনের প্রতি বিদ্বেষ দেখাননি, বরং কোনো কোনো জায়গায় গ্রাম এবং নগরের সাদৃশ্য দেখিয়ে বলেছেন, "সুতরাং গ্রামও যা নগরও তাই।" এজন্য গৃহ্যসূত্র বা ধর্মসূত্রের নগরবিদ্বেষকে নতুন দৃষ্টির পরিচয় বলে মানতে হয়।

মজা এই যে ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রগুলো হস্তিনাপুর থেকে খুব দূরে বসে রচিত হয়নি বলে অনুমান করা হয়। মনুসংহিতায় মৎস্য, শূরসেন, কুরু, পাঞ্চাল ইত্যাদি নিয়ে যে আর্যাবর্ত তাকে জগতের সবচেয়ে উচ্চ সংস্কৃতি সম্পন্ন স্থান বলা হয়েছে। অনুমান করা যায় মনুসংহিতা এই অঞ্চলেই রচিত

হয়। বৌধায়ন ধর্মসূত্রও এখানেই রচিত অনুমান করা চলে। রচনা অবশ্য গ্রামে হয়, হস্তিনাপুরে নয়। হস্তিনাপুর এবং ঐ গ্রামগুলির এক শক্তিশালী অংশ আপাততঃ একই সমাজে বর্তমান থাকলেও মনে হয় যেন তারা সাংগঠনিকভাবে এই সমাজশরীরের অঙ্গ ছিল না। অঙ্গ হলেও পরস্পর প্রতিকূল ছিল। অর্থাৎ আলোচ্য যুগেই হস্তিনাপুরের কাছেই এমন এক সংস্কৃতির ভিত্তি রচনা হচ্ছিল যা হস্তিনাপুরের অস্তিত্বের বিরোধী। নতুন গ্রামীণ সংস্কৃতি এত দিনের নগর সংস্কৃতির বিরোধী হয়ে উদিত হচ্ছিল।

পুরাণেরও একই দৃষ্টিভঙ্গী। মৎস্যপুরাণে একটি প্রাচীন কাহিনীর অভিনব পরিণাম থেকে আদি-মধ্যযুগের উক্ত দৃষ্টিভঙ্গীটি স্পষ্ট হবে। অথর্ববেদের একটি কাহিনী অনুসারে রাজা পৃথু বিরাট অর্থাৎ অবিকৃত প্রকৃতিকে দোহন করে সমস্ত প্রাণীর জীবিকার ব্যবস্থা করেন। এই কাহিনীটি নানা পুরাণেও পাওয়া যায়। পুরাণগুলির মধ্যে বায়ুপুরাণ একটু প্রাচীন, এতে মূল কাহিনীর সুরটি ধরা আছে। এখানে (৬২.১৭১) বলা হয়েছে, 'আগে পৃথিবীতল পাহাড়ে উঁচুনিচু ছিল, গ্রাম-শহর ছিল না, শস্য, গোরক্ষা, কৃষি বা বণিকপথ ছিল না। ..প্রজারা ফলমূল খেয়ে কষ্টেই থাকত। পৃথুর সময়ে কৃষি, গোপালন প্রভৃতি প্রবর্তিত হয়েছে।' মৎস্যপুরাণের (১০ম অধ্যায়) বর্ণনা একেবারে অন্যরকম। 'পৃথু লোকহিতার্থে ধনুষ্কোটি দিয়ে পাহাড় সরিয়ে পৃথিবীতল সমান করেছিলেন।' এই অবধি বর্ণনা ঠিকই হচ্ছে। তারপর বলা হচ্ছে 'তাঁর রাজত্বকালে গ্রাম, শহর, দুর্গ ছিল না, অস্ত্রধারী লোক ছিল না, ক্ষয় হেতু মানুষের কষ্ট ছিল না, অর্থশাস্ত্রের আদর ছিল না, লোকে ধর্মপরায়ণ হয়েই থাকত।' অশোকের সংস্কারের পর অর্থশাস্ত্রের অনাদর খুবই ঐতিহাসিক এবং সত্য। ধর্মপরায়ণতার প্রশংসায়ও পরোক্ষভাবে অশোকের নীতির বিজয়ই ঘোষিত হচ্ছে। কিন্তু গ্রাম, শহর, দুর্গলোপের সপ্রশংস উক্তির মধ্যে অচরিষ্ণুতা ও সভ্যতার গুটিয়ে যাওয়ার পদধ্বনি আছে। এই গুটিয়ে যাওয়াটা নগরের প্রাধান্যকে খর্ব করার যে ক্ষমতা ধরত সেই স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সমাজের সর্বব্যাপী প্রভাব বিস্তারের পবোক্ষ এবং অমোঘ ফল।

মৎসপুরাণের উক্তিটি কোনো আকস্মিক ব্যতিক্রম নয়। অন্যসব ধর্মের মতো ধর্মশাস্ত্রেও বরাবরই অভিচার (বাণ মারা) কর্মের নিন্দা করা হয়েছে। এই বিরুদ্ধতা ঋগবেদের ঐতিহ্য। সভ্য সমাজে এটা খুবই স্বাভাবিক এবং ধার্মিক প্রবৃত্তি। কিন্তু মনুসংহিতা (১১.৬২) এবং অন্য ধর্মশাস্ত্রগুলিতে অভিচারের মতো অনুষ্ঠানের নিন্দার সঙ্গে আরো কিছু কাজের একই রকম নিন্দা করা হয়েছে। যেমন আকরে কাজ, মহাযন্ত্র প্রবর্তন এবং ওষধীর হিংসা বারণ করা হয়েছে। টীকাকারদের ব্যাখ্যা অনুসারে মহাযন্ত্র প্রবর্তন মানে সেতুবন্ধ প্রভৃতির নির্মাণ। খনির কাজ, বাঁধ ও সেতুর কাজ এবং ওষুধের জন্য গাছ-গাছড়া সংগ্রহের কাজ বন্ধ হলে অর্থনীতির ওপর কি প্রভাব পড়তে পারে তা সহজেই অনুমেয়। কৌটিল্য থেকে ধর্মশাস্ত্রগুলি কতটা সরে এসেছিল তাও বোঝা যায়।

পুরাণে এই যুগের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা ঐ নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর অনুকূল। এই বর্ণনা থেকে হস্তিনাপুরের মতো নগরের অভ্যুদয় সমাজকে কতখানি নাড়া দিয়েছিল তা অনুমান করা যায়। নগর সভ্যতা উদয়ের যে নিন্দা করা হয়েছে তার পৌরাণিক নাম কলিযুগবর্ণন। এই বর্ণনার লক্ষ্য যে আমাদের আলোচ্য যুগ এই ব্যাপার পণ্ডিত মহলের চোখেও পড়েছে। প্রয়াত পুরাণ বিশেষজ্ঞ রাজেন্দ্র চন্দ্র হাজরা পুরাণে আলোচ্য কালের নিন্দার সংকলন এবং ইংরেজি (১৯৪০: ২০৭-২১০) অনুবাদও প্রকাশ করেন। হাজরা বলেছেন,

"এই বর্ণন নিঃসন্দেহে জৈনধর্ম এবং মৌর্য অশোকের পর শক্তিশালী হয়ে ওঠা বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক বিস্তারের নির্দেশ করে।... ...

"লোকেরা প্রায়ই জাতিধর্মের নিয়মগুলি মানতে এবং ঋক-, সাম- ও যজুর্বেদের নির্দেশ অনুসারে কর্তব্য পালন করতে চাইত না। তাদের মন ভরে থাকত অর্থের চিন্তায় এবং তা অর্জনে তারা অসদুপায়

অবলম্বনে ইতস্ততঃ করত না। দ্বিজরা বেদপাঠ ও যজ্ঞকর্ম ছেড়ে দিয়েছিল, এগুলি ছিল বোকাদের কাজ। তারা শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে নিজ ধর্ম ছেড়ে পরিব্রাজক ভিক্ষুক হয়ে জনপ্রিয় গান গেয়ে দেবতাদের স্তুতি করত, কিন্তু পরব্রহ্মের লাভ হতোনা।... ... অবৈদিক গ্রন্থের প্রামাণ্যে তারা বহুবিধ কাজ করত, নিজ কর্তব্যের সব আকর্ষণ হারিয়েছিল, আচরণ বিধি মানত না, বেদবিরোধীদের সঙ্গে মিশত এবং পেশাগত ভিক্ষুক হয়ে যেত। তারা তাদের খারাপ উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কুশিক্ষা, কুপ্রথা ও অসৎ উপার্জন দিয়ে লোকজনকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল।... ... সব শ্রেণীর মানুষই নিজেদের ব্রাহ্মণদের সমান মনে করত এবং তাদের প্রাধান্য অস্বীকার করত। উপবাস, ব্রতপালন এবং দান সম্বন্ধে তারা ব্রাহ্মণদের নির্দেশ মানত না, তাদের নিজেদের অযৌক্তিক চিন্তার দ্বারা চালিত হতো। বৈশ্যরা ব্যবসা ও কৃষি পরিত্যাগ করে দাস্যবৃত্তি বা শিল্পকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করত। এর ফলে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা লুপ্ত হয়ে গেল ও শূদ্রদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলো। পুরাণের আরো বক্তব্য কলিযুগে অধিকাংশ রাজাই ছিলেন শূদ্র। শূদ্রদের এই রাজনৈতিক প্রাধান্যের আঁচ উচ্চবর্ণের গায়ে লাগত। পুরাণে শূদ্রদের উঁচু স্থানের বর্ণনা কৌতূহল উদ্দীপক। কূর্ম পুরাণে আছে : 'নির্বোধ (শূদ্র) জনেরা ব্রাহ্মণদের আসনে বসা দেখলে উঠিয়ে দেয়। শূদ্র রাজপুরুষরা তাদের প্রহার করে। যে ব্রাহ্মণরা তেমন বেদপাঠ করেনি বা ভাগ্যবান ও ক্ষমতাশালী নয় তারা শূদ্রদের ফুল, সজ্জা এবং মাঙ্গলিক দিয়ে সম্মান করে। এরকম সম্মান পেয়েও শূদ্ররা ব্রাহ্মণদের দিকে তাকিয়েও দেখে না। ব্রাহ্মণরা ভয়ে শূদ্রদের বাড়িতে ঢোকে না, সম্মান জানানোর সুযোগের অপেক্ষায় দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। যে ব্রাহ্মণরা জীবিকার জন্য শূদ্রদের ওপর নির্ভর করে, তারা যানে আসীন শূদ্রদের স্তুতি ও সম্মান করার জন্য ঘিরে থাকে এবং তাদের বেদশিক্ষা দেয়। শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরাও এইভাবে তপস্যা ও যজ্ঞের ফল বিক্রয় করে বেদবচনের বিরোধী কাজ করে।...

"নারীরা তাদের হতভাগ্য স্বামীদের পরিত্যাগ ধরে ধনীদের কাছে যেত, তারা ভোগাসক্ত এবং নৈতিকতা বিষয়ে শিথিল হয়ে পড়েছিল ও তাদের স্বামীদের অমান্য করত। তারা হতো স্বার্থপর, অশুচি এবং মিথ্যাবাদী। তারা খারাপ ছিল এবং সর্বদা খারাপদের সঙ্গে মিলন কামনা করত। চুরি, ডাকাতি ও ছিনতাই ভীষণ বেড়ে যাওয়া মানুষের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা চলে গিয়েছিল। সর্বদা শিশু, নারী ও বীর হত্যা, গোবধ, গর্ভপাত, ঠগবাজি, রোগ ও ক্ষয়ক্ষতি আতঙ্কময় অবস্থা সৃষ্টি করেছিল।

"কলিযুগের কষ্টের এই ম্লান ছবিই পুরাণগুলি তুলে ধরে। স্পষ্টতই কিছু অতিরঞ্জন আছে, কিন্তু অশোক মৌর্যের সময় থেকে বৌদ্ধধর্মের প্রভাবশালী হওয়া, শূদ্রদের রাজা ও সম্ভবতঃ উচ্চ রাজপুরুষ হওয়া এবং শক, পহ্লব, আভীর প্রভৃতি নীতিবর্জিত যাযাবরদের বসতি স্থাপনের ফলে সামাজিক কাঠামো যে ভেঙে পড়েছিল তার বাস্তব বর্ণনাই পাওয়া যাচ্ছে।"

হাজরা বৌদ্ধধর্মের প্রসারকে ও বিদেশীদের বসতি স্থাপনকেই সামাজিক কাঠামো ভেঙে পড়ার কারণ হিসাবে দেখেছেন। কিন্তু তাঁর বর্ণনার পরবর্তী (নীচে) অংশ থেকে বোঝা যায় যে বৌদ্ধধর্ম এখানে উপলক্ষ্য মাত্র ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে নগর জীবনের প্রসার ও বিস্তারের ফলে চলাচল, মানুষে মানুষে বিনিময় ও সংযোগের যে বৃদ্ধি হয়েছিল সেটাই জাতিব্যবস্থার ভিত্তি টলিয়ে দিয়েছিল।

"জাতকে যে হিন্দু সমাজের ছবি উপস্থাপিত হয়েছে তা নানাভাবে পুরাণের বর্ণনার সঙ্গে মেলে। জাতক পড়লে আমাদের মনে হতে পারে 'ভারতের সেই জগৎ এমনই ছিল যেখানে প্রাচীন পুরোহিত শ্রেণী তার প্রাধান্য হারিয়েছিল, বণিক আর অভিজাতরা বেশি সম্মান পেত।' (Cambridge History of India, I: 221) এবং লোকেরা, এমন কি ব্রাহ্মণরা পর্যন্ত, প্রায়ই বর্ণাশ্রম ধর্মের নিয়ম লঙ্ঘন করত। ব্রাহ্মণদের প্রায়ই ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশবিরোধী জীবিকা অবলম্বন করতে দেখা যেত। যেমন

জীবিকার জন্য তারা পণ্যসার্থের প্রহরা, চাষ, রাখালি, ঘুরে ঘুরে পণ্যবিক্রি, কাঠের কাজ, সাপ খেলানো, শিকার, শকটচালনা, গাড়ি মেরামত করা, ধনুর্বাণ বা বোনার কাজ নিত। সমাজ এতে কোনো দোষও দেখত না। কখনো কখনো তারা রোজগারের জন্য গ্রহ বিচার, হস্তরেখা বিচার, জাদুবিদ্যা ইত্যাদিতে দক্ষতা অর্জন করত বা দক্ষতার ভাণ করত। রাজপুরুষ রূপে নিযুক্ত ব্রাহ্মণদের কখনো কখনো টাকার জন্য অন্যায় আচরণ করতে দেখা যেত। জাতকে দেখা যায় যে ক্ষত্রিয় এবং মধ্যবর্তী শ্রেণীগুলিরও বংশগত পেশা অবলম্বন বাধ্যতামূলক ছিল না এবং পেশা বদলানো সাধারণ ঘটনা ছিল।"

এই বর্ণনা থেকে জাতিগত পেশার ব্যবস্থায় বড় আঘাত এসেছিল বোঝা যায়। পণ্যোৎপাদনের দ্রুত বৃদ্ধির সাথে যে সমাজ স্বয়ংক্রিয়ভাবে এগিয়ে চলে তার বুকে জাতিব্যবস্থা গভীর শেকড় গড়তে পারে না। কৌটিল্যের রাষ্ট্রনীতিতে বৈদিক যুগেই শুরু হওয়া এক প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায় মাত্র দেখা যায়। উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলাল স্তরেই হস্তিনাপুরের কুরুরাষ্ট্র সহ বৎস, কোশল, অবন্তী, কাশী ইত্যাদি প্রত্যেকটি মগধ-পূর্ববর্তী রাজতন্ত্রের, তারপর সবাইকে গ্রাস করে নিয়ে দ্রুত একা সারা ভারতে অধিকার স্থাপনের লক্ষ্যে অগ্রসর মগধরাষ্ট্রের কৃষি-উদ্যোগ ও রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের ধাক্কায় দুটি প্রাচীন ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল— বৈদিক সংরক্ষণশীলতা এবং বিগণীকরণ প্রক্রিয়ার ঘূর্ণাবর্তে আর্যীকরণের নানা স্তরে মূলস্রোতে এসে পড়া ট্রাইবগুলির সংরক্ষণশীলতা। এর মধ্যে ট্রাইবগুলির ভেঙে পড়ার খবর পাওয়া যায় বৌদ্ধশাস্ত্র ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে। তাদের সর্বনাশের দিনগুলিতে উত্তর বিহারে বৌদ্ধ, জৈন, আজীবক ইত্যাদি অনেকগুলি ধর্ম জন্ম নেয়। এর পরবর্তী স্তরে জাতিবাদ দুর্বল হয়ে যাওয়ার প্রমাণ মেলে পুরাণ আর জাতকের বর্ণনা থেকে। হস্তিনাপুরের চিত্রিত ধূসর কৌলালের আদি স্তর থেকে খ্রি. পূ. দ্বিতীয় শতাব্দী পর্যন্ত নগর জীবনের ক্রমাগত উন্নতির সঙ্গে সাত-আটশ বছরে উত্তর ভারতে এই সার্বিক পরিবর্তন আসে। অনুমান করা যেতে পারে যে এই জন্যই ব্রাহ্মণদের প্রভাবশালী অংশ নবোদিত এই নগর সভ্যতার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পুরো সফল হয়নি। শার্ঙ্গরব-শারদ্বতের উক্তিগুলি সেই বিরূপ ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিভঙ্গীটির পরিচয় বহন করে।

এই দৃষ্টিভঙ্গীকে নতুন বলে মানতে হয়। কারণ দৃষ্টিটি শুধু রক্ষণশীল নয় অচরিষ্ণুও বটে। রক্ষণশীলতা থাকলেও বৈদিক যুগের শুরু থেকে অশোকের ধর্ম সংস্কার পর্যন্ত ভারতীয় সংস্কৃতির মূল স্রোতে কখনোই অচরিষ্ণুতার ছাপ দেখা যায়নি। চারটি বৈদিক সংহিতার কোথাওই জগত থেকে গুটিয়ে নেওয়ার মতবাদ চোখে পড়ে না। তার শত নিষ্ঠুরতা সত্ত্বেও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের সমাজকে অচরিষ্ণুতার দোষে দোষী করা যায় না। কৌটিল্য বিধবাবিবাহ অনুমোদন করেছেন। অর্থশাস্ত্রে পরবর্তী কালের অস্পৃশ্যতার পরিচয় তো নেইই, কাস্টের স্থানও লক্ষণীয় ভাবে গৌণ। কৌটিল্য ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করতেন না। শুধু তাই নয় পরম বিদ্রূপ ভরে তিনি (৯.৪=১৪২) বলেছেন, "নক্ষত্র নিয়ে যে বেশি বিচার করে সেই বোকাব উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয় না। লক্ষ্যটাই লক্ষ্যের নক্ষত্র, তারাগুলো আবার কি করতে পারে?" কৌটিল্যের রাষ্ট্র সহ উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলাল স্তরের সব রাষ্ট্রেরই লক্ষ্য টাকা— আরো আবাদি, আরো খাজনা। কোনো এক স্তরে লক্ষ্যটাব সঙ্গে যোগ হলো পণ্য উৎপাদন, বাণিজ্য, লাভ। এর কোনো বাধা কৌটিল্য মানতেন না। এমনকি কুসংস্কার যখন এর বাধা হয়েছে কৌটিল্য তাকেও খারিজ করে দিয়েছেন। একই গতিতে হয়েছে সভ্যতার কেন্দ্রের মগধাভিমুখী প্রসার যা অবিরাম যুদ্ধ ছাড়া সম্ভবই ছিল না। ফলে রাষ্ট্রের প্রসারের সঙ্গে বৈদিক যজ্ঞও খুব বেড়েও গিয়েছিল, জটিলও হয়ে পড়েছিল— যুদ্ধের যজ্ঞ রাজসূয় ও অশ্বমেধ। যজ্ঞকর্মের বৃদ্ধির সাক্ষ্য রয়ে গিয়েছে ব্রাহ্মণ সাহিত্যে এবং কৌশাম্বীর উৎখননে। অশোকের সংস্কারের ফলে আবাদির জন্য যুদ্ধের

এতকালের নীতির অবসান ঘটল। উদ্যোগ-সমৃদ্ধিতে রাষ্ট্রের মুখ্য ভূমিকাটি রইল না, কিন্তু এতদিনের খাটানো ও সঞ্চিত উদ্বৃত্তের বলে পণ্যোৎপাদন ও বাণিজ্য বিস্তার বেড়েই গেল। কেউ কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলো। কারণ যে ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় খুব কাছাকাছি থেকে সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করত— ক্রমাগত যুদ্ধ আর যজ্ঞ— তার গুরুত্ব কমে যাওয়ার সঙ্গে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শ্রেণীর প্রাধান্য নষ্ট হয়ে গেল। অচরিষ্ণু দৃষ্টিভঙ্গির জন্মে এর বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার ছাপ আছে।

শার্ঙ্গরবের উক্তি, পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্রের বিকাশ থেকে যা অনুমান করা যায়, জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সেই পুনঃ প্রতিষ্ঠার কথা সকলেরই জানা। কিন্তু এই নতুন প্রতিষ্ঠার রূপ বেশ ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। হস্তিনাপুরের আবার জাগতে না পারার প্রসঙ্গে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আরো একটু আলোচনা দরকার। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কয়েক জাতীয় শাস্ত্র হস্তিনাপুরের জীবৎকালে রচিত। ব্রাহ্মণ ও শ্রৌতসূত্র নামে পরিচিত গ্রন্থগুলি বৈদিকযুগের শেষভাগে যুদ্ধ ও যজ্ঞের অতিবৃদ্ধির সঙ্গে আসে। গ্রামে গ্রামে গৃহপতিদের বর্ধমান প্রভাব ও যজ্ঞকর্মের গুরুত্ব কমে যাওয়ার সূচনা পাওয়া যায় গৃহ্যসূত্র সাহিত্যের আবির্ভাবে। পণ্ডিতদের মতে খ্রি. পূ. তৃতীয়, দ্বিতীয় শতকে অর্থাৎ হস্তিনাপুরের চতুর্থ স্তরের গোড়ার দিকে এই সাহিত্যের শুরু হয়। তারও পরে ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রের শুরু। ধর্মসূত্রে নগরজীবনের নিন্দার নিদর্শন ওপরে দেওয়া হয়েছে। ধর্মশাস্ত্রের যুগে অস্পৃশ্যতা ব্যাপক আকার নেয়। অস্পৃশ্যতা আগেও ছিল না তা নয়। চণ্ডাল নামটি পাণিনির ব্যাকরণে (খ্রি. পূ. ৪০০?) আসেনি কিন্তু তাঁর পরবর্তী বৈয়াকরণ কাত্যায়নের (খ্রি. পূ. ৩০০-২০০?) বার্তিকে (৫.৪.৩৬) এবং কয়েকটি গৃহ্যসূত্রে এসেছে। সমাজে পূর্ণ স্বীকৃত শূদ্রদের পাণিনি (২.৪.১০) অনিরবসিত বলেছেন। কৌটিল্য শূদ্রদের আর্য বলেই স্বীকার করেছেন। কিন্তু মানুষ বা জন্তুর মৃতদেহ নিয়ে বৃত্তি সম্পন্ন দুটি জাতি আর্যত্বের মর্যাদা পায়নি। খ্রি. পূ ১৬০ অব্দ নাগাদ পাটলিপুত্রে বসে পাণিনি-কাত্যায়নের ভাষ্যকার বৈয়াকরণ পতঞ্জলি (২.৪.১০) চণ্ডাল এবং মৃতপদের অস্পৃশ্য বিবেচনা করেছেন, কিন্তু এদের বড় 'আর্যনিবাসের' 'অভ্যন্তরে' বাস করার কথাও বলেছেন। এর থেকে বৃত্তিভিত্তিক এবং মৃতদেহ নিয়ে প্রচলিত কুসংস্কারের ফল এই অস্পৃশ্যতা খ্রি. পূ. দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত পরবর্তী কালের ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেনি বোঝা যায়। বিগণীকরণের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক বার করা যায় না। কিন্তু পরবর্তী কালের বিশেষতঃ দক্ষিণের অস্পৃশ্যতা কুসংস্কারের ফল নয়। অস্পৃশ্য জাতিগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা রচনা করা হলেও এই অস্পৃশ্যতা যে বিগণীকরণের বাধা হিসাবে এসেছিল তা অনুমান করা যায়। দক্ষিণের সাবেকি জাতিব্যবস্থায় এক একটি জাতি এক একটি নিশ্ছিদ্র কক্ষ।

ক্ষিতিমোহন সেন (১৯৪০: ১০১-১০২) উত্তরে ও দক্ষিণে অস্পৃশ্যতার তীব্রতার ভেদ লক্ষ্য করে মন্তব্য করেছেন যে এই পার্থক্য আর্য অনার্য ভেদের জন্য হয়েছে, "অথবা প্রাচীন আর্যভূমিমেঁ যদি জাতিভেদ কম উগ্র হো তো ভী যহ সন্দেহ হো সকতা হৈ কি যহ প্রথা আর্যোঁকে লে আঈ হুঈ নহী হৈ। ইন্হোঁনে যহাঁ আকর স্বীকার কিয়া হৈ।... পংজাব আদি আর্য-প্রধান প্রদেশোঁমেঁ ঐসী তীব্রতা নহী হৈ। দাক্ষিণাত্যমেঁ জহাঁ অনার্য জাতিয়োঁ কী হী প্রধানতা হৈ, যহ ভেদ তীব্র হৈ।" উক্তির প্রথম অংশ সত্য হওয়াই সম্ভব। কিন্তু আর্য-অনার্য ভেদ দিয়ে দক্ষিণে অস্পৃশ্যতার বাহুল্যকে ব্যাখ্যা করতে গেলে অতিসরলীকরণ হয়ে যায়। ওপরে (§৪) আর্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে ক্যয়্পারের মত বলা হয়েছিল। আর্যরা এদেশে এসে দীর্ঘকাল পূর্ববাসীদের সঙ্গে থাকায় যে নতুন সংস্কৃতির জন্ম হয়েছিল ঋগবেদে তাই মেলে। (ক্যায়্পারের অনেক আগে এই চিন্তার প্রথম প্রবর্তক কোসম্বি ১৯৫০।) এখন, যদি কেবল 'অনার্য' প্রভাবেই অস্পৃশ্যতা এসে থাকে তাহলে তা আগেই ঋগবেদে বা উত্তরবৈদিক যুগে কেন এল না এর ব্যাখ্যা করা উচিত। কিন্তু এর কোনো ব্যাখ্যা

দেওয়া হয়নি। কষ্টকল্পিত আর্য-অনার্য ভেদ দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ব্যাপার ব্যাখ্যা করা খুব জনপ্রিয় পদ্ধতি হলেও একেবারেই অবৈজ্ঞানিক। সম্রাট অশোক অপবাহন করে আবাদি পত্তন ও খাসজমির দাস সংগ্রহের নীতি বর্জন করার পর এবং নগর জীবনের সবচেয়ে উন্নতির পর অস্পৃশ্যতা কেন বেড়ে গেল তার ব্যাখ্যা 'আর্য-অনার্য ভেদ' দিয়ে হয় না। রাষ্ট্রের উদ্যোগে বিগণীকরণের নীতি বর্জিত হওয়ার পর স্বাভাবিক স্বয়ংক্রিয় বিগণীকরণের প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছিল এটা স্বীকার করার প্রয়োজন আসে। তার প্রমাণ অস্পৃশ্যতার। ২০০ খ্রি. পূ. থেকে ২০০ অব্দ অবধি ধর্মশাস্ত্র রচনার যুগ ধরা যায়। ওপরে বলা হয়েছে যে ধর্মশাস্ত্রে আকরে কাজ, মহাযন্ত্র নির্মাণ এবং ওষধী সংগ্রহকে নিন্দিত কাজ বলা হয়েছে। তার ওপর অস্পৃশ্যতা ধর্মশাস্ত্রের যুগে চালু হয়ে গিয়েছে। অস্পৃশ্যতা বিগণীকরণের পথে বিরাট বাধা হয়ে আসবে এতে তো কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। অস্পৃশ্যতার মানে নতুন যে সব ট্রাইব লৌহ সভ্যতার সঙ্গে বিনিময়ের ফলে স্বরূপ স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রক্রিয়ায় গণ ভেঙে উন্নত কৃষিকর্মের প্রবৃত্ত হচ্ছে তারা সমাজের স্বীকৃতি পাচ্ছে না।

এর অনেক কুফল ফলতে বাধ্য। এই পরিবেশে আবাদির বৃদ্ধি কখনোই দ্রুত বা ব্যাপক হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, বিগণীকরণ সম্পূর্ণ হতে পারে না। অস্পৃশ্যতা সত্ত্বেও আকর্ষণে আসার ফল আর রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে অস্পৃশ্যতাবিহীন সমাজে আসার ফল এক হতে পারে না।

কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। অস্পৃশ্যতা উত্তরভারতেও ছড়িয়েছিল। এর ফলে আবহমান কাল প্রচলিত আর্যীকরণ প্রক্রিয়ায় যে ব্যাঘাতগুলি এসেছিল অনেক সময় তার চিহ্নগুলি রয়ে গিয়েছে। যে গোষ্ঠী কাছে আসছে তার উপাস্যকে স্বীকার করে নেওয়ার মাধ্যমে আর্যীকরণের এক প্রক্রিয়া ঋগবেদেই শুরু হয়ে অন্ত্য মধ্যযুগ পর্যন্ত ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য হিসেবে বজায় থেকেছে (ভট্টাচার্য ২০০১)। এর ফলে বহু বিগণীকৃত গোষ্ঠীর সংস্কৃতি এমন ভাবে ভারতীয় সমাজের অঙ্গীভূত হয়েছে যে তার দেবতাকে গোষ্ঠীর দেবতা বলে চেনার উপায় নেই। কৌটিল্যের অপবাহনে এই চালু প্রক্রিয়ারই এক অধার্মিক সহিংস রূপ দেখা যায়। চিরায়ত প্রক্রিয়াটির এক মধ্যযুগীন বিকৃতি অনেক সময়ে চোখে পড়ে। অনেক সময়ে দেখা গিয়েছে যে কোনো দেবতা বিশেষ অস্পৃশ্য জাতির দেবতা বলে লোকশ্রুতি আছে। কোথাও কোথাও ঐ জাতির মানুষদের ঐ দেবতার পরিচর্যায় বিশেষ অধিকারও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। মানুষগুলো কিন্তু সাধাবণ সমাজে স্বীকৃতি পায়নি। অস্পৃশ্যতার কারণেই এই মধ্যযুগীয় অর্ধসমাপ্ত বিগণীকরণ ও অর্ধ আর্যীকরণের উদ্ভব হয়েছিল।

আগেই দেখানো হয়েছে (§১০) যে কৌটিল্য আবাদি স্থাপনের সময় যন্ত্রপাতি, বীজ ইত্যাদি ধার দিয়ে নতুন বসানো চাষিকে সাহায্যের নির্দেশ দিয়েছেন। তার ফলেই উদীচ্য কৃষ্ণোজ্জ্বল কৌলাল যুগে দ্রুত কৃষির বিস্তার হয়েছিল। অস্পৃশ্যতা চালু হয়ে যাওয়ার পর এটা আর সম্ভবপর ছিল না। অর্ধসমাপ্ত বিগণীকরণের ফলে গ্রামগুলোর বৃহত্তম অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল অতি নিম্নমানের জীবনযাত্রা সম্পন্ন, নব্যপ্রস্তরীয় মানের চেয়ে একটু উন্নত, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং অচরিষ্ণু। এশিয়াটিক উৎপাদন পদ্ধতি বলতে কার্ল মার্কস যা বুঝিয়েছেন তা এই ভাবেই এসে ভারতবর্ষীয় মধ্যযুগকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আবার জেগে ওঠা যে হস্তিনাপুরের পক্ষে সম্ভব ছিল না সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

§১৭. অবক্ষয় সম্বন্ধে অন্য মত

এখানে যাকে অবক্ষয়ের যুগ বলা হয়েছে তাকে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক দীনেশ চন্দ্র সরকার অন্যভাবে দেখেছেন। ভারতের ইতিহাসের বিশেষতঃ অভিলেখ এবং সাহিত্যলব্ধ তথ্যাবলীর জ্ঞানে এই সর্বজন সম্মানিত ঐতিহাসিক অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি যা বলেছেন তার একটুও অতথ্য নয়। বরং তাঁর মত

পড়লে মনে হয় যে কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। যে গ্রন্থগুলিতে তিনি নতুন পর্যবেক্ষণ করে জমির মালিকানা, বিক্রয়স্বত্ব ইত্যাদি বিষয়ে অনেক নতুন আলোকপাত করেছেন তার একটিতে (১৯৮২: ৪৫) এই যুগের সমৃদ্ধি সম্বন্ধে 'আমাদের কোনো কোনো ঐতিহাসিকের' ভুল ধারণা দূর করার জন্য অনেক তথ্য নিবেশ করেছেন। যেমন কাঞ্চীর পল্লব, বাদামী এবং কল্যাণের চালুক্য, কনৌজের হর্ষ, যশোবর্মন এবং গুর্জর-প্রতিহার রাজ্য, কাশ্মীরের কার্কোট, মান্যখেটের রাষ্ট্রকূট, তামিল নাদুর চোল, পূর্ব ভারতের গৌড় এবং পালেদের সমৃদ্ধির কথা বলেছেন।

উক্ত রাজ্যগুলির সমৃদ্ধি যদি কেউ অস্বীকার করে থাকেন তাহলে তিনি নিশ্চয়ই ভুল করেছেন। কিন্তু সেটা কোসম্বির মত নয়, বর্তমান প্রবন্ধেও ঐ সমৃদ্ধি অস্বীকার করা হয়নি।

অবক্ষয়ের কথা যখন বলা হচ্ছে তখন দুটো যুগ এবং দুটো ভৌগোলিক ক্ষেত্র স্বীকার করা হচ্ছে। আলোচ্য যুগের ভৌগোলিক ক্ষেত্র উত্তর ভারত এবং পশ্চিম দাক্ষিণাত্য এবং সময় খ্রি.পূ. দ্বিতীয় সহস্রকের শেষ ভাগ থেকে নগরগুলির অবক্ষয় পর্যন্ত। এই যুগে সভ্যতার ভৌগোলিক এবং কালগতি খুব নির্দিষ্ট। বর্তমান পাকিস্তান ও ভারতের পাঞ্জাবে বৈদিক যুগে এর শুরু। এর মধ্যাকর্ষণ কেন্দ্রও একটি নির্দিষ্ট পথে সময়ের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে। কুরুরাজ্যের রাজধানী হস্তিনাপুর থেকে বৎসরাজ্যে কৌশাম্বীতে আসা উৎখনন থেকেই বোঝা গিয়েছে। প্রথম সহস্রকের ঐ অর্ধেই কাশী ও কোশল হয়ে মগধে এসে থামাটাও বৌদ্ধ শাস্ত্রের বিবরণী থেকে অনুমান করা যায়। লোহা ও খনিজ দ্রব্যের আকর্ষণে এই গতির সৃষ্টিও অনুমেয়। আর একটি শাখায় এই সভ্যতা দাক্ষিণাত্যে উজ্জয়িনীতে কেন্দ্রীভূত হয়। সেখানেও লোহার আকর্ষণ অনুমেয়। হস্তিনাপুরের লোপের আগে পর্যন্ত সভ্যতার এই ভৌগোলিক গতিতে ক্রমিক উন্নতিই চোখে পড়ে। যে কোনো একটি নগর লক্ষ্য করলে তার বুকে কালিক গতিতেও ক্রমিক উন্নতি চোখে পড়ে। যে কেন্দ্রগুলি এই প্রক্রিয়ায় গড়ে ওঠে একটা নির্দিষ্ট সময় থেকে তাদের অবক্ষয় চোখে পড়ে। তৃতীয় শতাব্দীতে হস্তিনাপুর, অরিকমেডু, নাসিক এবং নেবাসা লুপ্ত হয়ে যায়। অন্তর্নিহিত কোনো কারণ থাকলে তা অজ্ঞাত। কৌশাম্বী আক্রমণে ধ্বংস হয়। আর গড়ে ওঠেনি। বৈশালী পাঁচশ অব্দ নাগাদ পরিত্যক্ত হয়। মাহিষ্মতীতেও প্রথম সহস্রকের মাঝামাঝি অবধিই প্রাচীন বসতির চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে, তার পরে নয়। এগুলো কি এক যুগাবসানের ইঙ্গিত নয়? আম্বালা জেলার রোপড়েও (ইংরেজিতে Rupar) চিত্রিত ধূসর কৌলাল স্তরে যে বসতি গড়ে উঠেছিল দেড় হাজার বছর বসতির পর অষ্টম শতাব্দীতে পরিত্যক্ত হয়।

এ সবই ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রাচীন যুগের অবসানের চিহ্ন। স্বাধীন ভারতে যে উৎখনন হয়েছে তার কল্যাণে আমরা একে জানতে পেরেছি। সভ্যতার এই ছেদকে যদি অস্বীকার করা হয়, তাহলে উৎখনন লব্ধ তথ্যকে অস্বীকার করা হবে। পরবর্তী যুগকে অবক্ষয়ের যুগই হোক বা অন্য কোনো ভাবে অভিহিত করা হোক, আলাদা বলে স্বীকার না করলে যুগ বিভাগের ভুল হবে।

অবক্ষয় মগধ সহ উত্তর ভারতে এবং দাক্ষিণাত্যে অর্থাৎ যেখানে প্রাচীন যুগে সভ্যতার বিস্তার হয়েছিল সেইখানে এসেছিল। মধ্যযুগে দক্ষিণ ভারতে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার আর্থসামাজিক ভিত্তি আলাদা। বাংলায় পাল সাম্রাজ্যে প্রাচীন যুগের চরিত্র আছে, কিন্তু দক্ষিণ থেকে আসা সেনেদের রাজত্বেও নেই, এমন কি চতুর্থ শতাব্দীতে উত্তর দাক্ষিণাত্য ও মধ্য ভারতে খানিকটা যেন পরবর্তী যুগের মডেল হিসেবে গড়ে ওঠা বাকাটক রাজ্যেও নেই। বাকাটকরা এক বাণিজ্যহীন, গ্রামীণ (শ্রীমালি ১৯৮৭) সাম্রাজ্য শাসন করত। ২৩০ অব্দে বাণিজ্যবহুল সাতবাহন যুগ শেষ হয়। চতুর্থ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাকাটক শাসন শুরু হয়। বাকাটকরা কোনো মুদ্রার প্রচলন করেনি (শ্রীমালি ৫)। সাতবাহন যুগের সঙ্গে বাকাটক রাজ্যের বিপণনহীন গ্রামীণ সংস্কৃতির কোনো মিলই খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ঠিক

দেড়শ বছরে কিছু আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল স্বীকার করতে হয়। পল্লব, চালুক্য আর চোল রাজত্ব উত্তর ভারতের অবক্ষয়ের বিরোধী প্রমাণ নয়। উত্তর ভারতেও কয়েকটি সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। হর্ষবর্ধন সপ্তম শতাব্দীতে প্রকৃত পক্ষে এক পুরুষের একটি সাম্রাজ্য গড়ে ছিলেন। বাংলার শশাঙ্কও তাই। যশোবর্মনও তাই করেছিলেন অষ্টম শতাব্দীতে। এগুলি পূর্বযুগের অগ্রগতির রেশ নয়। এই সাম্রাজ্যগুলোর এলোমেলো .গড়ে ওঠা ও স্বল্পস্থায়িত্ব থেকেই এদের নতুন চরিত্রটি ধরা পড়ে। বিগণীকরণ ও আর্যীকরণ এই যুগেও হয়েছিল। স্থানে স্থানে প্রথম উদ্বৃত্ত রাষ্ট্রের জন্ম দিত এ কথাও অনস্বীকার্য। কিন্তু দুর্বল সভ্যতা (§১৬.৪) তাকে টিকিয়ে রাখতে পারত না। ফলে উৎখননের সাক্ষ্য থেকে আগের যুগে লোপের আগে পর্যন্ত যে ক্রমিক উন্নতির পরিচয় পাওয়া যায় (ওপরে) পরের যুগের সেইরকম কোনো ছবি মেলেনি। এটাই উত্তর ভারতে যুগাবসানের প্রমাণ। ক্রমিক উন্নতির অভাব ও একটির পর একটি নগরের লোপ এই দুটির সাক্ষ্যেই প্রাচীন উত্তর ভারত ও দক্ষিণাত্যের জন্য অবক্ষয় কথাটি ব্যবহার করা যায়।

অবক্ষয়ের ধারণা দুই শ্রেণীর ঐতিহাসিকের নেই— যাঁরা এশিয়াটিক সমাজতত্ত্বে বিশ্বাস করেন ও যাঁরা প্রাচীন ভারত বরাবরই অতি সমৃদ্ধ ছিল মনে করেন। দুই প্রান্ত এক জায়গায় এসে মেলে।

§১৮ প্রসঙ্গ কোসম্বি

এই লেখায় দামোদর ধর্মানন্দ কোসম্বির প্রভাব আছে বলে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। যাঁদের ওপর কোসম্বির প্রভাব পড়েছে তাঁদের লেখার সামান্যই সূচনা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এই জাতীয় ঐতিহাসিক এখন পর্যন্ত কম। এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার যে মৌলিকতায় অনন্য ঐতিহাসিক কোসম্বির মতের গুরুত্ব সম্বন্ধে অধিকাংশ ভারতীয় পণ্ডিত এখনো অসচেতন। অল্চিনদের ওপর কোসম্বির প্রভাব হরপ্পা ও আদি বৈদিক যুগে সীমাবদ্ধ - সোজাসুজি আমাদের আলোচনার পরিধির মধ্যে পড়ে না। নানা কারণে ক্যায়্পারের লেখা (১৯৯১) সহজলভ্য হয়েছে। আর্য সংস্কৃতির উৎপত্তি ও বিকাশে ভারতের পূর্ববাসীদের ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁর বিশিষ্ট মত ক্যায়্পার (১৯০৭-২০০৩) অন্ততঃ, ১৯৪৭ সাল থেকেই প্রকাশ করে এসেছেন। *The Aryans in the Rigveda* গ্রন্থে তা কোসম্বির মতের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর মতো ইন্দো-ইউরোপীয় ও সংস্কৃত বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতও যে এফ. আর. অল্চিনের মাধ্যমে পরোক্ষে অর্থাৎ নিজের অজ্ঞাতে কোসম্বির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন এ ব্যাপার বেশি ভারতীয় পণ্ডিতের চোখে পড়েছে বলে আমার জানা নেই। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের অধিকাংশ লেখা আমার কাছে অলভ্য থেকে গিয়েছে। তাই গ্রন্থপঞ্জীতে তাঁর সম্পাদিত *Combined methods in Indology and other essays*, (২০০২), *Coins and currency systems in South India* (১৯৭৭) ও বি.এম. পাণ্ডের সঙ্গে সম্পাদিত *Archaeological and historical essays in memory of A. Ghosh* (১৯৮৭) এর নাম নেই। প্রবন্ধ রচনার শেষে শ্রী সোমনাথ ভট্টাচার্যের সৌজন্যে *Studying early India* বইটি হাতে আসে। এর পরের প্রজন্মের ঐতিহাসিকদের লেখাতেও কোসম্বির প্রভাব পড়ে থাকা সম্ভব। সে খবর তাঁদের রচনার মাধ্যমে আমার কাছে এসে পৌঁছোয়নি।

দ্বিতীয় বক্তব্য কোসম্বি সম্বন্ধে। কোসম্বিই প্রাচীন ভারতের অর্থনীতির প্রথম ঐতিহাসিক এবং পথিকৃৎ। তাঁর দেখানো মূল সূত্রগুলি মানলেও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে অনেক জটিল সমস্যা এখনো সমাধানের অপেক্ষা রাখে। সভ্যতার অবক্ষয়ের কারণ এই রকম একটি সমস্যা। স্বয়ংভর গ্রাম ব্যবস্থাই এজন্য দায়ী এ কথা কোসম্বি স্বীকার করেননি। তাঁর মতে (১৯৫৬: ১১.১২; ২৪০ ও অন্যত্র) স্বয়ংভর গ্রামগুলির সংখ্যার ওপর শহরগুলির পরিণতি নির্ভর করেছে। অনেক গ্রামের উদ্ভব হলে

শহরের গুরুত্ব কমে গিয়েছে। অর্থাৎ গ্রামের স্বয়ংভরতা, যা কোসম্বির মতে (ঐ ১১) আংশিক ছিল, বরাবরই এক রকম ছিল। সেগুলি সংখ্যায় বেশি হয়ে যাওয়ায় শহরের পণ্যোৎপাদন ব্যাহত হয়েছিল।

শহর লোপের এরকম ব্যাখ্যায় স্ববিরোধ আছে। এই মত মানলে প্রথম যুগের চেয়ে মধ্যযুগে বেশি বিগণীকরণ ও আর্যীকরণ হয়েছিল মানতে হয়। কোসম্বির তাই মত। বর্তমান প্রবন্ধে এর বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী নেওয়া হয়েছে। লোপের কারণ হিসাবে কোসম্বির দেওয়া মত মানলে প্রথম যুগে কি করে উদ্বৃত্ত বেশি হয়ে বিপণন অর্থনীতির জন্ম দিয়েছিল তার ব্যাখ্যা হয় না। গ্রামের স্বয়ংভরতা একটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য। গ্রামের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা নেই বলেই স্বয়ংভর হয়ে কোনো রকমে বেঁচে থাকা। স্বয়ংভরতা এবং নীচু মানের উৎপাদন প্রথম থেকেই গ্রামের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। কৃষিতে ট্রাইবাল স্তরের চেয়ে উদ্বৃত্ত বেশি না হলে সীরপতির জন্ম হতোনা। সীরপতির আবির্ভাব বিনা অপবাহনে স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই হয়েছিল মনে হয়। কিন্তু যেহেতু বৈদিক যুগেও রাজায় রাজায় যুদ্ধ হত তাই খাজনা বাড়ানোর জন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগকেও নতুন ব্যাপার বলে মানা যায় না (ওপরে §১০)। নতুন আবাদি প্রবর্তনের নানা প্রক্রিয়ায় জাত উদ্বৃত্তই বাজার এবং বিপণনের জন্ম দিয়েছিল এই মূল সত্যটি স্বীকার করলেই বিপণন অর্থনীতির জন্মের ব্যাখ্যা হতে পারে। রাষ্ট্রের পণ্যেৎপাদন-উদ্যোগ যা পরে এসেছে মনে হয় তা ঐ প্রক্রিয়াকে আরো এগিয়ে নিয়ে যায়। গ্রামগুলির কিছু ক্রয়ক্ষমতা ছাড়া এই বিকাশ সম্ভবপর নয়।

গ্রামগুলি প্রথম থেকেই স্বয়ংভর হলে অর্থাৎ গ্রাম যদি প্রথম দিকে সাংগঠনিক ভাবে শহরের সঙ্গে যুক্ত না হয় তা হলে প্রথম বাজার কি করে সৃষ্টি হয়েছিল তারও যেমন ব্যাখ্যা হয় না তেমনই তার সংখ্যাবৃদ্ধি কি করে শহরকে 'মেরে ফেলতে' পারে তারও ব্যাখ্যা হয় না। বরং নতুন গ্রামগুলির গঠন ও জীবনযাত্রার মানই এমন ছিল যা নগরসভ্যতার অনুকূল নয় এ কথা বললে ব্যাখ্যা হতে পারে। খ্রি.পূ. প্রথম সহস্রকের গ্রামগুলির গঠন ও জীবনযাত্রার মান পরবর্তী কালের তুলনায় অন্যরকম ছিল এও স্বীকার করে নিতে হয়।

স্বয়ংভর গ্রামভিত্তিক অর্থনীতি কেন ছড়িয়ে পড়ল তাও বলতে হয়। কোসম্বির মতে (১৯৫৬:৩০১, ২৮৯ এবং অন্যত্র) পরবর্তীকালে আর্যীকরণ প্রক্রিয়ায় ধর্ম বলপ্রয়োগ ও হিংসার স্থান নিয়ে নিয়েছিল। "গ্রাম শহরগুলোকে এবং শ্রেণীগুলোকে মেরে ফেলেছিল" (৩০৬) এও বলেছেন। কিন্তু ধর্ম বরাবরই আর্যীকরণের উপায় থেকেছে। বৈদিক যুগ থেকেই যে এই প্রক্রিয়া চালু ছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায় (ভট্টাচার্য ২০০১)। অশোক ধর্মবিজয়ের নীতি ঘোষণা করেছিলেন ঠিকই। তার কারণ মৌর্যরা (এবং তাদের কিছু পূর্বসূরিও) অতিরিক্ত কিছু করেছিল। অপবাহনের অমানুষিকতা দেখে অশোক সেটা বর্জন করেছিলেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ধর্মের মাধ্যমে আর্যীকরণ আগে হয়নি। অশোকের পর আবহমান কালের অহিংস প্রক্রিয়াটি আর্যীকরণের একমাত্র প্রক্রিয়া হয়ে পড়ে। এখানেও আমরা নতুন কিছু দেখছি না যা দিয়ে একে শহরলোপের সঙ্গে জোড়া যায়।

স্থানীয় দেবতা ও ধর্মাচরণের থেকে মধ্যযুগীয় সভ্যতা বিস্তারে বা আর্যীকরণে ধর্মের মুখ্য ভূমিকা কোসম্বির (১৯৬৭ এবং অন্যত্র) চোখে পড়েছে। চোখে পড়া স্বাভাবিক। বৈদিক যুগে বা মৌর্য যুগে যে বিগণীকরণ তথা আর্যীকরণ হয়নি তা নয়। কিন্তু তার ছাপ অত স্পষ্ট নয়। মধ্য যুগ অত পুরোনো নয় বলে চিহ্নগুলো থেকেই যেতে পারে। এটি একটি কারণ। দ্বিতীয় কারণ অর্ধ সমাপ্ত বিগণীকরণ। বিগণীকরণ অসমাপ্ত বলে তার কাঁচা ছাপগুলো রয়ে গিয়েছে। অস্পৃশ্যতার ব্যাপকতা থেকে বোঝা যায় উচ্চ বর্গের একটা ধারায় সমাজে নতুন জাতির প্রবেশের বিরুদ্ধে সক্রিয়তা ছিল। এর ফলে বিগণীকরণ ব্যাহত না হয়ে পারে না। অর্থাৎ যত গ্রামের জন্ম হওয়া উচিত ছিল তাও হয়নি, যারা

জন্মেছে তারাও অপুষ্ট হয়ে জন্মেছে। পণ্যোৎপাদী শ্রেণী ও শহরগুলো এই জন্যই ক্ষীণ হয়ে যায়। একথা ওপরেও বলা হয়েছে।

এই কথাগুলি বলতে গিয়ে এও মনে রাখতে হচ্ছে যে সব রহস্য এখনো স্পষ্ট নয়। বিগণীকরণের মাধ্যমে সমাজে নতুন জ্যাতির প্রবেশের বিরুদ্ধে অচরিষ্ণু দৃষ্টিভঙ্গী জন্মানোর পেছনে কায়েমী স্বার্থ কাজ করেছে। এটা কি প্রক্রিয়ায় জন্মালো তা পুরোটা স্পষ্ট নয়। সাতবাহন অর্থনীতি ও দক্ষিণের মধ্যযুগীন অর্থনীতি নিয়ে কোসম্বি মূল্যবান আলোচনা করেছেন। সাতবাহন রাজত্ব ততো অস্পষ্ট নয়। কিন্তু পল্লব, চালুক্য বা চোল অর্থনীতির, গঙ্গ, কদম্ব প্রভৃতি রাজ্যের আবির্ভাব ও তৎকালীন উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতি ও অর্থনীতির ওপর প্রভাব আরো পর্যবেক্ষণের পর স্পষ্টতর হতে পারে। মতও বদলাতে হতে পারে।

গ্রন্থসূচনা

যে সব বই অপেক্ষাকৃত সহজে খোঁজকরা যায় সেই জাতীয় মূল সংস্কৃত বা পালি গ্রন্থের প্রকাশন বিবরণী দেওয়া হয়নি। ত্রিপাঠী (১৯৭৬) চিত্রিত ধূসর কৌলালের ওপর পরবর্তী প্রামাণ্য গ্রন্থ হলেও লালের ওপর শর্মা (১৯৬৪) থেকেও সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সংক্ষেপে অথচ কোনো তথ্য বাদ না দিয়ে দক্ষ উৎখনক স্বয়ং তুলনাত্মক দৃষ্টিতে এই অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বিবরণী তৈরি করায় এই গ্রন্থ স্থায়ী মূল্য অর্জন করেছে। নতুন তথ্য থাকলে পরবর্তী প্রকাশনের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। অত্রাঞ্জিখেড়ার আর.সি. গৌড়ের বিবরণীর প্রকাশের (দিল্লী ১৯৮৩) শুধু খবরটিই আমার কাছে আছে। তথ্য সংগ্রহের সূত্র যথাস্থানে দেওয়া আছে। হেমবতী নন্দন বহুগুণা শ্রীনগর-গহড়বাল বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে করা উৎখননে ২০০১ সালের শেষে ভারত-তিব্বত সীমান্তে প্রত্ন-ঐতিহাসিক যুগের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলেছে বলে খবর আছে। থাপলির মতো এও প্রাসঙ্গিক হতে পারে। ছাপা বিবরণী এখনো প্রকাশিত হয়নি। সংকলনের প্রবন্ধের সূচনায় প্রথম ছাপার কাল আলাদা হলে তা বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হয়েছে।

D.P. Agarwal 1971 — *The Copper-bronze age in India* New Delhi

D. Bhattacharya 2001 — 'Inclusiveness ideology and practice in the Atharvaveda '*Problems of social tolerance in ancient India* Ed. S.C. Sarkar, Calcutta : 55-60

B.D. Chattopadhyay 2003 — *Studying early India* Delhi

K.A. Chowdhury & S.S. Ghosh — 'Plant-remains' = Lal 1954: 120-135

R.C. Gaur (ed). 1968 — Painted Grey Ware : *Proceedings of Seminar on Archaeology held at the Aligarh Muslim University*, Aligarh, August 18-19, 1968

A. Ghosh 1973 — *The city in early historical India*, Shimla

,, ,, ,, 1989 — Ed. *An Encyclopaedia of Indian Archaeology*, New Delhi, Munshiram, 2 vol.s.

Ram Gopal	1959	*India of Vedic Kalpasutras,* Delhi.
R.C. Hazra	1940	*Studies in the Puranic record of Hindu rites and customs.* Dacca
K. Hoffmann	1940	'Vedische Namen' *Wörter and Sachen* 21 Heidelberg : 139-161
,, ,, ,,	1986	'Altindoar. *Kāca*' Die Sprache 32 Wien : 29-33
E. Hultzsch	1924-69	Inscriptions of Asoka *CII* Vol.1, 2nd Ed. 1969 Varanasi
R.P. Kangle	1963	*The Kauṭilīya Arthaśāstra* Part II University of Bombay
A.B. Keith	1928	*A History of Sanskrit Literature.* Oxford University Press
R.G. Kent	1953	*Old Persian,* American Oriental Society
B.M. Khanduri	1944	*The Archaeology of Alaknanda Valley (Central Himalaya)* New Delhi
D.D. Kosambi	1950	'The origin of the Brahmin Gotras', *Journal of Bombay Branch of the Royal Asiatic Society* New Series Vol. 26 Part 1:21-80
,, ,, ,,	1956-75	*An Indtroduction to the Study of Indian History,* Bombay 1956, 2nd ed. 1975
,, ,, ,,	1957(1956)	'The decline of Buddhism in India' *Exasperating essays* Poona : 63-66.
,, ,, ,,	1962	*Myth and reality,* Bombay.
,, ,, ,,	1967	'Living prehistory in India' *Scientific American,* February 1967 104-112; rep. *The American Review'* Dec. 1967 105-114.
F.B.J. Kuiper	1991	*The Aryans in the Rigveda,* Amsterdam
B.B. Lal	1954	'Excavation at Hastinapura and other explorations in the Upper Ganga and Sutlej Basins' 1950-1952 *Ancient India- Bulletin of Archaeological Survey of India* No.s 10 & 11

1954 & 1955:5-151. সহায়ক অন্য বিশেষজ্ঞ লেখক Thapar, Bholarath Nath Chowdhury, Ghosh বর্ণক্রম অনুসারে দ্র.।

„ „ „ 1962 'A picture emerges' *Ancient India– Bulletin of the Archaeological Survey of India* No.s 18 & 19 1962 & 1963: 204-221.

„ „ „ 1964 'Archaeological excavation and expeditions' *Oriental Studies in India,* 26th International Congress of Orientalists, New Delhi 171-194.

„ „ „ Web site 'A note on the excavations at Ayodhya with reference to the Mandir-Masjid issue.'

www.wac.uct.ac.za/croatia/lal.htm 1993 এর পরবর্তী

B.C Law 1953 'North India in the sixth century B.C.' *The age of Imperial unity* Ed R.C. Majumdar, Bharatiya Vidya Bhavan, 1-17

M.V.D. Mohan 1974 *The North-West India of second century B.C.* Ludhiana

Bhola Nath 'Animal-remains'= Lal 1954, 107-120

K.P. Nautiyal,
B.M. Khanduri,
Vindor Nautiyal &
D.L. Rajput 1978 'Thapli : A Painted Grey Ware Site in Garhwal' *Puratattva* 10, 1978-79:94-95

H. Oldenberg 1915 *Die Lehre der Upanishden und die Anfänge der Buddhismus,* Gottingen

Durga Prasad 1934 'Classification and significance of the Silver Punch-marked coins of ancient India' *Journal of the Asiatic Society of Bengal* N.S., XXX, 1934.

H.C. Raychaudhuri 1953 'Note on the date of the Arthaśāstra' *The age of Imperial unity* Ed. R.C. Mujumdar Bharaṭya Vidya Bhavan, 285-87

क्षितिमोहन सेन	१९४०	भारतवर्षमें जातिभेद, कलकत्ता
G.R. Sharma	1960	*The excavations at Kausambi 1957-59* Allahabad
R.S. Sharma	1985	'Taxation and state-formation in Northern India in pre-Maurya Times' *Proceedings of the Fifth World Sanskrit Conference*, New Delhi 763-787
Y.D. Sharma	1964	'Protohistoric remains', 'Remains of early historical sites' *Archaeological remains, monuments and museums* 26th International Congress of Orientalists, ND 1-84
K.M. Shrimali	1987	*Agrarian structure in Central India and the northern Deccan - A study in the Vakataka inscriptions*, Delhi
D.C. Sircar	1982	*The emperor and the subordinate rulers*, Visva Bharati, Santiniketan.
B.K. Thapar		'Brick-Measurements' Lal 1954 106-107
Romila Thapar		*Asoka and the decline of the Mauryas*, Oxford, 1961; 2nd ed. Delhi 1973
Vibha Tripathi	1976	*Painted Grey Ware– An Iron Age Culture of Northern India*, N.D.
,, ,,	2001	*The Age of Iron in South Asia : Legacy and Tradition*, N.D.

সংস্কৃত গ্রন্থ

অর্থশাস্ত্র	ওপরে কাংলে দ্র.।
অথর্ববেদ (পৈপ্পলাদলাদসংহিতা)	*The Paippalādalādasaṃhitā of the Atharvaveda* I, Ed. Dipak Bhattacharya Asiatic Society, Calcutta 1997
অথর্ববেদ (শৌনকসংহিতা)	*Atharvaveda Śaunakīya* with the commentary of Sāyana, Voll. 1-5, Ed. Vishva Bandhu, VVRI, Hosiarpur 1960-1964
যুগপুরাণ	'Yugapurāṇa of the Garga samhitā' K.P. Jayaswal *JBORS XIV* 397-421

যুগপুরাণ — *The Yuga Purāṇa* John E. Mitchiner, Asiatic Society, Calcutta 1986

শতকত্রয় — *The epigrams attributed to Bhartṛhari : Including the three centuries Ed.* D.D. Kosmabi, Bharatiya Vidya Bhavan, Bombay 1948

পঞ্চকন্যা

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি

শাস্ত্র বলে—সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই মহাপাতকনাশিনী পঞ্চকন্যাকে নাকি স্মরণ করতে হয়। তাহলে নাকি পাপ থাকে না। পাপনাশিনীদের তালিকায় যাঁরা আছেন, তাঁদের দুইজন হলেন মহাভারতের নায়িকা—কুন্তী এবং দ্রৌপদী। আর তিনজন হলেন রামায়ণের প্রথম গৌতম ঋষির স্ত্রী অহল্যা। দ্বিতীয়া বানর বালীর স্ত্রী তারা, আর তৃতীয়া রাক্ষস রাবণের স্ত্রী মন্দোদরী।

অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যা ঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্॥

শ্লোকটি খুব প্রাচীন বটে, তবে কত প্রাচীন জানি না। কেউ বলেন, ব্রহ্মান্ডপুরাণে এই শ্লোক আছে, কিন্তু এতদেশীয় ব্রহ্মান্ড খুঁজে এই শ্লোক পাইনি। কিন্তু নিজের চোখে না দেখলেও এই শ্লোকের প্রাচীনতাও আছে, পরম্পরাও আছে।

প্রশ্ন উঠেছে এই শ্লোক নিয়ে। জবরদস্ত প্রশ্ন উঠেছে এই রমণীদের চরিত্র নিয়ে। বহুজনে এই প্রশ্ন করে— আচ্ছা এমন আশ্চর্যও ঘটে— ভারতবর্ষে কি সতী রমণীর অভাব আছে? রামায়ণের রামপ্রিয়া সীতার মতো সতীসাধ্বী রমণী কি আর দ্বিতীয় পাওয়া যাবে? পাওয়া যাবে কি সাবিত্রী অথবা অত্রি-জায়া অনসূয়ার মতো সতী-সাধ্বী যিনি সতীত্বের তেজে, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকেও শিশুতে পরিণত করেছিলেন। ভারতবর্ষে কি চিরস্মরণীয়া সতী রমণীর সংখ্যা গোনা যাবে? ইতিহাস-পুরাণের মধ্যে সতীত্বের অলৌকিক তেজ না হয় অলৌকিক উপন্যাসও সৃষ্টি করেছে, কিন্তু ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে, স্বামীর জন্য আপন স্বার্থ বলি দেওয়া লক্ষ লক্ষ রমণী রয়েছেন, তাঁদের নাম ইতিহাস পুরাণে কীর্তিত নয় বলেই তাঁদের নামও আমরা জানি না। কিন্তু যে সমস্ত নারীর সতীত্ব-গৌরব শত শত রমণীর কাছে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়ে রইল, যাঁরা সাত সকালে উঠে ভিজে কাপড় পরে প্রতিজ্ঞা করে গেলেন সীতার মতো সতী হবো, রামের মতো পতি পাব সেই সীতা-সাবিত্রীর নামও তো এই প্রাতঃস্মরণীয়াদের তালিকায় নেই।

তালিকায় নেই বলেই বুঝি, যিনি এই শ্লোক রচনা করেছিলেন (শ্লোকটি কত প্রাচীন জানি না, কিন্তু শ্লোকটি বহুল প্রচলিত), তিনি এঁদের সতীত্বের মাত্রাটি বুঝেছিলেন অন্যভাবে। অর্থাৎ সাধারণ দৃষ্টিতে একপতিব্রতাদের মর্যাদা পরিমাপের যে মাপকাঠি আছে, তা থেকে এঁদের মর্যাদার কারণগুলি একান্তভাবে পৃথক। অথচ এই শ্লোকভুক্ত রমণীদের প্রতি শ্লোক রচয়িতার এক ধরনের মমতাও আছে। লক্ষণীয়, উপরিউক্ত শ্লোকের মধ্যে যে পঞ্চকন্যার নাম আছে, তাঁদের প্রত্যেকের একাধিক স্বামী আছেন, অথবা বলা যায় স্বামী থাকা সত্ত্বেও কোন না কোনভাবে তাদের সতীত্ব লঙ্ঘিত হয়েছে। অহল্যার দ্বিতীয় কোনো স্বামী ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি গৌতমরূপী ইন্দ্রের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছিলেন। অন্যদিকে কুন্তীর নিজের স্বামী ছাড়াও আরও পাঁচ সন্তানজনক স্বামী ছিলেন। দ্রৌপদীরও স্বামী সংখ্যা পাঁচ। আর বালী-পত্নী তারা এবং রাবণ-প্রিয়া মন্দোদরী দুজনেই প্রথম স্বামীর অবর্তমানে দেবরদের কণ্ঠলগ্না হয়েছেন।

স্বামীর এই সংখ্যাধিক্য অথবা সতীত্ব লঙ্ঘিত হওয়া সত্ত্বেও এই পঞ্চ রমণী যখন প্রাতঃস্মরণীয়াদের মধ্যে গণ্য হয়েছেন, তখনই বুঝতে হবে এই রমণীদের মর্যাদা বুঝতে হবে নতুন আলোয়, নতুন কোন দৃষ্টিকোণ থেকে। ঈশ্বরান্তঃপ্রাণ ব্যক্তি তথা অধিকাংশ বৈষ্ণবভাবাপন্ন সজ্জন ব্যক্তিদের মুখে শুনেছি যে, অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী যাঁরাই এই প্রাতঃস্মরণীয়াদের তালিকায় আছেন, তাঁদের চরিত্র-ভাবনার একটা সাধারণ ধর্ম বা 'কমন এলিমেন্ট' হল, এঁরা প্রত্যেকেই স্বশরীরে ঈশ্বর পুরুষের দর্শন করেছেন। অহল্যা, তারা এবং মন্দোদরী রামচন্দ্রকে স্বশরীরে দর্শন করেছেন এবং অন্যদিকে, দ্রৌপদী এবং কুন্তী স্বশরীরে দর্শন করেছেন ভগবান কৃষ্ণকে। অতএব উক্ত রমণীদের চরিত্রে তথাকথিত যুক্তি অনুসারে যদি অসীতত্বের কলঙ্ক আরোপও করা যায় তবুও ভগবানের দর্শন-মননে, সে দোষ তাঁদের কেটে গেছে।

অকপটে জানাই, রামচন্দ্র অথবা কৃষ্ণের চরম ভগবত্তায় যাঁদের বিশ্বাস আছে, এমনকি আমারও তা যথেষ্টই আছে, তাঁদের কাছে এর থেকে সরল সমাধান আর কিছু নেই।

ভগবদ্‌বিশ্বাসীজনেরা এও বিশ্বাস করেন যে, ভগবানের শারীরিক আর্বিভাবে সেই কালের পাপী-তাপী দুঃস্বভাব সকলেই সমস্ত দুঃখ-তাপ এবং পাপ থেকে মুক্তি লাভ করে। অবিশ্বাসী জনেরা এ-কথা নাই বিশ্বাস করলেন, কিন্তু এটা মানতে হবে যে, ভগবান নাই হোন, এমনকি তাঁর অলৌকিক প্রভাবে পাপী-তাপীদের জীবনমুক্ত হতে নাইবা দেখা গেল স্বচক্ষে, কিন্তু এটা মানতেই হবে যে, বিশালসত্ত্ব, বিশাল হৃদয় উত্তম পুরুষের প্রভাবে দেশে-কালে একটা বিশাল আলোড়ন আসে। যে আলোড়ন উত্তম-মধ্যম-অধম সকলের ওপরে প্রভাব বিস্তার করে এবং তা এক এক জনের ওপর এক একভাবে। মহাপুরুষের দিকে তাকিয়ে দেখুন, স্বার্থত্যাগী মহান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের দিকে তাকিয়ে দেখুন, অথবা দৃষ্টিদান করুন সমাজ সেবার জন্য বলি প্রদত্ত বিরাট মনুষ্যের দিকে, দেখবেন, তাঁর প্রভাবে সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে এমনকি দুষ্ট এবং চরিত্রহীন লোকের মনেও এক ধরনের পরিবর্তন আসে।

ভগবৎস্বরূপের আবির্ভাবে সমাজের সর্বস্তরে মানুষের মধ্যে যে পরিবর্তন আসে তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ যিশুখ্রিস্ট, বুদ্ধদেব, চৈতন্য। বিভূতিমৎ সত্ত্ব মহাপুরুষের উদাহরণ দেখুন— বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, মার্টিন লুথার কিং। অন্যদিকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব দেখুন— মাও সে তুঙ, লেনিন, আব্রাহাম লিঙ্কন।

সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মন পরিবর্তন করতে এরা সক্ষম ছিলেন। তবু বলি লৌকিক দৃষ্টিতে এ বিশ্বাস করা কঠিন হবে যে, শুধু ভগবৎ স্বরূপের দর্শন-স্পর্শন ঘটেছিল বলেই অহল্যা-দ্রৌপদী-কুন্তীরা প্রাতঃস্মরণের মর্যদা লাভ করেছেন। অথবা এঁদের তথাকথিত অসতীত্ব সতীত্বে পরিণত হয়েছিল। লৌকিক দৃষ্টিতে এ-কথা সত্যিই বিশ্বাস করা কঠিন, কেন না তাহলে এই যুক্তিও আসবে যে ভগবৎস্বরূপের আবির্ভাবকালে তাঁর দর্শনের পুণ্যবলে সেই যুগের গণিকা-বেশ্যারাও তাহলে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাকতেন। কাজেই সে যুক্তি নয়, আমার ধারণা— যিনি এই শ্লোক রচনা করেছিলেন এবং তাঁর আপন ভাবনাটি যথেষ্ট জনপ্রিয়ও করে দিতে পেরেছিলেন, তিনিও তেমন ভগবদ্ বিশ্বাসে এই শ্লোক লেখেননি। বরঞ্চ বলব, তাঁর দৃষ্টি ছিল অসম্ভব প্রগতিশীল এবং অন্য সকলের ধারণা থেকে বিশিষ্ট এবং পৃথক। আমি এখন দাবি করছি না যে, শ্লোকরচয়িতার মনের কথাটি আমিই একমাত্র বুঝতে পেরেছি, কিন্তু অহল্যা-দ্রৌপদীদের বিচিত্র চরিত্রের বিভিন্ন মৌল উপাদান-সংগ্রহ করে একটা সম্ভাব্যতার কথা আমরা বলতে পারি যে, হয়তো এই কারণে তাঁরা প্রাতঃস্মরণের মর্যাদা লাভ করেছিলেন।

(১)

অহল্যা

প্রজাপতি ব্রহ্মা সৃষ্টির তপস্যায় বসেছিলেন। শত শত নর-নারী সৃষ্টি করার পর তাদের সবার শরীরের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন খেদ হল ব্রহ্মার। তাঁর মনে হল কেমন যেন একই রকম সব। সেই এক চেহারা, একই গায়ের রঙ, একই ভাষা— একবর্ণা ঃ সমা ভাষা একরূপাশ্চ সর্বশঃ। মানুষের এমন একঘেয়ে বৈচিত্র্যহীন রূপ দেখে ব্রহ্মা ক্ষুব্ধ হয়ে আবারও বসলেন সৃষ্টির তপস্যায়। পৃথিবীর মানুষের যেখানে যা ভাল আছে, সব একত্র সঞ্চিত করে সেই সারভূত অংশ দিয়ে ব্রহ্মা এক অনন্য সাধারণ নারীমূর্তি সৃষ্টি করলেন। তাঁর নাম দিলেন অহল্যা। 'হল্' মানে বিরূপতা। 'হল' বা বিরূপতা যার জন্মায় তার ব্যাকরণসিদ্ধ নাম 'হল্য'। যে রমণীর মধ্যে বিরূপতা বা নিন্দনীয় অংশ এতটুকু নেই, তাঁকে অহল্যা বলে ডাকা ছাড়া উপায় কী ব্রহ্মাব— যস্যা ন বিদ্যতে হল্যং তেনাহল্যেতি বিশ্রুতা।

অনুপম সৌন্দর্যের সংকল্পিত ধারণায় এমন অনিন্দ্য সুন্দরী নারী মূর্তি রূপায়িত করার পর ব্রহ্মার দুশ্চিন্তাও কিছু কম হল না। কোথায় এঁকে রাখবেন, কোথায় তাঁর বিয়ে হবে, কেমন স্বামী হওয়া উচিত তাঁর— এত সব ভাবনা। চিন্তা যখন পিতামহের মস্তিষ্ক ক্লিষ্ট করে তুলছে, ততক্ষণে দেবলোকে সাড়া পড়ে গিয়েছে। স্বর্গের দেবতারা মানসিক শক্তি এবং প্রভাবে অবশ্যই মানুষের চেয়ে অনেক উন্নত বটে, কিন্তু কাম ক্রোধ লোভ তাঁদের মধ্যেও আছে। স্বয়ং ইন্দ্র দেবতাদের রাজা এবং স্বর্গের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি বলে মনে মনে ভেবেই রাখলেন যে, এই রমণীকে তিনিই পত্নীত্বে বরণ কববেন। ব্রহ্মাকে তিনি মনের কথা জানালেন না বটে, তবে মনে মনে তিনি আত্মসাৎ কবলেন সুন্দরী অহল্যাকে— স্থানাধিকতয়া পত্নী মমৈষতি পুরন্দরঃ।

পিতামহ ব্রহ্মা ইন্দ্রের মনের কথা বুঝলেও এমন স্ত্রীকামী ব্যক্তির প্রতি কোনও সমবেদনা প্রকাশ করলেন না অথবা প্রকাশ্যে কোনও ইতিবার্চক ইঙ্গিতও দিলেন না। মনের মধ্যেই খুঁজতে খুঁজতে এবার মর্ত্যলোকের মহর্ষি গৌতমের কথা স্মরণ হল ব্রহ্মার। ধীর, স্থির মহর্ষি গৌতম। তাঁকে ডেকে অহল্যাকে তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখার প্রস্তাব করলেন ব্রহ্মা। স্বর্গসুন্দরী অহল্যা মর্ত্যঋষির আরণ্যক আশ্রমে এসে থাকতে আরম্ভ করলেন। মহর্ষি গৌতম কর্তব্যের খাতিরে পিতামহ ব্রহ্মার কথা জেনে নিয়েছেন বটে, এমনকি ন্যাসভূতা এই রমণীর ভরণ-পোষণও তিনি করছেন কর্তব্যের খাতিরেই, কিন্তু বহুকাল আশ্রমস্থিত এই রমণীর দিকে একবারও তিনি অন্য কোনও দৃষ্টিতে তাকাননি। ইট-পাথর সোনায় তাঁর একই দৃষ্টি— সমো লোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনে।

বেশ কয়েক বছর গৌতমের আশ্রমে থেকে গেলেন অহল্যা। ব্রহ্মা যতটুকু সময় গৌতমকে অহল্যার ভরণ-পোষণের ভার নিতে বলেছিলেন, ততটুকু সময় পেরিয়ে যেতেই তিনি অহল্যাকে ফিরিয়ে দিয়ে এলেন ব্রহ্মার কাছে। গৌতমের এই নিস্পৃহ নির্বিন্ন আচরণ দেখে অবাক হয়ে গেলেন ব্রহ্মা। ভাবলেন তিন ভুবনের সারাৎসার সৌন্দর্য একত্র করে যে মোহময়ী রমণীমূর্তি তৈরী করেছিলেন তিনি, তাঁকে দিনের পর দিন নিকটে লাভ করেও যে মানুষ এতটুকু অসংযম দেখায় না, সেই তো এই রমণীর স্বামী হবার উপযুক্ত। ব্রহ্মা আর দেরী করলেন না।

তিনি নির্দ্বিধায় গৌতমের হাতেই সমর্পণ করলেন অহল্যাকে। ব্রহ্মার ইচ্ছাকে সম্মান দিয়ে গৌতম সুন্দরী অহল্যাকে বিবাহ করে পুনরায় ফিরে এলেন তাঁর আরণ্যক আশ্রমে। স্বর্গসুন্দরী অহল্যা পাকাপাকিভাবে মর্ত্যভূমির আবর্তে ফিরে এলেন মোহলেশহীন এক মুনির বধূ হয়ে।

অহল্যার সৃষ্টির মধ্যে অলৌকিকতার যে স্পর্শটুকু পেলাম, তার মধ্যে পৌরাণিকের কল্পনা কতটুকু, আর সত্য কতটুকু তা সুধীদের বিচার্য। তবে এটা লৌকিকতার খাতিরে অনুমান করা যায় যে,

অসাধারণ সুন্দরী রমণীদের রূপের কথা বলতে গিয়ে অনেক সময়েই এমন বিকল্প ব্যবহৃত হয়েছে— এই রমণীকে সৃষ্টি করার সময় বিধাতাপুরুষ আগে তুলি দিয়ে এক সৌন্দর্যময়ী নারীকে এঁকে নিয়েছিলেন, তারপর সেই চিত্রে প্রাণ সংযোগ করে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন পৃথিবীতে— চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিত-সত্ত্বযোগা। কালিদাস-ভবভূতি, ব্যাস-বাল্মীকি সমস্ত মহাকবিই রমণীর সৌন্দর্য কল্পনায় কখনও না কখনও বিধাতার মনোভূমি ব্যবহার করেছেন। কাজেই বিধাতাপুরুষের এই রূপকল্প কবিত্বের কল্প হিসেবেই যদি ধরে নিই, তাহলে বলতে হবে অহল্যা জন্মেছিলেন রমণীর আকাঙ্খিত সমস্ত সৌন্দর্য এক অঙ্গে ধারণ করে। কিন্তু বিধির বিধানে যে পুরুষটির সঙ্গে তাঁর বিবাহ হল, তিনি ত্যাগ-বৈরাগ্যের মূর্ত বিগ্রহ হলেও নিশ্চয়ই তিনি অহল্যার অসীম সৌন্দর্যরাশির সমঝদার রসিক ছিলেন না। কর্তব্যের অনুরোধে যে নির্বিণ্ণতায় মহর্ষি গৌতম অহল্যাকে গৃহে গচ্ছিত রেখেছিলেন, সেই কর্তব্যের কৌতুকেই গৌতম বিবাহ করলেন অহল্যাকে। লোক-পিতামহ ব্রহ্মার ইচ্ছে বলে কথা।

অহল্যার জীবনে কত সুখ নেমে এল সে-কথা জানি না, তবে রামায়ণের খবর আছে মহর্ষি গৌতম পরম সুখে অহল্যার সঙ্গে দিন কাটাতে লাগলেন— স তয়া সহ ধর্মাত্মা রমতে স্ম মহামুনিঃ। হয়তো সুখেই দিন কাটছিল অহল্যারও। কিন্তু ব্রহ্মার ইচ্ছায় যতই অনাড়ম্বর অথবা নিস্তরঙ্গভাবে গৌতম মুনির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা হোক অহল্যার, অন্যদিকে এই অনাড়ম্বর বিবাহের প্রভাব অথবা 'ইমপ্যাক্ট' ছিল একেবারেই অন্যরকম।

দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুণ্ণ এবং ক্রুদ্ধ হলেন দেবরাজ ইন্দ্র। যেদিন অহল্যার সৃষ্টি হয়েছিল, সেদিন থেকেই এই দেবরূপিণী রমণীটিকে নিজের জন্য বেছে রেখেছিলেন ইন্দ্র। কিন্তু হঠাৎই ব্রহ্মা তাঁকে গৌতম মুনির হাতে দিয়ে দেওয়ায় তিনি মনে মনে অন্য পরিকল্পনা করলেন।

সুযোগ বুঝে একদিন যখন গুরু গৌতম আশ্রমে উপস্থিত নেই— তিনি স্নান করতে গেছেন নদীতে, সেই সময় দেবরাজ প্রবেশ করলেন গৌতমের পর্ণকুটিরে, মহর্ষি গৌতমের মতোই জটা-চীর ধারণ করে।

দেবরাজের এই লুব্ধতার কথা বলতে গিয়ে রামায়ণ কোনও ভণিতা করেনি। দেখা যাচ্ছে মহর্ষি গৌতমের অনুপস্থিতি নজরে রেখে ইন্দ্র গৌতমের বেশ ধারণ করে সোজা তাঁর পর্ণকুটিরে ঢুকেই অহল্যাকে বললেন তপস্যায় সমাহিতা সুন্দরী আমার। মিলনকামী ব্যক্তি মিলনের জন্য অপেক্ষা করতে পারে না— ঋতুকালং প্রতীক্ষন্তে নার্থিনঃ সুসমাহিতে।

দিনের পর দিন যে ঋষির কাছে গচ্ছিত থাকার সময় কোনও দিন যাঁর দৃষ্টি আকর্ষিত হয়নি, তাঁর মুখে এমন কামুক প্রস্তাব যে অসম্ভবপ্রায়, এটা অহল্যার বুঝতে দেরি হয়নি। বিবাহিত জীবনেও যে ব্যক্তি কোনও দিন অসংযত আচরণ করে ধর্মবিরুদ্ধ মিলন প্রার্থনা করেননি, তিনি হঠাৎই এই ভর দুপুরে স্নানাহারের সময়ে শারীরিক মিলনের জন্য পাগল হয়ে উঠবেন, এমন অগৌতম সুলভ আচরণ মহর্ষি গৌতমের কাছে আশা করা যায় না বলেই অহল্যা নিশ্চিত হলেন যে, অসময়ের এই অতিথিটি গৌতম নন। মহর্ষির বসন-উত্তরীয়, জটা-চীর, কমণ্ডলু সব ঠিক আছে, কিন্তু সেই আর্য বেশভূষার অন্তরাল থেকে যাঁর কামাতুর মুখখানি উঁকি দিচ্ছে— অহল্যা বেশ বুঝতে পারলেন— তিনি গৌতম নন। অহল্যা চিনতে পারলেন— এ হল সেই মনুষ্যের প্রবৃত্তিযুক্ত সেই দেবরাজ ইন্দ্র, যিনি তাঁর সৃষ্টিলগ্নেই তাঁকে পাবার জন্য মনস্থ করে রেখেছিলেন।

ঘরে গচ্ছিত থাকা অবস্থাতেও যে পুরুষ তাঁর মতো অনিন্দ্যসুন্দরী রমণীর দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করেননি, তাঁর অসম্ভব সংযমের প্রশংসা করা যেতে পারে, কিন্তু সহস্রবর্ষের সাধনার ধন যে রমণীর মন, তার দিকে মহর্ষি গৌতমের আকর্ষণ কতটুকু? গৌতমের সহধর্মাচরণ, তাঁর হোম ধনুঁর

দেখভাল করা, প্রয়োজনে কিছু সমিধ-কুশ আহরণ, আর বংশের পরম্পরা রাখবার জন্য একটি সন্তানের জন্ম দেওয়া, এর জন্য তো যে কোনও একটি সাধারণ কুলশীলবতী রমণীই যথেষ্ট ছিলেন। তার জন্য তো অহল্যার মতো অসাধারণ রূপময়ী বিদগ্ধা রমণীর প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু 'বিধি জড় তপোধন', যে রমণী সৃষ্টিলগ্নেই দেবতাদের কাম্য হয়ে উঠেছিলেন, তিনি দেবতাদের বিলাস কুতুহলের সাক্ষী না হয়ে বিধাতার খেয়ালে এক শুষ্করুক্ষ ঋষির পর্ণকুটিরে এসে উঠলেন।

অহল্যাকে কি দোষ দেব? কোন এমন রমণী আছেন এই পৃথিবীতে, যিনি তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর রূপ এবং ব্যক্তিত্বের রসজ্ঞ পুরুষকে এতটুকুও প্রশ্রয় দেন না। বিশেষত যে রমণী হাজারো শাস্ত্রের হাজারো নিয়মে বাঁধা আছেন, সেই বাঁধনের ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে যদি অনিয়মের বাসন্তী হাওয়া একটুও প্রবেশ করে, তবে তাঁর অন্তরের বজ্র-আঁটুনি ফস্কা গেরোতে পরিণত হয়। অহল্যারও তাই হল। গৌতমের সজ্জাধারী দেবরাজকে অন্যায়-প্রার্থী জেনেও, তাকে ঠিক ঠিক চিনতে পেরেও তিনি সাড়া দিলেন দেবতার আহ্বানে। কেউ তো তাঁর রূপ-যৌবনের এবংবিধ কাম্যতার কথা, প্রার্থনীয়তার কথা এমন করে বলেনি। ফলে এক মুহূর্তেই অহল্যার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। গৌতম-গুরুর আর্য শুষ্কতার বিপরীতে দেবতার ভোগৈশ্বর্যময় মধুর মিলন না জানি কোন স্বর্গসুখ বয়ে আনবে, শুধু এই কৌতুহলেই ইন্দ্রকে চিনতে পেরেও, না জানার ভান করে মিলনে সম্মত হলেন অহল্যা।

ক্রৌঞ্চবিরহী কবি যিনি ক্রৌঞ্চমিথুনের একতমের বিনাশে, অধীর হয়ে আপন শোককে শ্লোকে পরিণত করেছিলেন, তিনিও অহল্যার অন্তর্গত হৃদয়ের প্রত্যাশাটুকু হৃদয়ঙ্গম না করেই লিখে দিলেন অহল্যার দুর্বুদ্ধি ঘটল, তিনি শুধু দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গত হওয়ার কুতুহলেই তাঁর আকাঙ্খিত মিলনে সঙ্গত হলেন— মতিংচকার দুর্মেধা দেবরাজকুতূহলাৎ।

দেবরাজের সঙ্গে মিলিত হবার পর অহল্যা যথার্থই খুশী হলেন। তাঁর শরীর মন সার্থক হয়ে উঠেছে যেন— কৃতার্থেনান্তরাত্মনা। এই ভাল লাগা বহমান হবার সময় ছিল না। মধুর মিলন সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই অহল্যার মন আতঙ্কিত হয়ে উঠল। গুরু গৌতম মধ্যাহ্ন স্নানে গেছেন, স্নানাহ্নিক শেষ হলেই ফিরে আসবেন তিনি। অতএব কাল বিলম্ব না করে বিনা ছলনায় প্রিয় মিলনের সুখ সম্পূর্ণ স্বীকার করেই অহল্যা বললেন আমারও অভীষ্ট সম্পূর্ণ হয়েছে, দেবরাজ! আমি কৃতার্থ বোধ করছি নিজেকে। কিন্তু আপনি এবার শীঘ্র এখান থেকে যাবার আয়োজন করুন— কৃতার্থাস্মি সুরশ্রেষ্ঠ গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ প্রভো।

অহল্যা ইন্দ্রকে আরও বললেন, আপনি আমাকেও বাঁচান, নিজেকেও বাঁচান। গৌতম-গুরুর ক্রোধ থেকে রক্ষা পাই দুজনেই। আপনি এখুনি চলে যান এখান থেকে আত্মানং মাঞ্চ দেবেশ সর্বথা রক্ষ গৌতমাৎ। ইন্দ্র প্রয়োজনের কথা বুঝলেন।

কিন্তু ইন্দ্রের যাত্রা শুভ হল না। মহর্ষি গৌতম স্নান করে ফিরছেন। ইন্দ্র ভয় পেলেন, বিষণ্ণও হলেন— দৃষ্ট্বা সুরপতিস্ত্রস্তো বিষণ্ণ বদনো' ভবৎ। মহর্ষি বুঝলেন— ইন্দ্র তাঁর বেশ ধারণ করে লঙ্ঘন করেছেন অহল্যার শরীর। তিনি অভিশাপ দিলেন ইন্দ্রকে। তাঁর কামনার ইন্দ্রিয়টিই খসে পড়ে গেল। ইন্দ্রকে অভিশাপ দিয়ে গৌতম এলেন অহল্যার কাছে। তাঁকেও শাপ দিয়ে বললেন— এই তপোবনে তুমি নিরাহারে বায়ুমাত্র ভক্ষণ করে সকলের অদৃশ্য হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে থাক বহু বছর ধরে— বাতভক্ষা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী। তারপর এই বনে যখন রাম নরচন্দ্রমা উপস্থিত হবেন, তখন শাপমুক্ত হয়ে পবিত্র হবে তুমি— তদা পূতা ভবিষ্যসি।

অহল্যার শাপমোচনের ব্যাপারে পরম পুরুষ রামচন্দ্রের এই আগমন-মন্ত্র শুনেই তো অনেকে বলেছেন যিনি নিজের জীবৎকালে ভগবত্তার স্বরূপে চিহ্নিত রামচন্দ্রের দর্শন পাবেন, তাঁর অসতীত্বের

মুক্তি হবে সেই ভগবত্তার জোরেই— এতে আর বেশি কথা কী? আমরা আজকের দিনের যুক্তিতে অবশ্য ব্যাপারটা এমন দৈবের ইঙ্গিতে দেখতে চাই না।

মূল রামায়ণে যেমনটি অহল্যাকে আমরা পাই তা অবশ্যই অনেক বাস্তবঘেঁষা এবং সমস্ত ঘটনাও এখানে ছলনাহীন নিষ্কপট। অহল্যা ইন্দ্রকে দেখে চিনেছেন, তাঁকে ভাল লেগেছে বলে তাঁর সঙ্গে মিলিতও হয়েছেন, আবার মিলনান্তে ধরা পড়বার আশঙ্কায় ইন্দ্রকে তিনি চলেও যেতে বলেছেন তাড়াতাড়ি। শেষ রক্ষা হয়নি যে, সে অহল্যার কপাল। কিন্তু অভিশাপের ঘটনাটা এখানে লক্ষ্য করবার মতো।

গৌতমের শাপের মধ্যে দুটি শব্দ লক্ষণীয়। এক, এই অভিশাপে অহল্যা আর মানুষের দৃষ্টিগোচর হবেন না। দ্বিতীয়ত, অহল্যাকে বায়ুমাত্র ভক্ষণ করে নিরাহারে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ভস্মশয্যা অথবা ধূলিশয্যায় শয়ন করে। এই ব্যাপারটাও খুব বাস্তব। স্বামী হিসেবে গৌতম যদি বুঝে থাকেন যে, অহল্যা অভীষ্ট পুরুষের আসঙ্গ কামনা করেছেন, অন্তত অন্যকৃত এই কামনায় তিনি বাধা দেননি, তাহলে ক্রোধ তো তাঁর হবেই। স্ত্রীর ওপরে কর্তব্যহীন অধিকারবোধই যেখানে পুরুষকে ক্রোধী করে, সেখানে গৌতম তো অন্তত ধর্মচারী বটে। তিনি সাংঘাতিক অভিশাপও কিছু দেননি। সমস্ত লোকের কাছে অদৃশ্য হয়ে ওঠাকে আমি কোনও 'ভ্যানিশ' হয়ে যাওয়া ম্যাজিক মনে করি না। বস্তুত যে ঘটনাটা ঘটেছে, তাতে লোকের কাছে আপাতত অহল্যার মুখ দেখাবার উপায় ছিল না এবং লক্ষ্য করে দেখুন, গৌতমও আর আশ্রমে না থেকে লোকচক্ষু থেকে উদ্ধার পাবার জন্যই আশ্রম ছেড়ে হিমালয়ে গেছেন।

কতটা নিরাহারে, কতটা বায়ুভক্ষণ করে অহল্যা দিন কাটিয়েছেন জানি না, তবে হ্যাঁ এটা মানি, অন্তত কাহিনীর নির্মোক ছাড়িয়ে বাস্তববোধে যা মনে হয়, তাতে অহল্যা আপন পর্ণকুটিরের মধ্যে মুখ লুকিয়েছেন লজ্জায়। ঘর থেকে প্রায় না বেরলেই তিনি লোকের কাছে অদৃশ্যই বটে। আর যথেষ্ট ব্রত উপবাস সংযমে তিনি দিন-দিন পূর্বঘটিত ঘটনার জন্য অনুতাপ করেছেন নিশ্চয়ই। গৌতম তাঁকে তপস্যা করতে বলেননি। বলেছেন তপ্যন্তী অর্থাৎ তাপ পেতে বলেছেন, অনুতাপ করতে বলেছেন। গৌতমের অনুশাসন এখানে রীতিমতো খ্রিষ্টীয়— এই অনুতাপে-অনুতাপে দিগ্ধ হয়েই অগ্নিশুদ্ধা হয়ে উঠেছেন অহল্যা। রামচন্দ্র হয়তো এই তপোবনে অবশ্যই এসেছিলেন। কিন্তু তারই দর্শনে তিনি পবিত্র হয়ে উঠলেন, তাঁকে অতিথিরূপে বরণ করেই অহল্যা মূর্তিমতী হলেন একথাটা রামচন্দ্রের দৈবসত্তার পক্ষে অনুকূল হতে পারে, কিন্তু মনে রাখা দরকার একথা রামচন্দ্রের পক্ষেও গৌরবজনক নয়। অহল্যার পক্ষেও এই ইন্দ্রজাল এমন কিছু মধুরতা সম্পাদক নয়।

রামচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে দেখুন, রামচন্দ্র ক্ষমাসুন্দর চক্ষে অহল্যার জীবনের দুর্ঘটনাটুকুকে জীবন সম্পর্কিত ক্ষণিক বিচ্যুতি হিসেবে মেনে নিয়েছিলেন বলেই অহল্যা তাঁর সামনে লোকলজ্জামুক্ত হয়ে বেরোতে পেরেছিলেন। মনে রাখা দরকার অহল্যাকে দেখামাত্র রামচন্দ্র সভ্রাতৃক তাঁর চরণ বন্দনা করেছিলেন— রাঘবৌ তু তদা তস্যাঃ পাদৌ জগৃহতুর্মুর্দা। একবারের তরেও রামচন্দ্রের মুখে অহল্যার পূর্বজীবনের ঘটনা পুনরুল্লিখিত হয়নি অথবা সেজন্য বলেননি কোনও সান্ত্বনাবাক্য বা করুণার কথা।

রামচন্দ্রের এই ক্ষমাসুন্দর আচরণের কথা মস্তকে ধারণ করেও বলি— অহল্যা শুদ্ধ হয়েছিলেন তাঁর নিজের প্রভাবেই। জীবনের যে মুহূর্তে ইন্দ্র তাঁর শরীর মনের অতিথি হয়ে এসেছিলেন, তাঁকে অস্বীকার করা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। এ ব্যাপারে তাঁর কোনও ছলনা নেই।

গৌতমের ক্রুদ্ধ অভিশাপ-বাণীতে সমাজের এই নিয়ম-নির্মমতা পদে পদে অনুভব করলেন অহল্যা। তাঁকে ফিরে যেতে হল নিয়ম-বদ্ধ পর্ণকুটিরের মধ্যে লোকচক্ষুর অন্তরালে। তারপর সারা জীবন বয়ে চলল— নিয়মে, যন্ত্রণায়, অনুতাপে। এইভাবেই একদিন স্থির হলেন অহল্যা।

এই স্থিরতার মধ্যেই তাঁর সতীত্ব প্রতিষ্ঠিত হল কিনা জানি না। কিন্তু একদিন আপন স্বাধীনতায় যে ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটেছিল, তার জন্য তিনি তাঁর রূপ এবং যৌবনকে সারা জীবনের জন্য বলি দিয়ে গেলেন, এই আত্মত্যাগের জন্যই তিনি প্রাতঃস্মরণীয়, রামচন্দ্রের দর্শন পাওয়া সেখানে গৌণ কথামাত্র।

মহাভারতের বনপর্বে দেখবেন— সেখানে অহল্যা-কুণ্ড তীর্থ বলে একটি হ্রদের নাম আছে। আধুনিক বিহারের দ্বারভাঙা জেলায় এই তীর্থটির অবস্থান বলে গবেষকদের ধারণা। পরম্পরাগত ধারণায় এইখানেই নাকি গৌতমের আশ্রম ছিল এবং এই আশ্রমেই দেবরাজ অহল্যার সতীত্ব কলুষিত করেছিলেন। এইখানে একটি পুরাতন কূপ আছে, যেটি মিথিলাধীশ রাজর্ষি জনক তৈরী করেছিলেন— জনকস্য তু রাজর্ষেঃ কূপস্ত্রিদশপূজিতঃ। পূর্বোক্ত অহল্যাকুণ্ডের ওপরেই একটি বৃক্ষের তলায় একটি বেদি আছে, যার নাম অহল্যাবেদি। এই বেদির অদূরেই দ্বারভাঙার মহারাজ একটি মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছেন। অহল্যাকুণ্ড থেকে তিন মাইল দূরেই গৌতমতীর্থ। আমাদের বিশ্বাস— গৌতম অহল্যাকে নিজের আশ্রমে ত্যাগ করে এসে এই জায়গাটাতেই বাসা বেঁধেছিলেন, হিমালয়ে নয়।

এবারে মেলানোর চেষ্টা করি। লক্ষ্য করে দেখুন, অহল্যা হ্রদের প্রসঙ্গে মহাভারতে অহল্যার সতীত্ব হানির কথা আছে, বিরল বেদিতে বসে তাঁর তপস্যার কথাও আছে, আছে অহল্যা হ্রদের মাহাত্ম্য ও, কিন্তু কোথাও রামচন্দ্রের আগমন কাহিনীব স্পর্শ নেই এখানে। অথচ জায়গাটা মিথিলায়।

অহল্যার তপস্যা বেদি রামায়ণ-মহাভারতের প্রামাণ্যে মিথিলাতেই যেখানে হবার কথা সেখানে অহল্যাকে টানাটানি করে আপন আপন প্রদেশে স্থাপন করবার জন্য কী রকম চেষ্টা করেছেন পৌরণিকেরা তা ভাবলে অবাক হবেন। মৎস্যপুরাণে দেখবেন অহল্যা তীর্থ নর্মদা নদীর তীরে। অহল্যা নাকি এইখানেই তপস্যা করে শাপমুক্ত হয়েছিলেন। আবার ব্রহ্মপুরাণের পৌরাণিকের মতে অহল্যার তপস্যাভূমি গোদাবরীর তীরে। অন্যদিকে শিবপুরাণ আর এক কাঠি ওপরে। এই পুরাণ মতে গোদাবরীর উত্তরাংশের নামই গৌতমীগঙ্গা। গৌতমী-গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়ে স্বরূপে ফিরে আসতে বলেন, অহল্যা যেখানে গৌতমী নদীতে মিলিত হন, সে জায়গাটার নামই অহল্যাতীর্থ বা অহল্যাসঙ্গম তীর্থ।

গৌতমী নদীর সঙ্গে মিলনের রূপকটুকু আমরা বুঝতে পারি। অর্থাৎ গৌতমের সঙ্গে পুনর্মিলনের ঘটনা। তার মানে ইন্দ্রের দ্বারা স্বেচ্ছায় লঙ্ঘিত হয়েও শেষ পর্যন্ত নিজের সংযম-নিয়মের ক্ষমতায় অহল্যা গৌতমের বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছিলেন বলেই অহল্যার জীবন ভারতবর্ষের সর্বত্র এত সম্মানিত এবং এত প্রচারিত। সতীত্ব লঙ্ঘনের ঘটনায় সে যুগে যেখানে চরম সামাজিক মূল্য দিতে হতো, সেখানে অহল্যা আপন ইচ্ছায় ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হয়েও পরে যেহেতু আবার গৌতমের পত্নীর মর্যাদা লাভ করতে পেরেছিলেন, তাঁর এই ক্ষমতাই তাঁকে প্রাতঃস্মরণীয়ার আসনে বসিয়েছে। অর্থাৎ অনর্থক সতীপনাও নয়, রামচন্দ্রের দর্শনও নয়, অহল্যা নিজের প্রভাবেই নিজে বিখ্যাত হয়েছিলেন এবং সে প্রভাব এতটাই যে তাঁকে মিথিলা থেকে টানাটানি করে নর্মদার আবাসিক করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আর একবার তাঁর আবাসস্থান নির্ণীত হচ্ছে গোদাবরীর তীরে।

(২)

কুন্তী

কুন্তী এবং দ্রৌপদীর সম্বন্ধে আমি অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করেছি, কিন্তু তাঁদের চরিত্রের দু-একটি বৈশিষ্ট্য এখানেও আলোচ্য হতে পারে। কুন্তীর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে— আপাতদৃষ্টিতে তাঁর

অনেক দোষ। কন্যা অবস্থাতেই তিনি সূর্যদেবতার সঙ্গমে পুত্রলাভ করেছিলেন এবং কন্যাবস্থার এই কলঙ্ক মোচনের জন্য তিনি সে পুত্রকে বিসর্জনও দিয়েছিলেন। এরপরে সম্পূর্ণ যৌবনবতী অবস্থায় হস্তিনাধিপতি পাণ্ডুর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হল। প্রথমে জানাই এই ঘটনাকে তৎকালীন সামাজিক নিয়মে কোনও দোষ বলেই গণ্য করা যায় না। কেন না, তৎকালীন নিয়মে কন্যা অবস্থায় জাত কানীন পুত্র সমাজ-স্বীকৃত পুত্র ছিল এবং অনেক কুমারী রমণীই সময়কালে তাঁর পূর্বাবস্থায় জাত কানীন পুত্রকে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠাও দিয়েছেন আপন অসহায়তা স্বীকার করে—যেমন সত্যবতী ব্যাসকে। কুন্তী যে একথা পরে স্বীকার করেননি সে তাঁর আপন রুচি, অসহায়তা এবং লজ্জার কারণে। এজন্য তাঁকে দোষও দেওয়া যায় না, কেন না প্রত্যেক স্ত্রীলোকের বিবাহ-পরবর্তী অবস্থা স্বতো বিভিন্ন।

তবুও কুন্তীর অবস্থা বিচার করুন। তাঁর স্বামী বেঁচে আছেন অথচ তাঁর পুত্রোৎপত্তিরও ক্ষমতা নেই। মহারাজ পাণ্ডু তাঁর কাছে কম প্রিয় ছিলেন না। তাঁর ইচ্ছামতো রাজ্যের সমৃদ্ধ সুখ বিলাস ছেড়ে তিনি বনবাসী হয়েছিলেন তাঁরই সঙ্গে। সর্বশেষে যখন বোঝা গেল পাণ্ডুর পুত্রোৎপত্তির ক্ষমতা নেই, তখন যদি তিনি তাঁর কানীন পুত্রের কথা ব্যক্ত করতেন, তাহলে পুরুষত্বহীন পাণ্ডু কি খুব খুশী হতেন মনে মনে। কাজেই কুন্তী তাঁর পুত্রের কথা না বলে এবং স্বামীর মনে ব্যথা না দিয়ে একভাবে স্বামীর কাছে বিশ্বস্তই থেকেছেন। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন, তবে অন্য কোনও অর্থে হলেও আমি একে সতীত্ব বলতে রাজি আছি।

দ্বিতীয় কথা বলি। পুত্রোৎপত্তির ক্ষমতা কুন্তীর নিজের হাতেই ছিল। তিনি স্বাধীনোপায়া। দুর্বাসার মন্ত্রবলে যদি বিশ্বাস থাকে, তাহলে পুত্রজন্মের জন্য পাণ্ডুর অপেক্ষা ছিল না তাঁর। কিন্তু কুন্তী তাঁর এই স্বাধীন ক্ষমতার কথা পাণ্ডুকে কোনওদিন বলেননি। এখানেও তিনি স্বামীকে অতিক্রম না করে পরম বিশ্বস্ত থেকেছেন স্বামীর কাছে। আমি এটাকেও সতীত্ব বলতে রাজি আছি। তৃতীয়ত, পাণ্ডু যখন পরলোকে এবং ইহলোকে অপুত্রক ব্যক্তির দুঃখ চিন্তা করে পুত্রলাভের জন্য প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে কুন্তীকে নিয়োগ প্রথার আশ্রয় নিতে বললেন, তখন কুন্তী তাঁর পুত্রলাভের দৈব ক্ষমতার কথা জানিয়েছেন লোকোত্তর পুত্রলাভের আশায়। পাণ্ডুর আদেশ এবং নিয়োগ অনুসারেই একে একে তথাকথিত ধর্ম, বায়ু এবং ইন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রথমে যুধিষ্ঠির, তারপর ভীম, এবং তারপরে অর্জুনকে পুত্ররূপে লাভ করেন।

ঘটনা হল— পাণ্ডু যখন যুধিষ্ঠিরকে লাভ করলেন, তখনই তাঁর পুত্রৈষণা বন্ধ হওয়া উচিত ছিল। কেন না প্রথম পুত্রলাভের সঙ্গে সঙ্গেই তৎকালীন সমাজের নিয়মে তাঁর ধর্মলাভও ঘটেছে। অন্যদিকে বাৎসল্যের তৃপ্তি।

নিজের সম্মান এবং পুত্রলাভে পিতা-মাতার আর যত বোধই সমৃদ্ধ হতে পারে, সবই অর্থ যুক্ত হয়ে ওঠা উচিত ছিল তাঁর প্রথম ধর্মজ পুত্রের জন্ম হওয়ার পরেই। পাণ্ডু কিন্তু এখানেই থেমে থাকেননি। তিনি বলশালী পুত্রলাভ করবার জন্য পুনরায় কুন্তীকে নিয়োগ করেন বায়ুদেবতার সঙ্গে সঙ্গম প্রার্থনা করে। ভীম জন্মালেন। কিন্তু পাণ্ডু বিরত হলেন না। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের সমান পুত্রলাভের জন্য ইন্দ্রকে আহ্বান করতে বললেন কুন্তীকে। কুন্তী বাধা দেননি, কেন না পাণ্ডু আদেশ করছেন তাঁকে। পুত্রোৎপত্তির ক্ষমতাহীন স্বামীর প্রতি হয়তো তাঁর এই মমতাটুকুও ছিল যে, একটি বা দুটিমাত্র পুত্রলাভে পাণ্ডুর পিতার হৃদয় তৃপ্ত হয়নি হয়তো। কিন্তু তৃতীয় পাণ্ডব জন্মানোর পরে পাণ্ডু যখন চতুর্থ পুত্র লাভের জন্য পীড়াপীড়ি করছেন, তখন কুন্তী বাধা দিয়ে বলেছিলেন মহারাজ। পুত্র না থাকায় আমাদের আপৎকাল উপস্থিত হয়েছিল। সেই আপৎকালে আপনার সম্মতি অনুসারে দেবপুরুষের সংসর্গে আমাদের পুত্রলাভ হয়েছে। কিন্তু আপৎকালেও এইভাবে অন্য পুরুষের সংসর্গে

তিনটি পুত্র উৎপাদনের পরেও আবার চতুর্থবার অন্য পুরুষের সংসর্গ করলে তো লোকে আমাকে স্বৈরিণী বলবে। আর আপনার যা মনের অবস্থা দেখছি, তার পরে পঞ্চমবার যখন আপনি পুনরায় দেবসঙ্গমে নিযুক্ত করবেন, তখন তো বেশ্যার মধ্যে গণ্য হব আমি— অতঃপরং স্বৈরিণী স্যাৎ পঞ্চমে বন্ধকী ভবেৎ।

কুন্তীর বক্তব্য শুনে বোঝা যায়— প্রজননশক্তিহীন এক অসহায় স্বামীর পুত্র কামনা মেটানোর জন্য কুন্তী স্বামীর ইচ্ছায় এবং স্বামীরই নির্বাচন অনুযায়ী তিনজন দেবপুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছেন। এখানে তাঁর কোনও কর্তৃত্ব নেই, পাণ্ডু এখানে প্রয়োজক বা নিয়োজক কর্তা। পাণ্ডু তিনজন নিয়োগজাত পুত্রলাভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই কুন্তী বাধা দিয়েছেন, এবং তাঁর আদেশও অমান্য করেছেন। এর পরেও কী করে এই অসতীত্বের প্রশ্ন তোলা যায়? প্রজননশক্তি নেই জেনেও পাণ্ডুকে তিনি নিজের ক্ষমতার কথা বলেন এবং পাণ্ডুর কাছে তাঁর প্রথম সপ্রেম বক্তব্য ছিল—আমি শুধু তোমার ধর্মপত্নী নই, আমি তোমাকে ভালবাসি—ধর্মপত্নীমভিরতাং ত্বয়ি রাজীবলোচন। ধর্ম অনুসারে তুমি আমার গর্ভে বীর পুত্রের জন্ম দেবে। সেই বীর পুত্রের জন্য শুধু তোমার সঙ্গেই মিলন হবে আমার। তুমি ছাড়া অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে আমার শারীরিক মিলন হচ্ছে—সে যে আমি মনে-মনেও ভাবতে পারি না—ন হ্যহং মনসাপ্যন্যং গচ্ছেয়ং তদৃতে নরম্।

এই যাঁর একান্ত মনের অবস্থা, তাঁকে যখন সমাজের চলতি নিয়মে স্বামীরই নিয়োগ অনুসারে অন্য পুরুষের কণ্ঠলগ্না হতে হয়, তাঁক অসতী বলব নাকি প্রাতঃস্মরণীয়া বলব? আরও একটা ব্যাপার দেখুন, কুন্তী বাপের বাড়িতেও সুখী হননি, শ্বশুর বাড়িতেও নয়। বাপের বাড়িতে শৈশবেই তাঁকে দত্তক দেওয়া হয়েছিল অন্যের হাতে। সেখানে যত সুখই থাক, তবু কুন্তীভোজ তাঁর নিজের পিতা ছিলেন না—এ দুঃখ তাঁর ছিলই। এদিকে যাঁর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হল, তিনি যত ভালমানুষই হোন, কতটুকু সময় তিনি সুখ দিলেন কুন্তীকে? বিয়ের কিছুদিনের মধ্যে তিনি দিগ্‌বিজয়ে বেরোলেন, তারপর দিগ্‌বিজয় সেরে কিছুদিন হস্তিনাপুরে থেকে তিনি স্বেচ্ছায় রাজ্যসুখ ছেড়ে চলে গেলেন বনে, পাহাড়ে পদচারী হয়ে। কুন্তীর কপালে কী জুটল? কিছুদিন মাত্র হস্তিনাপুরের রানী, তারপরেই পাণ্ডুর সঙ্গে পদচারিণী। তিন-তিনটে ছেলে হল এবং তারপরেই স্বামী মারা গেলেন। নিজের তিনটি এবং মাদ্রীর ছেলে দুটিকে নিয়ে কুন্তী ফিরলেন হস্তিনায়। ভাসুর ধৃতরাষ্ট্রের বাড়িতে তিনি রাজরাণীর মর্যাদায় থাকেননি। পদে পদে শত্রুতা আর অত্যাচার বহন করতে করতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সমস্ত শত্রুতার অন্ত ঘটেছে অনিবার্য ধ্বংসে। এই ধ্বংসের পর যুধিষ্ঠির রাজা হয়েছেন হস্তিনাপুরে। কিন্তু কুন্তী রাজমাতার আসনে বসে সুখভোগ করেননি। তিনি আত্ম নিয়োগ করেছেন ধৃতরাষ্ট্রের পত্নী গান্ধারীর সেবায়।

ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীকে এগিয়ে দিতে এসে তিনি এক কথায় বনে চলে এলেন। কারণ একটাই—শ্বশুর সমান ধৃতরাষ্ট্র আর শাশুড়ি-সমানা গান্ধারীর সেবা করে জীবন কাটিয়ে দেবেন তিনি—শ্বশ্রূশ্বশুরয়োঃ পাদান্ শুশ্রূষন্তী সদা বনে। যুধিষ্ঠির কত কেঁদেছিলেন সেদিন। ভীম-অর্জুন কত বলেছিলেন— পুনরুদ্ধৃত সমৃদ্ধ রাজ্যের ভোগসুখের কথা। কুন্তী সেদিন দ্বিগুণ গর্ব ভরে স্বামীর উদাহরণ দিয়ে পুত্রদের বলেছিলেন— রাজসুখ আমি অনেক ভোগ করেছি, পুত্র! আমার স্বামীর যখন সুখের দিন ছিল, তখন রাজরাণী হয়ে প্রচুর সমৃদ্ধি ভোগ করেছি আমি— ভুক্তং রাজ্যফলং পুত্র ভর্তুর্মে বিপুলং পুরা। আমার স্বাচ্ছন্দ্য স্বাধীনতার কোন বাধা ছিল না, একসঙ্গে অনেক বছর যথাবিধি সোমপান করেছি তাঁর সঙ্গে। আর আমার কী প্রাপ্য থাকতে পারে?

জীবনের শেষভাগে এসেও স্বামীর সম্বন্ধে এই সগর্ব-স্মরণ-মনন, তথা শ্বশুর-সমান ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা—এগুলি কুন্তীর চরিত্রের এমন কতগুলি বৈশিষ্ট্য যাতে করে কবে, কখন, কোন

যান্ত্রিকতায় তিনি দেবতা-পুরুষের সঙ্গমে তিনটি পুত্রলাভ করেছিলেন এবং এতে তাঁর চরিত্র খণ্ডিত হয়েছিল কিনা এ-কথা কখনও মনেও আসে না। মনে রাখা দরকার, পুরুষের নাম-শ্রবণেও যাঁদের সতীত্ব খণ্ডিত হয় কুন্তী সেই ধরনের সতী নন, সেই সতীত্ব তাঁর আদর্শও নয়। কিন্তু স্বামীর আদেশে অন্য পুরুষের কণ্ঠলগ্নতার কর্মকে যিনি সামান্য যান্ত্রিকতায় পরিণত করতে পারেন, তিনি এতটাই বড় মাপের মানুষ যাঁকে প্রাতঃস্মরণ করতে হয় সীতা-সাবিত্রীকে অতিক্রম করে।

(৩)

দ্রৌপদী

সতীত্বের এই 'ডিফারেন্ট স্ট্যানডার্ড' যেমন কুন্তীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনই আর এক পৃথক ধরনের সতীত্বের মর্যাদা প্রযোজ্য হবে দ্রৌপদী সম্বন্ধেও। আপনারা ভাল করেই জানেন যে, দ্রৌপদী সাধ করে স্বেচ্ছায় পঞ্চস্বামী বরণ করে নেননি। তাঁর ভাগ্যে-দুর্ভাগ্যে অথবা সৌভাগ্যে পঞ্চস্বামী চেপে বসেছিল তাঁর ঘাড়ের ওপর। স্ত্রীরত্ন ভাগ করে নেওয়া নিয়ে ভীম এবং কুন্তীর মধ্যে যে কথা হয়েছিল সেই কথার গুরুত্ব যতই থাক, মাতৃআজ্ঞা রক্ষা করার জন্য যুধিষ্ঠিরের আকুলতার প্রবন্ধটুকুও না হয় এ বাবদে বিশ্বাস করা গেল, কিন্তু পঞ্চস্বামীর সরসতা দ্রৌপদীর জীবনে নেমে আসার পিছনে প্রধান যে যুক্তি যুধিষ্ঠিরের দুর্ভাবনাতেই প্রকাশ পেয়েছে তা হল— দ্রৌপদীর মতো এক অসাধারণ রমণীর কারণে ভাইদের মধ্যে যাতে বিভেদ সৃষ্টি না হয়, সেই কারণেই পাঁচ ভাইয়ে মিলে দ্রৌপদীকে বিবাহ করা ঠিক করলেন। তাহলে এটা অন্তত বোঝা গেল যে, দ্রৌপদীর দিক থেকে যেভাবে এক-পতিত্ব লঙ্ঘিত হয়েছে, তার কারণ অন্তত দ্রৌপদী নন। দ্রৌপদী তো বিবাহের জন্য তাঁর পবম ঈপ্সিত লক্ষ্যভেত্তা পুরুষ অর্জুনকেই বেছে নিযেছিলেন, কিন্তু তাঁর ভাগ্যচক্রে পঞ্চস্বামীব মোহন চক্র আঁকা ছিল পূর্বাহ্নেই, কাজেই তাঁর আপন ইচ্ছা লঙ্ঘিত হলেও সতীত্ব লঙ্ঘিত হয়েছে একথা কোনওভাবেই বলা যায় না।

তবু একক স্ত্রীর পঞ্চস্বামী এমনই এক মুখরোচক আলাপন সৃষ্টি করে যে, আজকের দিনেও তাঁর চরিত্রের ওপর টিপ্পনী জোটে একইভাবে—যেমনটি কর্ণ কোথাও বলেছিলেন। কর্ণ বলেছিলেন— একটা ছেড়ে পাঁচটা স্বামী যার আছে সে মেয়েমানুষ বেশ্যা ছাড়া আর কী— বন্ধকীতি বিনিশ্চিতা। আমরা কর্ণের বিকার বুঝতে পারি এবং সে বিকারের কারণও আছে। কিন্তু নিয়তির মতো যে পঞ্চস্বামী দ্রৌপদীর এক পঞ্চমাংশ ভালবাসা পাবার জন্য নিজেদের মধ্যে স্বীকৃত এবং পর্যায়বদ্ধ হয়েছিলেন, সেখানে কাকে দোষ দেব—তাঁর পঞ্চস্বামীকে, না দ্রৌপদীকে? তাঁর এই পঞ্চস্বামী ভোগের জন্যই বা কোন অসতীত্বের লক্ষণ দেখতে পাব তাঁর শরীরে?

এক স্বামীর ভোগ-পর্যায়ের পর দ্রৌপদীর কুমারিত্ব ফিরে আসত— এই অলৌকিক তথা মহাকাব্যিক অভিসন্ধি না হয় বিশ্বাস করলাম না। কিন্তু এই পঞ্চস্বামী থাকা সত্ত্বেও দ্রৌপদী কী করে প্রাতঃস্মরণীয়ার মর্যাদাভুক্ত হলেন, তাঁর 'সসি' উত্তর একটাই আছে—পঞ্চস্বামীকে 'ট্যাকল' করার অসাধারণ শক্তি দ্রৌপদীর ছিল। বস্তুত দ্রৌপদীর এই শক্তি নিয়ে তাঁর নিজের কালের মানুষও তাঁর সঙ্গে রসিকতা করেছেন নিশ্চয়। স্বয়ং কৃষ্ণপ্রেয়সী সত্যভামা অরণ্যপর্বে বনবাসী যুধিষ্ঠিরের ঘরে এসে দ্রৌপদীকে দেখেছিলেন। দেখেছিলেন— তাঁর আরণ্যক সংসারেও পাঁচ স্বামীর নয়নের মণি হয়ে আছেন দ্রৌপদী।

আসলে দ্রৌপদী যেটা বিনয় করে বলেননি, সেটা হল তাঁর বৈদগ্ধের কথা, যা তাঁকে তাঁর পঞ্চস্বামীর মনোলোকের ভিতরে পৌঁছে দিয়েছে। ব্যক্তি জীবনে হাজার হাজার স্বামী এবং স্ত্রী মধ্যে যা

দেখতে পাই, তা হল— তাঁরা স্বামী কিংবা স্ত্রীর জন্য অনেক করেন— কেউ পরিশ্রম করেন, কেউ বা একে অন্যের বাহ্যিক তৃপ্তির জন্য অনেক অর্থব্যয় করেন, কিন্তু স্বামীও বোঝেন না কিসে স্বামীর মানসিক তৃপ্তি হয়। দ্রৌপদীর স্বামী একটি নয় পাঁচটি। সাধারণ স্ত্রীলোকেরা যেখানে একক স্বামীরই মনের গভীরে প্রবেশ করতে পারেন না, সেখানে দ্রৌপদী তাঁর পঞ্চস্বামীর অন্তরের গভীরে প্রবেশ করে ছিলেন আপন বিদগ্ধতায়।

পঞ্চস্বামীর চরিত্র সমধর্মী নয়। পাঁচ জনের চরিত্র পাঁচরকম। যুধিষ্ঠিরের ভাবনা এবং ব্যবহারের সঙ্গে ভীমের মানসিকতা এবং ব্যবহার এতটাই পৃথক যে দু-জনের মনের ভিতরে দ্রৌপদীকে প্রবেশ করতে হয়েছে দুরকমভাবে। আবার অন্যদিকে ভীমের সঙ্গে অর্জুনের অথবা অর্জুনের সঙ্গে সহদেবের ভাবনালোক এতই বিপ্রতীপ এবং বিষম যে, অতিপৃথকভাবে তাঁদের মনের শুশ্রুষা না করতে পারলে তাঁরাও অতিপৃথকভাবে দ্রৌপদীকে আপন আপন প্রিয়তমা পত্নী বলে মনে করতেন না।

বিবাহের পর দ্রৌপদী যখন পঞ্চস্বামীর একতমা পত্নী হলেন, তখন তাঁর সম্বন্ধে কবি মন্তব্য করেছিলেন— কৃষ্ণা দ্রৌপদী তাঁর সব স্বামীর বশবর্তিনী হবেন— বভূব কৃষ্ণা সর্বেযাং পার্থানাং বশবর্তিনী। কিন্তু স্ত্রীরা যেখানে একক স্বামীরই বশবর্তী হতে পারেন না, সেখানে কোন মন্ত্রগুণে দ্রৌপদী পঞ্চস্বামীর বশবর্তিনী হলেন। সাধে কি আর সত্যভামা প্রশ্ন করেছিলেন— তুমি ওষুধ করেছ নাকি স্বামীদের। আসলে সারা মহাভারত জুড়ে দেখেছি— যুধিষ্ঠিরের মতের সঙ্গে দ্রৌপদীর মত মেলেনি। চিরকাল তিনি তাঁর এই সত্ত্বগুণশালী ধর্মবুদ্ধি স্বামীটিকে উত্তেজনা এবং প্রতিহিংসার মন্ত্রে মন্ত্রিত করেছেন, এমনকি দরকারে গালাগালিও কম দেননি, কিন্তু চরম জায়গায় এসে তিনি যুধিষ্ঠিরকে অতিক্রমও করেননি অথবা করতে পারেননি। ঠিক এই কারণে যুধিষ্ঠিরকেও এক সময়ে বলতে হয়েছে দ্রৌপদী আমাদের মায়ের মতো প্রতিপালনীয়া— মাতেব পরিপাল্যা চ।

অন্যদিকে ভীমের মধ্যে যে তেজস্বিতা ছিল, দম্ভ ছিল, জীবনের বিচিত্র ক্ষেত্রে সেগুলিকে এমনভাবে ব্যবহার করেছেন দ্রৌপদী যে, ভীম নিজেকেই চিরকাল দ্রৌপদীর প্রেমমালঞ্চের একান্ত মালাকার ভেবে এসেছেন। মুখে বলেছেন— আমিই তোমাকে চিরকাল সমস্ত কর্মে সহায়তা করেছি, আমিই তো তোমার সবচেয়ে বিশ্বাসী মানুষ— অহমেব হি তে কৃষ্ণে বিশ্বাস্যঃ সর্বকর্মসু। ভাবটা এই— নতুন কোনও কর্ম দেহ অকর্মণ্য দাসে। অন্যদিকে অর্জুনের সঙ্গে দ্রৌপদীর ব্যবহার একবারে বিদগ্ধা নায়িকার মতো। প্রথম দর্শনে অর্জুনকে বরমাল্য দেওয়ার পর পঞ্চস্বামীর চক্র সৃষ্টি হওয়ায় দ্রৌপদীর সঙ্গে অর্জুনের ব্যবহারে একটা সংকোচ এসেছিল। সারাটি জীবন ধরে সেই সংকোচ-কন্টকিত ব্যবহার সযত্নে বাঁচিয়ে রেখেও অর্জুনের সঙ্গে এমনই একটা নান্দনিক দূরত্ব রেখে চলেছেন দ্রৌপদী, যাতে শেষ পর্যন্ত অর্জুনই দ্রৌপদীর প্রিয়তম নায়ক হয়ে ওঠেন। শেষমেশ নকুল, সহদেবের সঙ্গে দ্রৌপদী ব্যবহারের কথাটুকুও আসে। এই দুই ছোট্ট স্বামীর কাছে দ্রৌপদী যতখানি নায়িকা, তার থেকে অনেক বেশি মায়াময়ী অভিভাবিকা। অন্তত সহদেবকে তিনি এমনভাবে দেখতেন, যে ব্যবহারের সঙ্গে জননী কুন্তীর স্নেহ-মমতা মিলে যায়।

ঠিক এখানেই দ্রৌপদী অন্য সকলের চেয়ে ব্যতিক্রমী। পাঁচ পাঁচটি স্বামী থাকা সত্ত্বেও প্রত্যেকের সঙ্গে দ্রৌপদীর ব্যবহার পৃথক, অথচ প্রত্যেক স্বামীই দ্রৌপদীর সম্বন্ধে নিজেকে নায়ক ভাবেন এবং এক জায়গায় এই নায়কত্ব সম্বন্ধে প্রত্যেকের মনে আবার সংশয়ও আছে। একই সঙ্গে পঞ্চস্বামীর মনোলোকের গতিবিধি বুঝে নিজেকে যিনি মহাভারতের সর্বোত্তমা ব্যক্তিত্বময়ী নায়িকা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন, তাঁর ব্যাপারে চিরাচরিত এবং প্রথাসিদ্ধ সতীত্বের প্রশ্ন আসে না। প্রশ্ন আসে

প্রাতঃস্মরণীয়া হয়ে ওঠার— যেখানে সতীত্বের চেয়ে দ্রৌপদীর ব্যক্তিত্বই প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে ওঠে। এ-সব কথা আমি অন্যত্র বিস্তারিতভাবে লিখেছি।

(৪)

তারা

প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যার তালিকায় যখন তারার নাম দেখি, তখন বড় অবাক লেগেছিল। পরে ভেবে দেখেছি এই পঞ্চকন্যার এক-একজন এক-এক কারণে প্রাতঃস্মরণীয়া হয়েছেন এবং তা হয়েছেন নিজস্ব চরিত্রগুণেই, এর মধ্যে তথাকথিত লোকপূজিত সতীত্বের ভাবনাটুকুও আসে না। বালীর সঙ্গে তারার যখন বিয়ে হয়েছিল, তখন বালী কিষ্কিন্ধ্যা রাজ্যের রাজা। বালীর মতো বীর তখন দুনিয়ায় ছিল না, কাজেই এই বীর স্বামীকে প্রণয়ী হিসেবে লাভ করে সুন্দরী তারা যে যথেষ্ট গর্বিত এবং মুগ্ধ হয়েছিলেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু যেদিন থেকে বধূ হিসেবে তিনি বালীর গৃহে প্রবেশ করেন, সেদিন থেকে বালী ছাড়াও অন্য আরও অনেকের কাছে হয়তো কাম্য হয়ে উঠেছিলেন তিনি। এর কারণ হয়তো তাঁর অতুলনীয় রূপ এবং বিদগ্ধতা, বানরদের ঘরে এই রূপ এবং বিদগ্ধতা হয়তো একত্রে মিলত না।

প্রথম জীবনে স্বামীর সুখে ভালোই ছিলেন তারা। অমন বীর স্বামী তাঁর। দুনিয়ার দৈত্য দানব, যক্ষ-রাক্ষস সবাই তাঁকে ভয় পায়। বালীর শরীরে ক্লান্তি বলে কোনও জিনিস নেই। সূর্য ওঠার আগেই তিনি সমুদ্রান্তা পৃথিবী পরিক্রমা করেন, পাহাড়ের চূড়ায় উঠে পাহাড় নিয়ে লোফালুফি করেন। বিয়ের পর-পরই বালী দুন্দুভি নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত দৈত্যকে আছাড় দিয়ে মেরে ফেলেছিলেন। স্বামীর বীরপনায় তারার মন যেমন আপ্লুত ছিল, তেমনই তারার এতটুকু বেদনাও বালী সইতেন না। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর এমন নিষ্কলুষ দাম্পত্য জীবনের মধ্যে তারাকে নিয়ে বালীর নিশ্চিন্ততা ছিল না। তার কারণ তারা নিজেই। তাঁর সৌন্দর্য এবং ব্যক্তিত্বে মোহিত ছিলেন অনেকেই।

প্রথম মুগ্ধ ব্যক্তিটির নাম অবশ্যই সুগ্রীব, বালীর ছোট ভাই। বালীর বীরপনাকে ভয় পেতেন বলেই হোক, অথবা অন্য কোন কারণেই হোক তাঁর এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূটির প্রতি সুগ্রীব তাঁর মুগ্ধতাটুকু কখনই সোচ্চারে প্রকাশ করেননি বটে, কিন্তু নিজের স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তারার ব্যাপারে সুগ্রীবের যে দুর্বলতা কিছু ছিল, নানা ঘটনার তা প্রমাণিত হয়ে ওঠে। হয়তো তারাও এই দুর্বলতার কথা জানতেন, তবে তিনি বড়ই বুদ্ধিমতী। সুগ্রীবের দুর্বলতা তিনি নিজের অনুকূলে ব্যবহার করেছেন ঠিক সময়মতো এবং সুযোগমতো। তবে সুগ্রীব যে তারার সান্নিধ্য লাভ করার প্রথম সুযোগটি পেলেন, সে সুযোগ তাঁর নিজের সৃষ্টি নয়, সে সুযোগ দৈবক্রমে এসেছিল এবং সেই দৈবের মধ্যেও কিন্তু তারারই সৌন্দর্যের প্রচার দেখতে পাচ্ছি।

এমন হতে পারত— বালী দুন্দুভি নামে যে অসুরটিকে মেরে ফেলেছিলেন, সেই অসুরের ছেলের মনে প্রতিহিংসার আগুন থাকার কথা ছিল। অসুর দুন্দুভির ছেলের নাম মায়াবী— এমন হতে পারত, মায়াবী অসুর তার পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য বালীর সঙ্গে যুদ্ধে এসেছে। কিন্তু তা হয়নি। মায়াবী অসুর বালীর স্ত্রী তারাকে দেখেছিল এবং পিতৃহত্যার আক্রোশ নয়, তারাকে আপন অধিকারে লাভ করার জন্যই সে বালীর সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ করল— তেন তস্য মহদ্‌বৈরং বালিনঃ স্ত্রীকৃতং পুরা। বালীর মতো ত্রিভুবনজয়ী বীরের সঙ্গে যুদ্ধে জিতে তাঁর স্ত্রীকে হরণ করে নিয়ে যাওয়া অত সহজ কথা নয়। অতএব অসুর মায়াবী রাতের অন্ধকারে কিষ্কিন্ধ্যায় এল বটে, কিন্তু চোরের মতো তারাকে সে চুরি করে নিয়ে যেতে চাইল না। হয়তো তারার জন্য বীরত্ব প্রকাশ করার মধ্যেই সে জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছিল।

রাতের অন্ধকারে ঘুমের সময় যে ব্যক্তি দরজায় দাঁড়িয়ে কড়া নেড়ে যুদ্ধ করবে বলে চেঁচাচ্ছে, তাঁর ওপর রাগ হওয়াই স্বাভাবিক। বালী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বেরোলেন। সুগ্রীব তাঁকে বারণ করলেন। বালীর অন্তঃপুরশায়িনী অন্যান্য স্ত্রীরাও বালীকে বারণ করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা বারণ করলেন না। নিজের সৌন্দর্য এবং ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে তিনি বোধহয় একটু বেশি আত্মসচেতন ছিলেন, ফলে তাঁকে নিয়ে যখনই এই ধরনের কলহের সৃষ্টি হয়েছে, তিনি অদ্ভুত নির্বিকার সেই সব জায়গায়।

যাই হোক, বালী অসুর মায়াবীর পিছনে ধাওয়া করলেন ক্রুদ্ধ হয়ে। দাদার সঙ্গে যাওয়া কর্তব্য মনে করে সুগ্রীবও গেলেন বালীর সঙ্গে সঙ্গে। দুই মহাবীরকে একত্রে ধেয়ে আসতে দেখে মায়াবী এবার পালাতে আরম্ভ করল এবং বাঁচবার জন্য একটি গর্তে বা গুহায় ঢুকে পড়ল। শত্রুর শেষ করার জন্য বালী সুগ্রীবকে গর্তের বাহিরে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে ঢুকে পড়লেন গর্তের মধ্যে। তিনি সুগ্রীবকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে গেলেন— যতদিন শত্রুকে নিহত না করে তিনি ফেরেন, ততদিন যেন সুগ্রীব দাঁড়িয়ে পাহারা দেন গর্তের মুখে। বালীর কথামতো সুগ্রীব দাঁড়িয়েই রইলেন। দিন যায়, মাস যায় শেষে একটা গোটা বছর কেটে গেল। স্বাভাবিকভাবেই সুগ্রীবের ধারণা হল— বালী মারা গেছেন। অপেক্ষার শেষকালে গর্তের ভিতর অসুরের চিৎকার-শব্দ এবং গর্তের মুখে চাপ চাপ রক্ত এসে পড়ায় সুগ্রীবরে ধারণা আরও দৃঢ় হল। সুগ্রীব কী মনে করে গর্তের মুখে একটি বিরাট পাথর চাপা দিয়ে ফিরে এলেন কিষ্কিন্ধ্যায়।

সুগ্রীব ভবিষ্যতে রামচন্দ্রের কাছে এই ঘটনা বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, কতগুলি ঘটনা এবং দুর্ঘটনার ক্রম তাঁর অন্তরে একটি বিশেষ তর্কপন্থা তৈরি করে দিয়েছিল এবং প্রায় নিরুপায় হয়েই তিনি বালীর মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু সাধারণে এই প্রশ্ন তুলবেই যে, কেন তিনি গুহার ভিতরে প্রবেশ করে দেখলেন না? তিনি কি ভীত ছিলেন?

সুগ্রীব রামচন্দ্রকে সবিনয়ে বলেছেন— তিনি কিষ্কিন্ধ্যার রাজা হতে চাননি। মন্ত্রী-অমাত্যেরা প্রায় লুক্কায়িত সুগ্রীবকে জোর করে কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে বসিয়েছেন। হতেই পারে এবং এটা আমরা মেনে নিতেও রাজি আছে। কিন্তু কোথায় তিনি লুক্কায়িত ছিলেন? আসলে যে কথা সুগ্রীব রামচন্দ্রকে বলতে পারেননি বা বলেননি— তা হল, ভ্রাতৃবধূ তারার কথা।

শুদ্ধ আদি কবি সেইসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা স্বকণ্ঠে উচ্চারণ করতে পারেননি। কিন্তু প্রস্ফুটিত পুষ্পের দূরগন্ধ ইতস্তত ভ্রমণকারী সুগ্রীবের মন জুড়ে ছিল। অতএব বালীর মৃত্যু সম্বন্ধে সুগ্রীব স্বানুকূল তর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেই কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে এসে সিংহাসন অধিগ্রহণ করার আগে তারার হৃদয় অধিকার করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

অন্যদিকে সুন্দরী তারার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। বালীর মৃত্যুর পর নির্দ্বিধায় নিশ্চিন্তে তিনি সুগ্রীবের কণ্ঠলগ্না হয়েছেন এবং এখানে তারার মোহিনী শক্তি ছিল এতটাই যে, হয়তো অরাজক জনপদের সুরক্ষার জন্য তারাগৃহে শৃঙ্গার মত্ত সুগ্রীবকে জোর করে রাজা করে দিয়েছেন কিষ্কিন্ধ্যার মন্ত্রী-অমাত্যেরা। তারার সঙ্গে সুগ্রীবের এই নিঃশব্দ মিলন একদিনেই পরিণতি লাভ করেছে বলে আমরা মনে করি না।

পরবর্তী সময়ে রামচন্দ্রের কাছে নিজের ভ্রমণজাত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করার সময় সুগ্রীব কিন্তু বলে ফেলেছেন যে, বালী গুহায় আটকে থাকার সময় তিনি রুমার সঙ্গে তারাকেও ভোগ করেছেন। বাল্মীকি কিন্তু সলজ্জে সুগ্রীবের এই ভোগ-বিবরণের বিস্তারটুকু এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু মহাকবির এই চমৎকার নৈঃশব্দ্য থেকে এটা হয়তো বেশ বোঝা যায় যে, বালী ফিরে না আসা পর্যন্ত তারা নিশ্চিন্তে নির্দ্বিধায়

সুগ্রীবের স্ত্রীত্ব স্বীকার করেছিলেন; আবার বালী যখন ফিরে এসে সুগ্রীবকে প্রচণ্ড ভর্ৎসনা করে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিলেন, তখন আবারও সমান নিশ্চিন্ততা এবং দ্বিধাহীনতায় তিনি বালীর স্ত্রী হয়ে গেলেন।

জিজ্ঞাস্য হয়ে ওঠে— এটা কি অনার্যোচিত সভ্যতার ফল। তাতেই কি এক রমণী আপন ভোগসাধনে এমন নির্দ্বন্দ্ব এবং নিশ্চিন্ত হতে পারেন? অন্তত আমার তা মনে হয় না। আসলে নিজের ঘর আন্দাজে তারা এতটাই সুন্দরী এবং কাম্য ছিলেন যে, বালীর অনুপস্থিতিতে সুগ্রীবকে প্রশ্রয় দিয়ে নিজেকে সনাথ ভাবতে তাঁর যেমন কোনও দ্বিধা হয়নি, তেমনই বালী ফিরে এসে সুগ্রীবকে তাড়িয়ে দিলেও তারার প্রতি তিনি কিন্তু একবর্ণও তিরস্কার বাক্য উচ্চারণ করার সাহস পাননি। সুগ্রীবের দ্বারা লঙ্ঘিত পত্নীকে তিনি বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেছেন এবং তা করেছেন পূর্ণপ্রাণে। অন্যদিকে তারাকে দেখুন, পুনরাগত ক্রুদ্ধ বালীর কাছে সুগ্রীব কত দোষ স্বীকার করলেন, কত ক্ষমা চাইলেন, সেখানে অন্তর্বর্তী প্রেমিক দেবরের প্রতি করুণায় তারা কিন্তু একটি বাক্যও বলেননি তাঁর অনুকূলে। সুগ্রীব বিতাড়িত হয়ে ঋষ্যমূক পর্বতে নির্বাসিত হলেন এবং তারাও বিনা বাক্যে আশ্রয় নিলেন বীর স্বামীর উষ্ণ বক্ষে বাহুর ঘেরে।

বস্তুত বালী তাঁর স্ত্রীকে চিনতেন। একেবারে মৃত্যুর সময় বালী সুগ্রীবকে বলেছিলেন— করণীয় কর্মের সূক্ষ্মতা বোঝার ব্যাপারে তারা অত্যন্ত পটু; অর্থাৎ যে কোনও কাজের ফলাফল বুঝতে তাঁর জুড়ি নেই— সুষেণদুহিতা চেয়মর্থসূক্ষ্মবিনিশ্চয়ে... সর্বতঃ পরিনিষ্ঠিতা। এখানেও সেই সূক্ষ্ম বাস্তব বুদ্ধিরই প্রয়োগ করেছেন তারা। বালীর কাছে তিনি এমন ভাব দেখিয়েছেন যেন— তাঁর অনুপস্থিতিতে অবলা রমণী হিসেবে তাঁর কীই বা করার ছিল। নিতান্ত নিরুপায় হয়েই যেন তিনি রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট বালীপ্রতিম সুগ্রীবের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন। আবার যখন বালী ক্রুদ্ধ হয়ে ফিরে এসেছেন কিষ্কিন্ধ্যায় তখন প্রখর বাস্তববোধে সুগ্রীবের অনুকূলে তারা একটি কথাও বলেননি, সুগ্রীবকে নির্বাসিত হতে দেখেও তিনি নির্বিকার বসে রইলেন বালীর প্রতি একান্ত আনুগত্যে। স্বামী-পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই নির্বিকার ভাবনাটুকু তারাকে একনিষ্ঠ সতী বলে প্রমাণ করে না বটে, কিন্তু এই নির্বিকার প্রণয় তাঁকে শান্তি দিয়েছিল নিশ্চয়। কোন একান্ত আধুনিক এই বৈরাগ্যটুকু না থাকলেও স্বামী-পরিবর্তন করে মানসিকভাবে শান্ত থাকা যায় না অথবা পুনরায় সকাম ভোগেও তৃপ্ত হওয়া যায় না।

তারা যখন বালীর সঙ্গে পুনর্মিলিত হলেন, তখন কিন্তু এই মহাবীর স্বামীর প্রতি তাঁর একনিষ্ঠতার কোন তুলনা পাওয়া যাবে না। সুগ্রীব যখন বালীকে মারার অভিসন্ধি নিয়ে সগর্বে বালীকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন তখন বালীর প্রতি তারার প্রণয়টুকু যেমন প্রকাশ পাচ্ছে তেমনই প্রকাশ পাচ্ছে তাঁর প্রখর রাজনৈতিক বুদ্ধি এবং সূক্ষ্ম বাস্তববোধ— এই দ্বিতীয় সত্ত্বাটুকুর জন্যই তারার দুই স্বামীই তাঁর কাছে বাঁধা পড়ে গিয়েছিলেন। রামচন্দ্রের কথায় কিষ্কিন্ধ্যার রাজগৃহের সামনে এসে সুগ্রীব বালীকে সগর্বে যুদ্ধে আহ্বান করলেন।

সুগ্রীবের গর্জন শুনে বালীর গা জ্বলে উঠল। বালী যুদ্ধে উদ্যত হয়ে বেরিয়ে যাবেন এই সময় সুন্দরী তারা এসে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলেন তাঁকে। বাস্তব পরিস্থিতির সূক্ষ্মতা বোঝানোর চেষ্টা করে তারা বললেন— সুগ্রীব তোমার হাতে প্রচণ্ড মার খেয়ে মরতে মরতে বেঁচে গেছে। কিন্তু সেই লোক— নিজের দুর্বলতা জেনেও যখন আবার তোমাকে সদর্পে যুদ্ধ করতে ডাকছে, সেখানে আশঙ্কার কারণ আছে জেনো— ইহৈষ পুনরাহ্বানং শঙ্কাং জনয়তীব মে।

সুগ্রীবের সম্বন্ধে তারা একেবারে সঠিক অনুমান করেছেন। নিজের গর্ভজাত পুত্র কুমার অঙ্গদের কাছে পূর্বাহ্নেই তিনি সুগ্রীবের সঙ্গে রামচন্দ্রের মিত্রতার খবর পেয়েছেন এবং সে খবর বালীও পাননি। হয়তো সুগ্রীবের ব্যাপারে পূর্বপ্রণয়জাত অনুসন্ধিৎসা-বশেই তারা তাঁর খবর নিয়েছেন, কিন্তু এই মুহূর্তে

দুই ভাইয়ের কারও অনিষ্ট তিনি চান না। অঙ্গদের কাছ থেকে পাওয়া সংবাদ বালীকে জানিয়ে বলেছেন— সুগ্রীব প্রহৃত হয়েও দ্বিতীয়বার এইভাবে যুদ্ধাহ্বান করছেন বলেই আমি বিশ্বাস করি সে সহায় ছাড়া লড়তে আসেনি— নাসহায়মহং মন্যে সুগ্রীবং তমিহাগতম্। তারা রাম-লক্ষ্মণের খবর জেনেছেন গুপ্তচরদের মাধ্যমে এবং অঙ্গদের মাধ্যমে এবং রামচন্দ্রের বীরত্বের কথা সম্পূর্ণ জেনেই তিনি বালীকে বুদ্ধি দিয়ে বলেছেন— রামচন্দ্রের সঙ্গে মিত্রতাবদ্ধ সুগ্রীবের সঙ্গে তুমি শত্রুতা কোরো না। বরঞ্চ ভালো হবে— যদি তুমি সুগ্রীবকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করো। আর এতে লজ্জার কিছু নেই। কেননা সে তোমার ছোট ভাই, তাকে লালন করাই উচিত তোমার— লালনীয়ো হি তে ভ্রাতা যবীয়ানেষ বানরঃ। এই প্রস্তাবের মাধ্যমে তারা সঠিক সময়ে তাঁর পূর্বপ্রণয়ীকে রাজনৈতিকভাবে সুস্থিত করতে চাইলেন কিনা জানি না, কিন্তু তারার নিজস্ব রাজনৈতিক বুদ্ধি যে অসাধারণ, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না।

এই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে বালী মারা যাবেনই এবং বালী শেষ পর্যন্ত মারা গেছেন রামচন্দ্রের শরনিক্ষেপে। রামচন্দ্রের ওই গুপ্ত বাণ-নিক্ষেপের জন্য বালী তাঁকে অভিযুক্ত করলে রাম যুক্তি দেখিয়ে বলেছিলেন— সুগ্রীবের স্ত্রী রমাকে বালী অধিকার করেছেন বলেই তাঁকে দণ্ড দিতে হল। উত্তরে বালী কিন্তু বলেননি যে তাঁর স্ত্রী তারাকেও তো সুগ্রীব অধিকার করেছিলেন, কই রামচন্দ্র তো তার কোনও প্রতিবিধান করেননি। আসলে বালীর পক্ষে এই উত্তর দেওয়া সম্ভবই ছিল না বোধহয়। কেননা তিনি হয়তো জানতেন সুগ্রীব তারাকে হরণ করেছিলেন যতখানি তার চেয়ে বেশি তারা নিজেকেই সঁপে দিয়েছিলেন সুগ্রীবের কাছে। এই মানসিক জটিলতা সত্ত্বেও বালী কিন্তু মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও তারার বুদ্ধি এবং ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে ভোলেননি। তিনি বলেছিলেন এখন দেখছি আমার পত্নী তারা সব কিছু আগেই বুঝেছিলেন।

বালীর মৃত্যুর পর আবার এক অদ্ভুত দেখছি আমরা। যিনি অন্তবর্তী সময়ে সুগ্রীবের প্রণয়িনী ছিলেন তাঁকে এই মুহূর্তে করুণ ক্রন্দনে আলুলায়িত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। হয়তো সামাজিকভাবে প্রথমত তিনি বালীর পত্নী বলে স্বীকৃত বলেই তাঁর মৃত্যুতে বৈধব্যের হাহাকার শুনতে পাচ্ছি তারার মুখে।

তারার এই সুদীর্ঘ 'বিলাপ কুসুমাঞ্জলি'র মধ্যে সুগ্রীবের প্রতি আক্ষেপও বাদ যায়নি। সুগ্রীব-পত্নী রুমার দিকেও তার শব্দ-কটাক্ষ ছিল। হনুমান তারাকে শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন। এমনও বলেছেন— এই বানর রাজ্যের অধীশ্বরী এখন তুমি। কুমার অঙ্গদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করে শান্তি লাভ করো তুমি। তারা এই স্তোকবাক্যে ভোলেননি। প্রখর বাস্তববোধে তিনি উত্তর দিয়েছেন— এই বানররাজ্য এবং বয়ঃপ্রাপ্ত অঙ্গদের ওপর আমার কোনও প্রভুত্ব থাকতে পারে না। বালীর পরে সুগ্রীবেরই দায়িত্ব আসে পরম্পরায়— পিতৃব্যস্তস্য সুগ্রীবঃ সর্বকার্যেষ্বনন্তরঃ— তিনি রাজ্যত্ব করুন। আমার স্বামীর মৃত্যু শয্যাই আমরাও গন্তব্যস্থল। কান্নায় ভেঙে পড়ে তারা একসময় রামচন্দ্রকেও যথেষ্ট তিরস্কার করলেন। তাঁর কাছে আরও একটি শরাঘাত যাচনা করলেন নিজের মৃত্যুর জন্য।

এই মুহূর্তে রামচন্দ্রও অসাধারণ বাস্তব সান্ত্বনায় প্রবোধ দিয়েছেন তারাকে। তাঁর বাক্যের মধ্যে দার্শনিক যুক্তি ছিল চিরাচরিত— অর্থাৎ সেই দৈব, বিধাতার বিধান ইত্যাদি।

মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে রামচন্দ্রের কাছে অথবা সুগ্রীবের কাছেও বালী যে-সব অনুরোধ-আর্জি জানিয়েছেন তার মধ্যে নিজ পত্নী তারার জন্য কোন ব্যাকুলতা বা আশঙ্কা ছিল না। পুত্র অঙ্গদের সুরক্ষা এবং তার জীবনের ভবিষ্যৎ গতি নিয়ে বালী যতই চিন্তিত থাকুন, তারার বৈধব্য-জীবনের বিপন্নতা নিয়ে বালী এতটুকুও মাথা ঘামাননি। তিনি হয়তো জানতেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর তারা

সুগ্রীবেরই পত্নী হবেন, এবং সহজেই নির্দ্বিধায়। হয়তো সেইজন্যই সুগ্রীবকে মরণান্তিক পরামর্শগুলি দেওয়ার সময় খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন যে, সুষেণ বৈদ্যর এই মেয়ে তারা, সে খুব বুদ্ধিমতী। সে যা ভালো বলে স্থির করবে তাই নিঃসন্দেহে করাটা ঠিক হবে তোমার— যদেষা সাধ্বিতি ব্রূয়াৎ কার্যং তন্মুক্তসংশয়ম। আমাদের ধারণা— এই ধরনের কথা তাঁকেই বলা যায়, যাঁর সম্বন্ধে পূর্বনির্দিষ্ট ধারণা আছে, অর্থাৎ ধারণা আছে— এই ব্যক্তিই তারার অধিকারী হবেন।

রামচন্দ্রের অনুমান এবং বালীর ভাবনা যে কতটা সত্য ছিল তা বোঝা যায়— যখন বালীর মৃত্যুর পর দুই মাস মাত্র যেতে না যেতেই সুন্দরী তারা সুগ্রীবের অঙ্কশায়িনী হয়েছেন। সুগ্রীবের বিধিসম্মতা পত্নী ছিলেন রুমা— যে রুমাকে বালী তারা-হরণের প্রতিহিংসায় অধিকার করেছিলেন এবং যে রুমার জন্য রামচন্দ্রের কাছে বহু খেদ করে তাঁর অনুকম্পায় বালী বধ করিয়ে নিয়েছেন সুগ্রীব— সেই রুমাকে আর কতটুকু সুগ্রীবের সহগামিনী দেখছি? বালীবধের পর বর্ষাকাল পড়েছে এবং সেইকালে যেহেতু দুর্গম পথে সীতার অন্বেষণ সম্ভব ছিল না, অতএব সুগ্রীব প্রেমানন্দে তারার সঙ্গসুখ পাবার জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছেন। সমগ্র বর্ষাকাল জুড়ে তারার সঙ্গে সুগ্রীবের রতিরঙ্গ চলেছে এমনকি শরৎকালের মাঝামাঝিও সেই রতিরঙ্গ শেষ হয়নি।

সুগ্রীবের ব্যবহারে রামচন্দ্র ক্রুদ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মণকে পাঠিয়েছেন সুগ্রীবের কাছে। লক্ষ্মণ যখন কিষ্কিন্ধ্যার রাজগৃহের দ্বারে উপস্থিত, তখনও সুগ্রীব ঘুমের ঘোরে এবং রতিরঙ্গে ক্লান্ত— বভুব মদমত্তশ্চ মদনেন চ মোহিতঃ। লক্ষণের ধনুঃস্ফোটে এবং বানরদের ভয়ভীত শব্দে সুগ্রীব জেগে উঠেছেন বটে, কিন্তু নিজের বিপদ থেকে বাঁচতে তিনি শরণাপন্ন হলেন তারার। লক্ষ্মণ কেন এত ক্রুদ্ধ হয়েছেন, সেই জিজ্ঞাসা তো তারাকে করেছেনই সুগ্রীব, তারপর তিনি বলেছেন— তুমি নিজেই তাঁর সঙ্গে দেখা করো— অথবা স্বয়মেবৈনং দ্রষ্টুর্মর্হসি ভামিনি। ভালো কথা বলে তুষ্ট করো তাঁকে। আমার ধারণা, তোমাকে দেখলে তিনি আর রাগ করতে পারবেন না।

সুগ্রীবের সঙ্গে একত্রে মদ্যপানের ঘোর এখনও কাটেনি তাঁর। ফলে স্খলিত পদে মদবিহ্বল নেত্রে অধোগামী কাঞ্চীদাম স্বস্থানে নিবেশ করতে করতে তিনি উপস্থিত হলেন লক্ষ্মণের সামনে— সা প্রস্খলন্তী মদবিহ্বলাক্ষী প্রলম্বকাঞ্চীগুণহেমসূত্রা। আধুনিক কোনো বিলাসী মানুষ হলে তারার এই মোহিনী রূপের দিকে তাকিয়ে থাকতেন নির্নিমেষে। কিন্তু লক্ষ্মণ তারাকে দেখে সসম্মানে মাথা নীচু করলেন, রমণী বলেই হয়তো।

লক্ষ্মণ অভিযোগ করে তারাকে বলেছেন তুমি যতই স্বামীর হিতে ব্যস্ত থাকো, তোমার স্বামী কারও কথাই ভাবছে না। সে মদ্যপান আর কামসম্ভোগ নিয়ে এতটাই ব্যাকুল যে কাজের কথা সব ভুলে গেছে— ব্যতীতাংস্তান্ মদোদগ্রো বিহরন্নাববুধ্যতে। লক্ষ্মণ তারাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বললেন— তুমি তো সব জানো তারা। তুমিই বল না আমাদের কী করা উচিত এখন— তৎকার্যং কার্যতত্ত্বজ্ঞে ত্বমুদাহৃতুমর্হসি।

সেই যুগে এক রমণীর কাছে লক্ষ্মণের মতো এক ব্যক্তি যখন রাজনৈতিক উপদেশ যাচনা করছেন, তখন বুঝতে হবে তারার বুদ্ধি-বৈদগ্ধ্য কতখানি। তারার ভাষা এবং ভাবনা মদস্খলিত অবস্থাতেও কেমন পরিশীলিত। তিনি বললেন— কোন গুণী ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত গুণহীন ব্যক্তির ওপর ক্রোধ করেন? কোন সজ্জন তপস্বী সত্ত্বগুণ ত্যাগ করে আপনার মতো ক্রোধ অবলম্বন করবেন। দেখুন, আমি সমস্যাটা সবই জানি। রামচন্দ্র কেন ক্রুদ্ধ হচ্ছেন, তা জানি। আপনারা আমাদের জন্য যা করেছেন, তাও জানা আছে আমার, এমনকি এখন কী করতে হবে তাও আমি বুঝি। কিন্তু রাজকুমার। মানুষের মধ্যে শৃঙ্গার-সম্ভোগের একটা ব্যাপার আছে, সেটাকে কামতন্ত্র বলে। সে বিষয়টা আপনি একেবারে

কিছুই বোঝেন না বলেই এত রাগ হয়েছে আপনার— ন কামতন্ত্রে তব বুদ্ধিরস্তি/ত্বং বৈ যথা মন্যুবশং প্রপন্নঃ। সবচেয়ে বড় কথা আমাব সঙ্গেই সুগ্রীব এতকাল কামভোগে তৃপ্ত ছিলেন, সেই সুগ্রীবকে যদি আপনি ছোটভাই বলে ক্ষমা না করেন, তো আমরা বাঁচি কী করে। তা ছাড়া সীতা উদ্ধারের ক্ষেত্রে তিনি কোনও চেষ্টাই করেননি, সেটা তো ঠিক নয়।

এক সুন্দরী রমণীর কাছ থেকে এমন 'ব্লেটান্ট' কথাবার্তা শুনে লক্ষ্মণকে সত্যিই রাগ কমাতে হয়েছে এবং এরপর তারা তাঁকে অন্তঃপুর পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে গেছেন সুগ্রীবকে দেখানোর জন্য। স্ত্রীপরিবৃত সুগ্রীবের অবস্থা দেখে লক্ষ্মণ আবারও ক্রুদ্ধ হয়ে কঠিন কথা বলতে আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু এই অবস্থাতেও লক্ষ্মণকে থামিয়ে দেন তারা এবং সুগ্রীবের মানসিক অবস্থাটা তিনি এমনভাবেই উপন্যস্ত করেন লক্ষ্মণের কাছে যে, লক্ষ্মণকে ঠান্ডা মাথাতেই কাজ সারতে হয়েছে।

তারার এই অসাধারণ বাগ্‌বৈদগ্ধ্যকে আমি খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না। কেননা এমন ক্ষমতা অনেক রমণীরই থাকে। কিন্তু আমার পছন্দ হয় তাঁর মানসিকতাটুকু। অসম্ভব মানিয়ে নেবার ক্ষমতা, পূর্বের যে সংস্কার জীবনে বাধার সৃষ্টি করে, তা ভুলে যাবার ক্ষমতা— এই তিন নিয়েই তারা বুঝি রীতিমতো অতি আধুনিকা। পূর্বস্বামী বালী অথবা সুগ্রীবের সঙ্গে লড়তে যাচ্ছিলেন তাকেও যেমন তিনি সুপরামর্শ দিয়েছিলেন, আজ সেইরকমই এক দক্ষতায় তিনি শুধু সুগ্রীবকে বাঁচিয়েই দেননি, তাঁকে তিনি রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠাও করেছেন। কিন্তু ভাববার বিষয় এইটাই যে, এই তারাই চারমাস আগে বালীর প্রতি ভালবাসায় আত্মাহুতি দিতে চেয়েছিলেন। নিশ্চয়ই সেই ভাবটাও অসত্য ছিল না। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পূর্বস্মৃতির ক্ষতগুলি ভুলে সার্থকভাবেই সুগ্রীবের প্রিয়তমা, বালীর নন। পূর্বস্বামীকে এইভাবে ভুলে যাবার মধ্যে তারার হৃদয়হীনতাই দেখতে পাবেন সকলে, কিন্তু আমি বলি সুখী হতে চাইলে ভুলতে শিখতে হয়। তারা এই ভুলে যাবার ক্ষমতাটুকু শেখাতে পাবেন বলেই তিনি প্রাতঃস্মরণীয়া, নইলে সতীত্ব ব্যাপারটা তাঁর কাছে বড়ই আপেক্ষিক।

(৫)

মন্দোদরী

তথাকথিত সামাজিক নীতি-নিয়মের কথা যদি বলেন, তাহলে বলতেই হবে যে, অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী অথবা তারা— এঁদের সবারই পাতিব্রত্য কোনও না কোনও সময়ে লঙ্ঘিত হয়েছে। কিন্তু মন্দোদরীর ব্যাপারে বিপদ ঘটিয়েছেন স্বয়ং বাল্মীকি। কোথাও তিনি একবারও স্বকণ্ঠে বলেননি যে, রাবণ-বধের পর মন্দোদরী বিভীষণের স্ত্রীত্ব বরণ করেছিলেন। বিভীষণের সততা এবং তাঁর মহত্ত্বের প্রতি মন্দোদরীর অনেক শ্রদ্ধা ছিল বটে কিন্তু রাবণ-বধের সামান্য ব্যবহিত কাল পরেই মন্দোদরীর আর কোনও কার্যকলাপ বাল্মীকির রামায়ণে দৃষ্ট হয় না। লঙ্কারাজ্যে বিভীষণের অভিষেক হল, সেখানেও মন্দোদরীকে দেখছি না। বিভীষণ রামের সঙ্গে অযোধ্যার আনন্দ উৎসবে এলেন। সেখানেও মন্দোদরীকে দেখছি না। এমনকি রামচন্দ্রের অশ্বমেধ-যজ্ঞে বিভীষণকে যখন যোগ দিতে দেখছি, তখন তাঁর সঙ্গে তাঁর রাক্ষস-বন্ধুদের যেমন দেখছি, তেমনই অনেক স্ত্রীকেও দেখছি— বিভীষণশ্চ রক্ষোভিঃ স্ত্রীভিশ্চ বাহুভি র্বৃতঃ। কিন্তু এই স্ত্রীলোকের ভিড়ে কোথাও তো আমরা মন্দোদরীকে দেখছি না। তাহলে এই আরোপ কেন? প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চকন্যারা তথাকথিত সতীত্বের আবর্তে পড়েন না, অথচ কোনও না কোনও ভাবে তাঁদের সতীত্ব বা চারিত্রিক মহত্ত্ব প্রমাণ করা যায় বলেই সীতা সাবিত্রীকে ছাপিয়ে তাঁরা প্রাতঃস্মরণীয় হয়েছেন। তাহলে মন্দোদরীকে কোন্ অর্থে প্রাতঃস্মরণীয়া সতী বলব— প্রথাগত অর্থে? নাকি, যেভাবে অন্য চার রমণী প্রথাবহির্ভূত অর্থে সতী, সেই অর্থে?

প্রথম কথা বলি, আদি কবি বলেই হোক, অথবা প্রথাবহির্ভূত কোনও লঙ্ঘিত আচারের কথা বলতে সংকোচ বোধ করেন বলেই হোক, একথা মানতেই হবে যে, বাল্মীকি বড় চাপা স্বভাবের মানুষ। ব্যাসের মতো সামাজিক জটিলতা নিয়ে মাথা ঘামাতে তিনি পারেন না বেশিক্ষণ। ফলে বেশিরভাগ ক্ষুদ্র চরিত্রের ক্ষেত্রেই শেষ পরিণতি আমরা জানি না। মন্দোদরীর কথা পরে আর তিনি উচ্চারণ করেননি বলে না হয় ধরে নিলাম রাবণ-বধের পর মন্দোদরী হারিয়ে গেছেন। কিন্তু বিভীষণের আপন পত্নী সরমাই বা গেলেন কোথায়? ওই যে বিভীষণের রাজ্যভিষেকের কথা বলছিলাম, যেখানে না হয় রাগে-দুঃখে মন্দোদরী উপস্থিত থাকেননি, কিন্তু সরমাই বা কোথায় গেলেন? আপ্লুত বানরবৃন্দের হাত থেকে সমুদ্র তীর্থের জল নিয়ে লক্ষ্মণ যখন বিভীষণের মস্তক সিঞ্চন করলেন, তখন তো সরমাকেও একবার দেখলাম না স্মিতহাস্যে স্বামীর মর্যাদায় আন্দোলিত হতে। এই ঘটনা থেকে বুঝি বাল্মীকি এ-সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আতপ্ত চরিত্রগুলির শেষ পরিণতিটুকু খেয়াল করেননি।

সরমার কথা আমরা এইজন্য তুললাম যে, বিভীষণের আপন পত্নীরই যেখানে উল্লেখ নেই, সেখানে মন্দোদরীর কথা তাঁর মনে থাকবে কেন! কিন্তু কথা হল— প্রত্যেক চরিত্রের একটি অনুমেয় পরিণতি আছে। পরিণতি অস্বাভাবিক হলে সে খবর আমরা সহজে পেতাম। কিন্তু স্বাভাবিক পরিণতি যদি সেকালের সামাজিক রীতি অনুসারেই ঘটে থাকে, তবে মন্দোদরী অবশ্যই বিভীষণের অধিকারে এসেছিলেন এবং মন্দোদরীর এই দ্বিতীয়-পতিত্ব অত্যন্ত অনুমানযোগ্য বলেই প্রাতঃস্মরণীয়াদের মধ্যে তাঁর নামও অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। এই অনুমানের কিছু ভিত্তিও আছে।

বানর এবং রাক্ষসদের যদি তথাকথিত আশ্চর্য এক অন্যতর সম্প্রদায়ভুক্ত বলে ধরে নিই, তাহলেও বলতে হবে তাদের মধ্যে এই ধরনের বিবাহ চালু ছিল। বালীর স্ত্রী তারার কথা ভাবুন। তিনি বালীর মৃত্যুর পর সুগ্রীবের অঙ্কশায়িনী হয়েছিলেন সানন্দে। এমনকি আর্যদের মধ্যেও এই দেবর বিবাহের প্রথা যথেষ্টই চালু ছিল।

প্রথাগত এই নিয়মের কথা অথবা আকাঙ্খিত এই নিয়মের কথা মহাভারতের অনুশাসনপর্বে খুব ভালভাবে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে— স্বামীর অবর্তমানে রমণীরা দেবরকেই স্বামী হিসেবে গ্রহণ করে— নারী তু পত্যভাবে বৈ দেবরং কুরুতে পতিম্।

মহাকাব্যের যুগের এই চলতি সামাজিক নিয়ম থেকে বোঝা যায়, আর্য অনার্য যে সমাজেই হোক স্বামীর অবর্তমানে দেবরকে বিবাহ করার রীতিটি উচ্চ-নীচ সমস্ত শ্রেণীর মধ্যেই প্রচলিত ছিল। সেই নিরিখে দেখতে গেলে রাবণবধের পর মন্দোদরীর উত্তর জীবনে বিভীষণের সরস সঞ্চার ঘটেছিল অবশ্যই, কিন্তু সীতা উদ্ধারের পর রামায়ণের নরচন্দ্রমা রামচন্দ্রকে নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, আদিকবি মন্দোদরীর দ্বিতীয় দাম্পত্য নিয়ে আর ভাবনা করার অবসর পাননি। কিন্তু এই দ্বিতীয় মিলন যে সত্য, তা যেমন লোকপরম্পরার বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তেমনই এই ভাবনার বিশ্রান্তি ঘটেছে কবি-পরম্পরায়। বঙ্গের অলংকার কৃত্তিবাস যখন লঙ্কায় বিভীষণের অভিষেক বর্ণনা করছেন, তখন রামচন্দ্রের অনুরোধে কুমার লক্ষ্মণ যেমন বিভীষণের মাথায় অভিষেক জল সিঞ্চন করছেন, তেমনই রাণী মন্দোদরীকেও দেখছি বিভীষণের মাথায় জল ঢালতে। লঙ্কারাজ্যে বিভীষণের এই অভিষেকে ঢাক-ঢোল, ঢেমচা-খেমচা আর পঞ্চাশ হাজার রাক্ষসী ঢাকের বিকট বাজনার সঙ্গে রামচন্দ্র যখন বিভীষণের হাতে ছত্রদণ্ড আর লঙ্কাপুরী একত্রে তুলে দিচ্ছেন, তখন দেখছি মন্দোদরীও বিভীষণকে অভিষেক করেছেন নিজের হাতে— অভিষেক করি দিল রাণী মন্দোদরী।

রাবণ হত হবার পর মন্দোদরীর জন্য বিভীষণের দুঃখও ছিল, সংকোচও ছিল। কিন্তু কৃত্তিবাসের জবানীতে দেখছি— রামচন্দ্র স্বয়ং এই সমস্যার সমাধান করেছেন—

পুনর্বার শ্রীরাম কহিলা বিভীষণে।
মন্দোদরী লাগি কিছু না ভাবিহ মনে॥
মন্দোদরী দিব তোমা মম অঙ্গীকার।
রাজশ্রী রাজাতে লয় আছে ব্যবহার॥
অতএব না ভাবিহ মিত্র বিভীষণ।
রাণী মন্দোদরী তোমা দিলাম এখন॥

অর্থাৎ কৃত্তিবাস সেকালের সামাজিক যুক্তিতেই বুঝেছেন যে, রাবণের মৃত্যুর পর মন্দোদরী স্বাভাবিকভাবেই বিভীষণের অধিকারে এসেছেন। এই দ্বিতীয় স্বামীটিকে লাভ করে মন্দোদরী কতটা আমোদিত হয়েছিলেন কিম্বা আদৌ আমোদিত হয়েছিলেন কি না, সে কথা বলতে পারব না, কারণ সে বিষয়ে কোনও প্রমাণ নেই। কিন্তু জিজ্ঞাসা হয়— রাবণ বেঁচে থাকতেই কি তিনি খুব আহ্লাদিত ছিলেন। মন্দোদরীর সৌন্দর্য, মর্যাদা, গুণ, বৈদগ্ধ্য— কোনওটাই কম ছিল না। রাবণ তাঁকে লঙ্কার পট্টমহিষীর পদে সমাসীন করে রেখেছিলেন বটে, কিন্তু এই আনুষ্ঠানিক মর্যাদা ছাড়া আর কী সুখ ছিল এই রমণীর। রাবণ দিনের পর দিন নারী হরণ করেছেন, বিচিত্র উপভোগ রচনা করেছেন নিজের জন্য, এবং শেষকালে সীতা হরণ করার পর রাবণ যা করে গেলেন, তাতে মন্দোদরীর সুখী হওয়ার মতো কিছু ছিল না। অথচ যেদিন এই ত্রিভুবন বিজয়ী বীর রাবণের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল, সেদিন কি একবারের তরেও তিনি ভেবেছিলেন যে, এই বীরত্বই তাঁর জীবনে সবচেয়ে বড় বিপর্যয় ডেকে আনবে।

মন্দোদরীর পিতা ময়দানব রাক্ষসরাজ রাবণকে নামে চিনতেন, পিতা হওয়া সত্ত্বেও রাবণের ক্রূরকর্মের জন্য বিশ্রবা তাঁকে যে বিধ্বংসী অভিশাপ দিয়েছিলেন— ময় তাও জানতেন। কিন্তু তবুও রাবণকে মন্দোদরীর স্বামী হবার উপযুক্ত মনে করলেন এই কারণে যে, রাবণ মহামান্য মহর্ষি বিশ্রবার পুত্র এবং দ্বিতীয়ত তিনি ত্রিভুবন-বিজয়ী বীর। ময় রাবণকে মন্দোদরীর বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে বলেছিলেন— অপ্সরা হেমা যাকে গর্ভে ধারণ করেছিল, সেই মন্দোদরীর স্বামী হও তুমি। এই একটিমাত্র জায়গা যেখানে রাবণ সবলে নারী হরণ করার প্রয়োজন বোধ করেননি। এমন এক অপ্সরোপমা সুন্দরী আপনিই তাঁর হস্তগতা— এ তিনি ভাবতেও পারেননি। ফলে ময়দানব প্রস্তাব করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেছিলেন— আমি রাজি— বাঢ়মিত্যেব— আপনি ব্যবস্থা করুন।

রাবণের বিলম্ব সয়নি। সঙ্গে সঙ্গে সেই নির্জন বনের মধ্যে আগুন জ্বালা হল এবং রাবণ অগ্নিসাক্ষী করে মন্দোদরীর পাণিগ্রহণ করলেন— প্রজ্জাল্য তত্র চৈবাগ্নিমকরোৎ পাণিসংগ্রহম্। স্বর্ণলঙ্কার অধিপতি রাবণের সঙ্গে যতই অনাড়ম্বরে বিবাহ সম্পন্ন হোক, মন্দোদরী লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করলেন পট্টমহিষীর সম্মানে। এই সম্মান আরও বর্ধিত হয়েছিল যখন তিনি রাবণের ঔরসে মেঘনাদের মতো মহাবীরের জন্ম দিয়েছিলেন আপন কুক্ষিতে। রাবণ নিজে এই পুত্রের নামকরণ করেছিলেন সৌভাগ্যবতী মন্দোদরীর প্রথম নামবর্ণ ব্যবহার করে— মেঘনাদ— পিতা তস্যাকরোন্নাম মেঘনাদ ইতি স্বয়ম্।

হয়তো এই পুত্রজন্ম পর্যন্তই মন্দোদরীর সুখ এবং সৌভাগ্য ছিল অবিকৃত এবং হয়তো এই পর্যন্তই তার দাম্পত্য জীবনের স্মৃতি ছিল মধুর। এর পরেই রাবণ যখন প্রবল পরাক্রমে সুরলোক, যক্ষলোক জয় করে, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল মথিত করে দেব-দানব-রাক্ষসদের বিবাহিতা এবং অবিবাহিতা স্ত্রী-কন্যাদের লঙ্কায় হরণ করে নিয়ে আসতে থাকেন উপভোগ-সম্ভোগের জন্য, তখন থেকেই সুন্দরী মন্দোদরীর হৃদয় পীড়িত হতে থাকে। কোন রমণীই বা পট্টমহিষীর সম্মান লাভ করে স্বামীকে অন্যাসক্ত দেখার

দুর্ভোগ সহ্য করতে পারে। মন্দোদরীর মনঃপীড়া আরও বাড়ল, যখন রাবণ শূর্পনখার প্ররোচনায় রামপ্রেয়সী সীতাকে হরণ করে নিয়ে এলেন।

রাবণের আহরণ করা এইসব রমণীদের জন্য মন্দোদরী ভয় পান না। কিন্তু সীতাকে লঙ্কার অশোকবনে প্রতিষ্ঠা করার পর থেকে তাঁর মন পাবার জন্য রাবণ যেভাবে সাধনা করে যাচ্ছিলেন, তাতে মন্দোদরী বিরক্ত বোধ করছিলেন। স্ত্রীলোকের সত্তার মধ্যে যে 'ইগো' থাকে, যে স্বাভিমান থাকে, বিশেষত এতদিন যিনি রাবণের পট্টমহিষীর সম্মানে ভূষিতা হয়েছেন, তিনি রাবণের অন্যাসক্তিতে এ পর্যন্তও এতটুকু বিচলিত ছিলেন না। কিন্তু সীতাকে আপন অধিকারে আনার জন্য রাবণ যেভাবে নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে তাঁকে সাধ্যসাধনা করছেন তাতে মন্দোদরী বুঝতে পারছেন যে, সীতার প্রতি রাবণের আকর্ষণ বাড়ছে।

রাবণকে জীবৎকালে এই কথাটা মন্দোদবী বলতে পারেননি, অথবা এটাই ঠিক যে, তিনি রাবণকে বলেননি কেননা স্বামীর দ্বারা অপহৃতা এক রমণীর সঙ্গে তিনি মনে মনে প্রতিযোগিতা করছেন— এ-কথা প্রকাশ করতে তাঁর মনে লেগেছে। রাবণ যখন মারা গেছেন, তখন সকলের সামনে সোচ্চারে এই কথাগুলি তিনি বলেছেন। নিজেকে তো সীতার চেয়ে রূপবতী তিনি ভাবতেনই, কিন্তু এই অভিমান মন্দোদরী কতটা পোষণ করতেন সেটা বোঝা যায় মন্দোদরীর তাচ্ছিল্যে। রাবণের মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছিলেন সীতার চেয়ে সুন্দরী অন্য অনেক রমণী তোমার কাছেই ছিল— সন্ত্যন্যাঃ প্রমদা স্তুভ্যং রূপেনাভ্যধিকাস্ততঃ— কিন্তু এমন তোমার মোহ— তা তুমি বুঝতেই পারলে না। অন্য রমণীদের কথা বলে মন্দোদরী এবার নিজের কথা সাহংকারে বলেছেন মৃত স্বামীর শীতল কর্ণপুটে। বলেছেন— আচ্ছা! বংশ পরিচয় বল, রূপ বল অথবা উদার মানসিকতার কথাই বল— কিসে? কোন্ গুণে আমি নিজে তার সমান মনে করব, আমার চাইতে ভাল হওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না— ময়াধিকা বা তুল্যা বা তত্ত্ব মোহান্ন বুধ্যসে?

মন্দোদরীর এই সগর্ব অভিমানটুকু মিথ্যে নয়। কিন্তু রাবণের মতো লম্পট এবং অহংকারী পুরুষ নিত্য নব-নব রমণীর উপভোগ-মোহে মন্দোদরীর রূপ-লাবণ্য এবং গুণের যথাযথ কদর করতে পারেননি। কিন্তু নিজের মর্যাদা সম্বন্ধে তিনি যে ধারণা পোষণ করবেন, সেটি যে সর্বাংশে ঠিক, তা বোঝা যাবে হনুমানের বক্তব্য শুনলে। হনুমান তো তথাকথিতভাবে রাবণ পক্ষের বিরোধী গোষ্ঠীর মানুষ। কাজেই মন্দোদরীর সম্বন্ধে তাঁর চর্চা একেবারেই নিরপেক্ষ মনে করা যায়।

সীতার অন্বেষণের শেষ পর্যায়ে হনুমান সীতাকে খুঁজতে খুঁজতে এক সময়ে রাবণের শয্যাগৃহের অলিন্দে উপস্থিত হলেন। সেখানে মদ বিহ্বল নিদ্রাপ্লুত রাবণের সঙ্গে বিস্রস্তবাসা বহুতর সুন্দরী রমণীদের দেখা গেল। এই সমস্ত রমণীদের শয্যাপ্রান্তে হনুমান আরও একটি রূপবতী নারীকে দেখতে পেলেন। তাঁর সমস্ত অঙ্গে মণি-মুক্তা-বৈদূর্যের-আভরণও তাঁর দেহ সৌন্দর্যের কাছে ম্লান হয়ে গেছে। শুধু এই একটি রমণীর সৌন্দর্যে রাবণের সম্পূর্ণ শয্যাগৃহ যেন বিভূষিত হয়ে উঠেছে— বিভূষয়ন্তীব চ স্বশ্রিয়া ভবনোত্তমম্। মন্দোদরীর গায়ের রঙ সোনার মতো, মণিমুক্তা-মাণিক্যের ছটায় রাবণের অন্তঃপুরের ঈশ্বরী মনে হচ্ছিল মন্দোদরীকে— এতটাই গৌরীং কনকবর্ণাভাম্ ইষ্টামন্তঃপুরেশ্বরীম্।

মন্দোদরী এই সুন্দরী, রূপ এবং যৌবনের প্রাচুর্য তাঁর এতটাই যে, প্রথম দর্শনে হনুমান তাঁকেই রামরমণী সীতা বলে ভুল করলেন— তর্কয়ামাস সীতেতি রূপযৌবনসম্পদা। তর্কযুক্তির মাধ্যমে হনুমানের ভুল ভেঙে গিয়েছিল অচিরেই। কিন্তু এই অপ্রতিম সৌন্দর্য মূর্তিকে যিনি নিজের অধিকারে পেয়েছিলেন, সেই রাবণের ভুল কিন্তু ভাঙেনি। অবশ্য সীতার সৌন্দর্য-মাধুর্যে রাবণ কতটা অভিভূত ছিলেন জানি না এবং এই অভিভূতির ব্যাপারে আক্ষরিক প্রমাণ যতই থাকুক আমাদের ধারণা, রাবণ

কোনওদিন তাঁর অভিমান-দর্প ভুলতে পারেননি বলেই সীতাকে রামচন্দ্রের হাতে তুলে দিতে পারেননি। শূর্পনখার প্ররোচনায় ক্ষণিকেব উত্তেজনাবশে একবার যেহেতু তিনি সীতাকে নিয়ে এসেছিলেন, অতএব সারা জীবন তিনি আপন কৃতকর্মকে অতিক্রম করবেন না।

অথচ রাণী মন্দোদরীর কিন্তু সেই বাস্তব বোধ ছিল, যা রাবণের ছিল না। রাবণের জীবৎকালে মন্দোদরী তাঁর মুখের ওপব কথা বলতে পারেননি। কেননা বললে হয়তো বিভীষণের মতো একইভাবে পদাঘাত জুটত তাঁর কপালে। অন্তত এখানেও তাঁর বাস্তব বোধই কাজ করেছে। কিন্তু রাবণের মৃত্যুর পর মন্দোদরী যে মর্মন্তুদ বিলাপ করেছিলেন, তার মধ্যে রাবণের শক্তি ক্ষমতা এবং ব্যক্তিত্বের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা যেমন কাজ করছে তেমনই কাজ করছে, নিজস্ব বিশ্বাস, বৈদগ্ধ্য এবং রুচি।

সম্পূর্ণ রামায়ণের মধ্যে মন্দোদরীর নিজস্ব কথাবার্তা খুব বেশি নেই। রাবণের পট্টমহিষী হওয়া সত্ত্বেও লঙ্কারাজ্যের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে মন্দোদরীর কোন ব্যক্তিগত আলাপ অথবা উক্তি-প্রত্যুক্তি শোনা যায় না, রাজরাণী হিসেবে তাঁরও যে কোন বক্তব্য থাকতে পারে, থাকতে পারে রাবণের ওপরেও কোন অধিক্ষেপ, সেটা কিন্তু রামায়ণের অন্য স্থান থেকে বোঝাই যায় না। কিন্তু রাবণের মৃত্যুর পর যা কিছুই তিনি সত্য মনে করেছেন, তা তিনি বলতে দ্বিধা করেননি— হয়তো রাবণ আর উত্তর দিতে পারবেন না বলেই তিনি বলতে পেরেছেন রাবণের অপ্রিয় কথাগুলি।

এই কথাগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বোধহয় দেবর বিভীষণ সম্বন্ধে মন্দোদরীর ধারণা এবং সে ধারণা খুব সহজ। মন্দোদরী বিশ্বাস করেন— যে ভাল কাজ করে, সে ফলও ভালই পায়। আর যে অন্যায় কাজ করে, সে ফলও পায় সেইরকম। ঠিক এই দৃষ্টিতে বিভীষণ তাঁর সত্যতা এবং ন্যায়পরায়ণতার জোরে জীবিতও রইলেন এবং এই লঙ্কারাজ্যও তাঁরই অধিকারে এল। অন্যদিকে অন্যায় এবং পরস্ত্রী-হরণের মতো অসভ্য কাজ করে রাবণের রাজ্যও গেল, জীবনও গেল— বিভীষণঃ সুখং প্রাপ্তস্ত্বং প্রাপ্তঃ পাপমীদৃশম্। বস্তুত মন্দোদরী যে প্রকৃতির মানুষ বিভীষণের নীতিবোধ এবং ন্যায়নিষ্ঠার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ছিল সমধিক। সেই কারণেই রাবণের শক্তি এবং প্রভাবের সমস্ত দৃষ্টান্তগুলি স্মরণ করেও তিনি বিভীষণের সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ মন্তব্য করে বলেছেন— তুমি যেদিন মৈথিলী সীতাকে ধরে এনেছিলে, সেদিন আমার দেওর সত্যবাদী বিভীষণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন হতাশায়— সত্যবাক্ স মহাবাহো দেবরো মে যদববীৎ— তিনি বলেছিলেন— রাক্ষস-প্রধানদের শেষ সময় উপস্থিত হয়েছে এবার এবং তা হয়েছে তোমারই কাম-ক্রোধ এবং তোমারই কুকর্মের ফলে। তোমারই জন্য আজ আমরা সকলে সমূলে উচ্ছিন্ন হলাম— নিবৃত্তস্ত্বৎ কৃতেনার্থঃ সো'য়ং মূলহরো মহান্।

বিভীষণের ন্যায় চরিত্রে মন্দোদরী কতটা বিশ্বাস কবতেন যে, মৃত্যুর পর যখন মৃত স্বামীর গুণাবলী শুধু স্মরণ করার কথা— এবং তা তিনি করেছেনও— কিন্তু সেখানেও তাঁর এই কনিষ্ঠ দেবরটির সারগর্ভ সত্যনিষ্ঠার কথা রাবণের গুণাবলীকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে।

বিভীষণের প্রতি মন্দোদরীর শব্দগুলি নিবেদন করে আমি একবারও প্রমাণ করতে চাইছি না যে, রাবণের জীবৎকালে মন্দোদরী বিভীষণের প্রেমে পড়েছিলেন। পক্ষান্তরে বোঝাতে চাইছি— রাবণের জীবৎকালে মন্দোদরী রাবণের লাম্পট্য এবং ক্রোধ-ব্যবহারের বিরুদ্ধে যেমন একটি শব্দও উচ্চারণ না করে তাঁর পাতিব্রত্যের আদর্শ বজায় রেখেছেন, তেমনই বিভীষণের সততা, ন্যায় পরায়ণতা তথা বাস্তববোধের প্রতিও তিনি তাঁর অন্তরে মর্যাদা বহন করে গেছেন নিশ্চুপে অর্থাৎ সেখানেও তিনি রাবণকে অতিক্রম করেননি। কিন্তু বিভীষণের সমস্ত ব্যবহারের প্রতি যেহেতু তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল, তাই রাবণের মৃত্যুর পর তিনি যখন বিভীষণের পত্নীরূপে পরিণত হলেন সমাজের নিয়মে, তখন

যতখানি তিনি বিভীষণের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন, তার থেকে তিনি বেশি মিলিত হয়েছেন তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা মূর্তির সঙ্গে, সত্যমূর্তির সঙ্গে, নীতি-নিষ্ঠার বিগ্রহের সঙ্গে। রাবণের অবর্তমানে এই দ্বিতীয় স্বামীটি মন্দোদরীকে সত্য এবং ন্যায়ের পতিত্ব দান করায় নিন্দিতা হওয়ার পরিবর্তে মন্দোদরী পাতকনাশিনী হয়ে গেছেন। সকালে উঠেই তাই এই রাক্ষসীকে স্মরণ করতে হয়, কেননা প্রথম স্বামীর মৃত্যুর পর যদি দ্বিতীয়ের অঙ্কশায়িনী হতে হয়, তবে সেই শয্যায় যেন প্রেমের সঙ্গে পূর্ববাহিত শ্রদ্ধা থাকে, পূর্বমিলনের চেয়ে সেই প্রেমে যেন নীতি-নিষ্ঠার অতিশয়িনী বৃত্তি থাকে— তাতে রাবণরূপী সর্পটি মারা গেলেও পাতিব্রত্যের যষ্টিদণ্ডটি অটুট থাকে।

ভিন্নমত ও ভাববিদ্রোহ : প্রাচীন ভারতীয় দৃশ্যপট

প্রীতি কুমার মিত্র

১.০ উপক্রম

ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতার সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর বিপুল বৈচিত্র্য। তার সাথে আছে যুগে যুগে নানা পরিবর্তনের বর্ণিল ইতিহাস। সুপ্রাচীন কাল থেকে নিরন্তর প্রবহমানতা সত্ত্বেও ভারতীয় সভ্যতা এক ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত একমুখী জীবনদর্শনের বাঁধানো রাস্তা অনুসরণ করে চলেনি। বহুমার্গগামী এই প্রাচীন সভ্যতা সতত নানা পরিবর্তন অর্জন করে বিচিত্র ধারায় বিকশিত হয়েছে। বহুলতা ও পরিবর্তনের এই সমারোহের পেছনে যেসব গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে তার অন্যতম হচ্ছে ভিন্নমত ও ভাববিদ্রোহের উপস্থিতি। ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার বলেন :

> এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, ভারতীয় সমাজের মতো জটিল ও পরিবর্তনশীল যেকোনো সমাজে অবশ্যই ভিন্নমত, প্রতিবাদ ও বিরোধিতার ধারণা বিদ্যমান থাকতে হবে। অন্যথায় পরিবর্তনের মূল ব্যাপারটাই নাকচ হয়ে যাবে।[১]

ঐতিহাসিক এস. এন. আইজেনস্টাডও লক্ষ্য করেছেন যে, ভারতের চিরাগত বিভিন্ন ধারণাসূত্র ও প্রাতিষ্ঠানিক ধরন, যার মধ্যে ভিন্নমতের শক্তিসমূহও বিদ্যমান, সেগুলি আধুনিকতার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে ভারতকে সাহায্য করেছে।[২] তবে প্রাগাধুনিক যুগেও ভারতকে বহু দেশি-বিদেশি অভিনবত্বের মোকাবেলা করতে হয়েছিল এবং সে কাজ সহজ হয়েছিল চিন্তাধারায় অনেকত্ব ও ভিন্নমত লালনের ঐতিহ্য থাকার ফলে। প্রাচীন ভারতে চিন্তাক্ষেত্রে ভিন্নমত ও বিরুদ্ধ ভাবনার জোরালো উপস্থিতি এবং উপমহাদেশের সভ্যতা নির্মাণে তার ভূমিকার উপর আলোকপাত করাই বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য। তবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার আগে ভিন্নমত ও সংশ্লিষ্ট প্রত্যয়সমূহের লক্ষিতার্থ বিশদ করে নেয়া জরুরি।

২.০ ভিন্নমত কি?

এক সময়ে 'ডিসেন্ট' (Dissent) বলতে ষোলো ও সতেরো শতকে ইংল্যান্ডে ঘটে যাওয়া ধর্মীয় বিদ্রোহকে বোঝানো হতো। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে 'ডিসেন্ট' একটি প্রশস্ত ধর্মনিরপেক্ষ অর্থ লাভ করে এবং সক্রেটিস, গ্যালিলিও, টম পেইন, হেনরি থরো, মার্টিন লুথার কিং প্রমুখের অবাধ্যতা এর আওতায় আসে।[৩] এই অর্থে প্রাচীন ভারতের চার্বাক ও মধ্যযুগের দারা শিকোহ্ (১৬১৫-৫৯) প্রমুখ ভাববিদ্রোহীরা 'ডিসেন্টার' বলে বিবেচিত হতেই পারেন। অন্য অনেক প্রত্যয়ের মতো 'ডিসেন্ট' কথাটির সঠিক সংজ্ঞা দেয়া দুঃসাধ্য। ফ্রেড্রিক গিফিন ও রনাল্ড স্মিথ রচিত *এগেইন্স্ট দ্য গ্রেইন* [স্রোতের বিপরীতে] গ্রন্থে বলা হয়েছে: "সহজ সংজ্ঞায় 'ডিসেন্ট' অর্থ 'স্ট্যাটাস ক্যো' বা প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ।"[৪] জর্জ স্বোপ মনে করেন, চিরাগত প্রথা ও ঐতিহ্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ও প্রতিরোধই ডিসেন্ট।[৫] অতএব সহজ ও সাধারণ অর্থে 'ডিসেন্ট' বলতে বোঝায় ক্ষমতাসীন কর্তৃত্বের সাথে মতের অমিল।

বুৎপত্তিগত অর্থে ডিসেন্ট বা ভিন্নমত মূলে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক কর্ম যা প্রথমে কোনো এক ব্যক্তির মনের মধ্যে ঘটে।[৬] জন মেকলিন বলেন, "ভিন্নমত মূলত বুদ্ধিবৃত্তিক তথা সমালোচনাধর্মী এবং তা অধিকার নির্ণয় ও স্বাধীনতা রক্ষায় আগ্রহী।"[৭] ফলে ভিন্নমতের রয়েছে একটি রাজনৈতিক মাত্রা যাকে প্রায়ই 'প্রটেস্ট' বা প্রতিবাদ বলা হয়ে থাকে। গিফিন ও স্মিথ অনুভব করেন যে, "এক জন ভিন্নমতাবলম্বী ব্যক্তি বিদ্যমান ব্যবস্থার মধ্যে ত্রুটি লক্ষ্য করে তার প্রতিকার চান।"[৮] এ-ধরনের চেষ্টাই প্রতিবাদ, যা বহুসংখ্যক সমর্থকপুষ্ট হয়ে প্রতিবাদ আন্দোলনে পরিণত হয় এবং সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন পড়ে একটি মতাদর্শ ও কর্মনীতির। যখন এ দুটি জিনিসেব যোগান মেলে তখন ওই ভিন্নমতই পরিণত হয় এক নতুন 'অর্থোডক্সি' বা অধিষ্ঠিত কর্তৃত্বে, কিংবা অন্তত একটি 'হেটেরোডক্সি' বা বিকল্প অধিষ্ঠানে। এখানে একটি বৃত্তাকার পরিণতির দেখা মিলছে : অর্থোডক্সি → প্রটেস্ট → মুভমেন্ট → হেটেরোডক্সি → অর্থোডক্সি।
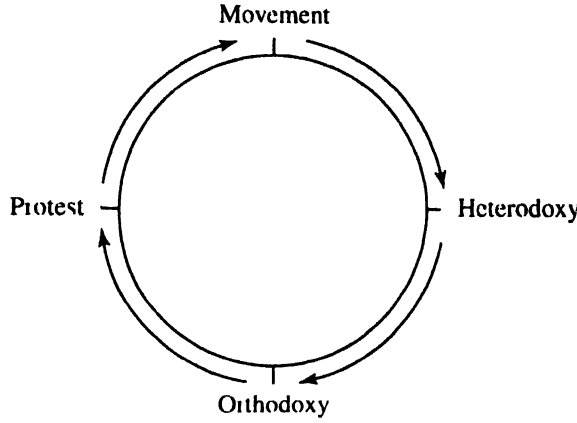
অতএব ভিন্নমতের পটভূমিতে রযেছে একটি ক্ষমতাসীন কর্তৃত্ব যাকে অর্থোডক্সি বা 'অধিষ্ঠান' বলা যায়। এর সমর্থনে থাকে একটি সামাজিক সংগঠন, যেমন একটি প্রতিষ্ঠান, একটা রাষ্ট্র বা সরকার, অথবা একটা চার্চ বা ধর্মাধিষ্ঠান যার কর্তৃত্ব একটি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের উপর বিরাজিত। অধিষ্ঠান সচরাচর ধারণ করে থাকে কতিপয় আদর্শিক মৌল— যেমন, কোনো ধর্মবিশ্বাস, কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ কিংবা সাহিত্য ও শিল্পকলা বিষয়ক নীতিমালা। অধিষ্ঠানের আরো থাকতে হবে একটি 'ইতিহাস' বা ঐতিহ্য— আধিপত্যের একটি উত্তরাধিকার যা থেকে উৎসারিত হয়ে ওই অধিষ্ঠানের প্রতি সম্ভ্রমবোধ। তবে অধিষ্ঠিত কর্তৃত্বের সবচেয়ে বড় উপাদান হচ্ছে এর শক্তি, অর্থাৎ নিজ শাসনক্ষেত্রের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখার এবং অবাধ্যতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষমতা।

ভিন্নমত কিন্তু কোনো পরিপূর্ণ মতাদর্শ বোঝায় না, বোঝায় একটি আপেক্ষিক অবস্থান যেটি উৎসের দিক থেকে বৌদ্ধিক এবং সম্ভাবনার দিক থেকে রাজনৈতিক। ভিন্নমত যদি সংগঠিত অনুসারি-দল পায়, একটা মতাদর্শ নির্মাণ করতে পারে, এবং আন্দোলনের জন্ম দেয় তাহলে সেটি একটি বিকল্প অধিষ্ঠানে পরিণত হয়, যার লক্ষ্য থাকে ক্ষমতাসীন অধিষ্ঠানকে অপসারিত করে তার জায়গায় নতুন অধিষ্ঠান হিসেবে নিজে ক্ষমতায় আরোহণ করা। ধর্মীয় হেটেরোডক্সিগুলো প্রায়শ এ ধরনের বৃত্তাকার পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়। প্রাগাধুনিক ভারতে জৈন, বৌদ্ধ, আজীবিক ও শিখ ধর্মের বিকাশে এরকম বৃত্তপথ অনুসরণের দৃষ্টান্ত রয়েছে। তবে বর্তমান আলোচনায় আমরা হেটেরোডক্সি বা বিকল্প অধিষ্ঠানকে ভিন্নমতের মধ্যে ধরবো না, কেননা হেটেরোডক্সিও একটা 'ডক্সি' এবং অর্থোডক্সির সাথে তার পার্থক্য শুধু ক্ষমতায়, বৌদ্ধিক কঠোরতার দিক থেকে দুই-ই সমান।

এখানে ভিন্নমতকে যেভাবে বোঝা হচ্ছে তাতে সেটি একটি মুক্তমুখ (open-ended) দ্বিমত যা পরিবর্তন ও নতুন অনুসন্ধানের ডাক দেয়, কিন্তু আবশ্যিকভাবে কোনো নিবর্তনরেখা টানে না বা পুরোনো অধিষ্ঠানের পরিবর্তে নয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে না। অধিষ্ঠিত কর্তৃত্বের সাথে দ্বিমতের শুরু থেকে ভিন্নমতাবলম্বীর অবাধ্যতা প্রতিবাদে রূপ পাওয়া পর্যন্ত অধ্যয়ন করাই ভিন্নমত গবেষণার সঠিক শৈলী বলে মনে হয়। প্রতিবাদ বহুজনের আন্দোলনে পর্যবসিত হওয়ার সাথে সাথে তা আর বৌদ্ধিক *পর্যায়ে থাকে না, প্রবেশ করে বাস্তব ঘটনার জগতে যা সাধারণ ইতিহাসের বিষয়বস্তু। এই নিবন্ধে* ভিন্নমত অধ্যয়নের চেষ্টা করা যাচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসের আওতায়, যে ইতিহাস ধ্যান-ধারণা তথা ভাব নিয়ে কাজ করে, নিরেট ঘটনাবলী নিয়ে ততোটা নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বর্তমান অনুসন্ধানে প্রাচীন ভারতের সুবিদিত ধর্মীয় হেটেরোডক্সিগুলির চেয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়া হবে চার্বাকীয় অবাধ্যতা তথা অন্যান্য ব্যক্তি-ভিন্নমতীদের উপর। পক্ষান্তরে সংগঠিত বৌদ্ধধর্ম, সংঘ ও শ্রমণগোষ্ঠীর চেয়ে বেদ ও ব্রাহ্মণ কর্তৃত্বে গৌতম বুদ্ধের অনাস্থা এবং ওই কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে তাঁর চ্যালেঞ্জকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হবে।

৩.০ ভিন্নমতের পুরাকাহিনী : বৈদিক, মহাকাব্যিক, পৌরাণিক

ভারতে ভিন্নমতের ইতিহাস শুরু হয়েছে *ঋগ্‌বেদের* সময় থেকেই। বেশ কয়েকজন বৈদিক ঋষি ভিন্নমত পোষণ করে তখনকার অধিষ্ঠিত কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। সে সময়ের অধিষ্ঠিত কর্তৃত্বের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল দেবতাদের উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং জন্মভিত্তিক বর্ণপ্রথা। এগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদই ওই বিদ্রোহী ঋষিদের প্রধান কাজ ছিল। এরকম অন্তত চারজন ঋষির বিষয় এখানে উপস্থাপন করা যাচ্ছে।

৩.১ মহীদাস ঐতরেয়

শূদ্রজাতীয়া ইতরার গর্ভজাত বালকের সাথে তার ব্রাহ্মণ বাবা ঋষি বিশাল বৈষম্যমূলক আচরণ করলে ছেলেটি মায়ের কাছে এর কারণ জানতে চায়। ইতরা জানান যে, তাঁরা শূদ্র, আর শূদ্ররা 'মহী' বা মাটির সন্তান। এবং মাটি-মা ছাড়া তাঁদের কোনো বান্ধব নেই। এরপব মাটি-মা ধরিত্রির কাছে বারো বছর ধরে শিক্ষা নিয়ে ওই বালক জ্ঞান অর্জন করলো। ধরিত্রির প্রতি ভক্তির জন্য তার নাম হলো **'মহীদাস'** এবং মা ইতরার নামে পরিচয় হলো 'ঐতরেয়'।[৯] সুদীর্ঘজীবী ঋষি মহীদাস পরে *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ঐতরেয় আরণ্যক* ও *ঐতরেয় উপনিষদ* নামক *ঋগ্‌বেদান্তর্গত* তিনটি গ্রন্থ রচনা করে অমর হয়ে আছেন। *ঐতরেয় ব্রাহ্মণে* উপস্থাপিত একটি মৌলিক ধারণা এই যে, ঈশ্বর হচ্ছেন মহত্তম শিল্পী এবং ঐশ্বরিক শিল্পের অনুপ্রেরণা থেকেই মানবিক শিল্পের জন্ম হয়েছে। ঈশ্বরোপাসনার মাধ্যম হিসেবে শিল্পকলা যাগযজ্ঞের চেয়ে ন্যূন নয় এ কথাও ওই গ্রন্থে বলা হয়েছে।[১০]

এভাবে মহীদাস ঐতরেয় সমকালীন ঋগ্‌বেদীয় অর্থোডক্সি থেকে এক দ্বিমুখী ভিন্নমত উপস্থিত করলেন। প্রথমত, শুষ্ক আচারসর্বস্ব যজ্ঞীয় আধ্যাত্মিকতার একটি অভিনব ও সৃজনশীল বিকল্প তিনি নির্দেশ করলেন। দ্বিতীয়ত, নিজ দৃষ্টান্তে তিনি প্রমাণ করলেন জন্ম নয়, ব্যক্তিগত গুণাবলীই সমাজে মানুষের মর্যাদা নির্ণয়ের সঠিক মাপকাঠি। এ প্রসঙ্গে তাঁর রচিত *ঐতরেয় ব্রাহ্মণে* ঋষি **কবশ** ঐলূষের উপাখ্যান বর্ণনা করা হয়েছে। ইলুষ নামক ব্রাহ্মণের পুত্র কবশ 'দাস' জাতীয়া মহিলার গর্ভজাত বলে সরস্বতী নদীতীরে যজ্ঞানুষ্ঠানরত এক দল ব্রাহ্মণ তাঁকে যজ্ঞস্থল থেকে তাড়িয়ে দেন। বিতাড়িত কবশ মরুপথে হাঁটতে হাঁটতে তৃষ্ণায় কাতর হয়ে সরস্বতী নদীর কাছে জল প্রার্থনা করলে নদী তৎক্ষণাৎ গতি পরিবর্তন করে যজ্ঞরত ব্রাহ্মণদেরকে পরিত্যাগপূর্বক কবশের পদমূলে প্রবাহিত হলো। এই অলৌকিক

ঘটনায় ব্রাহ্মণেরা অহংকার ছেড়ে কবশের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিলেন।[11] পরে ঋষি হয়ে কবশ কতিপয় বেদমন্ত্র রচনা করেন, যেগুলি *ঋগ্‌বেদের* দশম মণ্ডলে সন্নিবিষ্ট আছে।

৩.২ বিশ্বামিত্র বনাম বশিষ্ঠ

গোঁড়া ব্রাহ্মণ ঋষি বশিষ্ঠের সাথে বিদ্রোহী বিশ্বামিত্রের দ্বন্দ্বের কথা সুবিদিত। বিষয়টি বৈদিক, মহাকাব্যিক ও পৌরাণিক সাহিত্যে কতিপয় উপাখ্যানের মাধ্যমে প্রলম্বিত হয়েছে। ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বসহ জন্মভিত্তিক বর্ণবাদ, মানুষ ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উপর দেবতাদের আধিপত্য, নরবলি সহ রক্তপাতমূলক যাগযজ্ঞের মাধ্যমে দেবতাদের তুষ্ট করা, এবং অপরিবর্তনীয় সামাজিক ব্যবস্থা— এগুলির সমন্বয়ে যে ব্রাহ্মণ্য অধিষ্ঠিত তন্ত্র গড়ে উঠেছিল তার প্রতিনিধিত্ব করতেন ঋষি **বশিষ্ঠ**। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন ক্ষত্রিয় থেকে তপস্যার বলে ব্রাহ্মণ হয়ে যাওয়া ঋষি **বিশ্বামিত্র**, যাঁর সপ্রশংস উল্লেখ মহীদাসের *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ* ও *ঐতরেয় আরণ্যকে* পুনঃপুন করা হয়েছে। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাহিনীতে এক দিকে রূপকায়িত হয়েছে চিরায়ত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় দ্বন্দ্ব, অপর দিকে আচারক্লিষ্ট বৈদিক ধর্মচর্চার বিপরীতে তপশ্চর্যার উৎকর্ষ উদাহৃত হয়েছে। তপঃশক্তির প্রভাবেই বিশ্বামিত্র যজ্ঞযাযী ব্রাহ্মণ ও যজ্ঞভুক্ দেবতাদের মাথা নত করাতে পেরেছিলেন।

ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠ ঋষির হেফাজতে থাকা স্বর্গীয় গাভী 'নন্দিনী'কে জোরপূর্বক দখলে নিতে গিয়ে ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের অলৌকিক শক্তির মোকাবেলায় ব্যর্থ হন। তারপর রাজ্য ও সংসার ছেড়ে কঠোর তপস্যায় নিরত হন। দেবরাজ ইন্দ্রের সকল কাবসাজি ব্যর্থ করে বিশ্বামিত্র তপস্যায় সিদ্ধি লাভ করেন এবং অভূতপূর্ব সব অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করতে থাকেন। এতে দেবতাদের মর্যাদা হেট হওয়ার উপক্রম হলে ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং বশিষ্ঠসহ ঋষিকুল বিশ্বামিত্রকে 'ব্রাহ্মণ' বলে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন। এভাবে বিদ্রোহী বিশ্বামিত্র জন্মগত ব্রাহ্মণত্বের তত্ত্ব খারিজ করেন। এবং নিজেকে শুধু ব্রাহ্মণই নয়, একজন প্রথম সারির ঋষি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। বিখ্যাত 'গায়ত্রী মন্ত্র' সহ *ঋগ্‌বেদের* গোটা তৃতীয় মণ্ডল তাঁর রচনা। আর বশিষ্ঠ সপ্তম মণ্ডলের রচয়িতা। দেবতা-ব্রাহ্মণ জোটের বিরুদ্ধে বিশ্বামিত্রের আরও অনেক সাহসী প্রতিবাদের খবর পৌরাণিক রূপকে পরিবেশিত হয়েছে।

৩.২.১ ত্রিশঙ্কুর উপাখ্যান

পুরোহিত বশিষ্ঠর প্ররোচনায় সূর্যবংশীয় রাজা ত্রয্যারুণ তাঁর একমাত্র পুত্র ও উত্তরাধিকারী যুবরাজ সত্যব্রতকে নারীহরণের দায়ে নির্বাসিত করলে তিনি অন্ত্যজ চণ্ডালদের আশ্রয়ে থেকে শিকার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে থাকেন। স্বাভাবিকভাবে তাঁর মনে বশিষ্ঠের বিরুদ্ধে ক্ষোভ জমা হয়। এ দিকে পুত্রবিরহে কাতর রাজা ত্রয্যারুণ বনবাসে গেলে বশিষ্ঠ নিজেই রাজকার্য হাতে নেন। তাঁর শাসনকালে বারো বছর ব্যাপী এক বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষে দেশ ছারখার হতে থাকে। ওই সময় তপস্যার প্রয়োজনে বিশ্বামিত্র দেশের বাইরে অবস্থান করছিলেন। তাঁর স্ত্রী-পুত্রগণ অনাহারে আছেন দেখে সত্যব্রত শিকারলব্ধ পশুমাংস দিয়ে তাঁদের আহার যোগান। খরা-দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট দেশে বন্য পশু দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠলে একদা আর কিছু না পেয়ে সত্যব্রত বশিষ্ঠের গাভী নন্দিনীকে বধ করে কিছু মাংস নিজে খান এবং বাকিটা বিশ্বামিত্রের পরিবারকে দেন। ক্রুদ্ধ বশিষ্ঠ সত্যব্রতকে বর্ণচ্যুত করে 'চণ্ডাল' বলে ঘোষণা করেন এবং নারীহরণ, গোহত্যা ও গোমাংস ভক্ষণরূপ তিন পাপে পাপী বলে '**ত্রিশঙ্কু**' নাম দেন।

পরে উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসন লাভ করে ত্রিশঙ্কু দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। তার পর এক পর্যায়ে সশরীরে স্বর্গে যাওয়ার বাসনায় পুরোহিত বশিষ্ঠকে প্রয়োজনীয় যজ্ঞ সম্পাদনের নির্দেশ দেন। বশিষ্ঠ

ও তাঁর ছেলেরা অসম্মত হওয়ায় রাজা বিকল্প পুরোহিতের সন্ধানে প্রবৃত্ত হলে বশিষ্ঠ পুনরায় তাঁকে 'চণ্ডাল' ঘোষণা করেন। ফলে অন্য কোনো ব্রাহ্মণও যজ্ঞ সম্পাদনে রাজি হলেন না। এমন সময় গৃহ-প্রত্যাগত বিশ্বামিত্র দুর্দিনে তাঁর পরিবারের প্রতি ত্রিশঙ্কুর উপকারের কথা জানতে পেরে রাজার যজ্ঞ সম্পাদনের দায়িত্ব নিলেন। যজ্ঞের ফলে ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গের দরজায় পৌঁছালে স্বর্গরাজ ইন্দ্র 'পাপিষ্ঠ চণ্ডাল' বলে বজ্রাঘাতে তাঁকে পৃথিবীতে ফেরত পাঠান। বিশ্বামিত্র তপোবলে ত্রিশঙ্কুকে মাঝ আকাশে আটকে দিয়ে তাঁর জন্য দ্বিতীয় স্বর্গ নির্মাণ করে সেখানে বিকল্প ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতা সৃষ্টি করে প্রতিষ্ঠা করেন। এমনকি দ্বিতীয় ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণের লক্ষ্যে আকাশে নতুন নতুন নক্ষত্রমণ্ডল স্থাপন করতে শুরু করেন। ভীত-ত্রস্ত দেবতারা বিদ্রোহী বিশ্বামিত্রের সাথে সমঝোতায় আসতে বাধ্য হলেন। বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট নক্ষত্রমণ্ডলকে পুরোনো ব্রহ্মাণ্ডে সামিল করে নেয়া হলো এবং সেইখানে ত্রিশঙ্কু এক উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে বিরাজ করতে লাগলেন। এই কাহিনীতে বিশ্বামিত্রকে দেখা গেল বশিষ্ঠ-সমর্থিত অধিষ্ঠিত মূল্যবোধসমূহকে প্রত্যাখ্যান করতে এবং মানুষের উপরে দেবতাদের আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করতে।

৩.২.২ শুনঃশেপের কাহিনী

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৭.১৩.১৮) ও কয়েকখানি পুরাণে বর্ণিত শুনঃশেপের উপখ্যানে বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র দ্বন্দের আর একটি অধ্যায় প্রকটিত হয়েছে। ত্রিশঙ্কুর পুত্র ও উত্তরাধিকারী **হরিশ্চন্দ্র** বশিষ্ঠের অনুগামী ছিলেন। একদা তিনি জলের দেবতা **বরুণ**-এর উদ্দেশ্যে নিজ পুত্র **রোহিতাশ্ব**কে বলি দেওয়ার অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু প্রতিশ্রুতি পূরণে দেরি হওয়ায় বরুণ হরিশ্চন্দ্রের শরীরে জলসঞ্চার করে তাঁকে শোথরোগগ্রস্ত করে তুললেন। এ দিকে তাকে বলি দেওয়া হবে জানতে পেরে বালক রোহিতাশ্ব পালিয়ে গেলে পুরোহিত বশিষ্ঠ ব্যবস্থা দিলেন যে, রোহিতাশ্বের বদলে একটি বালককে কিনে এনে বলি দেওয়া যেতে পারে। বরুণও এ প্রস্তাবে রাজি হলেন। তখন রোহিতাশ্ব অজীগর্ত নামক এক লোভী ব্রাহ্মণের কাছ থেকে এক শো গাভীর বিনিময়ে তার ছেলে শুনঃশেপকে কিনে আনলো। তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে বশিষ্ঠ বলির উদ্যোগ নিলেন। সেখানে বিশ্বামিত্রসহ অনেক ঋষি উপস্থিত ছিলেন, আর ছিলো অজীগর্ত নিজে। পুনরায় এক শো গাভী পেয়ে অজীগর্ত নিজেই ক্রন্দনরত বালককে হাড়িকাঠে বাঁধলো এবং তৃতীয় এক শত গাভীর বিনিময়ে তাকে বধ করার কাজটিও করতে উদ্যত হলো। এই মুহূর্তে বিশ্বামিত্র হস্তক্ষেপ করে হতভাগ্য শিশুটির প্রাণ রক্ষা করলেন এবং বরুণসহ দেবতাদেরকে যজ্ঞ ছাড়াই ফিরে যেতে রাজি করালেন। সেই থেকে নরবলি বন্ধ হলো। হরিশ্চন্দ্র রোগমুক্ত হলেন। বিশ্বামিত্র শুনঃশেপকে নিজের ছেলে হিসেবে গ্রহণ করে নাম দিলেন 'দেবরাত'।[১২] দেবরাত পরে ঋষি হয়েছিলেন এবং ঋগ্‌বেদের সাতটি মন্ত্র তাঁর রচনা বলে প্রসিদ্ধি আছে। এই কাহিনীতে ধর্মের নামে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় অনুসৃত ও দেবকুল সমর্থিত তিনটি ঘৃণ্য প্রথার বিরুদ্ধে বিশ্বামিত্রকে সোচ্চার হতে দেখা যায়। প্রথা তিনটি হচ্ছে— (১) মানুষ কেনা-বেচা, (২) নরবলি, এবং (৩) শিশুনির্যাতন।

৩.২.৩. চণ্ডালের সাথে খাওয়া-দাওয়া

বশিষ্ঠের সঙ্গে পরবর্তী আর এক দ্বন্দ্বে বিশ্বামিত্র রাজা হরিশ্চন্দ্রকে চণ্ডালের জীবন এবং তাঁর স্ত্রী ও পুত্রকে ক্রীতদাসের জীবনযাপন করতে বাধ্য করেন, যাতে রাজ পরিবার ভারতের নিম্নতম বর্গের মানুষদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা পেতে পারে। এখানে বিশ্বামিত্র বর্ণবৈষম্য, ভালো কাজ সম্পর্কে উচ্চবর্ণের আদর্শ, কিছু কিছু কাজ ও খাদ্য সম্পর্কে নেতিবাচক সংস্কার এসবের বিরুদ্ধে

প্রতিবাদী হয়েছেন। *মহাভারত* অনুসারে একবার বিশ্বামিত্র নিজে এক চণ্ডালের বাড়িতে কুকুরের মাংস খেয়েছিলেন।[১৩] ঋষি হিসেবে বিশ্বামিত্র প্রায় দাসত্বদশা প্রাপ্ত 'দস্যু' জনগোষ্ঠীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং দাসত্বপরায়ণ জাতিসমূহ তথা ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গ উভয়ের পৌরোহিত্য করতেন।[১৪] এসব ঘটনার তাৎপর্য এই যে, ওই বিদ্রোহী ঋষি ভারতীয় জনগণের মধ্যেকার ধর্মীয়, জাতিগোষ্ঠীগত ও বর্ণগত প্রাচীর ভাঙতে এবং সাংস্কৃতিক সংস্কার দূর করতে চেষ্টিত ছিলেন। দেবতাদের খামখেয়ালের উপর নির্ভরতার পরিবর্তে আত্ম-উন্নতির পথ অনুসরণ করাও তাঁর অন্যতম নীতি ছিল।

৩.৩ বিদ্রোহী ঋষি ভৃগু

ঋগ্‌বেদোক্ত মহর্ষি ভৃগু ও তাঁর বংশধরেরা দেবতাদের বিপরীতে পুনঃপুন তপস্বিসুলভ দ্রোহ প্রদর্শন করেছিলেন। ঋগ্‌বেদে তাঁরা অগ্নি-উপাসক হিসেবে উপস্থাপিত এবং বায়ু ও অগ্নির সাথে সংশ্লিষ্ট এক দল নভশ্চর দেবতার সাথে সম্পর্কিত। এ রকম এক জন কনিষ্ঠ বায়ুদেবতা মাতরিশ্বা ভৃগুর নির্দেশে প্রমিথিউসের মতো স্বর্গ থেকে আগুন এনেছিলেন মানুষের জন্য।[১৫] পুরাণে ভৃগুকে দেখা যায় সবচেয়ে বড় দেবতাদের অমান্য করতে। শিব ও দক্ষের বিবাদে ভৃগু দক্ষের পক্ষ নিলে শিব তাঁর দাড়ি উপড়ে ফেলেছিলেন।[১৬]

৩.৩.১ ভগবানের বুকে পদাঘাত

পদ্ম পুরাণের নাটকীয় উপাখ্যানটি এ রকম : ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ এ নিয়ে এক বার ঋষিদের মধ্যে তুমুল বির্তক হয়। কোনো সিদ্ধান্তে পৌছাতে না পেরে ঋষিরা ভৃগুকে একমাত্র সদস্য করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করলেন। তদন্তে বেরিয়ে ভৃগু প্রথমে কৈলাস পর্বতে শিবের সাক্ষাৎকার নিতে গেলেন। কিন্তু শিব তখন পার্বতীর সাথে ব্যস্ত আছেন বলে ভৃগুকে ঘরে ঢুকতে দেয়া হলো না। বিরক্ত ভৃগু রায় দিলেন যে, শিব ধার্মিকদের পুজা পাওয়ার যোগ্য নন, কেবলমাত্র অপধর্মীরাই লিঙ্গ রূপে তাঁর পূজা করতে পারে।[১৭] তারপর ব্রহ্মার কাছে গিয়ে ভৃগু দেখলেন যে, স্তুতিপরায়ণ অনুচর পরিবৃত হয়ে আসীন ওই প্রবীণ দেবতা আত্মগরিমায় এতই বুঁদ যে ভৃগুর সবিনয় সৌজন্য-সঙ্কেত লক্ষ্যই করলেন না। 'ব্রহ্মা কারোই পুজো পাওয়ার যোগ্য নন' এই ঘোষণা দিয়ে ভৃগু চললেন বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর গৃহে। পরিচারকেরা তাঁকে সমাদর করে বিষ্ণুর শয়নকক্ষে নিয়ে গেলে ভৃগু দেখলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পরিপালক অনন্তশয়নে নিদ্রিত। বিষ্ণুর আলস্য ও কর্তব্য বিমুখতায় বিরক্ত হয়ে ভৃগু বিষ্ণুর বুকে কঠিন পদাঘাত করলেন। এতে অপমানিত বোধ করার বদলে বিষ্ণু মহর্ষিকে সময় মতো সমাদর করতে না পারায় ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে জানতে চাইলেন তিনি ব্যথা পেয়েছেন কি না। এবং এও জানালেন যে, মহর্ষির সংস্পর্শে তিনি নিজেকে সম্মানিত বোধ করেছেন। এ হেন বিনয়গুণে মুগ্ধ হয়ে ভৃগু তাঁকে সম্মান জানিয়ে ঘোষণা করলেন যে, একমাত্র বিষ্ণুই দেবতাদের এবং সৎ মানুষদের পূজনীয়।[১৮]

এ উপখ্যান শৈব ধর্মের বিপরীতে বৈষ্ণব ধর্মের গৌরব ঘোষণার জন্য রচিত বলে মনে করায় কোনো ভুল নেই। কিন্তু সর্বোচ্চ দেবতাদের বিরুদ্ধে তপস্বী ভৃগুর বিদ্রোহ দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার নয়। একজন মর্ত্য মানুষ দেবতাদের বিচার করে রায় দিচ্ছে এবং কোনো দেবতারই পূর্ণতা নেই বলে ঘোষণা করছে! এমন কি উৎকর্ষের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বিষ্ণুও কর্তব্যে গাফিলতির জন্য পৃথিবীবাসী মরণশীল এক মানুষের কাছে লাথি খেঁলেন! এই অসাধারণ নাটকীয়তাই বিশ শতকের বাঙালি 'বিদ্রোহী কবি' নজরুল ইসলামকে (১৮৯৯-১৯৭৬) চমৎকৃত করেছিল, যিনি স্বীয় বিদ্রোহকে প্রকাশ করতে বিদ্রোহী ভৃগুর রূপক বেছে নিয়েছেন :

আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দিই পদচিহ্ন;
আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ-হানা-খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন।
আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দেবো পদ-চিহ্ন![১৯]

৩.৪ ভৃগু ও ভরদ্বাজ

ভৃগু বিশ্বামিত্রের মতো তপস্বী শ্রেণীর বিদ্রোহী ছিলেন যিনি দেবতাদেরকে মোটেই মানতে চাননি। এমন কি পারিবারিক দেবতা অগ্নিকেও তিনি একবার অভিশাপ দিয়েছিলেন।[২০] উপরে বলা হয়েছে, ভৃগুকুলের ঋষিরা স্বর্গ থেকে আগুন পৃথিবীতে নিয়ে আসার ব্যাপারে ভূমিকা রেখেছিলেন। তাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন পবনদেবতাদের সাথে, যাঁদের একজন ওই আগুন আনার কাজটি সম্পন্ন করেন। আগুন ও বাতাসের এই সহযোগ দেবতাদেরকে একেবারেই পরিহার করার পথ দেখানোর ইঙ্গিত দেয়। *ঋগ্‌বেদের* ষষ্ঠ মণ্ডলের প্রখ্যাত ঋষি **ভরদ্বাজ**। তার সাথে একটি আকর্ষণীয় সংলাপে ভৃগু বস্তুজগতের অস্তিত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উপাদান হিসেবে আগুন ও বাতাসের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন, এমন কি কখনো কখনো আত্মার প্রয়োজনই বোধ করেননি।[২১] তবে ভৃগু আত্মাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেননি, যেটি ভরদ্বাজ করেছিলেন।[২২] এইসাথে আমরা প্রাচীন ভারতে আধ্যাত্মিকতার বিরুদ্ধে জড়বাদী চ্যালেঞ্জের প্রসঙ্গে উপনীত হলাম।

৪.০ বস্তুবাদী প্রতিদ্বন্দ্ব

কতিপয় প্রাচীনতর *উপনিষদে* বেশ কয়েকজন ভিন্নমতী ঋষির সাক্ষাৎ পাই যাঁরা 'বায়ু-প্রাণ তত্ত্বে'র প্রবক্তা হিসেবে মনে করতেন যে, মানব সত্তার চিৎ শক্তি বা বাক্‌শক্তি অপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে শ্বসন প্রক্রিয়া। পরবর্তী ভারতীয় চিন্তাধারায় যে প্রকৃতিবাদ দেখা যায় তার পূর্বসূরী এই 'বায়ুপ্রাণবাদী' দার্শনিকেরা। সবচেয়ে পুরোনো *উপনিষদ*গুলিতে যে শ-খানেক ভাবুকের নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে অন্তত আঠারো জন এই গোষ্ঠীভুক্ত। এর অর্থ হচ্ছে, প্রথম দিককার ঔপনিষদিক চিন্তাবিদরা, যাঁরা ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগেই আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁদের প্রায় ১৮% জীবন ও জগতের প্রাকৃতিক ব্যাখার দিকে ঝুঁকেছিলেন, এবং এটি তাঁরা করেছিলেন বিপুল সংখ্যাগুরু সহযোগীদের ভাববাদী ব্যখ্যার বিপরীতে অবস্থান নিয়ে। ব্রাহ্মণ হলেও এই ভিন্নমতীরা গোঁড়া ধর্মযাজকদের আচারানুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং তাঁদের জন্মান্তরবাদ প্রভৃতি রহস্যময় ধারণাসমূহে আস্থা রাখেননি। এভাবে এই 'বায়ুপ্রাণবাদী' ভাবুকেরা পুরোহিত ব্রাহ্মণদের অতিপ্রাকৃতবাদের বিরুদ্ধে প্রকৃতিবাদী ব্যাখার একটি সুপ্রাচীন প্রবণতার প্রতিনিধিত্ব করছেন।[২৩]

৪.১ উদ্দালক বনাম যাজ্ঞবল্ক্য

প্রথম দিককার *উপনিষদ*গুলোর মধ্যে *ছান্দোগ্য উপনিষদের* **উদ্দালক** আরুণি এবং ***বৃহদারণ্যক উপনিষদের* যাজ্ঞবল্ক্য** এই দুই বিখ্যাত ঋষির মধ্যেকার দ্বান্দ্বিকতা বিশেষ বিবেচনার দাবি রাখে। অধ্যাপক ওআল্টার রুবেনের মতে যথাক্রমে আদিম বস্তুবাদ ও আদিম ভাববাদের প্রতিনিধি হিসেবে ওই দুই ঋষি এক বিশিষ্ট দার্শনিক দ্বন্দ্বের অবতারণা করে প্রাচীন ভারতে দর্শনের প্রারম্ভ সূচিত করেছিলেন।[২৪] এক্ষেত্রে যাজ্ঞবল্ক্য সংখ্যাগরিষ্ঠ (৮২%?) মতের সমর্থক হিসেবে অধিষ্ঠিত তন্ত্রের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন এবং উদ্দালক প্রতিবাদী হিসেবে তাঁর বিপরীতে অবস্থান নিয়েছিলেন। ডেল রীপের পর্যবেক্ষণ অনুসারে, "উদ্দালক আগে থেকে চলে আসা বেদোক্ত প্রধান সৃষ্টিতত্ত্ব ও দেবতত্ত্ব খারিজ করে জগৎ সম্পর্কে এক ধরনের 'জড়প্রাণবাদী' (hylozoistic) এমন কি সরাসরি বস্তুবাদী ধারণা

অঙ্গীকার করেন।" *উদ্দালক জাতকে* উল্লিখিত উদ্দালকের বেদবিরোধী উক্তি উদ্ধৃত করে রীপ উদ্দালক সম্পর্কে বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গিও বিশদ করেছেন।[২৫]

তবে অধ্যাপক রুবেন উদ্দালক-যাজ্ঞবল্ক্য দ্বান্দ্বিকতাকে অবলোকন করেছেন গঙ্গা উপত্যকায় চলতে থাকা বিশাল বস্তুগত, রাজনৈতিক, সামাজিক ও বৌদ্ধিক রূপান্তরের পটভূমিতে। লৌহ যুগের আগমনে চারদিকের উপজাতিতন্ত্রের বিপরীতে কতিপয় রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল। শ্রেণীসংগ্রাম শুরু হচ্ছিল এবং ফলে মতাদর্শের প্রতিদ্বন্দ্বিতাও দেখা দিয়েছিল। বেদাচারের বিরোধী হয়ে উঠেছিলেন তপস্বীরা এবং অনেক চিন্তাশীল ব্রাহ্মণ বৈদিক দেবতাদের বিরুদ্ধে বলতে আরম্ভ করেছিলেন। আধিপত্যের জন্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়ে গিয়েছিল। চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতি বিজ্ঞান ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম লিপ্ত ছিল, এবং পদার্থবিদরা লড়ছিলেন ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে; জ্যোতির্বিদ্যা, ভূগোল, আইন, রাষ্ট্রতন্ত্র ইত্যাদি বিদ্যার উদ্ভব হচ্ছিল। রুবেনের জবানিতে ·

> আলোচনা প্রাচীন ভারতের এই নতুন যুগের বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল। সন্দেহ করাটা চেতনার সকল অঙ্গনে ফ্যাশানে পরিণত হয়েছিল। এবং তাব পরেই, বিশেষত বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনা শুরু হওয়ার পর, ওই সব সামাজিক ও মতাদর্শগত সংগ্রামের ভিত্তির উপর বস্তুবাদ ও ভাববাদের লড়াই দানা বেঁধে ওঠে...। উত্তরকালের যুক্তিবিদদের পূর্বসুরী হিসেবে উদ্দালক তাঁব দর্শনে স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তি ও নজির ব্যবহারের স্বকীয় পদ্ধতির মাধ্যমে এই নতুন বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন।[২৬]

৪.১.১ শ্বেতকেতুকে নিয়ে পরীক্ষা

নিজের ছেলে **শ্বেতকেতুর** উপর উদ্দালক যে একটি কৌতূহলোদ্দীপক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালিয়েছিলেন তার বিবরণ পাওয়া যায় ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে। উদ্দালক শ্বেতকেতুকে শিখিয়েছিলেন যে, 'মন' তৈরি অন্নের সূক্ষ্মতম অংশ দিয়ে; অনুরূপভাবে 'প্রাণ' ও 'বাক্' (বাক্শক্তি) তৈরি যথাক্রমে জলের ও অগ্নির সূক্ষ্মতম অংশ দিয়ে। এই তত্ত্বটি প্রমাণ করার জন্য তিনি ছেলেকে পনেরো দিন খাবার না খেয়ে শুধু প্রচুর জলপান করে থাকতে বললেন। উপবাসশেষে শ্বেতকেতু বাবার কাছে এলে উদ্দালক তাঁকে *ঋক্ সাম* ও *যজুর্বেদের* মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ করতে বললেন। শ্বেতকেতু জানালেন যে তিনি কিছুই মনে করতে পারছেন না। তখন উদ্দালক তাঁকে খাবার খেতে বললেন। খাদ্য গ্রহণের পর উদ্দালক সব কিছুই স্মরণ করতে পারলেন। এ থেকে উদ্দালক জড়বাদী ভঙ্গিতে সিদ্ধান্ত করলেন যে 'মন' (অর্থাৎ স্মৃতিশক্তি) খাদ্য থেকে উৎপন্ন হয়।[২৭]

৪.১.২ উদ্দালকীয় বস্তুবাদ

রুবেন জানাচ্ছেন যে, অধ্যাপক হারমান জাকোবি সর্বপ্রথম উদ্দালকের ধারণাকে মূলত বস্তুবাদী বলে ধরতে পেরেছিলেন। কিন্তু পরে পণ্ডিতেবা দেখান যে অত প্রাচীনকালে (আ. খ্রি. পূ. ৭ম শতক)·বস্তু ও চৈতন্যের মধ্যে পার্থক্য পরিষ্কার ছিল না। এ থেকে রুবেন উদ্দালককে থেলিসের (আ. ৬২৪-৫৪৭ খ্রি. পূ.) মতো একজন 'জড়প্রাণবাদী' (hylozoist) বলে সনাক্ত করেন। 'জড়প্রাণবাদ' একটি আদিম ধারণা যাতে সকল পদার্থকেই প্রাণিত বলে মনে করা হতো। কিন্তু যেহেতু উদ্দালক (এবং একটু পরবর্তী থেলিস) 'প্রথম সত্তা' হিসেবে কোনো বিশ্বাত্মা বা 'ব্রহ্ম' তত্ত্ব উপস্থাপন করেননি, তাই তাঁদের দর্শন ভাববাদ হতে পারে না, যা হতে পারে তার নাম 'আদিম বস্তুবাদ' (primitive

materialism)। একইভাবে যাজ্ঞবল্ক্যের ভাববাদও 'আদিম ভাববাদ' (primitive idealism) কারণ 'চিৎ'কে প্রথম ও 'জড়'কে দ্বিতীয় সত্তা বলে স্বীকার করলেও ওই দর্শন পরবর্তীকালের উচ্চতর ভারতীয় ভাববাদের 'মায়া ও 'বিবর্ত' সম্পর্কে *নিশ্চুপ।*[২৮] *তবে এই প্রাথমিক স্তরেও উদ্দালকের বস্তুবাদ ও যাজ্ঞবল্ক্যের ভাববাদ দুটি পরস্পর বিরোধী দর্শন হিসেবে তুলিত হওয়ার মতো যথেষ্ট স্পষ্ট ছিল।*

বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে রুবেন দেখিয়েছেন যে, সমকালীন ব্রাহ্মণ্য চিন্তার প্রধান প্রধান বিষয়গুলো সম্পর্কে উদ্দালক ও যাজ্ঞবল্ক্য দুজনই মতামত দিয়েছেন। সেসব আলোচনায় উদ্দালক সর্বদাই বস্তুবাদী ব্যাখ্যার দিকে ঝুঁকেছেন এবং যাজ্ঞবল্ক্য নির্ভর করেছেন ভাববাদী আন্দাজের উপর। উদ্দালকের মতে একজন মুমূর্ষু মানুষ প্রথমে হারায় তার মন (অর্থাৎ চৈতন্য বা পরিচিত জনদের চিনতে পারার ক্ষমতা), তারপর বাক্‌শক্তি, তারপর শ্বাসপ্রশ্বাস, এবং সব শেষে তাপ। এটি মৃত্যুর একটি যৌক্তিক বর্ণনা যা উদ্দালকের সৃষ্টিতত্ত্বের সাথে মোটামুটি সঙ্গতিপূর্ণ। ওই সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসারে অনাদি 'সৎ' (অস্তিত্ব) থেকে 'অন্নম্' (খাদ্য), 'আপঃ' (জল) এবং 'তেজঃ' (অগ্নি, শক্তি) উদ্ভূত হয়ে যথাক্রমে মন, শ্বাস ও বাক্‌শক্তিতে পরিণত হয়। মৃত্যুকালে মন, বাক্, শ্বাস ও তাপ ক্রমান্বয়ে শরীর ত্যাগ করে 'সৎ'-এ ফিরে যায়। আর 'সৎ' হচ্ছে পরম বস্তু যা প্রাণিত, অনাদি এবং চরম সত্য। মৃত্যু সম্পর্কিত রচনায় উদ্দালক অনশ্বর আত্মা কিংবা 'কর্ম' সম্পর্কে কিছুই বলেননি।[২৯]

পক্ষান্তরে যাজ্ঞবল্ক্য মুমূর্ষু মানুষের বর্ণনা দিতে গিয়ে তার দেহ, চোখ, মন, শ্বাস ও বাক্ বিভিন্ন প্রাকৃতিক উৎসে ফিরে যায় একথা বলার পর 'পুরুষ' বা মৃতের অবিনশ্বর আত্মা তার কর্মফলানুযায়ী গতি লাভ করে এই তত্ত্বের উপর জোর দেন।[৩০] এভাবে দেখা যাচ্ছে যে, তৎকালীন ব্রাহ্মণদের প্রধান দর্শন ভাববাদের প্রতিনিধিত্বকারী যাজ্ঞবল্ক্যের বিপরীতে একজন ভিন্নমতী হিসেবে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন 'জড়প্রাণবাদী' (hylozoist) উদ্দালক।

৪.১.৩ উদ্দালকের মূল্যায়ন

ভারতীয় প্রকৃতিবাদের ইতিহাসে উদ্দালকের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। ডেল রীপের মতে উদ্দালকই সর্বপ্রথম একটি দ্বৈততাবিহীন প্রাকৃতিক বিশ্বের ধারণা দেন— প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ সম্মিলিতভাবে বস্তুময় ও অণুগঠিত এক বিশ্বসত্তা উৎপন্ন করেছে। উদ্দালক উপরন্তু দিয়েছেন একটি বিশ্লেষণী পদ্ধতি যা বাস্তব পর্যবেক্ষণ-নির্ভর এবং প্রকাশ্যে সকল ইন্দ্রিয়ের প্রতি সংবেদনশীল, কিন্তু আচারনিষ্ঠ পুরোহিতদের ব্যবহৃত অতীন্দ্রিয়বাদী ছন্দোময় মন্ত্রমালা যা শ্রবণেন্দ্রিয়কে অভিভূত করে প্রত্যয় উৎপাদনের চেষ্টা পায় তেমন কিছুর প্রতি আগ্রহী নয়। এও বলা যায় যে, উদ্দালকই শুরু করেছিলেন সেই বিখ্যাত "ভারতীয় দ্বান্দ্বিকতা" যার বিষয়বস্তু হচ্ছে: অস্তি ও নাস্তির মধ্যে কোন্‌টি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিল? উদ্দালক মনে করতেন যে, স্রেফ ঐশী শক্তির বলে অনস্তিত্ব থেকে কোনো অস্তিত্ব বেরিয়ে আসতে পারে না। শেষত, যাজ্ঞবল্ক্য-সেবিত তৎকালীন নৈরাশ্যবাদী দার্শনিক ধারার বিপরীতে উদ্দালক একটি আশাবাদী ধারার সূচনা করেন।[৩১] এখানেও উদ্দালককে প্রতিষ্ঠিত ধারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

৪.২ চার্বাক

প্রাচীন ভারতে বস্তুবাদী ভিন্নমতের পরবর্তী পর্যায়ে রয়েছে 'চার্বাক' দর্শন। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে গৌতম বুদ্ধের অল্প পূর্বে অভির্ভূত এই দর্শন ভারতে কল্পিত বস্তুবাদের সর্বোত্তম উদাহরণ। তৎকালীন ধর্মীয়-দার্শনিক 'অধিষ্ঠিত তন্ত্রে'র বিরুদ্ধে চার্বাক দর্শন এক সার্বিক আক্রমণ শানিয়েছিল। ঈশ্বর, দেবকুল, স্বর্গ

ও নরক এবং অবিনশ্বর জীবাত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস, তথা কর্ম, জন্মান্তর, দুঃখভোগ, ও আধ্যাত্মিক মুক্তির ধারণায় অবিচল আস্থা এসব উপাদান নিয়ে গড়ে উঠেছিল ওই অধিষ্ঠিত তন্ত্র। মুক্তির অনুকূলে নানাবিধ আচারানুষ্ঠান ও প্রক্রিয়াদি ভারতীয় জনগণের ভাবনাচিন্তা ও কাজকর্মের অনেকটাই দখল করেছিল। মূলধারার অন্যান্য উপাদানের মধ্যে ছিল বর্ণভেদ, চিন্তাজগতে বেদের আধিপত্য, এবং সমাজে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য। কর্ম, জন্মান্তর, মোক্ষ/মুক্তি/নির্বাণ, তথা জীবন মানেই দুঃখ-ভোগ— এসব প্রত্যয় খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দের পূর্বেই ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন জীবনদর্শনে সাধারণভাবে গৃহীত হয়ে প্রায় ডগ্ম্যা (dogma) বা বদ্ধবিশ্বাসে পর্যবসিত হয়েছিল।[৩২] ফলে এর সকল উপাদানই বিকশিত চার্বাক দর্শনের আক্রমণের আওতায় এসেছিল।

৪.২.১ চার্বাকীয় পরম্পরা

ঐতিহ্যগতভাবে মনে করা হয় যে, চার্বাক একজন দার্শনিকের নাম যিনি প্রাচীন অতীত থেকে চলে আসা বস্তুবাদী ধারণাগুলোকে একটি দর্শনতন্ত্রে সন্নিবদ্ধ করেছিলেন। আবার এও বলা হয়েছে যে, 'চার্বাক' শব্দের অর্থ 'চারুবাক্' বা মিষ্টভাষী, অর্থাৎ এমন একজন দার্শনিক যিনি আনন্দময় ভোগবাদী জীবন পদ্ধতির উপদেশ দিতেন আপাতমধুর ভাষায়। চার্বাক দর্শনকে 'লোকায়ত' (অর্থাৎ ইহজগৎ নিবদ্ধ, বা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত) এবং 'বার্হস্পত্য' (ঋষি বৃহস্পতি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত) বলা হয়ে থাকে। *পুরাণের* দেবগুরু বৃহস্পতিকে *ঋগ্বেদের* '**লৌক্য**' (লোক-এর পুত্র। 'লোক' শব্দটি 'লোকায়ত' শব্দের সাথে সম্পর্কিত) নামক সেই ঋষির সাথে অভিন্ন মনে করা হয় যিনি বলেছিলেন, "অসতঃ সদজায়ত" [চেতনা জড় থেকে উদ্ভূত] (*ঋগ্বেদ* ১০.৭২.২)।[৩৩] *তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের* মতে বৃহস্পতি গায়ত্রী দেবীর মাথায় আঘাত করে মাথা ভেঙ্গে দিয়েছিলেন।[৩৪] বেদের পবিত্রতম মন্ত্র 'গায়ত্রী'কে 'বেদমাতা' বলা হয়ে থাকে। *মৈত্রায়ণী উপনিষদের* মতে দেবদ্বেষী বৃহস্পতি ভ্রান্ত উপমা ও অলীক প্রদর্শনের সাহায্যে বেদাচারসহ সমস্ত ভালো কাজকে মন্দ এবং মন্দ কাজকে ভালো বলে প্রতিপন্ন করতেন। তার শিক্ষার কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল: আত্মা নেই এবং *বেদ* অনুসরণযোগ্য গ্রন্থ নয়।[৩৫]

ঋগ্বেদ ও পরবর্তী সাহিত্য থেকে আরও কয়েকজন বৃহস্পতির কথা জানা যায়। এমন একজন *ঋগ্বেদীয়* বৃহস্পতিকে "গণানাং গণপতিঃ" বা জনগণের নেতা এবং "কবীনাং কবিঃ" বা জ্ঞানীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। এতে মনে হয়, তিনি গণতন্ত্রের প্রবক্তা তথা একজন প্রভাবশালী দার্শনিক ছিলেন, যাঁর ধারণাসমূহ সাধারণ গণমানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। মহর্ষি অঙ্গিরার বংশজাত এক বৃহস্পতি নাকি একটি *রাজশাস্ত্র* বা সরকার পদ্ধতি প্রণয়ন করেছিলেন, যা পরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। অপর এক বৃহস্পতি রচনা করেছিলেন একখানি *অর্থশাস্ত্র*, যার খ্যাতি কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্রের* পরেই। এ বইয়ে লোকায়তকে একটি মূল্যবান শাস্ত্র বলে অভিহিত করা হয়েছে। চার্বাক দর্শন নিয়ে একটি *সূত্রগ্রন্থ* প্রণেতা এক বৃহস্পতির নামোল্লেখ ও অনেক উদ্ধৃতি পাওয়া যায় অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে। অপর এক বৃহস্পতি তাঁর রচিত *ধর্মশাস্ত্র* গ্রন্থে ঘোষণা করেছেন: "যুক্তি ছাড়া শুধু ধর্মশাস্ত্র দিয়ে সত্য নির্ণয় করা উচিত নয়।"[৩৬] এভাবে দেখা যাচ্ছে, প্রাচীন ভারতে দীর্ঘকাল থেকে চলে আসছিল একটি অবাধ্য 'বৃহস্পতিবাদ'। ভিন্নমতের এই ধারাটি জোর দিয়েছিল বস্তুবাদ, যুক্তিবাদ, ও জনগণবাদ (populism)-এর উপর।[৩৭]

বার্হস্পত্য মতের এই সমুদয় ধারণা কালক্রমে চার্বাক দর্শনে সংহত হয়। সংস্কৃত নাটক *প্রবোধচন্দ্রোদয়* রচয়িতা কৃষ্ণ মিশ্র জানিয়েছেন, বাচস্পতি বা বৃহস্পতি তাঁর দর্শন চার্বাককে শিখিয়েছিলেন এবং চার্বাক তা শিষ্যদের মাধ্যমে বহুল প্রচার করেন।[৩৮] *সর্বদর্শনসংগ্রহ* প্রণেতা মাধবাচার্য (খ্রি. ১৪ শতক) চার্বাককে বৃহস্পতির অনুগামী বলে সনাক্ত করে জানিয়েছেন যে, চার্বাক বেদবিরোধী

নাস্তিকদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন। মাধবাচার্য চার্বাক দর্শনের এগারোটি সূত্র উদ্ধৃত করে বলেছেন যে সেগুলি বৃহস্পতির রচনা। বাৎস্যায়নের কামসূত্র ও উক্ত প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে চার্বাক দর্শনের আরো সূত্র মেলে। দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী তাঁর চার্বাক দর্শন গ্রন্থে এ রকম মোট চুয়ান্নটি সূত্রের তালিকা দিয়েছেন।[৩৯]

৪.২.২ চার্বাক দর্শনের মূলকথা

চার্বাক দর্শনের কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে জ্ঞানতত্ত্ব, অধিবিদ্যা ও নীতিবিদ্যা। এসব বিষয়ে ওই দর্শনের প্রধান ধারণাগুলো এরকম:

১) ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে সরাসরি অনুভবই জানার একমাত্র উপায়। অনুমান, উপমান, আরোহ ও আপ্তবাক্য বা দৈববাণীর কোনো মূল্য নেই।
২) ঈশ্বর, অনশ্বর আত্মা, পরলোক, স্বর্গ-নরক এসব কিছুই নেই, কারণ প্রত্যক্ষ অনুভূতি দ্বারা এদের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায় না।
৩) একই কারণে ধর্মের কোনো কার্যকরিতা নেই এবং সবরকম ধর্মচর্চাই বৃথা।
৪) *বেদ* মিথ্যা এবং *বেদের* জায়গায় যুক্তির প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত। পুরোহিত শ্রেণী সম্পূর্ণ অকেজো। আসলে তারা আপাদমস্তক ভণ্ড ও বদমাশ।
৫) জড়ই চরম সত্য এবং তা ক্ষিতি, জল, বায়ু ও অগ্নি এই চার মৌলিক উপাদান নিয়ে গঠিত।
৬) এই উপাদানসমূহ অনাদি ও অসৃষ্ট এবং এদের প্রত্যেকের রয়েছে 'স্বভাব' বা স্বকীয় প্রকৃতি।
৭) চৈতন্য এবং অন্য সব কিছুই এই চতুর্ভূত থেকে 'স্বভাব' অনুসারে উদ্ভূত। এ ভাবে চার্বাক দর্শন এক জড়ময় অদ্বৈতের অবতারণা করেছে।
৮) কোনো ঘটনারই নির্বিশেষ কারণ বা ফল নেই। প্রতি ঘটনাই স্বতউদ্ভূত ও আকস্মিক। উক্ত চতুর্ভূতের যথেচ্ছ সম্মিলনের ফলে আকস্মিকভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়েছে। এই তত্ত্বের নাম 'যদৃচ্ছাবাদ'।
৯) জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে এই পৃথিবীতে সম্ভাব্য অধিকতম সুখ লাভ করা।[৪০]

অতএব জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক থেকে চার্বাকপন্থীরা ছিলেন এম্পিরিসিস্ট বা অভিজ্ঞতাবাদী, অধিবিদ্যায় তাঁরা ছিলেন জড়বাদী, এবং নৈতিক দিক থেকে সুখবাদী (hedonists)।[৪১] ফলে তাঁরা ব্রাহ্মণ্য অধিষ্ঠান এবং পরবর্তীকালের জৈন ও বৌদ্ধ বিকল্প অধিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ছিলেন। ব্রাহ্মণের আধ্যাত্মিকতার মতো তপস্বীর ও শ্রমণের কৃচ্ছ্রতাও তাঁদের অপ্রিয় ছিল। চার্বাক দর্শনের মূল উৎসসমূহ বিদ্যমান না থাকায় এবং পরবর্তী কালে চার্বাক-বিরোধীদের তৎপরতায় নানা বিকৃতি ঢুকে যাওয়ায় আরো নানা বিষয়ে চার্বাকীয় অভিমত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করা দুরূহ। তবু প্রাপ্ত তথ্য থেকে পণ্ডিতেরা কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। যেমন ডেল রীপ মনে করেন "চার্বাক সত্য, সততা, সামঞ্জস্য, ও চিন্তার স্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতেন।"[৪২] বর্ণবৈষম্য ও আশ্রমভেদ তথা তপশ্চর্যার প্রতি তাঁদের কোনো শ্রদ্ধা ছিল না।[৪৩] তবে ব্রাহ্মণদের আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব মেনে না নিলেও চার্বাকপন্থীরা রাষ্ট্র ও রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধাচরণ করেননি, কারণ তাঁরা মনে করতেন পৃথিবীতে রাজাই সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ এবং জনগণের উচিত তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও কর্তৃত্ব মেনে নেয়া।[৪৪] বৃহস্পতির "গণানাং গণপতিঃ" পদবী এবং তাঁর দর্শনের 'লোকায়ত' অভিধা থেকে অনুমিত হয় যে চার্বাক দর্শন মূলত গণমুখী ছিল এবং এর লক্ষ্য ছিল কোনো ধরনের জনগণবাদ প্রতিষ্ঠা করা। দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীর মতে প্রধান প্রধান দর্শনের নৈরাশ্যবাদী চরিত্রের বিপরীতে চার্বাক দর্শনের জোরালো আশাবাদ ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে একে

এক বিশিষ্ট ব্যতিক্রম হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। চার্বাক পৃথিবীকে একটি আকর্ষণীয় জায়গা বলে মনে করতেন, যেখানে অজস্র আনন্দোপকরণ বিদ্যমান। জীবনের একমাত্র যৌক্তিক লক্ষ্য হচ্ছে ওই আনন্দ সাধ্যমতো উপভোগ করা এবং যতো দূর সম্ভব দুঃখকষ্ট এড়িয়ে চলা।[৪৫] এদিক থেকে বিবেচনা করলে বলতে হয়, চার্বাকীয় বিশ্বদর্শন ব্রাহ্মণ্য ধর্মাধিষ্ঠান তথা জৈন-বৌদ্ধ-আজীবিক বিকল্পাধিষ্ঠান থেকে এক বিশাল মতভেদ তথা পথভেদ স্বরূপ। পরলোকের ধারণা এবং জানার প্রকরণ হিসেবে অনুমানের কার্যকারিতা অস্বীকার করা— এ দুটি বৈশিষ্ট্যও চার্বাক দর্শনকে অন্য সব ভারতীয় দার্শনিক পদ্ধতি থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করেছে।[৪৬]

৪.২.৩ তাৎপর্য

ভারতীয় চিন্তাধারার ইতিহাসে চার্বাকীয় বিদ্রোহ একটি ইতিবাচক ঘটনা, এবং ভারতীয় দর্শনের বিকাশে এর অবদান বিরাট। ধর্মীয় যুক্তিহীনতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে চার্বাক যুক্তিবাদ ও ইহজাগতিকতার উপর গুরুত্ব দেন। অলীক ধর্মীয় অনুশাসন ও যাজককুলের শোষণমূলক তৎপরতার বিরুদ্ধে জীবনের রমণীয় দিকগুলির রসাস্বাদনে মানুষের অধিকার নিশ্চিত করতে চেয়েছিলেন চার্বাকপন্থীরা। ঐশ্বরিক ভীতি ও ধর্মামাগীদের কৌশলী তৎপরতার বিরুদ্ধে মানবসত্তার আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে চার্বাক মানুষকে কর্মফল, পারলৌকিক শাস্তি ইত্যাদির তোয়াক্কা না করে ইহজগতের সম্ভাবনাসমূহের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করার পরামর্শ দেন। চার্বাকের উত্থাপিত প্রশ্ন ও অভিযোগসমূহ অন্য সকল ভারতীয় দার্শনিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক বিশাল চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে তাদেরকে অধিকতর সাবধানী হতে এবং অত্যধিক কট্টরতা পরিহার করতে সাহায্য করে। প্রায় প্রত্যেক দার্শনিকই নিজের দর্শন উপস্থাপন করার আগে চার্বাক দর্শনের অসারতা প্রদর্শনে তৎপর হতেন। এভাবেই চার্বাকীয় প্রতিদ্বন্দ্ব ধর্মীয় কট্টরতা ও মতাদর্শগত বিকল্পহীন সর্বব্যাপিতার বিরুদ্ধে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ঐতিহাসিকভাবে চার্বাক দর্শন ব্রাহ্মণ্য ভাববাদের বিরুদ্ধে প্রথম প্রবল বিদ্রোহ যা পূর্ববর্তী বৈদিক পরম্পরাস্থ বিক্ষিপ্ত ভিন্নমতগুলিকে সংহত করে ভারতে নিশ্ছিদ্র সর্বব্যাপী ধর্মের উত্থান রোধ করতে সক্ষম হয়েছিল। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'লোকায়ত-চার্বাক' বস্তুবাদের আবির্ভাব না হলে মনুর ব্রাহ্মণ্যবাদ ও শঙ্করের ভাববাদ ভারতে এক নীরন্ধ্র অন্ধকার সৃষ্টি করে বিজ্ঞান ও প্রগতির পথকে চিরকালের জন্য বন্ধ করে দিতে পারতো।[৪৭] হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, ভারতে অর্থবিজ্ঞানের শুরুটা লোকায়ত চিন্তাবিদদের হাতেই হয়েছে।[৪৮] অপরপক্ষে, চার্বাকীয় প্রতিবাদ বৌদ্ধ-জৈন-সাংখ্য দর্শনসহ অন্যান্য বিদ্রোহের পথ সুগম করেছিল বলে মন্তব্য করেছিলেন উনিশশতকীয় ঐতিহাসিক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫-৮৬)। তাঁর মতে বৃহস্পতির যুক্তিবাদ রামায়ণ-মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণে প্রভাব রেখেছিল এবং বৈদিক দেবদেবী ও যাগ-যজ্ঞের গুরুত্ব কমিয়ে দিয়েছিল। আবার বৃহস্পতির (তথা চার্বাকের) প্রত্যক্ষবাদের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে ভারতীয় তর্কশাস্ত্রে অনুমান পদ্ধতির বিশেষ বিকাশ সম্ভব হয়েছিল।[৪৯]

৪.২.৪ প্রতিক্রিয়া ও অবলুপ্তি

চার্বাকীয় বিদ্রোহের বিরুদ্ধে অধিষ্ঠিত ধর্মসমূহের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, যার বিস্তারিত বিবরণ আমাদের জানা না থাকলেও বেশ কিছু তথ্য বিক্ষিপ্তভাবে নানা গ্রন্থে বিধৃত আছে। জৈন সন্তরা চার্বাক মতকে "মিচ্ছা *দিঠ্ঠি*" [মিথ্যা দৃষ্টি] বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।[৫০] জৈন গ্রন্থ *সূত্রকৃতাঙ্গ* লোকায়তকে মিথ্যা বিদ্যা প্রচারক দার্শনিক গোষ্ঠী বলে অভিহিত করেছে।[৫১] *বিনয়পিটকের* 'সুল্লবগ্গ' অংশে বুদ্ধ ভিক্ষুদের জন্য লোকায়ত দর্শনের পঠনপাঠন নিষিদ্ধ করেছে। *মহাশীল* ও *সদ্ধর্মপুণ্ডরীক*

নামের দুখানি অর্বাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থেও লোকায়তকে নিন্দা করা হয়েছে।[৫২] *রামায়ণে* বেদাচারী রামচন্দ্র রাজপদে অধিষ্ঠিত ভাই ভরতকে সাবধান করে দিয়েছিলেন যেন তিনি শাস্ত্রবিরোধী যুক্তিবাদী তর্কপ্রিয় লোকায়ত ব্রাহ্মণদেরকে আনুকূল্য না করেন।[৫৩] *মহাভারতে* অনেকবার চার্বাক সহ তাঁর কলহপ্রিয়, বিজয়লিপ্সু, কুতার্কিক অনুগামীদেরকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে।[৫৪] মনুর মতে যুক্তিবাদী ব্রাহ্মণেরা নাস্তিক এবং বেদদ্বেষী। তাই তিনি তাঁদেরকে সমাজচ্যুত করার নির্দেশ দিয়েছেন।[৫৫] দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, ধর্মনিষ্ঠদের প্রতিক্রিয়ায় চার্বাকপন্থীদের রচনাবলী বিনষ্ট ও চরমভাবে বিকৃত হয়েছে এবং তাঁদের ব্যক্তিত্বকে অত্যন্ত নিন্দনীয়রূপে দেখানো হয়েছে।[৫৬] দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী লিখেছেন, চতুর্দিকের বিরোধিতা ও প্রতিক্রিয়ার চাপে পরবর্তী চার্বাকগণ নিজেদের মতের গুরুতর ব্যত্যয় ঘটিয়ে আংশিকভাবে অনুমানকে মেনে নেন, এবং আকাশকে অন্যতম ভূত হিসেবে তথা প্রাণশক্তিকে এক ধরনের আত্মা বলে স্বীকার করেন। নৈতিক দিক থেকে তাঁদের পদস্খলন হয়, কারণ তাঁরা কাপালিক প্রভৃতি বামাচারী গোষ্ঠীর ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শুরু করেন। ফলে ক্রমে তাঁদের পৃথক অস্তিত্ব লোপ পায়।[৫৭]

তবে চার্বাক দর্শনের পরাভবের সবচেয়ে বড় কারণ মনে হয় সংগঠনের অভাব। বার্হস্পত্য-চার্বাক মত সুদীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী হলেও এটি কখনো হেটেরোডক্স ধর্ম বা মতাদর্শে পরিণত হয়নি, বরাবরই একটি ডিসেন্ট বা ভিন্নমত হিসেবেই থেকে গেছে। ফলে একদিকে ব্রাহ্মণ্য অর্থোডক্সি এবং অপর দিকে প্রচারমূলক জৈন-বৌদ্ধ হেটেরোডক্সির প্রচণ্ড বিরোধিতার মুখে অসংগঠিত চার্বাকপন্থীরা টিকে থাকতে পারেনি। ভারতে মুক্ত চিন্তার ফসল এবং সর্বপ্রথম প্রণালীবদ্ধ দর্শনতন্ত্র এই বার্হস্পত্য-চার্বাক চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ইহজাগতিক এবং যথেষ্ট গণমুখী হওয়া সত্ত্বেও অত্যধিক মস্তিষ্ক প্রধান হওয়ায় এবং উপযুক্ত উপস্থাপনের অভাবে ব্যাপক জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারেনি। ফলে ভারতে শেষ পর্যন্ত ধর্মেরই জয় হয় এবং বিজ্ঞানমুখী চিন্তাভাবনায় ভাটা পড়ে। তবে জবরদস্ত ভিন্নমত হিসেবে চার্বাক দর্শনের স্থায়ী আসন ভারতীয় চিন্তাধারার ইতিহাসে বিদ্যমান।

৫.০ তিন বিরুদ্ধ ধর্ম (Heresies)

চার্বাক বিদ্রোহসহ অন্য বহুতর ভিন্নমতের পটভূমিতে ও আবহে খ্রি. পূ. ষষ্ঠ শতকে উদ্ভূত হয়েছিল তিন বিখ্যাত বিরুদ্ধ ধর্ম— জৈন, বৌদ্ধ ও আজীবিক। এগুলির শুরু ভিন্নমত দিয়ে, কিন্তু পরে নির্দিষ্ট মতাদর্শ, আধ্যাত্মিক লক্ষ্য, ও ধর্মীয় সম্প্রদায় সৃষ্টি করে এরা তিনটি পৃথক হেটেরোডক্সি বা বিকল্প ধর্মাধিষ্ঠানে পরিণত হয়। ফলে এই প্রবন্ধের প্রথমে দেয়া সংজ্ঞা অনুসারে এই তিন ধর্মমত এখানে আলোচ্য বিষয় নয়। তবে ভিন্নমত ও বৈদিক-ব্রাহ্মণিক অধিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে এদের ভূমিকাটুকু বিবেচিত হতে পারে।

বৈদিক যুগের শেষ দিক থেকে চলে আসা তপস্বী-শ্রমণ ধারার পরিণতি হিসেবে খ্রি. পূ. ষষ্ঠ শতকে উত্তর ভারতে অভূতপূর্ব দার্শনিক উত্তেজনা সৃষ্টি হয়ছিল। ভ্রাম্যমান ভাবুক ('পরিব্রাজক')-দেরকে সর্বত্রই দেখা যেত এবং সকল শ্রেণীর মানুষ তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতো। টি.ডব্লিউ.রিস ডেভিডস পরিস্থিতির মুল্যায়ন করেছেন এভাবে:

> In monarclies the royal family, in the clans the community, put up ... public halls where such wanderers (*paribbajaka*) could lodge, and where conversational discussions, open to every one, were held on philosophic and religious questions.... And the most perfect freedom,

both of thought and expression, was permitted to them– a freedom probably unequalled in the history of the world.[৫৮]
[রাজা বা জনগণের তৈরি মিলনায়তনগুলোতে পরিব্রাজকেরা থাকতে পারতেন এবং সেখানে প্রকাশ্য সভায় দার্শনিক ও ধর্মীয় প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হতো। আর চিন্তা ও বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁদের ছিল পরিপূর্ণ স্বাধীনতা যা সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে তুলনাহীন।]

বৌদ্ধ উৎসে গৌতম বুদ্ধের সময়ে তেষট্টিটি দার্শনিক গোষ্ঠীর উল্লেখ আছে এবং জৈন উৎস থেকে আরো বেশি সংখ্যক বিরুদ্ধ মতাবলম্বী গোষ্ঠীর অস্তিত্বের কথা জানা যায়।[৫৯] এই বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতির অসমান্য ফসল হচ্ছে জৈন, বৌদ্ধ ও আজীবিক নামে তিন বিশাল ধর্মবিপ্লব।

৫.১ জৈন মতবাদ

পার্শ্বনাথ (খ্রি. পূ. ৮ম শতক) ও মহাবীর (আ. ৫৯৯-৫২৭ খ্রি. পূ.) প্রতিষ্ঠিত জৈন মতবাদ ধর্মীয় ও দার্শনিক ভিন্নমত হিসেবে সমকালীন অধিষ্ঠিত তন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে (১) বেদের প্রামাণ্যতা, (২) ব্রাহ্মণের প্রাধান্য, (৩) উপাসনা পদ্ধতি হিসেবে যাগযজ্ঞের উৎকর্ষ এবং (৪) বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও পালকের অস্তিত্ব প্রত্যাখ্যান করে। পক্ষান্তরে একটি অভিনব জ্ঞানতত্ত্ব, জোরালো বস্তুবাদ এবং মানববাদী নৈতিক ধারণা নিয়ে জৈন মত সরজমিনে হাজির হয়। জৈন চিন্তার মূলগত নিরীশ্বরবাদ থেকেই এসব মতান্তরের উদ্ভব।

বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের যুগ থেকে চলে আসা ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ দ্বন্দ্বের একটা পর্যায়ে এসে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের জন্ম হয়। যাগযজ্ঞের পৌরোহিত্য থেকে শুরু করে এমনকি তপশ্চর্যার অধিকার পর্যন্ত ব্রাহ্মণেরা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করে। ক্ষত্রিয়দের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ আসে এবং অতীতের বিশ্বামিত্রের মতো মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ প্রমুখ চিন্তাশীল ক্ষত্রিয়রা তপশ্চর্যার পথ ধরে বিকল্প দর্শন ও ধর্মের অবতারণা করে ব্রাহ্মণ্যবাদের মোকাবেলা করার প্রয়াস পান। এই দুই নতুন ধর্মের প্রথম অনুসারীরাও অনেকে ক্ষত্রিয় ছিলেন। জৈন গ্রন্থগুলিতে ব্রাহ্মণ বিরোধিতার অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে। *উত্তরাধ্যায়ন* গ্রন্থের একটি গোটা অধ্যায় ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে রচিত। যাগযজ্ঞের কার্যকারিতা অস্বীকার করে তপশ্চর্যার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং তপস্যার পথ সকলের জন্য খুলে দেয়া হয়। জন্মগত বর্ণভেদের পরিবর্তে মানুষের কর্মকেই তার মূল্যায়নের মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। কর্ম যেকোনো মানুষকে দেবত্বের পর্যায়ে উন্নীত করতে পারে। এমন কি ঈশ্বরের স্থানটিও দখল করে নিয়েছেন উচ্চস্তরীয় জৈন সাধকেরা, যাঁরা 'অর্হৎ', 'জিন' ও 'তীর্থংকর' নামে পূজিত হন। জি.পি. টেইলরের মতে ঈশ্বর-উপাসনা ত্যাগ করে তার পরিবর্তে মানব-উপাসনা গ্রহণ আধুনিক যুগের ইউরোপীয় দৃষ্টবাদের (Positivism) এক বিস্ময়কর পূর্বাভাস।[৬০] অনুরূপভাবে, বেদের প্রামাণ্যতা অস্বীকৃত হওয়ায় জৈন জ্ঞানতত্ত্ব বস্তুত সম্পূর্ণ মানুষ-নির্ভর। নিম্নস্তরীয় জ্ঞান ইন্দ্রিয়ানুভূতিজাত এবং আপেক্ষিক। এই জ্ঞানের পথ ধরেই পৌছানো যায় উচ্চস্তরীয় জ্ঞানে— যা ইন্দ্রিয়াতীত, স্বজ্ঞালব্ধ, অব্যবহিত এবং তুরীয় 'কেবলজ্ঞান'।[৬১] সর্বোচ্চ জ্ঞান হচ্ছে সর্বজ্ঞতা (omniscience) যা ঈশ্বরের অবর্তমানে মানুষেরই লভ্য। কেবলজ্ঞানী 'অর্হৎ' ও 'সিদ্ধ' গণের তুরীয় সর্বজ্ঞ মানসই জৈন মতে জ্ঞানের সর্বোত্তম উৎস।[৬২] এখানেও আর একবার মানুষের দেবোচিত শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হলো।

৫.১.১ জৈন দর্শন

জৈন দর্শনে বাস্তব জগতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'অনেকত্ব', যার অর্থ বহুপার্শ্বিক বাস্তবতা। ফলে ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান একদেশদর্শী ও আপেক্ষিক হতে বাধ্য। এই বাস্তবতাকে আয়ত্ত করার কৌশলের নাম 'নয়বাদ'

বা আপেক্ষিক বহুত্বের তত্ত্ব। একটা 'নয়' বা অবস্থান-বিন্দু থেকে দেখার ফলে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তা আংশিক সত্য মাত্র, এবং ভিন্নতর সত্য উপলব্ধির অবকাশ থেকেই যায়। 'সপ্তভঙ্গী নয়' বা সপ্তকৌণিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে 'স্যাদ্‌বাদ' ['সম্ভবত' -পদ্ধতি] নামক অপর একটি সপ্তবৈকল্পিক বৌদ্ধিক পদ্ধতি মিলে যে জৈন জ্ঞানতত্ত্ব সৃষ্টি হয়েছে তার মূল কথা হচ্ছে কোনো সিদ্ধান্তই সম্পূর্ণ সত্য বা সম্পূর্ণ মিথ্যা হতে পারে না। এই প্রেক্ষিত-চেতনার ফলে জৈনরা অন্যদের প্রতি অসাধারণ রকমের সহনশীল থাকতে পেরেছে। চার্বাক ও অদ্বৈতের মতো অতি বিপরীতধর্মী দর্শনেও জৈনরা কিছু কিছু ধারণার গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে, যদিও ওই দুই দর্শনের একদেশদর্শিতা তথা অন্যান্য দৃষ্টিকোণের সম্ভাব্যতা অস্বীকার করার প্রবণতাকে তারা আক্রমণ করতে কসুর করেনি।

এই জ্ঞানতত্ত্বের সাথে জৈন দর্শনে যথেষ্ট জড়বাদও বিদ্যমান। যৌক্তিকতার মাপকাঠিতে স্রষ্টা ঈশ্বরের অস্থিত্ব অস্বীকৃত। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে প্রতিটি বস্তুর বাস্তবতা শাশ্বত। কাজেই 'প্রথম কারণ' হিসেবে কোনো ঈশ্বরের কল্পনা নিষ্প্রয়োজন। দার্শনিক জিনসেনের জিজ্ঞাসা: স্রষ্টা যদি অসৃষ্ট হতে পারেন তবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে স্বতঃ অস্তিত্ববান্ মনে করায় অসুবিধা কোথায়?[৬৩] হেমচন্দ্র বলেন, যদি এক জন (অর্থাৎ ঈশ্বর) স্বতঃ বিদ্যমান হন, তাহলে আরো অনেকে অমনি অসৃষ্ট ও শাশ্বত— এমন ভাবা মোটেই অযৌক্তিক নয়।[৬৪] মহাবিশ্ব অসৃষ্ট ও অবিনশ্বর। জড় পদার্থ শাশ্বত এবং সেখানে অবিরাম পরিবর্তন চলছে সহজাত প্রাকৃতিক শক্তি বলে, কোনো দৈব হস্তক্ষেপে নয়।

জৈন দর্শনে এক নানাত্ববাদী বাস্তবতার কথা বলা হয়েছে। 'জীব' ও 'অজীব'-এর মৌলিক দ্বৈততা মহাবিশ্বের মূল সত্য। এটি চার্বাকদের জড় অদ্বৈত এবং বেদান্তের আধ্যাত্মিক অদ্বৈত উভয়েরই বিরোধী। 'জীব' শাশ্বত চৈতন্য এবং তা সংখ্যায় অগণিত। জীব নানা আকারের এবং প্রয়োজনে সংকুচিত ও প্রসারিত হতে পারে। অর্থাৎ জৈনরা ভৌত আত্মার অস্তিত্ব প্রায় স্বীকার করে নিয়েছে।[৬৫] বস্তুত তারা 'ভাব-মনঃ' ও 'দ্রব্য-মনঃ' নামে দুই প্রকার মনের অস্তিত্ব স্বীকার করেছে। 'দ্রব্য-মনঃ' সূক্ষ্ম ভৌত অণুদ্বারা গঠিত যার কাজ চিন্তার উদ্রেক করা।[৬৬] 'জীব' বা আত্মা 'পুদ্গল' বা জড়ের সাথে আবদ্ধ থাকে 'কর্ম' দ্বারা। এই কর্মও জড়াত্মক এবং এর নির্দিষ্ট রূপ আছে। অতি সূক্ষ্ম জড়াণু দিয়ে কর্ম গঠিত এবং আদি-অন্তহীন এসব অসংখ্য অণু ইন্দ্রিয়ানুভূতির অগোচর।[৬৭] 'অজীব' সত্তাটিতেও আছে অসৃষ্ট ও অনশ্বর সংখ্যাতীত অনুদ্বারা গঠিত 'পুদ্গল' এবং তৎসহ স্থান, কাল, গতি ও বিরতি। সূক্ষ্ম পুদ্গলই কর্মকণায় রূপান্তরিত হয়। এমন কি কালকেও কখনো কখনো অর্ধ-ভৌতিক সত্তা বলা হয়েছে।[৬৮] এভাবে লক্ষ্য করা যায় যে, জৈন দর্শন জড় অদ্বৈতের খুব কাছাকাছি পৌঁছে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, 'নিত্যসিদ্ধ' স্তরের পরিপূর্ণ 'জীব' ছাড়া অন্য সকল ধরনের 'জীব' সত্তাতেই জড় উপাদান আছে। অপর পক্ষে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে নানা আকার, প্রকার ও মানের অসংখ্য 'জীব' বা আত্মা বিদ্যমান। ক্ষিতি, অপ্, অগ্নি, বায়ু এই চতুর্ভূতেরও আছে এক ধরনের অপরিস্ফুট আত্মা।[৬৯] এ থেকে সিনক্লেআর স্টিভেনসন ধারণা করেন যে, জৈন বিশ্বতন্ত্র সর্বপ্রাণাত্মক (animistic) তথা জড়প্রাণাত্মক (hylozoistic)।[৭০]

জৈন নীতিদর্শন সম্পূর্ণ মানবিক এবং প্রাতিস্বিক। জৈন জীবনের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্য হচ্ছে জড়াত্মক কর্মবন্ধন থেকে ব্যক্তি-আত্মার মুক্তি। ঈশ্বরবিহীন বিশ্বে এই কাজে ব্যক্তির নিজ চেষ্টার বিকল্প নেই। কোনো মহল থেকে ন্যূনতম সহায়তার সম্ভাবনা অনুপস্থিত। "Alone he accumulates merit; alone he enjoys the . . . happiness of heaven; alone he destroys *karma*; alnone he attains to *moksha*."[৭১] [তিনি পুণ্যসঞ্চয় করেন একা, একাই তিনি স্বর্গসুখ ভোগ করেন, কর্মফল বিনাশের কাজটিও তাঁর একার, এবং একাই তিনি মোক্ষলাভ করেন।] ব্যক্তি-মানুষই

তার ভাগ্যের একমাত্র নির্মাতা। এই বিশেষ বিষয়ে আস্তিক্যবাদী ব্রাহ্মণ ও নিয়তিবাদী আজীবিকদের থেকে একেবারেই ভিন্ন পথে গেছে জৈন দর্শন।

৫.১.২ সীমাবদ্ধতা

জৈন চিন্তাধারার উপরি উক্ত ভিন্নমতী বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও কালক্রমে জৈন মত নির্দিষ্ট বদ্ধবিশ্বাস, ধর্মাধিষ্ঠান ও পুরোহিতবর্গসহ একটি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম সম্প্রদায় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে— ব্রাহ্মণ্যবাদের বিপরীতে একটি হেটেরোডক্সি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। জৈন ভিন্নমতের মৌলিক মৃদুতা এবং 'নয়বাদ-স্যাদ্‌বাদ'-ভিত্তিক পরমত সহিষ্ণুতা জৈন ধর্মে বহু ব্রাহ্মণ্য বিশ্বাস ও আচারের অনুপ্রবেশ ঘটতে সাহায্য করে। জাতিভেদ, ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য, বৈষ্ণব ভাবধারা ইত্যাদির অনুপ্রবেশের ফলে জৈন মত-পথের বিদ্রোহী ভাব শান্ত হয়ে আসে এবং ব্রাহ্মণ্য হিন্দু অর্থোডক্সির সাথে তার একটা আপোস হয়ে যায়। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় বলেন:

> Even from very early days in their history they [the Jains] seem to have aligned themselves on the side of the 'establishment', social, political and religious. Therefore the original protestant spirit of this social group had lost its historical significance, indeed had missed its role very early in its career...[১২]
>
> [এমন কি তাদের ইতিহাসের একেবারে আদি কাল থেকে জৈনরা সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষমতাসীন শক্তির সাথে হাত মেলায়। ফলে এই সামাজিক গোষ্ঠীটি তার মূল প্রতিবাদী চরিত্র হারিয়ে ফেলে, এবং বস্তুত খুব প্রথম থেকেই সঠিক ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়।]

৫.২ বৌদ্ধ ভিন্নমত

একই পরিমণ্ডল থেকে উদ্ভূত বৌদ্ধ মতবাদের সাথে জৈন মতের অনেক মিল রয়েছে এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসেবেও তারা যথেষ্ট সদৃশ। বৌদ্ধ মতেও যথারীতি বেদ, ব্রাহ্মণ ও যাগযজ্ঞ প্রত্যাখ্যাত। আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকৃত এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বের ব্যাপারে গৌতম বুদ্ধের (৫৬৬-৪৮৬ খ্রি. পূ.) নীরবতা পরবর্তী বৌদ্ধ দর্শনকে নিরীশ্বরবাদে নিয়ে গেছে। এম. মোনিআর-উইলিআম্‌সের মতে বুদ্ধের মূল শিক্ষায় সত্যকার অর্থে যাজকত্ব, পৌরোহিত্য, ঐশীবাণী, আচারানুষ্ঠান, প্রার্থনা, পূজা এসব কিছুই ছিল না।[১৩] ব্রাহ্মণদের ভাষা সংস্কৃত পরিহার করে বুদ্ধ জনগণের ভাষায় তাঁর বক্তব্য প্রচার করতেন। তাই পরে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র সংকলিত হয়েছিল তখনকার উত্তর বিহারের লৌকিক ভাষা 'পালি'তে।

৫.২.১. বেদবিরোধিতা

বৈদিক যাগযজ্ঞের বিরোধিতা করে বুদ্ধ পশু বলি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেন। ত্রিপিটকস্থ দীঘনিকায় নামক গ্রন্থের "কূটদন্ত সুত্ত" শীর্ষক অধ্যায়ে বুদ্ধ জনৈক ব্রাহ্মণকে বলছেন, যজ্ঞানুষ্ঠানের আগে রাজার উচিত তাঁর দেশে শান্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তারপরে যদি যজ্ঞ করতেই হয় তাহলে সেখানে পশুবধ এবং ভৃত্যদেরকে নিষ্ঠুরভাবে খাটানো এই দুটি কর্ম অবশ্য পরিহার করতে হবে। এর চেয়েও বড় যজ্ঞ হবে 'বুদ্ধ, ধম্ম ও সংঘ' এই ত্রিরত্নের শরণ নেয়া। সব শুনে ব্রাহ্মণ যজ্ঞের জন্য বেঁধে রাখা একশত পশুর বাঁধন খুলে দিয়ে বললেন : "ওরা সানন্দে সবুজ ঘাস খাক, পান করুক শীতল জল,

ঠান্ডা হাওয়া ওদের শরীর শীতল করুক'।[৭৪] তারপর ব্রাহ্মণ বুদ্ধের কাছে দীক্ষা নিলেন। সংযুত্ত *নিকায়ে* এবং *সুত্তনিপাতের* "ব্রাহ্মণধম্মিক সুত্তে" পশু বলিকে পুনরায় নিষ্ঠুর, অনুচিত ও সুফলদায়ক নয় বলে নিন্দা করা হয়েছে।[৭৫]

বৌদ্ধ জ্ঞানতত্ত্বেও বেদ প্রত্যাখ্যাত। বুদ্ধের মতে "ব্রাহ্মণদের শিক্ষাপদ্ধতি হচ্ছে এক সারি অন্ধ মানুষের মতোঃ যে সামনে আছে সে কিছু দেখে না, দেখে না কিছু সেও যে আছে মাঝে, এবং সে তো দেখেই না যে রয়েছে পিছে।"[৭৬] বেদের বদলে বুদ্ধ স্বজ্ঞা (intution)-কেই জ্ঞানের সর্বোচ্চ উৎস বলে সনাক্ত করেন। আত্মমননলব্ধ এই অন্তশ্চৈতন্যকে তিনি 'বোধি' আখ্যা দিয়েছেন। ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে জ্ঞানের উৎস বলে স্বীকার করলেও তাকে বোধি অপেক্ষা হীন বলা হয়েছে। এ কারণে বুদ্ধের শিক্ষায় যুক্তিবাদের অনেক উপাদান থাকলেও তাঁকে 'এম্পিরিক্যাল মিস্টিক' বা 'অভিজ্ঞতাশ্রয়ী অতীন্দ্রিয়বাদী' বলা হয়েছে।[৭৭] বুদ্ধ ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তার উপর জোর দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু পরবর্তী থেরবাদী বৌদ্ধ পরম্পরাতে বুদ্ধের কথাকে সর্বোচ্চ সত্য বলে ধরে নেয়ার ফলে বৌদ্ধ মত ব্রাহ্মণ্যবাদের মতো একটি অনড় অধিষ্ঠানে পরিণত হয়।

৫.২.২ বর্ণভেদ বিরোধিতা

বেদ প্রত্যাখ্যানের সাথে সাথে বুদ্ধ স্বাভাবিকভাবে বর্ণপ্রথা প্রত্যাখ্যান করেন। ব্রাহ্মণের জন্মগত শ্রেষ্ঠত্ব দাবিকে বার বার নস্যাৎ করা হয়েছে *মঝ্ঝিম নিকায়ের* "অস্সলায়ন সুত্তে"। *জাতকের* অনেক কাহিনীতে এবং *অঙ্গুত্তর নিকায়ে* বহু জায়গায় ব্রাহ্মণদেরকে বিদ্রূপ করা হয়েছে। তবে বুদ্ধ আসলে যে জিনিসটির বিরোধিতা করেছিলেন তা হচ্ছে বংশগত পুরোহিততন্ত্র। জন্ম নয়, কর্ম ও চরিত্রের উপর নির্ভরশীল নৈতিক ব্রাহ্মণত্বকে তিনি স্বীকার করতেন। *দীঘ নিকায়ের* "ব্রহ্মজাল সুত্তে" ও "তেবিজ্জ সুত্তে" এবং পূর্বোক্ত "ব্রাহ্মণধম্মিক সুত্তে" অতীতের সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণের সাথে বুদ্ধের সমকালীন অধঃপতিত ব্রাহ্মণদের তুলনা করা হয়েছে।[৭৮] তবে ভালোভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বুদ্ধ যতোটা না বর্ণপ্রথার বিরোধী ছিলেন তার চেয়ে বেশি ছিলেন ব্রাহ্মণ বর্ণের প্রাধান্য-বিরোধী। পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় দ্বন্দ্বের ধারাবাহিকতায় বুদ্ধ *দীঘ নিকায়ের* "অগ্গঞ্ঞ সুত্তে' ক্ষত্রিয়দের মানবকুলে প্রধান বলে উল্লেখ করেছেন।[৭৯] বস্তুত, বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিতে বর্ণক্রমকে ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র ও চণ্ডাল এভাবে দেখানো হয়েছে। এতে উচ্চতর দুই বর্ণের স্থান পরিবর্তন করে দ্বিতীয়কে প্রথম ও প্রথমকে দ্বিতীয় করা হয়েছে মাত্র, অন্য বর্ণের অবস্থান আগের মতোই রয়ে গেছে। তবে বর্ণ বৈষম্যকে বৌদ্ধমণ্ডলীতে কখনো প্রশ্রয় দেয়া হয়নি। সামাজিক ব্যাপারে বৌদ্ধ আন্দোলনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে এই যে, ভারতে এটিই প্রথম ধর্মীয় সংঘ যেখানে নারীর প্রবেশাধিকার দেয়া হয়েছে। তবে সেখানেও 'কিন্তু' আছে। বুদ্ধ একটি সন্ন্যাসিনী সংঘ স্থাপন করেছিলেন বটে, কিন্তু তাকে সন্ন্যাসী সংঘের অধীনস্থ করা হয়েছিল। সাধনাবলে কোনো সন্ন্যাসিনী 'অর্হৎ'-এর বেশি উপরে উঠতে পারেন না। পুরুষ হিসেবে পুনর্জন্ম লাভ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর বুদ্ধত্ব অর্জনের অধিকার ছিল না।[৮০]

৫.২.৩ ব্রহ্মজাল

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের বহুত্ব এক ও অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের মায়াচ্ছন্ন বহিঃপ্রকাশ মাত্র— উপনিষদের এই সর্বেশ্বরবাদী ধারণার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন গৌতম বুদ্ধ। সাথে সাথে প্রত্যেক জীবের মধ্যে একটি অবিনশ্বর আত্মার অস্তিত্বও তিনি অস্বীকার করেন। অধিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্যবাদের কেন্দ্রীয় প্রত্যয় এই 'আত্মন-ব্রহ্মণ্' ধারণাকে 'ব্রহ্মজাল' [ব্রহ্ম-ধোঁকা] আখ্যা দিয়ে খারিজ করে দেন। সম্পূর্ণ বিমূর্ত ও অশরীরী জীবাত্মা ও পরমাত্মার অস্তিত্ব প্রমাণসাপেক্ষ নয় বিধায় তা তিনি সরাসরি নাকচ করেন।[৮১] স্রষ্টার অস্তিত্ব

সম্পর্কে বুদ্ধ নীরব থাকেন। আসলে 'আদি কারণ' নিয়ে ব্রাহ্মণদের কৌতূহলকে বুদ্ধ সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। বরং জগতের স্বাভাবিক অস্তিত্ব মেনে নিয়ে সেখানে দুঃখকষ্টের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। দুঃখ থেকে সকল জীবের মুক্তিই বৌদ্ধ দর্শনের লক্ষ্য। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের মূল উৎস নিয়ে আনুমানিক ভাবনাচিন্তা ওই লক্ষ্যের জন্য অবান্তর। বস্তুত বুদ্ধের অস্ফুট নিরীশ্বরবাদ অনেকটা অজ্ঞেয়বাদের কাছাকাছি, কেননা 'আদি কারণ'-এর অস্তিত্ব অস্বীকার করার চেয়ে তিনি বরং বিষয়টি নিয়ে মাথা ঘামানোর যৌক্তিকতাকে বাতিল করেছেন।[৮২] অপর দিকে ইন্দ্র-অগ্নি-বরুণাদি ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব স্বীকার বা অস্বীকার কোনোটাই করেননি।[৮৩] পরবর্তী বৌদ্ধ সাহিত্যে বুদ্ধকে ব্রহ্মার উপর স্থান দেওয়া হয়েছে।[৮৪] স্বীয় সাধনাবলে সর্বজ্ঞত্ব অর্জন করার পর বুদ্ধ সকল দেবতার ঊর্ধ্বে উঠে গেছেন।[৮৫] ৮০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ইসলামের বিজয়াভিযান এবং অন্য কতিপয় কারণে একেশ্বরবাদের অনুরূপ 'আদিবুদ্ধ' প্রত্যয়টির আবির্ভাব হয় উত্তর-পশ্চিমের বৌদ্ধদের মধ্যে বিশ্বস্রষ্টার অভিধা হিসেবে। এডওয়ার্ড কোন্‌জে মনে করেন, এ ছিল বুদ্ধের মূল দর্শন থেকে সম্পূর্ণ প্রত্যাবর্তন এবং এখানেই বৌদ্ধ ধর্মীয় ভিন্নমতের পরিসমাপ্তি।[৮৬]

৫.২.৪ বুদ্ধের বুদ্ধিবাদ-বিরোধিতা (anti-intellectualism)

বৌদ্ধ ধর্মের চরম লক্ষ্য 'নির্বাণ' লাভ হওয়ায় দর্শন চর্চা সেখানে আপতিক বিষয় মাত্র। নির্বাণের জন্য অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা নিরুৎসাহিত করা হয়। শুধুমাত্র জানার জন্য অনুসন্ধান সময়ের অপচয় ছাড়া কিছু নয়।[৮৭] মহাবিশ্বের স্বরূপ জানার চেষ্টা করা, অস্তিত্বের রহস্যভেদ করে আনন্দিত হওয়া, কিংবা স্রেফ জ্ঞানের জন্য জানতে চাওয়া— এসব বৌদ্ধ ধর্মের লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। বুদ্ধের নৈতিক বাস্তববাদের কাছে একমাত্র 'বোধ' (understanding) অর্থে ছাড়া জ্ঞান বস্তুত নির্বাণপথের বাইরে পড়ে। যদিও বুদ্ধ নিজে দার্শনিক মনন বা পরাজাগতিক আলোচনা এড়াতে পারেননি, কিন্তু তিনি তাঁর অনুগামীদেরকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিলেন জাগতিক ও পরাজাগতিক বিষয় নিয়ে অনুসন্ধানে লিপ্ত না হতে, কারণ তা নির্বাণপ্রেপ্সুর কোনো কাজে আসে না।[৮৮] এই মননবিরোধিতা ঔপনিষদিক ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং পরবর্তী *ষড়্‌দর্শন* উভয় থেকে বুদ্ধের স্বাতন্ত্র্য নির্দেশ করে।

তবে এই প্রাথমিক নিষেধাজ্ঞা পরবর্তী বৌদ্ধ মনীষীদের প্রপঞ্চ ও জ্ঞান সম্পর্কিত চিন্তা থেকে নিরস্ত রাখতে পারেনি। সেরকম একটি পরিণতি হচ্ছে খ্রিস্টীয় কালের প্রারম্ভে বিকশিত 'বৈভাসিক' মতবাদ। থেরবাদী পালি শাস্ত্রের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে বৈভাসিকেরা একটি নানাত্ববাদী বস্তুময় জগতের ধারণা দেন। জাগতিক বস্তুসমূহ সতত পরিবর্তনশীল ক্ষণস্থায়ী সত্তামাত্র নয়, বরং তাদের স্বতন্ত্র ও স্থায়ী বাস্তব অস্তিত্ব আছে। ক্ষিতি, অপ্‌, তেজঃ ও মরুৎ সমন্বয়ে গঠিত বস্তুজগৎ পরমাণুময়। জ্ঞানতত্ত্বেও বৈভাসিকেরা আত্যন্তিক বাস্তববাদী ছিলেন। বুদ্ধকথিত স্বজ্ঞার পরিবর্তে তাঁরা সরাসরি ইন্দ্রিয়ানুভূতিকেই জ্ঞানের উত্তম উৎস হিসেবে সনাক্ত করেছেন বলে মনে হয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান ধর্মশাস্ত্র দ্বারাও নাকচ হবার নয়। এ বিষয়ে বৈভাসিকেরা ব্রাহ্মণ্য ও থেরবাদী বৌদ্ধ কর্তৃত্বকেই অগ্রাহ্য করেছেন।[৮৯]

আধ্যাত্মিক মুক্তির পন্থা হিসেবে 'জ্ঞান', 'কর্ম' ও 'ভক্তি'র কথা ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বলা হয়েছে। 'কর্ম' অর্থাৎ বৈদিক যাগযজ্ঞের সাথে সাথে বুদ্ধ 'ভক্তি' অর্থাৎ প্রার্থনা ও পূজার্চনা বাতিল করেছিলেন।[৯০] তাঁর শিক্ষায় পৌত্তলিক উপাসনার কোনো স্থান ছিল না। কিন্তু অন্যান্য অনেক কিছুর মতো এ বিষয়েও বৌদ্ধরা পরবর্তীকালে পিছু হটে। নানা আচারানুষ্ঠানসহ অসংখ্য দেবদেবী তথা বুদ্ধমূর্তির পূজার প্রচলন হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৪০০ অব্দ নাগাদ শুরু হওয়া 'ভক্তি' আন্দোলন খ্রিস্টের সমসাময়িক কালে ভারতীয় জনগণের মধ্যে ভক্তিবাদের যে জোয়ার সৃষ্টি করে তার তোড়ে ভেসে যায় 'মহাযান' বৌদ্ধ

ধর্ম।[৯১] কালক্রমে থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্মেও মূর্তিপূজার প্রচলন হয়। তবে নির্বাণ লাভের জন্য 'জ্ঞান' এর পথটি বুদ্ধ খোলা রাখেন। কিন্তু সেই 'জ্ঞান' বুদ্ধের anti-intellectualism-এর আওতার মধ্যস্থ 'বোধ' মাত্র। ধ্যান ও নৈতিক আচরণ দ্বারা লাভ করা যায় সঠিক 'জ্ঞান' যা পরিণামে দুঃখ থেকে মুক্তি দেয়। ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থায় জ্ঞানের পথ সকলের জন্য খোলা ছিল না, অল্পসংখ্যক মননশীল ব্রাহ্মণই মাত্র এ পথ অনুসরণের অধিকারী ছিলেন। বুদ্ধ কিন্তু জন্ম ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল আগ্রহী ব্যক্তির জন্য 'বোধি'র রাস্তা উন্মুক্ত রাখেন।[৯২]

৫.২.৫ সীমাবদ্ধতা

উপরের আলোচনায় দেখা গেল অনেক বিষয়ে বৌদ্ধ মত পরবর্তী কালে পরিবর্তিত হয়ে তার মূল প্রতিবাদী চরিত্র ও অন্যান্য স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলেছিল। এমনকি প্রাথমিক পর্যায়েও বৌদ্ধ ভিন্নমত ততো তীব্র ছিল না, যতোটা সাধারণত মনে করা হয়ে থাকে। বৈদিক যাগযজ্ঞের তীব্র বিরোধিতা এবং ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদকে অস্বীকার করার মধ্যেই মূলত বুদ্ধের বিদ্রোহ সীমিত ছিল। ব্রাহ্মণ বর্ণের প্রাধান্য না মানলেও বুদ্ধ বর্ণব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করেননি। একজন সাধারণ ভারতীয় বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করলে 'হিন্দু' ধর্মবিশ্বাস, সমাজ ব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল থেকে তার সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। তাই ডেল রীপ বুদ্ধকে একজন "কোমল সংস্কারক" (mild reformer) হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন।[৯৩] আসলে বুদ্ধের ভিন্নমত ছিল মূলত ধর্মীয় এবং তার সামাজিক তাৎপর্য ভারতীয় জনগণের জন্য তেমন বড় কিছু ছিল না। একজন আধুনিক বৌদ্ধ পণ্ডিতের মতে বুদ্ধ কোনো সমাজ সংস্কারক বা রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না। সামাজিক প্রথা ও শ্রেণীবিন্যাস তাঁর বিবেচনার বিষয় ছিল না। ধর্মীয় বিষয় তথা আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রশ্ন নিয়েই তিনি ব্যাপৃত ছিলেন।[৯৪]

৫.৩ আজীবিক মতবাদ

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের অভিন্ন দার্শনিক আলোড়ন থেকে জৈন ও বৌদ্ধ মতবাদের সাথে সাথে উদ্ভূত হয় আজীবিক মতাদর্শ। মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধের জ্যেষ্ঠ সমসাময়িক **মক্খলি গোসাল** ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা। **পুরণ কস্সপ** ও **পাকুধ কচ্চায়ন** নামে আর দুই ভাবুকও আজীবিক মত নির্মাণে অবদান রেখেছিলেন। এঁরা যথারীতি বেদ, ব্রাহ্মণ, স্রষ্টা, ব্রহ্ম, যাগযজ্ঞ, পূজার্চনা প্রভৃতি প্রত্যাখ্যান করেন। কর্ম ও জন্মান্তরের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও ওই দুই এর মধ্যে কোনোরকম সম্পর্ক তাঁরা আমলে নেননি। পরিবর্তে তাঁদের প্রত্যয়গুলি হচ্ছে যথাক্রমে নিয়তিবাদ, অনৈতিকতাবাদ (antinomianism) ও পরমাণুবাদ। আজীবিক মতে কোনো কিছুরই কারণ বা ফলাফল নেই। সবকিছু নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে 'নিয়তি' নামক এক আমোঘ ও বিমূর্ত চালিকা শক্তিদ্বারা।[৯৫] এই ধারণার সাথে খাপ খেয়ে যায় পুরণ কস্সপের 'অক্রিয়াবাদ'। অক্রিয়াবাদ অনুসারে আত্মা নিষ্ক্রিয়; ভালো বা মন্দ কোনো কর্মই তাকে প্রভাবিত করে না। জাগতিক সকল ঘটনাই অকারণ ও নিষ্ফল। কর্ম ভালো-মন্দ কোনো ফল উৎপাদন করতে পারে না। কর্মদ্বারা মানুষ পাপ বা পুণ্য কিছুই অর্জন করে না।[৯৬]

বেদোত্তর ভিন্নমতীরা একটি নিরীশ্বরবাদী বিমূর্ত 'আদি কারণে'র সন্ধান করছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক নাগাদ 'কর্ম' ও 'সংসার' (জন্মান্তর) ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন প্রমুখ প্রায় সকল মতের সাধারণ বিশ্বাসে পরিণত হয়। কিন্তু আজীবিক মতবাদ একটি ব্যাতিক্রম। কর্মীয় কারণমালার পরিবর্তে একমাত্র নির্ধারক উপাদান হিসেবে সনাক্ত করা হয় 'নিয়তি'কে যা ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে।[৯৭] গোসালের মতে প্রতিটি আত্মা নিয়তির নিয়ন্ত্রণে ৮৪,০০,০০০ মহাকল্প ধরে বাধ্যতামূলকভাবে জন্ম-জন্মান্তর অতিক্রম করে তবে দুঃখের অবসান ঘটাবে।[৯৮] ভালোমন্দ কোনো ফলোৎপাদনের ক্ষমতা

কর্মের না থাকায় নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে আজীবিক মত পূরণ কস্‌সপের অনৈতিকতাবাদ (antinomianism)-কে অস্বীকার করে। ফলে বৌদ্ধ ও জৈন নীতিবাদীরা আজীবিক সন্ন্যাসীদেরকে ভোগবাদ ও অনাচারের দায়ে অভিযুক্ত করেছেন।[৯৯]

আজীবিক মতের জোরালো বস্তুবাদও একে জৈন-বৌদ্ধ মত থেকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। জৈনরা 'ধর্ম' ও 'কর্ম'কে অণুময় বলায় তারা বৌদ্ধদের চেয়ে বেশি বস্তুবাদী বলে বিবেচিত। কিন্তু জৈনদেরকে অতিক্রম করে পাকুধ কচ্ছায়ন আনন্দ, দুঃখ ও আত্মাকে অণুময় বলে সিদ্ধান্ত দেন। পাকুধই ভারতে সর্বপ্রথম আণবিক তত্ত্বের অবতারণা করেন এবং তাঁব থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে অণুতত্ত্ব অন্যান্য দার্শনিক গোষ্ঠীতে বিস্তৃত হয়— এমন মত প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত এ.এল.ব্যাশাম।[১০০] যা হোক, স্পষ্ট যে আজীবিক মতবাদ আর্থোডক্স ও হেটেরোডক্স উভয় প্রকার ধর্মীয় অধিষ্ঠান থেকে ভিন্নতর ধ্যান-ধারণা নিয়ে একটা স্বতন্ত্র বিকল্প উপস্থাপন করেছিল। প্রতিক্রিয়ায় বৌদ্ধ ও জৈনগণ আজীবিকদেরকে ধর্মদ্রোহী আখ্যা দিয়ে অনাচার প্রভৃতি নানা অভিযোগে অভিযুক্ত করে। ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্ম দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মধ্যযুগে ক্রমান্বয়ে আজীবিক মতকে আত্মস্থ করে নেয়।[১০১] তবে একথা মনে রাখা দরকার যে, আজীবিক মত তার স্বীয় ডগ্‌ম্যা ও সংগঠন নিয়ে একটি আনুষ্ঠানিক ধর্মে পরিণত হয়ে হেটেরোডক্সির পর্যায়ে চলে গিয়েছিল। এ মতে জন্মান্তর ও তপশ্চর্যা বজায় থাকে এবং কর্মও সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয় না। অতএব চার্বাকপন্থীদের অবাধ্যতার তুলনায় আজীবিকরা অনেকটাই নরমপন্থী ছিলেন, বলতেই হবে।

৬.০ সন্দেহবাদী-অজ্ঞেয়বাদী পরিলেখ

পরবর্তীকালে 'চার্বাক' ও 'লোকায়ত' শব্দ দুটি "বেদোত্তর যুক্তিবাদী যুগের (৬০০-৩০০ খ্রিস্টপূর্ব) অব্রাহ্মণ্য, অজৈন, অবৌদ্ধ ও অনাজীবিক" ভিন্নমত বোঝাতে সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।[১০২] অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য, জৈন, বৌদ্ধ ও আজীবিক ধর্মতন্ত্রগুলি একত্রে অর্থোডক্স-হেটেরোডক্স অধিষ্ঠান হিসেবে বিবেচ্য এবং চার্বাক তথা অন্যান্য বিরুদ্ধবাদী মুক্তচিন্তকরা ওই অধিষ্ঠিত তন্ত্রের বিপরীতে দাঁড়িয়ে প্রাচীন ভারতে বুদ্ধিবৃত্তি চর্চায় দ্বান্দ্বিক ধারাটি চালু রেখেছিলেন। এ ধরনের বেশ কয়েকজন সন্দেহবাদী ও অজ্ঞেয়বাদী দার্শনিকের কথা জানা যায় যাঁরা জগৎ, জীবন ও জ্ঞান সম্বন্ধে অনেকটাই নেতিবাচক অবস্থান নিয়েছিলেন।

৬.১ বৈদিক সাহিত্যে সংশয়বাদ

ঋক্ সংহিতা থেকে শুরু করে *কেনোপনিষৎ* পর্যন্ত বৈদিক গ্রন্থগুলিতে কতিপয় ঋষি ও সাধারণ মানুষের সন্দেহবাদী মনোভাবের পরিচয় ইতস্তত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। দেবতাদের অস্তিত্ব এবং ইন্দ্রের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে খোদ *ঋগ্‌বেদেই*। অবিশ্বাসী জনের উক্তি : "কোথায় ইন্দ্র? আসলে সে নেই।"[১০৩] বেদের প্রধানতম দেবতা ইন্দ্রের অস্তিত্ব সন্দেহের আওতায় পড়ায় গোটা বেদের উপরেই সন্দেহের ছায়া বিস্তৃত হয়। *ঋগ্‌বেদের* 'নাসদীয় সূক্তে' প্রজাপতি **পরমেষ্ঠী** গভীর সন্দেহে প্রশ্ন তোলেন :

> ...ছিল কি সলিল রাশি গহন গভীর? ...কে জানে নিশ্চিতরূপে? ...কোথা থেকে এ সৃষ্টি এলো? ...কে জানতে পারে কোথা থেকে এর উদ্ভব হয়েছে? ...যিনি উচ্চতম স্বর্গ থেকে একে অবলোকন করছেন একমাত্র তিনিই জানেন। অথবা হয়তো জানেন না তিনিও।[১০৪]

ঋগ্‌বেদের ১০ম মণ্ডলে এই মন্ত্রে এবং অন্যত্র জল থেকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভব সংক্রান্ত একটি তত্ত্ব হাজির করা হয়েছে। অর্থাৎ ঈশ্বর নয়, জলের অন্তর্নিহিত বিশুদ্ধ প্রকৃতিই দায়ী বিশ্বের আবির্ভাবের জন্য।[১০৫] পরমেষ্ঠীর মতো একই সংশয়ে অভিভূত হয়েছিল ঋষি দীর্ঘতমা, যখন তিনি বিশ্বের কেন্দ্রস্থিত মূল নীতিটির সন্ধানে দার্শনিক মননে নিমগ্ন ছিলেন।[১০৬]

উপনিষদেও তথ্য রয়েছে সন্দেহবাদীদের অস্তিত্ব সম্পর্কে, যাদের মতামতকে নস্যাৎ করতে চাওয়া হয়েছে 'আত্মন্-ব্রহ্মন্' তত্ত্ব দিয়ে। *কঠোপনিষদে* **নচিকেতা** যমকে জানিয়েছিলেন যে, পৃথিবীতে অনেক মানুষ আছে যারা বিশ্বাস করে আত্মা আছে এবং তা দেহের মৃত্যুর পর পরলোকে যায়, আবার এমন লোকও আছে যারা স্বীকারই করে না এ জাতীয় কোনো কিছুর অস্তিত্ব।[১০৭] *শ্বেতাশ্বরোপনিষদ* জানাচ্ছে, জগৎ সৃষ্টির পেছনে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কারণের উল্লেখ করেন— যেমন কাল, প্রকৃতি, ভাগ্য, দৈব, ভূতসমূহ ইত্যাদি।[১০৮] উপরন্তু *কঠোপনিষদেই* রয়েছে সেই বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী পংক্তিমালা :

যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্।।[১০৯]

[চরম তত্ত্ব যিনি বোঝেননি মনে করেন, তিনিই ঠিক বুঝেছেন; আর যিনি বুঝেছেন বলে ভাবেন তাঁরই বোঝা হয়নি। বিজ্ঞ যাঁরা তাঁদেরই জানা হয়নি; যাঁদের জানা নেই তাঁরাই জেনেছেন।]

৬.২ জাবালির প্রত্যক্ষবাদ

রামায়ণে **জাবালি** নামে এক সন্দেহবাদী ও অজ্ঞেয়বাদী ব্রাহ্মণের দেখা মেলে যিনি ছিলেন রাজা দশরথের মন্ত্রী। যখন বনগমনোদ্যত রাম তাঁর ভাই ভারতের অনুরোধ সত্ত্বেও ফিরলেন না, তখন জাবালি তাঁর নৈতিক সংকোচকে বিদ্রূপ করে বলেছিলেন, রামের উচিত নয় শূন্যগর্ভ নৈতিক আদর্শদ্বারা স্বীয় বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করা। তিনি আরো বললেন যে, মানুষ কারো অনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য নয়— বান্ধব, পরিজন, মাতাপিতা, শাসকবর্গ, এমন কি দেবতাদেরও না।[১১০] জীব একাই জন্মায় ও বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তার কোনো আত্মীয় বা সঙ্গী নেই। মৃত্যুকালে প্রত্যেকেই অপরিহার্য পরিণতি লাভ করে। এটাই জগতের নিয়ম।[১১১]

জাবালির মতে যাগযজ্ঞ নিরর্থক। এগুলো চতুর পুরোহিতদের বানানো জীবিকার্জনের সহজ উপায় মাত্র। মৃত পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান অপচয় ছাড়া কিছু নয়, মৃত ব্যক্তি কখনো কিছু খায় না, এবং ওই খাদ্য শেষ পর্যন্ত যাজকদের পেটে যায়। ব্যয়ের ব্যাপারে বিশেষ সচেতন জাবালি রামকে উপদেশ দেন লোভী ব্রাহ্মণদের কথা মতো আজেবাজে আচার-অনুষ্ঠানে অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী অপচয় না করতে। 'যজ্ঞ করুন', 'দান করুন', 'প্রায়শ্চিত করুন', 'ত্যাগ করুন', এ ধরনের তাগিদসম্পন্ন ধর্মীয় পুস্তকের লেখকেরা ধুরন্ধর ব্যক্তি। পরকালে পুরস্কার বা স্বর্গবাসের আশা একেবারেই অসার, কারণ স্বর্গ বলে কিছু নেই এবং স্বর্গ সম্পর্কে গালভরা গল্পগুলো ধূর্ত পুরোহিতদের বানানো। সুতরাং বুদ্ধিমান মানুষের উচিত নিজের জীবনের সর্বোচ্চ সার্থকতা নিশ্চিত করা, এবং সে জন্য যা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাই সাদরে গ্রহণ করা, আর অন্য সব কিছুই প্রত্যাখ্যান করা। এভাবে জাবালি ভোগ ও সফলতাময় জীবনের পক্ষে প্রচার করেন এবং রামকে উপদেশ দেন রাজ্যভার গ্রহণ করে প্রাপ্য সকল সুবিধাদি ভোগ করতে। কর্তব্য ও ত্যাগের পথ অনুসরণ মারাত্মক ভুল ও বিভ্রান্তি। যখন কেউ মারা যায়, তখন সে চিরকালের জন্যই নিঃশেষ হয়ে যায়। দুনিয়ায় তার যাবতীয় ত্যাগ ও সংযমের জন্য কোনো পুরস্কারই সে পরকালে পায় না।[১১২] বলা বাহুল্য, ধর্মপরায়ণ রাম জাবালির এসব উপদেশে কান দেননি।

৬.৩ অজ্ঞেয়বাদী অজিত কেশকম্বলী

অতঃপর আমরা আসি খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের সেই অসাধারণ সময়টাতে। *দীঘ নিকায়ের* "সামাঞ্‌ঞফল সুত্ত" শীর্ষক অধ্যায়ে বর্ণনা রয়েছে কয়েক জন বিরুদ্ধধর্মী আচার্যের, যাঁরা বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁরই মতো ব্রাহ্মণতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমকালীন প্রতিবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এঁদেরই একজন **অজিত কেশকম্বলী**কে চার্বাকপন্থী বলা হয়েছে। চার্বকপন্থীদের মতো তিনি জড়বাদী ছিলেন এবং ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ এই মূল চতুর্ভূত মাত্র স্বীকার করতেন, কিন্তু কোনো আত্মার অস্তিত্ব মানতেন না। মানুষ ওই চতুর্ভূতে তৈরি এবং তার মৃত্যুর পর ভুতচতুষ্টয় তাদের মূল অবস্থায় ফিরে যায় এবং ইন্দ্রিয়বর্গ বিলীন হয় আকাশে। পরলোক বলে কিছু নেই, সেখানে যাওয়ার মতোও কেউ নেই। এমন কোনো ব্রাহ্মণ বা শ্রমণ নেই যিনি পরিপূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছেন এবং ইহলোক ও পরলোক সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেছেন। মৃত্যুকাল জ্ঞানীদের ও মূর্খদের একইভাবে সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে হয়। মৃত্যুর পরে তারা কেউ কোনোভাবেই আর বিদ্যমান থাকে না।[১১৩]

শ্মশানে মৃতদেহ আগুনে পোড়ার সাথে সাথে মৃত ব্যক্তির যাগযজ্ঞ ত্যাগ-তিতিক্ষা সবই ভস্মীভূত হয়। যজ্ঞের কোনো সুফল নেই, নেই কোনো কুফল তথাকথিত অসৎ কাজেরও। ভালো ও মন্দ কাজের ফল কিছুই নেই। স্বজ্ঞা দ্বারা কোনো জ্ঞান আহরণ করা যায় না, কারণ জ্ঞান কেবলমাত্র বাইরে থেকে আসতে পারে ইন্দ্রিয় মারফত। ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান আবার যুক্তিদ্বারা পরিশীলিত হয়। যেহেতু যুক্তি ও ইন্দ্রিয় দুই-ই আবেগ দ্বারা বিকৃত হয়, তাই সকল জ্ঞানই বৃথা।[১১৪] এই অজ্ঞেয়বাদ অজিতকে চার্বাকদের থেকে নিশ্চিতরূপে আলাদা করে, কারণ চার্বাকপন্থীরা ইন্দ্রিয়লব্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে গ্রহণযোগ্য মনে করতেন। অজিত আরো মনে করতেন যে, ইহলোক ও পরলোক কোনোটারই অস্তিত্ব নেই।[১১৫] এ অবস্থান তাঁর জন্য স্বাভাবিক, কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন ইন্দ্রিয় দ্বারা বাস্তব জগতের যে উপলব্ধি হয় তা নির্ভরযোগ্য নয়। তিনি আরো বলতেন, আনন্দ একটি আকর্ষণীয় তুচ্ছ বস্তু; এটিকে গ্রহণ করা বা না করা যেতে পারে, উপভোগ করা যেতে পারে, আবার নাও করা যেতে পারে।[১১৬]

তবে চার্বাকপন্থীদের মতোই অজিত পথপ্রদর্শকরূপে বা জ্ঞানের উৎস হিসেবে *বেদ* ও ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর মতে *বেদে* লভ্য 'জ্ঞান' 'ব্রাহ্মণদের বমনোদ্গীরণ' বৈ কিছু নয়।[১১৭] অজিতের বিদ্রোহ প্রধানত ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে হলেও তাঁর জড়বাদ ও অজ্ঞেয়বাদের জন্য বুদ্ধও তাঁকে কঠোর ভাষার নিন্দা করেছিলেন।[১১৮] অজিত কর্তৃক কর্ম ও তার ফল অস্বীকার বিশেষভাবে বৌদ্ধ (এবং জৈন) মতের বিরুদ্ধে গিয়েছিল।[১১৯] এভাবে দেখা যাচ্ছে, অজিত কেশকম্বলী এক জন শক্ত ভিন্নমতী ছিলেন এবং চার্বাকদের মতো প্রাচীন ভারতের অর্থোডক্সি ও হেটেরোডক্সি উভয়ের বিরুদ্ধেই দাঁড়িয়েছিলেন। সুতরাং তিনি এবং তাঁর অনুগামীরা বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণদের দ্বারা সমভাবে নিন্দিত হয়েছিলেন।[১২০]

৬.৪ সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত : সন্দেহী-অজ্ঞেয়ী শান্তিবাদী

"সামাঞ্‌ঞফল সুত্তে" উল্লিখিত আর একজন বিরুদ্ধবাদী হচ্ছেন **সঞ্জয় বেলট্‌ঠিপুত্ত**। সন্দেহবাদ ও অজ্ঞেয়বাদ উভয় প্রবণতার ধারক সঞ্জয় মনে করতেন আত্মার জ্ঞান অর্জন করা অসম্ভব। তাই কেবল মানসিক শান্তিলাভের সম্ভাবনাই খোঁজা উচিত। তিনি অতিপ্রাকৃত বিষয়ের জ্ঞান লাভের কিংবা সৃষ্ট পদার্থসমূহের চূড়ান্ত পরিণতি তথা অস্তিত্বের রহস্য বোঝার চেষ্টা নিরর্থক বলে নিশ্চিত হয়েছিলেন।[১২১]

যেকোনো সমস্যা সমাধানে তাঁর পদ্ধতি ছিল কখনো কোনো কিছু স্বীকার বা অস্বীকার না করা। সঞ্জয় নাকি বলেছিলেন :

> আপনি যদি আমাকে প্রশ্ন করেন, "পরজগৎ বলে কিছু আছে কি?"... আমি বলি না যে, 'হ্যাঁ এটাই ঠিক; আমি এও বলি না যে বিপরীতটাই সত্য; আমি বলি না যে বিষয়টি এরকম নয়; আমি এমনও বলি না বিষয়টি যে এরকম নয়, তা নয়'।[১২২]

এমনিভাবে বিচক্ষণ ব্যক্তি সকল বিষয়ে রায় দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। এটাই মানসিক শান্তি লাভের একমাত্র উপায়। কৌতূহল দমিত হলে আবেগ স্তিমিত হয়। আবেগ নিয়ন্ত্রণে থাকলে শান্তি মেলে। সঞ্জয় মনের সমতা ও প্রশান্ত অবস্থার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিতেন, কারণ এগুলিকে তিনি বিমুক্ত চিত্তের লক্ষণ বলে মনে করতেন। সঞ্জয় ও তাঁর অনুগামীরা যথারীতি সমকালীন ভাবুকদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। বিবিধার্থবোধক কথা বলা এবং সৎ জিজ্ঞাসুদের জিজ্ঞাসাকে *"পাঁকাল মাছের মতো পিচ্ছিল ভঙ্গিতে" এড়িয়ে যাওয়ার জন্য বুদ্ধ সঞ্জয়ের নিন্দা করেছেন।*[১২৩] *বুদ্ধের অবস্থান ছিল এই যে,* উত্তর মেলে না এমন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা সময়ের অপচয় মাত্র; বিশেষত তা যখন সন্দেহবাদের দিকে নিয়ে যায়।[১২৪] বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণেরা সঞ্জয়কে স্বাগত জানাবেন এমন সম্ভাবনা মোটেই ছিল না।

৬.৫ জয়রাশির নাস্তিবাদ

প্রাচীন ভারতের সর্বশেষ ভাববিদ্রোহী ছিলেন **জয়রাশি ভট্ট** (খ্রি. ৭ম শতক) যাঁর *তত্ত্বোপপ্লবসিংহ* বৌদ্ধ-জৈন গ্রন্থাদির বাইরে 'নাস্তিক' বর্গীয় একমাত্র গ্রন্থ যা লুপ্ত হয়ে যায়নি। কোনো বিষয়ে মানুষের কোনোপ্রকার জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা খারিজ করে দিয়ে জয়রাশি একজন চূড়ান্ত জ্ঞান-তাত্ত্বিক নিরস্তিবাদী (epistemological nihilist) হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। সূক্ষ্ম যুক্তিমালা ও তীক্ষ্ণ দ্বান্দ্বিক বিতর্কজাল বিস্তার করে তিনি সমকালীন প্রধান প্রধান ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদকে ভ্রান্ত প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন।[১২৫] চার্বাকপন্থীরা 'প্রত্যক্ষ'কে জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায় হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। কিন্তু জয়রাশি প্রত্যক্ষসহ জ্ঞানের সকল পন্থাকে অকার্যকর বলে বাতিল করেছেন। অসীমের জ্ঞান আমাদের হতে পারে না, কারণ আমরা সসীম। আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ অসম্পূর্ণ, তারা বস্তুজগতের খণ্ডাংশগুলোকে উপলব্ধি করে ধাবমান মুহূর্তসমূহের ক্রমগতির মধ্য দিয়ে। প্রপঞ্চের এই খণ্ডিত অভিজ্ঞতা নিয়ে ব্যক্তি কখনো তাকে 'জানা'-র দাবি করতে পারে না। বিকৃত ও অত্যন্ত আত্মমুখী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তার জ্ঞানের সম্পূর্ণ বাইরে অবস্থিত বিশাল বহির্জগৎ সম্পর্কে ব্যক্তির যাবতীয় অনুমান নিরর্থক হতে বাধ্য। মানুষের কথা বলতে গেলে বলতে হয়, কিছুই তার জ্ঞাত ও জ্ঞেয় নয়, কারণ জ্ঞাতা হওয়ার যোগ্যতাই তার নেই। ধর্মীয় সত্য ভুয়ো, এবং যেকোনো সত্য অপর যেকোনো সত্যের মতো একইরকম অলীক।[১২৬]

জয়রাশির মতে বস্তুজগৎকে জানার নির্ভরযোগ্য পন্থা না থাকায় বস্তুজগতের অস্তিত্বও স্বীকার করা যায় না। এ রকম সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়বাদ নিয়ে তিনি চার্বাকপন্থী বস্তুবাদী বলে বিবেচিত হতে পারেন না। ওআল্টার রুবেন বলেন, বস্তুবাদী বা ভাববাদী উভয় দর্শনেই আস্থাহীন জয়রাশি বস্তুর অস্তিত্ব কিংবা বাস্তব জীবনের সম্ভাবনা অস্বীকার করেছেন।[১২৭] তবে একটা কথা বলতেই হয় যে, ভিন্নমতী হিসেবে জয়রাশি প্রাচীন ভারতের সকল ধর্মীয় ও দার্শনিক মতবাদকে আক্রমণ করলেও চার্বাক দর্শনকে আঘাত করেননি। বৃহস্পতির প্রতি তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল বলে প্রতীয়মান হয়।[১২৮] অপর দিকে ব্রাহ্মণ, জৈন ও বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে নির্বিশেষ ও নিষ্করুণ আক্রমণ তাঁকে অর্থোডক্স ও হেটেরোডক্স উভয় ধরনের অধিষ্ঠানবিরোধী বিদ্রোহী হিসেবে প্রতিপন্ন করেছে।

৭.০ ভারতীয় চিন্তাধারায় নাস্তিক ঐতিহ্য ও তার পরাভব

জড়বাদী, সন্দেহবাদী, অজ্ঞেয়বাদী, নিরস্তিবাদী চিন্তা-চেতনা তথা বিরুদ্ধবাদী ধর্মসমূহ একত্রে প্রাচীন ভারতের 'নাস্তিক' ধারা বলে বিবেচিত। এঁরা সকলেই *বেদ* ও ব্রাহ্মণের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। এঁদের উত্থানের ঘটনা প্রাচীন ভারতীয় মানসের উর্বরতা নিষ্পন্ন করে। বুদ্ধিবৃত্তিক অবাধ্যতা *বেদের* প্রাচীনতম যুগেই দেখা গিয়েছিল এবং তা খ্রিস্টপূর্ব দশম-অষ্টম শতকের ঔপনিষদিক যুগ ধরে বৃদ্ধি পেয়ে খ্রি. পূ. ষষ্ঠ শতকে এসে তীব্রতম পর্যায়ে পৌঁছায় এবং কয়েকটি বিরুদ্ধ ধর্মের জন্ম দেয়। তবে ওই বিস্ফোরণের পরে ভারতে জোরালো ভিন্নমতের ঘটনা কমে আসে, এবং তা সম্ভবত নতুন নতুন ধর্মাধিষ্ঠান তথা বৃহৎ সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের ফলে।

পরবর্তী মহাকাব্যিক ও পৌরাণিক যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল পূর্বে উদ্ভূত ভিন্নমত ও বিরুদ্ধ ধর্মগুলিকে হিন্দু বহুত্ববাদের মধ্যে আত্মস্থ করে নেয়ার প্রক্রিয়া। হিন্দুইজ্‌মের মুক্তমুখ (open-ended) প্রকৃতি ও যৌগিক গঠনতন্ত্রের বদৌলতে সেখানে চিন্তা ও চর্চায় অভূতপূর্ব বহুত্ব ও বৈচিত্র্যের স্থান সংকুলান হয়। ভিন্নমত ও বিরুদ্ধধর্ম তখন ধর্মের শুভত্বের আপেক্ষিকতায় অশুভের প্রতীক হিসেবে প্রয়োজনীয়তা পায়। ফলে পৌরাণিক ধর্মে বিশেষ ধরনের সহিষ্ণুতার দেখা মেলে। ভিন্নমত ও বিরুদ্ধ মতাদর্শ তখন পাপ বা বিদ্রোহ না হয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক ভ্রান্তি বা অন্য রকম বোধ হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে।[১২১] খ্রিস্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে গুপ্ত বংশ উত্তর ভারতে তাদের বহুমাত্রিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলার আগেই ওই সমন্বয় সাধিত হয়ে গিয়েছিল। তবে এই নতুন সমঝোতায় বিশাল প্রশস্ততা ও বহুত্বময়তা থাকা সত্ত্বেও সাধারণভাবে আস্তিক ধর্মতত্ত্ব ও ব্রাহ্মণ্য সামাজিক অধিষ্ঠান প্রাধান্য লাভ করে এবং যেসব বিরুদ্ধধর্মী গোষ্ঠী উক্ত সমন্বয়ে সম্পূর্ণ সামিল হতে পারেনি তারা সীমিত অঞ্চলে কোনোক্রমে তাদের ভিন্ন আদর্শ নিয়ে টিকে থাকে।

গুপ্ত যুগের পরে সাম্প্রদায়িক বৈচিত্র্য সত্ত্বেও আস্তিক ধারার প্রাধান্য বজায় থাকে এবং মৌলিক ভিন্নমত অতীত বিষয়ে পরিণত হয়। নাস্তিক ধারাটি যারপরনাই দুর্বল হয়ে পড়ে এবং আপোসজনিত রূপান্তরের ফলে তাকে চেনাই দুষ্কর হয়। ভারতীয় সভ্যতার সর্বাঙ্গে স্থবিরতার লক্ষণ দেখা দেয়। একটা ধীরে চলার প্রবণতা এসে যায়। শুরু হয় বিশ্রামের যুগ। অনুগত্য ও সমঝোতা তথা অবসাদ ও বিশ্রামের এই আবহে জয়রাশি ভট্ট একটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছিলেন অতীতের সেই বিতর্কময় জঙ্গম যুগকে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে ক্রমাগত মুসলিম আগ্রাসনের ফলে নাস্তিক চিন্তাধারা স্থায়িভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে এবং উনিশ শতকে ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান এ দেশে আমদানি হওয়ার আগে পর্যন্ত তা আর মাথা তোলার অবকাশ পায়নি। তবে হ্যাঁ, মুসলিম আমলে তখনকার অধিষ্ঠিত তন্ত্রের বিরুদ্ধে ভিন্নমত ও অবাধ্যতার স্বতন্ত্র ধারা গড়ে উঠেছিল, যা বর্তমান প্রবন্ধের আওতায় পড়ে না।

৮.০ উপসংহার

বর্তমান প্রবন্ধে প্রদত্ত তথ্যাদি ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা থেকে বিশদ হয়েছে যে, প্রাচীন ভারতে স্বাধীন চিন্তাবিদদের একটি সুদীর্ঘ পরম্পরা বিদ্যমান ছিল। এসব আপোসহীন ভাবুকেরা সমকালীন প্রধান ধ্যানধারণা ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রশ্নবিদ্ধ করে নতুন বিকল্পের অবতারণা করেন। মহীদাস, বিশ্বামিত্র, উদ্দালক ও চার্বাক প্রমুখ বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের উপস্থাপিত চ্যালেঞ্জ থেকে উদ্ভূত দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতি ভারতীয় মেধার অভূতপূর্ব উৎকর্ষের কারণ হয়েছিল। তাঁদের ধ্যান-ধারণা কোনো সাধারণ বর্গের মধ্যে পড়ে না, কিন্তু তা ভারতীয় চিন্তন-মননের দিগন্তকে বিপুলভাবে প্রসারিত করে। ফলে বৈদিক-ব্রাহ্মণিক

অধিষ্ঠান ভারতে কখনো একটি বিশ্বজনীন বদ্ধবিশ্বাস ও তার অনুকূল একটি নির্বিকল্প ধর্মরাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী সত্তা সৃষ্টি করতে পারেনি। এভাবে আরো ভিন্নমতের জন্য দরজা খোলাই থেকে যায় এবং সন্দেহবাদী, অজ্ঞেয়বাদী, জড়বাদী, পরমাণুবাদী, আনন্দবাদী, নিরস্তিবাদী প্রমুখদের দীর্ঘ মিছিল এসে মেশে খ্রি. পূ. ষষ্ঠ শতকের জৈন-বৌদ্ধ-আজীবিক ধর্মের বিশাল বিকল্প অধিষ্ঠানের দোর গোড়ায়। অপর দিকে বৈদিক-ব্রাহ্মণিক কর্তৃত্বের কখনই সেই একরূপতা (uniformity) ও সাজ-সরঞ্জাম ছিল না, যার দ্বারা সে নিজ ক্ষমতা বজায় রাখবে এবং বিদ্রোহ দমন করবে। ফলে নূতনত্বের বিরুদ্ধে গোঁড়াদের কঠোর সমালোচনা ও পৌনঃপুনিক নিন্দাবাদ সত্ত্বেও ভিন্নমতী ও বিরুদ্ধধর্মীদের উপর কঠিন উৎপীড়ন ও তাদেরকে শারীরিকভাবে নিশ্চিহ্নকরণের মতো কোনো ঘটনার খবর আমরা পাই না। এটি অবশ্যই লক্ষণীয় যে, বুদ্ধ ও মহাবীর মর্যাদাময় ও শান্তিপূর্ণ দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন, যা ভারতের বাইরে কন্‌ফুসিআস, সক্রেটিস, যীশু, মুহম্মদ ও মার্ক্স প্রমুখ প্রতিবাদীর ভাগ্যে জোটেনি।

উৎস নির্দেশ ও টীকা

১. রোমিলা থাপার, *ডিসেন্ট ইন আর্‌লি ইন্ডিয়ান ট্র্যাডিশন* [প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে ভিন্নমত] (দেরাদুন : দ্য ইন্ডিয়ান রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট, ১৯৭৯), পৃষ্ঠা ৩। অনূদিত। মূল ইংরেজি:

It would seem self-evident that any society which is complex and registers change, as has been the case with Indian society, must also register ideas of dissent, protest and non-conformity; otherwise the very fact of change would be nullified.

২. এস. এন. আইজেনস্টাড, "*ডিসেন্ট হেটেরোডক্সি অ্যান্ড সিভিলাইজেশনাল ডিন্যামিক্‌স: সাম অ্যানালিটিক্যাল অ্যান্ড কম্পারেটিভ ইন্ডিকেশন্‌স*" [ভিন্নমত, বিরুদ্ধধর্ম ও সভ্যতার জঙ্গমতা : কতিপয় বিশ্লেষণী ও তুলনাত্মক সংকেত]। অন্তর্গত এস. এন. আইজেনস্টাড, রয়ভেন কাহান ও ডেভিড শুলম্যান (সম্পা.) *অর্থোডক্সি, হেটেরোডক্সি অ্যান্ড ডিসেন্ট ইন ইন্ডিয়া* [ভারতে অধিষ্ঠিত তন্ত্র, বিরুদ্ধ তন্ত্র, ও ভিন্নমত] (ব্যর্‌লিন : ম্যুটন পাবলিশার্স, ১৯৮৪), পৃষ্ঠা ৮।

৩. নর্ম্যান টমাস, *গ্রেট ডিসেন্টার্স* [মহান ভিন্নমতাবলম্বী] (নিউ ইয়র্ক : ডব্লিউ, নর্টন অ্যান্ড কোং, ১৯৬১), এবং ফ্রেডরিক সি. গিফিন ও রনাল্ড ডি. স্মিথ (সম্পা.) *এগেইন্‌স্ট দ্য গ্রেইন : অ্যান অ্যান্‌থলজি অব ডিসেন্ট, পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট* [স্রোতের বিপরীতে : ভিন্নমতী রচনাসংগ্রহ, অতীত ও বর্তমান] (নিউইয়র্ক : দ্য নিউ আমেরিকান লাইব্রেরি, ১৯৭১) প্রভৃতি গ্রন্থে এই মনীষীদেরকে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ 'ডিসেন্টার'দের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪. গিফিন ও স্মিথ, *এগেইন্‌স্ট দ্য গ্রেইন*, পৃষ্ঠা (নয়)। অনূদিত। মূল ইংরেজি : "Simply defined dissent means 'opposition to the status quo.'"

৫. জর্জ এস. স্বোপ, *ডিসেন্ট : দ্য ডাইন্যামিক অব ডেমোক্রেসি* [ভিন্নমত : গণতন্ত্রের চালিকা শক্তি] (নিউইয়র্ক : AMACOM, ১৯৭২), পৃষ্ঠা (পাঁচ), ৭-১৬।

৬. Dissent শব্দের বুৎপত্তি বিবেচনায় নিলে এর অর্থ খানিকটা পরিষ্কার হতে পারে। Webster's *Third International Dictionary of the English Language,* Unabridged ed., 1971-এ সংকলিত "Dissent" ও "Sense" শীর্ষক দুটি ভুক্তি থেকে নিচের ব্যুৎপত্তি দেয়া হলো:

Dissent- L. *dissentire = dis + sentire*: to feel, to perceive, to suppose, akin to Old High German *sin*: mind, sense; sinan: to travel, strive after, *sind*· journey, road.

৭. জন এম. মেকলিন, *দ্য স্টোরি অব অ্যামেরিক্যান ডিসেন্ট* [আমেরিকান ভিন্নমতের কাহিনী] (নিউ ইয়র্ক: হারকোর্ট, ব্রেস অ্যান্ড কোং, ১৯৩৪), পৃষ্ঠা ৩৬।

৮. গিফিন ও স্মিথ, *এগেইন্‌স্ট দ্য গ্রেইন*, পৃষ্ঠা (নয়)।

৯. বেন্‌জামিন ওআকার, *হিন্দু ওঅর্ল্ড : অ্যান এন্‌সাইক্লোপিডিয়া অব হিন্দুইজ্‌ম* [হিন্দু জগৎ : হিন্দুত্ব সম্বন্ধীয় বিশ্বকোষ], ২ খণ্ড (লন্ডন : জর্জ অ্যালেন অ্যান্ড আনউইন, ১৯৫৫), ২:১৬, ভুক্তি "মহীদাস।"

১০. *তদেব*। সংশ্লিষ্ট অংশটির জন্য দ্র. *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ* ৬.২৭।

১১. *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ* ২.১৯। মার্টিন হগ (সম্পা., অনু.) *দ্য ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অব দ্য ঋগ্‌বেদ* [ঋগ্‌বেদান্তর্গত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ], ২ খণ্ড (দিল্লী : ভারতীয় পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৭), ১:১১২-১৩।

১২. *ঐতরেয় ব্রাহ্মণ*, ৭.১৬। বেত্তম মনি, *পুরানিক এন্‌সাইক্লোপিডিআ* [পৌরাণিক বিশ্বকোষ], ৫ম সং (দিল্লী : মোতিলাল বানারসিদাস, ১৯৭৫), পৃষ্ঠা ৮৭৫, ৮৭৬।

১৩. মনি, *পুরানিক এন্‌সাইক্লোপিডিআ*, পৃষ্ঠা ৮৭৬।

১৪. ওআকার, *হিন্দু ওঅর্ল্ড* ২:৫৭৮।

১৫. *তদেব*, ১ : ১১২, ১৫১। ভুক্তি 'অগ্নি', 'ভৃগু'।

১৬. *তদেব*, ১: ১৫১।

১৭. ওএনিড ডি. ও'ফ্ল্যাহার্টি (অনু.) *হিন্দু মিথ্‌স : এ সোর্স বুক ট্রান্‌স্লেটেড ফ্রম দ্য স্যান্‌স্ক্রিট* [হিন্দু পুরাণকথা : সংস্কৃত থেকে অনুদিত একটি উৎস গ্রন্থ] (হারমণ্ড্‌স্‌ওঅর্থ, ইংল্যান্ড : পেঙ্গুইন বুক্‌স, ১৯৭৫), পৃষ্ঠা ১৪৯-৫০; ওআকার, *হিন্দু ওঅর্ল্ড* ১ : ১৫১।

১৮. ও'ফ্ল্যাহার্টি, *হিন্দু মিথ্‌স*, পৃষ্ঠা ১৫০-৫৪; ওয়াকার, হিন্দু ওঅর্ল্ড ১: ১৫১।

১৯. কাজী নজরুল ইসলাম, "বিদ্রোহী", *নজরুল-রচনাবলী*, আব্দুল কাদির-সম্পাদিত, ৪ খণ্ড, নতুন সং, (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩), ১:১০।

২০. ওআকার, *হিন্দু ওঅর্ল্ড*, ১:১৫১।

২১. ডেল রীপ, *দ্য ন্যাচরালিস্টিক ট্র্যাডিশন ইন ইন্ডিয়ান থট* [ভারতীয় চিন্তাক্ষেত্রে প্রকৃতিবাদী ধারা] (দিল্লী : মোতিলাল বানারসিদাস, ১৯৬৪), পৃষ্ঠা ১৭৮-৭৯ পাদটীকা।

২২. *তদেব*।

২৩. *তদেব*, পৃষ্ঠা ২৮-২৯, টীকা ৫৪ ও ৫৫।

২৪. ওয়াল্টার রুবেন, "উদ্দালক অ্যান্ড যাজ্ঞবল্ক্য : মেটিরিয়ালিজ্‌ম অ্যান্ড আইডিয়ালিজ্‌ম" [উদ্দালক ও যাজ্ঞবল্ক্য : বস্তুবাদ ও ভাববাদ], অন্তর্গত দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *স্টাডিজ ইন দ্য হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ান ফিলসফি : অ্যান অ্যান্‌থলজি অব আর্টিক্‌ল্‌স বাই স্কলার্স ইস্টার্ন অ্যান্ড ওএস্টার্ন* [ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস অধ্যয়ন : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের লেখা প্রবন্ধ সংকলন], ৩য় খণ্ড, (কলকাতা : কে. পি. বাগচি অ্যান্ড কোং, ১৯৭৮), ১ : ১৪১।

২৫. রীপ, *ন্যাচরালিস্টিক ট্র্যাডিশন*, পৃষ্ঠা ২৯।

২৬. রুবেন, "*উদ্দালক অ্যান্ড যাজ্ঞবল্ক্য*", পৃষ্ঠা ১ : ১৪১-৪২। মূল ইংরাজি থেকে বর্তমান লেখক কর্তৃক অনূদিত।

২৭. *ছান্দোগ্য উপনিষদ* ৬.৫.৭., *সংক্ষেপিত* ও *অন্তর্গত, চট্টোপাধ্যায়, লোকায়ত দর্শন,* ১ম খ *(কলকাতা : নিউ এজ পাবলিশার্স, ১৯৬৯), পৃষ্ঠা ২৫৩-৫৪।*

২৮. রুবেন, *"উদ্দালক অ্যান্ড যাজ্ঞবল্ক্য", পৃষ্ঠা* ১: ১৪৩-৪৫।

২৯. *তদেব,* পৃষ্ঠা ১ : ১৪৫-৪৬।

৩০. *তদেব,* পৃষ্ঠা ১.১৪৬।

৩১. রীপ, *ন্যাচরালিস্টিক ট্র্যাডিশন,* পৃষ্ঠা ৩০-৩১।

৩২. *তদেব,* পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪।

৩৩. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, *চার্বাক দর্শন,* পরিব, সং, (কলকাতা . পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮২), পৃষ্ঠা ১৫৭।

৩৪. *তদেব,* পৃষ্ঠা ১৫৫।

৩৫. *মৈত্রায়ণী উপনিষদ* ৭.৯।

৩৬. উদ্ধৃত, রামমোহন রায়, *গোস্বামীর সহিত বিচার,* পুনর্মুদ্রিত, *রামমোহন গ্রন্থাবলী*-২, সম্পা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, তাবিখ বিহীন) পৃষ্ঠা ৫৭।

৩৭. শাস্ত্রী, *চার্বাক দর্শন,* পৃষ্ঠা ১৫৩-৫৭।

৩৮. *তদেব,* পৃষ্ঠা ১৯, ১৫৬।

৩৯. *তদেব,* পৃষ্ঠা ২০০-০৩।

৪০. এগুলি নিম্নলিখিত উৎসে প্রাপ্ত তথ্যাদির বর্তমান গবেষককৃত সমন্বিত রূপ। (১) রীপ, ন্যাচরালিস্টিক ট্র্যাডিশন, পৃষ্ঠা ৫৮; (২) দক্ষিণারঞ্জন ভট্টাচার্য, "দ্য চার্বাক ফিলসফি" [চার্বাক দর্শন] অন্তর্গত, সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণণ (সম্পা.) *হিস্ট্রি অব ফিলসফি ইস্টার্ন অ্যান্ড ওএস্টার্ন* [প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস], ২ খণ্ড (লন্ডন : জর্জ অ্যালেন অ্যান্ড আনউইন, ১৯৫২), ১.১৩৪-৩৬; এবং (৩) উপরে নোট ৩৯এ উল্লিখিত উৎস।

৪১. রীপ, *ন্যাচরালিস্টিক, ট্র্যাডিশন,* পৃষ্ঠা ৭৭।

৪২. *তদেব,* পৃ. ৭৫-৭৬।

৪৩. মাধবাচার্য, *দ্য সর্বদর্শন-সংগ্রহ অর রিভিউ অব দ্য ডিফ্‌রেন্ট সিস্টেম্‌স অব হিন্দু ফিলসফি* [সর্বদর্শনসংগ্রহ বা হিন্দু দর্শনের বিভিন্ন শাখার সমীক্ষা], অনু. ই.বি. কাওএল ও এ.ই.গুচ, ৪র্থ সং, (লন্ডন: কেগান পল, ট্রেঞ্চ, ট্রাবনার অ্যান্ড কোং, ১৯০৪), পৃষ্ঠা ১০।

৪৪ শাস্ত্রী, *চার্বাক দর্শন,* পৃষ্ঠা ৮৮; ভট্টাচার্য, "চার্বাক ফিলসফি", ১:১৩৭।

৪৫. শাস্ত্রী, *চার্বাক ফিলসফি* [চার্বাক দর্শন] (কলকাতা : পুরোগামী প্রকাশনী, ১৯৬৭), পৃষ্ঠা ৪৭-৪৮।

৪৬. রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, "চার্বাকদর্শন", বঙ্গদর্শন ৩, সংখ্যা ৪ (জুলাই-আগস্ট ১৮৭৪) : ১৫৫।

৪৭. চট্টোপাধ্যায়, *হোঅট ইজ লিভিং অ্যান্ড হোঅট ইজ ডেড ইন ইন্ডিয়ান ফিলসফি* [ভারতীয় দর্শনে কি জীবিত এবং কি মৃত], ২য় সং, (নয়া দিল্লী : পীপল্‌স পাবলিশিং হাউজ, ১৯৯৭), পৃষ্ঠা ২১৩। মার্ক্‌স্‌বাদী দার্শনিক চট্টোপাধ্যায় এক্ষেত্রে দৃশ্যত অনৈতিহাসিক পর্যবেক্ষণ করেছেন। কারণ, মনু (খ্রি. পূ. ২য়-১ম শতক) এবং শঙ্কর (খ্রি. ৯ম-১০ম শতক) দুজনই চার্বাক-বৃহস্পতি (খ্রি.পূ. ৬ষ্ঠ থেকে

আরো প্রাচীনতর কাল)-র চেয়ে অনেক অর্বাচীন। মনু ও শঙ্করের বিরুদ্ধে চার্বাক দর্শনের কার্যকারিতার ব্যাপারটি প্রামাণ্যভাবে যথেষ্ট সন্দেহজনক। তবে বৈদিক-ব্রাহ্মণিক অধিষ্ঠানের বিরুদ্ধে চার্বাক দর্শনের উত্থান ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখা— এই মূল বিষয়টি অবিসম্বাদিত।

৪৮. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, "*লোকায়ত*", ঢাকা ইউনিভার্সিটি বুলেটিন, ১ম সংখ্যা (১৯২৫) থেকে চট্টোপাধ্যায়, *স্টাডিজ*-এ পুনর্মুদ্রিত,.পৃষ্ঠা২ : ৩০-৩১।

৪৯. মুখোপাধ্যায়, "*চার্বাকদর্শন*", পৃষ্ঠা ১৬৪।

৫০. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, *চার্বাক দর্শন*, পৃষ্ঠা ৫২, ৬৬।

৫১. এ. এল. ব্যাশাম, *হিস্ট্রি অ্যান্ড ডক্‌ট্রিন্‌স অব দ্য আজীবিকজ : এ ভ্যানিশ্‌ড ইন্ডিয়ান রিলিজ্যন* [আজীবিক ধর্মতন্ত্র ও ইতিহাস : ভারতের একটি বিলুপ্ত ধর্মমত] (লন্ডন : লুজাক অ্যান্ড কোং, ১৯৫১), পৃষ্ঠা ২৩২।

৫২. *তদেব*, পৃষ্ঠা ৬৬, ১৯২।

৫৩. *রামায়ণ*, ২.১০০. ৩৮-৩৯।

৫৪. *মহাভারত*, ১২, ১৯, ২৩-২৪, ১২. ১৮০. ৪৭-৪৯; ১৩-৩৭. ১১-১৪; ১৩.৩৯. ৩-১৯।

৫৫. দক্ষিবারঞ্জণ শাস্ত্রী, *চার্বাক দর্শন*, পৃষ্ঠা ৪৮, ৮৬।

৫৬. চট্টোপাধ্যায়, *হোয়াট ইজ লিভিং অ্যান্ড হোয়াট ইজ ডেড*, পৃষ্ঠা ২১৩।

৫৭. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, *চার্বাক দর্শন*, পৃষ্ঠা ১৮৪-৮৫।

৫৮ টি. ডব্লিউ, রিস-ডেভিড্‌স, *বুড্‌ঢিস্ট ইন্ডিয়া* [বৌদ্ধ ভারত] (১৯০৩), ৯ম সং, (দিল্লী : ইন্ডোলজিক্যাল বুক হাউজ, ১৯৭০), পৃষ্ঠা ১১১।

৫৯. কৈলাস সি. জৈন, *লর্ড মহাবীর অ্যান্ড হিজ টাইম্‌স* (দিল্লী : মোতিলাল বানারসিদাস, ১৯৭৪), পৃষ্ঠা ১৫২।

৬০. জি. পি. টেইলর, "ইনট্রোডাকশন" [ভূমিকা], অন্তর্গত মিসেস সিনক্লেয়ার স্টিভেনসন, *দ্য হার্ট অব জৈনিজ্‌ম* [জৈন ধর্মের মর্মকথা] (জে. এন. ফারকুহার ও এইচ. ডি. গ্রিস্‌ওঅল্ড সম্পাদিত 'দ্য রিলিজিয়াস কোএস্ট অব ইন্ডিয়া' [ভারতের ধর্মজিজ্ঞাসা] শীর্ষক গ্রন্থমালার অন্তর্গত) (লন্ডন : হ্যামফ্রে মিলফোর্ড, অক্‌স্‌ফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯১৫), পৃষ্ঠা চৌদ্দ।

৬১. এস. গোপালন, *আউট্‌লাইন্‌স অব জৈনিজ্‌ম* [জৈন ধর্মের রূপরেখা] (নয়া দিল্লী : উইলে ইস্টার্ন, ১৯৭৩), পৃষ্ঠা ৫২।

৬২. রীপ, *ন্যাচরালিস্টিক ট্র্যাডিশন*, পৃষ্ঠা ১১৪।

৬৩. এস. গোপালন, *আউটলাইন্‌স*, পৃষ্ঠা ৪০-এ প্রদত্ত উদ্ধৃতি থেকে।

৬৪. *হেমচন্দ্র*, *স্যাদ্‌বাদমঞ্জরী*, শ্লোক ৬। দ্র., গোপালন, *আউট্‌লাইন্‌স*, পৃষ্ঠা ৯১-৯২।

৬৫. রীপ, *ন্যাচরালিস্টিক ট্র্যাডিশন*, পৃষ্ঠা ৯৯, ১১৪।

৬৬. গোপালন, *আউটলাইন্‌স*, পৃষ্ঠা ৯১-৯২।

৬৭. *তদেব*, পৃষ্ঠা ১৬৬-৬৭; রীপ, *ন্যাচরালিস্টিক ট্র্যাডিশন*, পৃষ্ঠা ১০৯।

৬৮. রীপ, *ন্যাচরালিস্টিক ট্র্যাডিশন*, পৃষ্ঠা ৯৩-৯৪।

৬৯. *তদেব, পৃষ্ঠা ৯৮-১০০।*

৭০. *স্টিভেনসন, হার্ট অব জৈনিজ্‌ম, পৃষ্ঠা ৮৯।*

৭১. জৈন উৎস উদ্ধৃত, জে. এল. জৈনী, *আউটলাইন্‌স অব জৈনিজ্‌ম* [জৈন ধর্মের রূপরেখা] (কেমব্রিজ, ইংল্যান্ড: কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৪০), পৃষ্ঠা ৮০; পুনরুদ্ধৃত, রীপ, *ন্যাচরালিস্টিক ট্র্যাডিশন*, পৃষ্ঠা ১১০।

৭২. নীহাররঞ্জন রায়, "*প্রটেস্ট্যান্ট স্পিরিট ইন দ্য ইন্ডিয়ান ট্র্যাডিশন*" [ভারতীয় ঐতিহ্যে প্রতিবাদী চেতনা] *ট্রান্‌জ্যাকশন্‌স অব দ্য বোস রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট* (কলকাতা), খণ্ড ৪৩, সংখ্যা ৩ ও ৪ (১৯৮০), পৃষ্ঠা ৪২-৪৩।

৭৩. এম মোনিয়ার-উইলিয়াম্‌স, *বুড্‌ঢিজ্‌ম ইন ইট্‌স কানেকশন উইথ ব্রাহ্মনিজ্‌ম অ্যান্ড হিন্দুইজ্‌ম...* [ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও হিন্দু ধর্মের সাথে বৌদ্ধ ধর্মের সম্পর্ক] (১৮৮৯), ২য় সং (বারানসী ঃ চৌখাম্বা স্যান্সক্রিট সিরিজ অফিস, ১৯৬৪), পৃষ্ঠা ৮৫ (এব পর *বুড্‌ঢিজ্‌ম, ব্রাহ্মনিজ্‌ম অ্যান্ড হিন্দুইজ্‌ম* রূপে উল্লিখিত)।

৭৪. উদ্ধৃত, হেরমান ওল্ডেনবার্গ, *বুদ্ধ : হিজ লাইফ হিজ ডাক্‌ট্রিন হিজ অর্ডাব* [বুদ্ধ · তাঁর জীবন তাঁব ধর্ম তাঁর সংঘ], অনু. উইলিয়াম হোসেন (১৮৮২) (বারানসী : ইন্ডোলজিক্যাল বুক হাউস, ১৯৭১), পৃষ্ঠা ১৭৩-৭৪।

৭৫. পি. আর. বড়ুয়া, *আর্লি বুড্‌ঢিজ্‌ম অ্যান্ড দ্য ব্রাহ্মণিক্যাল ডক্‌ট্রিন্‌স* [আদি বৌদ্ধ ধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় প্রকরণ] (ঢাকা . এশিয়াটিক সোসাইট অব পাকিস্তান, তারিখ নাই), পৃষ্ঠা ৭৩।

৭৬. উদ্ধৃত, ওল্ডেনবার্গ, *বুদ্ধ*, পৃষ্ঠা ১৭২।

৭৭. রীপ, *ন্যাচরালিস্টিক ট্র্যাডিশন*, পৃষ্ঠা ১৪৩, পা. টী. ২৮।

৭৮. বড়ুয়া, *আর্লি বুড্‌ঢিজ্‌ম*, পৃষ্ঠা ৪৮, ১৩২।

৭৯. *তদেব*, পৃষ্ঠা ৪২, ৪৫।

৮০. মোনিআর-উইলিয়াম্‌স, *বুড্‌ঢিজ্‌ম, ব্রাহ্মণিজ্‌ম অ্যান্ড হিন্দুইজ্‌ম*, পৃষ্ঠা ৮৬-৮৭।

৮১. *তদেব*, পৃষ্ঠা ১০৬-০৭।

৮২. এডওয়ার্ড কোন্‌জে, বুড্‌ঢিজ্‌ম : *ইট্‌স এসেন্‌স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট*, ২য় সং (অক্‌সফোর্ড, ইংল্যান্ড ঃ ব্রুনো ক্যাসিরার, ১৯৫৩), পৃষ্ঠা ৩৯।

৮৩. রীপ, *ন্যাচরালিস্টিক ট্র্যাডিশন*, পৃষ্ঠা ১৪১।

৮৪. কোন্‌জে, *বুড্‌ঢিজ্‌ম*, পৃষ্ঠা ৩৯।

৮৫. বড়ুয়া, *আর্লি বুড্‌ঢিজ্‌ম*, পৃষ্ঠা ১৩৫।

৮৬. কোন্‌জে, *বুড্‌ঢিজ্‌ম*, পৃষ্ঠা ৪৩, ১৯০-৯১।

৮৭. *তদেব*, পৃষ্ঠা ১৫-১৬।

৮৮. রীপ, *ন্যাচরালিস্টিক ট্র্যাডিশন*, পৃষ্ঠা ১৩৪-৩৫।

৮৯. *তদেব*, পৃষ্ঠা ১৫৮-৬১, ১৬৭।

৯০. মোনিআর-উইলিয়াম্‌স, *বুড্‌ঢিজ্‌ম, ব্রাহ্মনিজ্‌ম অ্যান্ড হিন্দুইজ্‌ম*, পৃষ্ঠা ৯৬।

৯১. *কোন্জে, বুড্ডিজম,* পৃষ্ঠা ১৪৫।

৯২. *মেনিয়ার-উইলিয়াম্স, বুড্ডিজ্ম, ব্রাহ্মনিজ্ম অ্যান্ড হিন্দুইজ্ম,* পৃষ্ঠা ৯৬-৯৭।

৯৩. রীপ, *ন্যাচরালিস্টিক ট্র্যাডিশন,* পৃষ্ঠা ১২৩।

৯৪. বড়ুয়া, *আর্লি বুড্ডিজ্ম,* পৃষ্ঠা ৫৯।

৯৫. ব্যাশাম, *আজীবিকজ,* পৃ. ৭৯, ৯০-৯১, ২৭৮। ওআকার, *হিন্দু ওঅর্ল্ড,* ১:২০ ভুক্তি "আজীবিক।"

৯৬. ওআকার *হিন্দু ওআর্ল্ড,* ১:২২।

৯৭. ব্যাশাম, *আজীবিকজ,* পৃ. ২৮৪।

৯৮. *দীঘ নিকায়* ১, উদ্ধৃত, ব্যাশাম, *আজীবিকজ,* পৃষ্ঠা ১৪।

৯৯. ব্যাশাম, *আজীবিকজ,* পৃষ্ঠা ১২৩-২৭।

১০০. *তদেব,* পৃষ্ঠা ২৬৯, ২৮৪।

১০১. *তদেব,* পৃষ্ঠা ২৮০-৮২।

১০২. রীপ, *ন্যাচরালিস্টিক ট্র্যাডিশন,* পৃষ্ঠা ৪৫।

১০৩. *ঋগ্বেদ,* ২.১২.৫ রাল্ফ টি এইচ. গ্রিফিথ (অনু) *দ্য হিম্স অব ঋগ্বেদ* [ঋগ্বেদের মন্ত্রমালা], ২খ., ৪র্থ সং (বারানসী : চৌখাম্বা স্যান্সক্রিট সিরিজ অফিস, ১৯৬৩), ১:২৭৩।

১০৪. *ঋগ্বেদ,* ১০ ১২৯ এ এ ম্যাকডোনেল (নির্বাচন ও অনুবাদক), *হিম্স ফ্রম দ্য ঋগ্বেদ* [ঋগ্বেদীয় মন্ত্রমালা], দ্য হেরিটেজ অব ইন্ডিয়া সিরিজ (কলকাতা · অ্যাসোসিয়েশন প্রেস, তারিখ নাই), পৃষ্ঠা ১৯-২০।

১০৫. *ঋগ্বেদ,* ১০.৮২, ৫-৬, ১০.১২১ ৭-৯। আরও দ্র. *ঐতরেয় আরণ্যক* ২.১.৮. *দ্য ঐতরেয় আরণ্যক,* সম্পা., অনু. আর্থার বি. কীথ (অক্সফোর্ড : দ্য ক্ল্যারেন্ডন প্রেস, ১৯০৯), পৃষ্ঠা ২১০। আরও তুলনীয় দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, *চার্বাক দর্শন,* পৃষ্ঠা ১০৬-০৭, এবং রীপ, *ন্যাচরালিস্টিক ট্র্যাডিশন,* পৃষ্ঠা ২৩-২৫।

১০৬. *ঋগ্বেদ,* ১.১৬৪ ৪, ৬, ১৮, ৩৭. আবও দ্র. দক্ষিণাবঞ্জন শাস্ত্রী, *চার্বাক দর্শন,* পৃষ্ঠা ৩৬।

১০৭. *কঠোপনিষদ,* ১.১.২০।

১০৮. *শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ,* ১ ২। ৬.১-এও বলা হয়েছে যে, কোনো কোনো বিজ্ঞ ব্যক্তি বিভ্রান্ত হয়ে প্রকৃতিকে এবং অন্যরা কালকে সব কিছুর আদি কারণ বলে উল্লেখ করে থাকেন।

১০৯. *কঠোপনিষদ,* ২.৩।

১১০. ওআকার, *হিন্দু ওঅর্ল্ড,* ১:৫০০, ভুক্তি "জাবালি"।

১১১. তারপদ চৌধুরী, "দ্য এপিক্স : রামায়ণ" [মহাকাব্য : রামায়ণ], অন্তর্গত, রাধাকৃষ্ণণ, *হিস্ট্রি অব ফিলসফি,* ১: ৮১।

১১২. সংক্ষেপিত, *হিন্দু ওঅর্ল্ড,* ১:৫০০ এবং চৌধুরি, "দ্য এপিক্স", ১:৮১-৮২।

১১৩. সংক্ষেপিত, ব্যাশাম, *আজীবিকজ,* পৃষ্ঠা ১৫।

১১৪. ওআকার, *হিন্দু ওঅর্ল্ড* ১:২০, ভুক্তি "অজিত"।

১১৫. ব্যাশাম, *আজীবিকজ,* পৃষ্ঠা ২১৮; দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, *চার্বাক দর্শন,* পৃষ্ঠা ১৩।

১১৬. ওয়াকার, *হিন্দু ওঅর্লড*, ১:২০।

১১৭. *তদেব*।

১১৮. ব্যাশাম, *আজীবিকজ*, পৃষ্ঠা ৯৩, ৫৫।

১১৯. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, *চার্বাক দর্শন*, পৃষ্ঠা ১৯৩।

১২০. ওআকার, *হিন্দু ওঅর্লড*, ১:২০।

১২১. *তদেব*, ২:৩৪৮, ভুক্তি "*সঞ্জয়*"।

১২২. ব্যাশাম, *আজীবিকজ*, পৃষ্ঠা ১৬-১৭। ব্যাশামের ইংরেজি থেকে বাংলা তরজমা বর্তমান লেখকের।

১২৩. আকার, হিন্দু ওঅর্লড, ২ : ৩৪৮

১২৪. রীপ, ন্যাচরালিস্টিক ট্র্যাডিশন, পৃষ্ঠা ৩৮।

১২৫. ওআকার, *হিন্দু ওআর্ল্ড*, ১:৫০৩, ভুক্তি "জয়রাশি"।

১২৬. *তদেব*।

১২৭. রুবেন, উদ্ধৃত রীপ, *ন্যাচরালিস্টিক ট্যাডিশন*, পৃষ্ঠা ৬২।

১২৮. বৃহস্পতির প্রতি জয়রাশির সশ্রদ্ধ মনোভাব সম্পর্কে দ্র. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, *চার্বাক দর্শন*, পৃষ্ঠা ৫৮-৬০।

১২৯. ও'ফ্ল্যাহার্টি, "দ্য অরিজিন অফ হেরিসি ইন হিন্দু মিথলজি," [হিন্দু পুরাণে বিরুদ্ধ ধর্মের উৎস], অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত (১৯৭৩) পিএইচ. ডি. অভিসন্দর্ভ, পৃষ্ঠা (ছয়-সাত), ২৭-২৭এ। আরও দ্র. তাঁর প্রবন্ধ, *হিস্ট্রি অব রিলিজ্যন্স* [ধর্মের ইতিহাস] ১০, সংখ্যা ৪ (মে ১৯৭১) : ২৮০।

সংস্কৃত সাহিত্যে মানবিকতাবোধ

বিজয়া গোস্বামী

সংস্কৃত সাহিত্য এবং সংস্কৃত ভাষা সংক্রান্ত যা কিছু, সবই আজকের দিনে এক বিচিত্র অবস্থানে আছে। একদিকে 'সবই ব্যাদে আছে' গোছের মনোবৃত্তি, যাতে যা কিছু পুরোনো তা সবই ভালো, অন্যদিকে আবার সংস্কৃত শাসক ও পূজক শ্রেণীর ভাষা, সেখানে এমন কিছুই নেই যা আজকের পৃথিবীতে গ্রহণযোগ্য। দু'পক্ষই ভুলে যান, ভাষা বা সাহিত্য কোনো যুগেই আকাশ থেকে পড়ে না, সমাজের মধ্যেই তৈরি হয়। যে সব সামাজিক মানুষকে আমরা প্রত্যহ পথেঘাটে দেখি, আমাদের পরিবারের মধ্যে, কর্মক্ষেত্রে সেরকম মানুষ দিয়েই যুগে যুগে সমাজ তৈরি, তাদের নিয়েই ভাষা, তাদের নিয়েই সাহিত্য। আজকাল মানবিকতা বোধ ও মানবাধিকার নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা হয়। ঠিক এর অনুরূপ কোনো শব্দ প্রাচীন যুগে ছিল না। কিন্তু তাই বলে মানবিকতাবোধ মানুষের মধ্যে ছিল না, এ কথা বলা যায় কি? মানুষ যেখানে মানুষের মনুষ্যত্বের যথার্থ মূল্য দেয়, সেখানেই মানবিকতা প্রকাশ পায়, তা যে দেশে এবং যে কালেই হোক না কেন। তাই সংস্কৃত সাহিত্যেও মানবিকতাবোধ প্রতিফলিত হয়েছে। সচরাচর মানবিকতাবর্জিত ব্যক্তি খুব উঁচুদরেব কবি হতে পাবেন না। তাই কাব্যে যা প্রতিফলিত হয়েছে, তা কবির তো বটেই, সমগ্র সমাজেরও মানবিকতা— কারণ কবি তো সমাজের বাইরের কোনো জীব নন! অনেক ক্ষেত্রেই কবি হয়তো রাজা-রাজড়াদের নিয়ে কাব্য-নাটক রচনা কবতে বাধ্য হয়েছেন— রাজকীয় বৃত্তি নিয়েই তো কবির ভরণপোষণ চলে! কিন্তু তাই বলে মানুষের প্রতি তাঁদের কোনো সহানুভূতি নেই, এ কথা কখনোই সত্য নয়। কবির নিজের কল্পনার প্রলেপ অবশ্য কাব্যের উপর পড়বেই, কিন্তু সেখানেও সমাজচিন্তা এক গভীর ছাপ ফেলে গেছে। শ্রীকরুণাসিন্ধু দাস বলেন : "অবশ্য সাহিত্যে সমাজ খুঁজতে যাওয়ার ঝুঁকি অনেক। স্রষ্টার কল্পনা ও আবেগের অতিরেক যথার্থ বস্তুস্বরূপকে বহুলাংশে আবৃত করে রাখতে পারে। অতীত কথাবস্তুর আধারে যিনি শিল্প নির্মাণ করছেন, ডিটেল ব্যবহারে তিনি কতটা ঐতিহ্য অনুসারী আর কতটা সমকালের দ্বারস্থ হচ্ছেন, তাও বোঝা সহজ নয়। তবে এ কথাটা স্পষ্ট করে বলা যায়, ভাবসঞ্চালনের তাগিদ থেকেই যেহেতু লেখা হচ্ছে, সুতরাং পাঠক-শ্রোতার সাধারণ অভিজ্ঞতায় যা উপস্থিত, তা দিয়েই ডিটেল, ভাবানুষঙ্গ, এমনকি সামগ্রিক শিল্প পরিকল্পনার মূল রচনা স্বাভাবিক।" (সংস্কৃত সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ— পৃ. ৩)

ঐতিহ্য ও সমকালের মধ্যে কোনটি কবির উপরে বেশি প্রভাব ফেলে তা খতিয়ে দেখতে গিয়ে প্রথমেই একটি তথ্য চোখে পড়ে। রামায়ণ-মহাভারতাদি গ্রন্থ থেকে যেসব কাব্য-নাটকের মূল সংগ্রহ করা হয়েছে, সে বিষয়ে একটি নির্দেশ পাওয়া যায়। ধনঞ্জয় তাঁর 'দশরূপক' গ্রন্থে বলেছেন—

যত্তত্রানুচিতং বস্তু নায়কস্য রসস্য বা।
বিরুদ্ধং তৎ পরিত্যাজ্যমন্যথা বা প্রকল্পয়েৎ।।

(দশরূপক, ৩/২৪-২৫)

অর্থাৎ মূল বিষয়বস্তুতে নায়ক বা রসের প্রতি হানিকর বা অনুচিত কিছু যদি থাকে তবে তা পরবর্তীকালের কবি পরিহার করতে পারেন অথবা তাকে অন্যভাবে দেখাতে পারেন। এই 'অনুচিত'

বিষয়বস্তুর অনৌচিত্য কোন মাপকাঠিতে যাচাই হবে? অবশ্যই কবির এবং তাঁর সমাজের। কত শতাব্দী পূর্বে রামায়ণকার (তিনি যে-ই হোন) লিখে গেছেন, বালী ও সুগ্রীবের যুদ্ধের সময়ে রাম তাঁর মিত্র সুগ্রীবের পক্ষ অবলম্বন করে নেপথ্য থেকে বালীকে বাণ মারেন। এ কি কোনো বীরোচিত কাজ? না কি এর মধ্যে মানবিক কোনো মহত্ত্ব দেখা যায়? রামায়ণে যা-ই থাকুক, পরবর্তীকালের কবিদের মানবিকতাবোধে এই ঘটনা চূড়ান্ত আঘাত হেনেছিল। তাই তাঁরা এই 'হানিকর', 'বিরুদ্ধ' ঘটনার পরিবর্তন বা পরিবর্জনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। ভবভূতির 'মহাবীরচরিতে' দেখা যায়, বালী ও রামের মধ্যে সম্মুখযুদ্ধ হয়েছিল। বালী রামের এক বড় ভক্ত, কিন্তু রাবণের সঙ্গে সখ্যবশত, মাল্যবানের অনুরোধে তিনি রামের সঙ্গে যুদ্ধে সম্মত হয়েছিলেন (এবং নামাযুক্তমনুরুধ্যমানা ঃ পুমাংসো মহত্যযুক্তগহ্বরে নিপাত্যন্তে। যদনেন মাল্যবতা পৌলস্ত্যমৈত্রী প্রতিশ্রবমনুস্মার্য তত্র— ভবতো রঘূদ্বহস্য নিধনে নিযুক্তোঽস্মি। — মহাবীরচরিত, ৫ম অঙ্ক)। 'উদাত্তরাঘব' নাটকে এই ঘটনা সম্পূর্ণরূপে উহ্য। এই পরিবর্জন ও পরিবর্তনের হেতু অবশ্যই মানুষের প্রতি, জীবনের প্রতি কবির অকৃত্রিম অনুরাগ।

রামায়ণের অন্য যে ঘটনাগুলি অমানবিক বলে পীড়াদায়ক, তার মধ্যে প্রধান শম্বূকবধ এবং সীতার অগ্নিপরীক্ষা ও নির্বাসন। শম্বূকবধ অবশ্যই আজকের দিনে আমাদের পীড়া দেয়। সব মানুষেরই শিক্ষার অধিকার আছে, আত্মোন্নতির অধিকার আছে, এ কথা যাঁরা মানেন, শূদ্র শম্বুকের বেদপাঠ এবং তপস্যা তাঁদের কাছে 'অপরাধ' নয়। কিন্তু এই ঘটনার পটভূমিকা হলো রামরাজ্য। সেখানে একটি ব্রাহ্মণ শিশুর অকালমৃত্যু হয়েছে। ব্রাহ্মণমাহাত্ম্য প্রচার করার জন্য তাই দেখানো হয়েছে, ব্রাহ্মণেরা এত পুণ্যবান, যে তাঁদের অকালমৃত্যু হয় না, সুতরাং শূদ্রের বেদপাঠ এবং তপস্যার সঙ্গে এই মৃত্যুর কার্যকারণ সম্বন্ধ আছে। এই কারণেই রাম শম্বূকের মুণ্ডচ্ছেদ করলেন, এবং ফলে শূদ্র স্বর্গে যেতে পারলো না বলে কৃতজ্ঞ দেবতারা রামকে বরদান করলেন।

গৃহাণ চ বরং সৌম্য যং ত্বমিচ্ছস্যরিন্দম।
স্বর্গভাঙ্ ন হি শূদ্রোঽয়ং ত্বৎকৃতে রঘুনন্দন।।

(রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ৭৬/৮)

কিন্তু কালিদাস এই ঘটনাকে ভিন্নরূপ দিয়েছেন। রাম দৈববাণীর আদেশে খুঁজতে বেরোলেন, তাঁর প্রজাদের মধ্যে কে 'অপচার' করেছে (রঘুবংশ, ১৪/৪৬-৪৭)। খুঁজতে খুঁজতে দেখলেন এক ব্যক্তি গাছের ডাল থেকে অধঃশিরা হয়ে ঝুলে তপস্যা করছে। পরিচয় জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন, সে শম্বূক নামে শূদ্র। অতএব রাম সেই 'অনধিকারী'র শিরচ্ছেদ করলেন (ঐ ৪৯-৫১)। কিন্তু মৃত্যুর পর শম্বূক স্বর্গে গেল, কারণ স্বয়ং রামের হাতে তার মৃত্যু হয়েছে।

কৃতদণ্ডঃ স্বয়ং রাজ্ঞা লেভে শূদ্রঃ সতাংগতিম্।
তপসা দুশ্চরেণাপি ন স্বমার্গাবলম্বিনা।।

(ঐ ৫৩)

ভবভূতি আরও করুণাশীল। তাঁর 'উত্তররামচরিত' নাটকে দৈববাণী স্পষ্টভাবে শম্বূকের নামই বলে দিয়েছে, এবং রামকে আদেশ করেছে তার মাথা কেটে ফেলতে (শীর্ষচ্ছেদ্যঃ স তে রাম— উত্তররামচরিত, ২য় অঙ্ক, বিষ্কম্ভক) রামও অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে এই কাজ করেছেন, এবং তাঁর ডান হাতকে সম্ভাষণ করে বলেছেন, "তুমি তো সেই রামেরই অঙ্গ, যে গর্ভভারক্লিষ্টা সীতাকে নির্বাসন দিতে বিচলিত হয়নি— তোমার আবার কিসের করুণা!"

রামস্য গাত্রমসি নির্ভরগর্ভখিন্ন—
সীতাবিবাসনপটোঃ করুণা কৃতস্তে।

(উত্তররামচরিত, ২য় অঙ্ক)

এই ঘটনার পরেই শূদ্র শম্বূক দিব্যদেহ ধারণ করে রামের সামনে উপস্থিত হচ্ছে।

এভাবে রামের চরিত্রচিত্রণ করায় যে রামের দোষক্ষালন হয়ে যাচ্ছে তা নয়, তবে এই বিষয়টি যে কবিমানসকে পীড়িত করেছিল, সমাজ মানসকেও কি তা পীড়া দেয়নি? সুতরাং এই ঘটনাগুলির পরিবর্তন একটা বৃহত্তর সামাজিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত বহন করে।

সীতার প্রতি রামের অবিচার যুগযুগান্ত ধরে মানুষের মনকে পীড়া দিয়ে এসেছে— সমগ্র নারীজাতির প্রতি অপমান ও হৃদয়হীনতার প্রতীকরূপে। আজও আমাদের দেশের মানুষ কন্যাসন্তানের নাম 'সীতা' রাখতে ইতস্তত করেন, এই নাম হলে সে মেয়ে নাকি জন্মদুঃখিনী হয়। এই মানুষের বেদনা কবিরা কাব্যে রূপ দিয়েছেন চিরকাল। রামায়ণে সীতার অগ্নিপরীক্ষা হয় কারণ রাম মনে করেন, 'পরপুরুষের' ঘরে দীর্ঘকাল বাস করে, এবং সীতাহরণের সময়ে যে কলুষিত দৃষ্টি ও স্পর্শ সীতার দেহে পড়েছিল তাতে 'পুলকিত' হয়ে সীতা কলঙ্কিত— "তোমার চরিত্র বিষয়ে আমার সন্দেহ উপস্থিত হয়েছে... তুমি রাবণের অঙ্কশায়িনী হয়েছিলে, তার কুৎসিত দৃষ্টি তোমার উপরে পড়েছিল, আমার মহৎ কুলে কালি দিয়ে আমি কি তোমাকে আর ফিরিয়ে নিতে পারি?" (রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড, ১১৫/১৫-২৩)। এমনকি তিনি সীতাকে যার সঙ্গে ইচ্ছা হয় তার সঙ্গেই চলে যেতে বলেন। এই অপমানের প্রতিবাদ স্বরূপই সীতা অগ্নিতে প্রাণবিসর্জন দিতে গিয়েছিলেন। কিন্তু অগ্নি ও অন্যান্য দেবতারা এসে সীতার শুচিতার সাক্ষ্য দেওয়াতে রাম তাঁকে ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, তাঁর নিজের সীতার বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, তিনি শুধুমাত্র লোকের বিশ্বাস জন্মাতে এই কাজ করেছেন। সীতা এতই পবিত্র যে আগুন তাঁকে পোড়াতে পারেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাজত্ব করার কিছুকাল পরে আবার যখন প্রজাদের মধ্যে সীতার চরিত্র বিষয়ে কানাকানি ওঠে, তখন তিনি সীতাকে সে বিষয়ে কিছু না জানিয়েই গর্ভবতী অবস্থায় তাঁকে বনে নির্বাসন দিলেন। তাঁর ভরণপোষণের কোনো ব্যবস্থাই করলেন না, এমন কি তাঁর নির্বিঘ্নে প্রসব হয়েছে কিনা, তিনি সুস্থ আছেন কিনা, আদৌ বেঁচে আছেন কিনা, সে বিষয়ে কোনো সন্ধান নেওয়ার প্রয়োজন মনে করলেন না। রামের আর কোনো সন্তান ছিল না, তাই আকস্মিকভাবে যখন তিনি লব-কুশের সন্ধান পেলেন, তখন দেখলেন, এদের নিজের সন্তান বলে গ্রহণ করলে তাদের মাকেও গ্রহণ করতে হয়। তাই সীতাকে আবার এক পরীক্ষা দিতে ডাকলেন। কিন্তু ধরিত্রীর চেয়েও সহনশীলা সীতার এতদিনে ধৈর্যচ্যুতি ঘটল এবং তিনি মাতা ধরিত্রীর বুকেই আশ্রয় নিলেন।

সীতার এই পরীক্ষার ঘটনার মধ্যে অবশ্যই তৎকালীন সামাজিক চিত্র ফুটে ওঠে। কিন্তু লক্ষণীয় যে পরবর্তীকালের কবিরা এই ঘটনাগুলিকে নায়কের ও রসের প্রতি হানিকর বলেই নিশ্চয় মনে করেছিলেন— তাই এ দুটি ঘটনাকে নানাভাবে অন্যরকম করে সাজাবার প্রচেষ্টা করেছিলেন। তাতেই মনে হয়, সামাজিক চেতনার কিছুটা পরিবর্তন অবশ্যই ঘটেছিল। মহাকবি ভাস তাঁর 'অভিষেক' নাটকে সীতার অগ্নিপরীক্ষা দেখিয়েছেন। সেখানেও রাম রামায়ণের মতোই বলেছেন, "আমি সীতার শুচিতা জেনেও লোকের বিশ্বাস জন্মাবার জন্য একাজ করেছি।"

জানতাপি চ বৈদেহ্যাঃ শুচিতাং ধূমকেতন।
প্রত্যয়ার্থং হি লোকানামেবমেব ময়া কৃতম্।।

(অভিষেক, ৬ষ্ঠ অঙ্ক)

কিন্তু 'প্রতিমা' নাটকে বোধহয় তাঁর সাহস আরও বেড়ে ছিল। সেখানে তিনি অগ্নিপরীক্ষার ঘটনাই বাদ দিয়ে দিয়েছেন। সীতাকে দীর্ঘ বিরহের পর দেখে রাম বলছেন, "এই যে বৈদেহী ধীরে ধীরে এদিকেই আসছেন, তাঁকে তপস্বিনীরা প্রীতিভরে যাঁর যাঁর বয়স অনুসারে কেউ 'সখী', কেউ 'সীতা', কেউ 'জানকী', কেউ বা 'বধূ' বলে সম্ভাষণ করছেন।"

সখীতি সীতেতি চ জানকীতি যথাবয়ঃ স্নিগ্ধতরং স্নুষেতি
তপস্বিদারৈর্জনকেন্দ্রপুত্রী সম্ভাষ্যমাণা সমুপৈতি মন্দম্।।

(প্রতিমা, ৭ম অঙ্ক)

কালিদাস সুকৌশলে অগ্নিপরীক্ষার ঘটনা এড়িয়ে গেছেন। তাঁর 'রঘুবংশে' রামের যুদ্ধান্তে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন বর্ণনা করতে গিয়ে সীতার প্রসঙ্গে শুধুমাত্র অগ্নিশুদ্ধা বিশেষণটি ব্যবহার করেছেন (জাত-বেদোবিশুদ্ধাম্— রঘুবংশ, ১২/১০৪)।

ভবভূতির 'মহাবীরচরিত' নাটকের সপ্তম অঙ্কের বিষ্কম্ভকে লঙ্কা ও অলকা— দুই নগরীর কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে রাবণবধ, রামের জয়, ও সীতার অগ্নি পরীক্ষার ঘটনা জানা যায়। সেখানেই অলকা আক্ষেপ করে বলেন, পতিব্রতার জ্যোতিও অন্য জ্যোতি (অর্থাৎ অগ্নি) দিয়ে শুদ্ধ করতে হয়, এটাই আশ্চর্য। অথবা এ লোকাচারের অনুবর্তন মাত্র।

পতিব্রতাময়ং জ্যোতির্জ্যোতিষান্যেন শুধ্যতে।
ইদমাশ্চর্যমথবা লোকস্থিত্যনুবর্তনম্।।

(মহাবীরচরিত, ৭ম অঙ্ক, বিষ্কম্ভক)

ভবভূতির 'উত্তররামচরিতে' অগ্নিপরীক্ষার উল্লেখেই রাম শিউরে উঠে বলেন, সীতাব আবাব অগ্নিশুদ্ধি! তীর্থস্থানের জল এবং অগ্নি— এদের অন্য কিছু দিয়ে শোধন করতে লাগে না (তীর্থোদকং চ বহ্নিশ্চ নান্যতঃ শুদ্ধিমর্হতঃ— উত্তরবামচরিত, ১ম অঙ্ক)।

অন্যান্য অনেক কবিও অগ্নিপরীক্ষার ঘটনাকে নানা নতুন রূপ দিয়েছেন। রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডে আছে, ঋষিপত্নী অনসূয়া সীতাকে নানা দিব্য আভরণ দিয়েছিলেন (অযোধ্যাকাণ্ড, ১১৮/১৭-২১)। এই ঘটনার সূত্র ধরে শক্তিভদ্র তাঁর 'আশ্চর্য চূড়ামণি' নাটকে দেখিয়েছেন, অনসূয়া সীতাকে বর দিয়েছিলেন যে তিনি যখন স্বামীর সামনে উপস্থিত হবেন, তখন সব কিছুই তাঁর আভরণ হবে (তুহ ভত্তুণো দংসণপহে সব্বং মণ্ডনং ভবিস্সদিত্তি— আশ্চর্যচূড়ামণি, ২য় অঙ্ক)। এরই ফলে রাম সীতাকে দীর্ঘ বিরহের পর দেখেন— চন্দনলিপ্ত অঙ্গ, কুসুমশোভিত কেশভার এবং পরিধানে রক্তাম্বর। তিনি ব্যঙ্গ করে সুগ্রীবকে বলেন, "দেখেছ, এরকম বিরহের চরিত্র আগে কখনও দেখেছ?" সীতা বুঝতে পারেন রামের ভুল এবং মনে মনে বলেন, "হায়, অনসূয়ার বর আজ আমার কাছে অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।" (হদ্ধি অণসূআএ অনুগ্গহো বিঅ দাণিং সাবো সংবুত্তো— ঐ ৭ম অঙ্ক)। জয়দেবের 'প্রসন্নরাঘব' নাটকে দেখা যায়, সীতার উপরে পড়ে জ্বলন্ত কয়লা মহার্ঘ মুক্তায় পরিণত হয়। এই সব সংযোজনে রামের দোষ প্রক্ষালন হয় না বটে, তবে সীতার প্রতি তথা নারীজাতির প্রতি অবমাননার পীড়া কিছুটা হ্রাস পায়।

সীতা নির্বাসনের ঘটনা পাওয়া যায় রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে, যা পরবর্তীকালের সংযোজন বলেই মনে করা হয়। সেই সময়কার সামাজিক চাহিদা হয়তো এটাই ছিল— কোনো নারী তার স্বামীর থেকে দূরে কোনো 'পরপুরুষের আশ্রয়ে' যদি থাকতে বাধ্য হয়, তবে অগ্নিপরীক্ষাতেও তার শুদ্ধি হয় না। 'সমাজ' মানে তো এখানে সমাজপতিরা— তাঁদের কাছে নারী তো সম্পত্তি বিশেষ! কিন্তু এই অবিচারের বিরুদ্ধে পরবর্তীকালের কবিরা সোচ্চার। সীতা গর্ভাবস্থায় আবার তপোবন দেখতে যাওয়ার

ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এই তপোবন দেখতে পাঠাবার ছলেই রাম তাঁকে নির্বাসন দেন। কালিদাসের 'রঘুবংশে' আছে— সীতা যখন জানতে পারলেন, রাম তাঁকে ত্যাগ করেছেন, তখন তিনি লক্ষ্মণকে বললেন, "রাজা" রামের উদ্দেশ্যে এই বার্তা নিয়ে যেতে— "যদিও আমি তোমার সামনেই অগ্নিশুদ্ধা হয়েছিলাম, তা সত্ত্বেও আমাকে লোকাপবাদ শুনে যে তুমি ত্যাগ করলে, তা কি তোমার এই প্রসিদ্ধ বংশের উপযুক্ত হয়েছে?"

বাচ্যস্ত্বয়া মাবচনাৎ স রাজা
বহ্নৌ বিশুদ্ধামপি যৎ সমক্ষম্।
মাং লোকবাদশ্রবণাদহাসীঃ
শ্রুতস্য কিং তৎ সদৃশং কুলস্য।।

(রঘুবংশ, ২৪/৬১)

রাম যখন সীতাকে দ্বিতীয়বার শপথ করার জন্য আহ্বান জানালেন, তখন এরপর বেশ কিছু বছর কেটে গেছে। সীতা এখন দুই সন্তানের জননী এবং বাল্মীকির আশ্রমে নিজ ব্যক্তিত্বে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিতা। তাঁর পক্ষে এই অবমাননা সহ্য করা কঠিন— এবং অনুচিতও বটে। তাই তিনি শপথ নিয়ে সংসারে ফিরে যাবার দিকেই গেলেন না। তাঁর মাতা ধরিত্রীকে ডেকে তিনি বললেন, "আমি যদি বাক্, মনঃ, কর্মের দ্বারা কখনও স্বামীর প্রতি ব্যভিচারিণী না হয়ে থাকি, তবে হে মাতা বিশ্বম্ভরা ধরণী! তুমি আমাকে অন্তর্হিত কর।"

বাঙ্মনঃকর্মভিঃ পত্যৌ ব্যভিচারো যথা ন মে।
তথা বিশ্বম্ভরে দেবি! মামন্তর্ধাতুমর্হসি।।

(ঐ ১৫/৮১)

এই পাতাল প্রবেশকে যদি আমরা প্রতীক হিসেবে দেখি, তবে মনে হতে পারে, সীতা সংসার-সমাজের কটূক্তির প্রতি ধিক্কারে সব কিছু ত্যাগ করে বিপুলা পৃথিবীর পথে চলে গেলেন - কেউ আর তাঁকে খুঁজে পেল না।

দিঙ্নাগের 'কুন্দমালা' এবং ভবভূতির 'উত্তররামচরিত', এই দুটি নাটকেই রাম কর্তৃক সীতাপরিত্যাগের মর্মান্তিকতা ফুঠে উঠেছে, এবং দুই কবিই প্রজার প্রতি কর্তব্যের অনুরোধে নিষ্ঠুর কাজে প্রবৃত্ত হওয়ায রামের অসহায়তা প্রকাশ করেছেন, কিন্তু রামের দোষ ক্ষালন হয়নি। রামের অনুশোচনার সাক্ষী হিসেবে সীতাকে অলক্ষ্যে রেখে তাঁরা সীতার প্রতি অবিচারের কিছুটা প্রতিকার করার চেষ্টা করেছেন। বিশেষত ভবভূতি নাটকের শুরু থেকেই সীতানির্বাসনের ক্ষেত্র একটু একটু করে প্রস্তুত করেছেন। প্রথম অঙ্কের পূর্বেই জানা যায়, ঋষ্যশৃঙ্গের যজ্ঞে আমন্ত্রিত হয়ে রামের সব গুরুজনেরা— যথা দশরথের তিন মহিষী ও কুলগুরু বশিষ্ঠ— রাজধানীতে অনুপস্থিত আছেন। সেখান থেকে বশিষ্ঠ দূত করে পাঠিয়েছেন অষ্টাবক্র মুনিকে, এবং তাকে দিয়ে রামকে বলে পাঠিয়েছেন, "জামাতার (অর্থাৎ ঋষ্যশৃঙ্গের— দশরথের কন্যা শান্তা ঋষ্যশৃঙ্গের স্ত্রী) যজ্ঞে আমরা আবদ্ধ আছি। তুমি বালক এবং রাজ্যও নতুন লাভ করেছ। সুতরাং সর্বদাই প্রজাদের সন্তুষ্ট করতে সচেষ্ট থাকতে, তাতেই লাভ করবে যশ, যা তোমার পরম ধন।"

জামাতৃযজ্ঞেন বয়ং নিরুদ্ধা—
ত্বং বাল এবাসি নবং চ রাজ্যম্।

যুক্তঃ প্রজানামনুরঞ্জনে স্যা—
স্তস্মাদ্ যশো যৎ পরমং ধনং বঃ।।
(উত্তররামচরিত, ১ম অঙ্ক)

'বালক!' রামের বয়স তখন কম করেও ৩০-৩৫ হবে! কিন্তু বশিষ্ঠের কাছে অবশ্যই তিনি বালক, এবং রাজ্যপালনের অভিজ্ঞতাও কিছুই তাঁর হয়নি। তাই 'বালকটি' বেশ একটু ফুলে উঠলেন, এবং উত্তর দিলেন— "স্নেহ, দয়া, সুখ— এমন কি জানকীকেও যদি লোকানুরঞ্জনের জন্য ত্যাগ করতে হয়, তবে তাতে আমার কোনো খেদ নেই।"

স্নেহ দয়াং চ সৌখ্যং চ যদি বা জানকীমপি।
আরাধনায় লোকানাং মুঞ্চতো নাস্তি মে ব্যথা।।
(ঐ ঐ)

অপরদিকে সীতা রামের ভালোবাসার বিষয়ে এতটাই নিশ্চিত যে এত দুঃখ, এত অপমানের পরেও তাঁর রামের প্রতি কোনো ক্ষোভ, কোনো অনুযোগ নেই। তিনি বারবারই বলেছেন, "আমি আর্যপুত্রের মন জানি।" কিন্তু তাতে আর কারো তিরস্কার বাধা পায়নি। সীতার প্রিয়সখী বাসন্তী রামকে বলেছেন, "প্রভু, আপনি কি নিষ্ঠুর!... 'তুমি আমার প্রাণ, তুমি আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমি আমার চক্ষের কৌমুদী, তুমি আমার অঙ্গে অমৃত— এইসব শত প্রিয়বাক্য বলে সেই সরলার মন ভুলিয়ে, তাকেই— থাক, এসব বলে আর কি হবে!"

অয়ি দেব, কিং পরং দারুণঃ খল্বসি।...
ত্বং জীবিতং ত্বমসি সে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।
ইত্যাদিভির্প্রিয়শতৈরনুরুধ্য মুগ্ধাং
তামেব শান্তমথবা কিমিহোত্তরেণ।।
(ঐ ৩য় অঙ্ক)

এ কাজ তিনি কেন করেছেন, তার উত্তরে রাম বলেছেন, লোকে সহ্য করত না। কেন করত না? উত্তরে অভিমানভরে তিনি বলেছেন, সে তারাই জানে (ঐ)। সমাজপতিরা যাই বলুন, সাধারণ মানবহৃদয় রামের পত্নীত্যাগের 'মাহাত্ম্য' মেনে নিতে পারেনি।

এরকম একটি ঘটনা মহাভারতে দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার কাহিনী। কালিদাস তাঁর 'অভিজ্ঞানশকুন্তলে' এর নতুন রূপ দিয়েছেন। মহাভারতের কাহিনীতে দুষ্যন্ত গান্ধর্বমতে শকুন্তলাকে বিবাহ করেছিলেন বটে, কিন্তু তার বেশ কিছু বছর পরে, শকুন্তলা যখন তাঁর পুত্রকে নিয়ে রাজার সভায় আসেন, তখন দুষ্যন্ত ইচ্ছে করেই তাঁকে চিনতে চাননি, কারণটা অবশ্য একইরকম— লোকে কি বলবে! তখন শকুন্তলা কঠোরভাবে তাঁকে তিরস্কার করে চলে যাবেন— সেই সময়ে দৈববাণী হলো যে শকুন্তলা দুষ্যন্তেরই ধর্মপত্নী এবং বালকটি তাঁরই পুত্র। তখন দুষ্যন্ত ক্ষমা চেয়ে শকুন্তলাকে ফিরিয়ে আনলেন। এই সমস্ত ঘটনাটির উপরে কালিদাস এক মায়ার পর্দা ফেলে তার কদর্যতা মুছে দিয়েছেন একটি নতুন ঘটনা সংযোজন করে। এই ঘটনা হলো দুর্বাসার শাপ। শকুন্তলা দুষ্যন্তের চিন্তায় এতই অভিভূত যে দুর্বাসার মতো মান্য অতিথির সৎকার করতেই ভুলে যান। তার ফলে ক্রুদ্ধ দুর্বাসা শাপ দেন— যার চিন্তায় তুমি আমাকে অবমাননা করলে, সে তোমাকে কিছুতেই চিনতে পারবে না। শকুন্তলার সখীর কাকুতি-মিনতিতে তিনি বললেন, কোনো অভিজ্ঞান দেখাতে পারলে দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে চিনতে

পারবেন। দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে তাঁর আংটি দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সে আংটিটা হারিয়ে যাওয়ায় দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে চিনতে পারেননি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন, "কালিদাস দুর্বাসার শাপ আনিয়া ঐ মহাপুরুষকে রাজার মতো রাজা, এমনকি দেবতা করিয়া তুলিয়াছেন।" (দুর্বাসার শাপ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী)। রাজার বিলাসের উপকরণরূপে শকুন্তলাকে উপস্থাপিত না করে এক ব্যক্তিত্বশালিনী নারী করে গড়ে তোলার মধ্যে অবশ্যই কবির কৃতিত্ব কাজ করে। উপরন্তু রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে সত্যি করে যা মঙ্গলজনক, যা পেলে জীবন সার্থক হয়, তা পেতে হলে তার মূল্য দিতে হয়। এই মূল্য দুঃখের মূল্য, তপস্যার মূল্য— যা দুষ্যন্ত তাঁর দীর্ঘ অনুতাপের মধ্যে দিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন— "এই অনুতাপ তপস্যা।" (শকুন্তলা, রবীন্দ্রনাথ) সবচেয়ে বড় কথা, মূল কাহিনীতে নারীর যে অপমান আছে, তার কলঙ্ক মুছে দিতে কবি বাইরের একটি অঘটন এনে উপস্থিত করেছেন— দুর্বাসার শাপ— তারই ফলে দুষ্যন্ত শকুন্তলাকে ভুলে গেছেন।

আরও একটা কাজ এসব কবিরা করেছেন। নায়ক যে কারণেই হোক, নায়িকাকে প্রত্যাখ্যান করার পরে আবার যদি ফিরে ডাকেন, তাহলে নায়িকা হয়তো ফিরে আসতে বাধ্য হবেন, কিন্তু তা কি নায়িকা বা সমগ্র নারীজাতির প্রতি খুব সম্মানজনক হবে? নায়ক যে অনুতপ্ত, তিনি যে ক্ষমা চেয়ে নায়িকাকে ফিরিয়ে আনতে ব্যাকুল, তা নায়িকাকে তো জানানো প্রয়োজন। তাই কালিদাস দুষ্যন্তের অনুশোচনার সাক্ষী হিসেবে এনেছেন অপ্সরা সানুমতীকে— যে অদৃশ্য অবস্থায় রাজার ব্যাকুলতা প্রত্যক্ষভাবে দেখে শকুন্তলাকে জানায়। দিঙ্নাগ ও ভবভূতি অবশ্য সীতাকেই অদৃশ্যভাবে উপস্থিত রেখেছেন।

সমাজের তথাকথিত নীচু স্তরে যাঁরা বাস করেন, কবিরা তাঁদের প্রতি মানবিক স্বীকৃতি দিতে কখনোই পেছপা হননি। 'অভিজ্ঞানশকুন্তলে' যে হতভাগ্য জেলেটি মাছের পেটে রাজার আংটি পেয়েছিল, তার প্রতি কবির সহানুভূতি খুবই পরিস্ফুট। পুলিশের কর্তা যখন তাকে ব্যঙ্গ করে বলেন, সে একটি শুদ্ধ জীবিকা অবলম্বন করে, তখন জেলে তার উত্তরে বলে, যার যা জন্মগত পেশা, যতই নিন্দনীয় হোক, সেটা তার ত্যাগ করা উচিত নয়। দয়ালু ব্রাহ্মণেরা তো যজ্ঞে নিষ্ঠুরভাবে পশুহত্যা করেন। (অভিজ্ঞানশকুন্তল, ৬ষ্ঠ অঙ্ক, বিষ্কম্ভক) 'মৃচ্ছকটিক' প্রকরণে জুয়ায় সর্বস্বান্ত সংবাহকের চিত্র কবি এঁকেছেন বড় সংবেদনশীলভাবে। সরল, সাদাসিধে একটি গৃহস্থের ছেলে, পাটলিপুত্রনগরে বাস করে। ছেলেবেলা থেকেই তার ভবঘুরে মন নানা দেশের গল্প শুনে চঞ্চল হয়ে ওঠে, একদিন বেরিয়ে পড়ে পথে। সুসমৃদ্ধ উজ্জয়িনী নগরীতে এসে সে নায়ক চারুদত্তের সংবাহন বা গা টেপার(massage) কাজে নিযুক্ত হয়। চারুদত্ত দরিদ্র হয়ে পড়লে সে চাকরি তার চলে যায়, এবং সে শেষকালে জুয়া খেলতে শুরু করে। জুয়ায় সর্বস্ব হারিয়ে রাজকর্মচারী সভিক ও অপর একজন জুয়াড়ির হাতে নিগৃহীত হয়। নানা ছলছুতো করে পালাবার চেষ্টা করে সে— শেষপর্যন্ত পিছু হেঁটে একটি প্রতিমাহীন মন্দিরে ঢুকে প্রতিমার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকে— যাতে তার পায়ের ছাপ দেখে লোকে মনে করে, সে মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। কিন্তু জুয়াড়িরা কি এতই বোকা! তারা তার ছল ঠিকই ধরতে পারে। তাকে হাতেনাতে ধরার জন্য তারা তার সামনেই জুয়া খেলতে বসে। তারা জুয়াড়ি-মনস্তত্ত্ব ভালোভাবেই বোঝে, তাই তারা জানে, সামনে জুয়া খেললে পাকা জুয়াড়ি না খেলে থাকতে পারবে না। তাই শেষে হয়, জুয়াখেলার লোভে সংবাহক আপনি ধরা দেয়। এই ঘটনা মনে পড়িয়ে দেয় ঋগ্বেদের অক্ষসূক্ত বর্ণিত সেই অভাগাকে, যে জুয়া খেলবে না বলে সংকল্প করেও সন্ধ্যা হলেই জুয়ার আখড়ার গিয়ে উপস্থিত হয়— যেমন প্রেমিকা প্রেমিকের অভিসারে না গিয়ে পারে না।

যদাদীধ্যে ন দবিষাণ্যোভিঃ
পরায়দ্ভ্যোঽব হীয়ে সখিভ্যঃ।

ন্যপ্তাবচ বভ্রবো বাচমক্রতঁ
এমীদেষাং নিষ্কৃতং জারিণীব।।

(ঋগ্বেদ, ১০/৩৪/৫)

এই দুর্ভাগা জুয়াড়িকে নিগ্রহ করতে দেখে আর কেউ এগিয়ে আসে না, আসে শুধু আর এক জুয়াড়ি দর্দুরক, যে নিজেই জুয়ার দেনার ভয়ে সভিকের মুখোমুখি হতে চায় না (মৃচ্ছকটিক, ২য় অঙ্ক)। এই প্রকরণেই দেখি, দুর্বৃত্ত শাকার, অত্যাচারী রাজা পালকের শ্যালক এবং প্রিয়পাত্র, তার ক্রীতদাস স্থাবরককে আদেশ করে ভাঙা পাঁচিলের উপর দিয়ে গরুর গাড়ি চালিয়ে আনতে। স্থাবরক যখন প্রতিবাদ করে, গাড়ি ভেঙে যাবে, গরুগুলি মরে যাবে, সে নিজেও মরে যাবে, তখন শাকার উত্তর দেয়, তাতে কি হয়েছে? গাড়ি ভাঙলে নতুন গাড়ি কিনব, গরু মরলে নতুন গরু কিনব, দাস মরলে নতুন দাস কিনব (ঐ ৮ম অঙ্ক)। অপরদিকে আবার হৃদয়বান চারুদত্ত রাতের বেলা ঘুমন্ত দাসদাসীকে জাগিয়ে বিব্রত করতে চান না (ঐ ৩য় অঙ্ক)। এই প্রকরণেরই ১০ম অঙ্কে নায়ক চারুদত্তকে মিথ্যা অপবাদে দোষী সাব্যস্ত করে যখন শূলদণ্ড দেওয়া হয়, তখন সেই কাজে যে দু'জন চণ্ডাল নিযুক্ত হয়, তাদের সহানুভূতি সম্পূর্ণভাবে চারুদত্তের প্রতি দেখা যায়। তারা এমন কথাও বলে, আমাদের লোকে চণ্ডাল বলে, আমরা চণ্ডাল নই, যারা এরকম নিষ্ঠুর কাজ করে, সজ্জনের উপরে উৎপীড়ন করে, তারাই চণ্ডাল।

সংস্কৃতে অনেকগুলি সংগ্রহ বা anthology পাওয়া যায়, যার মধ্যে নানা কবির খুচরো রচনা শ্লোকগুলি সংগৃহীত হয়েছে। এখানেই নানা শ্লোকে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কথা বলা হয়েছে। এমনি একটি শ্লোক শ্রীধরদাস সংকলিত 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' একটি বড় করুণ ছবি ফুটিয়ে তোলে যা স্মরণ করিয়ে দেয় অমর কথাশিল্পী বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'র শিশু অপু ও দুর্গাকে— চিনিবাস ময়রাকে প্রতিবেশীর বাড়ি খাবার বেচতে দেখে যারা সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে—

প্রায়ো দরিদ্রশিশবঃ পরমন্দিরাণাং
দ্বারেষু দত্তকরপল্লবলীনদেহার।
লজ্জানিগূঢ়বচসো বহুভোক্তুকামা
ভোক্তারমর্ধনয়নেন বিলোকয়ন্তি।।

(সদুক্তিকর্ণামৃত, ২২২৭)

মানুষ চিরদিনই মানুষ। এবং মানুষের আনন্দ, মানুষের দুঃখ— এসবই সাহিত্যের বিষয়। যেসব কবি শুধুমাত্র রাজার মন রাখতে জমকালো বর্ণনাগুলি কাব্যে ধরে রাখার চেষ্টা করলেন, তাঁরা হয়তো রাজার খেতাব পেলেন, কিন্তু জগৎ তাঁদের ভুলে গেল। তাঁদেরই মনে রাখল, যাঁরা রচনার পত্রপুটে ধরে রাখলেন মানুষেরই মুখের একটু হাসি অথবা একবিন্দু চোখের জল।

গ্রন্থপঞ্জী

ঋগ্বেদ সংহিতা— সম্পাদনা : ভি. এস. সাতবলেকর, স্বাধ্যায়মণ্ডল

সংস্কৃত সাহিত্য সম্ভার— নবপত্র প্রকাশন

প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য— সুকুমারী ভট্টাচার্য, আনন্দ পাবলিশার্স লি., ১৯৯৮

সংস্কৃত সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব ও অন্যান্য প্রসঙ্গ— করুণাসিন্ধু দাস, রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯

সাঁচী ও অজন্তার শিল্পকলায় ভুস্বর্গ কপিলবস্তুর প্রতিচ্ছায়া

রণজিৎ পাল

সার্থক শিল্পসৃষ্টি কি থেকে হয়, দৈবপ্রেরণা, সঞ্চারবাসনা নিগূঢ় সৌন্দর্য্যবোধ, নাকি আনন্দময়তা এ নিয়ে প্রশ্ন আছে কিন্তু কোনো দেশের শিল্পকলার ইতিহাস লিপিবদ্ধ রাজারাজরার বিবরণ কিংবা আর্থিক-সামাজিক চর্চার তুলনায় কোন অংশে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দেলাক্রয় ও অন্যান্য উনবিংশ শতাব্দীর কলা সমালোচকেরা প্রাচীন গ্রীক ও রোমীয় কলা শেলীব ভূয়সী প্রশংসা করলেও প্রাচ্যের শিল্পকলাকে[১] ধর্তব্যের মধ্যে আনেননি। সাম্রাজ্যবাদের পতনে পরে বিশ্বে সমাজ চেতনায় আমূল পরিবর্তন এসেছে। গ্রীক ভাস্কর্য্য, ভাস্-চিত্র কিংবা ক্রীটের চিত্রকলার সৌন্দর্য্য সত্যই অনুপম[২] কিন্তু হ্যাভেল, কুমারস্বামী, থসিমের, আঁদ্রে মলরো, ও ফুশারের মতো কলা বিশেষজ্ঞেব ভারতীয় ও সুমেরীয় শিল্পকলার অনবদ্য সৌন্দর্য্যের কথাও একবাক্যে স্বীকার করেছেন[৩]। বস্তুতঃ মরিও বুসাগ্নি ও গোলাম ইয়াজদানীর মতো প্রখ্যাত লেখকেরা অজন্তার চিত্রকলাকে মানব ঐতিহ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। অজন্তার চিত্রের এক অতীন্দ্রিয় প্রভা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে কিন্তু এই চিত্রে স্বর্গকল্পনার একটি ইহলৌকিক পটভূমি আছে যা প্রাচীন ভারত ও ইরাণের মধ্যে এক নিবিঢ় আত্মীয়তার ইঙ্গিত করে। এ প্রসঙ্গে এসে যায় প্রাচীন কম্বোজের কথা যা ছিল ইরানের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে। কেবলমাত্র ভারতীয় কিংবা ইরানীয় সভ্যতার নয়, কম্বোজ ছিল বিশ্ব সভ্যতার শৈশবভুমি যারা চর্চা ব্যতিরেকে ভারতীয় ইতিহাস অথবা শিল্পকলার মূল্যায়ন অসম্ভব।

ভারতীয় কলার ইতিহাসে নবযুগ

মৌর্য্য[৪] শিল্পকলা প্রায় সম্পূর্ণভাবে রাজকীয় এবং এতে জনমানসের সঙ্গে সংযোগ ছিল কম। নিহাররঞ্জন রায়র মতে ভারতীয় সংস্কৃতিতে মৌর্য্যকলার বিপুল প্রভাব থাকা সত্ত্বেও এর ঐতিহ্য ছিল বহিরাগত। মৌর্য্যযুগের পরেই শিল্পকলায় এক নতুন জোয়ার আসে পশ্চিম ও মধ্য ভারতে। অজন্তার চিত্রে গান্ধার ও পাবসিক কলার প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও এতে সবকিছুই বিলীন হয়ে এক নূতন শৈলীর সৃষ্টি হয়েছে যা সম্পূর্ণ ভারতীয়[৫]। চিত্রগুলি দুইটি বিভিন্ন সময়ে অঙ্কিত হয়[৬]। প্রথম পর্বটি খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের। চিত্রগুলির উপজীব্য বিষয় বুদ্ধদেব, বোধিসত্ত্ববৃন্দ ও জাতকের কাহিনী যা মূলত: ধর্মসম্বন্ধীয়। এখানে আলেখ্যের পোশাক পরিধান-পদ্ধতি উষ্ণীষ ও অলংকার ভারহুত ও সাঁচীর উদগত মূর্তির সমরূপ। চিত্রকল্পের অনুচিন্তন অথবা শিল্পী-হস্তেব নৈপুন্যে সমসাময়িক বিশ্বে এরূপ উচ্চমানের নিদর্শন বিরল। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের আরম্ভ খ্রিস্টিয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে যখন অধ্যাপক ব্যাশামের মতে[৭] ভারত ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে সুসভ্য ও সুখী দেশ। রূপমাধুর্য্যে, মর্মগ্রাহিতায়, গতিশীলতায়, বৈচিত্রে, বর্ণিকাভঙ্গে ও সুসমঞ্জস রেখাবিন্যাসে এই চিত্রগুলি অনন্য। নর-নারীর সৌন্দর্য্য ও বিচিত্র আবেগ এখানে নিখুঁত ও প্রায় জীবন্ত রূপ ধারণ করিয়াছে যার নজির বিশ্বের ইতিহাসে অতুলনীয়।

স্বর্গের কাহিনী প্রায় সব ভাষাতেই সাহিত্য ও ধর্মকাহিনীর একটি মূল্যবান অঙ্গ। "অগর্ ফেরদৌস বর রূ-এ জমীনস্ত/হম ইনস্ত্ হম ইনস্ত্ বো হম ইনস্ত্"- পৃথিবীতে যদি থাকে স্বর্গ তবে তবে তা এইখানে, এইখানে, এইখানে, লিখেছিলেন এক ফারসী কবি। কবিদেব তাঁর কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্র থেকে নির্বাসনের পরামর্শ দিয়েছিলেন গ্রীক মনীষী প্লেটো। তাঁর কথায় প্রকৃত সৌন্দর্য্যের কোনো অস্তিত্ব নেই বস্তুজগতে সৌনন্দর্য্যমাত্রই স্বর্গীয়। স্বর্গের সৌন্দর্য্যের কেবলমাত্র একটা অস্পষ্ট আভাষ পাওয়া সম্ভব বস্তুজগতে, তার প্রতিচ্ছায়ায়। পঞ্চেন্দ্রিয় সংযোজনের মাধ্যমে অজন্তার যে নিরুপম সৌন্দর্য্য শুধু অগণিত জনসাধারণ নয়, ইয়াজদানী, মারিও বুসাগ্লি ও লরেন্স বিনিয়নের[৭] মতো প্রথিতযশা পণ্ডিতেরাও উপলব্ধি করেছেন সে কি বস্তুজগতে ভুস্বর্গেরই প্রতিচ্ছায়া? প্লেটোর ভাবজগতের বাইরে গিয়েও কিন্তু সেকথাই মনে হয়।

কপিলবস্তুর মায়াবী ঐতিহ্য

অজন্তার চিত্রে স্বর্গকল্পনার একটা অত্যন্ত বাস্তব পেক্ষাপট আছে। আলেখ্যগুলি যেহেতু বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত, এতে গৌতম বুদ্ধের জন্মভূমি কপিলবস্তু চিত্রিত থাকার সম্ভাবনা প্রবল। বুদ্ধের জন্মকাহিনী ললিতবিস্তারে কপিলবস্তুর বর্ণনায় কিন্তু স্পষ্টতঃই এক স্বর্গরাজ্যের[৮] আভাস আছে- যুগে যুগে মহা অবতারেরা দেবতা-অধ্যুষিত এই ভুস্বর্গ কপিলবস্তুতেই জন্মগ্রহণ করেন। আপাতদৃষ্টিতে এটা ভক্তি অথবা কল্পনার প্রসার মনে হয়, কিন্তু এই আখ্যানগুলির মধ্যে বহু অমূল্য সত্যও লুকিয়ে থাকতে পারে এ সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া অসমীচীন। বিশিষ্ট প্রত্নতাত্বিক দেবলা মিত্র লিখেছেন "উপরন্তু চিত্রগুলি তদানীন্তন সমাজের সংস্কার-বিশ্বাস, আচার ব্যবহার, বীতি-নীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাদ্যযন্ত্রাদি, আসবাবপত্র, এমন কি যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রক্রিয়ায়ও প্রামানিক দলিলবিশেষ। এই সকল আলেখ্যেব মাধ্যমে সেই প্রাচীন যুগের মানুষের কল্পনার দেবদেবী ও উপদেবতা-অধ্যুষিত স্বর্গরাজ্যেব আভাস পাওয়া যায়।"[৯] চিত্রকারদের এই স্বর্গরাজ্য কি পুরোপুরি কাল্পনিক, নাকি কোনও না কোনভাবে ভুস্বর্গের সঙ্গে এদের রক্তের যোগসূত্র ছিল?

বৌদ্ধধর্ম বণিকসমাজকে নুতন স্বীকৃতি দিয়েছিল সত্য, কিন্তু অজন্তাব চিত্র ও সাঁচী, গান্ধারা ভারহুত, কালি এবং আমরাবতীর ভাস্কর্য্য থেকে পরিস্কার বোঝা যায় যে বুদ্ধের সৌভ্রাত্রের বানী এক সময় রাজা থেকে রূপোপজীবিনী, শিল্পকার থেকে কর্মকার, ধনী শ্রেষ্ঠী থেকে ক্ষুদ্র মৎস্যজীবি, সকলকেই গভীবভাবে আপ্লুত করেছিল।[১০] অজন্তার চিত্রের যে বৈশিষ্ট্য মানসচক্ষুকে সহজেই প্রদীপ্ত করে তা হলো সাম্য ও সৌহার্দ্য, যা মানবিকতারও উর্দ্ধে। ইয়াজদানী মন্তব্য করেন যে অজন্তার চিত্র থেকে মনে হয় যে এই প্রেম যে শুধুমাত্র জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানব-মানবীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, সমস্ত জীবকুল ছিল এই বৃত্তের অর্ন্তভুক্ত। কপিলবস্তুর সেই সৌহার্দ্যের সুখস্মৃতিই কি পরবর্তী প্রজন্মের মনে ভুস্বর্গের আভাস রেখে যায়? মহাভারত, আলেকজান্ডারের অভিযান ও বাইবেলের পূর্ববিধান থেকে ঈঙ্গিত মেলে যে ভুস্বর্গের ধারণা অতি প্রাচীন। এ বিষয়ে চর্চা করতে হলে কপিলবস্তুর সঠিক ভৌগলিক অবস্থান নির্ণয় করতে হয়।

কপিলবস্তুর অবস্থান ও ডঃ ফুহরারের ইতিহাস-সৃষ্টি

কপিলবস্তুর ভৌগলিক অবস্থান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা নিয়ে বিস্তর জল ঘোলা হয়েছে। বহু ঐতিহাসিক নেপালের তিলৌরাকোটই কপিলাবস্তু ছিল মনে করেন, অথচ অন্যেরা উত্তর প্রদেশের প্রিপাওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। প্রথমে খননকার্য্যে বাধা দিলেও উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন কাজ শুরু হয় তখন থেকেই নেপালের শাষকেরা প্রত্নতত্ত্বকে সংকীর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার

করার চেষ্টা করেন। তদারকির দায়িত্ব পান ডঃ এ. এ. ফুহরার্[11] যাঁর তথাকথিত লুম্বিনি আবিষ্কারের পিছনে ছিল বহুবিধ কুকীর্তি। সম্প্রতি ব্রিটিশ গবেষক টি. এ. ফেলপ্স ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তি নিয়ে কয়েকটি প্রায় অবিশ্বাস্য তথ্য দিয়েছেন ও কপিলাবস্তু তিলৌরাকোট কিংবা পিপ্রাওয়ায় হতে পারে না লিখেছেন[12]। ডঃ ফুহরার বহুলারের সাঁচীর লেখ-বিষয়ক একটি বিবরণ হুবহু নকল করে নেপালে তাঁর খননকার্যের প্রতিবেদন হিসাবে দাখিল করেন, একটি মুর্তিতে জাল করে ব্রাহ্মী লিপি খোদাই করেন[13] ও বহু অর্থের বিনিময়ে একটি ঘোড়ার দাঁতকে বুদ্ধের দাঁত বলে বিক্রী করে ধরা পরেন। তাঁর পৃষ্ঠপোষক খড়্গ শামশের ছিলেন আরেক খলনায়ক, ষড়যন্ত্র ছিল যাঁর অস্থিমজ্জায়। তিনি নেপালের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করার পর ব্রিটিশ সরকারের আশ্রয় লাভ করেন। ডঃ ফুহরারকে বরখাস্ত করার পর তৎকালীন গভর্নর কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি পত্রে লেখেন যে তাঁর সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক বিচারই ভ্রান্ত এবং বর্জনীয়। ভারতীয় প্রত্নবিদরা সাধারণতঃ বিষয়টি না জানার ভান করলেও ফেলপ্স সন্দেহ করেন যে ফুহরারের মতো ইতিহাস-সৃষ্টির ঠিকাদারের সঙ্গে তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের যোগসাজস ছিল। প্রখ্যাত ভারতবিদ্ ভিনসেন্ট্ স্মিথের উক্তি, "কপিলবস্তুর সমস্যা বহু বছর ধরে অপরিক্ষিত ধারনা নিয়ে ছেলেখেলার পর্য্যায়েই নিবদ্ধ থাকবে"[14], ডঃ ফুহরারের দিকেই অঙ্গুলি সংকেত করে। তিলৌরাকোটে প্রভুত মৌর্য্যযুগীয় প্রত্নসামগ্রী হয়েছে কিন্তু বৌদ্ধযুগের বিশেষ কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। পিপ্রাওয়ায় বৌদ্ধ নিদর্শন সে তুলনায় অধিক কিন্তু এখানেও সে যুগের এমন কোনো বিশিষ্ট প্রত্নবস্তু উদঘাটিত হয় নাই যাহার আলোকে ইহাই কপিলবস্তু ছিল প্রমানিত হয়।[15] প্রকৃতপক্ষে ডঃ ফুহরারের কুকীর্তির রেশ না টানলে বোঝা যায় যে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর কপিলবস্তু ছিল উত্তর-পশ্চিম গান্ধারবৃত্তে, নেপালে নয়। সম্প্রতি ব্রাডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডঃ কনিংহ্যাম ইউনেস্কোর সহযোগে গবেষণা করিয়া তিলৌরাকোটই কপিলবস্তু ছিল বলিয়া যে রায় দিয়াছেন তা ভিনসেন্ট স্মিথ কথিত ছেলেখেলারই সমতুল্য। এই অভিমত ফুহরারের মিথ্যাস্তুপের উপর সংস্থাপিত এবং স্যার উইলিয়াম জোন্সের পাটনায় পালিবোথার আবিস্কারের মতো এরও কোনো সুষ্ঠু প্রত্নতাত্ত্বিক ভিত্তি নাই। কপিলবস্তুর প্রমাদ ভারতীয় ঐতিহাসের একটি কলঙ্কময় অধ্যায়ের ফলশ্রুতি যার সমাধান জোন্সের প্রমাদের মুলে না গিয়ে করা অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে নেপাল নামটিও উত্তর-পশ্চিম পাওয়া যায়।

লাদাখের বৌদ্ধচিত্র ও বৃহত্তর ভারতের পরিধি

বিশিষ্ট কলা বিশেষজ্ঞ প্রতাপাদিত্য পালও লাদাখে লেহ এর সন্নিকটে আলাচীর একাদশ শতাব্দীর বৌদ্ধচিত্রে স্বর্গের প্রতিচ্ছবি দেখেছেন। সিন্ধুর পশ্চিম তটের অবস্থিত আলচীর এই স্বল্প-পরিচিত চিত্রগুলি সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছেন যে এগুলি ভারতের তথা কাশ্মীরের বৌদ্ধ সংস্কৃতির অনবদ্য নিদর্শন যা অজন্তা, হরিউজি এবং মধ্য এশিয়ার বৌদ্ধচিত্রের কথা স্মরণে আনে, কিন্তু তিনি এই চিত্রকলায় প্রচ্ছন্ন ইরানীর প্রভাবে বিস্মিত হলেও তার ব্যাখ্যা করতে গতানুগতিক ধরা অনুসরণ করেছেন। তিনি লিখেছেন,[16] "যে ধর্ম আলচী সৃষ্টি করেছিল তা প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের বৃত্ত থেকে এতটাই দূরে যে শাক্যমুণি বুদ্ধ যদি নিজে আজ এই মঠ দর্শন করতেন তবে এর চিত্রকল্পের জটিলতা দেখে যে কোনো সাধারণ মানুষের চেয়ে তিনিও কম বিস্মিত হতেন না।" এর রেশ টেনে বলা যায় যে শাক্যমুণি বুদ্ধ তার তথাকথিত জন্মভূমি উত্তর ভারত অথবা নেপালে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ কিংবা পঞ্চম শতাব্দীর বৌদ্ধ পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রীর অপ্রতুলতা কিংবা কপিলাবস্তুর ভৌগলিক অবস্থাম নিয়ে ভারত ও নেপালের জাতীয়তাবাদীদের মল্লযুদ্ধ দেখেও হয়তো হতবুদ্ধি হতেন। আলচীর চিত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট গৌতম বুদ্ধকে রাজবেশে চিত্রিত করা। ফন্ডুকিস্তানে প্রাপ্ত বৌদ্ধমূর্তিতেও বুদ্ধকে রাজবেশে

দেখান হয়েছে। প্রখ্যাত বৌদ্ধতত্ত্ববিদ গিউসেপ্পে তুচ্চি, যিনি রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে শান্তিনিকেতনে আসেন, এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মহাযান বৌদ্ধতত্ত্বের প্রভাবের কথা লিখেছেন[17] যেখানে বুদ্ধকে মহাপ্রতাপশালী হিসাবে কল্পনা করা হয়, কিন্তু সাধারণতঃ তাঁকে সামন্ত রাজার পুত্র হিসাবে বর্ণনা করা হলেও তিনি যে একদা রাজ-চক্রবর্তীর সমতুল্য ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে যে ধর্ম আলচী সৃষ্টি করেছিল তার মূল ক্ষেত্র নিয়ে ডঃ পালের ধারণা পণ্ডিতমহলে সাধারণভাবে স্বীকৃত হলেও এ নিয়ে নতুন চিন্তার সময় এসেছে। সুকুমারী ভট্টাচার্য দূরদৃষ্টি নিয়ে লিখেছেন যে ভারতের সীমানা একদা মধ্যপ্রাচ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[18] হেলমান্ড নদীর প্রাচীন নাম ছিল হিন্দমান্দ। বস্তুতঃ প্রাচীন কম্বোজ জনপদ যে দক্ষিণ-পূর্ব ইরাণে ছিল এই অমোঘ সত্য হৃদয়ঙ্গম না করে ভারতীয় কলা কিংবা ইতিহাসের মূল্যায়ন অসম্ভব।

একবিংশ শতাব্দীর যুগান্তরকারী প্রত্নতাত্ত্বিক আবিস্কার ও কম্বোজ

সম্প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব ইরাণে সিন্ধু, সুমেরীয় ও মিশরীয় সভ্যতার মতো এক অতি প্রাচীন সভ্যতার[19] চাঞ্চল্যকর প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন উদঘাটিত হয়েছে যা বিংশ শতাব্দীতেও ছিল অজ্ঞাত। বিশিষ্ট পুরাতত্ত্ববিদ জি. এফ. ডেলস্ সুমেরীয় ও সিন্ধু সভ্যতা একই সময়ে ধ্বংস হওয়াকে খুবই তাৎপর্য্যপূর্ণ গন্য করেন এবং এথেকে সিদ্ধান্তে আসেন যে এই দুই সভ্যতার মধ্যে এক অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক ছিল। আসলে এই সদ্য আবিস্কৃত ইরানীয় সভ্যতা, সুমেরীয় ও সিন্ধু সভ্যতা একই বৃন্তের ত্রয়ী ছিল। দ্বারাবতী ছিল কম্বোজের রাজধানী এবং দ্বিরোফত নামে যে শহরে সম্প্রতি বহু প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গেছে তার নিকটবর্তী দারাব নগর দ্বারাবতীর স্মৃতি বহন করে। দ্বিরোফত নামটিও দ্বারাবতীর পরিবর্তিত রূপ হতে পারে। আর. এল. ব্যাশাম, এ. ডি. এচ. বিভার ও আর. থাপার কম্বোজ পামীর অঞ্চলে ছিল লিখলেও ডি. সি. সরকার এই অভিমত সুচিন্তিত মনে করেন নি। তিনি উল্লেখ করেন যে বৌদ্ধশাস্ত্রে দ্বারকা থেকে কম্বোজগামী পথের উল্লেখ আছে। প্রাচীন কম্বোজ এবং দার্শণ ষোড়শ জনপদে ছিল এবং রায়চৌধুরী প্রাচীন দাশর্ণ মধ্যপ্রদেশে ছিল লিখলেও এ নামের প্রতিধ্বনি আরবের দাহরান ও ইরাণের রাজধানী তেহরাণেও পাওয়া যায়। এছাড়া ইরাণের এলমে যে দ্বারকা, সুরাট, সোগর, যাস্ক ইত্যাদি নগর ছিল এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলাম গ্রন্থের প্রামান্য মানচিত্রে তার প্রমাণ আছে। কম্বোজ ভাষায় ইরানীয় প্রভাবের কথা খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে যাস্ক লিখেছিলেন। ইরানীয় পণ্ডিতদের মতে এ সভ্যতার নাম ছিল দক্ষনাউস যা দক্ষ ও নহুষের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। কম্বোজরাজ সুদক্ষিনের উল্লেখ আছে মহাভারতে। হিব্রু ভাষায়ও নহুষ শব্দের অর্থ ছিল নাগ বা যা এই অঞ্চলের শিল্পকলায় বহু ব্যবহৃত প্রতীক। নহুষ ঋকবেদের এক প্রাচীন রাজার এবং জাতিরও নাম। এই নহুষই ইহুদীদের প্রাচীন পূর্বপুরুষ নাহুষ মনে হয়। দ্বিরোফট এর নিকটবর্তী দেব নদী (দিউ রুদ) ইঙ্গিত করে যে প্রাচীন দেবভূমি এ অঞ্চলেই ছিল। একযুগে এ অঞ্চলে নাম ছিল আনশান যা অঙ্গেরই পরিবর্তিত রূপ। মহেনজোদারো মনে হয়ে ছিল মহাঅঙ্গদ্বার। কালিবঙ্গান (কাল- নগর) এক প্রাচীন বঙ্গের স্মৃতি বহন করে। সীস্তানে দারাঞ্জ নগরের নাম ছিল দ্বার-অঙ্গ। এলমের ডের (দ্বার) নগরী প্রাচীন ইন্দো-ইরানীয় এবং মনে হয় আর্য্য সভ্যতার পীঠস্থান ছিল। এই নগরের অন্য নাম ছিল ভদ্র এবং টয়েনবি লিখেছিলেন ভদ্র জনগোষ্ঠী ছিল বহিরাগত। প্রাচীন মিশরীয় লেখে ব্যবিলন ও উপসাগরীয় অঞ্চলে যে দ্বার গোষ্ঠীর উল্লেখ আছে তারা ইন্দো-ইরানীয়।

মহামহিম আলেকজান্ডার ও ইরান-ভূমির এক মৌর্য্যরাজ

ইরান-ভূমির কিছু অংশ যে একদা ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল তার প্রশ্নাতীত প্রমাণ আছে। ভিনসেন্ট্ স্মিথ্ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যে প্লিনীর প্রাচীন গ্রন্থে কারমান ও গেদ্রোশিয়াকে ভারতের অংশ বলা হয়েছে কিন্তু

জোনসের ভ্রান্তির জন্য এই অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য অজ্ঞাত রয়ে গেছে। পুরুরাজের পরাজয়ের বহু মাস পরে আলেকজান্ডার বর্তমান ভারতখন্ড হতে বহুদুরে ইরাণের কারমান প্রদেশের কোহনৌজে ভারতীয়দের দ্বিতীয়বার পরাজিত করে মহা ধুমধাম করেন। আশ্চর্যের কথা যে ইরাণের কোহনৌজে এরা কোনো ভারতীয় এ প্রশ্ন কেউ করেননি। ইরাণের এই অঞ্চল যে একদা ভারতে ছিল এটা শুধু তার যে অকাট্য প্রমাণই নয়, এথেকে বোঝা যায় যে কোহনৌজই ছিল প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার পীঠস্থান কনৌজ[২০]। চন্দ্রগুপ্তের (সংসারচুন্দ) রাজধানী ছিল কনৌজ লিখেছিলেন ঐতিহাসিক ফিরিস্তা। কোহনৌজে নুজ নয়তো পতলনগরীই ছিল মেগাস্থেনিস বর্ণিত পালিবোথ্রা।

কারমান যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের অধীনে ছিল তার অখণ্ডনীয় প্রামণ আছে। আলেকজান্ডারের অনুরোধ সত্ত্বেও বিপাশা তীরে ক্লান্ত গ্রীক ও মাকেদনীয় সৈন্যেরা আর অগ্রসর হইতে অসম্মত হয়। এর কারণ হিসাবে সাধারণতঃ চন্দ্রগুপ্তের প্রাসী রাজ্যের মহাপরাক্রমে কথা বলা হয় কিন্তু এই রাজ্য ছিল উত্তর-পশ্চিমে, জোনসের ধারণা অনুযায়ী পাটনায় নয়। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী "সিন্ধুনদী প্রাসী রাজ্যের সীমানা দিয়ে বয়ে যায়", প্লিনীর এই দ্ব্যর্থহীন মন্তব্যেরও অপব্যাখ্যা করতে সমর্থ হন। তদুপরি আলেকজান্ডার পতল নগরীতে আসার আগেই এখানকার শাষনকর্তা মোএরিস্, যিনি পূর্বে গ্রীকরাজের বন্ধু ছিলেন, তিনি পলায়ন করেন। রায়চৌধুরী লেখেন যে চন্দ্রগুপ্তও প্রথমে গ্রীকরাজের বন্ধু ছিলেন পরে শত্রু হন, কিন্তু মোএরিস্ নামটি যে মৌর্য্যেরই পরিবর্তিত রূপ এই সাধারণবুদ্ধিগম্য তথ্য এন. শাস্ত্রী, এচ্ সি শেঠ ও অন্যেরা স্বীকার করলেও তিনি সুকৌশলে এড়িয়ে যান।

বহু ইউবোপীয় পণ্ডিতেও জোনসের মায়াজালে বাধা পড়েছেন।[২১] বিপাশাতীরের বিদ্রোহের পর অন্য সুগম পথ থাকা সত্ত্বেও আলেকজান্ডার গেড্রোশিয়ার মরুপথে যাত্রা করিয়া প্রায় বিধ্বস্ত হন। অগনিত সৈন্য ও অসামরিক-ব্যক্তির মৃত্যু হয় এবং তিনি নিজেও অল্পের জন্য রক্ষা পান। হার্ভার্ডের এ. বাডিয়ানের মতে এর কারণ তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি। মোএরিস্ কে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য ধরলে বোঝা যায় যে মস্তিস্কবিকৃতি নয়, গ্রীকরাজে গেড্রোশিয়ার দুর্গম মরুপথে যান যুদ্ধের প্রয়োজনে, মোএরিসের খোজে জাষ্টিন উল্লেখ করেন যে আলেকজান্ডার প্রাশীবিজয় করেছিলেন।

বুদ্ধের মহাপ্রয়াণ ও জেরক্সেসের দৈব নিধন

অজন্তার একটি চিত্রে বালক গৌতমের পোশাক পারসীয়, যা তাঁর সঙ্গে ইরান-ভূমির এক নিবিড় সম্পর্কের ইঙ্গিত করে কিন্তু শুধু চিত্রকলা কিংবা ললিতবিস্তারের কল্পনার জগতে নয়, ইতিহাসের পরিসীমায়ও ভুস্বর্গের হদিস্ মেলে। গৌতম বুদ্ধ ও চন্দ্রগুপ্ত উত্তর-পশ্চিম থেকে এসেছিলেন এ কথা লিখেছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পাটনা ও আফঘানিস্তানে খননকার্য্যের পরিচালক ডক্টর ডি. বি. স্পুনার। তাঁর অত্যন্ত সুচিন্তিত অভিমত এ. বি. কীথ্ আমল না দিলেও ভিনসেন্ট স্মিথ্ ও এফ্. ডরিউ. থমাস এর গভীরতা অনুধাবন করেন। আরেকটি চিত্রেও রাজা ও রাণীর পোশাক ইরানীয় কিন্তু কেউই ভাবেননি যে এরা ভারতীয়, যদিও ইরান-ভূমির অধিবাসী। ইয়াজদানী অজন্তার চিত্রে পার্থীয়দের উপস্থিতির উল্লেখ করেন যা থেকে বোঝা যায় হিন্দু ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব সেযুগে কত সুদুরপ্রসারী ছিল। মহাপণ্ডিত রষ্ট্রভজেফ্ বৌদ্ধকলায় প্রার্থীয় প্রভাবের উল্লেখ করে পণ্ডিতসমাজের সাড়া জাগিয়ে ছিলেন।

গৌতম বুদ্ধকে প্রায়ই দেব নামে অভিহিত করা হয়, এথেকে মনে হয় যে দেব ছিল একটি প্রাচীন গোষ্ঠীর নাম। পারস্য সম্রাট জেরক্সেস্ খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে যে দৈব গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযান করেন তার ভারতীয় হতে পারে এই মূল্যবান কথা লিখেছেন হার্ভার্ডের রিচার্ড ফ্রাই।[২২] উল্লেখনীয় যে প্রায় এই সময়েই গৌতম বুদ্ধের মৃত্যু হয়। তবে কি গৌতম বুদ্ধই ছিলেন সেই গোমাতা

যাঁর বিরুদ্ধে দারিউসের লেখা লিপি সত্যের অপলাপ বলে লিখেছেন টয়েনবি, অল্মস্টেড, ডন্ডমায়েভ্ ও অন্যান্যেরা? এথেকে সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে গোমাতার বন্ধু রাজা কুরাশের পুত্র বার্ডীয়, যাকে হত্যা করে দারিউস্ রাজা হন, তিনিই ছিলেন বৌদ্ধশাস্ত্রে উল্লিখিত গৌতম বুদ্ধের আত্মীয় রাজা ভদ্দিয় যিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন। গোমাতার গৃহ শাক্যভাটিতে ছিল যা গৌতম বুদ্ধের নাম শাক্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। শাক্যরা কি তবে শক গোষ্ঠীভুক্ত? ফিরদৌসীর মহাকাব্য শাহনামায়ও দেব গোষ্ঠীর বিবরণ আছে। শাহনামার পটভূমি সীস্তান অথবা শকস্তান কিন্তু নিকটবর্তী গান্ধার অঞ্চল ছিল বৌদ্ধ শিল্পকীর্তির প্রাচীনতম পীঠস্থান, যা ইঙ্গিত করে যে বদ্ধের জন্মভূমি ছিল উত্তর-পশ্চিমে। জেরক্সেসের দৈব সম্প্রদায় নিঃসন্দেহে গৌতম বুদ্ধেরই গোষ্ঠী।

গৌতম বুদ্ধের প্রয়াণকাহিনী মহা পরিনিব্বান সুত্র আলাচনা প্রসঙ্গে বিশিষ্ট বৌদ্ধতাত্ত্বিক সুকুমার দত্ত কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের অবতারনা করেন। প্রথমতঃ তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে দেশে প্রচণ্ড রাজনৈতিক অস্থিরতার ইঙ্গিত মেলে ও তাঁর সঙ্গে তদানীন্তন রাজার গুরুতর মতভেদ হয় একটি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান নিয়ে। এরপরই মনে হয় যেন তাঁর জীবনে অন্ধকার নেমে আসে। দ্বিতীয়তঃ একথা পরিস্কার ভাবে বোঝা যায় যে জীবনের এই শেষকালে আনন্দ ছাড়া তার পাশে আর কোনো শিষ্যই ছিলেন না[২৩]। প্রচণ্ড খরতাপে ও জলাভাবে তিনি বাধ্য হন অত্যন্ত অপরিস্কার জল পান করতে যার ফলেই হয়তো অসুস্থ হয়ে পরেন। প্রশ্ন জাগে, রাজরোশ এড়াতে গিয়ে পলায়মান অবস্থায়ই কি তাঁর মৃত্যু হয়? বুক্ অফ্ এস্থারে বর্ণিত ঘটনার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে নানা প্রশ্ন থাকলেও প্রখ্যাত পণ্ডিত আর. দে ভোয়া এটি ইরানীয় রাজবংশের সংঘাত বলে লিখেছেন। সামান (হামান) গৌতম বুদ্ধের নাম হতে পারে কেননা বৌদ্ধদের নাম ছিল সামান। রাণী ভাস্তির নামে হয়তো কপিলবস্তুর প্রতিধ্বনি আছে। সীস্তানে একাধিক নগরের নাম ছিল ভাস্ত্। জেরক্সেস্ই মনে হয় সেই রাজা বিরুঢক যিনি কপিলাবস্তু আক্রমণ করেন।

মগধের রাজা মনু

এটা ভাগ্যেরই পরিহাস যে মনুর মতো এক সুপ্রাচীন মহানায়কের ঠাঁই হয়েছে আজ ইতিহাসের আস্তাকুড়ে।[২৪] মনুসংহিতা একদিনে লেখা হয়নি এবং যুগেযুগে এর পরিবর্তনও হয়তো হয়েছে, কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতিতে এর বিপুল প্রভাব থেকে এটা নিশ্চিত যে মনুকে[২৫] বাদ দিয়ে লেখা ভারতীয় ইতিহাস অসমঞ্জস ও বিকৃত। প্রজাসৃষ্টির অভিলাষে মনু মরিচী, অত্রি, অঙ্গিরা, ইত্যাদি দশ প্রজাপতির জন্ম দেন। এই দশ প্রজাপতি হইতে ক্রমান্বয়ে স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, ঔওমি, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত ও সাবর্ণি এই সাতজন মনু ও অন্যান্য দেবগণের জন্ম হয়। শাস্ত্রের এই বিশদ বিবরণ স্পষ্টতঃ বৈজ্ঞানিক চেতনার পরিপন্থী যা থেকে সন্দেহ হয় মনু অতিকথার নায়ক, কিন্তু এফ্ ডরিউ পারজিটার ও আর সি হাজরার মতো পুরাণ-বিশেষজ্ঞেরা এতে ঐতিহাসিক তথ্যেরও আভাস পেয়েছেন। উল্লেখনীয় যে ইরানীয় শাস্ত্রেও অঙ্গিরা মনুর উল্লেখ আছে। মনুকে ব্যাশাম ভারতীয় আদম আখ্যা দিয়েছেন যা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত।

সুমেরীয় ইতিহাস থেকে জানা যায় খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে মগনের কোহনৌজে মনিউম নামে এক পরাক্রান্ত অধিপতি রাজত্ব করতেন যার বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক জয় সুমেররাজ নরমসিন বহু লেখে নথিভুক্ত করেন[২৬]। "দ" ও "ন" একই গোত্রের অক্ষর কাজেই মগধের পরিবর্তিত রূপ মগন হতে পারে। এস. রত্নাগার উল্লেখ করেন যে নামটি মনিউম লেখা হলেও পোয়েবেলের মতে এটি আসলে মননু তবু জোনসীয় কুসংস্কারের প্রভাবে তিনি প্রাচীন কনৌজ ও মনুকে চিনতে দ্বিধা করেন। নিকটবর্তী বন্দর পোর্টুস মাকেদনুম ও সাক্ষী দেয় যে একদা এ অঞ্চলের নাম ছিল মগধ।

সপ্তসিন্ধু - হিন্দুত্বের নুতন সংজ্ঞা

সিন্ধু অঞ্চলে প্রাপ্ত একাধিক সীলে সাত রাজার উপস্থিতিতে একটি বিশেষ ধর্মগত অথবা শাস্ত্রীয় আচার চিত্রিত আছে[২৭] যা সপ্তসিন্ধুর প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে। স্যার হ্যারল্ড বেইলী মন্তব্য করেন যে সুমেরীয় নথিতে যে সাতটি উচ্চ অঞ্চলের উল্লেখ আছে তা ঋকবেদের সপ্ত সিন্ধবঃ ও অবেস্তার হপ্ত হিন্দুর ধারণার সঙ্গে যুক্ত। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত বাইবেলের বুক অব এস্থারেও কার্শেনা, সেথার ইত্যাদি সাত রাজার উল্লেখ আছে যা আমাদের কৃষ্ণ (মহাভারতের নয়) এবং সিদ্ধার্থের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পরবর্তীকালে ইসলামীয় ঐতিহাসিকেরাও বারে বারে সাত হিন্দুরাজার উল্লেখ করেন যা থেকে বোঝা যায় যে প্রাক-ইসলামীয় যুগে পশ্চিম এশিয়া ও আরবে হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব কত ব্যাপক ছিল।

মনে হয় এক যুগে এই সাত হিন্দুরাজারাই ছিলেন সাত মনু। অঙ্গিরা মনু ছিলেন অঙ্গের অধীশ্বর যদিও এই অঙ্গ মহেনজোদারো (মহা অঙ্গ দ্বার), সীস্তানের দারাঞ্জ (দ্বার অঙ্গ) অথবা ইলমের আনশান হতে পারে। এপ্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে বাহরেণের রাজা ছিলেন এক মনু[২৮] যিনি সম্ভবতঃ ছিলেন ওমানের (এবং বাহরেণের) রাজা ঔওমি মনু। প্রত্নবিদ কেনোয়ার সিন্ধু নগরী ও ওমানের মধ্যে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা লিখেছেন। মুন্ডিগাক ও শহর-ই-শোকথার সঙ্গেও ওমানের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

ন্যায়নিষ্ঠ প্রিয়দর্শী রাম

কত রক্তক্ষয়ই না হয়েছে রাম-জন্মভূমির খোঁজে। এজন্য ব্রিটিশ-দর্শিত ভারতের ভুয়া ইতিহাসকে দায়ী করেন বিশিষ্ট চিন্তাবিদ অমর্ত্য সেন। "ভারতবাসীর ঘরে লোক এত সত্য নহে, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা তাহার পক্ষে যত সত্য", লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রামায়ণে যে সৌভ্রাত্র, ত্যাগ, ও সত্যপরতা বর্ণিত আছে তা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেরই অদর্শনীয় তবুও বর্তমান বিজ্ঞান-নির্ভর যুগে রামচরিতকথা যে শুধু ভক্তি ভরে হৃদয়ে ধারণ করাই যথেষ্ট নয়, এর যুক্তিসম্মত বিশ্লেষণও প্রয়োজন সেদিকেও রবীন্দ্রনাথ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন ১৯১১ সালে ('ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা')। শাস্ত্রকাররা মহাভারতকে ইতিহাস-পুরাণ হিসাবে গণ্য করলেও রামায়ণকে কাব্যই বলেছেন, কাজেই প্রশ্ন ওঠে রাম কি সত্যই কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব নাকি নিছক কবিকল্পনা? বিষয়টি জটিল কেননা বিষ্ণুপুরাণের যুগেও রাম যেন এক অজ্ঞাত পুরুষ, কিন্তু ইতিহাসের ছায়া না থাকলে রামায়ণের এরূপ বিশ্বব্যাপী প্রভাব হতো না। জে. এল. ব্রকিংটন রামায়ণকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্য আখ্যা দিয়েছেন যার প্রভাব ছিল গ্রীক মহাকাব্য ইলিয়াদের চেয়েও বেশী। এককালে ইরান, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ফিলিপাইনস এমনকি জাপানেও রামায়ণ সমাদৃত ছিল। রমেশচন্দ্র মজুমদার ও রামশঙ্কর ত্রিপাঠীর মতো প্রবীন লেখকেরা রামকে ঐতিহাসিক রাজা হিসাবে গণ্য করলেও আর. এল. ব্যাশাম্ ও রমীলা থাপারের মতে রাম এক গৌণ কাল্পনিক চরিত্র। এটা মনে হয় সত্যের অপলাপ। জার্মান পণ্ডিতেরা রামায়নের কাল খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ সাল অনুমান করেছিলেন কিন্তু রাম এর চেয়েও বহু প্রাচীনতর। সেই বৈদিক যুগে বৃহত্তর ভারত যে ইরান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং গাঙ্গেয় অঞ্চল যে খুব উন্নত ছিল না একথা মনে রাখলে রাম-কথার আলোচনা এক নুতন রূপ নেয়। রাম সম্বন্ধে অত্যন্ত মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায় ইরাকের ইতিহাসে।

কোথায় ছিল অযোধ্যা?

রামায়ণ সম্পর্কে ব্যাশাম ও অন্যান্য পণ্ডিতদের খাটো ধারণার প্রধান কারন হলো বৈজ্ঞানিক প্রমানের অভাব। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন থেকে এটা স্পষ্ট যে খ্রিস্টপূর্ব যুগে উত্তরপ্রদেশ তুলনায় অনগ্রসর ছিল

কাজেই এখানে বাল্মিকী-বর্ণিত অযোধ্যা মহানগরী কল্পনা করা বাতুলতা[২৯]। স্যার মর্টিমার হুইলার ও অমলানন্দ ঘোষের মতো বিশিষ্ট পণ্ডিতেরা দ্যর্থহীন ভাষায় লেখেন যে গাঙ্গেয় অববাহিকায় নগর-কেন্দ্রিক সভ্যতার উদ্ভব হয় খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে। কাজেই এ অঞ্চলের সঙ্গে গৌতম বুদ্ধ অথবা রামের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। অযোধ্যায় প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রী ও লিপিগুলি সবই মধ্যযুগীয় তা সত্ত্বেও দিল্লীর এস. পি. গুপ্তা ও অন্যান্য নব-হিন্দুত্ববাদী প্রত্নবিদেরা উল্লেখ করতে দ্বিধা করেন যে আরেক প্রাচীন অযোধ্যা উত্তর-পশ্চিম ছিল। আলেকজান্ডারের সহযাত্রী লেখকেরা উত্তর পশ্চিমে রাম-ভগিয়া নগরের উল্লেখ করেন যে গৌতমের উপাধি ভগভ স্মরণ করিয়ে দেয়। তদুপরি বৃহত্তর ভারতে রাম যে অত্যন্ত শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন তার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। অখমেনীয় ও সাশানীয় ইরাণে বহু নগর ও রাজার নামে রামের স্মৃতি ছিল। কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইরান গ্রন্থে দিয়াকনভ লেখেন যে বহু প্রাচীন মিডীয়দের নাম ছিল রাম। রাম শহরিস্তান ছিল সীস্তানের সুরেনরাজদের রাজধানী। মিট্টানিদের রাজা টুশরুট্টার নামও মনে হয় দশরথেরই প্রতিধ্বনি। ইরানের ইতিহাসের আর্যরথের নাম আছে।

রাম মার্গবেয়

স্বর্গীয় সুকুমার সেন[৩০] রামের মীথের সঙ্গে ইরানের ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র লক্ষ্য করেন। অনন্য সাহসিকতাব সঙ্গে তিনি লেখেন- 'মনে হয় 'রাম' এই ব্যক্তি-নামটি ইরানী (বা তন্নিকটস্থ দেশীয়) সূত্রেই আমরা পেয়েছি'। প্রাচীন ইরানীয় ঐতিহ্যে - আবেস্তায় - শান্তি ও প্রসন্নতার দেবভাব অর্থে রাম নামটি পাওযা যায়। ব্যক্তি-নাম হিসাবে ভারতীয় শাস্ত্রে রামের উল্লেখ প্রথম পাওয়া যায় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে 'রাম মার্গবেয়'। মার্গবেয় কথাটি ব্যুৎ পত্তি অজানা। সুকুমার সেনের মতে শব্দটি এসেছে 'মর্গু' এই স্থান-নাম থেকে। ইরানের আকামেনীয় রাজাদের অধিকারে এই নামের একটি প্রদেশ ছিল যায় রাজধানীরও এই নাম ছিল। নামটি ইংরেজীতে মার্গিয়ানা লেখা হয়। এ অঞ্চলেব রক্সান উপত্যকার নাম প্রাচীন হলে তা রামায়ণের রাক্ষস নামে সঙ্গে সম্পর্কিত হতে পারে।

ইরাক, ইরান ও সিন্ধু সভ্যতার অধীশ্বর রাম

রামের ঐতিহাসিকতা স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় সুমেরের ইতিহাসে। আশ্চর্যের কথা যে প্রমান্য সুমেরীয রাজতালিকায় ভরত (Warad-Sin), রাম (Ram-Sin)[৩১] ও লক্ষ্মণের (Lakhamar) উল্লেখ থাকলেও কোনো ঐতিহাসিকই তা লক্ষ্য করেননি। রাম সিনের মৃত্যুর অনতিকাল পরে উর শহরে নির্মিত তাঁর স্মৃতি-মন্দির এখনো বর্তমান[৩২]। সুমেরীয় তথ্য অনুযায়ী ভরত প্রথমে বারো বৎসর রাজত্ব করেন যা দশরথ জাতকের সঙ্গে মেলে এবং তারপরে রাম ষাঠ বৎসর রাজত্ব করেন। রামের রাজ্যকালকে অত্যন্ত আদর্শনীয় অর্থে যেমন রাম-রাজ্য বলা হয়, রাম-সিনের রাজ্যকালকেও সুমেরীয় সভ্যতার স্বর্ণযুগ বলা হয়েছে[৩৩]। সুমেরীয় নথিতে রামকে ইরানী (এলামীয়) বলা হয়েছে যা সুকুমার সেনের ধারণা সমর্থন করে। রাম শুধু যে ইরাক ও ইরানের অধীশ্বর ছিলেন না মহেনজোদারো, হরপ্পা ও অন্যান্য ভারতীয় নগরীরও যে তাঁর অধীনস্ত ছিল তার প্রমাণ রামায়ণ। সুমেরীয় ইতিহাসে রামের পিতার নাম মহাভগ (মাবোক) যিনি ডের নগরী থেকে আসেন। মহাভগ গৌতমের উপাধি ভগভ স্মরণ করিয়ে দেয়।

ডের নগরীর সঙ্গে সীস্তানের জারাঞ্জ (দ্বার-অঙ্গ) ও মহেনজোদারোর (মহা-অঙ্গ-দ্বার) সম্বন্ধ থাকতে পারে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এখানে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান হয়নি। এই নগরের সঙ্গে হয়তো প্রাচীন ইন্দো-ইরানীয় সভ্যতার বিশেষ সহযোগ ছিল। মিশরীয় নথিতে ব্যাবিলন ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলকে ডুরা বলা হয়েছে। হলেও হতে পারে বাল্মিকীর অযোধ্যা ছিল মহাসম্রাট সারগণের রাজধানী আগাদ যার

অবস্থান এখনো অজ্ঞাত। আগাদ হয়তো ডের নগরীর নিকটে ছিল। সুমেরীয় সাহিত্যে প্রাচীনতম কাব্যের রচয়িতা ছিলেন সারগনকন্যা হেদু (এনহেদুআন্না) যিনি উর নগরে চন্দ্রদেবতার মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। ভাগ্যের পরিহাসে তিনি হয় অপহৃত হন নয়তো উর ছেড়ে যেতে বাধ্য হন। হতে পারে বাল্মিকী এই কাব্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। অধিকাংশ পণ্ডিতেরা সীতাহরণের কাহিনী ঐতিহাসিক নয় মনে করেন। পরবর্তীকালে রাম সিনের ভগ্নী এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পতে অধিষ্ঠিত হন।

লংকা বন্দর, বালী ও সুতাল

উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা থেকে রামের শ্রীলঙ্কা অভিযান ও সীতা উদ্ধার, দক্ষিণ ভারতে রামেশ্বরে সেতুবন্ধন ইত্যাদি জনপ্রিয় কাহিনীর যে কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই তা বলাই বাহুল্য। উন্নত নগর-কেন্দ্রিক সভ্যতার নিদর্শন দক্ষিণ ভারতে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর পূর্বে ও শ্রীলঙ্কায় খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে পাওয়া যায় না। সাঙ্কালিয়া ও অন্যান্যেরা দেখিয়েছেন যে রামায়ণের লংকা শ্রীলঙ্কায় হতে পারে না। এম. ভি. কিবে মধ্যভারতে লংকার অবস্থানের সপক্ষে যুক্তি দেখান। সুকুমার সেনের ধারণা অনুযায়ী রাম মার্গবেয়র কথা মনে রাখলে রামায়ণের লংকা খুজতে ইরানেই যেতে হয়। সিংহলের প্রাচীন নাম ছিল সঙ্গারা অথচ মিশরীয় লেখে সঙ্গারা ছিল ইরানের দক্ষিনাঞ্চলের নাম[৩৪]। অতাল, সুতাল, বিতাল, তালতাল ও মহাতাল ছিল পাতালের অংশ এবং সুতাল ছিল বালীর রাজধানী অথচ বালী ইরান ও ইরাকের ইতিহাসের একটি অতি প্রাচীন নাম। এই সুতাল নিশ্চয়ই ইরানের প্রাচীন নগর সিহ্-তালু[৩৫] যে অঞ্চলের রাজা ছিলেন বালী। ইরানের ফাহলিয়ান অঞ্চলে পর্বতগাত্রে উৎকীর্ণ বহুপ্রাচীন চিত্র রামায়ণের যুগের হতে পারে। রামের জন্মভূমি উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় ছিল এ ধারণা যে কতটা অবাস্তব তা বোঝা যায় ইরানের লেঙ্গেহ্ বন্দর, সেতুমস্ত, ডণ্ডকান, রাম শহ্‌রিস্তান, ইত্যাদি স্থানের নাম থেকে। আর্য্যরা চিরকালই বর্তমান ভারতখণ্ডে বাস করতেন এ ধারণা অত্যন্ত সংকীর্ণ চিন্তার ফল। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে তুরস্কের সীমাবর্তী ইরাকের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ভারত নামে পরিচিত ছিল। রামায়ণে অম্বরীষ ছিলেন অযোধ্যার এক রাজা ছিলেন অথচ একই নামের এক রাজা ছিলেন এই দুরবর্তী ভারতে, ইরাকের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে।[৩৬]

হেরোডোটাসের বিবরণে পাঞ্চাল ও সাগরের উল্লেখ

ভারতের ইতিহাসের বহু অসঙ্গতির কারণ ভৌগলিক প্রেক্ষাপট নিয়ে অবিমৃশ্যকারিতা যা প্রায় যথেচ্ছাচারের সমতুল্য। ভাবলে অবাক হতে হয় যে এমনকি হেরোডোটাস, যাকে সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার প্রবর্তক বলা হয়, তাঁর দেওয়া বহু মূল্যবান তথ্যও ঐতিহাসিকেরা সুষ্ঠুভাবে খতিয়ে দেখেননি। হেরোডোটাস লেখেন যে গেড্রোশিয় সৈন্যদের সঙ্গে একযোগে ভারতীয় সৈন্যরা যুদ্ধ করেছিল যা থেকে জানা যায় যে বর্তমান পারস্যের কিছু অংশ তখন ভারতের অঙ্গ ছিল। কাজেই এটা সহজেই অনুমেয় যে হেরোডোটাস পারস্য নিয়ে যে সব তথ্য দিয়েছেন তার কিছু অংশ প্রাচীন ভারত সম্পর্কে প্রযোজ্য। পারস্যরাজ কুরাশের সিংহাসনলাভ প্রসঙ্গে হেরোডোটাস (১,১২৫) পান্থিআলা, ডেরিউসি, সাগরটি, ইত্যাদি গোষ্ঠীর উল্লেখ করেন যা মহাকাব্যের যুগের ভারত সম্পর্কে নুতন আলোকপাত করে, পরিস্কার বোঝা যায় পাঞ্চাল ও সাগর রাজ্য খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে সুদুর উত্তর-পশ্চিম ছিল। ডি.পি. মিশ্রের মতে যদুবংশের রাজারা পূর্ব ইরান থেকে এসেছিলেন।[৩৭]

সান্দ্রোকোট্টোস, আন্দ্রোকোট্টোস, আন্দ্রাগোরাস্ ও জাতকের রাজা অরুণ

বিশ্বের কোনখানেই যে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী শনাক্ত করা যায়নি তা ব্রিটিশ-দর্শিত ভারতবিদ্যার শূন্যগর্ভতার প্রমাণ। শুধু চন্দ্রগুপ্ত নয় নন্দরাজাদের, এমনকি অশোকেরও কোন

প্রত্নবস্তু জোনস-কথিত পালিবোথ্রায় (পাটনা) পাওয়া যায়নি। চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না[৩৮], এ আক্ষেপ করেই জোনসীয় লেখকেরা দায়িত্ব নিস্পন্ন করেন এবং এ নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান আজ যেন নিরর্থক ঠেকে। এর মূল অনুসন্ধান করতে গিয়ে স্বনামধন্য পণ্ডিত বেনীমাধব বড়ুয়া মন্তব্য করেন যে চন্দ্রগুপ্ত উত্তর-পশ্চিমেরই ব্যক্তিত্ব, পাটনাব নন। বিশিষ্ট পণ্ডিত ভি. এস. অগ্রওয়ালের মতে নন্দরাজের সভাসদ পানিণীও উত্তর-পশ্চিমেরই অধিবাসী ছিলেন।

অথচ পারস্যরাজ দারিউস-২ এর উপাধি ছিল নন্দ যা থেকে বোঝা যায় নন্দরাজারা কোথায় ছিলেন। কি অযত্নেই না ভারতীয় ইতিহাস লেখা হয়েছে। বস্তুতঃ আর. সি. মজুমদার, ব্যাশাম্ ও থাপারের মতো লেখকেরা জোনসের ভুয়া আবিস্কারকে অন্ধ সমর্থন দিয়েছেন হিউ এন ৎসাঙ এর বিবরণের ভিত্তিতে কিন্তু ভাবেননি যে কানিংহ্যামের স্রাবস্তী, কৌশাম্বী, বৈশালী, ইত্যাদি নগরীর শনাক্ত করণের ভিত্তিও কিন্তু সেই হিউ এন ৎসাঙ যার সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের রয়েছে সহস্রাব্দেব ব্যবধান। এটা প্রাচীন ভৌগলিক তথ্য অনুসন্ধানের একটি অত্যন্ত প্রমাদগ্রস্ত পদ্ধতি[৩৯]।

সান্দ্রোকোট্রোস নামটি চন্দ্রগুপ্তেরই গ্রীক রূপান্তব কিন্তু একথা হয়তো আন্দ্রোকোট্রোস নাম সম্বন্ধে প্রযোয্য নয়। মুদ্রারাক্ষস নাটকের কয়েকটি পাণ্ডুলিপিতে চন্দ্রগুপ্তের বদলে রন্তিভর্মার নাম আছে যা থেকে বোঝা যায় তাঁর আরেক নাম ছিল রন্তিভর্মা যার গ্রীক রূপান্তর হল ওরোন্টেস অথবা ওরোন্টোবাটেস। এ প্রসঙ্গে আন্দ্রাগোবাসের নাম এসে যার যাঁব স্বর্ণমুদ্রা চন্দ্রগুপ্তেব সমকালীন। এই মুদ্রায় সূর্য্যদেবের রথীর প্রতীক থেকে বোঝা যায় যে আন্দ্রাগোরাসেব নাম অরুণ অথবা অরুণদাস যা গ্রীকেরা ওরোন্টেসে রূপান্তরিত করে[৪০]। কাজেই চন্দ্রগুপ্তই (ওরোন্টেস) রাজা অরুণ যিনি জাতকের কাহিনী অনুযায়ী পোতালির রাজা ছিলেন। এইচ. সি. শেঠ লেখেন যে আলেকজান্ডারের সহযোগী শশিগুপ্তই ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত কিন্তু রায়চৌধুরী জোনসের প্রভাবে একথা স্বীকার করতে দ্বিধা করেন।

দিওদোটাস্-১ই ছিলেন সম্রাট অশোক

ভারতবিদ্যার বহু বিতর্কের সুষ্ঠ সমাধান করতে হলে প্রথমে জানতে হয় সম্রাট অশোকেব প্রকৃত পরিচয়। চন্দ্রগুপ্ত সম্বন্ধে বড়ুয়ার বক্তব্য অশোক সম্পর্কেও প্রযোয্য, তাঁকে আর থাপার যে পাটনার রাজা হিসাবেই দেখেছেন তার একটি মারাত্মক ভ্রম কেননা পাটনায় তাঁর একটি কানাকড়িও আবিস্কৃত হয়নি। খ্রিস্টিয় প্রথম শতাব্দীতে ইশিডোর লেখেন যে অরাকোশিয়া "শ্বেত ভারত" নামে পরিচিত ছিল। কান্দাহার লিপি প্রমাণ করে যে কান্দাহার অঞ্চল ছিল অশোকের অধীনে কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এখানে তাঁর নয়, ইন্দো-গ্রীক রাজা দিওদোটাস্-১ এর অজস্র সমসাময়িক মুদ্রা[৪১] পাওয়া যায় যা প্রমাণ করে দিওদোটাস্-১ই এখানকার রাজা ছিলেন। এই কঠিন সমস্যার সমাধানের একমাত্র উপায় স্বীকার করে নেওয়া যে অশোকই ছিলেন দিওদোটাস্-১। গ্রীক লেখকেরা অশোকের নামোল্লেখ করেননি, আর. থাপারের এই মন্তব্য একেবারেই সুচিন্তিত নয় কেননা শিলালেখে তাঁর সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত নাম অশোক নয়, দেবনামপিয়া এবং দেবদত্ত ও দেবনাম (পিয়া = ত্রাতা) সমার্থক কেননা পারসীয় ভাষায় 'নাম' ও 'ডাট' দুটি শব্দেরই অর্থ আইন। স্যার্ উইলিয়াম টর্ন লেখেন যে দেবদত্ত নামটি দিওদোটাস্ নামের রূপান্তর এবং দিওদোটাস্-১ একটি বহু-উল্লিখিত নাম।

অশোক তাঁর লিপিতে লিপিতে লিখেছেন "মহালাকে হি ভিজিতম্" অর্থাৎ বিশাল আমার সাম্রাজ্য কিন্তু এর নিহিত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে ঐতিহাসিকেরা ব্যর্থ হয়েছেন। এনসাইক্লোপিডিয়া অব আর্ট গ্রন্থে (পার্থিয় আর্ট, পৃ. ১০৬.১৯) মারিও বুসাগ্লি লিখেছেন, "এটা মনে রাখা উচিৎ যে পার্থিয় সাম্রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তৃতির সময় এ রাজ্য ইরান অপেক্ষা অনেকটাই বড় ছিল এবং এর গন্ডীর মধ্যে ছিল ভারতীয় উপমহাদেশ, মেসোপটেমিয়া, আরমেনিয়া ও আরও অনেক অঞ্চল যেখানে ইরান ও ভারত

দুয়েরই প্রভাব ছিল।" পার্থিয় শাষকেরা যদি ভারতেরও রাজা ছিলেন তবে অশোক নিট্টুর লিপিতে নিজেকে যে পঠভীর রাজা বলেছেন তার অর্থ তিনি আর কেউ নন স্বয়ং দিওদোটাস্-১ যিনি ব্যক্ট্রীয়ার রাজা হিসাবে সর্বজনবিদিত হলেও পার্থিয়ারও রাজা ছিলেন। ইরানীয় শাস্ত্রে পার্থিয়ার নাম পার্থভ কাজেই পঠভীর অর্থ পার্থিয়া, পৃথিবী নয়। অশোক, যিনি পৃথিবীর দুর দুরান্তের রাজাদের কাছে বার্তা পাঠানোর কথা লিখেছেন, তিনি নিজেকে পৃথিবীর রাজা হিসাবে জাহির করবেন এটা অকল্পনীয়[৪২]।

বুদ্ধমূর্তির প্রথম আবির্ভাব

অশোকের সিংহাসনে ব্যাক্ট্রীয়ার রাজা দিওদোটাস্-১ আসীন হলে গান্ধার কলার মূল্যায়নের এক নব দিগন্তের সূচনা হয়। অশোকের ধমনীতে যে হেলেনীয় রক্ত প্রবাহিত হয়ে থাকতে পারে এটা অনস্বীকার্য্য এবং এই সুবাদে মৌর্য্য ও গান্ধার কলায় হেলেনিষ্টিক প্রভাব নিয়ে বিতর্ক সম্পূর্ণ এক নূতন দিক নেয়। এই হেলনীয় প্রভাবের হোতা ছিলেন আলেকজান্ডার যিনি বহু বিজয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন। দিওদোটাস্-১ অশোক হলে বোঝা যায় কেন চীনে বৌদ্ধধর্মের বানী প্রচার করেন পাটনার নয়, উত্তর-পশ্চিমের সন্ন্যাসীরা[৪৩]। বুদ্ধমুর্তির প্রথম আবির্ভাব কোথায় হয়, মথুরায় না গান্ধারায়? কানিংহ্যাম, ফুশার্, গ্রূণওয়েডেল ও অন্যান্যেরা একবাক্যে গান্ধারার পক্ষে রায় দিলেও কুমারস্বামীর[৪৪] মতে মথুরার শিল্পীরাই প্রথম বুদ্ধমুর্তি সৃষ্টি করেন, লোহুইজেন্ দ্য লীউও এ মত সমর্থন করেন। কুমারস্বামী অত্যন্ত প্রতিভাশালী ও স্বাধীনচেতা লেখক ছিলেন যিনি সত্যের সন্ধানে ইওরোপীয় পণ্ডিতদের নির্দেশিত পথ অনুসরণ না করেও বহুদুর অগ্রসর হয়েছিলেন কিন্তু মথুরা আধুনিক ভারতের কলা ও শিল্পপীঠগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন ও গুরুত্ব পূর্ণ হলেও গান্ধারার বৌদ্ধ স্থাপত্যের সঙ্গে তুলনায় নবীনতর। গান্ধারার স্থাপত্যের কালনির্ণয় নিয়ে বহু বিতর্ক থাকলেও এল. এম. যোশী গান্ধারাই পুর্বসূরী বলে লিখেছেন। ডেলিগেশিয়ঁ আর্কাওলজি ফ্রাঁসেই দ্য আফঘানিস্তাঁর স্বনামধন্য কর্নধার ডি. শ্লুমবার্জার ছিলেন প্রকৃত অর্থেই ফুশারের উত্তরসুরী। শ্লুমবার্জার ব্যাক্ট্রিয়ার শুর্খ কোটালের মন্দিরের প্রাচীনতর কলাকৃতির সঙ্গে মথুরার ঘনিষ্ঠ সংযোগ লক্ষ্য করেন। "মথুরার শিল্পীদের আগেই সম্ভবতঃ গান্ধারের শিল্পীদের নিকট অনুরোধ আসিয়াছিল ভগবান বুদ্ধের মূর্তি ও ফলক বচনার।" লিখেছেন কে কে, গঙ্গোপাধ্যায় (ভারতকোষ, ৫,২৩৩)। ভারতীয় বৌদ্ধকলা খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ববর্তী নয় এবং হেলিনিষ্টিক প্রভাবিত, কাজেই এই কলার মাপকাঠি দিয়ে যে প্রাচীনতর ইরানীয় বৌদ্ধকলার মূল্যায়ন সম্ভব নয়, পণ্ডিতমহলে এ সচেতনতাই নেই[৪৫] যদিও এ বিষয়ে সতর্ক ছিলেন স্টাইন। জাপানের আশাহি শিম্বুনের সংবাদ অনুযায়ী সম্প্রতি ইরাণে বহু প্রাচীন বুদ্ধমূর্তি উদাঘাটিত হলেও সেগুলি সবই মূর্তি-পাচারকারীদের হাতে চলে গেছে। অভেস্তা গ্রন্থে গৌতমের উল্লেখ আছে কিন্তু প্রাক-ইসলামীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি নিয়ে ইরানীয়দের অনাগ্রহের কারণে ইরাণে সুপ্রাচীন বৌদ্ধ সংস্কৃতির চর্চা দুষ্কর।

সাঁচীর অমূল্য শিল্পকীর্তি

সাঁচীর শান্ত অঞ্চল ভাস্কর্য্যে এমন এক কালোত্তীর্ণ রসস্রোত আছে যা ভারতীয় সংস্কৃতির গভীর থেকে উঠে আসা, যুগযুগ পরেও যার করুণাসুন্দর রূপ ও কৈবল্য আমাদের স্তম্ভিত করে। সাঁচী নামটি হয়তো সঙ্ঘ শব্দের রূপান্তর। প্রাচীনতম স্তুপটির নির্মাণ সম্ভবতঃ অশোকেরই পৃষ্টপোষকতায় শুরু হয় খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে। সিন্ধুযুগের শিল্পকলার সঙ্গে মৌর্য্য ও পরবর্তী যুগের কলাকৃতির কোনো সম্পর্ক ছিল না, নিহাররঞ্জন রায়ের এ ধারণা মনে হয় ভ্রান্ত। সিন্ধু সভ্যতা মুলতঃ অনার্য্যদের কীর্তি এবং আর্য্যদের আক্রমনে এ সভ্যতার পতন হয় এ ধারণার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। স্ট্রিজিগৌস্কি ও ষ্টেলা ক্রেমরিশ ভারতীয় কলায় যে আর্য্য ও অনার্য্য বিভাজন নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তা কিছুটা

সেকেলে। জোনসীর ভ্রান্তির কারণে সিন্ধুযুগে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি ও সমাজ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, এখানে কোনো মন্দির অথবা রাজপ্রাসাদ এখনো চিহ্নিত হয়নি। একমাত্র সীল থেকে বহু মূল্যবান তথ্য জানা যায় যদিও তার ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। প্রকৃতপক্ষে সিন্ধু সীলের প্রতীকগুলির সঙ্গে সাঁচীর প্রতীকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। তোরণের গঠন থেকে মনে হয় এরূপ তোরণ আগে কাষ্ঠনির্মিত হতো যার প্রতিকৃতি সিন্ধুসীলে আছে।

গ্রীক কলার মানদন্ডে মূর্তিগুলি হয়তো কিছুটা চাপা গড়নের কিন্তু অনেক বেশী সংবেদনশীল ও গতিময়। স্তূপতোরণে মহাসমারোহে চলমান উৎসবমুখর জনতার স্রোত আজও যেন মনে হয় কত প্রাণবন্ত। শিল্পীদের মধ্যে আনন্দের নাম দক্ষিণ তোরণে উৎকীর্ণ আছে। বুদ্ধ ও জাতকের কাহিনী এখানে উপজীব্য বিষয় কিন্তু বুদ্ধের কোনো মূর্তি নেই, তাঁর প্রতীক বেষ্টনীমধ্যস্থ বৃক্ষ (বৃক্ষ ছিল জ্ঞানের প্রতীক), তাঁর পদচিহ্ন, ও তাঁর বৃক্ষতলস্থ আসন। সাঁচীর নয়নাভিরাম প্রতীকগুলির নিহিত অর্থ নিয়ে বহু অন্বেষণ হয়েছে কিন্তু অতীত যেন দুরধিগম্যই রয়ে গেছে। এখানে বস্তুরূপের মধ্যে রহস্যবোধ এমনভাবে সঞ্চারিত যে গভীর অন্তরাবলোকন সত্ত্বেও তার মাত্রা নিরুপন দুঃসাধ্য[৪৬]। তৎকালীন সমাজের ধর্মভাবনার চিত্র এখনো আমাদের কাছে স্পষ্ট নয় সমকালীন মানব মানবীর কাছে সাঁচীর বৃক্ষিকার প্রকৃত রূপ কি ছিল, রক্ষাকারী মায়াবিনী দেবী, না অন্য কিছু তা নির্ণয় করা দুরূহ কোশাম্বী উল্লেখ করেন যে শালবৃক্ষ ছিল শাক্যদের টোটেম এবং লুম্বিনী ছিলেন শালের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে প্রাচীন গ্রীসে নুম্ফ-রা ছিলেন বন ও পর্বতের দেবী।

সাঁচীর ভাস্কর্যে ভূস্বর্গের ঐতিহ্য

ভারতীয় প্রাচীন স্থাপত্য ও চিত্রকলা নিয়ে পশ্চীমী কলা বিশেষজ্ঞদের অনীহার প্রধান কারণ ছিল যে এতে চিত্তবৃত্তির যে সচ্ছন্দ বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায় তা গ্রীক শৈলীর সমাত্মক হলেও খ্রিস্টিয় ধারা থেকে অনেকটা স্বতন্ত্র। সাঁচীর ভাস্কর্যে নরনারীর দেহসৌষ্ঠব সদম্ভে নিনাদিত যা থেকে কুমারস্বামী এই কলাকে সামগ্রিকভাবে প্যাগান আখ্যা দিয়েছিলেন (দি ডান্স অব শিভা, পৃ ৭২) কিন্তু এটা হয়তো কেবল আংশিক সত্য। এই শিল্পকলায় ইরানীয় প্রভাব লক্ষ্যনীয়, তোরণের বৃষের শিং এলামীয় মন্দিরের কথা স্মরণে আনে কিন্তু এখানে সব কিছু মিলেমিশে এমন এক উচ্চমানের শিল্পসৃষ্টি হয়েছে যা বিশ্বের কলাসম্ভারে অদ্বিতীয়। সাঁচীর ভাস্কর্যে সে যুগের ধর্মভাবনা, নর-নারীর সম্পর্ক ও পশু-পক্ষী সম্বৃদ্ধ পরিবেশ চেতনার এক প্রামান্য চিত্র পাওয়া যায় যা অত্যন্ত মূল্যবান। মুর্তিগুলির দেহের ডৌলে অপূর্ব কমনীয়তা ও গতিভঙ্গ লক্ষ্য করা যায়। শিল্পীর নিপুন হস্ত দেহে সঞ্চারিত করেছে এক অপূর্ব বর্তুলতা ও প্রাণসত্তা। নারীর নিতম্ব ও বক্ষদেশে এবং পুরুষের স্কন্ধে এবং বাহুতে পুষ্ট মাংসলতা এবং শক্তিমত্তার স্পর্শ তোরণভিত্তির মূর্তিগুলিতে এক অপূর্ব পূর্ণতা এনেছে ও শিল্পচেতনায় জীবন্ত করে তুলেছে। সাঁচীর দিকপালিকা যেন সেই জাগ্রত মহাকালের প্রতিভূ যাঁর সম্বন্ধে বলা যায়, 'তোমার লিখিললুপ্ত অন্ধকারে দাঁড়ায়ে একাকী / দেখেছে বিশ্বের মুক্তিপথ'।

সাঁচীর শিল্পকীর্তিতে তন্ত্রের[৪৭] প্রভাব লক্ষ্যনীয়। তন্ত্রসাধনা ভারতীয় তথা বঙ্গসংস্কৃতির এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ যার একাধিক বহিঃপ্রকাশ আছে। তন্ত্রে দেহকে যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিয়া মোক্ষলাভের কথা আছে। কথিত আছে যে তন্ত্রের উদ্ভব হয় স্বর্গে যা আমাদের কপিলবস্তুর ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তন্ত্রের উদ্ভবস্থল হিসাবে কম্বোজেরও উল্লেখ আছে যা ছিল কপিলবস্তুর নিকটবর্তী অঞ্চল। ম্যাডেলিন হাল্লাদ উল্লেখ করেন যে ভারতীয় কলায় যে পরিব্যাপ্ত ইন্দ্রিয়চেতনা[৪৮] ও আধ্যাত্মিকতার মিলন লক্ষ্য করা যায় তা বিশ্বে অনন্য। অনুরূপ ইন্দ্রিয়চেতনা ও আধ্যাত্মিকতার

সমাবেশ ব্যাবিলনীয় সংস্কৃতিতে দেখা যায় যার মূলেও হয়তো প্রাচীন কম্বোজের প্রভাব আছে। সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাবিলনের সম্বন্ধ ছিল এলমের সঙ্গে এবং এই ছিল আসিরীয়দের সঙ্গে ব্যাবিলনীয়দের সংঘাতের প্রেক্ষাপট।

আকেজাণ্ড্রিয়া প্রফথাসিয়া, সীস্তানের বৌদ্ধ মন্দির ও কপিলবস্তু

প্রাচীন ইরানে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব নিয়ে ইরানীয়রা ঘোরতর অস্বস্তি বোধ করলেও সত্য কখনই পুরোপুরি গোপন করা যায় না। আলেকজান্ডার বহু আলেকজাণ্ড্রিয়া নগর স্থাপন করেন যেখানে গ্রীক নগর-রাজ্যের মতো রাজার ক্ষমতার আইনি সীমা ছিল ও নাগরিকদের বহু অধিকারও স্বীকৃত ছিল। মহাপণ্ডিত রাসেলের মতে এই নগরগুলি মানব সভ্যতায় নুতন দিগন্তের সূচনা করে এবং এই ছিল মানবজাতির জন্য গ্রীকরাজের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার। বহু আলেকজাণ্ড্রিয়ার মধ্যে একটির নাম আলেকজাণ্ড্রিয়া প্রফথাসিয়া যা স্বাভাবিকভাবেই কৌতুহলের উদ্রেক কেননা গ্রীক ভাষায় প্রফথেস্ শব্দের অর্থ অবতার। প্রশ্ন ওঠে কোনো অবতারের স্মৃতি বহন করে এই প্রফথাসিয়া? এই নগরীর অবস্থান নিয়েও বিতর্ক আছে। অধিকাংশ লেখক ফ্রাডাকে আলেজাণ্ড্রিয়া প্রফথাসিয়া বলে ধরলেও হেলেনীয় সংস্কৃতি বিশারদ স্যার ডব্লিউ. ডব্লিউ. টর্ণের ধারণা অনুযায়ী প্রফথাসিয়া সীস্তানের হামুন হ্রদ অঞ্চলে ছিল। টর্ণের অভিমত যুক্তিযুক্ত মনে হয় কেননা হামুন হ্রদ অঞ্চলের কুহ-ই-খোয়াজা ইরানীয় অবতার জরথুস্ট্রের জন্মভূমি হিসাবে স্বীকৃত। কুহ্-ই খোয়াজাই ছিল ঐতিহাসিক কপিলাবস্তু কেননা এখানে পাওয়া ম্যুরালচিত্র পণ্ডিতদের মতে গান্ধারকলার প্রাচীনতম নিদর্শন।[৪৯]

বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিশিষ্ট পুরাতাত্ত্বিক অরেল স্টাইন সীস্তানের হামুন হ্রদ অঞ্চলে কুহ-ই-খোযাজায় একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির ও বহু পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিস্কার করে পণ্ডিত মহলে সারা জাগিয়ে ছিলেন। উল্লেখনীয় যে সীস্তান ইরানীয় মহাকাব্যের সুপ্রাচীন পটভূমি হিসাবে চিহ্নিত হলেও একদা বৃহত্তর ভারতের অঙ্গ ছিল। পুরাতাত্ত্বিক বিচারে এটি একটি অত্যন্ত প্রাচীন এলাকা যা বালুচিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরাণের সংযোগস্থলে অবস্থিত। সীস্তানের রাজা গন্ডোফারনেসকে[৫০] যে কেবল খ্রিস্টিয় শাস্ত্রে "ভারতের রাজা" বলে অভিহিত করা হয়েছে তা নয়, তাব রাজধানী "রাম শহবিস্তান" এর নাম থেকেও তাঁর ভারতীয়ত্বের হদিস মেলে। প্রখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত দরমেস্তেতেব কাবুল ও সীস্তানের সভ্যতা ও কৃষ্টির সঙ্গে প্রচীন হিন্দু সভ্যতার নিবিড় আত্মীয়তাব কথা উল্লেখ করেছেন।

কপিলবস্তু ও বাইবেলের পূর্ববিধান-উল্লিখিত ভুস্বর্গ

কোন যুগের ছিলেন কপিল, কত প্রাচীন হতে পারে কপিলবস্তু? সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন কপিলের কাল খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী লেখেন কিন্তু কপিল হয়তো আরো এক সহস্রাব্দেরও বেশী প্রাচীনতর। কোরাণে কপিলের উল্লেখ আছে, হাবিল ও কাবিল **প্রথম** মানব আধমের পুত্র। আধমের উল্লেখ থেকে কপিলের সঙ্গে স্বর্গের এক যোগসূত্র দেখা যায়, বোঝা যায় কপিল কত প্রাচীন। ভাষাতত্ত্বের নিয়মে 'ক' খুব সহজেই 'ব' তে রূপান্তরিত হয় কাজেই কবিলের পরিবর্তিত রূপ বাবিল হতে পারে যা একটি অতি পরিচিত নগরের নাম যদিও ভারতীয় শাস্ত্রে এর উল্লেখ নেই। সমরূপ একটি নাম - বাভেরু - জাতকের কাহিনীতে আছে যা সাধারণতঃ ব্যাবিলন বলে ধারণা করা হয়। প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ ই. হার্জফেল্ড ইরাণের বাওয়ের নগরের কথা লেখেন যা বাবিলের (এবং কপিলের) রূপান্তর এবং যা স্থাপনা করেছিলেন স্বয়ং যামশেদ। সম্ভবতঃ বাওয়ের ছিল সীস্তানে যা ইরানীয় মহাকাব্যের প্রাচীন পটভূমি। এথেকে বোঝা যায় কপিলবস্তু কখনই নেপালে হতে পারে না। প্রাচীনতার মানদন্ডে সীস্তানের সঙ্গে কোনো তুলনাই হয় না পিপ্রাওয়া অথবা তিলৌরাকোটের।

প্রাচীন সুমের, ভারত ও ইরাণের ইতিহাস থেকে প্রতীয়মান হয় যে বাইবেলে যে স্বর্গীয় ইডেন উদ্যানের উল্লেখ আছে তা পুরোপুরি কল্পনাপ্রসূত নয়। এই উদ্যান পূর্বে ছিল কিন্তু এর অবস্থান নিয়ে পশ্চিমী পণ্ডিতেরা বহু বিচার বিবেচনা সত্বেও কোনো স্থির সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারেননি। ইরাক কুয়াইত সীমান্তেই এই উদ্যান ছিল বলে সাধারণতঃ দাবি করা হলেও এ ধারণা ভ্রান্ত। সম্প্রতি পুরাতত্ত্ববিদ ডেভিড রোহল এই উদ্যান ইরাণে ছিল লিখেছেন[৫১]। স্বর্গের প্যারাডাইস নামটি যে ইরানীয় অথবা ইন্দো-ইরানীয় এটা স্পষ্ট বোঝা যায় এবং এথেকেও মনে হয় যে ভূস্বর্গ ভারত-ইরাণেই ছিল, ইরাকে নয়। চিত্রকলা ও ভাস্কর্য্য ব্যতিরেকে ভূস্বর্গ-সম্পর্কিত মীথও প্রধানতঃ ইন্দো-ইরানীয় এবং সুমেরীয়। প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ ই. হার্জফেল্ড এক যুগান্তকারী প্রতিবেদনে লেখেন যে কুহ-ই-খোয়াজা থেকেই তিনজন ম্যাগী যীশুখ্রিস্টকে বরণ করতে বহু উপঢৌকন নিয়ে প্যালেস্টাইনে যান। কুহ-ই-খোয়াজায় অরেল স্টাইনের আবিস্কৃত বৌদ্ধমন্দির খ্রিস্টধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে এক যোগসূত্রের হদিস দেয় যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সীস্তানের এই প্রাচীন নগরীই মনে হয় যামশেদ-প্রতিষ্ঠিত বাওয়ের অথবা বাবিল নগর যার উল্লেখ করেছিলেন হার্জফেল্ড। এই বাবিল বাবিলনের চেয়েও প্রাচীনতর এবং এই ছিল প্রাচীন কপিলবস্তু।

প্রখ্যাত মার্কিন পণ্ডিত এস. এন ক্রেমার সুমেরীয় ভূস্বর্গ দিলমুন সিন্ধু অঞ্চলে ছিল বলে দাবি করলেও অন্য পণ্ডিতেরা তা মানেননি। যদিও অধিকাংশ ইউরোপীয় লেখকেরা মনে কবেন যে দিলমুন্ বাহরেণে ছিল, এর বিরুদ্ধে ক্রেমার অকাট্য যুক্তি পেশ করেছেন। রমীলা থাপারের বক্তব্য যে গুজরাট একদা দিলমুনের অংশ ছিল, পশ্চীমী ঐতিহাসিকেরা মেনে না নিলেও এ ধারণাব মধ্যে অনেকটা সত্য লুকিয়ে আছে। মনে হয় প্রাচীন গুজরাট ছিল বালুচিস্তান ও সীস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত কেননা রাজস্থানেও গুজজর নামটি পাওয়া যায়। এ থেকে বোঝা যায় সীস্তান প্রাচীন সুমেরীর ভূস্বর্গ দিলমুনেব অঙ্গ ছিল। "দি ক্লাসিকাল এজ" গ্রন্থে (পৃ ৬৩৯) রমেশচন্দ্র মুজমদার বসবাব নিকটবর্তী ভারতীয় নগর উব্বুলার কথা লেখেন যা ভারতে প্রবেশের দ্বার হিসাবে পরিচিত ছিল। এই উব্বুলাই ছিল উরুভেলা যেখানে বোধিলাভের পরে গৌতম বুদ্ধ ধর্মপ্রচার করেন। উরুভেলা কখনই পুর্বভারতে হতে পারে না। ভেলা, ভাল, বাল, কাল ইত্যাদি শব্দ প্রাচীনকালে শহরের নামের শেষে ব্যবহৃত হত। অতএব উরুভেলা প্রাচীন শহর উর হতে পারে যদিও এই উর ইরাকের বহু-আলোচিত নগরী উর নয়, ইরানীয শাস্ত্রে উল্লিখিত উর্ব যা ছিল সীস্তানে। এই উর্ব কপিলবস্তুর নিকটে ছিল।

ব্যাবিলন ও কপিলাবস্তু

ব্যাবিলনের প্রকৃত নাম ছিল "বাবিল" যা গ্রীকদের হাতে ব্যাবিলনে রূপান্তরিত হয় কিন্তু এই নামের অর্থ নিয়ে অনেক প্রশ্ন আছে। সুমেরীয় নথিতে ব্যাবিলনের নাম ছিল কা-ডিঙ্গির-রা (অথবা কারা) যার অর্থ করা হয় ইশ্বরের দ্বার (বার-ইলানি) কিন্তু বিশিষ্ট মার্কিন পণ্ডিত আই. জে. গেলব্ সিদ্ধান্ত করেন যে বাবিল নামটি ব্যবিলনের তুলনায় প্রাচীনতর একটি নামের প্রতিধ্বনি।[৫২] এই প্রাচীন বাবিল নিঃসন্দেহে ইরাণের বাওয়ের নগর যা যামশেদ-প্রতিষ্ঠিত বলে লিখেছিলেন হার্জফেল্ড এবং যা ছিল সীস্তানে। বাওয়ের নামটি জাতকের বাভেরুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যা মনে করা হয় ব্যাবিলনের নাম কিন্তু হতেও পারে যে জাতকের বাভেরু ছিলে সীস্তানে। শুধু পারসীয় কাব্যের উল্লেখ থেকে নয়, শহর-ই-শোকথার প্রত্নতাত্ত্বিক আবিস্কারও সীস্তানের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করে। ব্যাবিলন এককালে যে বিশ্বের পবিত্রতম ধর্মস্থান হিসাবে পরিচিত ছিল তার কারণ হতে পারে এই নগরের সঙ্গে প্রাচীন ভূর্স্বর্গ কপিলবস্তুর (বাবিল) সম্পর্ক।

বিশ্বে ধর্মের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে ব্যাবিলনের যে এককালে অগ্রনী ভূমিকা ছিল তা অনস্বীকার্য্য। ব্যবিলন এককালে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নগরী ছিল এবং বাইবেলের নববিধানে ব্যাবিলনের নানা নিন্দা থাকলেও পূর্ববিধানের সুর সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে ব্যবিলনের রাজা নেবুচদ্রেজার পূর্ব বিধানের অত্যন্ত মহান এক ব্যক্তিত্ব যিনি ইহুদীদের প্যালেস্টাইন থেকে বিতারিত করলেও তাঁকে জেরেমাইয়া ও অন্যান্য ঈহুদী মহাপুরুষেরা ঈশ্বরের প্রতিভূ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। বৈজ্ঞানিক উৎখননের ইতিহাসে ব্যবিলনের জার্মান খননকারক কোল্ডেভের কাজ দৃষ্টান্তমূলক ধরা হয় কিন্তু উৎখননে ব্যবিলনের প্রাচীন ও পবিত্র ঐতিহ্যময় সৌধমালা ধ্বংস হওয়া নিয়ে তিনি এক সময় এতই অভিভুত হয়ে পরেন যে খননকার্য্য বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। নেবুচদ্রেজার মহাপরাক্রমশালী বিশ্বসম্রাট ছিলেন কিন্তু তিনি বিজিতদের নির্মূল করার আসিরীয় পন্থা অনুসরণ না করে সাম্যের বানী প্রচার করেন। তাঁর দৃষ্টান্তই মনে হয় মহাসম্রাট আলেকজান্ডার অনুসরণ করেন। সম্রাট অশোকের উপরও নেবুদ্রেজারের প্রভাব স্পষ্ট। স্যার লিওনার্ড উলীর মতে নেবুচদ্রেজারের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম যাগযজ্ঞ ও পুরোহিতহীন ধর্মসমাবেশে প্রার্থনাসভার অনুষ্ঠান হয ব্যবিলনে। এথেকে ব্যাবিলনই ভক্তিবাদের উৎস মনে হয়। জেরেমাইয়া নেবচদ্রেজারকে ঈশ্বরের প্রতিভূ হিসাবে মনে করতেন।

গ্রীকরা সাধারণতঃ বিদেশীয়দের তুচ্ছার্থে বার্বারোই নামে অভিহিত করলেও ব্যবিলন সম্পর্কে তাদের শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। গিলবার্ট মারে ও অন্যান্য লেখকেরা এটা গ্রীকদের দুর্বলতা হিসাবে দেখলেও এই ধারণা ভ্রান্ত। নেবুচদ্রেজার বিশ্বভাতৃত্বেব দিশারী ছিলেন। একারণেই তাঁর সৈন্যবাহিনীতে বহু গ্রীক সৈনিকের মধ্যে কবি আলকেউসের ভাই আন্তিমেনেদিসও ছিলেন। গণিত জ্যোতিবিদ্যা, নগর-কেন্দ্রিক সভ্যতা অনেক কিছুই গ্রীকরা ব্যাববিলনীয়দের থেকে গ্রহণ করে। গ্রীকরাজ আলেকজান্ডার ব্যাবিলনকে তার বিশ্ব সাম্রাজ্যের রাজধানী করেন।

প্রকৃতপক্ষে নেবুচদ্রেজার ও ব্যাবিলনকে বাদ দিয়ে পূর্বভারত ও নেপালের ইতিহাসে ভিত্তিতে বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন সম্যকভাবে বাখ্যা করা যয় না। নেবুচদ্রেজারের যুগে ব্যাবিলনের অগনিত মন্দিরের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশটির নাম ছিল মহাজী (জী শব্দের অর্থ ছিল জ্ঞান) যার সঙ্গে প্রাক-গৌতম বৌদ্ধধর্মের যোগ থেকে থাকতে পারে। এখানে এক শ্রেণীর ধর্মীয় অধিকর্তাদের নাম ছিল সাঙ্গুমাহু যা মহাসঙ্ঘিকার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ধর্মের পটভূমি ব্যতিরেকে ব্যবিলনের ইতিহাসের যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা অসম্ভব। এক অর্থে নেবুচদ্রেজারের ব্যবিলনের ধর্মভাবনার উত্তরসুরী বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম। জীবনের শেষভাগে তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন যা অনভিজ্ঞ পাশ্চাত্য লেখকেরা তার মনোবিকারের সূচক বলে ধরেছেন। বর্তমান লেখকের মতে দারিউস্-১ এর যুগে ব্যাবিলনের ধর্মগুরু বগপ ছিলেন স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ যাঁর উপাধি ছিল ভগভ।[৫৩]

---

১. লন্ডনের রয়্যাল সোসাইট অব আর্টসের পন্ডিত বার্ডউড এক সময় সদর্পে ধ্যানরত বুদ্ধের অপরূপ মূর্তির সঙ্গে সুয়েট্ পুডিং এর তুলনা করেন।

২. সুমেরীয় সভ্যতা গ্রীসের তুলনায় বহু প্রাচীন এবং গ্রীক কলায় সুমেরীয় ও সিন্ধু ধারাও আভাস পাওয়া যায় কিন্তু এ নিয়ে আলোচনা বিরল।

৩ প্রাচীন ভারতে শিল্পসৌন্দর্য্যের স্বরূপ নিয়ে শুধু যে একটা সুস্পষ্ট উপলব্ধি ছিল তাই নয় এ বিষয়ে গভীর তাত্ত্বিক আলোচনারও নজির আছ। ভরতের নাট্যশাস্ত্র একটি অত্যন্ত প্রাচীন গ্রন্থ (খ্রিস্টপূর্ব

দ্বিতীয় শতাব্দ থেকে খ্রিস্টিয় দ্বিতীয় শতাব্দ)। জয়মঙ্গল হইতে জানা যায় যে ভারতীয় শিল্পবিদ্‌দের মতে চিত্রের ছয়টি অঙ্গ - রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্যযোজন, সাদৃশ্য ও বর্ণিকাভঙ্গ। কথাগুলির প্রকৃত তাৎপর্য সম্বন্ধে বিতর্ক আছে।

৪. বেনীমাধব বড়ুয়া মৌর্য্যদের উত্তর-পশ্চিমের অধিবাসী হিসাবেই দেখেছেন এবং ইসলামাবাদ বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক এ. এচ. দানিও এ অভিমত সমর্থন করেন। ফুশারের মতানুযায়ী আফগানিস্তান ও সীস্তানও মৌর্য্যদের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। মেগাস্থেনেস উল্লিখিত পালিবোথ্রা পাটনায় ছিল, স্যার উইলিয়াম জোন্সের এ ধারণার কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক ভিত্তি নেই। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই বৃটিশ আবিষ্কারই যে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের বিকৃতির প্রধান উৎস একথা এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকেরা এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করেন। ব্রিটিশ চিন্তাবিদদের হাতেই ভারতবিধ্যার সূচনা হয় কিন্তু বর্তমান লেখকের মতে লন্ডন ঘরাণার বাইরে না গিয়ে সত্যনিষ্ঠ ভারতচর্চা অসম্ভব। রণজিৎ পাল, "নন্‌-জোন্সীয়ান ইন্ডোলজি য়্যন্ড আলেকজান্ডার", নয়া দিল্লী, (২০০২)।

৫. প্রথম পর্বের ৬টি গুহাই খ্রিস্টপূর্ব যুগের এবং প্রাচীনতমটি খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের। এই গুহাগুলি তুলনায় অনাড়ম্বর এবং এখানে আরাধ্য ছিল শৈলখাত স্তুপ, কোনো মূর্তি নয়। প্রায় চার শতাব্দীব্যাপী নিষ্ক্রিয়তার পর পরবর্তী পর্বের গুহাগুলিতে কাজ শুরু হয়। এই পর্বের গুহা অলংকারবহুল ও এখানে অরাধ্যস্তুপে বুদ্ধমূর্তি উৎকীর্ণ।

৬. "দি ওয়ান্ডার দ্যাট ওয়াজ ইন্ডিয়া", পৃ.৬৭।

৭. লরেন্স বিনিয়ন "দি স্পিরিট অব ম্যান ইন এশিয়ান আর্ট" হার্ভাড, ১৯৩৫।

৮. বৌদ্ধ চিত্রে স্বর্গকল্পনার বহু স্তর থাকা সম্ভব। ইন্দ্রের প্রসাদ ছিল স্বর্গের অমরাবতীতে। গৌতম বুদ্ধ তুষিত স্বর্গ হতে মর্ত্যে নেমে এসেছিলন।

৯. ভারতকোষ, প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৯।

১০. এই সাম্যের বানী প্রচার করেন রাজা অশোক কিন্তু তারও পূর্বে গ্রীকরাজ আলেকজান্ডার তাঁর ভারতীয় গুরুর শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে অপিস ভোজসভায় সৌভ্রাত্রের (হমোনায়া) আদর্শ তুলে ধরেন।

১১. ভাবলে অবাক হতে হয় যে এই ফুহরারই বহুকাল এপ্রিগ্রাফিয়া ইন্ডিকার সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ভারতীয় পুরাতত্ত্বের এই অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতে রমীলা থাপারের সোচ্চার মন্তব্য, "পাটুলিপুত্রের অবস্থান নিয়ে কোনও অনিশ্চয়তা নেই", কিছুটা বিসদৃশ ঠেকে। বিশিষ্ট প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ অমলানন্দ ঘোষ কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় সাবধান করেছিলেন যে পাটুলিপুত্র নিয়ে আমরা যা যানি তা পুরোপুরি পুঁথিনির্ভর

১২. এচ্‌ লুডারস, জার্ণাল অব দি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯১২, পৃ. ১৬১-১৬৮। ডঃ ফেলপসের ওয়েবসাইট http://www.lumkap.org.uk/ দ্রষ্টব্য।

১৩. এ নজির বহুকালের। সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রাপ্ত লিপি একটি অশোক স্তম্ভের উপর লেখা। অশোক নিজেই হয়তো কয়েকটি আলেকজান্ডার স্থাপিত স্তম্ভে লিপি খোদাই করেছিলেন। রণজিৎ পাল, "য়্যান্‌ অন্টার অব আলেকজান্ডার নাও স্ট্যান্ডিং নিয়ার দিল্লী", স্কলিয়া, সং, ১৩, ২০০৫ দ্রষ্টব্য। চক্রধর মহাপাত্র একটি শিলালিপির উল্লেখ করেন যা থেকে ধারণা হয় গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয় উড়িষ্যার কপিলেশ্বরে।

১৪. "কপিলাবস্তু", হেস্টিংস্ এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন য়্যান্ড এথিকস।

১৫. "তিলৌরাকোটে শাক্যজাতির রাজধানী কপিলবস্তুর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয় এই মত পূর্বে কেহ কেহ প্রকাশ করিয়াছেন। উৎখননে এই মত সপ্রমাণ বা অপ্রমাণিত হয় নাই", লিখেছেন বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক এ. ঘোষ। ভারতকোষ, ১, ৫৯৭। "কপিলবস্তুর অবস্থান-স্থল এখনও অজ্ঞাত', লিখেছেন নেপালের প্রত্নতত্ত্ব বিশারদ দেবলা মিত্র।

১৬. প্রতাপাদিত্য পাল, এ বুদ্ধিস্ট প্যারাডাইস, দি ম্যুরালস্ অব আলচী, (১৯৮২), ৩৫ পৃ.।

১৭. এনসাইক্লোপিডিয়া অব আর্ট, "বুদ্ধিজম্", পৃ. ৬৮৭। প্রাক-গুপ্তযুগে সীস্তান, আফগানিস্তান, গান্ধার ইত্যাদি অঞ্চলে বৌদ্ধসভ্যতার যে ব্যাপ্তি লক্ষ্য করা যায় তা পূর্বভারতের তুলনায় বহুলাংশে বেশী। প্রাচীন বৌদ্ধপুথি পাওয়া গিয়াছে মধ্য এশিয়ায় ও শ্রীলঙ্কায়, একটিও পূর্বভারতে নয়। স্যার অবেল স্টাইনের বহু চাঞ্চল্যকর আবিস্কার বৌদ্ধধর্মের প্রাচীন ইতিহাসের প্রত্নতাত্ত্বিক ভিত্তি স্থাপনা করেছে কিন্তু তার কোনটিরই পটভূমি পূর্বভারত নয়। বিশিষ্ট ভাষাবিদ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের মতে সিংহল ভাষাভাষীরা খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে কাথিয়াওয়াড ও দক্ষিণ সিন্ধু থেকে শ্রীলঙ্কায় যান। পালি ভাষার উৎপত্তি-স্থল নিয়ে বহু মত থাকলেও তা যে পূর্বভারত নয় এটা নিশ্চিত। সুকুমার সেন উজ্জয়িনী অঞ্চলের ভাষাই পালি ভাষার বীজ এই অভিমত পোষণ করেন। স্যার্ চার্লস এলিয়টের মতো বিদগ্ধ ভারতবিদ্ আশ্চর্য্য হয়ে লক্ষ্য করেন যে চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করনে সেই উত্তর-পশ্চিমেরই সন্ন্যাসীরা।

১৮. "আজকের ভারতবর্ষের ভৌগলিক সীমা বা ১৯৪৭-এ দেশ 'স্বাধীন' হবার আগে যে সীমা ছিল তার বহু পূর্বে ভারতবর্ষের সীমা মধ্যপ্রাচ্যের দিকে অনেক বেশী বিস্তৃত ছিল। শুধু বাণিজ্য সীমায় নয়, সাংস্কৃতিক আদানপ্রদানের ভিত্তিতে জাতিগোষ্ঠী বা জনগোষ্ঠী হিসেবে এক না হলেও অনেক বিস্তৃত এক ভূখণ্ডে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ছড়িয়েও এর বিস্তৃতি ছিল। হয়তো কেন্দ্রীয় কোনো শাসনের অতর্ভুক্ত ছিল না এ সমস্ত অঞ্চল, কিংবা বলা যায়, শতাব্দীর পর শতাব্দীতে, এমনকি কিছু সহস্রাব্দেরও ওপারে, ঐ অঞ্চলের শাসন ব্যবস্থা গুলোর বারেবারে হাতবদল হয়েছে। কিন্তু ঐ অঞ্চলের মানুষের মনে ভারতবর্ষ বলতে অনেক বিস্তৃত, অনেক বহুজাতিক বহুভাষিক এক জনগোষ্ঠীর ধারণা ছিল। "প্রাচীন ভারত', কলিকাতা, ১৯৯৮, পৃ.১১।

১৯. য়্যাড্রু লওলার, সায়েন্স, সং ৩০২, নভেম্বর ২০০৩। বর্তমান লেখকের "নন্-জোন্সীয়ান ইন্ডোলজি য়্যান্ড আলেকজান্ডার" গ্রন্থে এই আবিস্কারের অগ্রসূচনা ছিল।

২০. এ প্রসঙ্গে দারিউস্ উল্লিখিত হিদুস্ প্রদেশের ভৌগলিক পরিধির সমস্যা জরিত। হিদুস্ নামটি বৃহত্তর ভারতরই সমার্থক, দক্ষিণ-পূর্ব ইরানও একদা হিদুসের অঙ্গ ছিল। এনসাইক্লোপিডিয়া অব আর্ট গ্রন্থে ভাদিম এলিসিয়েফ্ স্পষ্ট ভাষায় দক্ষিণ-পূর্ব ইরাণের প্রাচীন শিল্পকলায় প্রচ্ছন্ন ভারতীয় প্রভাবেব কথা লিখেছেন।

২১. রণজিৎ পাল, "য়্যান্ অল্টার অব আলেকজান্ডার নাও স্ট্যান্ডিং নিয়ার দিল্লী", স্কলিয়া, সং, ১৩।

২২. দি হেরিটেজ্ অব পার্সিয়া, পৃ. ১১৯।

২৩. "দি বুদ্ধা য়্যন্ড ফাইভ আফটার সেঞ্চুরিস" সাহিত্য সংসদ, ১৯৭৮, পৃ. ৫৪

২৪. প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, সাহিত্য, ধর্মকাহিনী ইত্যাদি যে প্রমানের ভিত্তিতে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস লেখা হয় তাতে একটা অদৃষ্ট ভাগ্যের প্রভাব থেকে যায়। বন্যা ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রকৃতিক দুর্যোগে ও চৌর্য্যবৃত্তির

কারণে প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী হারিয়ে যায় এবং ইতিহাসের মূল্যায়নেও প্রয়শঃই ব্যাক্তিকেন্দ্রিক অথবা গোষ্ঠীভিত্তিক পক্ষপাত থাকে। ইতিহাস যে নির্ব্বিকার সত্যানুসন্ধান একতা ডি. এফ্ স্ট্রাউস্ ও অনন্যান্য টুবিংগেন স্কুলের গবেষকেরা ঘোরতর প্রতিকূলতার মধ্যে প্রতিপন্ন করার প্রয়াস করলেও ব্রিটিশ গবেযকেরা সাধারণতঃ একে বিপদজনক জার্মান র‍্যাশন্যলিজম হিসাবেই দেখেছেন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক জি. এম. টেভেলিয়ান সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে নজর রেখে ইতিহাস লেখার কথা বলেন। ব্রিটিশ ভারতবিদেরা সাধারণতঃ ব্রটিশ ভারতকেই প্রাচীন ভারত বলে গন্য করেছেন এবং জোনসের প্রমাদের মূলে না গিয়ে নানাবিধ ভ্রান্ত ধারণার সৌধ রচনা করেছেন।

২৫. মানব কথাটির উৎপত্তি হয়তো মনু থেকে। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার পৌত্র মনু মানব জাতির আদি পুরুষ হিসাবে খ্যাত। ঋকবেদে মনু এক অত্যন্ত খ্যাতনামা পুরোহিত (ও সেই সুবাদে রাজা) যিনি প্রথম যজ্ঞের হোতা এবং যাঁর ভাই ছিলেন রাজা যম। মনুসংহিতার আখ্যান অনুযায়ী ব্রহ্মা নিজে দেহকে নারী ও পুরুষরূপে বিভক্ত করিয়া ঐ নারীর গর্ভে বিরাটরূপে আবির্ভূত হন। সেই বিরাট পুরুসের তপস্যার ফলে মনুর জন্ম হয়।

২৬. কেমব্রিজ এনসিয়েন্ট হিস্ট্রি গ্রন্থে ডব্লিউ হিনজ্ লিখেছেন যে এলামীয় ভাষায় "দ", "ন" তে পরিবর্তিত হতো।

২৭. আই, মহাদেবন, "দি ইন্ডাস্ স্ক্রিপ্ট", পৃ. ৮১১

২৮. রণজিৎ পাল, "নন জোনসিয়ান ইন্ডোলজি য়্যান্ড আলেকজান্ডার", পৃ. ৩৭

২৯. সম্প্রতি রাম-জন্মভূমি নিয়ে সরকার-পুষ্ট প্রত্নবিদদের কীর্তি ইতিহাসে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের বিসময় ফল সম্পর্কে অধিকাংশ ভারতীয়কেই সচেতন করেছে।

৩০. সুকুমার সেন, "রাম-ইতিহাসের প্রাক-কথা"

৩১. জি. রওয়া (Roux), 'ইরাক' পৃ. ৪৫০। রামের নাম রিম সিন লেখা হয় কিন্তু একই সুমেবীয় চিহ্নের উচ্চারণ ছিল রিম ও রাম এবং সিন ছিলেন চন্দ্রদেবতা।

৩২. জোয়ান ওটস্, "ব্যাবিলন", পৃ. ৭৭

৩৩. কেম্ব্রিজ এনসিয়েন্ট হিস্ট্রি, সং ১,(২),১৯৭১, পৃ. ৬৪৩

৩৪. কেম্ব্রিজ এনসিয়েন্ট হিস্ট্রি সং ২,(২),১৯৭১, পৃ.

৩৫. গিয়ানোরোবার্তো স্কারসিয়া, "ইরান", এনসাইক্লোপিডিয়া অব ওয়র্ল্ড আর্ট,

৩৬. আর. ডি. বার্ণেট, কেমব্রিজ এনসিয়েন্ট হিস্ট্রি, সং ২ (২), পৃ ৪১৯ ও পৃ. ৪২৬।

৩৭. ডি. পি. মিশ্র, 'স্ট্যাডিজ ইন দি প্রোটো হিস্ট্রোরি অব ইন্ডিয়া' ওরিয়েন্ট লংম্যান, ১৯৭১।

৩৮. কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ্. আর. আলচিন ও দিলীপ চক্রবর্তী একারণে চন্দ্রগুপ্তের নামোল্লেখ পর্য্যস্ত করেননা তাদের উপমহাদেশের প্রত্নতত্ত্ব-বিষয়ক গ্রন্থে। এই আক্ষেপ ও অনুল্লেখ আজ যেন এক জোনসীয় ঐতিহ্য। ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায় ও ডঃ রাঘবন দ্বিধাহীন কণ্ঠে স্বীকার করেন যে পুঁথীর বাইরে নন্দরাজাদের কোনো অস্তিত্ব নেই। জার্মান ঐতিহাসিক কুলকে ও রথারমুণ্ড চন্দ্রগুপ্তের ইতিহাসকে ভ্রান্তিবিলাস আখ্যা দিয়েছেন। "ইন্ডিয়া", রূপা, ১৯৯১, পৃ.৬১। কলেজ দ্য ফ্রাঁসের জি. ফুসম্যানও গতানুগতিকভাবে অশোকের মৃত্যু-পরবর্তী কালের ভারতীয় ইতিহাসের বহু আত্মবিরোধী দিক নিয়ে লিখেছেন কিন্তু এর মূলে যে পাটনায় তথাকথিত পালিবোথ্রা আবিস্কার তা উপলব্ধি করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন।

৩৯. অমলানন্দ ঘোষ দুরদৃষ্টি নিয়ে লেখেন যে কানিংহ্যাম-আবিস্কৃত স্রাবস্তী, কৌশাম্বী, বৈশালী ইত্যাদি নগরীতে এমন কোনো বিশেষ প্রত্নবস্তু উদ্ঘাটিত হয় হয়নি যা এই নামগুলি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করে। তিনি লক্ষ্য করেন যে এই সব স্থানে বৌদ্ধযুগের নাগরিক সভ্যতার কোনো নিদর্শন নেই। স্মিথ আশ্চর্য্যপ্রকাশ করেন যে উত্তরপ্রদেশের কণৌজে হর্ষযুগের কোনো প্রাচীন সৌধ নেই অথচ কোহণৌজে তার এক সহস্রাব্দ পূর্বে ভারতীয়দের উপস্থিতির অকাট্য প্রমাণ আছে। হিউ এন ৎসাঙ বাংলার বিবরণে প্রায়ই যে ইরাণের উল্লেখ করেন তা থেকে বোঝা যায় মগধের মত আরেকটি প্রাচীন বঙ্গ ছিল। দ্বারকা, সোমনাথ ইত্যাদি নগরীর শনাক্তকরণের ভিত্তি কিন্তু বৈজ্ঞানিক।

৪০. চন্দ্রগুপ্তকে ওরোন্টেস ধরলে আলেকজান্ডারের ইতিহাসে নাটকীয় পরিবর্তন আসে। বর্তমান লেখকের ওয়েবসাইট www.geocities.com/ranajitda দ্রষ্টব্য।

৪১. ছোটোখাটো ইন্দো-গ্রীক রাজাদেরও অপূর্ব সুন্দর মুদ্রা পাওয়া যায় অথচ অশোকের কোনো মুদ্রা নেই কেন এ প্রশ্নের সদুত্তর রমীলা থাপার তাঁর লেখা অশোকের ইতিহাসে না দিলেও এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন আর এস ত্রিপাঠী। অশোকের প্রকৃত পরিচয় মনে রাখলে বলা যায় যে তাঁব স্বর্ণ ও রৌপমুদ্রা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ।

৪২. এ বিষয়ে বিশদ আলোচনার জন্য বর্তমান লেখকের প্রবন্ধে "য়্যান্ অল্টার অব আলেকজান্ডার নাও স্ট্যান্ডিং নিয়ার দিল্লী", স্কলিয়া, সং, ১৩ দ্রষ্টব্য।

৪৩. স্যার চার্লস এলিয়ট, 'হিন্দুইজম য়্যান্ড বুদ্ধিজম'। অশোকই খোটানে প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন এই তথ্য আর. থাপার অবিশ্বাস করলেও তা যুক্তিযুক্ত নয়।

৪৪. পেশায় ভূতত্ত্ববিদ্ কুমারস্বামীর লেখায় বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার অভাব ছিল না এবং তিনি কলম ধরেন এমন এক সময়ে যখন এক শ্রেণীর লেখকেরা ভারতীয় কলার নিরপেক্ষ ও যথার্থ মূল্যায়ন না করে সবকিছুতেই গ্রীসীয় ধারার ছায়া খুজে পেতেন।

৪৫. প্রতাপাদিত্য পালের মতো কলেজ দ্য ফ্রাঁসের আব. এমেরিকও পূর্বভারতকেই বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তিস্থল কল্পনা করে ইরানের অভ্যন্তরে একটি প্রাচীন বৌদ্ধ মঠের অবস্থিতি নিয়ে গভীর অস্বস্তি বোধ করেছেন এবং কেমব্রিজ্ হিস্ট্রি অব ইরান গ্রন্থে "একটিমাত্র সোয়ালো পাখী দেখে গ্রীষ্ম এসেছে মনে করা যায় না" মন্তব্য করে এর গুরুত্ব উড়িয়ে দিয়েছেন। খোটানের প্রাচীন সাহিত্য পুরোপুরি বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধিত। বৌদ্ধধর্ম নিয়ে এরূপ উন্মাদনা পূর্বভারতে কোথাও ছিল না যা ইঙ্গিত করে যে এই ধর্মের উদ্ভব এ অঞ্চলে হয়নি।

৪৬. হ্যাভেলের মতে পদ্ম হিন্দুসংস্কৃতির এক অনন্য প্রতীক যদিও পদ্মাসীন হোরুসের মূর্তি মিশরীয় কলায়ও বিখ্যাত। ৎসিমেরের মতে পদ্ম বুদ্ধের বোধিলাভের ইঙ্গিত করে। নাগ ছিল সমুদ্রের প্রতীক যা এলপত্র নাগরাজা ও সাগরপারের দক্ষনহুষের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

৪৭. নরবলি ও বহুবিধ যৌন অমিতাচার ভ্রষ্ট তান্ত্রিকতার সঙ্গে যুক্ত হলেও সিলভ্যাঁ লেভি. পি. সি. বাগচী ও মিরচা এলিয়াডের মতো পণ্ডিতেরা তন্ত্রসাধনার সুষম ধারার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তন্ত্রের ইতিহাস সুপ্রাচীন, আফঘানিস্তানে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দের মণ্ডলাকার প্রসাদ পাওয়া গিয়াছে। প্রাণ নাথ মিশরীয় কলায় তন্ত্রের প্রভাবের কথা লেখেন এবং সুমেরীয় সভ্যতায়ও তন্ত্রের প্রভাব লক্ষ্যনীয়।

৪৮. মাডেলিন হাল্লাদ, ইন্দো-ইরানিয়ান আর্ট, এনসাইক্লোপিডিয়া অব ওয়ার্ল্ড আর্ট। সাঁচী অঞ্চলের প্রাচীন নাম ছিল কাকনভা এবং কাকনয় যে নামের প্রাচীনতর নগরী ইরানের এলামে পাওয়া যায়। আল-

বিরুনী লিখেছিলেন যে ধর্মগত কারণে বুদ্ধের কালেই ইরানের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল (কম্বোজ) থেকে ভারতে বৌদ্ধদের অভিপ্রয়াণ হয়। স্বর্গীয় নিহাররঞ্জন রায় ইতিহাসকে জাতীয়তাবাদী চিন্তা থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করেন এবং ফুহরারের জালিয়তির কথা মনে রেখে স্পষ্ট ভাষায় লেখেন যে বর্তমান ভারতের বৌদ্ধ শিল্পকলার নিদর্শনগুলির কোনোটাই খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয়-তৃতীয় শতাব্দীয় পূর্ববর্তী নয়। সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশে একটি অপরূপ সরস্বতীমূর্তি পাওয়া গিয়াছে।

৪৯. রণজিৎ পাল, "নন্-জোন্সীয়ান ইন্ডোলজি য়্যান্ড আলেকজান্ডার" নিউ দিল্লী, ২০০২।

৫০. নামটি অন্যত্র গন্ডফার বলে উল্লেখ করা হয় যা আসলে হয়তো গন্ডভার, যার অর্থ হয়তো ভারতের বাজা গন্ড। ইরাকের কাশীয় রাজা গান্ডাশ বর্তমান লেখকের মতে ঋকবেদ উল্লিখিত প্রমগন্ড ও গন্ডফারের গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। গন্ড নামটি সঙ্গে গান্ধার নামে যোগ থাকা অসম্ভব নয়।

৫১. "সানডে টাইমস, ১১ই অক্টোবর ১৯৯৮"

৫২. যোয়ান ওটস, "ব্যবিলন", পৃ. ৬০। জাতকের বাভেরু ইরানের বাওয়েরও হতে পারে যদিও জাতকের যুগে মনে হয় ব্যবিলনই বেশী সমৃদ্ধিশালী ছিল।

৫৩. রণজিৎ পাল, "য়্যান্ অন্টার অব আলেকজান্ডার নাও স্ট্যান্ডিং নিয়ার দিল্লী", স্কলিয়া, সং ১৩।

প্রাচীন ভারতের বণিকসম্প্রদায়

রণবীর চক্রবর্তী

প্রাগাধুনিক তথা প্রাচীন ভারতের সমাজ এবং সংস্কৃতি সাধারণভাবে সনাতন বলে চিহ্নিত। সনাতন শব্দটি দ্বারা পরিবর্তনশীল হাল আমলের সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সংস্কৃতি থেকে তাকে পৃথক দেখানোর চেষ্টা থাকে; সনাতন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের চেয়ে পরম্পরা ও ধারাবাহিকতার প্রাধান্য বেশি। প্রাচীন ভারতের সমাজ এবং সংস্কৃতিকে সনাতন বলে দেগে দেবার ক্ষেত্রে তার অনড়, অটল, জগদ্দল চরিত্রটিই আমাদের মানসলোকে মূর্ত হয়ে ওঠে। এই জাতীয় ভাবনার মধ্যে নিহিত থাকে এক দীর্ঘলালিত বিশ্বাস যে, প্রাচীন ভারতের সমাজ একান্তভাবে শাস্ত্রানুসারী এবং শাস্ত্রীয় অনুজ্ঞা যুগ যুগ ধরে একইরকম, বদলবিহীন। গত পাঁচ বা ছয় দশক ধরে প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে যে গবেষণা চলছে, তার ফলে প্রাচীন ভারতের সমাজ, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সম্ভাবনা প্রকটিত হয়েছে। এই জাতীয় গবেষণায় শাস্ত্রীয় বচনকেই কেবল প্রাচীন ভারতকে বোঝবার প্রধান বা একমাত্র চাবিকাঠি হিসেবে গণ্য কবা হযনি। সুদূর অতীতের ভারতীয় সমাজ এবং সংস্কৃতির সনাতন চরিত্রের ধারণা গড়ে ওঠার আর একটি উপাদান হলো গ্রামীণ কৃষিপ্রধান জীবনযাত্রার উপর নিরন্তর নির্ভরতা। অস্বীকার করা অসম্ভব যে সুদূর অতীত থেকে বর্তমান আমল পর্যন্ত ভারতীয় অর্থনীতি ও সমাজের ভিত্তি কৃষিতেই নিহিত; ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কৃষিজীবী এবং ভারতের প্রাণ তার গ্রামগুলিতে। আবদ্ধ, স্বয়ংসম্পূর্ণ জড়বৎ গ্রামীণ সমাজ একান্তভাবে কৃষি নির্ভর হওয়ায় অভিনবত্বের সম্ভাবনা সামান্যই। প্রায় চিরাচরিত এই বিবরণে কৃষি-বহির্ভূত অর্থনীতির ভূমিকা নিতান্তই গৌণ বলে প্রতিভাত হয়। সুখের বিষয় গত দুই বা তিন দশক ধরে ঐতিহাসিকদের আগ্রহ বাড়ছে কৃষি-অর্থনীতির বাইরে অর্থনীতির ক্ষেত্রেও। তার দরুন সুদূর অতীতের কারিগরি শিল্প-উৎপাদন এবং কারিগর, ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং নগরায়ণের প্রতি ঐতিহাসিকের অনুসন্ধানও ক্রমবর্ধমান।[১] বার্তাশাস্ত্র — অর্থাৎ যে বিদ্যা বৃত্তি বা পেশা নিয়ে আলোচনা করে— বলতে কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে কৃষি এবং পশুপালনের পাশাপাশি বাণিজ্যকেও যথাযথ মর্যাদা দিয়েছেন। বিশাল ভারতীয় উপমহাদেশ যথেষ্ট পরিমাণে বৃষ্টিপাতের কারণে এবং নদীবিধৌত হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই কৃষির পক্ষে বিশেষ অনুকূল। কিন্তু একথাও অস্বীকার করা যাবে না যে উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ সমতলভূমি এবং নদীর আধিক্য যাতায়াতের পক্ষে অত্যন্ত প্রশস্ত ছিল। তাছাড়া উপমহাদেশের অবস্থান ভারতমহাসাগরের প্রায় কেন্দ্রে; তার উপর উপমহাদেশের দুই দীর্ঘ তটরেখা আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগরকে স্পর্শ করে আছে। এই ভৌগোলিক পরিস্থিতি ভারত মহাসাগরের সমুদ্রবাণিজ্যে উপমহাদেশের পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হয়ে উঠেছিল। উত্তর পশ্চিম সীমান্তবর্তী এলাকার গিরিপথগুলি বিপদসংকুল হলেও পশ্চিম এশিয়া এবং মধ্য এশিয়ার সঙ্গে স্থলপথে যোগাযোগের জন্য ব্যবহৃত হতো। অন্যদিকে উত্তর-পূর্ব প্রান্তের মধ্য দিয়ে মায়ানমার এবং চীনের দক্ষিণাংশের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখা নিতান্ত দুষ্কর ছিল না। এই দিক দিয়ে বিচার করলে প্রাচীন ভারতীয় সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্বকে হয়তো

একেবারে প্রান্তীয় পর্যায়ে রেখে দেওয়া যাবে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের তাৎপর্য যাই থাক না কেন, এতে কোনও দ্বিমত নেই যে তার অবস্থান ছিল সামগ্রিক কৃষিপ্রধান আর্থ-সামাজিক অবস্থা-ব্যবস্থার মধ্যেই। প্রাচীন ভারতের ব্যবসায়-বাণিজ্যের অতীত উদ্ধার করতে গিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুখ্য মনোযোগ পড়েছে বিনিময়যোগ্য পণ্য, নগর ও বন্দর সহ বিপণনকেন্দ্র, যাতায়াত এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা, মুদ্রা এবং বিভিন্ন বিনিময়ের মাধ্যম—প্রভৃতি বিষয়ের উপর। এই চর্চার তাৎপর্যকে কিছুমাত্র খাটো না করেও অবশ্য বলা চলে যে অপেক্ষাকৃত কম নজর পড়েছে বণিকের উপর, ব্যবসার ইতিহাসে যে বণিক মুখ্য চরিত্র। তথ্যের অপ্রতুলতা বোধহয় এই অভাবের একটা বড় কারণ। তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে এক মানসিকতা যে সনাতন ভারতীয় সমাজের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব করে কৃষক সম্প্রদায়।

বর্তমান প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতের বণিকদেব প্রসঙ্গই প্রধান উপজীব্য। জনসংখ্যার সিংহভাগই যেখানে কৃষিকর্মের উপর নির্ভরশীল, সেখানে বণিক সংখ্যার বিচারে নির্দ্বিধায় গৌণ। সংখ্যার বিচারে গৌণতর হয়ে দেখা দেবেন বিবিধ বিদেশী বণিকগোষ্ঠী, যাঁরা বহির্ভারতীয় এলাকা থেকে ভারতে এসে স্বল্পস্থায়ী বা দীর্ঘমেয়াদী বসতি গড়ে তুলেছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় সমাজ এবং সংস্কৃতির অনেকান্ত চরিত্রকে মেনে নিলে প্রধান কৃষিজীবী সমাজের সঙ্গে বণিক সমাজের তাৎপর্যও স্বীকার করতে হয়। বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা সেই কারণেই।

॥ ২ ॥

ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বিবিধ তথ্যসূত্র উদ্ধার করে প্রাচীন ভারতের যাবতীয় বণিকের তালিকা তৈরি করা সীমিত পরিসরে সম্ভব নয়। এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও তা নয়। বণিকদের ক্রিয়াকলাপ বোঝাব একটি সামগ্রিক প্রয়াস এখানে করা হবে; বণিক সমাজের নানা বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরার কিছু চেষ্টা করা যেতে পারে। বণিকরা কবে থেকে ভারতীয় সমাজে প্রতিভাত হলেন, তার নিখুঁত নির্দ্ধারণ প্রায় অসাধ্য। তবে হরপ্পা সভ্যতার আমলে (আ: খ্রি: পূ: ২৬০০-১৭৫০) একটি নগরাশ্রয়ী জটিল সমাজে বণিকদের উপস্থিতি নির্দ্বিধায় নির্দেশ করা যায়।[২] এই সভ্যতার অন্তর্গত বানাওয়ালি (হিসসার জেলা, হরিয়ানা) প্রত্নক্ষেত্রে আবিষ্কৃত হয়েছিল একটি বাড়ির অবশেষ। এটি একটি বসতবাড়ি, যেখান থেকে আবিষ্কৃত হয় একাধিক নামমুদ্রা, ওজনের বাটখারা এবং ভূগর্ভে প্রোথিত বেশ কয়েকটি বৃহদায়তন জালা। এই প্রত্নবস্তুগুলির ভিত্তিতে পুরাতাত্ত্বিক বিশট্ বাড়িটিকে শনাক্ত করেছিলেন কোনো ব্যবসায়ীর গৃহ হিসেবে। এছাড়াও বাড়িটিতে ছিল আধুনিক বৈঠকখানা সদৃশ একটি ঘর; প্রক্ষালনের ব্যবস্থা সমেত একটি স্নানাগার। বাড়ির মালিক তথা বাসিন্দার সম্পন্ন অবস্থার পরিচয় পুরাবস্তুগুলিতে উপস্থিত।[৩]

হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে সমকালীন মেসোপটেমীয় সভ্যতার ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের কথা সুবিদিত। মেসোপটেমীয় 'বাণমুখ' ('কুনেইফর্ম') লিপিতে হরপ্পা সভ্যতার এলাকা 'মেলুহ' বলে অভিহিত। 'বাণমুখ' লিপিতে বলা হয়েছে মেলুহ থেকে আগত বণিকদের কথা; মেসোপটেমীয় এলাকায় তাঁদের গতিবিধি এতটাই নিয়মিত যে একটি 'মেলুহ গ্রাম'-এর উল্লেখও এই 'বাণমুখ' লিপিতে জানা যায়।[৪] এমনই একটি লিপিতে মেলুহ থেকে আগত এক জাহাজী বণিকের প্রসঙ্গও উল্লিখিত হয়েছে।[৫] অপর একটি লিপিতে বলা হয়েছে মেলুহ ভাষার এক দোভাষীর কথা, যাঁর নাম সু-ইলি-স্‌সু।[৬] বাণিজ্যজনিত নিকট সম্পর্ক এবং মেসোপটেমিয়াতে হরপ্পীয় বণিকদের নিয়মিত উপস্থিতির কারণেই এই দোভাষীর প্রয়োজন ঘটেছিল। বণিকদের সক্রিয় ভূমিকা সাংস্কৃতিক যোগসূত্র স্থাপনে যে সহায়ক হয়ে উঠছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

॥ ৩ ॥

সেই তুলনায় *ঋগ্বেদে* (আ: খ্রি: পূ: ১৫০০-১০০০) বাণিজ্য এবং বণিক প্রায় বিরলদর্শন। তার প্রধান কারণ তৎকালীন সমাজ মূলত পশুপালন এবং কিছুপরিমাণে কৃষির উপর আশ্রিত; নগরাশ্রয়ী হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে তার চরিত্রগত ব্যবধান অনেকটাই। *ঋগ্বেদে* কখনও কখনও বর্ণিত হয়েছেন 'পণি'-রা। পণিরা বহু সম্পদের অধিকারী; তাঁরা বহুদূর দেশেও যেতেন; তাঁদের ভাষা ঋগ্বেদের সূক্তকারদের কাছে অবোধ্য, তাই তাঁরা *ঋগ্বেদে* হেয় প্রতিপন্ন হয়েছেন। তাঁদের সম্পন্ন অবস্থান এবং দূরদূরান্তরে যাওয়া এই দুই লক্ষণ মিলিয়ে কোসাম্বী অভিমত দিয়েছিলেন যে ঋগ্বেদের পণি কার্যত পববর্তী পর্যায়ে সংস্কৃত *বণিক* শব্দেরই পূর্বসূরী[৭]। বণিকদের প্রসঙ্গ পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে (আ: খ্রি: পূ: ১০০০-৫০০) মিলবে ঠিকই, কিন্তু বর্ণবিভাজিত সমাজে বণিকদের মর্যাদা দিতে বৈদিক সাহিত্যের অনীহা আমাদের নজর এড়ায় না। বণিক শতধনলাভে আগ্রহী— এই বর্ণনা যেমন আছে, তেমনই আছে বাণিজ্যিক সাফল্যের আশায় পণ্যসিদ্ধি নামক আচার-অনুষ্ঠান করার উল্লেখ।[৮] বণিক অবশ্যই বৈশ্য বর্ণের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বৈশ্য উচ্চতর তিন বর্ণের অন্যতম বলে বিবেচিত হলেও ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের তুলনায় তাঁর সামাজিক মর্যাদা ক্রমান্বয়ে অধোগামী। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বৈশ্য সম্বন্ধে যে হেয় মন্তব্য করা হয়েছে, তার সঙ্গে শূদ্রের বিরুদ্ধে উচ্চারিত কটূক্তির পার্থক্য সামান্যই। এমতাবস্থায় বণিক এবং পণ্য লেনদেন কৃষিপ্রধান বৈদিক সমাজে উপস্থিত থাকলেও, তাঁর প্রতি অবমাননাকর দৃষ্টিভঙ্গীই ফুটে উঠেছে।[৯]

এই দৃষ্টিভঙ্গী বৈদিক ঐতিহ্যবাহী শাস্ত্রগ্রন্থে অব্যাহত তো বটেই, বোধহয় তা কঠোরতর রূপেও দেখা দিচ্ছিল। *অর্থশাস্ত্রে* বণিকদের প্রতি কৌটিল্যের বিরাগ এবং সন্দেহ এতটাই প্রকট যে তিনি *বৈদেহক* বা ব্যবসায়ীদের সরাসরি *কণ্টক* বলে চিহ্নিত করেছেন। বণিকরা অসাধু এবং তাই বিপজ্জনক; অতএব কৌটিল্য তাঁদের *শোধন* (প্রকৃতপক্ষে দমন) করার বিধান দিয়েছেন।[১০] *মনুসংহিতায়* ব্যবসায়ী *সত্যানৃত*-এর কারবারী বলে আখ্যাত, অর্থাৎ তাঁদের ক্রিয়াকলাপ সত্য এবং অনৃত (= মিথ্যা)-এর মিশ্রণে গড়ে উঠেছে।[১১] বণিক ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রগ্রন্থে *প্রকাশ্যতস্কর* বলেও নিন্দিত। বৈদিক ঐতিহ্যবাহী বর্ণাশ্রম ধর্মই শাস্ত্রীয় অনুজ্ঞায় আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা; এই সমাজ ব্যবস্থা মূলত গ্রামকেন্দ্রিক এবং কৃষি-আশ্রিত। নগরজীবনের প্রতি শাস্ত্রকারদের অনীহা অজানা নয়।[১২] অন্যদিকে বণিকের ক্রিয়াকর্মের প্রধান ক্ষেত্র স্বাভাবিকভাবেই ছিল নগর; বর্ণাশ্রম প্রথার জটিলতা বণিকরা ব্যবহারিক জীবনে কতটা মানতেন তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায় (প্রসঙ্গটি পরে আলোচিত)। বণিকরা অনেকেই বিত্তবান ছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রগ্রন্থে তাঁদের যথোচিত সামাজিক মর্যাদা স্বীকৃত হয়নি। ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রের অনুশাসনে বণিকদের প্রতি বিরূপতা থাকলেও তার বোধহয় কোনো একশৈলিক রূপ নেই। শাস্ত্রীয় বচনই বাণিজ্যকে লক্ষ্মীর আবাস হিসেবে স্তুতি করে। ভারতে আগত বিদেশী বণিকদের প্রতি শাস্ত্রে অনুরূপ কোনও বিরাগ প্রদর্শিত হয়নি। কৌটিল্য বণিকদের প্রতি খড়্গহস্ত বটে, কিন্তু এমন কি তিনিও বিদেশী বণিককে সমাদরে অভ্যর্থনা জানাতে এবং তাঁদের নানাপ্রকার আর্থিক সুযোগ-সুবিধা দিতে চেয়েছেন।[১২] বিদেশী ব্যবসায়ীর ভারতে নিয়মিত উপস্থিতিতে এবং বসতি স্থাপনে যে ভারতীয় সমাজে বিশেষ প্রতিবন্ধকতা ছিল না, তার যথেষ্ট ঐতিহাসিক নজিরও আছে (প্রসঙ্গটি পরে আলোচিত)। বণিকদের প্রতি শাস্ত্রকারদের মনোভাবে সম্ভবত দোলাচলচিত্ততার আভাস পাওয়া যাবে।

বণিকসমাজের প্রতি অনেকটাই ভিন্ন মনোভাব ফুটে উঠেছে বৌদ্ধ এবং জৈন গ্রন্থমালায়। বৌদ্ধ পালি শাস্ত্রে *উক্কট্ঠ কম্ম* (= উৎকৃষ্ট কর্ম)-এর অন্যতম হলো বণিজ্জা বা ব্যবসা, যে বৃত্তি *উক্কট্ঠকুল* (উৎকৃষ্ট কুল) বা সম্ভ্রান্ত সামাজিক গোষ্ঠীর পক্ষে উপযুক্ত। ধনাগমের জন্য অপেক্ষাকৃত কম কায়িক

শ্রমে কৃষির তুলনায় বাণিজ্যই যে বেশি সুবিধাজনক, এমন মন্তব্যও পালি সাহিত্যে মিলবে।[১৩] জাতক এবং অবদান কাহিনীগুলি— যাদের জনপ্রিয়তা সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে তর্কাতীত— বারবার উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়ে তুলেছে বণিকদের ভূমিকা। কেবলমাত্র সমাজের বিত্তবান গোষ্ঠী হিসেবে নয়, এই সাহিত্যে বণিক বৌদ্ধ সংঘে নিয়মিত পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্যও প্রভূত কীর্তিত। একই মন্তব্য করা যায় প্রাকৃত এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিশাল জৈন সাহিত্য সম্বন্ধেও। বৌদ্ধ এবং জৈন উভয় ধর্মমতই খ্রিঃপূঃ ষষ্ঠশতক নাগাদ আবির্ভূত হলো; এই দুই ধর্মমতের ব্যাপক জনপ্রিয়তার আধার ছিল তাদের বেদ এবং ব্রাহ্মণ বিরোধী ঐতিহ্য। ঐ সময়ে উত্তর ভারতে বিশেষত মধ্য গঙ্গা উপত্যকায় গড়ে উঠছে বহু নগর। নগরগুলিই ছিল বুদ্ধ, মহাবীর প্রমুখের নতুন ধ্যান-ধারণা প্রচারের এবং ব্যাখ্যার আদর্শ এলাকা; এই নগরই আবার বণিকের মুখ্য কর্মকেন্দ্র। বছরের অধিকাংশ সময়ই অগেহ বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং অর্থপ্রত্যাশী বণিক ভ্রাম্যমান থাকতেন। বর্ষার তিন বা চার মাসে উভয়েরই যাত্রাবিরতি ঘটত অস্থায়ী কোনো ডেরায়, কখনও গুহাবাসে—বৌদ্ধশাস্ত্রে *'বস্সাবাস'* (বর্ষাবাস) বলে যা চিহ্নিত। বণিক এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুর যোগসূত্রের দুইটি প্রধান ক্ষেত্র—নগর এবং সাময়িক বস্সাবাস। জৈন ধর্মে অহিংসার ব্যাপক গুরুত্ব সুবিদিত। অন্যান্য বিবিধ পেশায়—এমন কি কৃষিকর্মেও— অজান্তে প্রাণবিনাশ ঘটে যেতে পারে। বাণিজ্যে এই ধরনের প্রাণবিনাশের আশঙ্কা তুলনায় কম, তাই জৈন দৃষ্টিভঙ্গীতে বণিকের বৃত্তি অহিংসার অনুসারী এবং শ্রেয় এক পেশা।

॥ ৪ ॥

প্রাচীন ভারতের বণিক সম্প্রদায় নিয়ে অনুসন্ধান করতে গেলে আরও একটি বিষয়ে সচেতন থাকা জরুরী। বণিকের নানা প্রকারভেদ ছিল, প্রাচীন আমলের সাক্ষ্যও সেই বৈচিত্র্যের আভাস দেয়। অতএব কেবলমাত্র 'বণিক' এই সামান্য অভিধায় বণিকের বিচিত্র জগৎ ধরা পড়ে না। যে কোনও ব্যবসায়ীকেই সংস্কৃত তথ্যসূত্রে বণিক বলা চলে। কিন্তু *বৈদেহক* বা *বঞ্জারক* খুব সম্ভবত ভ্রাম্যমান স্বল্প পুঁজির ছোট ব্যবসায়ী যিনি ফিরিওয়ালার মতো অল্প পরিমাণ তৈজস নিয়ে স্থানান্তরে যাতায়াত করতেন। ব্যবসায়ী মাত্রেই যে কেবলমাত্র দুর্মূল্য, দুষ্প্রাপ্য, বিলাস সমাগ্রীর লেনদেন করবেন তার কোনো মানে নেই। তামিল তথ্যসূত্রে দেখা মিলবে *উপ্পুবণিকের* যিনি নুনের ব্যবসায়ী।[১৪] নুনের মতো নিছক আটপৌরে কিন্তু অপরিহার্য পণ্যের ব্যবসায়ে যথেষ্ট সফল ছিলেন নবম শতকে গঙ্গা-যমুনা দোয়াব এলাকার বাণিজ্যকেন্দ্র তথা নগর সিয়াডোনীতে এক *নেমকবণিজ।*[১৫] তাঁর পিতাও ছিলেন *নেমকবণিজ*; অর্থাৎ নুনের ব্যবসায়ী হিসেবে পুরুষানুক্রমিক এক বিশেষ পেশায় তাঁরা যুক্ত ছিলেন। লৌহ নির্মিত সামগ্রীর বেচাকেনায় লিপ্ত ছিলেন *লোহবণিয়*। তামিল সাহিত্যে *পোনবণিক*[১৬] বলে যিনি পরিচিত তিনি উত্তর ভারতে *সুবর্ণবণিক* বলে আখ্যাত : তিনি অবশ্যই অনেক বেশি দামি জিনিষের কারবারে লিপ্ত ছিলেন। মণিমুক্তোর মতো দুর্মূল্য তৈজসের ব্যবসায়ী তামিল সাহিত্যে *মণিয়বণিয়* বলে আখ্যাত।[১৭]

কি পালি, কি সংস্কৃত সাহিত্য, কি লেখমালা, সর্বত্রই বহুল পরিমাণে উল্লিখিত হয়েছেন *সার্থবাহ*। বৌদ্ধ সাহিত্যে হামেশাই দেখা যাবে সার্থবাহ *পুব্বন্ত* (পূর্বসীমা) থেকে *অপরান্ত* (পশ্চিম সীমা) পর্যন্ত বহু গোশকটের কাফেলা নিয়ে পণ্যসামগ্রী সমেত দূর দূর দেশে যাতায়াত করতেন। *সার্থবাহ* চলেছেন; *পথ দেখাবার জন্য তাঁর সহায়ক হিসেবে আছেন* *স্থলনিয়ামক।*[১৮] দশম শতকে বাংলার সমতট এলাকায় (বর্তমান বাংলাদেশের নোয়াখালি-কুমিল্লা অঞ্চল) সক্রিয় ছিলেন *বৃদ্ধসার্থ* জম্ভলমিত্র।[১৯] *বৃদ্ধসার্থ* কথাটি প্রবীণ সার্থবাহের দ্যোতক হতে পারে, আবার সার্থবাহদের মধ্যে অগ্রগণ্য বোঝাতেও ব্যবহৃত হতে পারে।

এক বিশেষ প্রকার বণিক সম্ভবত পরিচিত ছিলেন পশু ব্যবসায়ী হিসেবে। তিনি নিঃসন্দেহে সাধারণ কোনো বণিকের থেকে আলাদা, এমন বণিকদের পাণিনি তাঁর *অষ্টাধ্যায়ীতে* উল্লেখ করেছেন *গো-বণিজ* এবং *অশ্ব-বণিজ* বলে।[১৯] যা লক্ষ্যণীয় তা হলো জীবজন্তুর ব্যবসায়ে লিপ্ত হলেও দুই প্রকার গৃহপালিত পশুর ব্যবসা করছেন দুই ভিন্ন ধরণের ব্যবসায়ী। কৃষিনির্ভর সমাজে গবাদি সম্পদের প্রয়োজন ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। গোবণিকের কর্মকাণ্ডের মধ্যে বাণিজ্য, পশুপালন এবং কৃষির সাযুজ্য অনুমান করা যায়। জাতক গ্রন্থে এমনই এক গোসম্পদ ব্যবসায়ী *গোবিত্তকসেট্‌ঠি* বলে অভিহিত: অর্থাৎ যে ব্যবসায়ীর বিত্তের মূলে আছে গবাদিসম্পদ।[২০] গবাদিপশুর তুলনায় ঘোড়া অনেক দামী সামগ্রী। ঘোড়া প্রধানত যুদ্ধে ব্যবহৃত হতো। খ্রি: পূ: চতুর্থ শতক থেকেই অশ্ববাহিনী ভারতীয় যুদ্ধব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গবিশেষ। এছাড়া ঘোড়া সামাজিক মর্যাদা ও সম্ভ্রমের দ্যোতক। বিত্তবান ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং ক্ষমতাশালী রাজপুরুষরাই ঘোড়া ব্যবহার করতেন। উচ্চমানের ঘোড়া, বিশেষত সেরা যুদ্ধাশ্ব, ভারতে চিরকালই বিরল। ঘোড়া তাই মূলত আমদানি হতো স্থলপথে উত্তর পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত কম্বোজ এবং গান্ধার এলাকা দিয়ে। আ: ১০০০ খ্রি: এর পর থেকে বহুমূল্য আরবী ঘোড়া সমুদ্রপথেও আমদানি করা শুরু হয়। এই কথাগুলির অবতারণা করতে হলো এইজন্য যে অশ্ববণিক দুর্মূল্য এক সামগ্রী নিয়ে লেনদেন করতেন। নবম শতাব্দীতে পৃথূদক (বর্তমান হরিয়ানার অন্তর্গত পেহোয়া)— তে বসেছিল এক *ঘোটকযাত্রা* বা ঘোড়া কেনাবেচার মেলা, সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন অনেক অশ্বব্যবসায়ী। তাঁদের কয়েকজনের নাম নিঃসন্দেহে অভারতীয়। এজাতীয় অশ্ববণিকরা ক্রমেই *হেড়বিক* গোষ্ঠী বলে পরিচিত হন।[২১] লক্ষ্যণীয় এই যে এই জাতীয় বণিকরা তত্ত্বগতভাবে বৈশ্য বর্ণভুক্ত; কিন্তু লেখতে তাঁদেব পৃথক পরিচয় দেওয়া হলো; সেই পরিচয়ের ভিত্তি হলো বিশেষ একটি সামগ্রী নিয়ে তাঁদের ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ। সুদূর দক্ষিণভারতের অশ্বব্যবসায়ীরা নিজেদের পরিচয় দেবার প্রয়াস পেয়েছেন তাঁদের লেখমালায়। এই লেখমালায় (একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত) তাঁরা মালাইমণ্ডলম্ (কেরলের অন্তর্গত মালাবার উপকূল)-এর *কুদিরৈচেট্টি* বলে আখ্যাত।[২২] তামিলে কুদিরের অর্থ ঘোড়া। চেট্টি বা শ্রেষ্ঠী ধনী বণিকের সমার্থক। আরবী বিবরণী এবং মার্কোপোলো-র সাক্ষ্য। মিলিয়ে পড়লে দেখা যাবে দক্ষিণভারতের যুযুধান রাজশক্তিগুলি অবিরাম যুদ্ধাশ্ব আমদানি করত সমুদ্রপথে পারস্য উপসাগরীয় এলাকা এবং এডেন থেকে[২৩]। *কুদিরৈচেট্টিরা* এই বাণিজ্যেই অংশ নিচ্ছিলেন। তবে ঘোড়া আমদানির সরাসরি সমুদ্র বাণিজ্যে তাঁদের দেখা পাওয়া দুষ্কর, তা বোধহয় আরব বণিকরাই কুক্ষিগত করে রেখেছিলেন।[২৪] বিশেষ আকর্ষণীয় বিষয় হলো *কুদিরৈচেট্টিদের* এলাকা লেখমালায় মালাইমণ্ডলম বলে চিহ্নিত হলেও, তাঁদের লেখগুলি কিন্তু কেরলের উপকূলবর্তী অঞ্চলে পাওয়া যায় না। সেগুলির প্রাপ্তিস্থল অনেকটা পূর্বে তামিলনাড়ুর নানা জায়গায়। অর্থাৎ *কুদিরৈচেট্টিদের* প্রধান কর্মক্ষেত্র উপকূল ছাড়িয়ে তামিলনাড়ুতেই দেখা যাবে।

উপকূলের সমাজে বিশেষত ১০০০ খ্রি: থেকে এক বিশেষ ধরণের বণিক আরবী/ফার্সী বিবরণীতে, সংস্কৃত লেখমালায় এবং একাদশ-দ্বাদশ শতকীয় ইহুদী বণিকদের চিঠিপত্রে পাদপ্রদীপের আলোয় উঠে এলেন। সংস্কৃত লেখমালায় এঁরা *নৌবিত্তক* নামে পরিচিত। এঁদের অভিধাই বুঝিয়ে-দিচ্ছে যে তাঁদের বিত্তের উৎস হচ্ছে জলযান— অর্থাৎ এঁরা ছিলেন জাহাজী বণিক। আরবী/ফার্সী গ্রন্থে এবং ইহুদী বণিকদের *চিঠিপত্রে জাহাজী* বণিক *নাখুদা* বলে আখ্যাত। ফার্সী শব্দ *নাও* (তুলনীয় সংস্কৃত *নৌ*) বা জাহাজের খুদা বা মালিক হলেন *নাখুদা*। এখনও পর্যন্ত এঁদের সন্ধান মিলবে ভারতের পশ্চিম উপকূলে— গুজরাট থেকে কোঙ্কন হয়ে মালাবার পর্যন্ত। এতটাই সুপরিচিত এই জাহাজী বণিক সম্প্রদায় যে *নৌবিত্তক* এবং *নাখুদা* শব্দদুটি সংস্কৃত লেখতে *নৌ* এবং *নাখু* এই সংক্ষেপিত রূপে বিরাজ

করে। এমন কি *নৌবিত্তক নাখুদা* শব্দ দুইটি সমার্থক বা প্রতিশব্দ হিসেবেও লেখতে ব্যবহৃত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাহাজী বণিকরা আরবদেশীয়, ধর্মে মুসলমান। কিন্তু ইহুদী বণিকদের চিঠিপত্রে অন্তত তিন চারজন ভারতীয় নাখুদার দেখা পাওয়া যাবে। দ্বাদশ শতকের এমনই এক জাহাজী সওদাগর ছিলেন ফতনসামী, যা পট্টনস্বামীর আরবী রূপ।[২৬] পট্টনস্বামী সমকালীন কন্নড় লেখমালায় বহুল পরিচিত এক অভিধা; বিশিষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ কোনো ব্যবসায়ী বণিক সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে যখন পট্টন বা বন্দর-নগরের দায়িত্বভার পেতেন, তখন তিনি পট্টনস্বামী বলে উল্লিখিত হতেন। বুঝতে অসুবিধে হয় না যে এটি কোনো ব্যক্তিনাম নয়, বরং বিশিষ্ট পদমর্যাদার পরিচায়ক। তাঁর অন্তত দুটি জাহাজ মালাবার থেকে এডেন বন্দরে যাতায়াত করত। অপর এক জাহাজী বণিক তিনবু-র জাহাজ নিয়মিত যাতায়াত করত অলমঞ্জরুর (ম্যাঙ্গালোর) থেকে মহারাষ্ট্রের থান্না পর্যন্ত। তাঁর পরিচয় রয়েছে ১০৪৫ এর একটি ইহুদী বণিকের চিঠিতে।[২৭] কোঙ্কন উপকূলের বলিপত্তন বন্দরে সক্রিয় ছিলেন এক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী পরিবার অন্তত তিন পুরুষ ধরে; তাঁরা যে জাহাজী ব্যবসায়ে যুক্ত ছিলেন তার বিবরণ আছে দ্বাদশ শতকীয় একটি লেখতে।[২৮] এঁদের জাহাজগুলি অবশ্য মাঝদরিয়ায় পাড়ি দিত না, তটীয় বাণিজ্যেই এঁদের ভূমিকা সীমিত ছিল। জাহাজী ব্যবসায়ে ঝুঁকি প্রচুর, জীবন এবং সম্পত্তিহানির আশঙ্কা *নৌবিত্তক-নাখুদাদের* নিত্যসঙ্গী। ঝুঁকি এবং অনিশ্চয়তা অতিক্রম করে সফল হলে অবশ্য জাহাজী সওদাগররা প্রভূত লাভের মুখ দেখতেন। এর বিশ্বস্ত আলেখ্য ফুটে উঠেছে ইহুদী বণিকদের পত্রগুচ্ছে। কখনও কখনও বিত্তবান বণিক সরাসরি জাহাজী সওদাগর না হয়েও লাভের তাগিদে জাহাজী ব্যবসায়ে নামতেন বা অর্থলগ্নী করতেন। গুজরাটের ত্রয়োদশ শতকীয় বিশিষ্ট বণিক জগডু প্রাথমিকভাবে নৌবিত্তক না হলেও অধস্তন সহায়ক বণিকের মাধ্যমে পারস্য উপসাগরের বিখ্যাত বন্দর হোর্মুজ বা আর্দ্রপুর পর্যন্ত জাহাজ পাঠিয়েছিলেন।[২৯]

ধনী এবং সম্পন্ন ব্যবসায়ী বলতে অবশ্য সবচেয়ে পরিচিত চরিত্র হলেন *শ্রেষ্ঠীরা*। পালি সাহিত্যে যাঁদের বলা হয়েছে *সেট্‌ঠি*। শ্রেষ্ঠী কথাটির প্রয়োগ হয়তো পরবর্তী বৈদিক আমল থেকেই দেখা যাবে, কিন্তু তাঁদের উজ্জ্বলতর ভূমিকা প্রতিভাত হয়েছে পালি সাহিত্যে, বিশেষত জাতক কাহিনীগুলিতে। বৌদ্ধ কাহিনীতে *সেট্‌ঠি*-র বিপুল বিত্ত সম্বন্ধে বাঁধাগতের একটি বিবরণ আছে : তিনি আশীকোটি বৈভবের অধিকারী *(অসিতিকোটিবিভবসেট্‌ঠি)*। এই বিপুল সম্পদের উৎস অবশ্যই বাণিজ্যিক সাফল্য। পালি সাহিত্যে প্রভূত সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে *গহপতি-সেট্‌ঠির* দেখাও মিলবে। *গহপতি* অত্যন্ত সম্পন্ন ব্যক্তি, তিনি প্রচুর ভূসম্পত্তির মালিক ছিলেন। পালি সাহিত্যের অনুপুঙ্খসহ বিচার করে আইভো ফাইজার এবং রোমিলা থাপার সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে কোনো কোনো *গহপতি* তাঁদের সম্পদের একাংশ ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করতেন। তার দরুন *গহপতির* কর্মজগৎ আর কেবলমাত্র ভূসম্পদের মধ্যে সীমিত থাকল না, তা লেনদেনের সঙ্গেও জড়িত হলো। অথচ এর দ্বারা গহপতি পুরোদস্তুর ব্যবসায়ীও হলেন না। এই পরিস্থিতি বোঝাবার জন্যই *সেট্‌ঠি-গহপতি* কথাটির বিশেষ প্রয়োগ; তিনি পুরোপুরি গহপতি নন, আবার পাকাপাকিভাবে বণিকও নন। তিনি যে অর্থ বিনিয়োগ করছেন তা অবশ্যই আরও বেশি অর্থলাভের তাগিদে। বিনিয়োগকারী রূপে *সেট্‌ঠি-গহপতি* গোষ্ঠী থেকেই ক্রমে *সেট্‌ঠি* বা শ্রেষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছিল, এমন অনুমান যুক্তি সঙ্গত। শ্রেষ্ঠীর আর্থিক সাফল্যের চাবিকাঠি বোধহয় তার অর্থলগ্নী করার দক্ষতাতেই নিহিত।[৩০]

পালি সাহিত্যে *সেট্‌ঠি* প্রায়শ বর্ণিত হয়েছেন রাজার বিশেষ ঘনিষ্ঠ হিসেবে। তিনি প্রতিদিন তিনবার করে রাজসভায় যান, এমন বর্ণনা জাতক কাহিনীগুলিতে বারবার শোনা যায় (*দিবসস্ তয়োবারে রাজুপট্‌ঠনম্ গচ্ছতি*)। অথচ সেট্‌ঠি কখনওই বেতনভুক রাজকর্মচারী নন। কারণ

রাজভোগ্যদের তালিকায় তাঁর নাম নেই। অনুমান করা চলে যে রাজদরবারে সেট্‌ঠি নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন তাঁর ব্যক্তিগত ভূমিকায় নয় বরং ব্যবসায়ী সমাজের মুখপাত্র রূপে।[৩১] কারণ বৈভবের বিচারে তিনি নিঃসন্দেহে ব্যবসায়ী সমাজে অগ্রগণ্য। সেট্‌ঠির গুরুত্ব তাই যুগপৎ তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবসায়িক সাফল্য এবং বণিক সমাজের মুখপাত্র দুই-এরই উপর আশ্রয় করে থাকে।

॥ ৫ ॥

বণিক সমাজ প্রকৃতপক্ষে নানা প্রকার ব্যবসায়ীর সম্মিলিত, সমষ্টিগত রূপ। নিছক ব্যবসায়ী বা বণিক অভিধা প্রয়োগ করলে তাঁদের পেশাগত বৈবিধ্য অগোচর রয়ে যায়। সামান্য আগেই বলা হয়েছে ব্যবসায়ীদের প্রতিনিধি হিসেবে শ্রেষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিক অবস্থানের কথা। ব্যবসায়ীরা কি নিয়মিত পেশাদারীভাবে সংগঠিত হতেন? প্রাচীন আমলের কারিগর এবং বিবিধ বৃত্তিধারী গোষ্ঠী আপন আপন কারবারী সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। এইগুলি *শ্রেণী, গণ, সংঘ, পূগ, নিকায়* প্রভৃতি প্রাচীন পরিভাষা দ্বারা চিহ্নিত। বণিকদের এমন সংগঠনের পরিচয় বিশেষ পাওয়া যায় না। মহারাষ্ট্রের কার্লা গুহাবাসের একটি লেখতে (খ্রি পূ: দ্বিতীয় শতক) বলা হয়েছে *বণিকগ্রাম*-এর কথা। কোসাম্বী সার্থকভাবে দেখিয়েছিলেন কথাটির অর্থ বণিকদের জন্য নির্দিষ্ট গ্রামীণ বসতি নয়। *গ্রাম* শব্দ দ্বারা সমষ্টি বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বণিকদের সংগঠন।[৩২] গুজরাটে *বণিকগ্রামের* সক্রিয় ভূমিকা ষষ্ঠ শতকের প্রথম দুই দশকের উৎকীর্ণ তিনটি লেখতে স্থান পেয়েছে। *বণিকগ্রামের* সদস্যদের মধ্যে স্থানীয় (*বাস্তব্য*) ব্যবসায়ী যেমন আছেন, তেমনই আছেন দেশান্তরের বণিক (*চর্তুদিশাভ্যাগতবৈদেশ্য*)। তাঁদের সমষ্টিগত সিদ্ধান্ত ছিল একটি বিষ্ণুমন্দিরে নানাবিধ সামগ্রী দান করা। এই সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করার জন্যই তিনটি লেখ উৎকীর্ণ করা হলো।[৩৩] ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে পশ্চিম ভারতে *বণিকগ্রাম* নামক সংগঠনটি যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল তা বোঝা যাবে ৫৯২ খ্রি: একটি তাম্রশাসনের আলোয়। কাথিয়াওয়াড়ের স্থানীয় শাসক বিষ্ণুষেণ আপ্যায়ন এবং সমাদর করে এমনই একটি *বণিকগ্রামকে* স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। *বণিকগ্রামের* নিবেশনটি যাতে দীর্ঘমেয়াদী হয় তার জন্য বাহাত্তরটি শর্ত লিপিবদ্ধ হয়েছিল (*আচারস্থিতিপত্র*)[৩৪]।

বণিকগ্রাম নামক সংগঠনটি উত্তর এবং পশ্চিম ভারত থেকে এর পরবর্তীকালে কার্যত অদর্শন হয়ে গেল। কিন্তু তা *মণিগ্রামম্* নামে নিয়মিতভাবে দেখা যেতে লাগল দক্ষিণভারতে, বিশেষত খ্রি: নবম শতাব্দীর পর থেকে। কন্নড়, তামিল এবং তেলুগু লেখমালায় কেবলমাত্র *মণিগ্রামম্* নয়, *নানাদেশী, উভয়নানাদেশী, অঞ্জুবন্নম্* এবং *আণ্ণয়াবোলের ৫০০ স্বামী* নামধারী বণিক সংগঠনগুলির প্রভূত উল্লেখ দেখা যায়। *নানাদেশী* নামটিই সংগঠনটির দেশদেশান্তরে কর্মকাণ্ডের ইঙ্গিতবাহী। *উভয়নানাদেশী* বলতে বোধহয় বুঝিয়েছে যাঁরা স্থলপথে এবং জলপথে ব্যবসাসূত্রে যাতায়াত করতেন। *অঞ্জুবন্নম* শব্দটি কখনও কখনও কন্নড়, রাষ্ট্রকূট এবং তামিল লেখতে *হঞ্জমান* বলেও অভিহিত। যে প্রসঙ্গে *হঞ্জুমান* নামক বণিক সংগঠন। উল্লিখিত হয়েছে, তা বিচার করলে মনে হয় উপকূলের সমাজে আরব এবং ইহুদী বণিকদের সংগঠন দক্ষিণ ভারতীয় লেখমালায় *হঞ্জমান* এবং *অঞ্জবন্নম্* বলে পরিচিত ছিল। এই সংগঠনের উপস্থিতি প্রধানত পশ্চিম উপকূলেই অধিকতর দৃশ্যমান; কিন্তু পূর্ব উপকূলের বিশাখাপত্তনম (অন্ধ্রপ্রদেশ)-এও এই বিদেশী বণিকগোষ্ঠীর অস্তিত্ব লেখ-র সাক্ষ্যে দেখা যায়। বণিকসংগঠনগুলির সবচেয়ে প্রধান ও 'গুরুত্বপূর্ণ ছিল *আইয়াবোলের ৫০০ স্বামী*। আইয়াবোল কর্ণাটকের উত্তরাংশে আইহোলের সঙ্গে অভিন্ন। বণিক সংগঠনটির উত্থান হয়তো আইহোল থেকে ঘটে থাকবে। খ্রি: অষ্টম শতকের লেখমালায় *আইয়াবোলের ৫০০ স্বামীর* প্রথম উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু

আশ্চর্যের বিষয় এই সংগঠনটির সক্রিয় ভূমিকা নজরে আসে তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশে এবং কেরলে। কর্ণাটকে তাদের উপস্থিতি তুলনায় কম। দক্ষিণভারতের বণিক সংগঠনগুলির ক্রিয়াকলাপ ছড়িয়ে পড়েছিল শ্রীলঙ্কা, মায়ানমার, থাইল্যাণ্ড, সুমাত্রা এবং চীন পর্যন্ত। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে বণিক সংগঠনগুলির জারি করা লেখতে, যার অনেকগুলি প্রাগুক্ত বহির্ভারতীয় এলাকা থেকে পাওয়া গিয়েছে। এই লেখগুলিতে বণিক সংগঠনের ক্রিয়াকলাপের ব্যাপক স্তুতি করা হয়েছে, অনেকটা প্রশস্তির ভঙ্গীতে। সমকালীন উত্তরভারতের লেখতে বণিকদের ক্রিয়াকলাপের বিবরণ যখন স্থান পেয়েছে, তখন তার সঙ্গে সমসাময়িক রাজশক্তির প্রশস্তিও করা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের বণিক সংগঠনগুলি যখন তাদের খ্যাতির শিখরে, তখন চোল এবং পশ্চিমচালুক্যদের প্রবল পরাক্রান্ত দুই ক্ষমতা দক্ষিণ ভারতে কর্তৃত্ব করছেন। কিন্তু বণিক সংগঠনগুলির ক্রিয়াকর্মের বিশদ বিবরণের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতীয় রাজশক্তির কোনো প্রশস্তি দক্ষিণ ভারতীয় লেখগুলিতে নেই। এই ঘটনা দক্ষিণ ভারতীয় বণিক সংগঠনগুলির স্বতন্ত্র চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করে।[৩৫]

উত্তর ভারতে অনুরূপ বণিক সংগঠনের তথ্য যে খ্রি: অষ্টম শতক থেকে প্রায় বিরল, একথা আগেই বলেছি। বণিকরা বাণিজ্যকেন্দ্রে সমবেত হচ্ছেন ব্যবসায়ের কারণে বা কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে, এমন বর্ণনা অবশ্য সাহিত্যে এবং লেখমালায় পাওয়া যায়; তবে সেখানে বণিক সংগঠন গড়ে তোলার তাগিদ দেখা যাবে না। অষ্টম শতকের জৈন গ্রন্থ *কুবলয়মালা* শূর্পারক বন্দরে (মুম্বই-এর নিকটস্থ সোপারা) এমনই এক *বণিকমেলির* আলেখ্য উপহার দেয়। এই *বণিকমেলি* নিঃসন্দেহে কোনো পেশাদারী বণিক সংগঠন নয়। বণিকরা এখানে সমবেত হয়েছেন, অনেকটা আজকের ক্লাবের মতো। সেখানে তাঁরা বিশ্রাম্ভালাপ করছেন, খানিকটা গল্পগুজব চলছে, আবার ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় তথ্যাদিও তাঁরা চালাচালি করছেন। কাহিনীতে *বণিকমেলিটি* কাল্পনিক হলেও তার বর্ণনা বাস্তবসঞ্জাত।[৩৬]

উত্তরভারতের বণিকরা, বিশেষত অষ্টম-নবম শতক থেকে, নিজেদের পরিচয় রাখছেন পেশাদারী সংগঠনের মাধ্যমে নয়, বরং আপন আপন জাতির ভিতর দিয়ে। সীয়াডোনীতে যে *নেমকবণিজ*-এর আগে বলা হয়েছে, তিনি শেষ পর্যন্ত নিজেকে *নেমকজাতি* বলে গণ্য করেন। এমন কোনও জাতির মান্যতা বা অস্তিত্ব সরাসরি শাস্ত্রে সমর্থিত নয়। কিন্তু পুরুষানুক্রমিক নুনের ব্যবসায়ে সাফল্য, সাংস্কৃতিক কর্মে পৃষ্ঠপোষকতা ইত্যাদির কারণে লবণ ব্যবসায়ী বোধহয় সামাজিক মান্যতা এবং বিশিষ্টতা লাভে উৎসাহী হয়েছিলেন। সেই সামাজিক স্বাতন্ত্র্য তিনি জাতির মাপকাঠিতে প্রকাশ করছেন সীয়াডোনীর লেখতে। দশম থেকে ত্রয়োদশ শতকে রাজস্থানে বণিকরা এইভাবে তিনটি উল্লেখযোগ্য বংশ বা জাতি পরিচয় দিতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এইগুলি হলো ধূসর, ধর্কট, উয়েসল এবং শ্রীমাল বংশ। ৯৮৬ সালে এক বণিক নিজের পরিচয় দিচ্ছেন ধর্কটবংশীয় বলে। পরবর্তীকালে ধর্কট জাতির উদ্ভব নজরে আসে। বংশগত পরিচয় দেবার মধ্যে সম্ভবত বণিকদের এই মনোভাব কাজ করছে যে তাঁরা কুলশীল বিচারে সম্ভ্রান্ত এবং ভূঁইফোড় নন।[৩৭] দ্বাদশ শতকের শেষ দিকে শ্রেষ্ঠী যশোদেব একটি লেখতে তাঁর পরিচয় জানাচ্ছেন *শ্রীশ্রীমালবংশবিভূষণ* অর্থাৎ শ্রীমালবংশীয় বণিকদের মধ্যে তিনি রত্নপ্রতিম।[৩৮] শ্রীমাল বর্তমান রাজস্থানের ভিনমাল। এই বণিক তাঁর সামাজিক ঔৎকর্ষ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন একটি বিশিষ্ট বাণিজ্য কেন্দ্রের সূত্র ধরে এবং একটি বিশেষ বংশমর্যাদা দেখিয়ে। এই বংশমর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিক ব্যবসায়ে সাফল্য নিশ্চয়ই সহায়ক হয়েছিল। একইভাবে *উয়েসলজ্ঞাতীয়* বা *ওইস্বলজ্ঞাতীয়* বণিকদের থেকে মধ্যযুগে অসোয়াল জাতিভুক্ত বণিকদের উদ্ভব ঘটে।

অতএব শাস্ত্রবাক্য মেনে বণিকদের চটজলদি বৈশ্য বলে চিহ্নিত করলে অতিসরলীকৃত একটি ছবি

পাওয়া যাবে। উচ্চনীচ বিবিধ জাতি পরিচয় লাভের আকাঙ্খা বণিকদের মধ্যে সক্রিয় ছিল এবং তার ফলে একটি জটিলতর সামাজিক প্রক্রিয়ার আভাসই পাওয়া যাবে। গুপ্ত আমলে ৪৬৬-৪৬৭ খ্রি: নাগাদ গঙ্গা-যমুনা দোয়াবে অবস্থিত ইন্দ্রপুরে দুই বণিকভ্রাতা সূর্যমন্দিরে নগদ অর্থদান করেছিলেন। প্রাসঙ্গিক লেখতে তাদের পরিচয় *ক্ষত্রিয়বণিক* হিসেবে।[৩৯] শাস্ত্রীয় অনুজ্ঞা মানলে এটি প্রায় সোনার পাথর বাটির মতো মনে হয়। অথচ এটাই বাস্তব। আরও বড় কথা হলো বর্ণব্যবস্থার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখালেও বণিকভ্রাতাদের হাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয়নি। সেক্ষেত্রে তাঁদের মন্দিরের উদ্দেশে অর্থানুকূল্য দান প্রত্যাখ্যাত হওয়াই উচিত ছিল। তা বাস্তবে ঘটেনি। অর্থাৎ বাণিজ্যিক সাফল্য এবং পৃষ্ঠপোষকতার জোরে শাস্ত্রলঙ্ঘন কার্যত সামাজিক স্বীকৃতি পেয়ে গেল। প্রায় সমসাময়িক শূদ্রকের বিখ্যাত নাটক *মুদ্রারাক্ষসে* দেখি চারুদত্ত ছিলেন *বিপ্রসার্থ*। অর্থাৎ জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ হলেও বৃত্তিতে তিনি সার্থবাহ বা বণিক। চারুদত্তের বংশ পরিচয় দিতে গিয়ে শূদ্রক জানাচ্ছেন তাঁর পিতা এবং পিতামহও ছিলেন *বিপ্রসার্থ*।[৪০] চারুদত্তের বাস নগরের ব্রাহ্মণপল্লীতে নয়, বরং শ্রেষ্ঠী বা ব্যবসায়ীদের পাড়ায় (*শ্রেষ্ঠীচত্বরে*)।[৪১] ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করে এবং অব্রাহ্মণোচিত পেশায় বংশানুক্রমিকভাবে জড়িত থাকলেও চারুদত্তের মতো চরিত্রকে নাটকের নায়ক করে তুলতে শূদ্রক পিছপা হননি।

॥ ৬ ॥

প্রাচীন ভারতের বণিক সমাজের আলোচনায় বিদেশী বণিকদের কথা না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে। সংস্কৃত এবং অন্যান্য দেশীয় তথ্যসূত্রে বিদেশী বণিক প্রায়ই যবন বলে আখ্যাত। এইসব বিদেশী বণিকরা প্রায়শ উপকূলবর্তী বন্দর নগরে অথবা কোনো নগরে সাময়িক/স্থায়ী বসতি তৈরি করতেন। রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য যখন তুঙ্গে তখন বিখ্যাত বন্দর মুজিরিসে গড়ে উঠেছিল অগাস্টাস-এর মন্দির।[৪২] এই মন্দিরের প্রাসঙ্গিকতা বুঝতে হবে মালাবার উপকূলে বসবাসকারী ভূমধ্যসাগরীয় বণিকদের পরিপ্রেক্ষিতে। তামিল সঙ্গম সাহিত্যে এঁরা যবন বণিক বলেই অভিহিত। বিখ্যাত তামিল মহাকাব্য *শিলপ্পাদিকারম্* অনুসারে চোল এলাকার বন্দর-নগর কাবেরীপট্টিনমে যবনদের জন্য একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল চিহ্নিত ছিল।[৪৩] কোঙ্কন উপকূলের বন্দরগুলিতেও ভূমধ্যসাগরীয় যবন বণিকরা সম্ভবত নিয়মিত আসতেন। তার অন্যতম প্রকাশ দাক্ষিণাত্যের একাধিক বৌদ্ধ গুহাবাসে *ধম্মযবনদের* দানকর্মে দেখা যাবে। সুদূর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত চিলাস এবং গিলগিট অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে খ্রি: প্রথম তিন শতক ধরে বহু দান লেখ। এই লেখগুলি যেমন খরোষ্ঠী হরফে লেখা, তেমনই আছে চীনা ও সোগদীয় লেখ। ঐ দুই ভাষা ব্যবহারকারী বিদেশী বণিকদের সঙ্গে স্থানীয় বণিকদের সহাবস্থানের সাক্ষ্য বহন করছে এই লেখগুলি। ওই অঞ্চলেই অ-ভারতীয় পোষাকে সজ্জিত ব্যক্তিদের চিত্র পর্বতগাত্রে পাওয়া যায়, যাঁরা স্তূপের আরাধনা করছেন।[৪৪] বণিকদের ক্রিয়াকলাপে শুধু বাণিজ্যিক লেনদেনই নয়, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় ধ্যানধারণার বিনিময়ও চলতে থাকে। বণিকদের মাধ্যমে যে সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন সম্ভব হলো তারই দরুন বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের প্রসিদ্ধ প্রত্নক্ষেত্র নাগার্জুনকোণ্ডাতে আবিষ্কৃত হয়েছে রোমান অ্যাম্‌ফিথিয়েটারের মতো ক্রীড়াঙ্গন।[৪৫] দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে সংস্কৃত ভাষা, বৌদ্ধ, শৈব এবং বৈষ্ণব ধর্ম এবং ভারতীয় শিল্পকলার যে প্রসার ঘটেছিল তাতে বণিক সমাজের অবদান কম নয়। দক্ষিণ ভারতীয় বণিকদের লেখগুলি তার বিশ্বস্ত আলেখ্য তুলে ধরে।

খ্রি: নবম/দশক শতাব্দী থেকে ভারত মহাসাগরের বাণিজ্যে ভারতের উত্তরোত্তর গুরুত্ব বৃদ্ধির কারণে ভারতে— বিশেষত পশ্চিম উপকূলে নিয়মিত আসতে থাকেন ইহুদী বণিকরা এবং ইসলাম

ধর্মাবলম্বী বণিক সমাজ। ইহুদী বণিক এব্রাহাম বেন ইশু তার প্রকৃষ্ট নজির। সুদূর টিউনিসিয়া থেকে আগত এব্রাহাম ১১৩২ থেকে ১১৪৯ পর্যন্ত কাটিয়ে গিয়েছিলেন অলমঞ্জুরুর বা ম্যাঙ্গালোরে। স্থানীয় এক রমণীর পাণিগ্রহণও তিনি করেন। ইহুদী বণিকদের পত্রগুচ্ছে বণিকদের আপন কণ্ঠস্বর আপনি শুনতে পাবেন।[৪৬] এঁদের মধ্যে ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রেষারেষি, এমন কি মামলা মোকদ্দমা নিশ্চয়ই চলত। কিন্তু ইহুদী, মুসলমান এবং ভারতীয় বণিক সমাজের অসামান্য সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের অনুপম দলিল এই চিঠিগুলি। এমনই এক ইহুদী বণিক যখন থানার কাছাকাছি অঞ্চলে বোম্বেটেদের দ্বারা উপদ্রুত হন, তখন তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন ম্যাঙ্গালোর নিবাসী অপর ইহুদী বণিক। দ্বিতীয় বণিক তাঁর বিপন্ন সহকর্মীকে আশ্বস্ত করছেন এই বলে যে প্রয়োজনে ভারতীয় নাখুদা তিনবুর কাছ থেকে বিপন্ন বণিকটি অর্থ চেয়ে নিতে পারেন, কারণ তিনবুর সঙ্গে তার সম্পর্ক বিশ্বস্ততা এবং ভ্রাতৃত্বের দ্বারা আবদ্ধ।[৪৭]

দশম এবং একাদশ শতকে কোঙ্কনের উপকূলের উত্তরাংশে সঞ্জন বন্দরে ছিলেন যেমন ভারতীয় বণিক, তেমনই ছিলেন আরব মুসলমান বণিক। সঞ্জন বন্দরের কথা জানা যায় অন্তত পাঁচপাঁচটি তাম্র শাসনে। আরব বণিক উল্লিখিত হয়েছেন তাজ্জিক নামে। এঁদের আরবী নাম সংস্কৃতায়িত হয়েছে, যেমন আলি হয়েছেন অল্লীয়, মহম্মদ মধুমতি এবং শাহরিয়ার শহরিয়ারহার। চমকপ্রদ ঘটনা হলো স্থানীয় একটি দেবী মন্দিরে যখন রাজকীয় আদেশ বলে জমিজমা দান করা হচ্ছিল, তখন ওই সামাজিক সাংস্কৃতিক ঘটনার সাক্ষী হিসেবে স্থানীয় উপকূলের সমাজের অন্যতম শরিক রূপে ওই আরব মুসলমান বণিকদের উপস্থিতি দেখা যায়।[৪৮] দশম শতকের গোড়ায় অলমাসুদী সৈমুর বন্দরে বহু ওমানী, সিরাফী এবং বাগদাদী বণিকের বসতি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন।[৪৯] রাষ্ট্রকূট শাসকের আনুকূল্যে যে তাঁদের জন্য মসজিদ নির্মিত হয়েছিল, তার সপ্রশংস উল্লেখ অলমাসুদী তাঁর বর্ণনায় রেখেছেন। একই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গুজরাটেও বিরাজমান। গুজরাটের চৌলুক্যবংশীয় শাসকরা আরব মুসলমান বণিকদের ব্যবসাসূত্রে তাঁদের এলাকায় আসার ব্যাপারে সদর্থক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েছিলেন। আরববণিকদের বসতি গড়ে তোলায় তাঁদের সমর্থন আমাদের নজরে আসে। উপকূল এলাকা জলদস্যুদের দ্বারা উপদ্রুত হলে আরব বণিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চৌলুক্য প্রশাসন যে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন তার তারিফ করতেই হয়।[৫০] আবার অন্যদিকে গুজরাটি বণিক জগডু যেমন বহু দানধ্যান করেছিলেন জৈন প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যে, তেমনই ইসমাইলী সম্প্রদায়ের জন্য *মসীতি* বা মসজিদ তৈরিতেও তাঁর সহায়তার কথা জানা যায় *জগডুচরিত* নামক গ্রন্থে।[৫১]

তবে এই ক্ষেত্রে সেরা নজিরটি এসেছে গুজরাটের সোমনাথ থেকে। সোমনাথ একাধারে শ্রুতকীর্তি শৈব তীর্থ। অন্য দিকে তা ছিল একটি প্রাণবন্ত বন্দর। ১২৬৪ সালে এই বন্দরে এসেছিলেন পারস্য উপসাগরের বিখ্যাত বন্দর হোর্মুজ থেকে এক জাহাজী বণিক—নাখুদা নুরউদ্দীন ফিরুজ। ধর্মপ্রাণ মুসলমান এই জাহাজী বণিক সোমনাথে একটি *মিজিগিতি* বা মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সহায়তা ব্যতীত হোর্মুজী বণিকের পক্ষে এই কাজ করা অসম্ভব ছিল। ১২৬৪ সালে উৎকীর্ণ দ্বিভাষী (সংস্কৃত এবং আরবী) লেখটি হোর্মুজী নাখুদা এবং সোমনাথের বিশিষ্ট কয়েকজন বণিকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগের এক বিস্ময়কর দলিল। স্থানীয় বণিকদের সহায়তায় মসজিদের জন্য প্রয়োজনীয় জমি যোগাড় হলো, এবং মসজিদ পরে নির্মিতও হলো। স্থানীয় বণিকদের মধ্যে বিশেষ করে ছাড় ছিলেন নুরউদ্দীনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এতটাই ঘনিষ্ঠ তাঁদের সম্পর্ক যে তাঁদের পরিচয় সংস্কৃত লেখ অনুযায়ী, *ধর্মবান্ধব*, বা ন্যায়নিষ্ঠ বন্ধু। সোমনাথ নগরের পৌর প্রশাসন সমগ্র ব্যাপারে অনুমোদন জানায়; এই পৌর প্রশাসনের শীর্ষে ছিলেন এক শৈব পাশুপতাচার্য। এর পরে ক্রমান্বয়ে প্রাদেশিক

শাসক এবং চৌলুক্য রাজা বাঘেল অর্জুনদেবও মসজিদ নির্মাণের পুরো প্রকল্পটিতে অনুমোদন জানিয়েছিলেন।[৫২] ধর্ম ও সংস্কৃতিগত ভিন্নতা সত্ত্বেও এবং ভিন্নতাকে মেনে নিয়েই বিদেশী বণিকদের সাগ্রহে আহ্বান জানানোর এক দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস প্রাচীন ভারতে দেখা যায়।

॥ ৭ ॥

প্রাচীন ভারতীয় বণিকদের আর্থিক সমৃদ্ধির আভাস নানা তথ্যসূত্রে বিবৃত, হয়তো সেই বর্ণনায় এক ধরণের প্রথাগত পৌনঃপুনিকতাও আছে। এই অর্থই বণিকদের সামাজিক সম্ভ্রম আদায়ের প্রধান উপকরণ। কারণ ব্রাহ্মণ্য ধারণায় বণিকের বর্ণজাতিগত অবস্থান বিশেষ উজ্জ্বল নয়। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে বিবিধ জনহিতকর ক্রিয়াকলাপে অংশ নিয়ে বা পৃষ্ঠপোষকতা করে বণিক যে মর্যাদা পেতেন, তা শাস্ত্রীয় বচনের মারফৎ স্পষ্ট বোঝা যাবে না। শাস্ত্রনির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক মর্যাদার সঙ্গে এক্ষেত্রে বাস্তব মর্যাদার ফারাক অনস্বীকার্য। প্রাচীন ভারতের বণিককে আপন মর্যাদা এবং ক্ষমতা বাড়াবার তাগিদে অবশ্য খুব কম সময়েই রাজনৈতিক জগতে প্রবেশ করতে দেখা যায়। অতি সম্পন্ন বণিক, বিশেষত শ্রেষ্ঠীরা, বণিক সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে হয়তো কখনও কখনও প্রশাসনিক কাজে শামিল হতেন বা ক্ষমতার অলিন্দে সঞ্চরমান ছিলেন। বৌদ্ধ কাহিনীর *সেট্‌ঠিদের* ক্ষেত্রে এর নজির পাওয়া যাবে। উত্তরবঙ্গে গুপ্ত শাসনকালে জেলা পর্যায়ের প্রশাসনে *নগর শ্রেষ্ঠী* এবং *সার্থবাহরা* যুক্ত থাকতেন। উপকূলের সমাজে ধনী শ্রেষ্ঠী এবং *নৌবিত্তকদের* অমাত্যরূপে এবং পঞ্চকুলের সদস্য হিসেবেও দেখা যায়। গুজরাটের শ্রীস্তম্ভ (বর্তমানের ক্যাম্বে) বন্দরের প্রশাসনিক দায়িত্বে ছিলেন মহামাত্য বস্তুপাল। যিনি জন্মেছিলেন এক বণিক পরিবারে। দক্ষিণভারতেও নগর প্রশাসনে স্থানীয় বণিক সংগঠনগুলি সক্রিয় ভূমিকা নিত। এমনকি নিজস্ব সুরক্ষার জন্য তাদের সশস্ত্র বাহিনীও যে ছিল, এমন কথা সোচ্চারে ঘোষণা করে প্রাসঙ্গিক তামিল লেখগুলি। কিন্তু খ্রি: ১৫০০ থেকে ১৯০০ পর্যন্ত বণিকের মানদণ্ডকে ক্রমান্বয়ে রাজদণ্ডে পরিণত করার যে সচেতন প্রয়াস ইওরোপীয়রা নিয়েছিলেন, তেমন কোনো প্রবণতা প্রাচীন ভারতের বণিক সমাজে বিরাজ করত না।

টীকা এবং সূত্র নির্দেশিকা :

১। রোমিলা থাপার, *আর্লি ইন্ডিয়া ফ্রম দ্য জেনেসিস টু এ.ডি. ১৩০০*, লন্ডন: ভাইকিং, ২০০২; ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, *দ্য মেকিং অব আর্লি মিডিভ্যাল ইন্ডিয়া*, নতুন দিল্লী: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৪; ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, *স্টাডিং আর্লি ইন্ডিয়া*, নতুন দিল্লী: পার্মানেন্ট ব্ল্যাক, ২০০৩; রণবীর চক্রবর্তী, *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে*. কলকাতা: আনন্দ, ২০০২ (দ্বিতীয় সংস্করণ); রণবীর চক্রবর্তী (সম্পা.), *ট্রেড ইন আর্লি ইন্ডিয়া*, নতুন দিল্লী: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ২০০১।

২। শিরিন রত্নাগর, *এনকাউন্টার্স: আর্লি ট্রেড অব দ্য হরপ্পানস*, নতুন দিল্লী: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮১।

৩। আর. এস. বিশট্. 'এক্সক্যাভেশনস অ্যাট বানাওয়ালি ১৯৭৪-৭৭', গ্রেগরী এল. পোসেল (সম্পা.), *হরপ্পান সিভিলাইজেশন, এ রিসেন্ট পার্সপেকটিভ*, নতুন দিল্লী: ইন্ডিয়া বুক হাউস, ১৯৯২ : ১১৩-২৪।

৪। শিরিন রত্নাগর, *এনকাউন্টার্স*।

৫। ই. সি. এল. ড্যুরিং-কাসপার্স, 'ইন্টারকালচারাল অ্যাণ্ড মার্কেন্টাইল কনট্যাকটস বিটুইন দ্য অ্যারাবিয়ান গালফ এ্যাণ্ড সাউথ এশিয়া', *প্রসিডিংস অব দ্য সেমিনার অন অ্যারাবিয়ান স্টাডিজ*, ২২, ১৯৯২ : ৩-২৮।

৬। *মরিৎজিও তোসি, 'দ্য হরপ্পান সিভিলাইজেশন বিয়ন্ড দ্য ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট', রণবীর চক্রবর্তী (সম্পা.), ট্রেড ইন আর্লি ইন্ডিয়া : ১২৮-৫১। অক্কাদীয় একটি নামমুদ্রায় প্রশাসক এবং অভ্যাগতদের* সঙ্গে এই দোভাষী দৃশ্যমান। প্রবন্ধে ১৩৬ পৃ: দ্রষ্টব্য।

৭। ডি. ডি. কোসাম্বী, *দ্য কালচার অ্যান্ড সিভিলাইজেশন অব এনশেন্ট ইন্ডিয়া ইন হিস্টোরিক্যাল আউটলাইন*, লন্ডন: রুটলেজ, ১৯৬৫।

৮। রোমিলা থাপার, *ফ্রম লিনিয়েজ টু স্টেট*, বম্বে, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৪।

৯। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বৈশ্যকে দেখানো হয়েছে এখন এক ব্যক্তি হিসেবে যাকে যথেচ্ছ অত্যাচার করা যায় (*যথাকামপ্রেষ্য*), যথেচ্ছ উৎপাটিত করা যায় (*যথাকামোত্থাপ্য*)। শূদ্রের সম্বন্ধে প্রায় একই হেয় মনোভাব। কেবল শূদ্রকে যথেচ্ছ হত্যা করা যায় (*যথাকামবধ্য*), যে বৈরিতা বৈশ্য সম্বন্ধে এত প্রকট নয়। বৈশ্য যেহেতু সমাজের প্রধান ধনোৎপাদক গোষ্ঠী, তাই *বলি* জাতীয় আদায় বৈশ্যের কাছ থেকেই রাজা দাবি করেন— পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে তার প্রমাণ স্পষ্ট। এইজন্য বৈশ্য *বলিকৃৎ*, বা বলির যোগানদার, এবং রাজা *বলিহৃৎ* অর্থাৎ বলি আহরণকারী। রামশরণ শর্মা, *মেটেরিয়াল কালচার অ্যান্ড সোশ্যাল ফর্মেশন ইন এনশেন্ট ইন্ডিয়া*, নতুন দিল্লী: ম্যাকমিলান, ১৯৮৩, রাজকীয় ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দ্রষ্টব্য; কুমকুম রায়, *দ্য ইমার্জেন্স অব মনার্কি ইন ইন্ডিয়া আপ টু ফোর্থ সেঞ্চুরি বি. সি.*, নতুন দিল্লী: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৭।

১০। আর. পি. কাঙ্গলে (সম্পা. এবং অনূ)। *কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র*, তিনখণ্ডে, বম্বে: ইউনিভার্সিটি অব বম্বে। ১৯৬৫-৭২; *কন্টকশোধন* অংশের *বৈদেহকরক্ষণ* অধ্যায় বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য।

১১। রণবীর চক্রবর্তী, *ট্রেড অ্যান্ড ট্রেডার্স ইন আর্লি ইন্ডিয়ান সোসাইটি*, নতুন দিল্লী: মনোহর, ২০০২।

১২। বুদ্ধের সমকালীন উত্তর ভারতে, বিশেষত গঙ্গা উপত্যকায়, যখন বহু নগর দেখা দিচ্ছে, তখন *বৌধায়ন ধর্মসূত্রে* নগর সম্বন্ধে অনীহা প্রকট। নগরে যাওয়া পাপ, গেলে প্রায়শ্চিত্ত করে শুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, কারণ নগরে সর্বক্ষণই *অনধ্যায়* চলছে (অর্থাৎ বেদচর্চা নগরে অচল)। অমলানন্দ ঘোষ, *দ্য সিটি ইন আর্লি হিস্টোরিক্যাল ইন্ডিয়া*, শিমলা: ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড স্টাডি, ১৯৭৩, দ্রষ্টব্য।

১৩। নরেন্দ্র ওয়াগলে, *সোসাইটি অ্যাট দ্য টাইম অব দ্য বুদ্ধ*, বম্বে : এশিয়া পাবলিশিং ১৯৬৬; রণবীর চক্রবর্তী *প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে*।

১৪। আর. চম্পকলক্ষ্মী *ট্রেড, ইডিওলজি অ্যান্ড আর্বানাইজেশন: সাউথ ইন্ডিয়া ৩০০ বি.সি.-এ.ডি. ১৩০০*, নতুন দিল্লী: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৬।

১৫। সিয়াডোনী লেখ-র সম্পাদিত পাঠ পাওয়া যাবে *এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা*, ১, ১৮৯২।

১৬। আর. চম্পকলক্ষ্মী, *ট্রেড, ইডিওলজি অ্যান্ড আর্বানাইজেশন*।

১৭। *তদেব*।

১৮। অতীন্দ্রনাথ বসু, *সোশ্যাল অ্যান্ড রুর‍্যাল ইকনমি অব নর্দান ইন্ডিয়া*, কলকাতা: ফার্মা কে. এম. মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৭; দ্বিতীয় খণ্ড।

১৯। নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস*, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, ১৯৮০, প্রথম খণ্ড।

২০। ভি. এস. অগ্রবাল, *ইন্ডিয়া অ্যাজ নোন টু পাণিনি*, লক্ষ্ণৌ, ১৯৫৩।

২১। পেহোয়া লেখটির সম্পাদিত পাঠের জন্য দ্রষ্টব্য *এপিগ্রফিয়া ইন্ডিকা*, ১, ১৮৯২ প্রাসঙ্গিক আলোচনা পাওয়া যাবে ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, *দ্য মেকিং অব আর্লি মিডিভ্যাল ইন্ডিয়া*: চিত্ররেখা গুপ্ত।

২২। এ. আপ্পাদোরাই, *ইকনমিক কন্ডিশন ইন সাউথ ইন্ডিয়া ১০০০-১৫০০*। মাদ্রাজ: ইউনির্ভাসিটি অব মাদ্রাজ, ১৯৩৬, দ্বিতীয় খণ্ড।

২৩। *রণবীর চক্রবর্তী*, '*হর্সট্রেড অ্যান্ড পাইরেসি অ্যাট টানা (থানা, মহারাষ্ট্র, ইন্ডিয়া): গ্লিনিংস ফ্রম* মার্কোপোলো', *জর্নাল অব দ্য ইকনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল হিস্ট্রি অব দ্য ওরিয়েন্ট*, ৩৪, ১৯৯১: ১৫৯-৮২।

২৪। ঘোড়া আমদানি, বিশেষত সমুদ্রপথে, আলোচিত হয়েছে মার্কোপোলো (অনুবাদ এইচ. ইয়ুল এবং এইচ. কর্ডিয়ায়, লন্ডন: জেমস মারে, ১৯০৩, দুই খণ্ডে) এবং ইবন বতুতা (এইচ. এ. আর গিব, *ট্রাভেলস অব ইবন বতুতা ইন এশিয়া অ্যান্ড আফ্রিকা*, লন্ডন: রুটলেজ, ১৯২৯)-র বিবরণে।

২৫। নৌ বিত্তক / নাখুদা নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন রণবীর চক্রবর্তী, 'নাখুদাস অ্যান্ড নৌবিত্তকস: শিপওনিং মার্চেন্টস ইন দ্য ওয়েস্ট কোস্ট অব ইন্ডিয়া (১০০০-১৫০০)', *জর্নাল অব দ্য ইকনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল হিস্ট্রি অব দ্য ওরিয়েন্ট*, ৪২, ২০০০: ৩৪-৬৪; রণবীর চক্রবর্তী 'সীফেয়ারিংস, শিপস অ্যান্ড শিপ ওনার্স: ইন্ডিয়া অ্যান্ড দ্য ইন্ডিয়ান ওশান (৭০০-১৫০০)', ডেভিড পার্কিন এবং রুথ বার্নস (সম্পা.) *শিপস অ্যান্ড দ্য ডেভেলপমেন্ট অব ম্যারিটাইম টেকনোলজি ইন দ্য ইন্ডিয়ান ওশান*, লন্ডন: রুটলেজ-কার্জন, ২০০২: ২৮-৬১।

২৬। এস. ডি. গয়টাইন, *লেটার্স অব মিডিভ্যাল জুইশ ট্রেডার্স*, প্রিন্সটন: প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৭৩: ১৮৫-৯২।

২৭। গয়টাইন, লেটার্স : ৬২-৬৫।

২৮। ভি ভি মিরাশি, *করপাস ইনসক্রিপশনাম ইন্ডিকেরাম*, ৬, নতুন দিল্লী: আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া, ১৯৭৮: লেখটির বিশদ আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য রণবীর চক্রবর্তী, 'কোস্টাল ট্রেড অ্যান্ড ভয়েজেস ইন কোঙ্কন: দ্য আর্লি মিডিভ্যাল সিনারিও', *দ্য ইন্ডিয়ান ইকনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল হিস্ট্রি রিভিয়্যু*, ৩৫, ১৯৯৮: ৯৭-১২৪।

২৯। জি. ব্যুলর (সম্পা), *জগডুচরিত*, ভিয়েনা, ১৮৯৯।

৩০। আইভো ফাইজার, 'দ্য প্রবলেম আ দ্য সেটঠি ইন বুদ্ধিস্ট জাতকস', রণবীব চক্রবর্তী (সম্পা.) *ট্রেড ইন আর্লি ইন্ডিয়া*: ১৬৬-৯৮; রোমিলা থাপার, *ফ্রম লিনিয়েজ টু স্টেট*।

৩১। রিচার্ড ফিক, *সোশ্যাল অর্গানাইজেশন ইন নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ডিউরিং দা বুদ্ধস টাইম*, বারাণসী: ইন্ডোলজিকাল বুক হাউস, ১৯৭৪ (পুনর্মুদ্রিত)।

৩২। ডি. ডি. কোসাম্বী, 'ধেনুকাকট', *জর্নাল অব দ্য বম্বে ব্রাঞ্চ অব দ্য রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি*, ৩০, ১৯৫৫: ৫০-৭১।

৩৩। গুজরাটের সঞ্জেলি থেকে পাওয়া হূণ রাজা তোরমানের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ এই তিনটি তাম্র শাসন অনুবাদ সহ সম্পাদনা প্রথম করেন আর. এন. মিশ্র এবং এ. এম. ঠক্কর, *এম. এস. ইউনিভার্সিটি কপার প্লেটস অব তোরমান*, বড়োদা: মহারাজ সয়াজী রাও ইউনিভার্সিটি, ১৯৭৮। পরবর্তীকালে তাম্র শাসনগুলির নতুন সম্পাদনা ও পাঠ দেন কে. ভি. রমেশ, 'থ্রি আর্লি চার্টার্স ফ্রম সঞ্জেলি,' *এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা*, ৪০, ১৯৮৬: ১৭৫-৮৬। দক্ষ পুরালেখবেত্তা হলেও রমেশ 'বণিকগ্রাম' পরিভাষাটির প্রকৃত তাৎপর্য বুঝতেই পারেননি। তিনি আক্ষরিক অর্থে এটিকে গ্রহণ করেছেন বণিকদের জন্য একটি গ্রামীণ বসতি হিসেব। এই অর্থ ভ্রান্ত। তিনি কোসাম্বী এবং দীনেশচন্দ্র সরকারের দেওয়া ব্যাখ্যা সম্বন্ধে অনবহিত বলে মনে হয়। লেখ তিনটির ভিত্তিতে বিশদ আলোচনা করেছেন রণবীর চক্রবর্তী, 'থ্রি কপার প্লেটস অব এডি সিক্সথ সেঞ্চুরি: গ্লিম্পসেস অব সোশিও ইকনমিক অ্যান্ড কালচারাল লাইফ ইন ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া', সাউথ এশিয়ান আর্কিওলজি কনফারেন্স, ১৯৯৯, লাইডেন-এ পঠিত (অপ্রকাশিত)।

৩৪। দীনেশচন্দ্র সরকার, 'এ চার্টার অব বিষ্ণুষেণ এডি ৫৯২', *এপিগ্রাফিয়া* ইন্ডিকা, ৩০, ১৯৫৫:

১৬৩-৮১; অনেকটাই ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন ডি. ডি. কোসাম্বী তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে 'ইন্ডিয়ান ফিউডাল ট্রেড চার্টার্স,' *জর্নাল অব দ্য ইকনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল হিস্ট্রি অব দ্য ওরিয়েন্ট*, ৪, ১৯৫৮: ২৮১-৯৩।

৩৫। তামিল বণিক সংগঠনগুলির সক্রিয় ভূমিকা মূর্ত হয়েছে বহু সংখ্যক লেখতে। দ্রষ্টব্য, নোবুরু কারাশিমা (সম্পা.), *এনশেন্ট অ্যান্ড মিডিভ্যাল কর্মাশিয়াল অ্যাকটিভিটিজ ইন দ্য ইন্ডিয়ান ওশান: টেস্টিমনি অব ইনসক্রিপশনস অ্যান্ড সেরামিক শার্ডস*, টোকিও : তাইশো ইউনিভার্সিটি, ২০০২। আকর তথ্যসূত্রের জন্য অপরিহার্য এই গ্রন্থ। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ (নোবুরু কারাশিমা এবং ওয়াই. সুব্বারায়লু 'আইন্নুরুবার: এ সুপ্রা-লোকাল অর্গানাইজেশন অব সাউথ ইন্ডিয়ান অ্যান্ড শ্রীলঙ্কান মার্চেন্টস') বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এছাড়া পঠিতব্য মীরা আব্রাহাম, *টু মিডিভ্যাল মার্চেন্ট গিল্ডস অব সাউথ ইন্ডিয়া*, নতুন দিল্লী; মনোহর, ১৯৮৮।

৩৬। এ. এন. উপাধ্যায় (সম্পা.) *কুবলয়মালা অব উদ্যোতনসূরি*, বারাণসী, ১৯৬৯।

৩৭। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, *মেকিং অব আর্লি মিডিভ্যাল ইন্ডিয়া*, বিশেষ করে দ্রষ্টব্য 'মার্কেটস অ্যান্ড মার্চেন্টস ইন আর্লি মিডিভ্যাল রাজস্থান' শীর্ষক অধ্যায়টি।

৩৮। *তদেব*।

৩৯। দীনেশচন্দ্র সরকার। *সিলেক্ট ইনসক্রিপশনস বিয়ারিং অন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড সিভিলাইজেশন*, ১, কলকাতা: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৫ (ইন্দোর কপারপ্লেট অব দ্য টাইম অব স্কন্দ গুপ্ত, দ্রষ্টব্য)।

৪০। শূদ্রক, *মৃচ্ছকটিক*, বঙ্গানুবাদ, সুকুমারী ভট্টাচার্য, দিল্লী: সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৮৫, প্রথম অঙ্ক।

৪১। *তদেব*।

৪২। এই মন্দিরটির উল্লেখ পাওয়া যাবে *ট্যাবুলা পিউটেনজেরিয়ানা*-তে (সম্পা. মে. মিলার, বার্লিন, ১৯৬৫)।

৪৩। চম্পকলক্ষ্মী, *ট্রেড, ইডিওলজি, আর্বানাইজেশন*; ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, *স্টাডিং আর্লি ইন্ডিয়া* (বিশেষত 'দ্য সিটি ইন আর্লি ইন্ডিয়া: পার্সপেকটিভস ফ্রম দ্য টেক্সটস' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য)।

৪৪। কার্লয়েটমার, *অ্যান্টিকুইটিজ ফ্রম নর্দান পাকিস্তান*, ১, মিউনিখ, ১৯৮৯।

৪৫। এইচ. সরকার এবং বি. এন. মিশ্র, *নাগার্জুনকোণ্ডা*, নতুন দিল্লী: আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া, ১৯৭২।

৪৬। ইহুদী বণিকদের ব্যবসায়িক চিঠি ও দলিলপত্রের শ্রেষ্ঠ গবেষক এস. ডি. গয়টাইন, *লেটার্স; এ মেডিটেরানিয়ান সোসাইটি*, ছয়খণ্ডে, বার্কলে, ১৯৬৬-৯৬।
ভারতযাত্রী ইহুদী বণিকরা এইসব চিঠিতে মুসাফির উল হিন্দ বলে অভিহিত, গয়টাইন যাঁদের 'ইন্ডিয়া ট্রেডার' বলে অভিহিত করেছেন। গয়টাইনকৃত এই জাতীয় চিঠির একটি নমুনা পাওয়া যাবে রণবীর চক্রবর্তী (সম্পা.) *ট্রেড ইন আর্লি ইন্ডিয়া*: ৪১৬-৩৪; অপর দুইটি দলিলের সটীক অনুবাদের জন্য *বুলেটিন অব দ্য স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ*, ১৬ (১৯৫৪), পৃ: ২৪৭-৫৭ এবং ৪৮ (১৯৮৭), পৃ: ৪৪৮-৬৪ দ্রষ্টব্য। ইহুদী বণিকদের ভারতীয় বাণিজ্যে ভূমিকা আলোচনা করেছেন রণবীর চক্রবর্তী· 'রিচিং আউট টু দ্য ডিসটান্ট শোরস', (প্রকাশ আসন্ন)।

৪৭। গয়টাইন, *লেটার্স*: ৬৫।

৪৮। রণবীর চক্রবর্তী, *ট্রেড ইন আর্লি ইন্ডিয়া*: ২৫৭-৮১।

৪৯। এস. মকবুল আহমেদ, 'অল মাসুদী অন দ্য কিংস অব ইন্ডিয়া', এস. মকবুল আহমেদ এবং এ. রহমান (সম্পা.), *অলমাসুদী মিলেনারি কমমেমোরেসন ভল্যুম*, আলিগড়, ১৯৬০: ৯৭-১১২।

৫০। ভি. কে. জৈন, *ট্রেড অ্যান্ড ট্রেডার্স ইন ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া*, নতুন দিল্লী : মুনশীরাম মনোহরলাল, ১৯৮৯।

৫১। জগড়ুচরিত, সম্পা. জি. ব্যুলর।

৫২। অসামান্য এই দ্বিভাষী লেখটির সংস্কৃত অংশের পাঠ দিয়েছিলেন ই. হুলশৎজ, ইন্ডিয়ান অ্যান্টিকুয়ারি, ১১, ১৮৮২: ২৪১-৪৫। পরবর্তী পাঠটি দিনেশচন্দ্র সরকারকৃত, *এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা*, ৩৪, ১৯৫৭-৫৮: ১৪১-৫০; আরবী অংশটির পাঠ এবং অনুবাদ করেন জেড. এ. দেশাই, *এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা, অ্যারাবিক অ্যান্ড পার্সিয়ান সাপলিমেন্ট*, ১৯৬২-৬৩; ১৭-২৪। বিশ্লেষণের জন্য পঠিতব্য, ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়, *রিপ্রেজেন্টিং দ্য আদার? স্যাংস্কৃট সোর্সেস অ্যান্ড দ্য মুসলিমস*, নতুন দিল্লী : মনোহর, ১৯৯৮; রণবীর চক্রবর্তী, *ট্রেড অ্যান্ড ট্রেডার্স: ২২০-৪২;* নতুন দিল্লী: রোমিলা থাপার, *সোমনাথ: দ্য মেনি ভয়েসেস অব এ হিস্ট্রি*, নতুন দিল্লী: পেঙ্গুইন, ২০০৪।

পদ্মিনী · নির্মাণ ও পাঠভেদ

রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়

["এ কি দেবী না পদ্মিনী? পদ্মিনী না দেবী?" —অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর [১]]

ইতিহাসে পদ্মিনী নেই, কিন্তু পদ্মিনীর একটি ইতিহাস আছে।[২] বাঙালীদের কাছে পদ্মিনীর আবির্ভাব বিশেষভাবে অর্থবহ। এই আলোচনায় পদ্মিনীর উপস্থিতি ও অনুপস্থিতিকে খতিয়ে দেখা হয়েছে বাংলার সেই অপঠিত ইতিহাসের প্রেক্ষায়।

পদ্মিনী আখ্যানের পটভূমি ভারতীয় ইতিহাসের মধ্যযুগ : আলাউদ্দিন খিলজির শাসনকাল (১২৯৬-১৩৯৪)। ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি চিতোর আক্রমণ করেন। সেই সময় চিতোরের রাণা ছিলেন রত্নসেন। যুদ্ধে রত্নসেনের পরাজয় হয় ও চিতোর দুর্গ বেশ কিছুদিনের মতো আলাউদ্দিনের কবলে থাকে। আলাউদ্দিন খিলজি নিঃসন্দেহে একজন ঐতিহাসিক চরিত্র। সন তারিখ মেলালে তাঁর চিতোরের অধিগ্রহণ প্রমাণ করা কঠিন নয়। রাজ্য জয়, কর আদায়, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সরল রেখায় চিহ্নিত এই ইতিহাসের মধ্যে পদ্মিনীর আবির্ভাব রোমান্সের ছোঁয়া আনে। আবার সমস্যার সৃষ্টিও করে। দূর সিংহল থেকে এক রাজকন্যা পৌঁছে গেলেন রাজস্থানে চিতোর কেল্লায়, এটা কি সম্ভব ছিল মধ্যযুগে? সত্যিই কি আলাউদ্দিন খিলজির মতো অত বড় দুঁদে শাসক, এক সুন্দরী নারীর জন্য যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন দিনের পর দিন?

রাজস্থানে চারণদের গাথায়, সুফিদের কাব্যে, পদ্মিনী এইসব প্রসঙ্গের বাইরে এক কল্পলোকের বাসিন্দা। ইতিহাসের যে কোনো চরিত্রের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল, জীবন্ত। এক আদর্শ নারী, যার রূপকল্প আজও নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের ইতিহাসের পাঠ। এখানে পুরাতত্ত্ব, মিথ ও ঐতিহাসিক ঘটনা মিলেমিশে যে পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে, সেখানে মার্গী ও দেশজ সংস্কৃতি সমানভাবে স্বীকৃত।

মালিক মহম্মদ জায়সির পদ্মাবৎ কাব্য বাংলায় অনুবাদ করেন আলাওল। সপ্তদশ শতকে আরাকান রাজসভায় ও পরে সুফি সাধারণের কাছেও এই কাব্য খুব জনপ্রিয় হয়। অন্যদিকে উনবিংশ শতকে শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তের কাছে টড পদ্মিনীকে উপস্থিত করেন দেশপ্রেম ও ভারতীয় আদর্শের আধার হিসাবে এই সূত্র ধরেই স্বদেশী আন্দোলনের সময় পদ্মিনীকে ঘিরে গড়ে ওঠে কাব্য, নাটক, কাহিনী। বাঙালী জাতীয়তাবাদী চেতনায় রাজপুতরা হয়ে ওঠেন তাঁদের পূর্বপুরুষ। পদ্মিনী আখ্যানে তাই শোনা যায় বিভিন্ন স্বর। ইতিহাসের মৌলিক উপাদান হিসাবে এই স্বরগুলিকে বিশ্লেষণ করাই আমার উদ্দেশ্য। কারণ তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমাদের ইতিহাস রচনার মূল সমস্যা।

(১)

আলাউদ্দিন-পদ্মাবতীর উপাখ্যান সাহিত্যে প্রথম অবতারণা করেন মালিক মহম্মদ জায়সি। তাঁর জন্ম জায়স নগরে ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে। কবি নিজের যে পরিচয় দেন তাতে জানা যায় তিনি সুফি সম্প্রদায়ের চিস্তি শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তাঁর গুরু ছিলেন শেখ মুহিউদ্দিন। একাধিক কাব্যের লেখক জায়সির

দ্বিতীয় কাব্য ছিল পদ্‌মাবৎ। কবির লেখায় শের সাহের প্রশস্তি থাকায় ধরে নেওয়া হয় কাব্যটির রচনার আরম্ভ ১৫৪০ সাল। শেষ জীবনে জায়সি আমেথির রাজার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন এবং এখানেই কাব্যটির শেষ হয়।[৩]

জায়সির কাব্য মূলত তাত্ত্বিক-রূপক খচিত একটি প্রেম কাহিনী। লেখক কোথাও দাবি করেননি যে এটি একটি ইতিহাসভিত্তিক রচনা। কাব্যটির দুই ভাগ। প্রথম অংশ রত্নসেন-নাগমতি-পদ্মাবতীর কাহিনী। দ্বিতীয় খণ্ডে কিছুটা ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়— যেমন আলাউদ্দিনের চিতোর অবরোধ ও পরবর্তীকালের অধিগ্রহণের বিবরণে। এখানেও ঐতিহাসিক অনুপুঙ্খ যা যুদ্ধের ক্ষেত্রে বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তোলে তার ওপর কবির কোনো ঝোঁক নেই। ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তকে শাসক আলাউদ্দিনের যে পরিচয় পাওয়া যায়, বিশেষ করে বারনির লেখায়, তার সঙ্গে জায়সির বর্ণিত চরিত্রের মিল অত্যন্ত স্বল্প। জায়সির রচনায় সংস্কৃত প্রণয়কাব্যের প্রভাব খুব স্পষ্ট। পদ্‌মাবৎ কাহিনীর প্রথম ভাগে তাই নায়ক-নায়িকার প্রেম, অ্যাডভেঞ্চার, মিলন একটি পারম্পর্যের সূত্রে গাঁথা। সিংহলের রাজকন্যা পদ্মাবতীর রূপগুণের কথা প্রিয় শুকপাখির মুখে জানতে পেরে চিতোরের রাজা রত্নসেন তাঁর স্ত্রী নাগমতির অজ্ঞাতে যোগীর ছদ্মবেশে সিংহলে পৌঁছান। এখানে পদ্মাবতীর অনুগত শুকপাখি হিরামনের সাহায্যে দুজনের দেখা হয়। প্রাথমিক বাধাবিপত্তির পর অবশেষে হরগৌরীর বরে পদ্মাবতীকে নিয়ে রত্নসেন চিতোরে ফিরে আসেন। সেখানে রাজার প্রথমা স্ত্রী নাগমতি দুঃখে দিন কাটাচ্ছিলেন— এই অংশে নাগমতির একটি বারোমাস্যা আছে, যার কাব্যগুণে মুগ্ধ হয়ে আমেথির রাজা জায়সিকে আশ্রয় দেন। খণ্ডটি শেষ হয় দাম্পত্য জীবনের বর্ণনায়— নাগমতির গর্ভে নাগসেন ও পদ্মাবতীর গর্ভে কমলসেন নামে রত্নসেনের দুই পুত্র লাভে। এই প্রথম খণ্ডে রূপকথার আমেজ সৃষ্টি হয় শুকপাখির দৌত্য, নায়ক নায়িকার রূপ বর্ণনা, তাঁদের প্রেম ও ঈর্ষার বিভিন্ন রসালাপে।

দ্বিতীয় অংশটি বেশির ভাগই আলাউদ্দিনের পদ্মিনীলাভের জন্য চিতোর অভিযান। রত্নসেনের পাঠান সৈন্যদের হাতে বন্দীত্ব, গোরা বাদলের বীরত্ব। পরে কুম্ভলমীরের রাজা দেবসেনের সঙ্গে রত্নসেনের যুদ্ধ এবং রত্নসেনের মৃত্যুতে নাগমতি ও পদ্মাবতীর সহমরণ। শেষ পর্যন্ত আলাউদ্দিন চিতোর অধিকার করলেন কিন্তু পদ্মাবতীকে লাভ করার বদলে পেলেন কিছু চিতাভস্ম। কাব্যের এই ভাগে একই সঙ্গে বীর ও করুণ রসের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

পদ্‌মাবৎ কাব্যের আর একটি দিক আছে যা জায়সি শেষ পর্যায়ে বর্ণনা করেছেন। এখানে সুফি সাধনা ও তাত্ত্বিক গুরুত্বই বিশেষভাবে প্রকাশ পায়। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য এই অংশটিতে রূপকের যে ব্যাখ্যা আছে তার সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু মনে রাখা দরকার ইসলামে 'ইমান' বা 'বিশ্বাসের' একটি বড় ভূমিকা আছে। সুফি সাধকদের একটি অংশ মানতেন যে মানুষের দেহেই সমগ্র ভুবন বর্তমান। যেমন বৈষ্ণবরা মানতেন বৃন্দাবন উপস্থিত বৈষ্ণবের মানস চেতনায়, যেখানে রাধাকৃষ্ণ নিত্য লীলা করছেন।[৪]

'মৈ এহি অরথ পণ্ডিতহ্ন সুঝা
কথা কি হমহ কিছু ঔর ন বুঝা
চৌদহ ভুবন জো তো উপরাহী
তে সব মানুষ কে ঘট সাহী'

(আমি এর অর্থ পণ্ডিতদের শুধিয়েছি। তাঁরা বলেছেন এর বেশি আমরা আর কিছু বুঝিনি। ঊর্ধ্বে এবং নিম্নে যে চৌদ্দ ভুবন বর্তমান, সে সবই আছে মানুষের দেহের ভিতরে।')

এর পর— "দেহ হল চিতোর, মনকে করেছি রাজা (রত্নসেন) হৃদয় হল সিংহল দেশ এবং পদ্মিনীকে জেনেছি বুদ্ধি। গুরু হলেন পথপ্রদর্শক শুক। গুরু বিনা এ জগতে কে পাবে নির্গুণ (ঈশ্বরকে), নাগমতি হল মর্তাশক্তি। এতে যার মন ধরা পড়ে তার মুক্তি নেই। দূত রাঘব (চেতন) হল শয়তান আর আলাউদ্দিন মায়া। এইভাবে এই প্রেমকাহিনীর বিচার কোর। যে বুঝতে সমর্থ সে বুঝে নাও।'[৫]

জায়সির মূল বক্তব্য তাঁর কাব্যরচনার যুক্তিতে ব্যাখ্যা করা আছে। 'আমি এই জেনে এই গান রচনা করলাম, তা যেন এ জগতে (কীর্তি) চিহ্ন হয়ে বর্তমান থাকে। এখন কোথায় সেই রাজা রত্নসেন এমন বুদ্ধিমান শুকপাখিই বা কোথায়? কোথায় সুলতান আলাউদ্দিন? কোথায় রাঘব চেতন যে (পদ্মাবতীর রূপ) বর্ণনা করেছিল। কোথায় সুরূপা রাণী পদ্মাবতী? কেউ নেই, শুধু তাদের কাহিনী আছে। যার যশ এবং কীর্তি থাকে সেই ধন্য। ফুল মরে কিন্তু তার গন্ধ মরে না।'[৬]

আলাউদ্দিনের শাসনকালের আড়াইশো বছর পরে জায়সি যখন আবধি-হিন্দি ভাষায় পদ্মাবৎ লেখেন, তখন এই ধরনের প্রণয় কাব্য, যা সুফি ও ভক্তির তাত্ত্বিক প্রভাবে রচিত, তার একটি ঐতিহ্য সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এদের মধ্যে মোল্লা দাউদের চান্দায়ন, কুতুবনের মৃগাবতী, মনঝনের মধুমালতী ও জায়সির পদ্মাবতী এই চারটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যার মধ্যে জায়সি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ।

প্রতিটি কাব্যের বৈশিষ্ট্য, সূচনায় মহম্মদের ও চার খালিফার গুণকীর্তন, পীরের যশোগান ও সমকালীন সুলতানদের উদ্দেশ্যে স্তুতিনিবেদন করে প্রেমকাহিনীর পরিবেশন। প্রায় সব রচনার ক্ষেত্রেই ফরাসী ও সংস্কৃত কাব্যর সঙ্গে মিশে গেছে লোকগাথা। চন্দায়নে যেমন লোকগাথা প্রাধান্য পেয়েছে, মনঝনের মধুমালতীতে রূপকথা। জায়সি তাঁর কাব্যে রূপক ও সমকালীন বাস্তবতার একটি মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন, যা তখনকার সাহিত্যে বিরল। ইতিহাসের তথ্য তাঁর কাহিনীতে গতি স্থাপন করেছিল, কাব্যকে ভারাক্রান্ত করেনি। এর পাশাপাশি রাজস্থানে গড়ে উঠেছিল একাধিক বীরগাথা। আলাউদ্দিন খিলজির রাজস্থান আক্রমণ বেশ কয়েকটি কাব্যের বিষয়। ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে পদ্মনাভ নামে এক নাগরি ব্রাহ্মণ রচনা করেন 'কানহাড ডে' প্রবন্ধ। কাব্যটি লেখা হয় কানহাড ডে-র বংশধর অক্ষয়রাজের (জালোরের রাণা) অনুরোধে। তিনি ছিলেন পদ্মনাভের পৃষ্ঠপোষক। কাব্যটি চার খণ্ডে বিভক্ত। কাহিনীর মূল আখ্যান গড়ে উঠেছে দেশপ্রেম, বীরত্ব ও বংশের সম্মানকে কেন্দ্র করে। এই সম্মান রক্ষার্থে রাজপুত পুরুষদের যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন ও নারীদের জহরব্রত উদযাপন কাহিনীর প্রধান উপজীব্য।[৭]

পঞ্চদশ শতকে রাজপুত রাণাদের দরবারে যে বীরগাথাগুলি লেখা হয়, তার সূত্র নিহিত আছে তাঁদের বংশাবলীতে। আদি মধ্যযুগ থেকেই (সপ্তম দশম শতক) রাজপুতদের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রমাণ করবার জন্য এই রচনাগুলির সৃষ্টি। চতুর্বর্ণ হিন্দু সমাজকে রক্ষা করার জন্য রাজপুতরা কী কী দায়িত্ব পালন করেছিলেন— দেশ, ধর্ম ও জাতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাঁদের আত্মত্যাগ, শুধু সাহিত্যে নয়, শিলালিপি স্থাপত্যে, ভাস্কর্য শিল্পে খোদিত হয়। কিছু জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা এর থেকে সিদ্ধান্তে আসেন যে, রাজপুতরাই আর্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, মহাভারত ও রামায়ণে বর্ণিত সূর্য ও চন্দ্র বংশের বংশধর।[৮]

বৈধকরণের প্রধান উপায় হল 'শত্রু'কে চিহ্নিত করা। সেই যে চিরাচরিত 'অপর' তার নির্মাণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে নায়কের অস্তিত্ব। এখানে মুসলমান সম্রাট— যেমন আলাউদ্দিন রাজ্যগ্রাসী, ক্ষমতালোভী ও হিন্দু সংস্কৃতি রক্ষার প্রধান বাধা। এর ফলে রাজপুতদের নিজেদের যে অন্তর্দ্বন্দ্ব তার উল্লেখ থাকলেও তার বিশ্লেষণ কাহিনীর মূল উদ্দেশ্য নয়।

১৪৮১ খ্রিস্টাব্দে ভাণ্ডাউ ভ্যাস 'হাম্মিরায়ন' বা 'হাম্মির মহাকাব্যম' রচনা করেন। লেখক এখানে দেখিয়েছেন যে তাঁর পৃষ্ঠপোষক হাম্মির আলাউদ্দিনের সঙ্গে যুদ্ধ করেন তাঁর আশ্রিত দুই মুঘল মিরকে রক্ষা করতে। দুই অনুচরের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁর পরাজয় ঘটে। আলাউদ্দিনের হাতে বন্দি না হবার জন্য হাম্মির নিজেই নিজের শিরচ্ছেদ করেন। এর পর তাঁর রাজপুত সৈন্যরা সবাই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে। নারীরা জহরব্রত পালন করেন ও কাব্য শেষ হয় ট্রাজেডিতে।

মধ্যযুগের যে বিশেষ মতাদর্শ সমকালীন ঐতিহাসিক রচনাকে পরিচালিত করত (যেমন জিয়াউদ্দিন বারনীর) সেখানে রাজধর্ম একটি বিশেষ নৈতিক বিধি যা রাজার আচরণে প্রকাশ পায়।[৯] এই কাব্যগুলিতে আলাউদ্দিনের ব্যবহারে রাজোচিত গুণগুলি প্রকাশ পায়নি, পরাজিত নায়ক হাম্মির যখন দুটি (মুসলমান) মুঘল আমিরকে রক্ষার জন্য প্রাণ দিচ্ছেন, তিনিই হয়ে উঠছেন রাজকাহিনীর যোগ্য নায়ক। এই কাহিনীগুলিতে ইতিহাসে যা ঘটেছিল তার থেকে অনেক বেশি প্রাধান্য পায় যা ঘটেনি, কিন্তু ঘটা উচিত ছিল।[১০]

বীরত্বের যে কাহিনীতে দেশপ্রেম ও ধর্মরক্ষা মূল প্রতিপাদ্য ছিল, তাতে পদ্মাবতী-আলাউদ্দিনের উপাখ্যান আরেকটি মাত্রা যোগ করে যেখানে শুধু মাতৃভূমি নয়, নারীকে রক্ষা করা বীর রাজপুতদের অবশ্য কর্তব্য। যে শত্রু, তার চরিত্রেও রূপান্তর ঘটে। ক্ষমতার লোভ বিস্তারিত হয় ভূমি, অর্থ থেকে নারীর প্রতি। এইভাবেই আলাউদ্দিন যিনি ছিলেন শুধুমাত্র অনৈতিক শাসক, তিনি হয়ে উঠলেন আরও নীচ, কামুক। চিতাই বার্তা ও পদ্মাবতীতে আলাউদ্দিনের উপস্থিতি কাহিনীতে পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করে। এর পরের অধিকাংশ সাহিত্যে রাজপুত বীরত্বের কাহিনীর কেন্দ্রে থাকে সতী নারী ও তাকে অপহরণে ইচ্ছুক মুসলমান রাজা— সেই 'অপর' যাকে ছাড়া কাহিনী হয়ে উঠবে অচল। ব্রাহ্মণ্য ও পিতৃতান্ত্রিক মতাদর্শ একত্রে নিয়ন্ত্রণ করে নায়ক-নায়িকার জীবন। এই জন্যই ইতিহাসে যা সম্ভব হয় না, তা সম্পন্ন হয় পরলোকযাত্রায়। হিন্দুদের স্বর্গে মুসলমানদের কোনো ছায়া পড়ে না। জায়সির কাব্যে কিন্তু এই যুক্তির কোনো স্থান নেই।

আলাউদ্দিন যখন চিতোরে প্রবেশ করলেন, তখন সব শেষ হয়ে গেছে।

"বাদশাহ এসে যখন সব বিবরণ শুনলেন, উজ্জ্বল দিনের আলোয় যেন রাত্রি ঘনিয়ে এল। তিনি (চিতার) একমুঠো ছাই নিয়ে (বাতাসে) উড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এ জগৎ মিথ্যা।'"[১১]

(২)

সপ্তদশ শতকে পদ্মিনীর কাহিনী অনুবাদ করেন আলাওল। ফতোয়ারা বা ফরিদপুরের অন্তর্গত জালালপুরে কবি আলাওলের জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন জালালপুরের অধিপতি মজলিস কুতুবের অমাত্য। মজলিস কুতুব ১৫৭৬ থেকে ১৬১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ক্ষমতাসীন ছিলেন। ধরে নেওয়া হয়, আলাওলের জন্ম এই সময়ের পরে নয়। পিতার সাথে জলপথে পর্যটনকালে তাঁরা জলদস্যুদের দ্বারা আক্রান্ত হন। তাঁর পিতা মারা যান। আলাওল আরাকান বা রোসাঙ্গে এসে পৌঁছান। এখানে তিনি প্রথমে রাজ অশ্বারোহী দলে যোগদান করেন। পরে রোসঙ্গ রাজের মুখ্য পাটেশ্বরী যশোস্বিনীর অমাত্য মাগন ঠাকুরের আশ্রয় লাভ করেন। সময়টি ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ। পদ্মাবতী আলাওলের প্রথম রচনা। এই কাব্যে আত্মপরিচয় অংশে কবি নিজের পরিচয় দেন—

মুলুক ফতেহাবাজ গৌরেতে প্রধান।
তথাতে জালালপুর পূণ্যবন্ত স্থান
বহুগুণবন্ত বৈসে খালিফা ওলসা

কথেক কহিব সেই দেশের মহিমা
মজিলিষ কুত্তপজান তাতে অধিপতি
মুই হিন্দ দিন তান আমথ্য সন্ততি[১২]

এই আত্মপরিচয় অংশে তাঁর জীবনের প্রথম দিনটুকুই ধরা পড়ে। জন্মস্থান বাল্যকাল ও জলদস্যুদের কবলে পড়া—

'কর্মগতি, জাইতে পন্থে বিধির গঠন
হার্মাদের সঙ্গে হৈল দরশন।
বহুযুদ্ধ আছিল শহিদ হৈল তাত
রণক্ষাতে ভোগ জোগে আইল এযাত।'[১৩]

ব্রহ্মদেশের উত্তর পশ্চিম সীমানায় চট্টগ্রামের কাছে আরাকান রাজ্য। প্রাচীনকালে এই রাজ্যেরই নাম ছিল রোসাঙ্গ। এখানকার অধিবাসী মগেরা ছিলেন বৌদ্ধ। রাজারাও ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, যদিও ইসলামের প্রভাব জোরদার হওয়াতে এরা একটি করে মুসলমান নামও গ্রহণ করেন। ঐতিহাসিকদের মতে, পঞ্চদশ শতকের শেষ থেকেই বাংলা, আরাকান ও ত্রিপুরার মধ্যে লড়াই চলছিল। তার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল চট্টগ্রামের দখল। পর্তুগিজ বারোসের মতে হুসেন সাহের সময় আরাকানের রাজা বাংলার সুলতানের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেন। এই কারণে বাকলা অঞ্চলে হুসেন সাহের খাস জমি ছিল। এছাড়া বেশ কিছু রাজকর্মচারী বাকলা থেকে আরাকান রাজসভায় যোগ দেন। ফলে আরাকান ও বাংলার মধ্যে একটা আদান-প্রদান গড়ে ওঠে।

এদিকে রিচার্ড ইটন দেখিয়েছেন কীভাবে পরবর্তীকালে বাংলার যেসব প্রত্যন্ত প্রদেশগুলিতে মুসলমানরা বসতি স্থাপন করছিলেন, (বাকলা অঞ্চলটি তার অন্যতম) সেখানে পর্তুগিজ জলদস্যুরা আরাকানীদের সঙ্গে মিশে এই সব মানুষদের ধরে নিয়ে গিয়ে দাস হিসাবে বিক্রয় করতেন। ফরাসী পর্যটক বার্নিয়ের ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দে এই অঞ্চলে ছিলেন, তার বিবরণের সঙ্গে আলাওলের বর্ণনা মিলে যায়। জলদস্যুদের অত্যাচারের প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবেও আলাওলের বিবরণ তাই যথেষ্ট মূল্যবান।[১৪]

রোসাঙ্গ বর্ণনা ও মাগন প্রশস্তি অধ্যায়গুলিতে আলাওল তৎকালীন আরাকান রাজসভার একটি বর্ণনা দেন—

'কহ শেখ সৈয়দ জাদা, মোগল পাঠান যোদ্ধা
রাজপুত হিন্দু নানা জাতি।
আভাই বরমা শান— ত্রিপুরা সুফির নাম
কতেক কহিনু জাতি তাতি
আমানী ওলন্দাজ দিনেমার ইঙ্গরাজ
কান্টিলান আর ফরাসিস
হিসপানী আলমানী হোলদার নসরানী
নানা জাতি আর পর্তুগিস।[১৫]

এই আন্তর্জাতিক আবহাওয়ায় আলাওলের কাব্যরচনা স্বাভাবিকভাবেই নাগরিক গুণে সমৃদ্ধ। আলাওলের পাণ্ডিত্য, সঙ্গীত নৈপুণ্য এবং আরও নানা গুণের জন্য কবিকে মাগন ঠাকুর সমাদর করে অমাত্য সভায় নিয়ে আসেন। এই সব রাজসভাসদদের গুণগ্রাহিতার জন্যই হয়তো আলাওলের মতো

কবিদের কাব্য বৈচিত্র্যময় হয়ে ওঠে। মাগন ঠাকুরের নির্দেশেই আলাওল জায়সীর পদ্‌মাবৎ-এর অনুবাদ শুরু করেন—

'এহি পদ্মাবতী রসে বচ রসকথা।
হিন্দুস্থানী ভাষে শেখে রচিয়াছে পোথা।
রোসাঙ্গেতে অনেকে না বুঝে এই ভাষা।
পয়ার রচিলে পুরে সভানের আশা।'[১৬]

অনুমান করা হয়, রাজা থাদো মিনতোর রাজত্বকালের মধ্যেই (১৬৪৫-১৬৫২) কোনো এক সময় এই গ্রন্থ শেষ হয়। ১৬৫২ খ্রিস্টাব্দে থাদো মিনতোর মৃত্যু হলে মাগন ঠাকুরের পরিচালনায় শিশুপুত্র শ্রীচন্দ্র সুধমাকে নিয়ে বিধবা রাণী রাজত্ব করতে থাকেন। এই সময় আলাওল মাগন ঠাকুরের নির্দেশে 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জমাল' কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। কিন্তু ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে মাগনের হঠাৎ মৃত্যুতে আলাওলের এ কাজ থেমে যায়। ১৬৫৯ খ্রিস্টাব্দে আরাকান রাজের মহামাত্য সোলেমানের আদেশে তাঁর পূর্বসূরী দৌলত কাজীর অসম্পূর্ণ কাব্য 'সতী ময়না বা লোর চন্দ্রানী' সমাপ্ত করেন। ১৬৬০ সালে আরাকান রাজের সেনাপতি সৈয়দ মুহম্মদের পৃষ্ঠপোষকতায় নিজামীর ফারসী কাব্য 'হপ্তপয়করের' অনুবাদ শেষ হয়। এই গ্রন্থে শাহজাদা সুজার আরাকান রাজের আশ্রয় গ্রহণের উল্লেখ আছে। ১৬৫০ খ্রিস্টাব্দে ভাগ্যহীন শাহ সুজা খিজিয়ার যুদ্ধের পর আরাকান রাজের বিরাগভাজন হলে সপরিবারে নিহত হন। আলাওলকে তাঁর এক শত্রু শাহ সুজার অন্তরঙ্গ বলে রাজসভায় ধরিয়ে দিলে আলাওলের পঞ্চদশ দিন কারাবাস করতে হয়। তিনি মুক্তিলাভ করেন কিন্তু তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই দারিদ্র্যের মধ্যেই তিনি ১৬৬৩-৬৪ খ্রিস্টাব্দে ইসলামী স্মৃতি শাস্ত্র 'তেহফা' গ্রন্থের অনুবাদ করেন ও 'সয়ফুলমুলক বদিউজ্জমালে'র শেষ অংশ লেখেন। ১৬৭১ খ্রিস্টাব্দে মজলিসের অনুগ্রহে আবার সুদিন দেখা দেয় ও কবি নিজামীর বৃহৎ ফারসী কাব্য 'ইসকন্দরনামা'র অনুবাদ করেন। আনুমানিক ১৬৭৩-৭৪ খ্রিস্টাব্দে আলাওলের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের অবসান ঘটে।[১৭]

সুলতানী আমল থেকেই বাংলা ভাষা একটি স্বকীয় রূপ নেয়। তার সঙ্গে আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিকাশ বিশেষভাবে জড়িত। একদিকে বাংলার ভক্তি আন্দোলন ও চৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রসার, অন্যদিকে সুফিবাদ ও লৌকিক ইসলাম বাংলা সাহিত্যচর্চাকে সমৃদ্ধ করে। আলাওল যদিও আরাকানে বাস করতেন, তবু তাঁর লেখায় এই দুই ধারাই বর্তমান।

বিষয়গতভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ইসলামীয় বাংলা সাহিত্যে প্রথম থেকেই গাথা কাব্য (narrative) প্রাধান্য পায়। ষোড়শ শতাব্দীর কবিদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মহম্মদ সগীর (যাঁর সন তারিখ পাওয়া যায়নি কিন্তু তাঁর ভাষা থেকে গবেষকরা সিদ্ধান্ত করেন যে কবি ষোড়শ শতকেই বর্তমান ছিলেন)। তাঁর রচনা 'ইউসুফ জুলেখা' যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়।[১৮] পদ্মাবতীর মতো এই কাব্যে প্রেমই চালিকাশক্তি। দৈনন্দিন জীবনে নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও বাস্তবতার টানাপোড়েন সাহিত্যে কিছুটা দ্বান্দ্বিক পরিবেশ গড়ে তোলে। তাতে বৈচিত্র্যের স্বাদও থাকে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের বাঙ্গালী কবিরা এই নানা ধরনের কাব্যের নিদর্শন নিজেদের ভাষায় আনতে চেষ্টা করেন।

মনোহর মালতীর আকুল ।পরীত
গাহিব সকল লোক মন হরষিত।
এহি সে সুন্দর কিচ্ছা হিন্দিতে আছিল
দেশি ভাষায় মুঞি পাঞ্চালি ভনিল।[১৯]
(মহম্মদ কবীর)।

একইভাবে ফুটে ওঠে আলাওলের লেখায়।

'রসনা সরস হৈল প্রেমের বচনে
প্রেম পুঁথি পদ্মাবতী রচিতে আশাএ।'[২০]

আলাওলের পদ্মাবতী তাই নিছক অনুবাদ নয়। জায়সির কাব্যের সঙ্গে কিছু প্রভেদও আছে। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার একটি বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। আলাওল পদ্মাবতীর শেষাংশে এসে সম্পূর্ণ ভিন্ন কাহিনীর অবতারণা করেছেন। আলাওলের শেষাংশে দেবপাল নিহত এবং রত্নসেন আহত হলেন। আহত রত্নসেন রাজধানীতে ফিরে এসে আরও দীর্ঘকাল বেঁচে রইলেন। যথাসময়ে পদ্মাবতীর গর্ভে চন্দ্রসেন ও ইন্দ্রসেন নামে তাঁর দুই পুত্র হল। তারা যখন যথাক্রমে সাত ও পাঁচ বছরের তখন পূর্ব-আঘাতের বিষক্রিয়ায় রত্নসেনের মৃত্যু হল। নাগমতি ও পদ্মাবতী রত্নসেনের সঙ্গে একই চিতায় সতী হলেন। মুমূর্ষু রত্নসেনের পূর্বনির্দেশ অনুযায়ী রাজপুত বীর বাদল রত্নসেনের পুত্রদের নিয়ে দিল্লীতে সুলতানের কাছে গিয়ে রাজার মৃত্যুর সংবাদ জানান। এতে দুঃখিত হয়ে সুলতান আলাউদ্দিন অনাথ ছেলেদুটিকে স্বান্ত্বনা জানিয়ে চান্দেরী ও মাড়োয়া রাজ্য দান করেন। বাদলকেও কিছু রাজ্য দান করা হল।

পরিশিষ্ট বা খিল খণ্ডটি কাহিনীতে অন্য একটি মাত্রা যোগ করে।

শাস্ত্রনীতি মৃত্যুকর্ম করিয়া যতন
দেশে মিলি দুইভাই করিলা রাজন
পিতা পাটে রাজেশ্বর বদি সে হইলা
তুরমান সাহার আগে পত্র লিখিলা॥
প্রথমে প্রণামী বহু যুগল চরণ
তার পাছে নিবেদিয়ে দুঃখের কথন॥
সংসার ছাড়িয়া পিতা সঙ্গে মাতৃগণ
আমা দুই ছাড়ি কৈল স্বর্গেতে গমন।
মৃত্যুকালে বাপ মোরে তোমার চরণ
ভূমি চুম্বি সমর্পিল করিয়া যতন।
যতেন কহিল পিতা তোমা পদযুগে
মনোগত কৃপাদৃষ্টি কর মোর আগে
আমার রক্ষক সাহা সংসাবেড়ে নাই
সর্ব্বত্র কল্যানকর্তা তুমি সে গোঁসাই॥

দুই শিশু ধরে সাহা বিষাদ অন্তরে
শোক শুনি সাহা পুন কান্দিলা বিস্তরে

যে পুনি মরিয়া গেল না কর শোচন
নিয়মিত রাজ্যভোগ যাবত জীবন
চান্দেরী মারোয়া রাজ্য তোমা বশ কৈলুঁ
দোব ক্ষেম বাপে তোমা বহু দুঃখ দিলু
মোর তরে মন ক্লেশ রাজা রত্নসেন

কাল গঞ্জি স্বর্গে গেল বিষাদিত মনে।
এ বলিয়া পুঞ্জে আনি রত্নধন
নানা দেশী দিব্যবস্ত্র আনিয়া তখন
নিজ হস্তে রাজতাজ ফিরে তুলি দিলা
অভয় প্রসাদ দিয়া দোহাকে তুলিলা।[২১]

এই অংশের টিকাতে দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য; 'রত্নসেনের মৃত্যু সংক্রান্ত আনুপূর্বিক কাহিনী শুনে সুলতানের শোক এবং সমস্ত বিবাদের স্মৃতি মুছে ফেলে পদ্মাবতীর অনাথ পুত্রদ্বয়কে সমাদরসহ অভ্যর্থনার যে চিত্র এখানে আছে, তাতে মূলকাহিনীর ট্র্যাজেডি অনুবাদে ট্র্যাজি-কমেডিতে পরিণত। পদ্মিনীকে না পাওয়ার ব্যর্থতা ভুলে অনুবাদের আলাউদ্দিন যেভাবে পদ্মিনীর পুত্রদের আহ্বান করে পাশে বসিয়ে পিতৃশোকের স্বান্তনা দিয়েছেন তাতে সুলতানের প্রেমভাব প্রকাশ পেলেও কাহিনীর পরিণাম যতদূর সম্ভব মেলোড্রামাটিক হয়েছে'। এই মন্তব্যে ফুটে উঠছে পদ্মাবৎ কাব্য পর্বের দুটি মূল সমস্যা। প্রথমত, জায়সি ও আলাওল একই কাহিনীকে অবলম্বন করলেও, তাঁদের বাস ছিল ইতিহাসের দুটি ভিন্ন অধ্যায়ে। দুজনেই মুসলমান, দুজনেই সুফি, কিন্তু জায়সির মধ্যে সুফি মতাদর্শ যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, আলাওলের ক্ষেত্রে তা অন্যভাবে প্রতিফলিত হয়। ত্রয়োদশ শতক থেকে ভারতে সুফিদের আগমন ঘটে। এক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ইসলামের পাশাপাশি সুফিদের আবেদন বিকল্প আধ্যাত্মিক শক্তি হিসাবে দেখা দেয়। সুফিদের সঙ্গে কবি ও শিল্পীদের যোগযোগ অভিন্ন ছিল। চিস্তি শেখদের জনপ্রিয়তা এই কারণেই এতটা বিস্তার লাভ করে।[২২] জায়সি রাজশক্তির চেয়ে এই আধ্যাত্মিক ক্ষমতার প্রতি বেশি অনুগত ছিলেন। অন্যদিকে আলাওল রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ব্যক্তি জীবন কীভাবে প্রভাবিত হয় তাকে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর কাব্যে। আলাউদ্দিন তাঁর রচনায় একজন সুশাসক হয়ে উঠেছেন। আধ্যাত্মিকতা ও নৈতিকতার মধ্যে এখানে পার্থক্য স্পষ্ট। আলাওল তাই শোধন করেছেন সুলতানের চরিত্র। জীবনবাদী হওয়ায়, শাসক ও শাসিতের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক তাঁর কাহিনীতে প্রাধান্য পেয়েছে। আলাউদ্দিনকে আলাওল ও জায়সি দুজনেই পুনর্নির্মাণ করেছেন তাদের নিজস্ব ঐতিহাসিক প্রেক্ষায়।

(৩)

বাঙলায় পদ্মিনী ও আলাউদ্দিনের উপাখ্যান, উনবিংশ শতকে নতুন করে উজ্জীবিত করেন জেমস্ টড। তাঁর রচিত 'Annals and Antiquities of Rajasthan' দুটি খণ্ডে প্রকাশিত হয় ১৮২৯ ও ১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ষোল বছর বয়সে টড ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অধীনস্থ সামরিক কলেজের ছাত্র হিসাবে যোগদান করেন। তিনি ভারতবর্ষে থাকেন ২৪ বছর। এর মধ্যে ১৭ বছর অতিবাহিত করেন মধ্যভারত এবং রাজপুতানায়। এই সময় তিনি বিভিন্নভাবে রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করেন। চারণ কবিদের রচনা, গাথা, মহাকাব্যগুলি ছিল তাঁর প্রধান উৎস। এছাড়া টডের উপরে ওরিয়েন্টালিস্ট উইলিয়াম জোন্স প্রভৃতির প্রভাব পড়ে। এদেশে অবস্থানকালে এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গেও তাঁর যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল। এ সবই তাঁর ইতিহাস রচনাকে সমৃদ্ধ করে। টড রাজপুত জাতির শৌর্য ও বীর্যে এতদূর আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি নিজেকে রাজপুত বলেই কল্পনা করতেন। এই সময় থেকেই ভারতবর্ষের ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব চর্চার সূত্রপাত হয়। এই প্রেক্ষায় টডের রচনার গুরুত্ব অপরিসীম। উনিশ শতক থেকেই ব্রিটিশ সরকারি

নথিপত্রে রাজপুতদের অভিহিত করা হতে থাকে যোদ্ধৃজাতি (martial race) বলে। তুলনায় বাঙালীদের বলা হতো মেয়েলি, দুর্বল গৃহমুখী (The effiminate Bengali)। হয়তো এরই প্রতিক্রিয়ায় বাংলা সাহিত্যে রাজপুত নায়ক-নায়িকার এতটা প্রাধান্য। পুরুষ চরিত্রের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় চরিত্র ছিলেন রাণা প্রতাপ, আর নায়িকা ছিলেন রাণী পদ্মিনী।[২৩]

টড আলাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণের কাহিনী মূলত 'খোমান রাসো' (মেওয়ারের রাজবংশের গাথা) থেকে সংগ্রহ করেন। তাঁর বর্ণনায় রাণা লক্ষ্মণ সিংহ চিতোরের রাণা হন ১২৭৫ খ্রিস্টাব্দে। সেই সময় পাঠান সম্রাট আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করেন— 'A memorable era in the annals, when Cheetore the repository of all that was precious yet untouched of the arts of India, was stormed, sacked, and treated with remorseless barbarity by the Pathan emperor, Alla-o-din. Thrice it was attacked by this subjugator of India. In the first siege it escaped spoilation, though at the price of its first defenders, that which followed is the first successful assault and capture of which we have any detailed account.

Bheemsi was the uncle of the young prince, and protector during his minority. He had espoused the daughter of Hamir Sank (Chohan) of Ceylon, the cause of woes unnumbered to the Sesodias. Her name was Pudmine, a title bestowed only on the superlatively fair, and transmitted with renown to posterity.'[২৪]

টড পুরাণ ও সংস্কৃত কাব্যের গুণগ্রাহী ছিলেন। পদ্মিনীর চরিত্রে তিনি নায়িকার লক্ষণগুলির সমষ্টি দেখেন— শঙ্খিনী, চিত্রিনী, পদ্মিনী। অন্যদিকে আলাউদ্দিনের আক্রমণ তাঁর জন্যে সৃষ্টি করেছিল সেই বিশাল রণাঙ্গন যেখানে বার বার রাজপুত বীর তার ক্ষমতার প্রমাণ দেবে। অন্যদিকে মুসলমান মাত্রেই হবে বর্বর, ছলনা ও অনৈতিকতার প্রতিমূর্তি। তার লোভ ও কামনা থেকে বাঁচবার জন্য রাজপুত রমণীরা জহরব্রত উদ্‌যাপন করবেন। টডের রচনায় রাজপুতদের যুদ্ধে প্রাণত্যাগ ও রমণীদের অগ্নিতে আত্মাহুতি হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এর জন্যই তা কবির লেখনীর যোগ্য। কাব্য এখানে পুরাণের আকার ধারণ করেছে।

'The poet has found in the disastrous issue of this siege admirable material for his song.'

টডের লেখাতে পদ্মিনী দেবীতে পরিণত হন— 'ম্যায় ভুখা হুঁ। তারপর গাঢ় ঘুমের মাঝখানে স্বপ্ন যেমন ফুটে ওঠে তেমনি সেই শয়নঘরে এক অপরূপ দেবী মূর্তি ধীরে ধীরে উঠল'[২৫]

'On the morning he convened a council of his chiefs, to whom he revealed the vision of the night, which they treated as the dream of a disordered fancy. He commanded their attendance at midnight, when again the form appeared and repeated the terms on which alone she would remain amongst them.

'Though thousands of barbarians strewed the earth, what are they to me? on each day enthrone a prince. Let the Kirna, the Chatra and the Chamara, proclaim his sovereignity, and for three days let his decree be seen, on the fourth let him meet the foe and his fate. Then only may I remain.'

'যখন দ্বিপ্রহরের স্তব্ধ রাজপুরে হাজার হাজার বীরের সম্মুখে আবার সেই দেবীমূর্তি 'ম্যায় ভুখা হুঁ' বলে প্রকাশিত হলেন, তখন আর কারো মনে কোনো সন্দেহ রইল না— সকলের মন থেকে সমস্ত অবিশ্বাস, সকল দুর্বলতা নিমেষের মধ্যে দূর হল, আগুনের তেজে অন্ধকার যেমন দূর হয়ে যায়। ... তারপর মহাবলির উদ্যোগ হল।'[২৬]

টডের নিজের মতামত এবিষয়ে খুব স্পষ্ট— 'Whether we have nerely the fiction of the poet, or whether the scene was got up to animate the spirit of resistance, matters but little, it is consistent with the belief of the tribe.' স্বপ্ন নির্মাণ করাই হোক বা এই কাহিনী কবির কল্পনাই হোক আসল উদ্দেশ্য ছিল চিতোরকে রক্ষা। একই সঙ্গে পদ্মিনীকে *দেবীতে পরিণত করা। এখানে কাহিনী যে নাটকীয় মোড় নেয় তার দুটি দিক আছে, এক রাজপুতদের শেষ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি ও নারীদের জহরব্রত উদ্‌যাপন। অন্যদিকে দেবীর আবির্ভাবে যা ছিল বাস্তব* তা হয়ে উঠল অলৌকিক। রাজপুত পাঠানদের যুদ্ধ পরিণত হল দৈব নির্দেশে পরিচালিত ঘটনায়, যার শেষ মৃত্যুতে। টডের কাহিনী এখানে পৌরাণিক নীতি অনুসরণ করে। ইতিহাস রচনা করতে হলে বাস্তবের প্রতি যে দৃষ্টি দিতে হয়, পুরাণে তা নিস্প্রয়োজন, কারণ সেখানে সূচনা ও সমাপ্তি সবই জানা। কাহিনী সেখানে গঠিত, স্থির— অন্যদিকে ইতিহাস মাত্রেই গতিশীল। তাই টডেব আখ্যানে স্বদেশের জন্য আত্মদান প্রাধান্য পেয়েছে, রাজা-প্রজার সম্পর্ক বা নারী-পুরুষের প্রেম নয়।

উনবিংশ শতকে ইউরোপে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে একধরনেব রোমান্টিক জাতীয়তাবাদের প্রাদুর্ভাব ঘটে। টড যে এই ধরনের যুক্তিতে বিশ্বাস করতেন তাব প্রমাণ পাওয়া যায় তার রাজপুত জাতীয়তাবাদের ব্যাখ্যায়। সুলতান আলাউদ্দিনের বিরুদ্ধে রাজপুতদের প্রতিরোধ এই জাতীয়তাবাদী আদর্শেব পবিচয়। একই জাতীয়তাবাদী চেতনা কাজ কবে মুঘলদের বিরুদ্ধে বাজপুতদের যুদ্ধে। পরবর্তীকালে (১৮১৭-১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে) টড যখন রাজপুত রাজাদের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের চুক্তি করছিলেন, তার একটা শর্ত ছিল রাজস্থান থেকে সমস্ত বিদেশীদের বহিস্কার করা হবে। এই বহিরাগতরা ছিলেন পিণ্ডাবি ও মাবাঠা। কিন্তু টড যে ইতিহাসেব প্রেক্ষায বাজস্থানের প্রাচীন গাথাগুলি লিপিবদ্ধ করেছিলেন, সেখানে বহিরাগত ও শত্রু মাত্রেই ছিল মুসলমান রাজশক্তি। টডের ঐতিহাসিক যুক্তি বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে বাঙালী জাতীয়তাবাদী লেখকদের।[২৭]

(৪)

১৮৫৮ সাল, ভারতের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় তারিখ— ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীব শাসনের অবসান ও ভাবতেব ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। একই সালে প্রকাশিত হয় রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (রাজস্থানীয় ইতিহাস বিশেষ)। এই সময় থেকেই ভারতীযবা মুক্ত হলেন এক জটিল আনুগত্যের সমস্যা থেকে। এতদিন পর্যন্ত তাঁরা ছিলেন আইনত মুঘল সম্রাটের প্রজা, যদিও প্রায় সারা দেশেই সামাজিক উদ্বৃত্ত কর হিসেবে গ্রাস করছিল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী। মতাদর্শগতভাবেও একদিকে সেকালের বিধান, অন্যদিকে 'ওরিয়েন্টালিস্ট' জ্ঞান চর্চার প্রভাবে নতুন করে আত্মসমীক্ষা শিক্ষিত বাঙালীদের কাছে কয়েকটি সমস্যার সৃষ্টি কবে। রঙ্গলালেব পদ্মিনী উপাখ্যানের ভূমিকায় এই চিন্তাগুলির কিছু নিশানা পাওয়া যায়।

"এই অভিনব কাব্যের প্রণয়ন ও প্রকটন সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিদ্বক্তব্য আছে। ১২৫৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে একটা বীটন সমাজের নিয়মিত অধিবেশনে কোনো কোনো সভ্য বাঙলা কবিতার অপকৃষ্টতা প্রদর্শন করেন। কোনো মহাশয় সাহসপূর্বক এরূপও বলিয়াছিলেন যে বাঙালীরা বহুকাল পর্যন্ত পরাধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকাতে তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত কবি কেহই জন্মগ্রহণ করে নাই। প্রত্যুত স্বাধীনতা-সুখবিহীনতায় মানসিক স্বাচ্ছন্দ-বিরহ হয়, সুতরাং পরিপীড়িত পরাধীন জাতির মধ্যে যথার্থ কবি কোনোরূপেই কেহ হইতে পারেন না। আমি উক্ত মহাশয়দিগের অযুক্তি নিরসন নিমিত্ত ঐ সভায় এক প্রবন্ধ পাঠ করি।"[২৮]

[illegible] রঙ্গলালকে বিশেষভাবে উৎসাহিত [illegible] তাঁর অনুরোধেই টডের রাজস্থান থেকে কাহিনী নির্বাচন করে 'পদ্মিনী উপাখ্যান' শুরু হয়। কেন টডের রাজস্থান থেকে বিষয় গ্রহণ করা হয় সে-সম্পর্কে রঙ্গলাল নিজেই লেখেন—

'এ স্থলে ইহাও জিজ্ঞাসা হতে পারে, আমি এতদ্দেশীয় প্রাচীন পুরানো ইতিহাস হইতে কোনো উপাখ্যান না লইয়া আধুনিক রাজপুতেতিহাস হইতে তাহা গ্রহণ করিলাম, ইহার কারণ কী? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে পুরানে ইতিহাস বর্ণিত বিবিধ আখ্যান ভারতবর্ষীয় সকল লোকের কণ্ঠস্থ বলিলেই হয়...

পরন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অন্তর্ধানকালবধি বর্তমান সময় পর্য্যান্তেরই ধারাবাহিক প্রকৃত পুরাবৃত প্রাপ্তব্য। এই নির্দিষ্ট কালমধ্যে এ দেশের পূর্বতন উচ্চতম প্রতিভা ও পরাক্রমের যে কিছু ভগ্নাবশেষ, তাহা রাজ্যপুতানা দেশেই ছিল। বীরত্ব, ধার্মিকত্ব প্রভৃতি নানা সদগুণালঙ্কারে রাজপুতেরা যে রূপ বিমণ্ডিত ছিলেন, তাঁহাদিগেব পত্নীগণও সেইরূপ সতীত্ব এবং সাহসিকত্ব গুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতএব স্বদেশীয় লোকের গরিমা প্রতিপাদ্য পদ্যপাঠে লোকের আশু চিত্তকর্ষণ এবং তদ্দৃকটান্তের অনুসরণ প্রবৃত্তি পধদারন হয়, এই বিবেচনায় আমি উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবলম্বন পূর্ব্বক রচিত করিলাম।'[২৯]

রঙ্গলালের পৃষ্ঠপোষকরা এই ধারণা মেনে নিয়েই এগিয়েছিলেন যে তৎকালীন শিক্ষা, সম্পূর্ণভাবে পরাধীনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। কারণ একসময় যা ছিল বাঙলা কাব্যের প্রধান আকর্ষণতা আদিরসাত্মক বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি কাব্যের অক্ষম অনুকরণে বাংলা দেশ ভরিয়া যায়। কবি সম্প্রদায়ও সেই কালে বিরহ হইতে খেউড় গানে অধঃপতিত বাঙলা জাতিকে প্লাবিত করিতে থাকেন। ইহারই অব্যবহিত পরে রামনিধি গুপ্ত ও দাশরথি রায়ের আবির্ভাব, তাঁহাদের কাব্যও সুরে লতায়িত, শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত পাদপ তখনও দৃষ্টগোচর হয়নি। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খণ্ড খণ্ড কবিতায় বাঙলা কাব্যে নূতনত্ব ও দৃঢ়ত্ব সম্পাদনে ব্রতী হন। বৃহত্তর কাব্য রচনা করিয়া মোড় ফিবাইবার গৌরব রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের।'[৩০]

রঙ্গলাল দীর্ঘকাল ১৮৭০-১৮৮২ সালের এপ্রিল পর্যন্ত রাজকর্মে নিযুক্ত ছিলেন। সরকারি কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের পর তাঁর স্বাস্থ্যহানি ঘটে ও পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী থাকার পর ১৮৮৭ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ১৮৭০-৮০-র দশক থেকে শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চেতনায় বিজিত জাতির আত্মমোক্ষণের প্রচেষ্টার প্রথম পর্ব শুরু হয়।[৩১] এই সময় বলেন্দ্রনাথ প্রভৃতি লেখকরা পাশ্চাত্য দেশ থেকে আসা বিপ্লবের তরঙ্গকে স্বাগত জানান। এর ফলে একদিকে ইতিহাসের নতুন পাঠ, অন্যদিকে বিদেশি রোমান্টিক সাহিত্যের আকর্ষণে বাঙলায় যে কাব্য রচনা হতে থাকে, পদ্মিনী উপাখ্যান তার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

রঙ্গলালের উপাখ্যান কিন্তু টড থেকে গৃহীত, জায়সি বা আলাওল থেকে নয়। কাহিনীর বিন্যাসও তাই এখানে ভিন্ন। এইজন্যই পদ্মিনী উপাখ্যানকে বিশ্লেষণের আগে প্রয়োজন টডের জনপ্রিয়তার বিচার। উল্লেখ্য যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে 'রাজস্থান'-এর মতো সুবিশাল গ্রন্থের অনুবাদ পাওয়া যায়। ১৮২০ সালে কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার টডের 'রাজস্থান'-এর অনুবাদে উদ্যোগী হন, যদিও তিনি নিজের নাম ব্যবহার করেননি। তাঁর 'রাজস্থানের ইতিবৃত্ত' পাঁচটি খণ্ডে প্রকাশিত হয় (১৮৭২-৭৩)।[৩২] উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে গোপাল মুখোপাধ্যায় টডের 'রাজস্থান'-এর অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ 'পবিত্র রাজস্থান' নামে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। 'চারুবার্তা'র ভূতপূর্ব সম্পাদক বজ্রেশ্বর বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক অনুদিত এবং অঘোরনাথ বরাট কর্তৃক প্রকাশিত 'রাজস্থান' নামক টডের গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়

১২৯০ বঙ্গাব্দে। দুই খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থটির দ্বিতীয়টি প্রকাশিত হয় ১২৯১ বঙ্গাব্দে। গ্রন্থটির মুখবন্ধে *প্রকাশক (অঘোরনাথ বরাট) টডের সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন—*

"ভারত মধ্যযুগের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত সকলের অধিগম্য হইয়াও হয় নাই। ক্রমে পাশ্চাত্য দেশসমূহের সহিত ভারতের সম্বন্ধ বন্ধন হইতে লাগল, ক্রমে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ভারতের অতীত গৌরবের বিষয় অল্পে অল্পে জানিতে পারিয়া তাহাদের কীর্তিসাগর মন্থন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সেই মন্থন হইতে অনেকগুলি ঐতিহাসিক রত্ন ক্রমে ক্রমে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সকলের মধ্যে রাজস্থান অন্যতম। ইহা ভারত রত্নাকরের অমূল্য রত্ন বিশেষ।

... মহাত্মা কর্ণেল টড ভিন্ন দেশীয় ও ভিন্ন জাতীয় হইযাও যেরূপ কঠোর পরিশ্রম, অপরিসীম অধ্যবসায়, মহৎ আত্মত্যাগ এবং অন্যান্য সাধারণী অনুসন্ধিৎসা সহকারে ভারতবর্ষীয় পতিত আর্য বীরগণের কীর্তিকলাপ সমুদ্ধার করিয়াছেন, তাহা ভাবিতে গেলে হৃদয় সহসা বিমলা কৃতজ্ঞতারসে অভিসিঞ্চিত হয় এবং স্বজাতি ও বিজাতি ভুলিয়া ভক্তিরূপ প্রসূনমালা লইয়া তাঁহাকে দেবভাবে পূজা করিতে অগ্রসর হয়। যদি তিনি এই ভারতক্ষেত্রে পদার্পণ না করিতেন, তাহা হইলে ভারতের প্রাচীন কীর্তি উদ্ধৃত হইত কিনা তাহা কে বলিতে পারে?'[৩৩]

রঙ্গলাল নিজেকে স্বাধীনতার পুরোহিত ও টডের মন্ত্রশিষ্য হিসেবে দেখেছেন। অতীত সঞ্চারী পাঠক চিতোব দূর্গ দেখেই ভাবতের অতীত গৌববেব কথা মনে করেন—

মানসে করেন চিন্তা কোথায় সে দিন?
যে দিনে ভাবতভূমি ছিলেন স্বাধীন॥[৩৪]

যে নতুন রূপক এই কাব্যে সৃষ্টি হয়েছে, তা সম্পূর্ণভাবে টডের অনুসারী। এখানে প্রণয় গাথা অত্যন্ত স্বল্প। আলাউদ্দিন বিধর্মী রাজা, যার মূল উদ্দেশ্য হিন্দু নিধন ও হিন্দু নারীব সতীত্ব নাশ। এক ধরনের উগ্র হিন্দুত্ব এই আখ্যানে গড়ে উঠেছে যার প্রধান নায়ক টডের nationalist রাজপুত। তাই রঙ্গলালের পঙ্‌ক্তিগুলি স্বদেশী আন্দোলনের মন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল—

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায় হে?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়?
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে
নরকের প্রায়
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ সুখ তায় হে
স্বর্গ সুখ তায়।

সার্থক জীবন আর বাহু বল তার হে
বাহু বল তার
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে
দেশের উদ্ধার"

পদ্মিনী এখানে আর শুধুমাত্র কাব্যের নায়িকা নন, পদ্মাবতী থেকে তিনি রূপান্তরিত হয়েছেন শাশ্বত সতীত্বে—

ওরে সখি আজ রে সুদিন
ঘটিয়াছে ভাগ্যাধীন।
শুধিব জীবন-দানে পতি-প্রেম-ঋণ

সতিত্ব সকল ধর্মসার
যার নাহি পর আর
যুগে যুগে ক্ষত্রিয়ের এই ব্যবহার।

এখানে স্বাধীনতার অনুষঙ্গ বার বার চিত্রকল্পে ফিরে এসেছে মৃত্যু ও মুক্তি রূপে। স্বাধীনতা এখানে আত্মত্যাগ ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে সমগ্র সত্তা নিয়ে বিদ্রোহ। কিন্তু যে রোমান্টিক প্রতিরোধ আমরা লক্ষ্য করি সেখানেও আপস থাকে।

ইংরাজের কৃপাবলে
মানস উদয়াচলে।
জ্ঞানভানু প্রভায় প্রচার।

(৫)

বাঙালীর অবচেতনে নারীর সতীত্ব ও জাতীয় সম্মান উনবিংশ শতক থেকেই ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তাই ইতিহাসকে পুনর্নির্মাণ করা হয় পুরাকাহিনীর আদলে। ভারতীয় পরম্পরাব সন্ধানে ব্যাপৃত সাহিত্যিক ও শিল্পীদের কাছে যে রূপকল্প প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায় তা দেশকে শুধু মাতৃকারূপে নয়, একই সঙ্গে সতী ও দেবী হিসাবে চিহ্নিত করে। এই রূপকল্প নির্মাণের প্রধান শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ।

১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে অবনীন্দ্রনাথের 'বাজকাহিনী' প্রকাশিত হয়। এই সময়ে স্বদেশী আন্দোলনেব জোয়ারে নতুন করে অতীতেব শিল্পসাহিত্যকে বিশ্লেষণ করা চলছিল। অবনীন্দ্রনাথের অবদান সম্পর্কে বিনোদবিহারী লেখেন—

'অতীতে ধর্মকর্ম, আধ্যাত্মিক সাধনা একত্রিত হয়ে যে সময় শক্তিশালী জাতীয় আন্দোলন রূপে আত্মপ্রকাশ করে ঠিক সেই মুহূর্তে ভারতীয় শিল্পসাধনার অতীত গৌরবকে প্রতিষ্ঠিত করার আয়োজন দেখা দেয় (১৯০৫) অবনীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে Art School-কে কেন্দ্র করে।'[৩৮]

সেই সময় আর্ট স্কুলে ভর্তি হতে গেলে ছাত্রদের স্কুল ফাইনালের সার্টিফিকেট উপস্থিত করতে হতো না। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন পুরাণ, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে পরিচয় হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তাই তিনি ছাত্রদের পুরাণ, ইতিহাস এবং অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। 'রাজকাহিনী' কিশোর পাঠ্য ইতিহাস হিসাবেই রচিত হয়।

অবনীন্দ্রনাথ অবশ্য তথাকথিত ইতিহাস রচনায় আগ্রহী ছিলেন না। এই বিশ্লেষণ তিনি নিজেই করে যান—

'ইতিহাসের ঘটনাগুলো পাথরের মতো সুনির্দিষ্ট শক্ত জিনিষ, একচুল তার চেহারার অদলবদল করার স্বাধীনতা নেই ঐতিহাসিকের, আর ঔপন্যাসিক, কবি, শিল্পী এদের হাতে পাচনও রসের দ্বারা সিক্ত হয়ে কাদার মতো নরম হয়ে যায়, রচয়িতা তাকে যথা ইচ্ছা রূপ দিয়ে ছেড়ে দেন। ঘটনার অপলাপ, ঐতিহাসিকের কাছে দুর্ঘটনা, কিন্তু আর্টিস্টের কাছে সেটা বড়ই সুঘটন বা সুপঠনের পক্ষে মস্ত সুযোগ উপস্থিত করে দেয়।'[৩৯]

'রাজকাহিনী'তে অবনীন্দ্রনাথ কথা দিয়ে দৃশ্যকে গড়ে তোলেন। পাশ্চাত্য শিল্পে History

painting-এর যে বিশেষ চল ছিল, সেই আঙ্গিকে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার নানা ঘটনা চিত্রণের মধ্যে দেখা দেয়। অবনীন্দ্রনাথের শিল্প আদর্শ এই ধরনের ফটোগ্রাফিক দৃশ্যকল্পনার বিরুদ্ধ ছিল। বরং তিনি অতীত ঘটনার মধ্যে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত খুঁজতেন, এর ফলে তাঁর লেখার মধ্যে চারণ সুফির কথকতার রেশ পাওয়া যায়।...

"বাপ্পাদিত্যের সময় মুসলমানেরা ভারতবর্ষের প্রথম পদার্পণ করেন। তারপর থেকে সূর্য বংশের অনেক রাজা অনেকবার চিতোরে সিংহাসন বসেছেন। রাজসিংহাসন নিয়ে কত ভায়ে ভায়ে বিচ্ছেদ, কত মহা-মহা যুদ্ধ, কত রক্তপাত, কত অশ্রুপাতই হযে গেছে।" যুদ্ধ যে শুধু মুসলমান আর হিন্দুদের মধ্যেই হয় না। এই ক্ষমতার লড়াই যে রাজপুতদের মজ্জাগত তা অবনীন্দ্রনাথ ভোলেননি। এখানে তিনি রবীন্দ্রনাথের মত মানতেন। "ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্ত করিয়া পরীক্ষা দিই তাহা ভারতর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্নকাহিনী মাত্র..., কিন্তু এই বক্তবর্ণে রঞ্জিত পরিবর্তমান স্বপ্নদৃশ্যপটের দ্বারা ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিলে যথার্থ ভারতবর্ষকে দেখা হয় না।[৪০]

'তখন বসন্তকাল। সমস্ত চিতোর জুড়ে দিকে দিকে আনন্দের রোল উঠেছে— 'হোরি হ্যায়, হোরি হ্যায়।' ঘরে ঘরে আবিরের ছড়াছড়ি, আর বাসন্তী রঙেব বাহাব। সেই ফাগুনে, ভরা আনন্দ আর হাসি খেলার মাঝখানে একদিন চিতোরে খবর পৌঁছল আলাউদ্দিন আসছেন— ঝড়ের মুখে প্রদীপের মতো চিতোরের সমস্ত আনন্দ একনিমেষে নিবে গেল।'[৪১]

আবিরের লাল ও যুদ্ধে মৃত সৈনিকের লাল রক্তের পার্থক্য অবনীন্দ্রনাথের বর্ণনায় মূর্ত। তাঁর ঐতিহাসিক দর্শন ববীন্দ্রনাথের নির্দেশ মতো মানুষের ঘবের মধ্যে ঢুকে তাঁদেব সুখ দুঃখ, দৈনন্দিন জীবনকে লক্ষ্য করছিল। তারপর আঁকা হয়েছিল লাল রঙের ছবি যেখানে আনন্দ ও দুঃখ পাশাপাশি অবস্থান করে। পদ্মিনীর জহরব্রতের বর্ণনায় এই চিত্রকল্প খুব স্পষ্ট—

'বারো হাজার রাজপুতানীর সঙ্গে রাণী পদ্মিনী অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন— চিতোরের সমস্ত ঘরের সমস্ত সোনামুখ মিষ্টি কথা আর মধুর হাসি নিয়ে এক নিমেষে চিতার আগুনে ছাই হয়ে গেল।'[৪২]

অবনীন্দ্রনাথ যখন রাজকাহিনী লিখছিলেন, সেইসময় অধ্যয়ন কবছিলেন প্রাচীন মূর্তিতত্ত্ব। হ্যাভেল ও কুমারস্বামী তাঁর ছাত্রদের কাছে উন্মোচন করছিলেন প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্র। একই সময়ে পড়া হচ্ছিল নৃতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব। বিনোদবিহারী নিজের শিল্প শাস্ত্র পাঠ ও শিল্প অভিজ্ঞতার একটি গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা দিয়েছেন, 'ভাবতের প্রত্যেক অঞ্চলে নবনারীর দৈহিক গঠনের ক্ষেত্রে ভঙ্গির মিল থাকলেও গঠনের বৈচিত্র্য প্রচুর। পদ্মিনী, শঙ্খিনী, হস্তিনী ইত্যাদি কতকগুলি তুলনা ভারতীয় মূর্তির সঙ্গে করা হয়ে থাকে। এই ধারণার সঙ্গে যদি আমরা একবার ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন জাতির অনুপ্রবেশ স্মরণ করি এবং সেই পথে অনুসন্ধান করি, তাহলে আমবা দৈহিক গঠনের বিভিন্ন আদর্শের সন্ধান পাব, যেমন সাঁচির যক্ষী মমল্লপুরের মহিষাসুরমর্দিনী, বাঙলার গঙ্গামূর্তি। এরা কেউই পদ্মিনী নন (গুপ্তযুগের দেবীমূর্তিতেই পদ্মিনীর প্রথম আবির্ভাব)।' অবনীন্দ্রনাথ নিজেও বিমূর্ত ধারণা থেকে কীভাবে মূর্তি সৃষ্টি হয় তার একাধিক আলোচনা করেছিলেন।

'ঐতিহাসিকের মাপকাঠি ঘটনামূলক, ডাক্তারের মাপক'ঠি কায়ামূলক আর রচয়িতা যারা তাঁদের মাপকাঠি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ামূলক।... রচয়িতাকে অনেক সময় অবস্তুকে বস্তুজগতে, স্বপ্নকে জাগরণের মধ্যে টেনে আনতে হয়। রূপক রসে, রসকে রূপে পরিণত করতে হয়।'[৪৩]

এ-ক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথ টডকে অনুসরণ করেই পদ্মিনীর কাহিনী লেখেন। গল্পের মূল কাঠামোতে তাঁর ও রঙ্গলালের রচনার বিশেষ প্রভেদ নেই। জাতীয়তাবাদী যে মতাদর্শ দুজনকেই অনুপ্রাণিত করেছিল তার প্রভাবে অবনীন্দ্রনাথ গড়ে তুলেছিলেন সতীত্বের এক আদর্শ মূর্তি। পরবর্তীকালে তা

নন্দলালের বিখ্যাত ছবি 'সতী'র সমালোচনায় প্রকাশ পায়। যদিও অবনীন্দ্রনাথ তাঁর কাহিনী থেকে পদ্মিনী ও ভীমসিংহের একটি ছবিই এঁকেছিলেন।

"পদ্মিনী বলে উঠলেন— 'রাণা, এখানে সমুদ্র ছিল, আমি তো জানি না মাগো, সাদা সাদা ঢেউ উঠছে দেখ।' ভীমসিংহ হেসে বললেন, 'পদ্মিনী, এ যে সে সমুদ্র নয়; এ পাঠান বাদশার চতুরঙ্গ সৈন্যবল। ঐ দেখ, তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত শিবিরশ্রেণী, জলের কল্লোলের মত ঐ শোন সৈন্যের কোলাহল।"[৪৪]

কেন শুধু এই ঘটনাটি অবনীন্দ্রনাথ বেছে নিয়েছিলেন, তার সম্পর্কে তাঁর কোনো মতামত জানা যায়নি। তাঁর আখ্যানের যে অংশটি পাঠকের কল্পনায় সবচেয়ে প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা হল, পদ্মিনীর মানুষী থেকে দেবীতে রূপান্তর।

'যখন দ্বিপ্রহরে স্তব্ধ রাজপুরে হাজার হাজার রাজপুত বীরের চোখের সম্মুখে আবার সেই দেবীমূর্তি 'ম্যায় ভুখা হুঁ' বলে প্রকাশিত হলেন, তখন আর কারো মনে কোনো সন্দেহ রইল না।'

কেবল রাণা ভীমসিংহ যেন সেই দেবীমূর্তির ভিতরে পদ্মিনীকে দেখে মনে-মনে তোলপাড় করতে লাগলেন, একি দেবী না পদ্মিনী? পদ্মিনী না দেবী?

তারপর মহাবলির উদ্যোগ হোল।'[৪৫]

সমগ্র বর্ণনার মধ্যে দিয়ে হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের যে রূপ ফুটে ওঠে তা একদিকে ভয়ঙ্কর অন্যদিকে স্বদেশী মতাদর্শের পূর্ণ প্রকাশ। পরে রবীন্দ্রনাথ অবনীন্দ্রনাথ দুজনেই স্বদেশীয়ানার এই ধর্মীয় আতিশয্যে বিতৃষ্ণা বোধ করেন। অবনীন্দ্রনাথ ইতিহাসের অন্য পাঠ গ্রহণ করেন, যেখানে সাজাহান ছিলেন নায়ক। তাজমহলের রূপকার, সৌন্দর্য ও শিল্পের ভক্ত এই মুঘল সম্রাট রবীন্দ্রকাব্যেও সমাদৃত। এই সময়ে রাজপুত বীরত্বের কাহিনীর চেয়ে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন অবনীন্দ্রনাথের ছবিতে, বিশেষ করে আরব্য রজনীর ছবিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মুঘল চিত্র ও কাহিনীর বিন্যাস হয়ে দাঁড়ায় তাঁর মূল প্রেরণা।

রাজকাহিনীর প্রভাব অবশ্য রয়ে যায় তাঁর উত্তরসূরীদের মধ্যে। অসিত কুমার হালদার 'রাজগাথা' নামে রাজকাহিনীর কয়েকটি কবিতা প্রকাশ করেন ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে (১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে)। গ্রন্থটির চিত্রগুলিও তিনিই আঁকেন। ভূমিকায় শিল্পী লেখেন—

'বলা বাহুল্য, টডের রাজস্থান থেকেই প্রধানত 'রাজগাথা'র গল্পগুলির উপকরণ নেওয়া হলেও পূজনীয় শিল্পগুরু শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রচিত 'রাজকাহিনী'র মধুর কাব্য-চিত্রবৎ গল্পগুলি এবং শ্রীমতী অ্যানি বেসেন্টের The Sweet Songs of Rajputana নামক মীরা বাইয়ের গল্পটি বিশেষ প্রেরণা দিয়েছে।'[৪৬]

মোট নয়টি গল্পের মধ্যে মৎপ্রণীত 'রাজগাথা' গ্রন্থে শিলাদিত্য, গোহ, বাপ্পাদিত্য ও পদ্মিনী এই চারটি গল্পের স্থানে স্থানে পূজনীয় শিল্পগুরু লেখা রাজকাহিনীর অন্তর্গত উপমা, তুলনা এবং পরিকল্পনার অনুসরণ করা হয়েছে মনোজ্ঞ বোধে।[৪৭]

অসিত কুমার অবনীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর শিল্পে সাহিত্যগত উপাদান স্বীকৃত। তাঁর লেখা ও ছবি দুটি আঙ্গিকেই রবীন্দ্রনাথ ও বাংলা সাহিত্যগোষ্ঠীর যোগাযোগ স্পষ্ট। অবনীন্দ্রগোষ্ঠী যে শিল্পীদের মধ্যে রূপকধর্মী চিত্র রচনার ধারা গড়ে উঠেছিল, অসিতকুমার তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। অবশ্য একই সঙ্গে শিল্পের যে তাত্ত্বিক দিক আছে এবং তার বিশ্লেষণ যে প্রয়োজন একথা তিনি মানতেন।

'মহাকবি কালিদাসের যেমন মল্লিনাথ, তেমনই শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের এই যুগপ্রবর্তক কীর্তি

প্রচার করতে ও বোঝাতে হ্যাভেল এবং কুমারস্বামীর প্রয়োজন ছিল। এবং আমরা শিল্পীরা যারা তাঁদের অনুসরণ করে চলেছি, তাদের প্রত্যেকের কাজ কালের নিকটে ধরা পড়বে। কালিঘাটের পটচিত্রের অনুকরণ বা বিলিতি অতি আধুনিক আর্টের নকল আমাদের দেশে এখন যে কয়েকজন করবেন, তা সাময়িক মোহ বা উত্তেজনা মাত্র, ফ্যাসনের মত অচিরেই লোপ পাবে।'[৪৮]

অসিত কুমারের শিল্প সম্পর্কে দায়বদ্ধতা নিয়ে বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য এক্ষেত্রে খুবই প্রযোজ্য— 'নিছক রূপ সৃষ্টি সার্থক-শিল্পীর আদর্শ হতে পারে না। সত্য ও সুন্দরকে রূপায়িত করাই শিল্পীর লক্ষ্য।'

'রাজগাথা' শিল্পীর শেষ জীবনের কাজ। এসময়ে তিনি লক্ষ্ণৌর বাসিন্দা। ১৯২৪ সালের লক্ষ্ণৌ আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন, তারপর থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই শহরেই কাটান। রাজগাথা যদিও এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়। এর চিত্রগুলি তাঁর শ্রেষ্ঠ কাজের সঙ্গে তুলনীয়। পদ্মিনী (পৃ. ১২২), দর্পণে পদ্মিনী (পৃ. ১৩৮), জহর ব্রত (পৃ. ১৬০) তিনটিই রেখাচিত্র। এর মধ্যে তাঁর আঙ্গিকের পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে। সেই সঙ্গে ফুটে উঠেছে পদ্মিনী উপাখ্যানে তিনটি বিশেষ মুহূর্ত। একই সঙ্গে নাটকীয় ও মধ্যযুগের নারী জীবনের কয়েকটি দিক। যখন বহিঃশত্রুর আক্রমণের থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় ছিল মৃত্যু। শত্রু এখানে সেই 'অপর' যে অনায়াসে ধ্বংস করে মানুষের জীবন, যে ইতিহাসের পাতায় শত্রু হিসেবে চিহ্নিত—

'লক্ষ লক্ষ সেপাই শাস্ত্রী
ধনু বল্লম হাতে
আলাউদ্দিন সাথে চলে সবে
পদ্মিনী রাণী আনতেই হবে
লুট করি পথে বসতি সবার
আহ্লাদে তারা মাতে।[৪৯]

অবনীন্দ্রনাথের বর্ণিত পদ্মিনীর কাহিনী থেকে অসিতকুমার কয়েকটি স্বল্প পরিবর্তন করেছিলেন, তার মধ্যে একটি হল পদ্মিনীর উবরদেবীর মন্দির যাত্রা। অবনীন্দ্রনাথের বর্ণনায় পদ্মিনী উবরদেবীর ভৈরবীর সঙ্গে একাই দেখা করেন ও তারপর দেবীর গহনা নিয়ে ফিরে আসেন— তখনই তিনি জহরব্রত উদ্‌যাপন করবেন, স্থির করেছেন। অসিতকুমারের লেখায় এর আর একটি রূপ আমরা পাই—

'পূজিবার তরে উবর দেবীরে
পদ্মিনী লয়ে রাণা যান ধীরে
মন্দির পরে ডাকিনী গৃধিনী
রয়েছে বিকট চাহি।[৫০]

রাণা ভীমসিংহ স্ত্রীকে নিয়ে এসেছেন চিতোরেশ্বরীর মন্দিরে, দুজনেই জানেন মৃত্যু অনিবার্য। তাই সেই মহাবলির জন্য তাঁরা পূজা দিতে আসছেন। এর যে ভৌতিক দিক যা অন্যদের লেখা অনুপস্থিত, শ্মশানের যে রূপ মানুষকে বিচলিত করে, এখানে শিল্পী তার বর্ণনা দিয়েছেন।

অসিত কুমারের রচনায়— চিত্র ও কাব্যে অবনীন্দ্রনাথের প্রভাবে একদিকে ভারতীয়ত্বের গভীরে প্রবেশের চেষ্টা, অন্যদিকে বর্তমানে আধুনিকতা বিশেষ করে পাশ্চাত্য শিল্পের অনুকরণে প্রবৃত্ত শিল্পীদের প্রতি তিরস্কার লক্ষ্যণীয়।

'রাজগাথা' (১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে রচিত) একদিকে অবনীন্দ্র পরম্পরার একটি বিশেষ গোষ্ঠীর দলিল, যাঁরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন একই সঙ্গে শিল্পীর স্বাধীনতা ও জাতীয়তাবোধ— যা আন্তর্জাতিকতাকে গ্রহণ করে, কিন্তু তার নিজস্ব শিল্পসত্তাকে বিসর্জন দিয়ে নয়।

(৬)

প্রবাসীর ১৩৩৭ সালের ফাল্গুন সংখ্যায় কালিকারঞ্জন কানুনগো 'পদ্মিনী উপাখ্যান ও তার ঐতিহাসিকতা' নামে প্রবন্ধ লেখার পরেই ১৩৩৮ সালের চৈত্র সংখ্যায় নিখিলনাথ রায়ের 'পদ্মাবতী একখানা ঐতিহাসিক কাব্য' প্রকাশিত হয়। বেধে যায় তুমুল বিতর্ক— সাহিত্যকে ইতিহাসের উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা যায় কি না? এ-সমস্যা আজও সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকরা সমাধান করতে পারেননি। কালিকারঞ্জনের মতে "নিতান্ত সমসাময়িক না হইলে কোনো কাব্যকে ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা বড়ই বিপজ্জনক। মারাঠী 'শিবভারত', সংস্কৃত 'রামচবিতম', 'পৃথ্বীরাজ দিগ্বিজয়ম', হিন্দী 'সুজান চরিত' ইত্যাদি ঐতিহাসিক কাব্য— কেননা এগুলি দরবারী কবিরা রাজার আদেশে লিখিয়াছিলেন— চাটুবাদগুলি বাদ দিলে এইগুলি হইতে সত্য ইতিহাস বাহির হইয়া পড়ে।"[৫১] এই মত মানলে আলাউদ্দিনের চিতোর জয়ের সঙ্গে কোনো নারী সম্পৃক্ত নন। চিতোর জয়ের প্রতক্ষ্যদর্শী আমীর খসরুর রচনায় পদ্মাবতী বা পদ্মিনী কোনো উল্লেখ নেই। জিয়াউদ্দিন বাবণী তাঁর তরিখ-ই-ফিরোজশাহী গ্রন্থে সম্রাট আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করলেও ভীমসিংহ, পদ্মিনী, লক্ষ্মণ সিংহ কারোর কোনো নাম করেননি। যারা করেছেন তাঁরা হলেন মহম্মদ আবুল কালেম ফিরিস্তা, দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর দরবারে আশ্রিত ঐতিহাসিক। তাঁর রচনাকাল খ্রিস্টিয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগ। কয়েকজন ঐতিহাসিকের মতে ফিরিস্তা রোমাঞ্চকর যত গালগল্প শুনতেন সবই তাঁর পুস্তকে স্থান করে দিতেন। অতএব তিনি একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নন।

পদ্মিনীকে ইতিহাসে স্থান করে দেবার মূল সূত্রগুলি হল জায়সির পদ্মাবৎ কাব্য যা ঘটনার প্রায় দেড়শো বছর বাদে রচিত। রাজস্থানে ভাটরা এই কাহিনী সংগ্রহ করেন জায়সির কাব্য থেকে, টড ভাটদের গান থেকে গড়ে তোলেন তাঁর রোমাঞ্চকর গাথা। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকদের— যেমন গৌরী শঙ্কর ওঝা ও কে.এস. লালের কাছে পদ্মিনীর কোনো গুরুত্ব নেই।

ঐতিহাসিকের কাছে উপাদান অনেক সময় তথ্যের চেয়ে মূল্যবান হয়ে ওঠে। মধ্যযুগের ইতিহাসের ক্ষেত্রে আকর গ্রন্থগুলি শাসকশ্রেণীর মতাদর্শকেই প্রচার করে। 'এখানে শুধুমাত্র প্রশস্তিকে বাদ দিলেই বাস্তব ইতিহাসকে ধরা যাবে।' কালিকারঞ্জনের এই ধারণাও গড়ে উঠেছিল তাঁর সমকালীন ঐতিহাসিকদের ইতিহাস চর্চার পরিপ্রেক্ষিতে। এখানে মধ্যযুগের লেখকের মতাদর্শ, উপাদান রচনার প্রেক্ষিত ও আঙ্গিক মূল্যায়ন থেকে বাদ পড়ে যায়। রাজস্থানের ইতিহাসের বিভিন্ন পাথুরে প্রমাণের পিছনে কাজ করছিল রাণার ক্ষমতার বৈধকরণের প্রচেষ্টা, সেখানে প্রতিরোধই কাহিনীর প্রধান উপজীব্য। অন্যদিকে সুলতানী ও মুঘল দরবারী ঐতিহাসিকরা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন তাঁদের পৃষ্ঠপোষকদের ক্ষমতা বিস্তারের কাহিনী। এখানে একটি কাহিনী, অপরটির পরিপূরক। তাই একই কাহিনী বিভিন্নভাবে বিবৃত হয়। দুটি কাহিনীরই কেন্দ্রে থাকেন নায়ক— যিনি আক্রমণ করছেন এবং যিনি তার বিরুদ্ধে লড়ছেন। 'আলাউদ্দিন ও পদ্মিনী'র আখ্যানে আলাউদ্দিনই নায়ক। ইতিহাস ও সাহিত্যে তাকেই বারবার নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে। নায়িকা পদ্মাবতী একবার আধ্যাত্মিক প্রেমের প্রতীক, আর একবার দাম্পত্য আদর্শের প্রতিমা। তাঁর ভূমিকা সব সময়েই গৌণ। উনবিংশ শতাব্দীতে পদ্মাবতী রূপান্তরিত হয়েছেন পদ্মিনীতে, মানুষী থেকে দেবীতে। উনিশশতকে সতীর মাহাত্ম্য বংশের

গৌরবকে বৃদ্ধি করেছে। অন্যদিকে বীরত্বের কাহিনীতে যুক্ত হয়েছে নারীর একটি প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠান রূপে জহরব্রত। পদ্মিনী মহাসতী, তাই তাঁর গহ্বর— যা গর্ভগৃহও বটে, পাহারা দেয় বিষধর সর্প, মধ্যযুগের নারীর যৌনশুচিতার রক্ষক। একই সঙ্গে তা ধর্মের প্রতীক ও দৈবশক্তির প্রকাশ। আধুনিক হিন্দুত্বের বিশ্বাস ও বাসনার সন্দর্ভ। যতদিন পদ্মিনীর মহল মাথা উঁচু করে অবস্থান করবে চিতোর গড়ের কেন্দ্রে আর তার স্মৃতিকে রক্ষা করবে ভয়ঙ্কর মৃত্যুদূত, ততদিন ঐতিহাসিকরা 'কলমের' যত ধারাল 'খোঁচা'ই ব্যবহার করুক না কেন, পদ্মিনী চিরকালই অবস্থান করবেন হিন্দু পাঠকের মানসলোকে ও সাধারণের ইতিহাস চিন্তায়।

উল্লেখপঞ্জি

১। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পদ্মিনী, রাজকাহিনী, ষষ্ঠ একত্রিত সংস্করণ, কলকাতা, ফাল্গুন ১৩৬১, পৃ. ১১।

২। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মাবতী (২য় খণ্ড) আলাওল, দ্বিতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০২, পৃ ১৪।

সম্পাদক লিখেছেন 'পদ্মাবতী ইতিহাসে নেই, কিন্তু পদ্মাবতীর একটা ইতিহাস আছে'। আমি পদ্মাবতীকে পদ্মিনী করেছি। আমার কাছে পদ্মাবতী ও পদ্মিনীর একটি পার্থক্য আছে। পদ্মাবতী শুধুমাত্র জায়সি ও আলাওলের নায়িকা। কিন্তু পদ্মিনী কালের উজান বেয়ে আজও বর্তমান বাঙালীর চিন্তায় ও সৃজনীতে বর্তমান।

৩। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদনা), পদ্মাবতী জাযসি ও আলাওল, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, জুলাই ১৯৮৪, ভূমিকা।

৪। ঐ, পরিশিষ্ট।

৫। ঐ, পরিশিষ্ট, অনুবাদ, উপসংহার, পৃ ১৭।

৬। ঐ।

৭। Ramya Sreenivasam Alauddin Khilji Remembered : Conquest, Gender and Community in Medieval Rajput Narratives, in Studies in History, 18, 2, n.s. 2002. P275.

৮। Brajadulal Chattopadhyaya. 'Origin of the Rajputs · The Political, Economic and Social Processes in Early Medieval Rajasthan' in The Making of Early Medieval India, OUP, Second Impression, 1998, P54.

৯। Irfan Habib, Barnies Theory of the History of the Delhi Sultanate in Indian Historical Review, July 1980 81, Vol VI, No. 1-2, P99-115.

১০। Hiralal Maheswari, History of Rajasthani Literature, Sahitya Akademy, New Delhi, 1980 P54.

১১। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মাবতী, প্রথম খণ্ড, ঐ, পরিশিষ্ট।

১২। ঐ, পৃ ৩৭২।

১৩। পদ্মাবতী, দ্বিতীয় খণ্ড, আত্মপরিচয় পৃ, ২০।

১৪। *Aniruddha Ray, Adventurers Land Owners and Rebels : Bengal C1575-C1715, New Delhi, P5 Richard Eaton, The Rise of Islam and the Bengal Frontier 1204-1760, OUP, 1997, P220 Francois Bernier, Travels in the Mogul Empire AD 1656-68 Trans By Archibold Constable 2nd Ed., New Delhi, 1968 P175*

১৫। *পদ্মাবতী ২য় খণ্ড, পৃ ২১।*

১৬। ঐ

১৭। ঐ

১৮। মহম্মদ এনামুল হক, মুসলিম বাংলা সাহিত্য, ঢাকা ১৯৬৮, পৃ ৯৬।

ওসমান গনী, ইসলামি বাংলা সাহিত্য ও বাংলায় পুঁথি, কলকাত, মাঘ ১৪০৬/ফেব্রুয়াবি ২০০০, বাংলার পুঁথি সাহিত্য। বাংলা সাহিত্যে প্রণয় গাথা, পৃ ৭৫-৭৬।

'ওই যুগের মুসলিম সমাজের স্বনামধন্য কবি শাহ্‌ মহম্মদ সগীর যখন প্রথম ইওসুফ জুলেখার প্রণয় কাহিনীন লিখতে শুরু করেন, তখন তাঁকেও মুসলিম সমাজের কাছে জিজ্ঞাসিত হবাব পূর্বেই কৈফিয়তের জবাব রূপে বলে দিতে হয়েছিল যে এটি পবিত্র কোরাণে আছে। পৃ ৭৬

১৯। আনিসুজ্জামান, বাঙালি নারী সাহিত্যে ও সমাজে, ঢাকা, ২০০০ পৃ ২৯। এনামুল হক, পৃ ৯৬।

২০। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মাবতী ২য় খণ্ড, পৃ ১২।

২১। ঐ, পৃ ৪০৩।

২২। Simon Digby, The Sufi Shaikh as a Source of Authority in Medieval India in Purusarth, Vol 9, 1986, P 57-77.

২৩। James Tod, Annals and Antiquities of Rajasthan, Vol I, Author's Introduction

২৪। Tod, Annals, Vol I, P 213

২৫। Tod, Annals, Vol I, P 214.

ভারতীয় ঐতিহাসিকরা রাজপুত ইতিহাসের বীরগাথাগুলিতে গুরুত্ব না দেওয়াতে টড অত্যন্ত মর্মাহত হন।

'Much disppointment has been felt in Europe at the sterility of the historic muse of Hindusthan ' অবনীন্দ্রনাথ, রাজকাহিনী, পৃ ৭৭।

২৬। Tod, P 214-15

রাজকাহিনী, পৃ ৭৯।

২৭। Norbert Peabody, Tod's Rajasthan and the Boundaries of Imperial Rul in Nineteenth Century India, University of Cambridge in Modern Asian Studies : Vol. 30, 1996, Printed in Great Britain, P 205-206.

২৮। রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, পদ্মিনী উপাখ্যান, ১৮৫৮ সনে প্রথম প্রকাশ। সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, ১৮৭২, তৃতীয় সংস্করণ, ভূমিকা।

২৯। ঐ

৩০। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনী কান্ত দাস সম্পাদক, পদ্মিনী উপাখ্যান, সম্পাদকীয় ভূমিকা।

৩১। *মালিনী ভট্টাচার্য, পরাধীনের রোমান্টিকতা ও যুগসন্ধির রবীন্দ্রনাথ, পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, সুশোভনচন্দ্র সরকার স্মারক বক্তৃতা কলকাতা, ২০০২, পৃ ১০।*

৩২। *বরুণ কুমার চক্রবর্তী, টডের রাজস্থান ও বাঙলা সাহিত্য, ১লা বৈশাখ, ১৩৮৮, পৃ ২৪, ২১৪।*

৩৩। ঐ, পৃ ২১৫।

৩৪। রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়, পদ্মিনী উপাখ্যান, পৃ ২২।

৩৫। ঐ, পৃ ১০০, ১০১।

৩৬। ঐ, পৃ ১০১।

৩৭। ঐ, পৃ ১০৯।

৩৮। বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়, চিত্রকথা, কলকাতা ১৯৮৫, পৃ ১২৩।

৩৯। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী শিল্প ও দেহতত্ত্ব, কলকাতা ১৯৬২, পৃ ৮৭।

৪০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতবর্ষের ইতিহাস, রবীন্দ্র রচনাবলী, (পশ্চিমবঙ্গ সরকার) ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৩৯৭, পৃ ১২১।

৪১। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজকাহিনী, পৃ ৬৯।

৪২। ঐ, পৃ ৯৫।

৪৩। বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়, চিত্রকথা, ভারত শিল্প, পৃ ৩৩।

৪৪। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজকাহিনী, পৃ ৭০।

৪৫। ঐ, পৃ ৯১।

৪৬। অসিত কুমার হালদার, রাজগাথা, এলাহবাদ, ১৩৫৫, ১৯৪৯, ভূমিকা।

৪৭। ঐ

৪৮। ঐ

৪৯। বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায়, চিত্রকথা, অসিত কুমার হালদার, পৃ ২৮২।

৫০। অসিত কুমার হালদার, রাজগাথা, পৃ ১২৬।

৫১। কালিকারঞ্জন কানুনগো, রাজস্থান কাহিনী, 'পদ্মাবত কাব্য ও পদ্মিনীর অনৈতিহাসিকতা', কলকাতা, আষাঢ়, ১৩৭৫, পৃ ২২১।

চার্বাক জড়দর্শন

রমেন্দ্রনাথ ঘোষ

ভারতীয় দর্শন বলিতে আমরা কেবল আধ্যাত্মিক দর্শন বুঝি না। ভারতীয় মনন এবং লোক ব্যবহারে যে জড়বাদী ও বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী মতবাদও প্রচলিত ছিল চার্বাকদর্শন ইহার একটি প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় দৃষ্টান্ত। ইহা একটি বেদবিরোধী, ধর্মমোক্ষবিরোধী, দেহাত্মবাদী, প্রত্যক্ষবাদী এবং বস্তুবাদী দর্শন। বস্তুবাদী দর্শন হিসাবেও এই দর্শনটি খুব সূক্ষ্মরূপ লাভ করিতে পারে নাই। সরল জড়বাদের পর্যায়ে রহিয়াছে। নানা প্রতিকূল সামাজিক অবস্থার কারণে ইহার বিস্তৃতি ঘটে নাই। সুতরাং অপরিপুষ্ট এবং অনুন্নত থাকা খুবই স্বাভাবিক। যাহারা বৈদিক আত্মতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব এবং মোক্ষতত্ত্বের অনুশীলন করিতেন এবং বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রতিভূ ছিলেন তাঁহাদের চোখে এই দর্শন খুবই নিন্দনীয় এবং হেয় বলিয়া গণ্য হইত। এমনকি 'ত্রিপিটক' গ্রন্থেও'[১] চার্বাক-দর্শন 'তিরচ্ছান বিজ্জা'[২] বা নীচ বিদ্যা হিসাবে নিন্দিত এবং নিষিদ্ধ হইয়াছে। বুদ্ধ নিজেই এই বিদ্যার অনুশীলন করিতে নিষেধ করেন। কাম এবং অর্থকে পুরুষার্থ মনে করিয়া লোকায়ত বিশ্বাস এবং আচরণের ক্ষেত্রে কিছুটা বাড়াবাড়ি হইত। বৌদ্ধ দর্শনও বেদবিরোধী। শেষ পর্যায়ে মহাযান বৌদ্ধ মতবাদসমূহের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য মতবাদের কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছুটা আপোস-রফা হয়।

চার্বাক বলিয়া প্রকৃত কোনো ব্যক্তি এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কিনা সে-সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। মহাভারতে 'চার্বাক' নামটির উল্লেখ দেখা যায়। তথায় 'চার্বাক নামক একটি রাক্ষস যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতাকে জ্ঞাতি-হত্যাকারী এবং পাপী বলিয়া তীব্র ভাষায় তিরস্কার করে, ঠিক সেই সময় যখন ধর্ম প্রতিষ্ঠার্থে অনুষ্ঠিত রক্তক্ষয়ী মহাযুদ্ধটির শেষে তাঁহারা হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিতেছিলেন।[৩] তাহার বক্তব্যের সঙ্গে এই দর্শনের সংগতি থাকিলেও তাহার সম্পর্কে আর কিছু জানা যায় না। সুতরাং তাহাকে এই চার্বাক বলিয়া শনাক্ত করিবার প্রচেষ্টাও নিরর্থক। 'চার্বাক' নামটি সম্পর্কে ভারতীয় দর্শনের ঐতিহাসিকেরা কিছু কিংবদন্তির উল্লেখ করেন। কাহারো মতে, চার্বাক বৃহস্পতির শিষ্য ছিলেন। মৈত্রায়নী উপনিষদ এবং বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ আছে : দেবগুরু বৃহস্পতি[৪] অসুরদের ধ্বংস সাধনের উদ্দেশ্যে তাহাদের মধ্যে এই জড়বাদ প্রচার করেন। ফলে, তত্ত্ব-বিস্মৃত অসুরগণ দেবতাদের নিকট পরাস্ত হয়। এইজন্য ইহাকে বার্হস্পত্য দর্শন নামেও আখ্যায়িত করা হয়। এই দর্শনকে যাহারা সমর্থন করিত তাহাদের প্রতি 'অসুর', 'রাক্ষস' প্রভৃতি অনার্য জাতিবোধক শব্দ ব্যবহৃত হইত।[৫]

মতান্তরে, চার্বাক বলিয়া কোনো ব্যক্তি ছিলেন না। জড়বাদী এবং ভোগসুখবাদী ব্যক্তিকেই চার্বাক বলা যায়। পান কর, খাও-দাও, ফুর্তি কর— এই প্রকার আত্মসুখবাদী নীতির সমর্থক বলিয়া সংস্কৃত 'চর্ব' ধাতু হইতে 'চার্বাক' নামটি নিষ্পন্ন হইয়াছে বলা হয়। ইহারা পুণ্য-পাপাদি চর্বণ করে, অর্থাৎ কোনো প্রকার ব্যবধান মানে না।[৬] কেউ বলেন, 'চারু বাক' হইতে 'চার্বাক' শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। এইরূপ সুখবাদী মতবাদীগণ মিষ্টভাষী ছিল, সুন্দর সুন্দর কথা বলিত।

ঋগ্বেদে উল্লিখিত বৃহস্পতি লৌক্য এইরূপ জড়বাদের প্রচার করেন বলিয়া তাঁহার ভাব-*শিষ্যদেরকে লোকায়তিক নামে অভিহিত করা হয়। 'লোকায়তিক' শব্দের এইরূপ একটি ব্যুৎপত্তিগত অর্থ আছে। চার্বাক জড়দর্শন বা লোকায়ত দর্শন যে 'বৃহস্পতি-সূত্র' হইতে আসিয়াছে ইহার প্রমাণ* সর্বপ্রথম উদ্ধার করেন এফ. ডব্লিউ. টমাস (F. W. Thomas)। ১৯২১ সালে তিনি এইরূপ কয়েকটি বৃহস্পতি-সূত্র খুঁজিয়া পাইয়া সম্পাদনা করেন।

'লোকায়ত' নামকরণ

'লোকায়ত দর্শন' বলিতে সাধারণ মানুষের দর্শন এবং ঐহিক দর্শন বুঝায়। 'লোক' শব্দের দুইটি অর্থ— সাধারণ মানুষ, ইহ-জগত। চার্বাক দর্শনকে লোকায়ত দর্শন বলিলে এক অর্থে বুঝিতে হইবে, ইহা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত দর্শন [লোকেষু আয়তো]। অন্য অর্থে ইহলোকই এই প্রকার দর্শনের ভিত্তিভূমি [লোকমিব আয়ত·]। দুইটি অর্থের মধ্যে আসলে কোনো বিবাদ থাকে না, যদি বিশ্বাস কবা হয়: সাধারণ মানুষের জীবন-দর্শন জড়বাদী ছিল। একটি অর্থই তাহা হইলে নির্দেশিত হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, লোকায়ত দর্শন বলিতে সাধারণ মানুষের ইহজগত-ভিত্তিক দর্শন বুঝায়। ই. বি. কাওয়েল এই অর্থটিকে গ্রহণ করেন এবং মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শন সংগ্রহ' গ্রন্থের অনুবাদে উল্লেখ কবেন।

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত উল্লেখ করেন, 'দিব্যাবদান' বৌদ্ধশাস্ত্রে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত দর্শনকে লোকায়ত দর্শন বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ৮ম শতাব্দীব হরিভদ্র সুরী প্রণীত 'ষডদর্শন সমুচ্চয়' গ্রন্থের ভাষ্যে গুণরত্ন (১৪শ শতক) মন্তব্য করেন যে, লোকায়ত অথবা লোকায়তিক বলিতে চিন্তাহীন এবং স্থূল (মূঢ়) সাধারণ মানুষের দর্শনকে বুঝায়। শংকরাচার্যের ব্যাখ্যায় লোকায়ত দর্শন প্রাকৃত জন অথবা অসংস্কৃত জনের দর্শন বলিয়া নগণ্য।[৭] সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বলেন, লোকায়ত মতবাদ ইহজাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল, — এই অর্থে ইহা জড়বাদ।

শংকরাচার্য, মাধবাচার্য, গুণরত্ন সকলেই ভাববাদী বা অধ্যাত্মবাদী চিন্তাবিদ্ ছিলেন। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লোকায়ত বলিতে ঋজু এবং মুক্তচিন্তার অধিকারী একটি সুসংগত বস্তুদর্শনকে বোঝেন। মার্কসবাদী চিন্তার আলোকে তিনি এই দর্শনের মূল্যায়ন করেন। তিনি ইহাকে দেহতত্ত্ববাদী তন্ত্রদর্শন এবং অন্যান্য সাধারণ মানুষের দর্শন ও চিন্তাপ্রবণতার সঙ্গে যুক্ত করেন। রাধাকৃষ্ণণ প্রমুখ অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকদের মতো লোকায়তিকদেরকে তিনি কোনোরূপ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেন না। এই দর্শনের যেমন একটি জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি আছে, তেমন একটি দেহতত্ত্ববাদী সাধন পদ্ধতিও আছে। আউল বাউল সহজিয়া-কাপালিক তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতিতে ইহার সাক্ষ্য বর্তমান। দেহতাত্ত্বিক সাধনার সূত্র হইল ঃ যহা নাই দেহভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে। দেহ ভিন্ন আত্মা নাই, চৈতন্য-স্মৃতি-বোধ-বুদ্ধি কিছুই নাই। প্রাকৃতিক প্রজননের সাধারণ নিয়মটিই মৌলিক। ব্রহ্মাণ্ড (cosmic egg) হইতেও একই নিয়মে সমস্ত জগতজনিত।

লোকায়ত দর্শন বলিতে যাঁহারা ইহজাগতিক দর্শন বোঝেন তাঁহাদের কথা প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা আবশ্যক। পঞ্চানন তর্করত্ন বলেন, এই দর্শন স্থূল বস্তুজগত ব্যতীত তাহার বাহিরে বা উর্ধ্বে অন্য কোনো তত্ত্বকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে না। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ও বলেন, 'লোক' অর্থে ইহলোক বুঝায়। বৌদ্ধ ভাষ্যকার বুদ্ধঘোষ 'লোকায়ত' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, 'আয়ত' বা 'আয়তন' অর্থ ভিত্তি, 'লোক' অর্থ,-ইহলোক। জৈন দার্শনিক হরিভদ্রের মতে, 'লোক' শব্দে ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের জগৎ বুঝায়। এই দর্শনটিকে মণিভদ্র পদার্থ সার্থ-অর্থাৎ, পদার্থসমূহের দর্শন বলিয়া উল্লেখ করেন।

এইসব বিশিষ্ট দার্শনিক এবং ভাষ্যকারদের ব্যাখ্যার আলোকে ইহা পরিষ্কার যে, লোকায়ত দর্শন বলিতে সাধারণ মানুষের ইহজগতভিত্তিক একটি দর্শন ছিল। 'শ্লোকবার্তিক' গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় মীমাংসক কুমারিল ভট্ট বলেন, লোকে মীমাংসাকে প্রায় লোকায়তে পরিণত করিয়াছে; তাহাকে আস্তিকপথে আনয়নের জন্য আমি এই যত্ন করিয়াছি।[৮] মীমাংসাদর্শনের দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবিকই লোকায়ত মতের খুব কাছাকাছি। মীমাংসাদর্শন ঈশ্বর এবং মোক্ষবাদে বিশ্বাস করে না। জড়বস্তু তথা ইহার দ্রব্য, গুণ, কর্ম এবং অবয়বে বিশ্বাস করে। ঈশ্বর-নিরপেক্ষ জড়পরমাণুবাদে বিশ্বাস করে। উপনিষদ-পূর্বকালে বৈদিক ঐতিহ্যে যে একটি বস্তুবাদী এবং কর্মবাদী দর্শন অত্যন্ত প্রাণবন্ত ছিল কুমারিলের দর্শনেও তাহা পরিস্ফুট। মীমাংসা ধর্ম এবং ঋতে (কর্মতত্ত্ব) বিশ্বাস করে, চার্বাক মতবাদীদের তাহাতে বিশ্বাস নাই। জীবনের নানা বৈচিত্র্যে যে সৌন্দর্য, প্রাণশক্তি এবং উদ্যম কাঙ্ক্ষা করে এবং বিশেষ করিয়া প্রাচীন বৈদিক ঐতিহ্যে যে আদিম (Pagan) জীবনমুখীনতা বিদ্যমান ছিল উহার প্রতি চার্বাক জড়বাদী এবং মীমাংসকদের প্রায় সমান প্রবণতা ছিল।

চার্বাক দর্শনের কাল নির্ণয়

এস. রাধাকৃষ্ণণ চার্বাক দর্শনকে মহাকাব্যের যুগের অন্তর্বর্তীকালীন দর্শন বলিয়া 'ভারতীয় দর্শন' ১ম খণ্ডে উল্লেখ করেন। মহাকাব্যের যুগ তিনি খ্রিস্ট-পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে খ্রিস্টীয় ২ শতাব্দীর মধ্যে চিহ্নিত করেন। মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ তাঁহার মতে সম্ভবত বৈদিক যুগে সংঘটিত হয়। কৌরব, পাঞ্চাল, কোশল, কাশী প্রভৃতি নামধেয় আর্যরা বৈদিক যুগেই দিল্লী, কনৌজ, অযোধ্যা, কাশী প্রভৃতি গাঙ্গেয় উপত্যকার বিভিন্ন রাজ্যে স্থিত হয়। আর্যজাতির এই প্রসাবের যুগেই বেদ রচিত হয়। একই যুগে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ কৌরব এবং পাণ্ডবদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। তবে তিনি উল্লেখ করেন যে, ষষ্ঠ খ্রিস্টপূর্বাব্দের আগে মহাভারত রচিত হয় বলিয়া প্রমাণ নাই।[৯] রামায়ণও এই যুগের রচনা। বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যা-কাণ্ডে তথাগত বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ আছে [নবোত্তর শততম সর্গ]। এই কালটিকে তিনি ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে একটি প্রচণ্ড মননশীলতা, বিচিত্র চিন্তা, ধ্যান-ধারণা এবং জীবন-জিজ্ঞাসার যুগ বলিয়া উল্লেখ করেন। এই যুগে দুটি মহাকাব্য ছাড়াও উপনিষদ, গীতা, বৌদ্ধদর্শন, জৈনদর্শন প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটে। মানুষের বৌদ্ধিক কৌতূহল, দার্শনিক আলোচনা এবং বিতর্কের উন্মেষ ঘটে। চিন্তা-চেতনা এবং আদর্শের ক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। উপনিষদসমূহ দার্শনিক অনুসন্ধিৎসা এবং পদ্ধতির নূতন দিগন্ত উন্মোচন করে এবং পুরাতাত্ত্বিক চিন্তার ক্ষেত্রে নূতনতর ফুর্তি এবং স্ফূর্তি আনয়ন করে। জৈনধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম দর্শন-জিজ্ঞাসায় বৈদিক ঐতিহ্যের সঙ্গে এক অভূতপূর্ব সংঘাতের অবতারণা করে। ক্লান্ত, অবক্ষয়িত এবং চিন্তার ক্ষেত্রে বন্ধ্যা প্রাকৃত মানুষেরা সংশয়বাদী, স্থূল অসংযত, সহজ উত্তেজনাপ্রবণ এবং ইন্দ্রিয়সুখবাদী চিন্তার প্রশ্রয় দেয়। ঋগ্বেদে স্বাধীন চিন্তার এবং সংশয়বাদের যে বীজ[১০] উপ্ত হইয়াছিল তাহাই নানাবিধ ইতিবাচক এবং নেতিবাচক পথে চালিত হয়। এই যুগে রাজনৈতিক অবস্থায়ও বিভিন্ন প্রকার সংকট, অস্থিতিশীলতা এবং বিশৃঙ্খলা পরিদৃষ্ট হয়। যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবাদ-বিসংবাদে ক্রমশ লিপ্ত হইয়া পড়ে। বৌদ্ধ সূত্রপিটকে এই প্রকার রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, রাজন্য ও রাজপুত্রদের লোভ এবং নৈতিক অধঃপতনের বহু উল্লেখ আছে।[১১] সুতরাং ক্লান্ত এবং ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ এই যুগে তীর্থংকর এবং বুদ্ধের প্রদর্শিত পথে মুক্তির সন্ধান করে। সংশয় এই যুগে আর বিপজ্জনক এবং ভয়ঙ্কর বলিয়া পরিত্যক্ত হয় না, বরং তাহা অনেকাংশে স্বীকৃতি লাভ করে।

চিরায়ত বৈদিক ধ্যান-ধারণার ঐতিহ্যে আঘাত লাগে এবং স্বাধীন মননশীলতার অধিকার গুরুত্ব লাভ করে।[১২]

এই যুগে একটি জিনিস লক্ষণীয় যে, গাঙ্গেয় ভূ-ভাগের পশ্চিমাংশে যখন ঔপনিষদীয় চিন্তা অধিক প্রসারতা লাভ করে, পূর্বাংশে তখন তাহা তেমনিভাবে গৃহীত হয় না। বিতর্ক এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়া পশ্চিমাংশের কোনো ধ্যান-ধারণা পূর্বাংশে স্বীকৃতি পায় নাই।[১৩]

এই যুগে চার্বাক বস্তুবাদী, জৈন এবং বৌদ্ধদের আন্দোলনের ফলে ঔপনিষদীয় তত্ত্ববিদ্যার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। ষড়দর্শনের উন্নত ধারাসমূহ এবং ন্যায়-দর্শন চিন্তার ক্ষেত্রে ক্রমশ প্রভাব বিস্তার করে। অমূর্ত ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ঈশ্বরের ব্যক্তিরূপে কল্পনাও নানাভাবে প্রশ্রয় পায়। গীতায় কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতাররূপে কল্পনা, শ্বেতাশ্বতর এবং পরবর্তীকালের অন্যান্য উপনিষদের শৈববাদ, মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অবতারবাদ ইহার দৃষ্টান্ত।

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ এই যুগকে তিনটি প্রধানভাগে বিভক্ত কবেন, যথা ঃ

১. চার্বাকবাদ, জৈন এবং বৌদ্ধমতবাদের উৎপত্তিকাল (৬০০ খ্রিঃ পূঃ)

২. ভগবদ্‌গীতা এবং পরবর্তী উপনিষদে ঈশ্বরবাদী চিন্তার পুনর্গঠন (৫০০ খ্রিঃ পূঃ)

৩. ষড়্‌দর্শনের প্রসার (৩০০ খ্রিঃ পূঃ - ২০০ খ্রিস্টাব্দ)।

সমকালীন চার্বাক মতবাদী মানুষ

এই যুগটিতে চার্বাক মতবাদী বেশ কিছুসংখ্যক ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। 'রামায়ণে' উল্লিখিত চার্বাক এবং পতঞ্জলি কর্তৃক উল্লিখিত জাবালি, 'মহাভারতে' উল্লিখিত চার্বাক এবং পতঞ্জলি কর্তৃক উল্লিখিত ভাগুরি বস্তুবাদী ছিলেন। 'হরিবংশে' উল্লিখিত রাজা বেন এই মতে বিশ্বাসী ছিলেন। পালি বৌদ্ধশাস্ত্রে 'সামঞ্‌ঞফলসুত্ত'[১৪]-তে অজিত কেশ কম্বলী নামে জনৈক জড়বাদীর উল্লেখ আছে। সে নাকি বুদ্ধের সমসাময়িক ছিল এবং বিশ্বাস করিত যে, মানুষ চারটি মূল পদার্থের সৃষ্টি, — মৃত্যুতে তাহার সম্পূর্ণ লয় হয় এবং প্রত্যক্ষ ব্যতীত জ্ঞান নাই। পুরাণ কাশ্যপের উল্লেখ আছে, সে নাকি নৈতিক বিচার বিশ্লেষণ সমর্থন করিত না এবং আত্মার জড়ত্ব, অহেতুবাদ এবং আপতিকতাবাদ সমর্থন করিত।[১৫] মস্‌করী গোষাল জড়বাদী ছিল। সে বিশ্বাস করিত, মানুষের জীবন-মৃত্যুর উপরে কোনো হাত নাই, সকলই প্রবহমান থাকে যতক্ষণ না তাহা সম্পূর্ণরূপে লয় হয়।[১৬]

কাকুড় কাত্যায়ন সত্তা, মাটি, জল, আগুন, বাতাস, দেশ এবং আত্মা প্রভৃতি পদার্থের মধ্যে গুণগত পার্থক্য করেন এবং সুখ ও দুঃখকে সৃষ্টি এবং ধ্বংসের দুইটি বিশ্ব নিয়মরূপে ব্যাখ্যা করেন। শান্তরক্ষিত 'তত্ত্বসংগ্রহ' গ্রন্থে পুরন্দর নামে জনৈক জড়বাদীর উল্লেখ করেন। জৈন দার্শনিক গুণরত্ন উল্লেখ করেন, কোনো কোনো চার্বাক আকাশকে একটি মৌলিক পদার্থ হিসাবে বিশ্বাস করিত। সদানন্দ 'অদ্বৈত-ব্রহ্ম-সিদ্ধি' গ্রন্থে উল্লেখ করেন ঃ পরবর্তী চার্বাক মতানুসারীরা আত্মাকে ইন্দ্রিয়, প্রাণ এবং মনের শামিল বলিয়া তত্ত্ব সৃষ্টি করেন। কাম-সূত্রের প্রণেতা বাৎসায়নও সম্ভবত এই যুগের। বাৎসায়ন যদিও জড়বাদী ছিলেন না, তথাপি তাঁহার ইন্দ্রিয়সুখ সম্বন্ধে যুক্তিপূর্ণ এবং বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব চার্বাক মতবাদীদের উপরে অনেক প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকিবে।[১৭]

এস, রাধাকৃষ্ণণ যদিও চার্বাক দর্শনকে মহাকাব্যেব যুগের দর্শন বলিয়া বিভিন্ন যুক্তিপূর্ণ কারণে চিহ্নিত করেন, বার্হস্পত্য দর্শনের উল্লেখ যখন ঋগ্বেদ এবং অন্যান্য প্রাচীন উপনিষদ ও মনুস্মৃতি প্রভৃতিতে বর্তমান, তখন ইহাকে আরও প্রাচীন এবং জৈন ও বৌদ্ধধর্মের পূর্ববর্তীকালের বলিয়া মনে হয়। জৈন এবং বৌদ্ধশাস্ত্রে অবশ্য এই মতবাদের উল্লেখ বেশি পাওয় যায়।

লোকায়ত পুঁথি-পত্র প্রসঙ্গ

চার্বাক কর্তৃক লিখিত কোনো বইপত্রও নাই। টমাস কর্তৃক উদ্ধারকৃত কয়েকটি বৃহস্পতি-সূত্র বাদে এই দর্শনের ভিত্তিমূলক পূর্ণাঙ্গ কোনো বই-ই উদ্ধার করা যায় নাই। মাধবাচার্যের 'সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ' ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতবাদসমূহের একটি অন্যতম প্রাচীন সংকলন। এই গ্রন্থে এবং চতুর্দশ শতাব্দীর আর একজন ভাষ্যকার গুণরত্নের 'তর্ক রহস্যদীপিকা' এবং 'ষড়দর্শন সমুচ্চয় ভাষ্যে', কৃষ্ণমিশ্রের 'প্রবোধচন্দ্রোদয়' এবং জলরাশি ভট্টের 'তত্ত্বোপপ্লবসিংহ' গ্রন্থে এই মতবাদের উল্লেখ আছে। 'মৈত্রায়নী উপনিষদ' 'বৃহদারণ্যক উপনিষদ', ছন্দোগ্য উপনিষদ, [১৮] কথা উপনিষদ, বিষ্ণুপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা,[১৯] পতঞ্জলি ভাষ্য এবং দিব্যাবদান' বৌদ্ধশাস্ত্রে এই মতবাদের উল্লেখ আছে। কুমারিল ভট্টের 'শ্লোকবার্তিকে', শংকরের 'শারীরকভাষ্যে' পূর্বপক্ষ হিসাবে এই দর্শনের ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ আছে, পরে খণ্ডন করা হইয়াছে। যে-সব গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারেরা এই দর্শনের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন, এই দর্শনের ঐতিহাসিক উৎসস্থল হিসাবে সেইসব ছাড়া আমরা প্রামাণ্য দলিল হিসাবে আর কিছু পাই না। আধুনিককালে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দার্শনিক ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, ই.বি. কাওয়েল, রিচার্ড গার্বে, আর. ডি. র‍্যানাডে, রাধাকৃষ্ণণ, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ প্রবক্তাদের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৪০ সালে বরোদা ওরিয়েন্টাল ইনষ্টিটিউটের সহযোগিতায় সুখলালজী ও পারিখ জয়রাশি ভট্টের তত্ত্বোপপ্লবসিংহ সম্পাদনা করেন। গ্রন্থটি ৮ম শতাব্দীর চার্বাক দর্শনের উপরে এইটি একটি নির্ভরযোগ্য প্রাচীন গ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃত। তুচ্চি মনে করেন, প্রাচীনকালে লোকায়ত মত সম্পর্কে বইপত্র ছিল। চন্দ্রকীর্তির 'প্রজ্ঞাশাস্ত্র'-তে একটি লোকায়ত গ্রন্থের কথা উল্লেখ আছে। আর্যদেব তাঁহার 'শতশাস্ত্র' নামক গ্রন্থে 'বৃহস্পতি-সূত্রের' উদ্ধৃতি ব্যবহার করেন। পতঞ্জলি, ভাস্করাচার্য প্রভৃতি লোকায়তিক এবং লোকায়ত গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেন। সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেন, 'দিব্যাবদান' বৌদ্ধশাস্ত্রে লোকায়তকে একটি স্বতন্ত্র শিক্ষার শাখা বলিয়া উল্লেখ করা হয় এবং বলা হয় যে, ইহার একটি ভাষ্য এবং প্রবচন ছিল।[২০]

শ্রুতি এবং স্মৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয় যে, এই দর্শনবিষয়ক পুঁথিপত্র ইচ্ছাকৃতভাবে বিনষ্ট করা হইয়া থাকিবে।[২১] মহাভারতের শান্তিপর্বে চার্বাক-নিধনের কাহিনী বর্ণিত আছে। এস. কে. বেলভলকর এবং আর. ডি. র‍্যানাডে মন্তব্য করেন এই দর্শনের ইহাই দুর্ভাগ্য যে, ইহার বিরোধী ব্যক্তিদের রচনা হইতেই এই দর্শনকে পরিচিত হইতে হয়। ঋগ্বেদে উল্লিখিত ধর্মদ্রোহী এবং নাস্তিকদের উল্লেখ থাকায় মুয়ার (Muir) অনুমান করেন, প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষের চিন্তাজগতে একটি স্বাধীন চিন্তাশক্তির অস্তিত্ব ছিল। ব্রাহ্মণ হইয়া লোকায়ত মতবাদ প্রচার করিতেন এবং শিক্ষা দিতেন এই সত্যটির অনুকূলে অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে।[২২] দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, লোকায়ত মতবাদের বাড়াবাড়ির ফলে প্রাচীন বৈদিক ঐতিহ্য ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।[২৩]

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে লোকায়ত মতবাদ কেবল প্রাচীন ভারতের ব্যাপার নয় কাপালিক এবং অন্যান্য তান্ত্রিক উপ-সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহা এখনো বর্তমান।

চার্বাক দর্শনের মূলকথা

লোকায়তই একমাত্র শাস্ত্র; প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ; পৃথিবী, জল, আগুন এবং বায়ুই একমাত্র উপাদান। ভোগই মানুষের একমাত্র কামনীয় বস্তু; মন বস্তুর সৃষ্টি মাত্র; পরলোক বলিতে কিছুই নাই; মৃত্যুই মোক্ষ,— ইহাই সংক্ষেপে চার্বাক দর্শনের মূলকথা।[২৪]

বৃহস্পতি-সূত্র

বিভিন্ন দার্শনিক রচনায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৃহস্পতি-সূত্রের উল্লেখ দেখা যায় ঃ

১. পৃথিবী, জল, আগুন এবং বায়ু মৌল উপাদান ('পৃথিব্যাপতেজ— বায়ুরিতি তত্ত্বানি')

২. এই চারিটি মৌলিক উপাদানের বিভিন্ন প্রকার সংমিশ্রণের ফলে শরীর, ইন্দ্রিয় এবং বস্তুর উৎপত্তি হয় ('তৎসমুদয়ে শরীরেন্দ্রিয় বিষয় সংজ্ঞা)

৩. গুড়, তণ্ডুল, প্রভৃতিতে মাদকতা থাকে না, কিন্তু ঐ সমস্ত বস্তু দ্বারা সুরা প্রস্তুত করিলে তাহাতে মাদকতা জন্মে। তেমনিভাবে বস্তু হইতে চৈতন্যের সৃষ্টি হয় ('কিনোবাদিভ্যো মাদকশক্তিবৎ বিজ্ঞানম')

৪. চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। 'চৈতন্যবিশিষ্ট কায়া পুরুষঃ।'

৫. ভোগই মানব জীবনের একমাত্র কাম্যবস্তু।'কাম এবৈক পুরুষার্থঃ।'

৬. মৃত্যুই একমাত্র মোক্ষ। 'মরণমেবপবর্গঃ।'

মাধবাচার্যের 'সর্বদর্শন সংগ্রহ' গ্রন্থে প্রথম পরিচ্ছেদে চার্বাক দর্শন আলোচনা করা হইয়াছে। তিনি লেখেন : এই সমস্তই বৃহস্পতি কর্তৃক উক্ত।[২৫] মাধবাচার্য বর্ণিত চার্বাক দর্শন নিম্নরূপ :

১. ভূমি, অপ (জল), অনল (আগুন) এবং অনিল (বায়ু)-এই চারিটি ভূত বা মৌলিক বস্তু হইতে চৈতন্য সৃষ্টি হইয়াছে।[২৬]

২. হরিদ্রা পীতবর্ণ ও চুন শুক্লবর্ণ; কিন্তু উভয়ে মিলিত হইলে তাহাতে রক্তিম বর্ণের উৎপত্তি হয়। গুড়, তণ্ডুলে মাদকতা নাই; কিন্তু ঐ সব দ্রব্য দ্বারা সুরা প্রস্তুত করিলে তাহাতে মাদকতা শক্তি জন্মে। এই চারিটি মৌলিক দ্রব্যের সংমিশ্রণে তেমনিভাবে চৈতন্য উপজাত হয়।

৩. স্বর্গ, নরক, মোক্ষ, আত্মা, পরলোক কিছুই নাই। বর্ণাশ্রম ধর্মের ক্রিয়াকাণ্ড প্রকৃতপক্ষে আদৌ ফলদায়ক নয়। প্রতারক এবং ধূর্তেরা বেদের সৃষ্টি করিয়া স্বর্গ-নরক, প্রভৃতি নানাপ্রকাব আলৌকিক পদার্থের কথা বলিয়া মানুষকে অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, জনসমাজের প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছে এবং রাজাদের নিকট হইতে বিপুল অর্থ লাভ করিয়াছে।

৪. অগ্নিহোত্র, বেদপাঠ, ত্রিদণ্ডধারণ, ভস্মলেপন প্রভৃতি কার্য বুদ্ধিহীন এবং পৌরুষহীন ব্যক্তিদের উপজীবিকা মাত্র।

৫. ধূর্তদের বিশ্বাস, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞে যে জীবের বলিদান করে সে স্বর্গ লাভ করে। ধূর্তেরা তবে আপন পিতামাতার স্বর্গলাভের জন্য তাহাদিগকে শিবোচ্ছেদ করে না কেন?

৬. শ্রাদ্ধকর্ম দ্বারা যদি মৃত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তবে কোনো ব্যক্তি বিদেশে গমন করিলে তাহাকে পাথেয় দিবার প্রয়োজন কি? বাড়িতে তাহার উদ্দেশ্যে কোনো লোককে ভোজন করাইলেই তো হয়।

৭. দান করিলে স্বর্গস্থিত ব্যক্তির যদি তৃপ্তি হয়, তবে প্রাসাদের উপরের তলায় অবস্থিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে নীচে বসিয়া কিছু নিবেদন করিলে সে পায় না কেন?

৮. যতদিন বাঁচিয়া থাক ঋণ করিয়াও ঘি খাও। ভস্মীভূত দেহ আবার কোথা হইতে ফিরিয়া আসে?

৯. দেহাবসানের পর আত্মা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইলে তাহা স্নেহসমাকুল বন্ধুদের নিকট আবার ফিরিয়া আসে না কেন?

১০. ভণ্ড, ধূর্ত ও নিশাচর এই ত্রিবিধ লোক একত্রিত হইয়া বেদ রচনা করিয়াছে। অশ্বমেধ

যজ্ঞশেষে মাংস আহারের অনন্তর যজমান পত্নী অশ্বশিশ্ন গ্রহণ করিবে ইত্যাদি অশ্লীল বিষয়ও ঐ সকল নিশাচর ব্যক্তিদের রচিত।[২৭]

জ্ঞানতত্ত্ব

চার্বাক দর্শন প্রত্যক্ষকেই জ্ঞানের একমাত্র উৎস বলিয়া মনে করে। প্রত্যক্ষ ব্যতীত অনুমান, উপমান, শব্দ প্রভৃতি সঠিক জ্ঞানের সন্ধান দেয় না। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষমূলক অভিজ্ঞতা হইতেই যাবতীয় জ্ঞান এবং ধারণা উৎপন্ন হয়। এই দর্শনটি বস্তুবাদী এবং অভিজ্ঞতাবাদী, ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের বাহিরে এবং উর্ধ্বে অন্য কোনো প্রকার প্রমাণ এবং প্রমেয়কেই তাহারা সত্য এবং সত্য প্রতিবাদনের পদ্ধতি বলিয়া স্বীকার করে না। প্রত্যক্ষের প্রতি আস্থা এবং অন্যসব প্রমাণের প্রতি অনাস্থা এই মতবাদী দার্শনিকদের স্বাভাবিক এবং সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গিসঞ্জাত।

নিম্নলিখিত কারণে চার্বাক দর্শন প্রত্যক্ষভিন্ন প্রমাণ স্বীকার করে না :

১. ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ গোচর নয়;
২. কার্যকারণ সম্বন্ধ সম্পর্কে কোনো প্রকার বস্তুগত সার্বিক শক্তি-সম্বন্ধের প্রাথমিক কোনো তথ্য ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষে পাওয়া যায় না। অনেক কার্যের কারণ নাই। দেখা যায়, যে সমস্ত জন্তুর শিং নাই তাহাদের পায়ের ক্ষুর দ্বিধাবিভক্ত নয়। অনুমানের দ্বারাও ইহার কারণ জানা যায় না।
৩. দুইটি বিষয়ের পরস্পর সম্বন্ধের অনুমান হইতে যদি জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তবে অনুমানকে অনুমানের উপর নির্ভর করিতে হয় এবং ইহাতে হেতুর অনবস্থা দোষ ঘটে।
৪. ন্যায়ানুমানের সিদ্ধান্তও নির্ভরযোগ্য নয়, বিশেষ করিয়া আশ্রয় বাক্যে যখন সিদ্ধান্তটিকে পূর্বেই স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। ইহাতে হেতুর চক্রকদোষ ঘটে।
৫. ঋষিবাক্যের প্রামাণ্যও অনুমান-নির্ভর, অতএব বিশ্বাসযোগ্য নয়।
৬. সাংখ্যমত : অস্তিত্ববিশিষ্ট কারণ বা কারণ-সমগ্র হইতে অস্তিত্ববিশিষ্ট কার্য উৎপন্ন হয়। বৌদ্ধমত : অনস্তিত্বের অবস্থা হইতে বা অসৎ হইতে সৎ-এর বা কার্যের উৎপত্তি হয়। দুইটি মতের অনুকূলের সমান যুক্তি আছে। অতএব, চার্বাকমতে কার্যকারণের সম্বন্ধটি বিতর্কিত বিষয়। অতীতে এবং বর্তমানে সত্য হইলেই কোনো কারণ-সম্বন্ধ তথা কারণ-কার্য ভবিষ্যতেও যে সত্য হইবে এমন কথা বলা যায় না।

অনুমানে সাধ্যপদ (Major term) এবং হেতুপদ (Middle term), — এই দুইটি পদের মধ্যে যে সার্বিক ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধকে অন্বয়-পরীক্ষা, ব্যতিরেক-পরীক্ষা, ব্যভিচারগ্রহ, উপাধিনিরাস, তর্ক ও সামান্য প্রত্যক্ষ, প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা ন্যায়দর্শনে মানিয়া লওয়া হয়, তাহাকে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ বলে। পর্বতে আগুন আছে, কেননা তথায় ধূম আছে। এই দৃষ্টান্তে ধূম আগুনের ব্যাপ্য, কেননা ধূম আগুনে ব্যাপিয়া থাকে এবং আগুন ধূমের ব্যাপক। ধূম এবং আগুনের মধ্যে যে নিয়ত শর্তান্তর সম্বন্ধ তাহাকে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ বলা হয়। চার্বাক দর্শনের যুক্তি হইল : ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের মাধ্যমে একটি বিশেষ বস্তু বা ঘটনা ক-এর সঙ্গে আরেকটি বিশেষ বস্তু অথবা ঘটনা খ-এর যোগাযোগ আমরা না হয় প্রত্যক্ষের মাধ্যমে জানিতে পারি। কিন্তু এই প্রত্যক্ষলব্ধ সহচরভাব দেখিয়া ক এবং খ-এর মধ্যে একটি একান্ত অপরিহার্য সার্বিক সম্পর্কের অনুমান কি প্রকারে সম্ভব? এইরূপ জ্ঞান কি জানা হইতে অজানার অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়া নয়? একটি প্রত্যক্ষকৃত দৃষ্টান্তে ক এবং খ-এর মধ্যে চ সম্পর্কের জ্ঞান হইতেছে বলিয়া অন্যান্য সমস্ত অপ্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তেই যে ক এবং খ এর মধ্যে অনুরূপ চ সম্পর্ক থাকিবেই ইহা

তো প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদনযোগ্য হয় না। অনুমানের অর্থ, জানা হইতে অজানায় ঝাঁপ দেওয়া। এই ঝাঁপটিকে 'আরোহী অনুমান মূলক ঝম্প' (Inductive leap) বলা হয়। চার্বাক দর্শন অন্ধকারে ঝম্প দিতে নারাজ।

বিচারের বিষয়কে শুরুতেই মানিয়া লওয়া অবরোহী অনুমানে হেত্বাভাস ঘটে। এই অনুপপত্তি দোষটিকে এরিস্টটলীয় যুক্তিবিদ্যায় *Petitio principii* বলা হয়। পরামর্শ অথবা নিগমনে যে বিষয়টিকে সিদ্ধান্ত হিসাবে প্রমাণ করিতেছি তাহা আশ্রয় বাক্যে আগে মানিয়া লইলেই এই দোষ ঘটে। ইহার জটিল রূপটিকে 'চক্রক যুক্তিপদ্ধতি' (Argument in a circle বা Circular *indemonstrando*) বলা হয়। বেনথাম (Bentham) ইহাকে 'Question-begging epithets' বলিয়াছেন। যথা, আফিম সেবন করিলে ঘুম আসে কেননা তাহা নিদ্রাজনক। অবরোহ-অনুমানের আশ্রয়-বাক্যে সাধ্য এবং হেতুপদের মধ্যে যে সার্বিক এবং আবশ্যিক সম্বন্ধকে স্বীকার করিয়া লওয়া হয় আরোহ-অনুমানে এইরূপ সম্বন্ধের যুক্তিবৈধতা নিশ্চয় করা হয়। বৈজ্ঞানিক আরোহ আবার সাধারণ গণনামূলক আরোহ হইতে এই অর্থে বেশি নির্ভরযোগ্য যে তাহার কার্য-কারণ সম্পর্ক এবং প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্তিতা নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া স্বীকার করা হয়। এই প্রকার অভিজ্ঞতালব্ধ সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলা হয়। ইহা সমস্ত অনুমানের মূল শর্ত। চার্বাক ব্যাপ্তি সম্বন্ধকে একটি কল্পনাপ্রসূত অবাস্তব ব্যাপার বলিয়া মনে করে। প্রত্যক্ষগোচর নয় এই যুক্তিতে। চার্বাক দর্শনের আর একটি যুক্তি হইল, ব্যাপ্তিকে অনুমান সাপেক্ষ বলিলে অনুমানের অন্য প্রকারে সত্যতা প্রমাণ করা আবশ্যক। শব্দ বা স্বতঃপ্রামাণ্য আপ্তবচন দ্বারাও এই ব্যাপ্তিকে সঠিকভাবে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। প্রথমত, শব্দ সঠিক প্রমাণের উৎস নয়। দ্বিতীয়ত, শব্দকে ব্যাপ্তি সম্বন্ধের প্রমাণ বলিয়া মানিয়া লইলে, অনুমানকে শব্দের উপর নির্ভর করিতে হয়। চার্বাক দর্শনের রায় হইল : অনুমান প্রমাণ গ্রহণযোগ্য নয়।

শূন্যবাদী বৌদ্ধদর্শন এবং অদ্বৈতদর্শনও অনুমানকে চরম প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করে না। এই সম্পর্কে নৈয়ায়িক উদয়ন এবং বেদান্তপণ্ডিত শ্রীহর্ষের মধ্যে দীর্ঘ বিতর্কের উল্লেখ আছে। নাগার্জুন, শংকর, শ্রীহর্ষ প্রভৃতি চরম ভাববাদীরা কেবল অনুমান-প্রমাণ নয়, ব্যবহারিক জ্ঞানগত সমস্ত প্রমাণের চূড়ান্ত অর্থপূর্ণতা অস্বীকার করিয়াছেন। ন্যায়-সূত্রকার গোতম, ন্যায়-সূত্রের ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন, নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ এবং পক্ষধর্মতা-সম্বন্ধকে পরার্থানুমানের পূর্বশর্ত বলিয়া স্বীকার করে। চার্বাক দর্শনের অনুমান-বিরোধিতা এবং শূন্যবাদ ও বেদান্ত কর্তৃক অনুমান-প্রমাণের বিরোধিতা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবের। শূন্যবাদ এবং অদ্বৈতবেদান্তে অনুমানকে অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ ব্যবহারিক জ্ঞানের অবলম্বন হিসাবে স্বীকার করা হয়। পারমার্থিক জ্ঞানকে স্বজ্ঞাগত স্বতোপ্রামাণ্য আপ্তবচন-নির্ভর সত্য বলিয়া স্বীকার করা হয়। চার্বাক দর্শন মাটি, জল, আগুন এবং বায়ুছাড়া অন্য কোনো দ্রব্যকেই পারমার্থিক সৎ বলিয়া মনে করে না এবং প্রত্যক্ষকেই মূল জড়পদার্থ, তজ্জাত আত্মা এবং অন্য সমস্ত জাগতিক বস্তুর জ্ঞানের একমাত্র সঠিক উপায় বলিয়া মনে করে। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এবং পারমার্থিক জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য চার্বাকের জানা ছিল না। প্রত্যক্ষকে স্বীকার করা এবং একই সঙ্গে অনুমানকে অস্বীকার করা সম্ভব কিনা,— এই সম্পর্কে কোনো প্রকার কৌতূহল হইতে চার্বাক মতবাদীরা সাধারণভাবে মুক্ত ছিল।

অভিজ্ঞতাবাদী দৃষ্টিতেও অনুমান ছাড়া চিন্তা, আলোচনা, বিচার বিশ্লেষণ, প্রত্যয়, তত্ত্ব কিছুই সম্ভব নয় বলিয়া চার্বাক দর্শন সমালোচনার সম্মুখীন হয়। বস্তুকে প্রত্যক্ষ করা যায়, কিন্তু বস্তুর ধারণাকে তো প্রত্যক্ষ করা যায় না। বস্তুর ধারণাকে এবং সংজ্ঞাকে অনুমানের মাধ্যমে সত্য বলিয়া মানিতে হয়। অন্যথায় সমস্ত জ্ঞানই অচল হইয়া পড়ে।

আধুনিককালে চার্বাক সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থূল এবং সূক্ষ্ম চিন্তার মান অনুযায়ী দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যথা : ধূর্ত এবং সুশিক্ষিত। সুশিক্ষিত চার্বাক মতাবাদীরা কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর জ্ঞানপ্রসঙ্গে অনুমানকে স্বীকার করে বলিয়া জানা যায়। নব্য-নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট এবং বৌদ্ধ দার্শনিক শান্তরক্ষিত সুশিক্ষিত চার্বাকবাদী সম্পর্কে এইরূপ ধারণা পোষণ করেন।

শান্তরক্ষিত পুরন্দর নামে জনৈক চার্বাকের কথা উল্লেখ করেন যিনি অনুমানকে প্রত্যক্ষলব্ধ দৈনন্দিন ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করিতেন। পুরন্দর (৭ম খ্রিঃ) বিশ্বাস করিতেন, ইন্দ্রিয়ের অতিগামী সত্তা, মরণোত্তর জীবন, কর্মতত্ত্ব প্রভৃতির সত্যতাকে অনুমানের দ্বারা প্রমাণ করা, কিংবা প্রতিপাদন করা সম্ভব নয়।[২৮] এই তত্ত্বগুলিও আসলে চার্বাক দর্শনের মতে অ-সৎ এবং মিথ্যা।

এইসব সুশিক্ষিত চার্বাকদের মধ্যে কেউ-কেউ অনুমানকে দুই ভাগে ভাগ করে— (১) অতীতের প্রতি উদ্দিষ্ট, (২) ভবিষ্যতের প্রতি উদ্দিষ্ট। অতীতেব প্রতি উদ্দিষ্ট অনুমানকে ইহারা স্বীকার করে, কারণ তদ্রূপ উদ্দিষ্টের অন্তত অতীতে একটি প্রত্যক্ষমূলক ভিত্তি থাকে। ভবিষ্যতের প্রতি উদ্দিষ্ট অনুমান অনিশ্চিত বলিয়া স্বীকার করে না। অতীন্দ্রিয় তত্ত্বগুলির কোনো প্রকার প্রত্যক্ষমূলক ভিত্তি থাকে না বলিয়া একেবারেই অস্বীকার কবে।

চার্বাক দর্শনে তার্কিকতা

বুদ্ধঘোষ লোকায়ত দর্শনকে একটি **বিতণ্ডা-বাদ-শাস্ত্র (বিতণ্ডা-বাদ-সাত্ত)** বলিয়া উল্লেখ করেন। একই সঙ্গে বিতণ্ডা এবং বাদ একই শাস্ত্র সম্পর্কে বলা যায় কি? 'বিতণ্ডা' অর্থ অর্থহীন তর্ক। 'বাদ' অর্থ সত্যনিষ্ঠ তর্ক। ন্যায়সূত্রকার গৌতম, বাদ, জল্প এবং বিতণ্ডা তিন প্রকার তর্কের কথা বলেন। বাদ সর্বশ্রেষ্ঠ তার্কিকতা। সত্যনিষ্ঠ যুক্তি পদ্ধতিকে শ্রেষ্ঠ বলিবার জন্য শাস্ত্র-প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। তথাপি ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যাইবে গীতায় বিভূতি-অধ্যাযে কৃষ্ণ কেন বলিয়াছেন তার্কিকতাব মধ্যে তিনি বাদ। চার্বাক মতবাদী দার্শনিকেরা যখন সংস্কার-মুক্ত বুদ্ধি দ্বাবা একটি বিষয়ের সত্যস্বরূপ জানিবার জন্য নিঃস্বার্থভাবে তার্কিকত'য লিপ্ত হয়, তখন ঐ তর্ক পদ্ধতিকে বাদ বলা যায়। স্থূল চার্বাকগণ যখন কেবল অর্থ এবং কাম ভোগ করিবার জন্য আধ্যাত্মিকতার বিরুদ্ধে তর্ক করে, তখন উহাকে বাদ বলা যায় না।

নব্য নৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্টের মতে বৌদ্ধেরা বিতণ্ডা এবং বাদ উভয় প্রকার তর্কপদ্ধতির মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না, কারণ উভয়কেই তাহারা অস্বীকার করে। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বলেন, বৌদ্ধ দর্শনের বিশেষ অর্থে লোকায়ত মতকে 'বাদ' বলা যায়। বৌদ্ধ দর্শনের বিশেষ অর্থ বলিতে সম্ভবত তিনি মনে কবেন বৌদ্ধরা বিতণ্ডা এবং বাদ এই উভয় প্রকার তর্কের মধ্যে পার্থক্য করিত না, অথবা বৌদ্ধেরা যে-রূপ বৈদিক পরাতত্ত্ব সম্পর্কে তর্ক করিত তদ্রূপভাবে চার্বাকবাদীরাও তর্ক কবিত।

লোকায়ত দর্শনের তর্কপদ্ধতি যে একেবারে বিতণ্ডামূলক ছিল তাহা মনে হয় না। কৌটিল্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে লোকায়ত-দর্শনকে একটি 'আন্বিক্ষিকী বিদ্যা' বা ন্যায়বিদ্যা বলিয়া উল্লেখ করেন। ভারতীয় ন্যায়ের প্রাচীন ঐতিহ্যকে আন্বিক্ষিকী শাস্ত্রই বলা হইয়া থাকে। অনু + ঈক্ষণ = অন্বীক্ষণ 'পশ্চাৎ মনন' অর্থে 'আন্বীক্ষিকী' মানে হেতু নির্ণয়। লোকায়ত বিদ্যাটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যা বলিয়া কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ করেন।

মনুস্মৃতিতে চার্বাক মতাবলম্বীগণ 'হৈতুকঃ' বলিয়া পরিচিত। 'হৈতুকঃ' শব্দের অর্থের ব্যাখ্যায় মেধাতিথি (নামান্তরে ন্যায়-সূত্রকার গৌতম) বলেন, ইহারা পারলৌকিক জগত, তদর্থে দান-ধ্যান এবং উৎসর্গের ফল অস্বীকার করে। কুল্লুক ভট্ট 'হৈতুকঃ' বলিতে 'বেদ-বিরোধী তার্কিক' অর্থ করেন।

বৈদিক তত্ত্ব তথা ব্রহ্ম, আত্মা, কর্মতত্ত্ব, স্বর্গ-নরক প্রভৃতি অস্বীকার করিবার জন্যই তাহারা দৃষ্টবাদী যুক্তিপদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করে এবং বেদের অপৌরুষেয়তাবোধক স্বতোপ্রামাণ্যবাদ অস্বীকার করে।

বিশ্বতত্ত্ব ঃ অনীশ্বরবাদ; স্বভাববাদ; দেহাত্মবাদ এবং দৃষ্টবাদ

চার্বাক দর্শন সমস্ত জগত এবং জীবনের যাবতীয় পরাতাত্ত্বিক সমস্যা সম্পর্কে জড়বাদী ব্যাখ্যা দেয়। জড়বাদ বস্তুকে মূল সত্তা বলিয়া স্বীকার করে এবং চৈতন্যকে জড়ে পর্যবসিত করে। ভাববাদ অথবা অধ্যাত্মবাদ চৈতন্য বা চিৎ-সত্তাকে মূল বলিয়া স্বীকার করে এবং জড়কে চৈতন্যে পর্যবসিত করে। চার্বাক দর্শন জড়বাদী বলিয়া ইহাতে বস্তুই মূলসত্তা বলিয়া স্বীকৃত এবং চৈতন্য জড়ে পর্যবসিত। চার্বাক দর্শন মতে জগত একান্তভাবেই আপতিক; ইহার ঈশ্বর নাই, 'জগত এবং জীবন সৃষ্টি ও পরিচালনার জন্য ঈশ্বরের কোনো প্রয়োজনও নাই। সৃষ্টি, পরিবর্তন এবং বিবর্তনের মূলে কোনো অতীন্দ্রিয় সত্তার কোনো প্রকার কর্তৃত্ব এবং উদ্দেশ্য নাই। সমস্ত ঘটনা যুগপৎ, অনিশ্চিত এবং একান্তভাবেই আকস্মিক। জীবন এবং জগতের অন্তরশায়ী কোনো কার্য-কাবণ, নিয়মের অস্তিত্ব নাই। সৃষ্টি, পরিবর্তন, কার্য-কারণ; চৈতন্য, আত্মা ঈশ্বর প্রভৃতি সমস্ত তত্ত্ব সম্পর্কেই চার্বাক দর্শন জড়বাদী ব্যাখ্যা দেয়। এই ব্যাখ্যা খুব সূক্ষ্ম না হইলেও, জড়বাদী দর্শন হিসাবে ভিতরে কোনো বিরোধ নাই।

মাটি, জল, আগুন এবং বায়ু চার্বাক দর্শনে চাবটি মৌলিক পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত। এই চারটি পদার্থই বাস্তব, অর্থাৎ পরস্পর স্বতন্ত্র। একে অপরের সৃষ্ট নয় একে অপরের উপর নির্ভরশীল নয়। এই চারিটি পদার্থই মৌল পদার্থ, অর্থাৎ সূক্ষ্মতর বস্তুতে অবিভাজ্য। ন্যায় বৈশেষিক দর্শনে আকাশকেও একটি ভাব পদার্থ এবং দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করে। আকাশকে প্রত্যক্ষ কর' যায় না, অনুমান করিয়া লইতে হয। সেইজন্য চার্বাক দর্শনে আকাশ পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত নয়। গুণরত্নেব মতে কেউ কেউ আকাশকেও পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিত। সাধারণভাবে চার্বাকবাদীরা কোনো অনুমান সাপেক্ষ কোনো দ্রব্যকেই নিত্য বলিয়া স্বীকার করে না। এই চারটি বস্তুর সংমিশ্রণে যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি হয়। সৃষ্টবস্তু জীর্ণ হইলে আবার এই চারটি নিত্য বস্তুতে ফিরিয়া যায়।

কার্য-কারণ সম্বন্ধ প্রত্যক্ষের অতীত বলিয়া তাহা বস্তুগত এবং নিত্য নয়। আমরা কারণ এবং কার্য নামে দুইটি বস্তু অথবা দুইটি ঘটনার পারম্পর্য প্রত্যক্ষ করি মাত্র, কিন্তু নির্দিষ্ট দুইটি বস্তু অথবা দুইটি ঘটনা যে কার্য-কারণ নামে একটি নিরবচ্ছিন্ন এবং সার্বিক সম্বন্ধ দ্বাবা নিযন্ত্রিত আছে এবং থাকিবে তাহা আমরা প্রত্যক্ষের মাধ্যমে স্থির করিতে পারি না। অতএব চার্বাক মতে এইরূপ কোনো সম্বন্ধ মূলত সত্য নয়। কার্য-কারণ নামে দুইটি ঘটনা নিতান্তই যুগপৎ, পরপর এবং আকস্মিকভাবে ঘটিয়া থাকে। চার্বাক দর্শনের অহেতুবাদের সঙ্গে অভিজ্ঞতাবাদী ব্রিটিশ দার্শনিক হিউমের কার্য-কারণ তত্ত্ব খণ্ডনের এবং কার্য-কারণ বিশ্লেষণের প্রসঙ্গটি আমরা স্মরণ করিতে পারি। হিউমের মতেও কার্য-কারণ একান্তই যুগপৎ, পরস্পর ও আকস্মিক।

গ্রিক দর্শনের এমপিডকলিসও [Empedocles] চার্বাকের মতো মাটি, জল, আগুন এবং বায়ুকে চারটি মৌলিক উপাদান হিসাবে স্বীকার করে। এমপিডকলিস-এর মতে এই চারটি মৌল উপাদান প্রেমের আকর্ষণে সংযোজিত হয় এবং ঘৃণার বিকর্ষণে বিযুক্ত হয়। ইহাতে বস্তুর সৃষ্টি এবং লয় ঘটে। প্রেম এবং ঘৃণার মতো সুখ এবং দুঃখকে বিশ্বপ্রকৃতির দুইটি সার্বিক নিয়ম রূপে চার্বাকবাদী কাকুড় কাত্যায়ন স্বীকার করে। এমপিডকলিসের প্রেম এবং ঘৃণার মতো এই দুইটি তত্ত্বও জড়াত্মক এবং বস্তুগত। চার্বাক দর্শনে কল্যাণের কোনো পরাতাত্ত্বিক কিংবা অতি-প্রাকৃত ব্যাখ্যা নাই। চার্বাক দর্শন স্বভাববাদী (Naturalistic)। চার্বাক দর্শন সৃষ্টি এবং বিবর্তন, উদ্দেশ্য এবং উপায়ের মধ্যে কোনো

প্রকার সঙ্গতির কারণস্বরূপ জাগতিক কারণের উর্ধ্বে অতীন্দ্রিয় কোনো সত্তা অথবা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। জগত এবং জীবন অনীশ্বর। এইরূপ তত্ত্ব যদৃচ্ছাবাদ (the theory of accidental causation) এবং স্বভাববাদ (Naturalism) বলিয়া পরিচিত। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় লোকায়ত দর্শন ছিল প্রকৃতিবাদী। আধুনিক কালে গভীরতর যুক্তিবাদ, সাম্যবাদ ও মানবতাবাদী চিন্তার অভিযোজনায় অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতো মনীষীদের চিন্তায় তাহা এক ধরনের নব্য প্রকৃতিবাদে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

ত্রিপিটকের 'সংযুক্ত নিকায়-'র লোকায়তিক-সুত্তে চার্বাক দর্শনের দেহাত্মবাদ সম্পর্কে জানা যায়। দীঘনিকায়-র জালিয়-সুত্ততে 'যাহা শরীর তাহাই আত্মা' শীর্ষক সূত্রটির আলোচনা দেখা যায়।[২৯] বৃহস্পতি-সূত্রে আছে, চৈতন্য-বিশিষ্ট দেহই আত্মা। বাদরায়ণের ব্রহ্ম-সূত্রে, শংকরের শারীরক-ভাষ্যে শারীরক ভাষ্যের উপর রচিত বাচস্পতি মিশ্রের 'ভামতী' টীকায় পূর্বপক্ষ হিসাবে দেহাত্মবাদ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে কোনো তত্ত্ব বা তত্ত্বাংশ খণ্ডনের একটি যুক্তিসিদ্ধ রীতি আছে। প্রথমে খণ্ডনযোগ্য তত্ত্বটির সমস্ত বক্তব্য নিখুঁতভাবে এবং নিরপেক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়, তৎপর খণ্ডকার্য আরম্ভ হয়। এইটি হইল ন্যায়সম্মত তর্কনীতি। পূর্বপক্ষের উদ্ধৃতিতে নিরপেক্ষতা যথাসম্ভব রক্ষা করা হয়।

শারীরক-ভাষ্যে দেহাত্মবাদ সম্পর্কে শংকর বলেন, চৈতন্য দেহের ধর্ম এই দর্শনের বিশ্বাস। শরীর বর্তমান থাকিলে প্রাণ, চেষ্টা, চৈতন্য, স্মৃতি সবই উপলব্ধি করা যায়। শরীরের অবর্তমানে এই সবের উপলব্ধি হয় না। অতএব এইগুলি শরীরেরই ধর্ম— যেমন উষ্ণতা ও প্রকাশ অগ্নিরই ধর্ম। 'আমি স্থূল', 'আমি কৃশ' আমিত্ব সম্পর্কে যত কথাই বলা যায় সব কথারই দেহের সঙ্গে সম্পর্ক থাকে। দেহ-বিবর্জিত আত্মভাব কোনো উক্তি হয় না। ইহা একান্তই অলীক।

দেহাত্মবাদ মতে আত্মা মাটি, জল, অগ্নি এবং বায়ু এইসব পদার্থের সৃষ্ট উপবস্তু (Epiphenomenon)। এইটি দেহের মতে একটি স্বতন্ত্র বস্তু বা অবভাস নয়। এইটি একটি উপাবভাস, দেহাবভাসের সৃষ্টি। পান, চুন এবং সুপারিতে লাল রঙ নাই, কিন্তু একসঙ্গে চিবাইলে যেমন লাল 'রঙ' হয়, অথবা ঝোলা গুড়, তণ্ডুল প্রভৃতি উপকরণের খামি গাঁজাইলে যেমন তাহাতে মাদকতা আসে, উক্ত চারিটি উপাদানের বিভিন্ন অনুপাতে সংমিশ্রণের ফলে চৈতন্য এবং আত্মা উপজাত হয়। যকৃৎ হইতে যেমন পিত্ত ক্ষরিত হয়, তেমনি ভূতাদির উপাদান হইতে মন ক্ষরিত হয়। দেহ ছাড়া কোনো 'অহং' নাই।

সদানন্দ তাঁহার 'বেদান্তসার' গ্রন্থে চারিটি বস্তুবাদী সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই চারটি সম্প্রদায় স্থূল শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ এবং মন— চারটি জড়সত্তাকে আত্মা হিসাবে ব্যাখ্যা করে।

আত্মার উদ্‌বর্তন (Survival) এবং মোক্ষ নাই। আত্মাই নাই, সুতরাং ইহার উদ্‌বর্তন এবং মুক্তির প্রশ্ন চার্বাকবাদীর নিকট একান্তই অবান্তর এবং অসঙ্গত। মৃত্যুতেই মোক্ষ। এই জগতের বাহিরে স্বর্গ-নরক নাই। ইন্দ্রিয় সুখই স্বর্গ, দুঃখই নরক। চার্বাক দর্শনের এইরূপ ধারণা দৃষ্টবাদ সম্মত।

চার্বাক দর্শনের জড়বাদ, স্বভাববাদ, দেহাত্মবাদ, দৃষ্টবাদ এবং যদৃচ্ছাবাদ কঠোর ভাষায় নিন্দিত এবং সমালোচিত হইয়াছে। জগত অনীশ্বর এবং আপতিক হইলে জাগতিক সমস্ত ক্রিয়াই বিশৃঙ্খলা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। পাশাপাশি অবস্থানকেই কার্য-কারণ বলা যায় না। দিন রাত্রির, কিংবা রাত্রি দিনের কারণ নয়। ষাঁড়ের দুইটি শিংও তো পাশাপাশি থাকে। যদিও তদ্রূপ পাশাপাশির কথা বলা হইতেছে না, কেননা ইহার একটিকে কেউ অন্যটির কার্য বলে না। শর্তান্তরহীন, নিয়ত এবং অব্যবহিত কোনো একটি পূর্ব-শর্তকে কারণ বলিয়া চিহ্নিত করিতে না পারিলে কার্যকে অন্যথাসিদ্ধ এবং অনিশ্চিত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কার্য-কারণ যে প্রক্রিয়ায় ঘটে ক্ষেত্রবিশেষে বৈজ্ঞানিক উপায়ে তাহা শনাক্ত

করিতে পারিলেও, সার্বিকভাবে কার্য-কারণ কী তাহা বলা কঠিন? এতদিন কার্য-কারণ বস্তুগত, না মনোগত এই নিয়া একটা বিরোধ ছিল। আলেকজান্ডার, আইনস্টাইন প্রমুখ সম্পর্কটিকে আপেক্ষিক বলায় একটি মধ্যপথের আবিষ্কার হইয়াছে।

আত্মা, কিংবা চৈতন্য একটি স্বতন্ত্র সত্তা না হইলে ইহা তো শরীর মাত্রেই অবিচ্ছেদ্য হইত। মনুষ্যেতর জীব-দেহের তো প্রজ্ঞাগত চৈতন্য নাই। প্রজ্ঞাগত চৈতন্যকে যদি আত্মার ব্যাবৃত গুণ বলি, তবে পশু এবং বৃক্ষের মধ্যেও চৈতন্য সুপ্ত থাকে বলিয়া আত্মা সুপ্ত অবস্থায় থাকে ইহা বলিবার তো কোনো অর্থ হয় না। দেহমাত্রেই প্রজ্ঞাগত বোধ, বিচারবোধ থাকে না কেন? নিদ্রিত এবং জাগ্রত অবস্থার মধ্যে যে পার্থক্য তাহা কি চেতনার গুণগত পার্থক্য নয়? চৈতন্য একটি দৈহিক গুণমাত্র হইলে অন্যান্য দৈহিক গুণের মতো কেন চৈতন্যের প্রত্যক্ষ হয় না? মরণোত্তর আত্মাকে প্রত্যক্ষ কবা বা নির্দেশ করা যায় না বলিয়া যদি তাহা অনিত্য হয়, তবে ইহার অনিত্যতা বা অসত্তা ও প্রত্যক্ষের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় কি?

জড়বাদকে ভাববাদের দৃষ্টিকোণ দ্বারা অনেক সমালোচনা করা চলে। জগত এবং জীবনের সঠিক ব্যাখ্যা হিসাবে ভাববাদই যে একমাত্র সত্য তত্ত্ব এইরূপ কথা সকলে স্বীকার করে না। জড়বাদ. বস্তুবাদ, ভাববাদ, অধ্যাত্মবাদ সমস্ত তত্ত্বই যখন কোনো-না-কোনো আকারে টিকিয়া আছে, ইহাদের প্রত্যেকেরই টিকিয়া থাকিবার পক্ষে কিছু কিছু গুণ আছে স্বীকার করিতে হয়। মানুষের বোধ এবং বুদ্ধির সঙ্গে সমস্ত সত্ত্বেরই কিছু কিছু সংযোগ আছে। এইসব তত্ত্ব বিভিন্ন কালে বিভিন্ন সামাজিক অবস্থায়, বিভিন্ন মানসিক-প্রবণতা এবং শক্তি দ্বারা প্রভাবিত মানুষেব তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা এবং জীবন জিজ্ঞাসার পরিচয় প্রদান করে। চার্বাক দর্শন যে একটি ঋজু এবং মুক্ত চিন্তার দর্শন ইহা এই দর্শনের এবং দৃষ্টিভঙ্গির একটি প্রধান মৌলিক গুণ।

নীতিতত্ত্ব

চার্বাক দর্শন বৈদিক প্রাধিকার, শ্রুতি এবং স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত আপ্তবচনের স্বতঃ- প্রামাণ্য ও সত্যতা অস্বীকার কবে। বৈদিক ধর্মের অন্তঃসারশূন্যতা, মজ্জাগত দ্বন্দ্ব এবং পুরোহিত সম্প্রদায়ের কাপুরুষতা ও ভণ্ডামিকে নিন্দা করে। মাধবাচার্যের 'সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ' গ্রন্থ হইতে চার্বাক মতবাদীদের নীতিতত্ত্ব সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

চার্বাক ধর্ম এবং মোক্ষকে জীবনের চরম কল্যাণ বলিয়া স্বীকার করে না। কাম এবং অর্থকে একমাত্র পুরুষার্থ মনে করে। এই দর্শনটি ভোগসুখবাদী। ইন্দ্রিয়সুখই একমাত্র কাম্যবস্তু। তুষ আছে বলিয়া কে তণ্ডুলকে বর্জন করে? কাঁটা আছে বলিয়া কে না গোলাপের সুগন্ধ উপভোগ করে? দুঃখকে বর্জন করিয়া সুখ লইতে হইবে। প্রিয়া পত্নীর সংসর্গে যদি আনন্দ হয়, তবে তাঁহার মৃত্যুতেও দুঃখ হইবে। মৃত্যুতেই তো সব কিছু শেষ হইয়া যায়। মৃত্যুতে যদি আত্মার পারলৌকিক যাত্রার পথ প্রশস্ত হয়, তবে আমরা মৃত্যু সম্পর্কে এত ভয় করি কেন? প্রিয়জনের অন্তিম বিরহে শোকে দুঃখে অত কাতর হই কেন? 'ঋণ করিয়াও ঘি খাও, ভস্মীভূত দেহ কি আর কখনো ফিরিয়া আসে?' এই ঐহিক জীবনই একমাত্র জীবন। ঐহিক সুখ-ই মানুষ চায়, অতএব ইহাই চরম কাম্য হওয়া উচিত। পারত্রিক জীবন এবং সুখ অলীক কল্পনা মাত্র। ইহজীবনেরও পারত্রিক কোনো ভিত্তি নাই। ইহা একান্তই আপতিক এবং অনির্দেশ্য।

চার্বাক নীতিতত্ত্ব সুখবাদী (Hedonistic)। প্রাচীন গ্রিসের এপিকিউরাস এবং এরিস্টিপাস-এর সুখবাদী এবং উপযোগবাদী নীতির সঙ্গে চার্বাক সুখবাদ তুলনীয়। চার্বাক দর্শন যে কেবল স্থূল

আত্মসুখবাদী এমন কথা নিঃশংসয়ে বলা যায় না। চার্বাক দর্শনের উদ্‌গাতা বৃহস্পতি বা গণপতির সামাজিক ন্যায়বিচার সম্পর্কেও সূত্র আছে। রাজাকে জনসমর্থিত হইতে হইবে (লোক-সিদ্ধো ভবেৎ রাজা)। এই দর্শনের দৃষ্টিতে পুরোহিত এবং চণ্ডাল একই মানুষ। পুরোহিত এবং চণ্ডালকে এক মনে করে বলিয়া এক সময়ে রক্ষণশীল বৈদিক ব্রাহ্মণেরা ইহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছে। আজ কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি মানবিক বলিয়া স্বীকৃত। এই দর্শনটি স্বাধীনচিন্তা এবং বিদ্রোহের প্রতীক। ইহাই এই দর্শনটির বিশেষ গুণ। ধর্ম এবং কোনোরূপ অতিজাগতিক তত্ত্বের রঙীন মণ্ডলের আড়ালে এই দর্শন মতবাদ প্রচার করে না। প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় ভারতে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম।

জৈন, বৌদ্ধ, সাংখ্য এবং মীমাংসা দর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না এবং অজ্ঞেয়তাবাদী। আত্মাকে বৌদ্ধ দর্শনও একটি নিত্যসত্তা বলিয়া স্বীকার করে না। চার্বাকদর্শন একটু বেশি উত্তেজনাপ্রবণ এবং অসংযত ছিল বলিয়া এবং প্রচলিত মূল্যবোধ এবং পুরোহিত শ্রেণীকে মারাত্মকভাবে আঘাত করে বলিয়াই সম্ভবত এই দর্শন বেশি অনাদৃত হইয়াছে। সাধারণ মানুষ, যাহাদের মধ্যে বৈদিক দর্শনের বৌদ্ধিক চিন্তা বেশি শিকড় গাড়িতে পারে নাই, তাহাদের লৌকিক এবং সাম্প্রদায়িক মন্ত্র-তন্ত্র এবং জীবনচর্যাকে আশ্রয় করিয়া সম্ভবত এই দর্শনটি এখনো টিকিয়া আছে। আধুনিক পণ্ডিতদের কাছে তো এই দর্শনটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক।

লোকায়ত মতের প্রকৃতি এবং উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন সিদ্ধান্তের বিচার

লোকায়ত মতবাদের প্রকৃতি এবং উৎপত্তি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হন। ভাববাদী দার্শনিকেরা সকলেই, যে-ভাবে এই মতবাদটি -বর্জন এবং খণ্ডনেব নিমিত্ত তৎপরতা দেখাইয়াছেন, তাহাতে প্রমাণ হয় সাধারণ মানুষ এবং এমনকি সুশিক্ষিতদের উপরও এই মতবাদের বেশ প্রভাব ছিল। অন্য দুইটি অবৈদিক দর্শন (জৈন এবং বৌদ্ধ) মূলত ক্ষত্রিয়-পরিবারভুক্ত ব্যক্তিদেব দ্বারা প্রবর্তিত হয় এবং পরে অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ঐ দুইটি দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হন। অনেক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত চার্বাক মতবাদেও কৃতবিদ্যা ছিলেন। কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রে উল্লেখ করেন, অনেক শতাব্দী যাবৎ ভারতে জড়বাদের অস্তিত্ব আছে। 'অর্থশাস্ত্রের' রচনাকাল খ্রিঃ পূঃ ৪র্থ শতক। লোকায়ত বিশ্বাস এবং সংস্কৃতিতে, চর্যাপদ এবং ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ তন্ত্র-সাহিত্যে মধ্যযুগ পর্যন্ত এই মতবাদটি অত্যন্ত প্রাণবন্ত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসেও কাপালিক সম্প্রদায়ের উল্লেখ দেখা যায়। কাপালিকও একটি লোকায়ত তান্ত্রিক সম্প্রদায়। ইহাতে মনে হয় এইরূপ নানাপ্রকার স্থূল এবং গুহ্য মতবাদের মধ্যে এই ধারাটি এখনো কোনো-না-কোনো আকারে বিদ্যমান আছে।

রিস ডেভিড্‌স (Rhys Davids) এই মতবাদ সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, আসলে এইটি একটি দর্শন নয়। এইটি একটি প্রবণতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি মাত্র। ইহা লোক-কথা, মন্ত্র-তন্ত্র, বিশ্বাস, সংস্কার এবং মনোভঙ্গির আকারে লোক-সংস্কৃতির নামান্তর মাত্র। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে, কিংবা সম্প্রদায়গতভাবে এই প্রকার মতবাদের অনুশীলন হয় নাই। আবহমান কালে যে-সমস্ত মানুষ অতীন্দ্রিয় জ্ঞান সম্পর্কে সংশয়বাদী হইয়া পড়ে, যাহারা স্বাধীন যুক্তি ও চিন্তা দ্বারা শাস্ত্রীয় প্রাধিকারের বিরোধিতা করে, যাহারা ইহ-জীবনের আদিমতা ও বৈচিত্র্যকে উপলব্ধি করিতে চায় এবং যাহারা ঐন্দ্রিয়িক অভিজ্ঞতার প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠা করিতে চায় চিরায়ত লোক-সংস্কৃতিতে তাহাদের কিছু-না-কিছু প্রভাব থাকিয়া যায়। এই সমস্ত উপাদানগুলি কখনো একটি বিশুদ্ধ যুক্তিভিত্তিক সুচিন্তিত দর্শনে দানা বাঁধে না। বিশুদ্ধ দর্শন চিন্তায় সংগঠিত হওয়ার পরিবর্তে কুমারীপূজা, কায়াসাধনা প্রভৃতি স্থূল পদ্ধতির সঙ্গে কালক্রমে জড়িত হইয়া পড়ে সুতরাং এইরূপ একটি প্রবণতাকে ঠিক দর্শন বলা যায় না। দর্শনের জন্য একটি বিশুদ্ধ পদ্ধতি,

পরিশীলিত এবং বৈজ্ঞানিক ভাষারও প্রয়োজন। বৈদিক জড়দর্শন সংস্কৃত ভাষায় চর্চা হইত। পাণিনির ব্যাকরণ, পাণিনির ব্যাকরণের উপর রচিত পতঞ্জলির মহাভাষ্য এবং অন্যান্য বৈয়াকরণিকের অবদান সংস্কৃত ভাষাটিকে বিজ্ঞানসম্মত করিবার পক্ষে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। সেইসঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় যুক্তি পদ্ধতির পরীক্ষা-নিরীক্ষাও হইয়াছে। প্রাচীন এবং নবীন নৈয়ায়িকগণ, ঋষিগণ এবং মুনিগণ এই কাজটি করিয়াছেন। প্রাকৃত ভাষাকে সংস্কার করিয়া সংস্কৃত ভাষা হইয়াছে। উদীচী প্রাকৃতের উন্নতরূপ সংস্কৃত এইরূপ একটি মত আছে। সাধারণ প্রাকৃত ভাষায় ক্ষেত্রবিশেষে সাধারণ মানুষের স্বাধীন চিন্তার পরিচয় থাকিলেও তাহা বিশুদ্ধ দর্শনের সৃষ্টি করিতে পাবে নাই। পরবর্তীকালে হীনযানপন্থী বৌদ্ধ নৈয়ায়িকদের দ্বারা পালিভাষায় বিশুদ্ধ দর্শনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হইয়াছে এবং একটি উন্নত ও সুষ্ঠু ব্যাকরণ উদ্ভাবনের ফলে চৈনিক, জাপানি, সিংহলি প্রভৃতি ভাষায় ইহাব অনুবাদও সম্ভব হইয়াছে। মহাযানী বৌদ্ধ দার্শনিকগণ পরবর্তীকালে আবার সংস্কৃতের অনুকূলে পালি পরিত্যাগ করিয়াছেন। প্রাকৃত মানুষের চিন্তার সূত্রগুলিকে আধুনিক পণ্ডিতগণ আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রাচীন জৈন নৈয়ায়িকগণ অর্ধ-মাগধী প্রাকৃতের অনেক উৎকর্ষ সাধন করেন। প্রাকৃতজ ভাষাসমূহেব কাছে যেমন সংস্কৃত ভাষার পবাজয় ঘটিয়াছে, তেমনি প্রাকৃত মানুষের চিন্তাও নূতন মূল্যায়ন লাভ করিতেছে। অন্তত, প্রাকৃতজনের মতবাদ বলিয়া লোকায়ত মতবাদ এখন আর উপেক্ষিত হইতেছে না। শংকবাচার্য প্রাকৃতজনের মতবাদ বলিতে কৃষ্টিহীন এবং শিক্ষা-দীক্ষাহীন সাধারণ মানুষের চিন্তাকে বোঝেন।

মূয়ার (Muır) এবং রাধাকৃষ্ণণ মনে করেন, এই মতবাদটি প্রাচীন ভারতে স্বাধীন-চিন্তার অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করে। তবে স্বাধীন চিন্তাব ব্যাপারটিকে ইহারা দুইজন ঠিকভাবে ব্যাখ্যা করেন না। মূয়ার মনে করেন, এইরূপ স্বাধীন চিন্তা প্রাচীনকাল হইতেই সক্রিয় ছিল। বাধাকৃষ্ণণ মনে কবেন বৈদিক ধর্ম যখন অনুষ্ঠানসর্বস্ব হইয়া পড়ে এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে সমাজ যখন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয় তখন এই প্রকাব মতবাদের উৎপত্তি ঘটে।

সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মন্তব্য করেন, চার্বাক মতবাদ মূলত ভারতীয় নয়। ইহা বিদেশ হইতে ভারতে আসিয়াছে। তিনি সুমেরীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সঙ্গে এই মতবাদটিকে সম্পর্কিত করেন।

চার্বাক দর্শনকে আসুরিক দর্শন বলা হয়। ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় 'অসুর' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্ণয় প্রসঙ্গে ইহাকে 'আসিরিয়া'-র সঙ্গে সম্পর্কিত করিয়াছেন। প্রাচীন অসিরিয়া এবং ব্যাবিলনিয়ার সভ্যতাকে সুমেরীয় সভ্যতা বলা হয়। গ্রিসের মাইনোয়া সভ্যতা এবং মেসোপটেমীয় সভ্যতার সঙ্গে ভারতীয় প্রাক-আর্যযুগের সভ্যতার কিছু ভাষাগত এবং প্রত্নতাত্ত্বিক সাদৃশ্যের কথা তিনি 'ভারত সংস্কৃতি' বইতে উল্লেখ করেন। সুতরাং সুমেরীয় সভ্যতার সঙ্গে চার্বাকবাদের কিছু সাধর্ম্য থাকিবে তাহা আর বিচিত্র কী। এইরূপ একটি অনুমানকে কষ্ট-কল্পনা না বলিয়াও বলা যায় ঋগ্বেদের সময় কাল হইতে ইহা একটি ভারতীয় মতবাদ। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, এই দর্শনটিকে বার্হস্পত্য দর্শন বলা হয়। ছান্দোগ্য, মৈত্রায়নী এবং অন্যান্য উপনিষদেও এই আসুরিক মতবাদটির উল্লেখ করা হইয়াছে, দেহতত্ত্ব ও কায়াসাধনায় বিশ্বাসী কাপালিক এবং অন্যান্য তান্ত্রিকগোষ্ঠীর বিশ্বাসের মধ্যে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই মতবাদটির আদি সংস্করণ আবিষ্কার করেন। সুতরাং, ইহাকে ভারতীয় বলিতে বাধা কি?

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে য়ুহেমেরাস (Euhemerus) নামে সিসিলির জনৈক দার্শনিক অলৌকিকতায় বিশ্বাস করিতেন না। তাহার নাম অনুযায়ী য়ুহেমেরিজম্ নামে প্রচলিত তত্ত্বটি ধর্ম ও উহার আনুষঙ্গিক চরিত্র ও ঘটনাকে বাস্তব ইতিহাসেরই অতিরঞ্জন মনে করে।

য়ুহেমেরিজম (Euhemerism) ও পায়রোনিজম (Pyrrhonism) নামাখ্য মতবাদের সাথে

চার্বাক-দর্শনের সৌসাদৃশ্য আছে। এলিসের পায়রো (খ্রিস্টপূর্ব ৩৬৫-২৭৫) মৌলবাদ বিরোধী ও সংশয়বাদী ছিলেন। লোকায়ত দর্শন আন্তর্জাতিকও বটে।

চার্বাক-দর্শন ছিল ধর্ম-নিরপেক্ষ, জড়বাদী প্রকৃতিবাদী ও স্বভাববাদী। সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত নৃকেন্দ্রিক সমাজবাদী, বস্তুবাদী, স্বভাববাদী তথা পরিবেশবাদী দর্শনের বিভিন্ন শাখায় ও নব্য প্রকৃতিবাদে এই ধরনের লোকায়ত চিন্তা, প্রকৃতির বৃন্তে মানুষের স্বভাব ও সম্বন্ধ-বিচার বিবেচনায়, বিচিত্র মাত্রা, শক্তি ও গুরুত্ব অর্জন করিয়াছে।[৩০]

---

১. মহাবগ্‌গ ৫/৭/১৫; পারাজিকা, ২/৮/১৪৯; পাচিত্তিয়, ৪/৪৯-৫০, ৫/৮৫/৫০৮; দীঘনিকায় ১/১/২/২১-২৭ (মহাসীলব্রহ্মজালসুত্ত)।

২. 'তিরচ্ছান বিজ্জার' প্রকৃত অর্থ 'জানোয়ারসুলভ বিদ্যা'। রিস ডেভিড্‌স ইংরাজীতে অনুবাদ করেন, 'brutish or beastly wisdom'।

৩. মহাভারতে উল্লিখিত চার্বাকের উক্তি ঃ
ধিক্ ভবন্তং কুন্‌পতিং জ্ঞাতিনমস্তু বৈ।
কিং তেন স্যাদ্ধি কৌন্তেয় কৃত্বেমং জ্ঞতি সংক্ষয়ম্।
ঘাতয়িত্বাগুরুংশ্চৈব মতং শ্রেয়ো ন জীবিতম্।।

৪. এই বৃহস্পতি এবং অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি এক ব্যক্তি কিনা সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। ঋগ্বেদে (১০ মণ্ডল, ৭২ সূক্ত, ৩ ঋক) লৌক্য বৃহস্পতি বা বৃহস্পতি লৌক্যের কথা উল্লেখ আছে। এই লৌক্য বৃহস্পতি বা বৃহস্পতি লৌক্য তথায় বলিয়াছে, অ-সৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হয়। 'অ-সৎ' শব্দে অর্থ জড় বুঝাইলে ইহাকে চার্বাক মত বলা যায়। মৈত্রী-উপনিষদে উল্লিখিত কাহিনীটি জানা যায়। বৃহস্পতি শুক্রাচার্য হইয়া অসুরদের নিকট জড়বাদ প্রচার করেন। উদ্দেশ্য, ইন্দ্রকে অভয় দান এবং অসুরদের পরাজয়।

৫. প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে।। 'গীতা', ১৬/৭
(অর্থঃ আসুর-প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ ধর্মে প্রবৃত্তি বা অধর্মে নিবৃত্তির বিষয় অবগত নয়, এই জন্য তাহাদের মধ্যে কি শৌচ, কি আচার, কি সত্য- এই সম্পর্কে কিছুই জ্ঞান নাই।)

৬. চর্বন্তি ভক্ষয়ন্তি তত্ত্বতো ন মন্যন্তে পুণ্যপাপাদিকং পরোক্ষং বস্তুজাতমিতি চার্বাকাঃ।
(অর্থঃ চর্বণ করে, অর্থাৎ ভক্ষণ করে, -পুণ্য পাপ প্রভৃতি পরোক্ষ তত্ত্বসমূহকে তত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করে না, এই কারণে ইহাদের নাম চার্বাক।) গুণরত্ন, 'তর্করহস্য দীপিকা' পৃষ্ঠা, ৩০০

৭. শংকরাচার্য, 'শারীরক ভাষ্য' ১'/১/১।
-"দেহমাত্রং চৈতন্যবিশিষ্টমাত্মেতি প্রাকৃতা জনা লোকায়তিকাশ্চ প্রতি পন্নাঃ"।।

৮. কুমারিল ভট্ট, 'শ্লোকবার্তিক,' প্রথম অধ্যায়, কারিকা ১০
ঃ 'প্রায়েনৈব হি মীমাংসা লোকে লোকায়তীকৃতা।
তামাস্তিক পথে কর্তুময়ং যত্নঃ কৃতো ময়া।।'

৯. S. Radhakrishnan, Indian Philosophy, Vol. 1. (London : George Allen & Unwin Ltd. 1923) 271.

১০. 'ঋগ্বেদ', ৭ম, ৮৯, ৩-৪।

১১. S. Radhakrishnan, Indian Philosophy, Vol. 1, 274; Oldenberg, Buddha. p.65

১২. S. Radhakrishnan, Indian Philosophy, Vol. 1, 274

১৩. ঐ, পৃঃ ২৭৩

৭ম খ্রিঃ পূঃ হইতে ২ খ্রিস্টাব্দের অন্তর্ভূত সময়কালটি পৃথিবীর ইতিহাসেও গুরুত্বপূর্ণ। চীনে কনফিউসিয়াস, পারস্যে জয়থুস্ট্র এবং গ্রিসে বিখ্যাত সব দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটে।

১৪. 'দীঘনিকায়,' ১/২/৪/২২।

১৫. ঐ, ১। (সামঞ্‌ঞফলসুত্ত > সামান্যফলসূত্র)।

১৬. মজ্‌ঝিম নিকায়, ১।

১৭. Dakshinaranjan Bhattacharyya, 'Charvaka Philosophy,' History of Philosophy : Eastern and Western (London, George Allen & Unwin Ltd.) ed. S. Radhakrishnan, 134.

১৮. ছান্দোগ্য উপানিষদে বিরোচন আসুরিক মতবাদের প্রতিনিধিত্ব করে। তাঁহার মতে দেহ ভিন্ন আত্মার অস্তিত্ব নাই।

১৯. গীতায় বলা হইয়াছে,— এই মতবাদী ব্যক্তিগণ আসুর-প্রকৃতিসম্পন্ন। ধর্ম এবং সত্যে ইহাদের বিশ্বাস নাই। বৈদিক প্রামাণ্য বিশ্বাস করে না। ঈশ্বরহীন জীব এবং জগত ও নারী-পুরুষের সঙ্গমে জীবের জন্মতত্ত্বে বিশ্বাস করে। সিদ্ধি, শান্তি ও মোক্ষ ইহার লাভ করিতে পারে না। 'গীতা' ১৬শ অধ্যায়, ৭/৮/২৩, দ্রষ্টব্য।

২০. S N. Dasgupta. **A History of Indian Philosophy,** Vol 3 (Great Britain, University Press, Cambridge, 1922), 514

২১. Jawaharlal Nehru **Discovery of India** (London . Meridian Book Ltd., 1946), 71

২২. মহাভারতের বনপর্বে উল্লেখ আছে, দ্রৌপদীর পিতা বাল্যকালে দ্রৌপদীর শিক্ষার নিমিত্ত বার্হস্পত্য মতে সুপণ্ডিত জনৈক ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে নিযুক্ত করেন।

২৩. D. P. Chattopadhyaya, Lokayata : **A Study in Ancient Indian Materialism.** (New Delhi : People's Publishing House, 1959) 13.

২৪. কৃষ্ণ মিশ্র (১১শ শতাব্দী), 'প্রবোধ চন্দ্রোদয়' (নাটক), ২য় অঙ্ক দ্রষ্টব্য।

২৫. মাধবাচার্য্য, 'সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ' (কলিকাতা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল; পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক সম্পাদিত, ১৮৫৮), প্রথম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২৬. অথ চত্বারি ভূতানি ভূমিরাপনলানিলাঃ।
চতুর্ভ্যঃ খলু ভূতেভ্যোশ্চৈতন্যমুপজায়তে।। ঐ, পৃঃ ৬

২৭. তদেতৎ সর্ব্বং বৃহস্পতিনা উক্তম্
ন স্বর্গঃ নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ।।
অগ্নিহোত্রং ত্রয়ো বেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।
বুদ্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকা ধাতুনির্মিতা।।
পশুশ্চেন্নিহতং স্বর্গং জ্যোতিষ্টোমে গমিষ্যতি।
স্বপিতা যজমানেব তত্র কস্মান্ন হিংস্যতে।।
ভূতানামপি জন্তুনাং শ্রাদ্ধং চেত্তৃপ্তিকারম্।
গচ্ছতামিহ জন্তুনাং ব্যর্থং পাথেয় কল্পনম্।।
স্বর্গস্থিতা যথা তৃপ্তিং গচ্ছেয়ুস্তত্রদানতঃ।
প্রাসাদস্থো পরিস্থানমত্র কস্মান্নদীয়তে।।

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদৃণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।।
যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেষু বিনির্গত।
কস্মাদ্ভুয়ো ন চায়াতি বন্ধুস্নেহ সমাকুলঃ।।
ততশ্চ জীবনোপায়ো ব্রহ্মনৈর্বিহিতাস্তিহ।
ভূতানাং প্রেতকার্য্যানি ন ত্বন্যদ্বিদ্যুতেক্কচিৎ।।
ত্রয়ো বেদস্য কর্তারো ভণ্ডধূর্তনিশাচরাঃ।
জর্ভরোতুর্ফরোত্যাদি পণ্ডিতানং বচঃ স্মৃতম্।।
অশ্বস্যাত্র হি শিশ্নস্তু পত্নীগ্রাহ্যং প্রকীর্তিতম্।
ভণ্ডৈস্তদ্বৎ পরঞ্চৈব গ্রাহ্যজাতং প্রকীর্তিতম্
মাংসানাং খাদনং তদ্বন্নিশাচর সমোচিতমিতি।।

২৮. পুরন্দর তু আহ্, লোক প্রসিদ্ধম অনুমানম্ চার্বাকৈঃ অপি ইচ্ছতে এবং যৎ তু কৈঃ চিৎ লৌকিকম্ মার্গম্ অতিক্রম্য অনুমানম্ উচ্যতে তৎ নিষিদ্ধতে।
— Deviprasad Chattopadhyaya, A Study of Ancient Indian Materialism, 28.

২৯. তংজীবং তং সরীরং। অঞ্‌ঞং জীবং অঞ্‌ঞং সরীরং।
'জীব' অর্থ জীবাত্মা, শরীর পালি ভাষায় 'সরীর', অঞ্‌ঞং' অর্থ 'এই এই'।

৩০ রমেন্দ্রনাথ ঘোষ " বিযুক্তকরণ ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়," **কুসুমে কুসুমে চরণচিহ্ন**, মফিজউদ্দীন আহমদ স্মারকগ্রন্থ, হাসান আজিজুল হক সম্পাদিত, প্রকাশক : খানম মমতাজ আহমদ, মফিজউদ্দীন আহমদ স্মৃতি সংসদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, বাংলাদেশ, ডিসেম্বর ২০০৩, ১৯৮-২০৬।

চার্বাক দর্শনের স্বরূপ

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

সদানন্দ যতি বা যোগীন্দ্র (ষোলো শতক)-র *বেদান্তসার*-এ চার ধরনের চার্বাকের কথা আছে।[১] তাঁদের একদল বলেন : অন্নরসময় পুরুষই আত্মা। মতটিকে দেহাত্মবাদ বা শরীরাত্মবাদ বলা হয়েছে।

আর-একদল বলেন : ইন্দ্রিয়ই আত্মা। এ মতটিকে ইন্দ্রিয়াত্মবাদও বলা হয়।

অন্য একদল বলেন : প্রাণই আত্মা। এর নাম প্রাণাত্মবাদ।

আরও একদল বলেন : আত্মা মনোময়। এই মতটিকে বলে মন-আত্মবাদ।

বেদান্তসার অনেক পরের বই, তবু অনেকেই এটিকে প্রামাণিক বলে মনে করেন। এর অন্তত তিনটি টীকা পাওয়া যায়। ষোলো শতকের মাঝামাঝি *সুবোধিনী* নামে একটি টীকা লিখেছিলেন নৃসিংহ সরস্বতী। সতেরো শতকের গোড়ায় আরও দুটি টীকা লেখেন আপদেব বা আপোদেব[২] (*বালবোধিনী*) আর রামতীর্থ যতি (*বিদ্বন্ মনোরঞ্জনী*)। এগুলি বহুবার ছাপা হয়েছে, বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায়। ইংরিজি ও জার্মানে *বেদান্তসার*-এর একাধিক অনুবাদও বেরিয়েছে।[৩]

সদানন্দ যে চার ধরনের চার্বাকের কথা বলেছেন, আধুনিক অনেক পণ্ডিতই সেটিকে কোনো গুরুত্ব দেননি।[৪] চার্বাক/লোকায়ত বা সাধারণভাবে ভারতে বস্তুবাদের ধারা নিয়ে আলোচনায় সব বিদ্বান্ *বেদান্তসার*-এর উল্লেখ করেন না। আবার কোনো কোনো বিদ্বান্ সদানন্দ-র মতটিকে খুবই গুরুত্ব দেন।[৫] দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী ঐ চারটি মত নিয়েই আলোচনা করেছেন ও সবকটিকেই আলাদা আলাদা মতের চার্বাক বলে ধরে নিয়েছেন।[৬] এছাড়া *ন্যায়সূত্র*-এ ইন্দ্রিয়াত্মবাদ ও মন-আত্মবাদ প্রসঙ্গে (৩।৩।১-১৭) তাঁর টিপ্পনীতে ফণিভূষণ তর্কবাগীশও সদানন্দ-এর মত স্বীকার করে নিয়েছেন।[৭] তাই চার ধরনের চার্বাক সম্পর্কে এই বিবরণ কতদূর মান্য তা একবার খুঁটিয়ে বিচার করা দরকার।

প্রথমেই বলা ভালো : আত্মা সম্পর্কে প্রাচীন ভারতে বহু রকমের মত ছিল। শঙ্করাচার্য-র নামে প্রচলিত (যদিও সন্দেহজনক) *সর্ব-বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সার-সংগ্রহ* বইটিতে এমন নটি মতের কথা পাওয়া যায় : পুত্রই আত্মা, দেহই আত্মা, ইত্যাদি। বাকিগুলি-হলো ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অজ্ঞান, জ্ঞানাজ্ঞান ও শূন্যবাদ।[৮] *ন্যায়সূত্র*-এ ভূতচৈতন্যবাদ-এর পাশাপাশি মনশ্চৈতন্যবাদ-এর কথা আছে (৩।৩।১৯৭)। *ন্যায়মঞ্জরী*-তে জয়ন্তভট্ট (দশ শতক) ঐ তিনটি মত নিয়ে আলোচনা করেছেন।[৯] ব্যোমশিবাচার্য (সাত শতক বা তার পরে)-র *ব্যোমবতী*-তেও ইন্দ্রিয়চৈতন্যবাদী ও মনশ্চৈতন্যবাদীর প্রসঙ্গ এসেছে।[১০] কিন্তু এঁরা কেউই দেহাত্মবাদ ছাড়া আর কোনো মতকে চার্বাকদের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত করেননি। *ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য*-এ শঙ্করাচার্য (ন শতক)-ও লিখেছেন : চৈতন্যবিশিষ্ট দেহমাত্রই আত্মা— এমন প্রতিপন্ন করেন প্রাকৃতজন (= অজ্ঞ মানুষ) ও লোকায়তিকরা; অন্যরা বলেন, চেতন ইন্দ্রিয়গুলিই আত্মা; অন্যে বলেন মন-ই আত্মা; একদল বলেন আত্মা বিজ্ঞানমাত্র ক্ষণিক; আবার একদল বলেন, আত্মা শূন্য।[১১] শঙ্কর নিজে কখনও দেহাত্মবাদ ছাড়া আর কোনো মতকে লোকায়তর সঙ্গে এক করে

দেখেননি।[১২] ন শতকে সুরেশ্বরাচার্য (বিশ্বরূপ) *মানসোল্লাস-সংগ্রহ* (বার্তিক)-এ ইন্দ্রিয়াত্মবাদ, প্রাণাত্মবাদ, ক্ষণিকবাদ ইত্যাদির উল্লেখ ও খণ্ডন করেছেন, কিন্তু দেহাত্মবাদ ছাড়া আর কোনো মতকে চার্বাকমত বলেননি।[১৩]

অদ্বৈত বৈদান্তিকদের বাইরে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী যামুনাচার্য (এগারো শতক) দেহাত্মবাদ ছাড়াও ইন্দ্রিয়াত্মবাদ, মন-আত্মবাদ ও প্রাণাত্মবাদ-এর উল্লেখ করেছেন।[১৪] তিনিও কিন্তু এই সবকটিকেই চার্বাকমতের শাখা বা ঐ ধরনের কিছু বলেননি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে : সদানন্দ যতি বা যোগীন্দ্রই প্রথম আত্মা সম্পর্কে নানা মতের মধ্যে থেকে চারটিকে বেছে নিয়ে তাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের চার্বাক বলে চিহ্নিত করলেন। হয়তো তাঁকেই অনুসরণ করে সদানন্দ কাশ্মীরক (সতেরো-আঠেরো শতক) দেহাত্মবাদকে চার্বাক আর বাকি তিনটি মতকে 'কেউ কেউ' (কেচিৎ), 'অপরে' ও 'অন্যে'-এর বলে জানিয়েছেন।[১৫] তবে এঁদের কথা এসেছে *অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি*-এর "দ্বিতীয় মুদ্গরপ্রহার"-অধ্যায়ে। তাই মনে হয় এই চারটি মতকেই সদানন্দ কাশ্মীরক এক-এক ধরনের চার্বাকমত বলে ধরে নিয়েছিলেন।

এই ধারণার সত্যিই কি কোনো ভিত্তি আছে? এর স্পষ্ট উত্তর : না। একমাত্র দেহাত্মবাদকেই চার্বাক/লোকায়তর অন্য নাম বলে ধরা যায়, যদিও চার্বাকমতের ক্ষেত্রে দেহকেই আত্মা বলে সনাক্ত করা হয় না, বরং বলা হয়: দেহ থাকলে তবেই চেতনা (চৈতন্য) থাকে; মৃত্যু হলে দেহের সঙ্গে সঙ্গে চেতনাও লোপ পায়। 'আত্মা' শব্দটি চার্বাকরা আদৌ ব্যবহার করতেন কিনা তাতেও সন্দেহ আছে। কালের কবল থেকে যে কটি চার্বাকসূত্র রক্ষা পেয়েছে, সেগুলিতে 'চৈতন্য' শব্দটিই পাওয়া যায়। চার্বাকসূত্রে বলা আছে :

১।১ সুতরাং এখন আমরা তত্ত্ব (বস্তুজগতের স্বরূপ) ব্যাখ্যা করব।
১।২ তত্ত্বগুলি (হলো) মাটি, জল, আগুন আর বাতাস।
১।৩ তাদের মিলিত (রূপের) নাম শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়।
১।৪ সেগুলি থেকে চৈতন্য (দেখা দেয়)।
১।৫ বিজ্ঞান (চেতনা) হলো কিণ্ব (মদ তৈরির উপাদান, যেমন ভাত, গুড়) ইত্যাদি থেকে মদশক্তি (নেশা ধরানোর ক্ষমতা)-এর মতো।[১৬]

আর-একটি সূত্র হলো : চৈতন্যবিশিষ্ট শরীরই পুরুষ (চৈতন্যবিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষঃ)। মধুসূদন সরস্বতীর *গীতাভাষ্য* (ষোলো শতক)-এ এটি উদ্ধৃত হয়েছে "দেহমাত্রং চৈতন্যবিশিষ্টং আত্মা"—এই ভাবে।[১৭] অর্থাৎ সচেতন দেহ থেকে আলাদা কোনো আত্মা, মৃত্যুর পরেও যা অশরীরী হয়ে থেকে যায়, এমন অজর, অমর, অক্ষয় কোনো পুরুষের ধারণায় চার্বাকরা বিশ্বাস করতেন না। তাঁরা মনে করতেন চৈতন্য আসলে ভূতধর্ম।[১৮] চার্বাকমত খণ্ডনের সময়ে যাবতীয় দার্শনিক— জৈন, বৌদ্ধ, নৈয়ায়িক, বৈদান্তিক নির্বিশেষে— চার্বাকদের এই ধারণাকেই আক্রমণ করেছেন। বৌদ্ধদের অনাত্মবাদী বলা হয়, কিন্তু তাঁরাও পরলোক মানতেন। সুতরাং তাঁদের চোখেও চার্বাকরা 'নাস্তিক' কারণ চার্বাকরা বলতেন : পরলোকী (পরলোকের বাসিন্দা) কোনো অমর আত্মা নেই বলেই পরলোক অসিদ্ধ, প্রমাণের অভাবে পরলোক বলে কিছু থাকতে পারে না।[১৯] ইন্দ্রিয়াত্মবাদ, প্রাণাত্মবাদ, মন-আত্মবাদ খণ্ডনে সব চার্বাক-বিরোধীই সময় নষ্ট করেননি। ঐ মতগুলিকে তাঁরা অতি প্রাচীন মত বলেই জানতেন। নানা উপনিষদে সেগুলির উল্লেখ আছে।[২০] তার কয়েকটি মত হয়তো পরেও প্রচলিত ছিল, কিন্তু সেগুলির সঙ্গে চার্বাক/লোকায়ত-র কোনো সম্পর্ক নেই।

তবে সদানন্দ যোগীন্দ্র প্রমুখ ইন্দ্রিয়াত্মবাদ ইত্যাদিকেও এক-এক ধরনের চার্বাকমত বলে ধরে নিলেন কেন? আসলে চার্বাক বলতে তাঁরা বুঝতেন সব ধরনের বস্তুবাদীই। রাধাকৃষ্ণন লিখেছেন : ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন— যাকেই আত্মা বলে ধরা হোক, এর সবকটিই প্রাকৃতিক ঘটনা (ন্যাচারাল ফেনোমেনন),[২১] অর্থাৎ অতিলৌকিক কিছু নয়। আর সেই কারণেই কিছু লোক মনে করলেন, এই সবকটি মতই চার্বাকদেরই রকমফের।[২২] উপনিষদের ধারাকেই অনুসরণ করে *বেদান্তসার*-এর টীকাকার নৃসিংহ সরস্বতী বলেছেন : পুত্রাত্মবাদীরা ছিলেন 'অতি স্থূলবুদ্ধি'। দেহাত্মবাদী চার্বাকরা তার চেয়ে 'বিশিষ্টবুদ্ধি' (এতদ্ অপেক্ষয়া বিশিষ্টবুদ্ধিঃ), প্রাণাত্মবাদীরা এঁদের চেয়ে 'সূক্ষ্মবুদ্ধি' ('বিশিষ্টাধিকারী')। এঁদের চেয়েও মার্জিতবুদ্ধি হলেন মন-আত্মবাদী।[২৩] দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীর মতে, দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন এই চারটি মত পর্যায়ক্রমে উন্নততর, কারণ একের ভুল অন্যে শুধরে নিয়েছেন।[২৪] তাঁর সিদ্ধান্ত এই :

> অধ্যাত্মবাদী দর্শনমতগুলি দ্বারা প্রবলভাবে আক্রান্ত হইয়া বার্হস্পত্যগণ আপনাদিগের পূর্বমত 'দেহাত্মবাদ' পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে 'ইন্দ্রিয়াত্মবাদ' 'প্রাণাত্মবাদ' ও 'মন-আত্মবাদ' স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।...
>
> পরবর্তী কালের এই চার্বাকগণই সুশিক্ষিত চার্বাক নামে পরিচিত। এই চার্বাকগণ যে ধীরে ধীরে অধ্যাত্মবাদের দিকেই অগ্রসর হইতেছিলেন, তাহা অনস্বীকার্য্য।[২৫]

আদৌ 'সুশিক্ষিত চার্বাক' বলে কেউ ছিলেন কিনা—সে নিয়েই মতভেদ আছে।[২৬] কিন্তু সে-কথা ছেড়ে দিলেও ইন্দ্রিয়াত্মবাদ, প্রাণাত্মবাদ ও মন-আত্মবাদ-এর মতো প্রাচীন ধারণাকে চার্বাকদের ওপর আরোপ করা ঠিক ইতিহাসসম্মত নয়। আর 'অধ্যাত্মবাদের দিকে অগ্রসর' হওয়ার ধারণাটি শুধু অস্বীকার্যই নয়, কালপরম্পরার বিচারেও ভুল। চার্বাকদের আগেও ভারতে বস্তুবাদী দার্শনিক ছিলেন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে চার্বাকদের প্রধান গরমিল ছিল এক জায়গায় : চার্বাকরা চারটি মাত্র ভূত (মূল উপাদান)-কে তত্ত্ব বলে মানতেন; তাঁদের বলা হয় 'ভূতচতুষ্টয়বাদী'। অন্য বস্তুবাদী সম্প্রদায় মাটি, জল, আগুন ও বাতাস ছাড়াও আকাশ বা ব্যোম নামে একটি পঞ্চম ভূত স্বীকার করতেন (এঁদের বলা যায় ভূতপঞ্চকবাদী)। 'চার্বাকৈকদেশীয়া' বা 'এক ধরনের চার্বাক' বলতে গুণরত্ন (পনেরো শতক) এই ভূতপঞ্চকবাদীদেরই বুঝিয়েছেন। ভারতে যে ভূতপঞ্চকবাদী সম্প্রদায় ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। *মহাভারত, সূত্র-কৃতাঙ্গ-সূত্র (সূ. কৃ. সূ), মণিমেকলাই* ইত্যাদি ব্রাহ্মণ্য, জৈন ও বৌদ্ধ সূত্রে তাঁদের কথা জানা যায়।[২৭] কিন্তু এই মতটি বস্তুবাদী হলেও চার্বাকদের পূর্ববর্তী— যদিও তাঁরা ভূতচৈতন্যবাদীই ছিলেন। কিন্তু তার জন্যে চার্বাকদের মধ্যে ইন্দ্রিয়াত্মবাদী ইত্যাদি তিনটি সম্প্রদায় কল্পনা করার কোনো হেতু নেই।

উপনিষদের যুগে (অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ছ শতকের আগে-পরে) আত্মা বা ব্রহ্ম সম্পর্কে অনেক রকমের ধারণা চালু ছিল। আগে যে কটির কথা বলা হয়েছে (পুত্র, দেহ, প্রাণ, মন ও বিজ্ঞান) সেগুলি ছাড়াও *তৈত্তিরীয় উপনিষদ্*-এ অন্ন ও আনন্দ এমন দুটি ব্রহ্মবাদের কথাও পাওয়া যায়।[২৮] এসব ধারণা অনেকদিন আগেই পেছনে পড়ে গিয়েছিল। *ন্যায়সূত্র* সঙ্কলনের সময়ে (খ্রিস্টপূর্ব দু শতক) ইন্দ্রিয়, প্রাণ, ও মন-আত্মবাদ-এর কোনো রেশ ছিল কিনা সন্দেহ। পরের ন্যায়-বৈশেষিকরা *ন্যায়সূত্র*-র প্রসঙ্গেই এগুলি নিয়ে কিছু মন্তব্য করেছেন। *ন্যায়সূত্র*-র বাইরে এগুলির ব্যাপারে আর কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ তাঁদের হাতে ছিল না। বৈদান্তিকদের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। তৈ.উ. ও শঙ্করাচার্য-র *ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য*-এর খেই ধরেই তাঁরা এসব মতের উল্লেখ করেছেন।

মনে রাখতে হবে : খ্রিস্টীয় ছ শতকের আগে লোকায়ত বলতে বস্তুবাদী দর্শন বোঝাত না; শব্দটির অর্থ ছিল বিতণ্ডাশাস্ত্র।[২৯] খ্রিস্টীয় আট শতকের আগে 'বস্তুবাদী' বা 'মেটিরিয়ালিস্ট' অর্থে

চার্বাক নামটি পাওয়া যায় না।[৩০] আর চার্বাক/লোকায়ত দর্শনে শুধু আত্মার স্বরূপ নিয়ে আলোচনা থাকে না। সেটি পূর্ণাঙ্গ দর্শন-প্রস্থান, তার জ্ঞানতত্ত্ব ইত্যাদিও আছে। ফলে ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন-আত্মবাদীদের চার্বাক বলার কোনো মানে হয় না। ভারতে বস্তুবাদের ইতিহাস-আলোচনায় তাই ঐ তিনটি মতকে বড়জোর পাদটীকায় উল্লেখ করা যায়। সেগুলিকে চার্বাকমতের রকমফের বলাটা অন্-ঐতিহাসিক, তত্ত্বগতভাবেও ভুল।

টীকা :

১। অদ্বৈত আশ্রম সংস্করণ, পৃ. ৭০-৭২ ; রামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ সং., পৃ: ১৪৬-১৪৯।

২। আপোদেব-এর বদলে পটার লিখেছেন আপদেব (১:১, পৃ. ৬১০), রামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ সং. এ আপোদেব-ই আছে।

৩। বিস্তৃত বিবরণের জন্যে পটার, ১:১, পৃ. ৫৪১, ই. ৬০৯-১০ দ্র.। এখানে রামমোহন রায়ের *বেদান্তসার*-কে ভুল করে সদানন্দ যতির বইটির অনুবাদ বলা আছে। (ই.৯৩৪।৩।২, ৯ দ্র.)। আসলে *বেদান্তসার* নাম দিয়ে রামমোহন *ব্রহ্মসূত্র*-র একটি নির্বাচিত সূত্রসঙ্কলন করে বাঙলা ও ইংরিজিতে তার তর্জমা করেন। তার সঙ্গে সদানন্দ-র বইটির কোনো সম্পর্ক নেই। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ১৯৯৭ দ্র.। নৃসিংহ সরস্বতী প্রসঙ্গেও পটার (ঐ, ১:১, পৃ. ৫৬৯, ই. ৯৯৮)-এ *বেদান্তসার*-এর টীকাটির উল্লেখ করেননি।

৪। উদাহরণ হিসেবে সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ও এরিখ ফ্রাউভালনার-এর নাম করা যায় (রচনাপঞ্জি দ্র.)।

৫। চার্বাকমতের আলোচনায় সদানন্দ-এর মতটিকে কোলব্রুক (১৮২৭) নির্বিচারে মেনে নিয়েছিলেন (পৃ. ৪০৪), কারণ তাঁর হাতে খুব বেশি তথ্য ছিল না। পরে তাঁকেই অনুসরণ করেছেন রাধাকৃষ্ণন (পৃ. ২৮০) ও হিরিয়ান্না (১৯৩২, ১৯৭৩, পৃ. ১৯৩ টী ১)। অন্য একটি প্রবন্ধেও (১৯৩৪) হিরিয়ান্না দেহাত্মবাদ-এর সঙ্গে প্রাণাত্মবাদ-এর কথা লিখেছেন (১৯৫২, পৃ. ২৬)। এছাড়া নিচে টী. ২২ দ্র.।

৬। ১৯৮২, পৃ. ১৩২-৫২।

৭। খণ্ড ৩, পৃ. ৬৯।

৮। পৃ. ২৩৪-৬০। বিশদ আলোচনার জন্যে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ১৯৯৬, পৃ. ৮-৯ দ্র.।

৯। আহ্নিক ৭। ভাগ ২, পৃ. ২১৭-১৯। ইন্দ্রিয়চৈতন্যবাদ খণ্ডন করে জয়ন্ত লিখেছেন : অতি তুচ্ছ এই ইন্দ্রিয়চৈতন্যবাদ নিয়ে কী আর বেশি লেখা যায়!

১০। ভাগ ২, পৃ. ১২৬।

১১। ১।১।১-এর ভাষ্য, চৌখম্বা সং., পৃ. ৮১।

১২। দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ অবশ্য ইন্দ্রিয়াত্মবাদ ও মন-আত্মবাদকে চার্বাকদেরই 'অন্যতম শাখা' ও 'অন্তর্ভূত' বলে ধরেছেন (পৃ. ৫২-৫৩, টী. ২২-২৩)। কিন্তু প্রাচীন কোনো টীকাকার (আনন্দগিরি, গোবিন্দানন্দ, বাচস্পতি মিশ্র, অমলানন্দ, অপ্পয়দীক্ষিত) সে-কথা লেখেননি।

১৩। *মানসোল্লাস*-এর অনুবাদে ৫।৭-এর পর বশিষ্ঠানন্দ পুরী লিখেছেন : "একদেশী চার্ব্বাকের ও বৌদ্ধের মত স্থাপন করিয়া [সুরেশ্বরাচার্য] খণ্ডন করিতেছেন" (পৃ. ৬০)। কিন্তু মূলে

কোথাও 'একদেশী চার্ব্বাক' এমন নাম নেই, শুধু ইন্দ্রিয়াত্মবাদ ও প্রাণাত্মবাদ-এর কথা আছে (৫।১৪-২২ দ্র.), তা-ও 'কেচিৎ' বলে।

১৪। পৃ. ১৯-২৪।

১৫। দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী এই তিনটিকেই তাঁর 'বার্হস্পত্যসূত্রম্'-এ স্থান দিয়েছেন (সূত্র ৩৬-৩৮, পৃ. ২০০, ২০২)। বিনা-স্বীকৃতিতে এই সূত্রসঙ্কলনটি হুবহু উদ্ধৃত করেছেন সর্বানন্দ পাঠক (পৃ. ১৩৬-৪৬)।

১৬। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ২০০১, পৃ. ৬-৮। সূত্রগুলিব উৎস এখানেই পাওযা যাবে।

১৭। *গীতা*, ২।১৩ প্রসঙ্গে। দামোদর মুখোপাধ্যায় সম্পা., পৃ. ২৬৭৩।

১৮। *প্রশ্নোপনিষদ্*, ৬।২-এর ভাষ্যে শঙ্কর লিখেছেন · 'চৈতন্যং ভূতধর্ম ইতি লৌকায়তিকাঃ'। ব্যাখ্যা করে আনন্দগিরি বলেছেন : দেহ আকাবে সংহত ভূতগুলির ধর্মই হলো চৈতন্য। পৃ. ১১০-১১, ১৯৪।

১৯। বামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ২০০১, পৃ. ৯-১০। 'নাস্তিক' প্রসঙ্গে বামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ২০০৩, পৃ ৩৩-৩৮ দ্র.।

২০। *কৌষিতকী উপনিষদ্*, ২।১১; *তৈত্তিরীয় উপনিষদ্* ২।২।২-৪।

২১। রাধাকৃষ্ণন, পৃ. ২৮০।

২২। হিরিয়ান্না (১৯৩২, ১৯৭৩), পৃ. ১৯৩ টী. ১; (১৯৫২), পৃ. ২৬। এই ব্যাখ্যায় বিভ্রান্ত হয়েছেন ডেল রিপে (পৃ. ৩২)। তিনি অবশ্য হিবিয়ান্নার দ্বিতীয় বইটির পৃ. ১২৪-এব উল্লেখ করেছেন। এটি অবশ্যই ভুল, কারণ বইটি মাত্র ১১৪ পাতাব!

২৩। কালীবর বেদান্তবাগীশ এই *সুবোধিনী টীকা* অনুসাবেই তাঁব বাঙলা অনুবাদ করেছিলেন। পৃ. ১২৮-৩২ দ্র।

২৪। ১৯৮২, ১৪১-৪৬।

২৫। ঐ, পৃ ১৪৬। অন্য একটি প্রবন্ধে দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী লিখেছিলেন :

এইরূপে সামান্যতোদৃষ্ট অলৌকিক অনুমানকে ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত পরমাত্মা, পরমেশ্বর, পরলোক, জন্মান্তর, কর্মফল ও স্বর্গনরকাদি চার্বাকের আঘাতে, শূন্যে নির্মিত বাত্যাহত সুরম্য সৌধশ্রেণীর ন্যায় নিরালম্ব ও চূর্ণবিচূর্ণ হইযা ধ্বসিয়া যায়; তাসের ঘর ভাঙ্গিয়া পড়ে।

কিন্তু আংশিকভাবে অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া সুশিক্ষিত চার্বাকগণ যে ধীরে ধীরে অধ্যাত্মবাদের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। (ঐ, পৃ. ১০৫)

২৬। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (১৯৮৭), পৃ. ৬৬-৬৯; ফ্রাঙ্কো ও প্রাইসেনডান্ৎস্, পৃ. ১৭৯ দ্র.। 'সুশিক্ষিত চার্বাক' কথাটি জয়ন্ত বিদ্রূপের ছলে লিখেছিলেন। 'চার্বাক ধূর্ত'-র মতো এটিও কোনো আলাদা সম্প্রদায়ের নাম নয়: দুটি বিশেষণ দিয়েই *চার্বাকসূত্র*-র এক অভিনব টীকাকার, উদ্ভটভট্টকে বোঝানো হয়েছে— চক্রধর-এর এই ব্যাখ্যাই ঠিক বলে মনে হয়। অন্য মতের জন্যে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, পৃ. ২৫২; সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, খণ্ড ৩, পৃ. ৫১৬ দ্র.। দক্ষিণারঞ্জনও এই মতেই বিশ্বাসী ছিলেন। এঁরা অবশ্য চক্রধর-এর *ন্যায়মঞ্জরী-গ্রন্থিভঙ্গ* টীকাটি দেখার সুযোগ পাননি।

২৭। *ষড়্দর্শনসমুচ্চয়*, পৃ. ৩০০; *মহাভারত*, প্রামাণিক সং., শান্তিপর্ব, ২৬৭।৪ (প্রচলিত সং.,

২৭৪।৪); আশ্বমেধিকপর্ব, ৫০।১০ (প্রচলিত সং., ৫১।৫১); সূ. কৃ. সূ., ১।১।৭-৮; *মণিমেকলাই*, অধ্যায় ২০, পৃ. ১৭০; ইআকবি (১৮৯৫), পৃ. তেরো দ্র.। বিশদ আলোচনার জন্যে রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য ২০০৪ ক দ্র.।

২৮। *তৈত্তিরীয় উপনিষদ্*, ৩।৩।২-১০, ৩।১০।৫-৬।

২৯। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ১৯৯৮ ক, ১৯৯৮ খ ও ২০০০ গ দ্র.।

৩০। কমলশীল (*তত্ত্বসঙ্গ্রহ-পঞ্জিকা*, পৃ. ৬৩৯) ও হরিভদ্র (*ষ. দ. স.*, শ্লোক ৮৫, পৃ. ৩০৭) প্রথম 'লোকায়ত' ও 'চার্বাক' শব্দদুটি সমার্থক রূপে ব্যবহার করেছেন।

কৃতজ্ঞতাস্বীকার : মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, সিদ্ধার্থ দত্ত

রচনাপঞ্জি :

অষ্টাদশ উপনিষদঃ। বি.প্র. লিময়ে ও রং. দে. বাডেকর সম্পা.। পুণাঃ বৈদিক সংশোধন মণ্ডল, ১৯৫৮।

কমলশীল। *তত্ত্বসঙ্গ্রহ-পঞ্জিকা*। দ্বারিকাদাস শাস্ত্রী সম্পা.। বারাণসীঃ বৌদ্ধবিহার, ১৯৮১।

জয়ন্তভট্ট। *ন্যায়মঞ্জরী* (চক্রধর-এর *গ্রন্থিভঙ্গ* সমেত)। গৌরীনাথ শাস্ত্রী সম্পা.। বারাণসী : সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮২-৮৪।

দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী। *চার্বাক দর্শন*। কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮২।

দামোদর মুখোপাধ্যায় সম্পা.। *শ্রীমদ্ভবদ্গীতা*। কলিকাতাঃ ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৮৫৪ শক্।

দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ সম্পা.। *বেদান্তদর্শনম্*। *শারীরকভাষ্যসমেতম্*। কলিকাতাঃ হরিপদ ভট্টাচার্য্য ও ক্ষীরোদচন্দ্র মজুমদার, তারিখ নেই।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। *ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে*। কলকাতা : অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ১৯৮৭।

ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। *ন্যায়দর্শন (গৌতম সূত্র) বাৎস্যায়ন-ভাষ্য*, খণ্ড ১-৫। কলিকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১-৮৯।

যামুন। *সিদ্ধিত্রয়*। তি. বীররাঘবাচার্য সম্পা। তিরুপতি, ১৯৪২।

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য। "জনৈক অদ্বৈত বৈদান্তিকের চার্বাক-ব্যাখ্যান", *ক্রান্তিক*। ১৯৯৬ (শারদ সংখ্যা)।

—। "*চার্বাকসূত্র* : পুনর্গঠনের দিকে", *অনুষ্টুপ*, বর্ষ ৩৫ সংখ্যা ৪, ২০০১।

—। "নাস্তিক আর চার্বাক", *মানবমন*, খণ্ড ৪২ সংখ্যা ৪, ২০০৩।

ব্যোমশিবাচার্য। *ব্যোমবতী*। গৌরীনাথ শাস্ত্রী সম্পা.। বারাণসী : সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩-৮৪।

শঙ্করাচার্য। *প্রশ্নোপনিষদ্ভাষ্য* (আনন্দগিরির টীকা সমেত)। স. সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী সম্পা.। মাউন্ট আবু, বারাণসী : মহেশ-অনুসন্ধান-সংস্থানম্, ১৯৭৯।

— । *ব্রহ্মসূত্র-শঙ্কর ভাষ্য* ও *ভামতী*, *কল্পতরু* ও *পরিমল*। অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী ও বাসুদেব লক্ষ্মণ শাস্ত্রী পণশীকর সম্পা.। বারাণসীঃ চৌখম্বা সংস্কৃত সীরীজ অফিস, ১৯৮২।

শারীরক ভাষ্য (দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ সম্পা. *বেদান্তদর্শনম্* দ্র.)।

সদানন্দ কাশ্মীরক (যতি)। *অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধিঃ* (পূর্ব্বার্দ্ধম্)। গুরুচরণ তর্কদর্শনতীর্থ ও পঞ্চানন তর্কবাগীশ সম্পা.। কলিকাতাঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩০।

সদানন্দ যোগীন্দ্র। *বেদান্তসারঃ* (কালীবর বেদান্তবাগীশ-কৃত বঙ্গানুবাদ সমেত)। নিশিকান্ত

সাংখ্যতীর্থ ও কালীপ্রসন্ন সাংখ্যতীর্থ সম্পা.। উত্তরপাড়া : বেদান্তবাগীশ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, ১৩৫৬।
— স্বামী নিখিলানন্দ সম্পা. ও ইংরিজি অনু. কলকাতা: অদ্বৈত আশ্রম, ১৯৯০।
— । ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য অনূদিত। কলিকাতা : রামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ, ১৯৬৮।
সর্ব্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সার-সংগ্রহঃ। প্রমথনাথ তর্কভূষণ এবং অক্ষয়কুমার শাস্ত্রী (অনু. ও সম্পা.)। কলিকাতা: লোটাস লাইব্রেরী, ১৭৩৫ শক।
সর্বানন্দ পাঠক। *চার্বাক দর্শন কী শাস্ত্রীয় সমীক্ষা*। বারাণসী: চৌখম্বা, ১৯৯০।
সুরেশ্বরাচার্য্য (বিশ্বরূপ)। *মানসোল্লাস সংগ্রহ* (বার্ত্তিক)। স্বামী বশিষ্টানন্দ পুরী সম্পা.। কলিকাতা : বসুমতী সাহিত্য মন্দির, তারিখ নেই।
হরিভদ্র। *ষড়্দর্শনসমুচ্চয়*। লুইজি সুআলি সম্পা.। কলিকাতা : এশিয়াটিক সোসাইটি। ১৯০৫-১৪।
Bhattacharya, Ramkrishna (1978a). "Sāṁkhya,' Yoga and Lokāyata in the Kauṭilya Arthaśāstra : A Review", *Bharatiya Samajik Chintan*, Vol . XXI, Nos. 1-2, January-June, 1998.
—. (1998b). "On *Lokāyata* and *Lokāyatana* in Buddhist Sanskrit", *Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute*, Vol . LXXI, 1998.
—. (2000c). "The Significance of *Lokāyata* in Pali", *Journal of the Department of Pali*, Calcutta University, Vol.10, 2000.
—. (2004a) Jain Sources for the Study of Pre-Carvaka Materialist Ideas in India. *Jain Journal*, Vol. 38 No. 3, January 2004.
Colebrook, H. T. *Miscellaneous Essays*, Vol. I. London : Wm. H. Allen and Co., 1837.
Dasgupta, S. N. *A History of Indian Philosophy* Vol 3 (1940). Delhi : Motilal Banarsidass, 1975.
Franco, Eli and Karin Preisendanz. "Materialism, Indian School of" in Edward Craig (ed.). *Routledge Encyclopedia of Philosophy*. Vol. 6 . London : Routledge, 1998.
Frauwallner, Erich. *History of Indian Philosophy*. Vol. II. Delhi : MLBD, 1997.
Hiriyanna, Mysore. *Outlines of Indian Philosophy*. London : George Allen and Uuwin, 1932, 1973 reprint.
—. *Popular Essays in Indian Philosophy*. Mysore : Kavyalaya Publishers, 1952.
Jacobi, Hermann. *Jaina Sutras*. Part II. Sacred Book of the East, Vol. 45. Delhi : MLBD, 1980 (first published 1895).
Potter, Karl. H. *Encyclopedia of Indian Philosophies. Bibliography* (Third Edition). Vol. I. Dehli : MLBD, 1995.
Radhakrishnan, S. *Indian Philosophy*. Vol. 1. London : George Allen and Onwin, 1948.
Riepe, Dale. *The Naturalistic Tradition in Indian Thought*. Delhi : MLBD, 1964.
Seal, Brajendranath. *The Positive Sciences of the Ancient Hindus*. Delhi: MLBD, 1991.
Silappathikasam. *Manimekalai*. Retold by Lakshmi Holmstoörm. Hyderabad : Orient Longman, 1996.

প্রাচীন যুগে বাঙ্গালী নারীর জীবন : সংস্কৃত সঙ্কলন সাহিত্যে প্রাপ্ত কিছু খণ্ড চিত্র

শাহানারা হোসেন

সমগ্র প্রাচীন বিশ্বের নারী সমাজের জীবন সম্পর্কে খুব স্বল্প জানা যায়। এই অজ্ঞতার একটি কারণ হচ্ছে প্রাচীন সমাজ ছিলো পিতৃতান্ত্রিক এবং এই সমাজে একক ব্যক্তি হিসেবে নারীর কোনো মর্যাদা বা গুরুত্ব ছিল না। প্রাচীন যুগের নারী সমাজের বিষয়ে বহু তথ্য অবিদিত থাকার আরেকটি কারণ হচ্ছে সে সময়কালে নারী ছিলো সাধারণত গৃহবধু। তারা শাসক বা সেনা ছিলো না— তারা পুরোহিতও ছিল না। তাই প্রাচীন বিশ্বের রাজনীতি ও সমাজে নারীর প্রভাব ছিলো প্রায় শূন্যের কোঠায় এবং কদাচিৎ প্রাচীন নারী রাজনীতি ও সমাজকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু নারী ছিলো পুরুষের জন্মদাত্রী মাতা, জীবন সঙ্গিনী স্ত্রী, স্নেহময়ী বোন ও স্নেহভাজন কন্যা। তাই সমসাময়িক সাহিত্যে প্রসঙ্গ ক্রমে কখনো কখনো নারীর জীবনের খণ্ড চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলাদেশে সঙ্কলিত প্রকীর্ণ সংস্কৃত শ্লোক গ্রন্থাবলীতে প্রাচীন বাঙ্গালী নারীব জীবনের টুকরো টুকরো চিত্র আমরা পাই এবং এই সকল চিত্রাবলী একত্রে গ্রন্থিত করে আমরা প্রাচীন বাংলার নারী সমাজের জীবন সম্পর্কে কিছু ধাবণা কবে নিতে পারি।

সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্কলন গ্রন্থ শাখার বাংলার অবদান অতি গুরুত্বের সাথে উল্লেখ্য। এই সংকলনগুলি মনে হয় সাধারণ জনদের কথা ভেবে প্রণীত হয়েছিলো যারা সম্ভবত এমন ধবনের সাহিত্য গ্রন্থের প্রয়োজন অনুভব করেছিলো যে গ্রন্থ তাদের বিভিন্ন মানসিক অবস্থার ও সাহিত্যিক রুচির সাথে সঙ্গতি রেখে চিত্তবিনোদনের মাধ্যম হবে।[১] যে সব সঙ্কলন গ্রন্থ বাংলাদেশে সঙ্কলিত হয়েছিলো এবং অদ্যবধি পাওয়া গেছে তার মধ্যে প্রাচীনতম সংস্কৃত শ্লোক সংকলন গ্রন্থ সুভাষিতরত্ন কোষ সঙ্কলিত করেছিলেন বৌদ্ধ আচার্য বিদ্যাকর। তার সময়কাল খ্রিস্টিয় একাদশ শতাব্দী হতে দ্বাদশ শতাব্দী। এই গ্রন্থটি মূলতঃ মধ্য ধ্রুপদী যুগের (৭০০-১০৫০) সংস্কৃত কবিতার সঙ্কলন গ্রন্থ, যে গ্রন্থে পূর্বাঞ্চলীয় বা বাঙ্গালী লেখকদের কবিতার প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শিত হয়েছে।[২] বৌদ্ধ পণ্ডিত বিদ্যাকর তার সঙ্কলন কাজে বরেন্দ্রী তথা উত্তর বাংলায় অবস্থিত জগদ্দল মহাবিহারের গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছেন। তার সঙ্কলন গ্রন্থ সুভাষিতরত্নকোষ বা সুউক্তির রত্নাগার এর দুইটি সংস্করণ রয়েছে। সংস্করণ দুটিই তিনি প্রণয়ন করেছিলেন। দুইশত জনের অধিক কবির লিখিত ১৭৩০টি শ্লোক এই সঙ্কলন গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

বাংলাদেশে সঙ্কলিত পরবর্তী সংস্কৃত শ্লোক সঙ্কলন গ্রন্থের নাম সদুক্তিকর্ণামৃত। এই গ্রন্থে পাঁচশতেরও অধিক কবির লিখিত ২৩৪০টি শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। সঙ্কলক শ্রীধরদাস রাজা লক্ষণ সেনের পৃষ্ঠপরিপোষকতায় ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে সদুক্তিকর্ণামৃত সঙ্কলন করেছিলেন। শ্রীধরদাসের পিতা বটুদাস রাজা লক্ষণ সেনের অধীনে একজন মহাসামন্ত চূড়ামনি বা প্রধান সামন্ত ছিলেন। শ্রীধরদাস নিজে ছিলেন মহামাণ্ডলিক অর্থাৎ বর্তমানকালের প্রদেশ শীর্ষক প্রশাসনিক ভাগের তিনি ছিলেন

অধিকর্তা। সুভাষিতরত্নকোষ ও সদুক্তিকর্ণামৃত— এই দুইটি সংস্কৃত শ্লোক সঙ্কলন গ্রন্থে ৬৮৩টি শ্লোক রয়েছে যা দুটি গ্রন্থেই অঙ্গিভূত হয়েছে। প্রাচীন বাংলার অপর একটি শ্লোক সঙ্কলন গ্রন্থের নাম আর্যাসপ্তশতী। গ্রন্থটির সংঙ্কলন ও রচয়িতা গোবর্ধানাচার্য মনে হয় রাজা লক্ষণ সেনের সভাকবি ছিলেন। এই সঙ্কলন কাব্যে রয়েছে ৭০০টি বিচ্ছিন্ন শ্লোক যা বিভিন্ন শাখায় সাজানো হয়েছে। এখানে আমরা দেখছি যে প্রাচীন বাংলার তিনটি শ্লোক সঙ্কলন গ্রন্থের প্রাচীনতম শ্লোক সংঙ্কলন গ্রন্থ সুভাষিতরত্নকোষ সঙ্কলন করেছিলেন একজন বৌদ্ধ আচার্য। দ্বিতীয় শ্লোক সঙ্কলন গ্রন্থ সদুক্তিকর্ণামৃত সঙ্কলন করেছিলেন একজন উচ্চপদধারী রাজ কর্মচারী। তৃতীয় সঙ্কলক ছিলেন রাজসভার কবি। বিদ্যাকরের পটভূমি ছিলো পাণ্ডিত্য ও ধর্মীয় পরিমণ্ডলের এবং শ্রীধরদাস শ্রেণীগতভাবে ছিলেন অভিজাত শ্রেণীর এবং তার ক্ষমতা ও রাজবংশের সাথে নিকট সম্পর্ক ছিলো— তবুও তাদের সঙ্কলন কাব্য গ্রন্থে উদ্ধৃত শ্লোকগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে জনগণের জীবন, চিন্তাধারা, দুঃখ ও আনন্দ। এই মন্তব্যটি গোবর্ধানাচার্যের আর্যাসপ্তশতীতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি সম্পর্কেও প্রযোজ্য—যদিও আর্যাসপ্তশতী একটি শৃঙ্গার কাব্য।

আলোচ্য প্রকীর্ণ শ্লোক সঙ্কলনগুলিতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি বিবিধ প্রকৃতির। এই শ্লোকগুলির মধ্যে দেব প্রশস্তিমূলক শ্লোক যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে বিভিন্ন ঋতু, ফুল, ফল, বৃক্ষ ও স্থানের বর্ণনামূলক শ্লোক। নর-নারীর সম্পর্ক ও তাদের প্রেম ও প্রণয়ের উপর লিখিত শ্লোকগুলিকেও সঙ্কলনগুলিতে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এই শ্লোকগুলির মধ্যে বহু শ্লোকে প্রকাশিত হয়েছে প্রেমিক প্রেমিকার মানসিক অবস্থা ও অনুভূতি। এ ধরনের একটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে— যে শ্লোকে প্রতিফলিত হয়েছে একজন ক্রুদ্ধা স্ত্রীর হতাশাময় অনুভূতি, তিক্ততা, প্রচ্ছন্ন ব্যাঙ্গ এবং চরম নৈরাশ্য— কারণ সে জানতে পেয়েছে তার স্বামীর ছলনা ও অবিশ্বস্ততা : [৩]

আমার পদতলের নীচে আনত হয়োনা, এই অনুরোধ করছি তোমাকে,
কাবণ এটা নিশ্চিত যে স্বামীগণ নিজেরাই নিজেদের প্রভু,
কিছু সময়ের জন্য তুমি অন্যত্র আনন্দ গ্রহণ করেছো,
এতে তোমার অপরাধ কোথায়?
আমিই পাপী, কারণ তোমার অনুপস্থিতিতেও আমি জীবন ধারণ করেছি,
কারণ, একথা বলা হয়ে থাকে যে স্ত্রীদের জীবন
তাদের স্বামীর জীবনের মধ্যেই নিহিত!

পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বাস করছে, এমন আর একজন স্ত্রীর দুঃখ ও হতাশা এক অজ্ঞাতনামা কবির শ্লোকেও প্রতিফলিত হয়েছে :[৪]

পিতার ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য যে
সম্পর্কে বন্ধনে দুজন আবদ্ধ হয়েছে,
এবং যে সম্পর্কে বন্ধুগণ অংশগ্রহণ করে;
যেখানে পরিহাস ও রঙ্গ সইতে হয় মার্জিত রুচির কারণে
এবং সেবা গ্রহণ করা হয় ভয়ে;
যেখানে নম্রতার জন্য সংযত থাকতে হয় এবং শপথ বাক্য উচ্চারণের কারণে বিশ্বাসী হতে হয়—
তুমি এ সম্পর্ককে প্রেম বলো? এ সম্পর্ককে বলা উচিৎ শিষ্টতা
ও অভ্যাস। এখানে ক্রোধের কোন স্থান নেই।

ভাবদেবী বা ভাবাকদেবী নাম্নী এক নারী কবির কবিতা সুভাষিতরত্নকোষ ও সদুক্তিকর্ণামৃত-এ দুই সঙ্কলন গ্রন্থেই উদ্ধৃত হয়েছে। বিদ্যাকরের শ্লোক সঙ্কলন ও সদুক্তিকর্ণামৃতে উদ্ধৃত ভাবদেবীর একটি শ্লোকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে একজন স্ত্রীর দুঃখ যার জীবন নিয়ে সকল স্বপ্ন ও প্রত্যাশা বিশ্বাসহন্তা স্বামী চূর্ণ করে দিয়েছে :[৫]

সূচনাতে আমাদের দুজনের দেহ পূর্ণ একত্বে আবদ্ধ ছিল
কিন্তু তারপর দুটি ভাগে পরিণত হয়, তুমি প্রেমিকরূপে
এবং আমি, দুঃখিনী আমি, ভালোবাসা পেয়ে।
এখন তুমি স্বামী, আমি স্ত্রী,
এই জীবন ছাড়া কি আর আছে,
যে জীবন ভেঙে তিক্ত ফল থেকে কিছু পাওয়া অতি কঠিন
কারণ তুমি বিশ্বাস ভঙ্গ করেছো।

প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজ ধর্মীয় বিধান এবং সামাজিক অনুশাসন দ্বারা বিদ্যমান পিতৃতন্ত্রকে অনমনীয় ও সুকঠিন ব্যবস্থায় পরিণত করেছিলো। সেই প্রেক্ষাপটের উপরে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি দাম্পত্য জীবনে নর-নারীর সম্পর্কের বিষয়ে শুধু কবিদের ভাবপ্রবণ অনুভূতিরই প্রকাশ নয়। এই সব কবিতায় উৎকীর্ণ চিত্রগুলোকে আমরা প্রাচীন বাংলায় নারী সমাজের সামাজিক অবস্থা ও মর্যাদার প্রতিফলন রূপেও ধরে নিতে পারি। শৈশব উত্তীর্ণ না হতেই একটি কন্যা শিশুকে বিবাহ দেয়া হতো। বিবাহের পর তার সারা জীবন অতিবাহিত হতো স্বামী গৃহে। মনু এবং তার ভাষ্যকার কুল্লুকের বিধানমালাই একটি বাঙ্গালী নারীর জীবন নিয়ন্ত্রিত করতো। মনুর বিধানে বলা হয়েছে : যে স্ত্রী তার চিন্তা, বাক্য ও কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে তারে প্রভুর প্রতি কর্তব্য পালনে কোনো অবমাননা করে না মৃত্যুর পর তিনি স্বামীর সাথে স্বর্গে বাস করেন এবং ইহলোকে পূণ্যবান ব্যক্তিগণ তাকে বিশ্বস্ত স্ত্রী বা সাধ্বী বলেন।[৬] কুল্লুকের অভিমতে নারীর এই পতি সেবাই তার মুক্তি লাভের উপায় এবং এর মাধ্যমেই শুধু নারী স্বর্গে যেতে পারেন।[৭] স্বামীই স্ত্রীগণের গুরু ও প্রভু—এই অনুশাসনটি উল্লেখিত হয়েছে গোবর্ধনাচার্যের আর্যাসপ্তশতী সঙ্কলন কাব্যে।[৮]

প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজে স্ত্রীকে বাস করতে হতো যৌথ পরিবারে এবং তাকে সর্বদাই স্বামীর পিতামাতার আজ্ঞানুবর্তিনী থাকতে হতো। তাকে ভৃত্যদের প্রতি যত্নশীল এবং বান্ধবদের আন্তরিকতার সাথে পরিচর্যা করতে হতো। স্ত্রীরূপে একজন নারীর দায়িত্ব ছিলো বহুবিধ এবং তার সকল কর্ম সে পালন করবে স্বামীর ইচ্ছা ও অভিমত অনুসরণ করে— এটাই ছিল সামাজিক অনুশাসন। একজন নারীর কখনোই স্বাধীনভাবে কিছু করার ক্ষমতা ছিলো না। পতির প্রতি তার বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য হবে সকল প্রশ্নের উর্ধ্বে— এটাই ছিলো প্রত্যাশিত। কবি উমাপতিধরের অভিমতে একজন বিশ্বস্ত স্ত্রী তার স্বামীর প্রতি নিজের বিত্তশালী ও গুণবান পিতার চেয়েও অধিক যত্নশীল। এমনকি নিজ পুত্রের চেয়েও স্বামীর প্রতি সে অধিক মনোযোগী।[৯] অপর একজন বাঙ্গালী কবি ক্ষেমিশ্বর আদর্শ কুলস্ত্রী বা মর্যাদাবান পরিবারের নারী সম্পর্কে বলেছেন,[১০]

তার অবগুণ্ঠিত শির নম্রতায় আনত,
তার গতি মন্থর, দৃষ্টি চরণের দিকে আবদ্ধ,
তার কথা নিয়ন্ত্রিত, কোমল ও সুমিষ্ট—
যেন এই সকল আচরণের দ্বারা এই মহিলা তার কুল মর্যাদা সরবে ঘোষণা করছেন।

একক ব্যক্তি রূপে প্রাচীন যুগে বাঙালী নারীর কোনো স্বাধীন স্বত্ত্বা সমাজে স্বীকৃত ছিলো না

বললেই চলে। মনুর বিধান অনুযায়ী সমাজ প্রত্যাশা করতো নারী তার জীবনের সকল পর্যায়েই একজন পুরুষ অভিভাবকের অধীনে থাকবে।[১১] এছাড়া বহুবিবাহ প্রথা নারীর জীবন অনেক সময় অসহনীয় করে তুলতো। রাজ পরিবারে, ব্রাহ্মণ বর্ণ ও অভিজাত শ্রেণীর পুরুষগণের প্রায়ই একাধিক স্ত্রী ছিলো। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অনুশাসন ছিলো এই যে এ ধরনের ক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠা স্ত্রী নবীনা স্ত্রীকে গ্রহণ করবে এবং তাকে কনিষ্ঠা ভগ্নীর মতো ভালোবাসবে। কিন্তু মানব প্রকৃতির স্বাভাবিক প্রবণতার কারণেই জ্যেষ্ঠা স্ত্রী প্রায়ই তার নবীন স্বপত্নীর প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হতো। স্বপত্নীদের মধ্যে এই স্বাভাবিক বিদ্বেষ আর্যাসপ্তশতীর একটি শ্লোকে ব্যক্ত হয়েছে :[১২]

একজন স্বপত্নী অপর স্বপত্নীর উন্নতিতে বাধা দেয়।
যখনি সে তার সম্মুখীন হয় বিদ্বেষে তার
আখি দু'টি কুঞ্চিত হয়।

পরিবারে নবীনা স্বপত্নীর আগমন জ্যেষ্ঠা পত্নীকে ভীত করে— কারণ তার নিরাপত্তাহীনতা বোধ। কিন্তু তার সখী তাকে পুনরায় আত্মবিশ্বাসী করে তুলতে সচেষ্ট হয়ে তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় তার জীবনে ভাগ্য যে সব আশীর্বাদ বয়ে এনেছে সেই সৌভাগ্যগুলি;[১৩]

কোলে তোমার পুত্র শিশু, চরণে
তোমার সেবা দাসী, তোমার স্বামী তোমার
পৃষ্ঠরক্ষক। সুতরাং গৃহিনী। তোমার
সকল অভীষ্ট লাভের জন্য আর কি বাধা রয়েছে?

যে জ্যেষ্ঠা স্ত্রী পুত্র সন্তানের মাতা স্বপত্নী নবীনা হলেও তার আত্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ণ থাকতো এবং নিজেকে সে সৌভাগ্যবতীই ভাবতো। তার বিশ্বাসের ভিত্তি ছিলো কুল্লুকের ন্যায় ধর্মশাস্ত্রকারগণের পিতৃতান্ত্রিক অনুশাসনাবলী। কুল্লুকের অভিমতে স্ত্রী একজন স্বামীর নিজের ও তার পূর্বপুরুষদের জন্য আশীর্বাদ— কারণ সে সেই সন্তান উৎপাদন করে যে তাকে তার নিকট পূর্বপুরুষদের প্রাপ্য ঋণ হতে মুক্ত করে এবং সেই সাথে মুক্তি দেয় পূর্ব পুরুষদের।[১৪] মনুকে অনুসরণ করে কুল্লুক আরো দু'টি বিধান দিয়েছেন : যে স্ত্রী পুত্র সন্তান জন্ম দিতে ব্যর্থ হয়েছে তাকে বাদ দিয়ে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা যাবে এবং অপুত্রক নারীর প্রদত্ত খাদ্য ব্রাহ্মণদের গ্রহণযোগ্য হবে না।[১৫]

যদিও সমাজের প্রত্যাশা ছিলো পুরুষের বহুবিবাহ প্রথা স্বাভাবিক নিয়ম হিসাবে মেনে নেওয়া হবে এবং তাই এই প্রথা পারিবারিক জীবনে কোনো দ্বন্দ্ব বা সংঘাতের কারণ হবে না তবুও যে পরিবারে একাধিক স্ত্রী রয়েছে সে পরিবারে ঈর্ষা, সংঘাত এবং সহিংসতা কখনো কখনো দেখা যেতো। সুভাষিত-রত্নকোষ কাব্যে উদ্ধৃত একজন অজ্ঞাতনামা কবির শ্লোকে একাধিক স্ত্রী থাকার পরিণামে একটি বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত পরিবারের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে : [১৬]

মুষ্টি দিয়ে আমি তাকে প্রহার করেছি এবং তার বক্ষে আমি আঁচড় দিয়েছি;
তার দেহের দুই পাশে আমি আঘাত হেনেছি এবং কেশ টেনে উৎপাদন করেছি
এবং তার অধর আমি কামড়িয়েছি যতক্ষণ না পর্যন্ত আঘাতের বেদনা সে
জোরে নিশ্বাস গ্রহণ করেছে।
তোমার স্বপত্নীর সাথে এ সকল আচরণ করেছি তোমারই জন্যে
এবং তোমার অনুপস্থিতিতে। হে আমার সরলা স্ত্রী
এখন আমাকে তুমি আদেশ কর আমি আর কি করতে পারি।

প্রাচীন বাংলায় সমাজের অনুশাসন ও প্রত্যাশা ছিলো নারী পবিত্র থাকবে এবং স্বামীর প্রতি তার

বিশ্বস্ততা হবে প্রশ্নহীন। কিন্তু পুরুষকে সেই সমাজই দিয়েছিলো বহুবিবাহের স্বাধীনতা। শুধু তাই নয়- সঙ্গীত, নৃত্য ও অন্যান্য কলা বিদ্যা নিপুণা বারাঙ্গনা গৃহে আনন্দের জন্য পুরুষদের গমনও সমাজে নিন্দনীয় ছিলো না। ধর্মশাস্ত্রকারগণ যদিও পুরুষদের বারাঙ্গনা ভবনে যাওয়া নিন্দা করেছেন সমাজ এ প্রথা স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করতো এবং এটা দোষনীয় অপরাধ বলে মনে করা হতো না। এ ধরনের প্রমোদবালা মন্দিরে, রাজসভায় এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে দেখা যেতো। এই প্রমোদবালাদেরকে আখ্যায়িত করা হতো বারবিলাসিনী, বারবধূ, বারাঙ্গনা, বেশ্যা, দেবদাসী। তারা কখনো কখনো প্রমোদ ভবন চালু করে সেখানে যুবকদের অর্থের বিনিময়ে চিত্তবিনোদন করতো। মদনের শরবিদ্ধ চঞ্চল তরুণদের এ ধরনের প্রমোদ ভবনে বারবধূদের নৃত্য উপভোগ এবং হাততালি পূর্বক আনন্দ প্রকাশের বর্ণনা আর্যাসপ্তশতী কাব্যে রয়েছে।[১৭]

বাংলাদেশে সঙ্কলিত সঙ্কলন সাহিত্যকর্মগুলিতে প্রাচীন বাঙ্গালী নারীর জীবনের বহু খণ্ড চিত্র ছড়িয়ে রয়েছে। এই চিত্রগুলি তাদের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমাদের অমূল্য তথ্য প্রদান করে। এই সকল খণ্ডচিত্রাবলী আহরণ ও গ্রন্থনা করে প্রাচীন বাংলার নারী সমাজের ইতিহাসের একটি রূপরেখার ভিত্তি ঐতিহাসিকগণ প্রণয়ন করতে পারেন।

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

An Anthology of Sanskrit Court Poetry, Vidyākara's Subhāsitaratnakosa. Translated by Daniel H. H. Ingalls, H.O.S, Vol.44, Cambridge, Massachusetts : 1965.

চক্রবর্তী, শ্রী জ্যাহ্নবী কুমার, আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, কলিকাতা : ১৩৭৮

Hussain Shahanara, *The Social Life of Women in Early Medieval Bengal.* Dhaka : 1985.

Manusamhitā. Edited with a Bengali translation by Bharatchandra Śiromani. Calcutta : Samvat, 1923; Transalated in English by G. Buhler, *The Laws of Manu, Oxofrd : 1886.*

Ray, Nihar Ranjan, *Bāngālīr Ithāsa, Ādi Prava.* Calcutta : 1400 (Bangāvda).

Sadukti-Karnāmrita of Srīdharadāsa. Ed. by Sures Chandra Banerji, Calcutta: 1965.

গ্রন্থপঞ্জি

১. Sadukti-Karṇāmṛta of Śrīdharadāsa, 1965 : I

২. An Anthology of Sanskrit Court Poetry, Vidyākrās Subhāsitaratnakosa. Translated by Daniel H. H. Ingalls, 1965:3 (এই প্রবন্ধটিতে উদ্ধৃত ও উল্লেখিত সকল শ্লোকই Ingalls এর উপরোক্ত গ্রন্থ হতে নেয়া হয়েছে। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলির পাদটিকায় Ingalls এর অনুবাদ গ্রন্থটি সুভাষিতরত্নকোষ নামে উল্লেখ করা হয়েছে)।

৩. সুভাষিতরত্ন কোষ, প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৬৪৩, পৃঃ ২১৯; সদুক্তিকর্ণামৃত, প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৭০৬, পৃঃ ১৮৯।

৪. সুভাষিতরত্নকোষ, শ্লোক নং ৬৪৪, পৃঃ ২১৫।

৫. সুভাষিতরত্নকোষ, প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৬৪৪, পৃঃ ২১৯, সদুক্তিকর্ণমৃত, প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ৭০৭, পৃঃ ১৮৯।

৬. The Laws of Manu. Trans by Buhler, 1866 ix, 29, p 232

৭. কুল্লুর মনুসংহিতার ভাষ্য, ৯, ৮৬। মনুসংহিতা, ভবতচন্দ্র শিরোমনি সম্পাদিত ও বাংলায় অনুদিত · সম্বত ১৯২৩, পৃ ঃ ৪৪২।

৮ শ্রী জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী, আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ ১৩৭৮, শ্লোক নং ১৭০, পৃঃ ১৬৯।

৯. সদুক্তিকর্ণামৃত, শ্লোক নং ৫২৭, পৃঃ ১৪২।

১০. ঐ, শ্লোক নং ৫২৯।

১১. The Laws of Manu, op cit., V 148, 149, ix 3, pp 195, 398

১২ আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, প্রাগুক্ত, শ্লোক নং ১০৭, পৃ ১৬৯।

১৩ ঐ, শ্লোক নং ৬২, পৃঃ ১৬০।

১৪. মনুসংহিতা, প্রাগুক্ত, ৯, ২৮, পৃ ৪৪০।

১৫ ঐ, ৯, ৮১, পৃঃ ৪৪০, ৪, ২১৩, পৃঃ ২৪৮।

১৬. সুভাষিত রত্ন কোষ শ্লোক নং ৬৭৭, পৃঃ ২২৫ , সদুক্তিকর্ণামৃত, শ্লোক নং ৮৮৭, পৃঃ ২২৮।

১৭. আর্যাসপ্তশতী ও গৌড়বঙ্গ, শ্লোক নং ১৫৬, পৃঃ ১৮১।

উপনিষদে ইহজাগতিক বার্তা ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

সনৎকুমার সাহা

এতে সম্ভবত দ্বিমত নেই, প্রাচীন ভারতীয় মনীষার বিকাশ উপনিষদে তার শিখর স্পর্শ করেছে। অনেকে একে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির মূল কাণ্ড বলে মনে করেন[১], এবং সেই অনুযায়ী একটা দৃষ্টিভঙ্গি তাঁরা গড়ে তোলেন। কিন্তু এতে উপনিষদের ব্যাপ্তি সীমিত হয়। অভিপ্রায় যদি বিশেষ প্রেক্ষাপটে মহৎ বলেও বিবেচিত হয়, তবু তা উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিজস্ব মোহজাল রচনা করে। বিপরীত দিক থেকে উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞানকেই তা খণ্ডন করে। তার নির্দেশনায় কোথাও কাউকে হিন্দু বলে আহ্বান করা নেই। বাস্তব সমাজের সুশৃঙ্খল বিন্যাসের যে ছক সে রচনা করে, তা অভিজ্ঞতা ও কাণ্ডজ্ঞান প্রসূত। সেখানে ধর্ম সম্প্রদায় কোনো বিষয় নয়। জীবন ও জগতের গতিময় বিস্তারই চিন্তার পটভূমি। তারই অনুসরণে উপনিষদ বার বার নবায়িত হয়। মূল কীর্তিরাশির স্থায়ী মূল্য তা হয়ত পায় না। কিন্তু তা প্রতিহত বা নিষিদ্ধও হয় না। জনশ্রুতি, মোঘল রাজপুত্র দারা শুকোহ্-র তত্ত্বাবধানে রচিত হয়েছিল শেষ উপনিষদ। হিন্দু ধর্মাভিমানীরা তাকে অবজ্ঞা করলেও তার ঐতিহাসিক মূল্য উপেক্ষা করা যায় না। এও প্রণিধানযোগ্য, দারা শুকোহ্-ই ফরাসি ভাষায় উপনিষদ-অনুবাদের উদ্যোগ নেন। এই কাজ সম্পন্ন হয় ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে। পরে এই অনুবাদ অবলম্বনেই বহির্বিশ্বে উপনিষদের প্রচারের সূত্রপাত[২]। বাইরের জগতে তখন ভারতীয় ও হিন্দু সমার্থক। সেই সূত্রে উপনিষদে হিন্দু অভিধা সেঁটে দেওয়া তাদের অবদান। কোনোক্রমেই তা অন্তর্জাত নয়। তবে তারই অভিমতে, এবং ঔপনিবেশিক বাস্তবতার প্রতিক্রিয়ায় ভারতে হিন্দু সচেতনতার জাগরণ। তা প্রবলভাবে বাস্তব, যদিও ভয়াবহ রকম গোঁজামিলে ভরা।

উপনিষদের ব্রহ্ম-ভাবনায় স্থান ও কালের মাত্রা অবলুপ্ত। আসলে তাদের অতিক্রম করেই ব্রহ্মজ্ঞানের পূর্ণতা। ওই ব্রহ্ম একাত্ম হওয়াতে যেখানে পরমার্থিক মোক্ষ, সেখানে পার্থিব ভাবনায় স্থান-কালের হিসাব অকিঞ্চিৎকর, এমনকি অবান্তর হয়ে পড়াও স্বাভাবিক মনে হয়। তত্ত্বানুসন্ধানীর কাছে এই স্থান-কাল নিরপেক্ষ পূর্ণসত্তার আবেদন প্রবল। অনুশীলনের ও মননের এক কঠিন অভিযাত্রাও বটে। কিন্তু এই অনুধ্যান পরিপার্শ্বের আপেক্ষিকতা থেকে চোখ সরিয়ে নেয়। তাতে বস্তুভাবনা ক্ষুণ্ণ হয়। ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে উপনিষদের যথার্থ স্থাপনা যথোচিত গুরুত্ব পায় না। তাকে বাদ দিলে বিষয়-বিষয়ী-ঐকৈকান্তিকতার যৌক্তিক নির্মাণ যে বিপর্যস্ত হয়, শুদ্ধাশ্রয়ী ভাবোন্মাদনার প্রচণ্ড জোয়ারে আমরা প্রায়শই তা বিস্মৃত হই। লোকবিশ্বাস যাইহোক, এবং বিদগ্ধ পণ্ডিতকুল নাকে মুখে ছিপি এঁটে তাকে যতই সমর্থন করুন, গোটা বৈদিক সাহিত্য কোনো এক সময়ে, অথবা সময়ের ওপারে, আকাশ থেকে পড়েছে[৩], এটা ভাবা বাতুলতা ছাড়া আর কিছু নয়। তা ঈশ্বর প্রেরিত বাণী হলে মানতে হয়, সেই ঈশ্বর সর্বজ্ঞ নন, তিনি প্রায়শ নিজেকে খণ্ডন করেন, এমন কি ভ্রান্তও প্রমাণিত হন। সমাজ সভ্যতার ঊষালগ্নের বস্তুগত অবস্থার অনাবিল অভিমত সে সময়ের মানুষী চিন্তায় যে সাড়া জাগায়, তারই ওপর ভিত্তি করে ধ্যান গম্ভীর মন্ত্রগাঢ় বাণীর উদ্গিরণ ওই সাহিত্য। স্থান ও কাল চিহ্নিত

বস্তুজ্ঞানের সীমা তা অতিক্রম করে না। সমাজ বাস্তবতার নির্ধারণ তাকে চালিত করে। অবশ্যই এসব মূল্যবান। বৈদিক সাহিত্যের মতো মহৎ কীর্তিকে তা ধারণও করে। কিন্তু তা বিস্মৃত হয়ে আবেগের আতিশয্যে বৈদিক ভাবনার ওপর অনাদ্যন্ত নিত্যতার ও অভ্রান্ততার ছাপ মেরে দিলে অযৌক্তিক গুরুভারে তাকে সজ্জিত করা হয়। প্রশ্নাতীত গৌরবে তাকে প্রতিষ্ঠিত করলেও ওই ভার বহনের ক্ষমতা তার আছে কিনা তা আমরা খুব একটা ভেবে দেখি না। এটা অবিচারও বটে।

সুনির্দিষ্টভাবে দিনক্ষণের হিসাব করা না গেলেও মোটামুটি ধারণা একটা করা যায় যে দেড় হাজার থেকে পাঁচশ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ, এইটি বৈদিক সাহিত্যের কাল। শ্রুতিনির্ভর বলে প্রাচীনত্বের সঠিক পরিমাপ মুশকিল, তবে সভ্যতা বিকাশের অন্যান্য তথ্য ও উপাদানের সঙ্গে মিলিয়ে এই অনুমান সংগত মনে হয়। উপনিষদ বৈদিক সাহিত্যের অন্তিম ভাগ—তাই বেদান্ত। বুদ্ধদেবের আবির্ভাব কালে সম্ভবত তা পূর্ণতা পায়। যে উপনিষদগুলো ওই পরিমণ্ডলে উচ্চারিত বলে স্বীকৃত, পূর্ণতা অর্থে তারাই কেবল বিবেচনায় আসে। উপনিষদ নামে অন্যান্য যে সব সংকলনের সন্ধান মেলে বিশেষজ্ঞরা তাদের হয় মেকি, নয়ত অর্বাচীন বলে খারিজ করে দেন। তবু যেটা দেখবার এবং তা সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের বেলাতেই সত্য, তা হলো, কোনো উপনিষদই বিশেষ কোনো ঋষির একক চিন্তার ফসল নয়, যদিও বিশেষ বিশেষ ঋষির প্রাধান্য কোথাও কোথাও প্রবল। মনে হয়, কোনো ঋষিকে ঘিরে চিন্তানুশীলনের পরিমণ্ডল একটা গড়ে ওঠে। পরে সেই পরিমণ্ডলে অথবা তার অনুসরণে একটা ভাবনা বলয় একটু একটু করে আকার পেয়ে যায়। আকার পুরো হতে কত সময় নিয়েছে তা আন্দাজ করা শক্ত। তবে বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন ভাবনা যে তাতে একত্রিত হয়, তা স্পষ্টই চোখে পড়ে। আপাত পরস্পর-বিরোধিতা তাই দুর্নিরীক্ষ্য নয়, যদিও কালোত্তীর্ণতার দোহাই দিয়ে কালাসংগতিকেও ব্যাখ্যা করার ও মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা এখনও যথেষ্ট প্রবল।

বিশিষ্ট বিজ্ঞজনদের অনেকের অভিমত, উপনিষদ আরণ্যক সাহিত্য। বৈদিক পরম্পরায় সংহিতা ও ব্রাহ্মণ পর্ব পেরিয়ে, এবং তাদের লক্ষণসমূহ শরীরে ধারণ করেই আরণ্যকের আবির্ভাব। সংহিতায় পাই ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র সংকলন। ব্রাহ্মণ গদ্য-নির্ভর। বিধি-নিষেধ, যাগ-যজ্ঞ, উপাসনা রীতি, ব্রহ্মবিদ্যা, আচার-অনুষ্ঠান, এসব তার চর্চার বিষয়। আরণ্যকে পাই উভয় ধারার সমন্বয়। তবে ব্রাহ্মণভাগের আচার-অনুষ্ঠান-যাগ-যজ্ঞ ইত্যাদি স্থূলক্রিয়া এখানে রূপান্তরিত হয় সূক্ষ্ম মননক্রিয়ায়। বিশ্ববাস্তবতার প্রতিবিম্ব রচিত হয় চৈতন্যে। এবং অনেক ক্ষেত্রে আচার সর্বস্ব যাগ-যজ্ঞ থেকে তা মুখ সরিয়ে নেয়। বলা হয়ে থাকে অরণ্যে রচিত ও পঠিত হয় বলে এ আরণ্যক। তাঁর সর্বোত্তম নিদর্শন উপনিষদ। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, 'সাংসারিক জীবনের ধন, মান, প্রতিপত্তির প্রতি বীতস্পৃহ এবং সম্পূর্ণ উদাসীন এক শ্রেণীর লোকই জীবনের প্রকৃত গূঢ় অর্থ নির্ধারণে উৎসুক হইয়া সংসার ত্যাগ পূর্বক এ বিষয়ে অরণ্যে বসিয়া গভীর ধ্যান-ধারণা করিতেন, তাঁহাদের চিন্তা প্রসূত উক্তিগুলিই উপনিষদে স্থান পাইয়াছে।'[৪]

উপনিষদের জগতের একটি ছবি এভাবে আমাদের মনে গাঁথা হয়ে যায়। যেহেতু তার স্থান আরণ্যক পর্বে, এবং প্রাচীন ভারতের তপোবন-সভ্যতার ঐশ্বর্যে আমাদের মুগ্ধতা অনিঃশেষ, তাই দুই-এ মিলে বৈরাগ্য সাধনার এই রঙিন কল্পনাকে শ্রেয়োচেতনায় উত্তীর্ণ করে আমরা তাকে সর্বতোভাবে সত্য বলে মেনে নিই। আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় চিন্তানায়কেরাও বিষয়টিকে এইভাবে দেখেন। রবীন্দ্রনাথের 'শান্তিনিকেতন' প্রবন্ধমালায় এর পরিচয় মেলে। পরিচয় মেলে বিবেকানন্দের বহুবিধ রচনায়। মনীষীবাণী শিরোধার্য করে আমরাও তা বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিই।

এতে যে বাস্তবতার রেশ নেই, এমন কথা হয়ত বলা যায় না। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে ছবিতে অন্য রঙও ফুটে ওঠে। তা আরো নানা প্রশ্নের জন্ম দেয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী সংবাদে

মৈত্রেয়ীর বিখ্যাত প্রশ্ন, 'যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্'[৫], আমাদের মনের আকাশে ব্যাপ্ত হয়ে থাকে। আমরা একেই আরণ্যক জীবনচর্চার সারাৎসার বলে মানি। নিত্য দিনের আনুষঙ্গিক বিষয়-আশয় ক্রিয়া-কর্ম সবই গুরুত্ব হারায়। অংশে সমগ্রের ভ্রম জাঁকিয়ে বসে। আমরা এটা দেখেও দেখি না, তুখোর ব্রহ্মজ্ঞানী বলে যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতিষ্ঠা তার আগে থেকেই। কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ীকে নিয়ে আরণ্যক পরিমণ্ডলেও তাঁর জমজমাট সংসার। মৈত্রেয়ীর কাছে প্রব্রজ্যা গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করে যখন তিনি দুই স্ত্রীর ভেতর তাঁর সব বিষয় সম্পত্তি ভাগ করে দিয়ে যাবার কথা তোলেন, তখনই বিষয় বিমুখ মৈত্রেয়ীর ওই স্মরণীয় প্রতিক্রিয়া। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যের ধন-সম্পদ ও তাঁর আরণ্যক জীবনেরই সঞ্চয়। তার উৎসের কিঞ্চিৎ ইঙ্গিতও আমরা অন্যত্র পাই। বৃহদারণ্যকেই তৃতীয় অধ্যায়ের শুরুতে দেখি, জনক রাজার যজ্ঞ সভায় নিজেকে বেদজ্ঞ শ্রেষ্ঠ দাবি করে যাজ্ঞবল্ক্য বিজয়ীর পুরস্কার সোনা-বাঁধানো শিং সমেত এক হাজার গরু নিজের গোশালার দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবার নির্দেশ দেন[৬]। এতে অন্যান্য ব্রাহ্মণের ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়। অশ্বল নামে জনকরাজার এক হোতা এগিয়ে এসে প্রশ্ন করেন, 'আপনিই বুঝি আমাদের ভেতর ব্রহ্মিষ্ঠ?' এই প্রশ্ন করা মানে যাজ্ঞবল্ক্যের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করে তাঁকে প্রতিযোগিতায় আহ্বান করা। যাজ্ঞবল্ক্য উত্তরে বলেন, 'ব্রহ্মিষ্ঠকে নমস্কার। ইদানীং আমরা কেবল গোধনকামী।'[৭] তাঁর বিনয় ও বিদ্রূপ, দুই-ই এতে ফুটে ওঠে। এরপরে ব্রহ্মবিদ্যার গভীর আলোচনা আমাদের দৃষ্টি অন্যত্র সরিয়ে নেয়। 'আমরা সবাই গোধনকামী' এই কথার পেছনের সমাজ বাস্তবতার দিকে আর ফিরে তাকাই না। একই রকম অন্যত্র দেখি, ঋষি গৌতম বলছেন, 'আপনি জানেন, আমার প্রচুর স্বর্ণ, গরু, অশ্ব, দাসী, পরিবার ও বস্ত্রাদি আছে—'[৮] আরুণি গৌতমও অরণ্যবাসী। তা হলে অরণ্যবাসী হবার সঙ্গে বিষয়বিত্তের অধিকারী হবার, পরিবার পরিজনের সঙ্গসুখ ভোগ করার বা সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়'পার কোনো বিরোধ থাকে না। মুনি-ঋষিদের বিষয়-বৈরাগ্যের যে ছবি আমরা আঁকি, তা অধিকাংশই আমাদের ইচ্ছার ও কল্পনার প্রলম্বিত বিস্তার। প্রাচীন শাস্ত্রে তাব সমর্থন অপ্রতুল। তাই বলে আরণ্যক সত্যান্বেষণ ও জ্ঞানচর্চা মিথ্যা নয়। তাদের বিপুল বৈভব আমাদেব চেতনাকে সমৃদ্ধই করে। আমরা আলোকিত হই। সভ্যতা ও সংস্কৃতির শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে বিশ্ববাস্তবতার মুখোমুখি হবার আত্মবিশ্বাস ও সাহস সঞ্চয় করি। কিন্তু তাকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখি না। তাতে দৃশ্যলোক সীমিত ও ভাবনা খণ্ডিত হয়। যদিও একেই অনেকে বাহুল্য বর্জন করে সারসত্যে মনোনিবেশের নিদর্শন বলে মনে করি। মনগড়া জল্পনাকে তা প্রশ্রয় দেয়। উদ্দেশ্য নিরাসক্ত থাকে না। কাঙ্ক্ষিত বা প্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত উপাওচয়নে হানা দেয়। বিভ্রান্তি বাড়ে এবং এই ভ্রান্তিকেই বিশ্বাসের নিশ্চিত আশ্রয় করে আমরা আমাদের ঐতিহ্যের স্বরূপ অন্বেষণ করি।

দূর অতীত অবশ্যই অস্পষ্ট। তবু ইতিহাসের সিঁড়ি ভেঙে যতদুর যাওয়া যায়, সেখান থেকে সমাজ-সভ্যতা গড়ে ওঠার প্রক্রিয়ার দিকে নির্মোহ দৃষ্টিতে তাকালে জীবনচর্চার যে বাস্তব ছবি ভেসে ওঠে তা মনে হয়, এই অনুমানকেই জোরদার করে যে সে সময় নগর গ্রাম ও অরণ্য আদৌ পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছিল না। অরণ্যকে ভেঙে ভেঙে যেমন গ্রাম ও গ্রাম থেকে নগর গড়ে ওঠে, তেমনি গ্রাম ও নগরের জীবনও অরণ্যে সম্প্রসারিত হয়। পাশাপাশি আরণ্যক ধ্যান-ধারণা লোকালয়ে ছড়ায়। তার প্রভাব অধিকতর প্রবল। সমাজ-মানুষের চেতনায় আজও তা ক্রিয়াশীল—যদিও অতীতের অবিকল পুনরাবৃত্তিতে নয়, বরং অনেক রূপান্তর এবং অনেক ভাবান্তর পেরিয়ে।

ভারত ভূখণ্ডে আর্য-সভ্যতার বিকাশ যখন সমতলীয় গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিস্তৃত হয়, তখন জীবন ধারণের জন্য কৃষিকাজের ওপর মানুষের নির্ভরতা বাড়ে। সমাজও অনেক স্থিতিশীল হয়ে উঠতে থাকে। তার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা দাবি করতে থাকে সর্বজনমান্য নিয়ম-কানুন ও বিধিনিষেধ। যেভাবেই

তারা গড়ে উঠুক না কেন, তাদের চালু রাখার দায় ও দায়িত্ব পড়ে রাজপুরুষদের ওপর। রাজ্য ও রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়। ছোটরাজা মহারাজা হবার, এবং মহারাজা সম্রাট হবার স্বপ্ন দেখেন। রাজা-প্রজার সম্পর্ক সেই অনুযায়ী বদলে যায়। মানুষে মানুষে পরস্পর-নির্ভরতার চেহারাও জটিলতর ও বিস্তৃততর হতে থাকে। একদিকে যেমন কাজের বিভিন্নতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সামাজিক স্তর বিন্যাস জাতিভেদ প্রথার আকার নেয় অন্যদিকে তেমনি রাজার এক্তিয়ারে ভূমিরাজস্ব ও কর ব্যবস্থা গৃহস্থ ও নাগরিক সম্প্রদায়কে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রাষ্ট্র কাঠামোর বাধ্য-বাধকতার ভেতর একটু একটু করে নিয়ে আসে। বিপুল বনাঞ্চল কিন্তু এর আওতায় পড়ে না। বন কেটে বসত গড়ায় ও কৃষিকাজে ক্রমবর্ধমান হারে মানুষ ঝুঁকে পড়ায়[৯] তার আয়তন হ্রাস পেতে থাকে ঠিকই, কিন্তু তবু তার প্রভাব মানুষের জীবন ভাবনা ও কর্মসাধনা থেকে উবে যায় না। গ্রাম ও নগরের সঙ্গে বনাঞ্চলের দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক, কখনো কখনো বা অবিশ্বাসের ও সংঘাতের গড়ে ওঠে। আরণ্যক জীবনে তার সব কিছুরই প্রতিফলন ঘটে। শুধু বৈরাগ্য সাধনার তাগিদ দিয়ে তাব পুরো ব্যাখ্যা মেলে না। এমনও হতে পারে নাগরিক জীবনে বিধি-নিষেধের বেড়াজালে অনেকে হাঁপিয়ে ওঠেন। যাগ-যজ্ঞ ও আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপের বাড়াবাড়ি কারো কারো কাছে হয়ত ক্লান্তিকর ঠেকে। এসব থেকে তাঁরা মুক্তি খোঁজেন—মনের এবং ব্যবহারিক জীবনেরও। বন সেখানে তাঁদের আশ্রয় দেয়। ইচ্ছা মত থাকা, ইচ্ছা মত চিন্তা করা—কেউ কোনো বাধা দেয় না। কর বা খাজনা আদায়ে রাজ কর্মচারীরাও ধাওয়া করে না। বিদ্যানুরাগী চিন্তাশীল মানুষদের তা বিশেষ করে টানে। নাগরিক কোলাহল থেকে তাঁরা দূরে থাকতে পারেন; জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অবাধ চিন্তায় মগ্ন থাকতে পারেন। সমাজমানুষও ওই চিন্তার বিষয় হয়ে ওঠে। মূলত সমাজমানুষই। নিরপেক্ষভাবে স্পষ্ট করে দেখার জন্যে যে দূরত্ব প্রয়োজন, বন সেই দূরত্ব রচনা করে। পুরাণ কাহিনীতে মুনি-ঋষিদের আশ্রমিক জীবনের যে চিত্র পাই, তা মনোরম। সংসার ধর্ম থেকে যে তা বিচ্যুত নয়, তার ইংগিত তো উপনিষদেই মেলে। সচ্ছলতা ও সহজ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিরাগ ওই জীবনাচরণে কোথাও ফুটে ওঠে না। তবে বনবাস যে সবটাই নিরুপদ্রব ছিল, এমন নয়। আদিম বনবাসীদের সঙ্গে বিরোধ কখনো কখনো তুঙ্গে উঠত। দস্যুদের আক্রমণও মাঝে মাঝে ঘটতো। অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে গেলে আশ্রমিক জনগোষ্ঠী যে আশপাশের কোনো শক্তিশালী রাজার হস্তক্ষেপ কামনা করতেন, তা অনুমান করা যায় পুরাণ সাহিত্যে বিভিন্ন জায়গায় তার উল্লেখ থেকে[১০]। সক্ষম হলে বনবাসীদের রক্ষা করা রাজার নৈতিক দায়িত্ব ছিল ঠিকই, কিন্তু রাজস্ব আদায়ে রাজার কর্তৃত্ব সাধারণত বনাঞ্চলে সম্প্রসারিত হতো না। জীবনের চতুরাশ্রমের বর্ণনায় বানপ্রস্থের কথা আমরা পড়ি। অবশ্য তা কখনোই সর্বজনীন আকার নেয়নি। তবু যাঁরা বানপ্রস্থে যেতেন, তাঁরা কীভাবে বাঁচতেন, এনিয়ে আমরা খুব একটা মাথা ঘামাই না। কুটির বানিয়ে বাস করা, খাবার জোগাড় করা, কাপড়-চোপড়-আসবাবপত্র প্রয়োজনমতো রাখা, আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা করা, এ সবই ব্যয় সাপেক্ষ। বনের ফলমূল হয়ত খাবার চাহিদা আংশিক মেটায়। সবটুকু নয়। অতএব বনবাসী হলেও জীবনের বস্তুগত অভাব দূর হয় না। তাকে সামলাতে কোনো না কোনোভাবে অর্থকরী ব্যবস্থার নিশ্চয়তা চাই। হয় তা আসে পেছনে ফেলে আসা পরিবার থেকে, নয়ত নিজেকেই কোনো আশ্রমিক ক্রিয়াকর্মে যুক্ত থেকে তার ব্যবস্থা করে নিতে হয়। আশ্রম স্বয়ং প্রাতিষ্ঠনিক রূপ পায়। বৈরাগ্য ফেরি করলেও বৈরাগ্য দিয়ে তাকে চালনা করা যায় না। এবং ফেরি করতে হলেও তাকে যেতে হয় লোকালয়েই। বন সেই লোকালয়ের সঙ্গে দূরত্ব বাড়ায় না; বরং নানা দিক থেকে দূরত্ব ঘোচায়। আরণ্যক-সাহিত্য হিসাবে উপনিষদকে যদি এই পটভূমিতে দেখি, তবে তার সঙ্গে সংসার ত্যাগ করে বিবাগী হবার কোনো সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা যায় না।

বলা হয়েছে, 'উপনিষৎ শব্দের অর্থ ব্রহ্মবিদ্যা।...ঐকাত্ম্য, নিশ্চয়ের দ্বারা যে বিদ্যা সত্বর সহেতুক সংসার উন্মূলিত করে। অথবা যাহা সত্বর নিশ্চিতরূপে আত্মসমীপে লইয়া যায়। কিংবা যে বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণপূর্বক তন্নিষ্ঠ হইয়া নিঃসংশয়ে উহার অনুশীলন করিলে উক্ত বিদ্যা অবিদ্যাদি সংসারবন্ধনকে শিথিল বা নিঃশেষে বিনাশ করে—সেই বিদ্যা।'[১১] উপনিষদেও কোথাও কোথাও এই অভীষ্টের সরাসরি উল্লেখ আছে। তার অভিযান পরা বিদ্যায়। যার ক্ষয় নাই, সেই অক্ষয়কে, বা ব্রহ্মকে যা প্রতিভাত করে, তাই পরা বিদ্যা। ভূমি থেকে দৃষ্টি চলে যায় ভূমায়। পরিপার্শ্ব তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়।

উপনিষদে বারবার এই জায়গায় জোর পড়লেও তারও কিন্তু একটা বস্তুগত প্রেক্ষাপট আছে। সমাজের ভেতরেই নানা প্রশ্ন জন্ম নেয়। উদ্বৃত্ত ব্যবহারে যাগ-যজ্ঞের অপচয়, এবং তাকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ চক্রের কায়েমি স্বার্থের উত্থান সমাজে চিন্তায় ও কর্মে গতিশীলতা রুদ্ধ করে। আচার-অনুষ্ঠানের অনর্থক বাহুল্য সংবেদনশীল মনের ওপর নির্যাতনের বোঝা চাপায়। সাধারণ মানুষের জীবনও সংস্কারের বেড়াজালে বাঁধা পড়তে থাকে। সার্বিক কল্যাণ বিপর্যস্ত হয়। কালের মনীষা এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি খোঁজে। আচার অনুষ্ঠানের বাধা পেরোতে সরাসরি তাই দৃষ্টি পড়ে পরম ব্রহ্মে। কিন্তু কার্যত আঘাত পড়ে যাগ-যজ্ঞ-পশুবলি ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত জেঁকে বসা যে কায়েমি স্বার্থ, তার ওপর। ব্রহ্মে লীন হবার কথা বলতে বলতেও উপনিষদ প্রত্যক্ষের এই বাস্তবতায় তার অবস্থান অস্পষ্ট রাখে না। বৃহদারণ্যকে উপনিষদের এই বক্তব্যকে কোনোক্রমেই নির্দ্বান্দ্বিক বলা যায় না : '...যিনি "আমি ভিন্ন এবং আমার উপাস্য ইনি ভিন্ন", এই রকম মনে করে আপনা থেকে পৃথক দেবতার উপাসনা করেন। তিনি অবিদ্যাবান; দেবগণের নিকট তিনি যেন গৃহপালিত পশু। ঠিক যেমন বহু পশু ব্যক্তি বিশেষের সেবা করে, তেমনি প্রতি ব্যক্তি দেবগণের সেবা করে। যেখানে একটা পশু খোয়া গেলেই মানুষ দুঃখে কাতর হয়, সেখানে বহুপশু চুরি গেলে সে যে আরো বেশি কাতব হবে, তা বলাই বাহুল্য। দেবগণও অনুরূপ চায় না, মানুষ তত্ত্বজ্ঞানী হোক।'[১২] বুঝতে কষ্ট হয় না, যজ্ঞের দেবতাদের প্রতিই এখানে ইঙ্গিত। এবং দেবতাদের দুঃখ বাস্তবে তাদের ঋত্বিক ব্রাহ্মণ পুরোহিতদেরই।

প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ আরো ধারাল ছান্দোগ্য উপনিষদে। আমরা পড়ি, 'যজ্ঞে যেমন বহিষ্পবমান স্তোত্র উচ্চারণ করে স্তবকারীরা পরস্পর সংলগ্ন হয়ে পরিক্রমা করেন, সেইরকম ওই শ্বেত কুকুরকে ঘিরে অন্য কুকুরেরা পরস্পরের লেজ ধরে প্রদক্ষিণ করেছিল। তারপর উপবিষ্ট হয়ে হুংকার দিয়ে বলেছিল, ওম্ ভোজন করবো। ওম্ পান করবো। ওম্ দেব বরুণ, প্রজাপতি, সবিতা, এই স্থানে অন্ন আহরণ করুন।'[১৩] বিষয়টির সূত্রপাত শ্বেত কুকুরের কাছে অন্য কুকুরদের আবেদনে, 'মহাশয়, গান গেয়ে আমাদের জন্য অন্নের বিধান করুন। আমরা ক্ষুধার্ত'।[১৪] রূপকের আড়ালে এখানে গূঢ় অর্থ খোঁজার চেষ্টা চলে। কিন্তু রূপক কাঠামোয় ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের যে ধারণা ফুটে ওঠে, তা আদৌ সম্মানজনক নয়।[১৫]

মুণ্ডকোপনিষদে অবশ্য রূপকের আড়ালটুকুও নেই। এখানে সরাসরি বলা হয়, 'ষোল জন ঋত্বিক, যজমান ও যজমান-পত্নী, এই আঠারো জনকে আশ্রয় করে যজ্ঞাদি নিকৃষ্ট কর্ম বিহিত হয়েছে। এই আঠারো জনই বিনাশী, কারণ তারা অনিত্য। অতএব যে সব মূর্খ এই কর্মকে শ্রেয়োলাভের উপায় বলে সমাদর করে তাদের বার বার জরা ও মৃত্যু গ্রাস করে।'[১৬]

অতএব পরা বা ব্রহ্মবিদ্যা কোনো বস্তু-নিরপেক্ষ ব্যাপার নয়। সমাজ বাস্তবতায় অকল্যাণপ্রসূ আচার-সর্বস্ব ক্রিয়াকর্মের প্রতিক্রিয়ায় ওই সমাজেই পারস্পরিক যোগাযোগের পথ অবাধ করে কর্মে

ও চিন্তায় মুক্তির অন্বেষণ থেকে তার উদ্ভব। যৌথ জীবনে সামঞ্জস্যহীনতা ব্যক্তি চেতনায় আঘাত হানে। উত্তর খোঁজার আন্তরিক প্রয়াস তাকে বেদবিহিত বিদ্যা থেকে দূরে ঠেলে। বেদান্ত ওই প্রয়াসেরই ফসল। পরমাত্মায় লীন হবার আকুতি বাস্তব জীবনে সুস্থিতি খোঁজার পরিণাম। পুরোহিত তন্ত্রের খপ্পর থেকে বেরিয়ে আত্মোপলব্ধির পথ প্রশস্ত করতে পারলে বিশ্ববাস্তবতার সঙ্গে ব্যক্তিপ্রাণের সম্পর্কের যে ব্যাপ্তি ঘটে, তাতে গোটা সমাজেরই প্রাণচঞ্চল কর্মমুখর ও কল্যাণমুখী হয়ে ওঠা সম্ভব।

তবে দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি উপনিষদে হয়নি। আসলে বাস্তবতা ছিল বহুমুখী ও বহুমাত্রিক ব্রাহ্মণ শাসিত আচার-অনুষ্ঠানের ধারাপাতে জীবনকে মুড়ে ফেলা তার একটি মুখই চিনিয়ে দেয়। গোটা সমাজে বহুবিচিত্র মানুষের কর্ম প্রবাহের প্রেক্ষাপটে সেইটিই প্রধান মুখ ছিল কিনা তা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। গাঙ্গেয় উপত্যকায় সমাজ যত ছড়িয়েছে এবং স্থিত হয়েছে, ততোই অসংখ্য মানুষের মিশ্রণ ঘটেছে। কোনো মানুষই ফাঁকা নয়। প্রত্যেকের রয়েছে জীবনভাবনার ও জীবনযাত্রার নিজস্ব ছক। আছে বিশ্বপ্রকৃতির মুখোমুখি হয়ে আপন আপন বিশ্বাসের নান্দনিক নির্মাণ। এ সবের মিশ্রণে কোনো একক সত্য তা সে যত উচ্চ মানেরই হোক না কেন, আর সব কিছু মুছে ফেলে একাই রাজত্ব করতে পারে না। বোঝাপড়ার ও দেয়া-নেয়ার পালা ভেতর থেকে অব্যাহতভাবে চলে। তাতে অনার্য ভাবনা আর্য ভাবনার মূল স্রোতে ঢুকে পড়ে। প্রাচীন আর্য দেবতারা স্থানচ্যুত হন। বহুস্তরীয় চেতনার সমন্বয় ঘটাতে বিচিত্র পূজাবিধি বিচিত্রতর হয়। তাতে সব মিলিয়ে পুরোহিতদের অবস্থান দুর্বল হয় না, বরং আরো পাকাপোক্ত হয়। যদিও রফায় আর্য রীতির অনেককিছুই জলাঞ্জলি যায়। উপনিষদের তত্ত্বজ্ঞান যখন মানবিক আঁধার খোঁজে তখন প্রত্যক্ষের এই মায়াকে উপেক্ষা করতে পারে না। স্ব-বিরোধ মেনে নিয়েই তার সঙ্গে সমঝোতা করে। ফলে যাগ-যজ্ঞ-আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির সঙ্গে আপোষহীন বিরোধ আর বজায় থাকে না। তাদেরও একটা প্রায়োগিক মূল্য সে মেনে নেয়। একই জায়গা থেকে উঠে এসে বুদ্ধদেব তাঁর বাণীকে তার যৌক্তিক পরিণামে নিয়ে গিয়ে যেভাবে সমাজের কাছে সমস্ত বিবেকী শুদ্ধতা নিয়ে ফিরে আসেন, উপনিষদ তা করে না। তার নিজেকে জানার আহ্বান প্রায়শ যে রূপকের আশ্রয় নেয়, তা বাস্তব যজ্ঞানুষ্ঠানে ফিরে আসে। দুই এর ভেতর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সেতু একটা বচিত হয়। বুদ্ধদেবও বলেন, আত্মদীপোভব। তিনি কিন্তু বরাবব যাগ-যজ্ঞের দিক থেকে মুখ ফিরিয়েই থাকেন।

আরো একটা ব্যাপার আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উপনিষদের ঋষি সবাই ব্রাহ্মণ নন। বেশ ক'জন প্রধান ঋষি ক্ষত্রিয় রাজা। এঁদের ভেতর উল্লেখযোগ্য প্রবাহন কৈবলি[১৭] কাশীরাজ অজাতশত্রু[১৮], কৈকেয় অশ্বপতি[১৯], বৈদহ জনক[২০] ও গাঙ্গ্যপুত্র চিত্র[২১]। ব্রাহ্মণ ঋষিরাও তাঁদের শিষ্যত্ব নেন। দার্শনিক চিন্তাকে তাঁরা গভীরতম পর্যায়ে নিয়ে যান, মানব চৈতন্যে আলোর শিখা প্রজ্বলিত করেন। এ থেকে বিশেষ বিশেষ পণ্ডিত মহলে এ ধারণা প্রাধান্য পায় যে ক্ষত্রিয় প্রভাবই উপনিষদে প্রবল।[২২] সামাজিক ও রাজনৈতিক স্তরে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের ভেতর আধিপত্যের দ্বন্দ্ব মাঝে মাঝেই প্রকট হয়ে উঠত। পুরাণ কাহিনীতে তার ইঙ্গিত অপ্রতুল নয়।[২৩] পাশাপাশি রাজ্য ও সমাজ শাসনে উভয়ের সহযোগিতাও অনিবার্য ছিল। বিশ্ব-প্রকৃতির বিপুল অজানারাশির সামনে বিহ্বল মানুষের কী করণীয়, আর কী করণীয় না, তা স্থির করায় রাজাদেশই যথেষ্ট ছিল না। জ্ঞানবাজদের নির্দেশেরও প্রয়োজন ছিল। জ্ঞানচর্চায় ব্রাহ্মণদের ছিল প্রথাগত অধিকার। তাকে খাটিয়ে কর্তৃত্বের কায়েমি স্বার্থকে তারা বিস্তৃত করায় সচেষ্ট থাকত। আচার অনুষ্ঠানের আড়ম্বর দিয়ে সমাজ-মানুষের মন ভুলিয়ে তাকে বেঁধে রাখা ছিল এক সহজ উপায়। বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধার ভাগ তাতে নিশ্চিত হতো। তার অনুপাতও বাড়ত। একই হারে বাড়ত তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি। রাজশক্তি কখনো কখনো একে পুরোপুরি মেনে নিতে পারত না।

ভেতরে ভেতরে দ্বান্দ্বিক অবস্থা একটা তৈরি হতো। দ্বন্দ্ব সংঘাতের দিকেও যেত। পুরোহিততন্ত্র ছিল ব্রাহ্মণদের সামাজিক শক্তির উৎস। তাকে দুর্বল করতে পারলে ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্বও খর্ব করা যায়। উপনিষদের শিক্ষা তা করার দিকে আমাদের টেনে নিয়ে যায়। তাই তাতে ক্ষতি প্রাধান্যের কথা বার বার ওঠে।

তবে যুগচেতনাই এখানে প্রবল মনে হয়। ক্ষত্রিয় প্রাধান্য ওই লক্ষ্যে কোনো সচেতন উদ্যোগের ফল, এমনটি প্রমাণ করা মুশকিল। আচার-শাসিত সমাজ মানুষের স্বাভাবিক স্ফূর্তিকে ক্ষুণ্ণ করছিল। যাগযজ্ঞে সম্পদের অহেতুক অপচয় ক্রমবর্ধমান কৃষিসমাজের চাহিদার সঙ্গে সংগতি হারাচ্ছিল। এ অবস্থায় উদ্ধারের পথ খোঁজা যে কোনো চিন্তাশীল মানুষের পক্ষেই ছিল স্বাভাবিক। তা ক্ষত্রিয়ের বেলায় যেমন, ব্রাহ্মণের বেলাতেও তেমনি। এমনকি অন্যদের বেলাতেও। উপনিষদে তারই প্রতিফলন ঘটে। আরো অনেক পরে, এগারো শতকে রামানুজ, বা ষোল শতকে শ্রীচৈতন্য জাতপাতের বেড়া ভেঙে প্রচলিত ব্রাহ্মণ কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ভক্তিবাদের প্রচার করেন। উভয়েই ছিলেন ব্রাহ্মণ সন্তান। উপনিষদেও অনুরূপ অনেক ব্রাহ্মণ-প্রতিভা বৈদিক ক্রিয়াকলাপ প্রত্যাখ্যান করে বেরিয়ে আসার কথা বলেন। কথা বলার অধিকার আদায় করে নেন অন্যরাও। অবশ্য আরণ্যক সনাক্ত সমাজ সেখানে একটা রক্ষাকবচের মতো কাজ করে।

এটা সহজেই চোখে পড়ে, গ্রাম ও নগর জীবনের রীতিনীতি অরণ্যে অনেকটাই শিথিল। বর্ণ ও কর্ম বিভাজনের ভেদরেখাগুলোও অস্পষ্ট। বনবাসে বা সন্ন্যাসে তাই নামগোত্রহীন যারা, তারাও শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। এমন কি যোগ্য বলে স্বীকৃতি পেলে গুরুর আসনেও। এটা মেয়েদের বেলাতেও সত্য। গুরুমাতার আবির্ভাব, লক্ষ্য করি, প্রাচীন ভারতেও। বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে অবণ্যে মুক্তিব এই আবহাওয়া সহায়ক হয়। লোকালয়েও তার প্রভাব পড়ে। পারস্পরিক যোগাযোগ সমাজকে সচল রাখে।

একটা প্রশ্ন তবু আমাদের বিব্রত করে, শাস্ত্রানুমোদিত বর্ণ বিভাজনের ছক কতটা ঐতিহাসিক? ক্ষত্রিয়ের সংজ্ঞা কি ব্যবহারিক কর্মের বৃত্ত অতিক্রম করে জাতিগত রূপ পায়? বংশানুক্রমিক অধিকারের মৌরসিপাট্টা ব্রাহ্মণরা নিজেরাই নিজেদের দিয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ক্ষত্রিয়দের বেলায় তেমন কিছু কি কার্যকর ছিল? না কি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলে, অথবা জয় করলে, কিংবা যোদ্ধা হলেই যে কেউ ক্ষত্রিয় বলে পরিচিত হতো? ছান্দোগ্য উপনিষদে জ্ঞানশ্রুতি ও রৈক্কের উপাখ্যান নানা দিক থেকে কৌতুহলপ্রদ। রাজা জ্ঞানশ্রুতি দানশীল ও জ্ঞানপিপাসু। রৈক্ক মহাজ্ঞানী। জ্ঞানশ্রুতি আবো অনেক মহার্ঘ উপঢৌকনের সঙ্গে আপন কন্যাকে তাঁর হাতে পত্নী রূপে সম্প্রদান করলে তবেই রৈক্ক বিদ্যা দানে সম্মত হন। অবশ্য তার আগে দুইবার জনশ্রুতিকে শূদ্র বলে সম্বোধন করেন।[২৪] ভাষ্যকাররা এখানে শূদ্র শব্দের অন্য ব্যাখ্যা খোঁজেন। তবে যা দেখবার তা হলো, শূদ্র কন্যার পাণিগ্রহণ ব্রাহ্মণ ঋষির জন্যে সমাজে নিষিদ্ধ থাকলে রূপকের আড়ালেও তা বলা যেত না। দ্বিতীয়ত, রূপসী রাজকন্যার প্রলোভনে বিদ্যাভিমানী ব্রাহ্মণের ঋষিত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না। তৃতীয়ত, এবং যা এখানে সবিশেষ প্রাসঙ্গিক, শূদ্রের রাজা হওয়া সমাজে আটকায় না। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও শূদ্রে শাস্ত্রীয় বিভাজন যেমনই থাক না কেন, ব্যবহারিক জীবনে তেমন কোনো ভেদ রেখা টানা যায় না।[২৫]

পৌরাণিক জগৎ যখন ইতিহাসের আলোয় স্পষ্টতা পায়, তখন রাজশক্তির সঙ্গে মিলিয়ে ক্ষত্রিয় জনগোষ্ঠীকে চিনে নেওয়া আরো কঠিন হয়ে পড়ে। যতদূর জানা যায়, মগধের নন্দবংশের রাজারা ছিলেন নিচু জাতের। কৌলিন্যের দাবী ছিল না মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্তেরও। গ্রীক সেনাপতি সেলুকাসের মেয়েকেও তিনি বিয়ে করেছিলেন। জনশ্রুতি, ভারত ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ

সম্রাট অশোকের আবির্ভাব ওই যবন বিবাহের সূত্র ধরে।[২৬] তারপরেও অবশ্য শাস্ত্রীয় শুদ্ধতায় আসল হিন্দুত্বের বা প্রকৃত ভারতীয়ত্বের বড়াই করতে অনেকের বাধে না।

উত্তর ও পশ্চিম ভারতের কোনো কোনো জাতিগোষ্ঠী এখনও নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে দাবি করে। প্রাচীন আর্য রক্তের ধারা তাদের ভেতর বহমান, এমনটি ভাষার পেছনে কোনো যুক্তিসংগত ভিত্তি খুঁজে পাওয়া মুশকিল। বরং আর্যশক্তি বিনাশী বহিরাগত জনস্রোত থেকে তাদের উদ্ভব, এই অনুমান অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়। অস্পষ্ট অতীতে আর্য সভ্যতার স্বর্ণযুগে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিরোধের ইঙ্গিত পাই আমরা রামায়ণে বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র বিবাদে। তবে এখানে আরো একটা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের কামধেনু শবলাকে যখন সবলে হরণ করায় উদ্যত, তখন শবলা বশিষ্ঠকে বলে— এবং আমরা পড়ি 'আপনিই অধিক বলশালী, কারণ ক্ষত্রবল অপেক্ষা ব্রহ্মবল শ্রেষ্ঠ। আপনি অনুমতি দিন, আমি ব্রহ্মবলে এই দুরাত্মার দর্প, বল, চেষ্টা নষ্ট করব। বশিষ্ঠ বললেন, তবে তুমি সৈন্য সৃষ্টি করো। শবলা হুম্বা রব করবামাত্র শত শত পহ্লব সৈন্য উৎপন্ন হয়ে বিশ্বামিত্রের সৈন্য বধ করতে লাগল। বিশ্বামিত্র অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে বিবিধ পহ্লব সৈন্য বিনষ্ট করলেন। শবলা শক ও যবন সৈন্য সৃষ্টি করলেন, কিন্তু তারা বিশ্বামিত্রের অস্ত্রাঘাতে আকুল হলো। তখন শবলার হুংকার থেকে কম্বোজ, স্তন থেকে বর্বর, যোনি থেকে যবন, মলদ্বার থেকে শক এবং রোমকূপ থেকে কিরাত ও হারীত সৈন্য উৎপন্ন হয়ে বিশ্বামিত্রের অস্ত্র গজ রথ পদাতিক সমস্ত বিনষ্ট করলেন।'[২৭] এখানে লক্ষণীয়, ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রকে সামলাতে যাদের ডেকে আনা হলো, তাদের অধিকাংশই বহিরাগত। খ্রিস্টাব্দ শুরু হবাব সমসাময়িক ইতিহাস বলে, শক, পহ্লব, যবন ইত্যাদি জনগোষ্ঠী বাইরে থেকে এসে অভ্যন্তরীণ রাজ্যগুলোর উপর হামলা চালায়। পরে এখানেই তারা শত মানুষের ভিড়ে মিশে যায়। প্রাচীন ক্ষত্রশক্তিকে বিনষ্ট করে তারা নিজেরাই নিজেদের ক্ষত্রিয় বলে ঘোষণা করে। স্থিতিশীল সমাজে জাতে ওঠার তাগিদও এর একটি কারণ। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে তারা বেশিরভাগ বসবাস শুরু কবে। আজ যারা যে সব অঞ্চলে নিজেদের সাড়ম্বরে ক্ষত্রিয় বলে জাহির করে, শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে তারা তাদের উত্তরাধিকারই বহু মিশ্রণের পরেও বহন করে চলে। আর্য অহমিকায় অলীক হিন্দুত্বেব ধ্বজা ওড়ানো নিতান্তই হাস্যকর।

ব্রাহ্মণদের বেলাতেও শুদ্ধতার দাবি পুরোপুরি খাটে না; যদিও ব্রাহ্মণ ঐতিহ্যের দ্বারা তুলনায় চিনে নেওয়া সহজ। ছান্দোগ্য উপনিষদে জবালা-সত্যকাম কাহিনীর ধ্রুপদী মাহাত্ম্য আমাদের বিমোহিত করে।[২৮] সরল সত্যে উদ্ভাসিত হলে কলঙ্কিত জন্মের কালিমা ব্রাহ্মণত্বলাভে বাধা হয়ে দাঁড়ায় না, এটা জেনে আমরা উদ্বোধিত হই। অবশ্য ছান্দোগ্য উপনিষদে বিদ্রোহী ভাবনা অপেক্ষাকৃত প্রবল এবং পরে 'দ্বিজোত্তম' হলেও বস্তুবাদী বলেই জাবালির অধিকতর প্রসিদ্ধ।

তবে মন্থন, মিশ্রণ ও আত্তীকরণ প্রক্রিয়া যে ব্রাহ্মণদেরও গ্রাস করেছিল, প্রাচীন সাহিত্যে তার ইংগিত মেলে যথেষ্টই। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাস আর্য ঋষি ছিলেন, এমনটি মেনে নেওয়া শক্ত। মহাভারতে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্মকথায় কৃষ্ণবর্ণ ও কদাকার ব্যাসেব যে বিবরণ পাই, তা থেকে পিতা পরাশরকে অনার্য বলেই মনে হয়। মাতা সত্যবতীও ধীবর পালিত কুমারী কন্যা। রামায়ণ প্রণেতা বাল্মীকি যে নীচ কুলোদ্ভব ছিলেন, অন্ত্যজ মানুষেরা বাল্মীকি-দিবস পালনের ভেতর দিয়ে আজও তা স্মরণ করে। শুধুই জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণত্বের অধিকার তখনও নিশ্চয় একমাত্র বিধান ছিল না। নিজেদের দাপট ও কর্তৃত্ব নিষ্কন্টক করতে হিসাবি ব্রাহ্মণেরাই সম্ভবত তাকে বংশানুক্রমিক করে তুলেছিল। কিন্তু বিশাল ভূখণ্ডে বহু মানুষের অবিরাম যোগাযোগে তা কার্যত তার কৌলিন্য হারায়। বাইরের বড়াই অবশ্য ক্ষুণ্ণ হয় না। বরং কৌলিন্যের অভাব আড়াল করতে তার বাড়াবাড়িটাই দৈনন্দিন জীবনে জাঁকিয়ে বসতে থাকে। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে তার ধারা এখনও সচল।

উপনিষদে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু নারীদেরও দেখা পাই। সংখ্যায় তাঁরা নিতান্তই নগণ্য। যাজ্ঞবল্ক্যের এক স্ত্রী মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী হলেও অন্য স্ত্রী কাত্যায়নী স্ত্রীপ্রজ্ঞা, অর্থাৎ নারীজনোচিত সাংসারিক বুদ্ধি সম্পন্না ছিলেন। কাত্যায়নীরাই ছিলেন সমাজে মেয়েদের প্রতিনিধি স্থানীয়। মৈত্রেয়ীদের অবস্থান ব্যতিক্রমীই মনে হয়। অবশ্য ব্রহ্মবাদী পুরুষও কোনো সময়ে সমাজে অসংখ্য মিলত না। তবে অনুরূপ মেয়েদের তুলনায় তাঁদের অনুপাত যে অনেক বেশি ছিল, উপনিষদে তাঁদের উল্লেখ থেকে তা সহজেই অনুমান করা যায়। অনুপাত যাইহোক, যা দেখবার, তা হলো, জ্ঞান চর্চার সুযোগ আগ্রহী মেয়েদের জন্য বন্ধ ছিল না। গুরু শিষ্য পরম্পরায় তারাও পড়াশোনা করতে পারত, করাতে পারত। পুরুষের সঙ্গে সমানতালে বুদ্ধি বৃত্তিক কর্মকাণ্ডে, এমনকি শাস্ত্রীয় বিতর্কে লিপ্ত হতে পারত। স্বীকৃতির অভাব বা হীনম্মন্যতা কোনো বাধা হতো বলে মনে হয় না। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দেখি, জনক রাজার যজ্ঞসভায় গার্গী অসংকোচে যাজ্ঞবল্ক্যকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য যে এক সময় এই বলে তাঁকে থামিয়ে দেন, 'অতি প্রশ্ন করো না, করলে তোমার মুণ্ডপাত হবে,'[২৯] তাতে অনেকে মনে করেন, উত্তর দিতে ব্যর্থ হওয়ায় নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে পুরুষের অহমিকায় যাজ্ঞবল্ক্য তাঁকে ওইভাবে ধমক দিয়ে নিরস্ত করেন। কিন্তু এটা সম্ভবত যথার্থ নয়। প্রথমত ব্রহ্মলোকের সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ে তর্ক এমন এক জায়গায় পৌঁছোয়, যেখানে অব্যয়, অদ্বয় ও অক্ষয়ের কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধারণা আর সম্ভব নয়। চেতনায় তার বিস্তার ও বুদ্ধির সীমায় বাধা পায়। তাকে অতিক্রম করতে গেলে বুদ্ধি বিলুপ্তিরই আশংকা। যাজ্ঞবল্ক্য এই দিকেই ইঙ্গিত করে থাকতে পারেন। দ্বিতীয়ত, এমনও হতে পারে, 'তোমার মুণ্ডপাত যেন না হয়'—'না তে মূর্ধা ব্যাপপ্তৎ' এই সাবধান বাণী নিতান্তই তৎকালীন এক বাক্‌চাল। এর সঙ্গে পুরুষ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কোনো সম্পর্ক নেই। এই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কারণ ওই তর্কসভাতেই কিছু পরে আমরা দেখি, প্রতিদ্বন্দ্বী শাকল্যের প্রতিও তিনি অনুরূপ বাক্য উচ্চারণ করেছেন।[৩০] আর গার্গীও তখন বিরত হলেও আবার তর্কে ফিরে আসেন। শেষে এই বলে প্রশ্নোত্তরে ইতি টানেন, 'শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণগণ, যদি এঁকে নমস্কার করেই এঁর হাত থেকে নিষ্কৃতি পান, তবে সেইটিই যথেষ্ট মনে করবেন। ব্রহ্মবিচারে আপনারা কেউই এঁকে পরাস্ত করতে পারবেন না।'[৩১]

আসলে ব্রহ্মজ্ঞান নারীপুরুষ ভেদাভেদ বিলুপ্ত করে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পড়ি, 'নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ'—এই জীবাত্মা অবশ্যই নারী নয়, নরও নয়, 'ন চৈবায়ং নপুংসকঃ'—এবং তা নপুংসকও নয়। তবে, 'যদ্‌যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে' যে যে শরীর সে গ্রহণ করে, সেই সেই শরীরই তাকে রক্ষা করে।[৩২] এই বোধ নারী পুরুষের বহিরঙ্গ ভেদ করে তাদের অন্তর্যামীতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। সেখানে দৈনন্দিন জীবনে বৈষম্যের সংকোচ আর থাকে না। অবশ্য এটা ব্রহ্মজ্ঞানের অনুশীলনের পরিণাম। সমাজ সংগঠনের বিশিষ্ট নির্মাণ প্রক্রিয়ার নিজস্ব কারকতা তাকে তার মতো করে পরিচালিত করে। ব্রহ্মজ্ঞান প্রত্যক্ষের জীবনচর্চার এই ছবিটিকে পেছনে রেখেই দাঁড়াতে চায়; এবং তাকে অতিক্রমও করতে চায়। এইটি বোঝার জন্য তার স্বরূপের যথাসম্ভব খোঁজ নেওয়া দরকার। আমরা এবার তারই চেষ্টা করি। এবং তার অনুসরণে বাস্তব জীবনভাবনা কীভাবে ফুটে উঠতে পারে, তা নিয়ে কিছুটা মাথা ঘামাই।

বেদমন্ত্র : অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময় মৃত্যোর্মাহমৃতং গময়—বৃহদারণ্যক উপনিষদে পুনরুচ্চারিত।[৩৩] তবে বৈদিক প্রভাতের সরল প্রাণের আকুতি এখানে গভীর আত্মজিজ্ঞাসার পরিণাম। এই আত্মজিজ্ঞাসা গোটা উপনিষদ সাহিত্যেই। যে প্রশ্নমালা দিয়ে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শুরু আমরা কোথা থেকে এসেছি, কে আমাদের জীবিত রাখে, সবশেষে কোথায় যাই; কে আমাদের সুখ-দুঃখ ভোগের ব্যবস্থা করে[৩৪]' — তার অনুধ্যান চিন্তাকে জগৎ-কারণের দিকে নিয়ে যায়, এবং

জগৎ কারণ থেকে প্রথম আদি শক্তি নির্গুণ পরমাত্মায়। অসৎ থেকে সৎ-এ যাওয়া আপেক্ষিক সৎ থেকে পরম সতে যাওয়াও। স্থান-কালের সীমায় ন্যায় নীতির বহু রূপ। সৎ-অসৎ-এ দ্বন্দ্ব যেমন, তেমনি তাদের রূপান্তর, এমন কি পারস্পরিক জায়গা বদলও ঘটে চলে অনুক্ষণ। এসবকে পায়ে পায়ে ভেঙে ভেঙে অতিক্রম করে এক স্থির বিন্দুতে পৌঁছুনই উপনিষদের লক্ষ্য। অসৎ থেকে সৎ-এ যেমন, তেমনি অন্ধকার থেকে আলোয়, মৃত্যু থেকে অমৃতে। এবং শেষ বিচারে সব গন্তব্যই এক। অমৃতই প্রথম এবং পরম। সব সৃষ্টি মৃত্যু লাঞ্ছিত। সৎ পূর্ণতা পায় ওই অমৃতেই। আলোও পায় অবিচল ধ্রুবত্ব। জগৎকারণ হওয়াতে তার সগুণ প্রকাশ— আপেক্ষিকতার ক্রমবর্ধমান ও ক্রমবিস্তারমান ক্ষেত্রে রূপ থেকে রূপে নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া ফুটিয়ে তোলা। রূপ বিনাশী। কিন্তু বিপুল প্রাণের সমারোহে প্রতি মুহূর্তে তা পূর্ণ। উপনিষদের এক শান্তিবচনে তাই বারবার ধ্বনিত হয়, 'ও পূর্ণ, এও পূর্ণ। পূর্ণ থেকে পূর্ণের' উদ্ভব। পূর্ণ থেকে পূর্ণ নিয়ে নিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।'[৩৫] নামরূপে প্রকাশিত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে একই সত্যের প্রকাশ। নাম থেকে মুক্তি ঘটলে স্থান-কালের সীমা আর থাকে না। অনশ্বর ওই পরম সত্যেই তা প্রতিভাত হয়। এই পরম সত্য-পরম ব্রহ্মকে উপনিষদ জানতে চায়। জানতে চায় তার সগুণ ও নির্গুণ, উভয় সত্তাকেই। যদিও উপলব্ধি পূর্ণতা পায় অভেদের চেতনায়।

ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোক আমাদের জানায়, জঙ্গম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু চলমান, অর্থাৎ পরিবর্তমান, তার সবের ওপরেই ঈশ্বরের আচ্ছাদন ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।[৩৬] এই ঈশ্বর পরম ব্রহ্ম। তার চেতনাই বিশ্বজগতের আচ্ছাদন। এই আচ্ছাদন বাইরের, ভেতরেরও। একদিকে আত্ম চেতনায় ব্রহ্মের উপলব্ধি, অন্যদিকে বিশ্বপ্রপঞ্চে ব্রহ্মজ্ঞান। দুটোতেই নশ্বরতাকে ছাপিয়ে জেগে থাকে অমৃতময় সত্তা। তারই প্রতিফলন দৃশ্যে-অদৃশ্যে প্রাণে-অপ্রাণে পরিপূর্ণ বিশ্বজগতের অবিরাম চলিষ্ণুতায়। যে শক্তির বিচ্ছুরণ তাতে উদ্ভাসিত হয়, তার অবিকৃত সত্তা সর্বব্যাপী, জ্যোতির্ময়, 'অকায়ম্ অব্রণম্ অস্নাবিরং শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্' তা 'কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভু', তা 'শাশ্বত'[৩৭]। আমরা আরো জানি, 'তদেজতি তন্নৈজতি'—'তা জঙ্গম, তা স্থির, 'তদ্দূরে তদ্বন্তিকে' তা দূরে, আবার কাছে, তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ'—তা এই সমস্ত জগতের ভিতরে, আবার এই সমস্ত জগতের বাইরে।[৩৮]

এই ব্রহ্মের উপলব্ধি থেকে জন্ম নেয় তার সঙ্গে একত্বের চেতনা।—'যোহ্সাবসৌ পুরুষঃ সোহ্মস্মি।'[৩৯] একই কথা বিপরীত দিক থেকে বস্তুবিশ্বের অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়ে শ্বেতকেতুকে ব্যাখ্যা করেন পিতা উদ্দালক। অদ্বিতীয় সৎ চাইলেন বহু হতে। বহুতে নিজেকে তিনি ছড়িয়ে দিলেন। বটবৃক্ষের বীজ থেকে শুরু করে সৃষ্টির সকল সত্তার মূলেই তিনি। শ্বেতকেতুর ভেতরেও। 'ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বং তৎসত্যংস আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেত কেতো' (সেই যে সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম) তিনিই এইসব কিছুর আত্মা। তিনিই সত্য তিনিই আত্মা। হে শ্বেতকেতু, তুমিই সেই।'[৪০] অথচ সেই তিনি একই সঙ্গে অব্যয়, অক্ষয় অনাদ্যন্ত্য অচঞ্চল। কীভাবে তা সম্ভব? উপনিষদ বিশদ হয়, 'অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব'—একই অগ্নি যেমন ভুবনে প্রবেশ করে রূপে রূপে আলাদা আলাদা আকার পায়, 'একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ'— তেমনই এক সর্বভূতান্তরাত্মাও রূপে রূপে বিরাজমান, অথচ তাদের বাইরে আপন অবিকৃত সত্তায় বর্তমান।[৪১] অনুরূপ, 'একই বায়ু যেমন পৃথিবীতে প্রাণরূপে প্রবেশ করে বিভিন্ন দেহের আকার পায়, তেমনি সর্বভূতের অন্তরাত্মাও, অথচ তাদের বাইরে তার অসম্পৃক্ত অবস্থান।[৪২] সূর্য যেমন সর্বলোকের চোখে আলো ঢেলে দিয়েও স্বয়ং কোনো চাক্ষুষ পাপে লিপ্ত হয় না, নিখিল জীবের আত্মাও তেমন এক হয়েও জাগতিক দুঃখে জড়িয়ে পড়ে না।[৪৩] তার বাইরে সে দুঃখাতীত'। উপনিষদ বলে, এই আত্মাই পরম।

'সত্যস্য সত্যম্'।[৪৪] *এবং এখান থেকে শংকরাচার্যর ব্যাখ্যা, অদ্বৈতবাদ-ও মায়াবাদ-দর্শনের জন্ম। এই তত্ত্ব অনুযায়ী দৃশ্যে অদৃশ্যে সর্বব্যাপ্ত এক ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম এবং তাই একমাত্র সত্য। বিশ্ব প্রপঞ্চে সম্পর্ক সম্বন্ধ সব অলীক। সব মায়া। জলবুদ্বুদের মতো তারা ভেসে ওঠে আর মিলায়।* আমাদের ইন্দ্রিয় সমূহ তাদেরই প্রত্যক্ষ করে, অনুভব করে, উত্তর-প্রত্যুত্তরে তাদের মোহজালে জড়িয়ে যায়। কিন্তু তারা অনিত্য, তাদের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকে সত্য। সেই সত্য তাদের অনুভূতি জাগায়, যদিও স্বয়ং অবিকৃত থাকে। বৃহদারণ্যকে উপনিষদে পড়ি, 'বহুরূপে ইন্দ্রের মায়ার বিস্তার। রথের ঘোড়ার মতো দশটি, এমনকি শত শত ইন্দ্রিয়ানুভবের তিনি কর্তা। এই আত্মাই তাদের ধারণ করেন; ইনিই হাজার হাজার রূপে প্রতিভাত, বহু ও অনন্ত। ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই অপূর্ব, অনপর, অনন্তর ও অবাহ্য। সর্বানুভবকারী এই আত্মাই ব্রহ্ম।'[৪৫] মায়াজাল ছিন্ন করে এই ব্রহ্মকে জানাই উপনিষদের অভীষ্ট। প্রত্যক্ষের কোনো কিছুই তো তা নয়। তাই 'নেতির অরণ্যে' তার ধারণার নির্মাণ—'হে গার্গি, জ্ঞানী জনেরা বলেন, ইনি সেই অক্ষর, স্থূল নন, অনু নন, হ্রস্ব, দীর্ঘ বা লোহিত নন; ইনি স্নেহবস্তু নন, ছায়া নন, অন্ধকার কি বায়ু বা আকাশও নন; ইনি অসঙ্গ, অ-রস, অ-চক্ষু, অ-কর্ণ; ইনি বাগিন্দ্রিয় বিহীন, মনোবিহীন, অতেজস্ক, অপ্রাণ, অমুখ, অপরিমেয়, অনন্তর ও অবাহ্য। ইনি কিছুই ভোজন করেন না, এবং অপর কেউ এঁকে ভোজন করে না।'[৪৬] আবার বিপরীতে প্রকাশমান বাস্তবতাতে তাঁরই অপ্রত্যক্ষ দীপ্তির সঞ্চালন। কঠোপনিষদ জানায়, 'ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং—সেখানে, অর্থাৎ ব্রহ্মের সন্নিধানে সূর্যের আলো প্রকাশ পায় না, চন্দ্র তারকারও না, নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহ্য়মগ্নিঃ—বিদ্যুৎও চমকায় না, এই অগ্নিই বা কিভাবে দীপ্তি দেবে? তিনি দীপ্যমান বলেই সব কিছু উজ্জ্বল। তাঁর আলোতে জগৎ সমুদয় বিভাসিত তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।'[৪৭] এইভাবে নিষ্প্রপঞ্চ স-প্রপঞ্চ হন। প্রপঞ্চের বিস্তার আপনা থেকে সত্তাবান হয় না। কাল এবং অবস্থানও তাদের আপনা থেকে গড়ে ওঠে না। প্রতিটি মৌলকণায় ব্রহ্ম আত্মস্থ হন। তাতেই তারা সত্তাবান হয়।

এভাবে দেখলে এই জগৎ সংসার আপাত সত্য, প্রকৃত সত্য নয়। কাজেই তাতে আসক্তি নিবর্থক। তার মোহ দৃষ্টিকে যদি আচ্ছন্ন রাখে, তাহলে সত্যের সত্য' অধরাই থেকে যায়। বিষয় বৈবাগ্যেই মন হতে পারে ওই সত্যাভিমুখী। তাই চূড়ান্ত মোক্ষের পথ সন্ন্যাস। বাসনাতিরিক্ত আত্মস্বরূপের এবং বিশ্বস্বরূপেরও উপলব্ধি ঘটে ওই পথে।[৪৮] তবে পথ দুর্গম— ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দূরত্যয়ী।[৪৯] এবং তার হদিসও আগে থেকে জানা থাকে না। ব্রহ্মোপলব্ধি প্রবচনে মেলে না। মেলে না মেধায় অথবা বহু শ্রুতির অনুসরণে।[৫০] অনুমান করি, বৈদিক শাস্ত্রানুশীলন ও দেবতা সমূহের উপাসনা মন্ত্রের উচ্চারণ এখানে প্রত্যাখ্যাত। পরমাত্মাকে আত্মস্বরূপে বরণ করলে তাঁর কৃপাই কেবল পথ দেখায়। আধ্যাত্মিকতার উচ্চ মার্গে প্রস্থানের ওপর জোর পড়ায় প্রত্যক্ষের জীবনচর্চা এখানে তীব্রতা হারায়, এমনকি নিরর্থক বলে উপেক্ষিত হয়, এমন অভিযোগ যদি কেউ করেন, তবে তা সরাসরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এর অবশ্য অন্য মাত্রাও আছে। সেদিকে দৃষ্টি দেবার আগে স-প্রপঞ্চ ব্রহ্মের অনুভূতি প্রপঞ্চ ছাড়িয়েও যে জীবনমুখী ধারাতে বহমান, এই কথাতে কোনো সারবস্তু আছে কিনা তা বোঝার চেষ্টা করি।

ঈশোপনিষদের এই বাণী আমাদের চমকে দেয়,—'যারা অবিদ্যার, অর্থাৎ মায়ার উপাসনা করে, তারা গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে। কিন্তু যারা কেবল বিদ্যার, অর্থাৎ অতিলৌকিক দেবতার উপাসনায় রত, তারা আরো গভীর অন্ধকারে ডুবে যায়।'[৫১] আমরা অবাক হই, মায়া জগতে বদ্ধ থাকার মতো শুধুই দেবলোকে মগ্ন থাকার ব্যাপারেও এখানে নিষেধের বাণী উচ্চারিত হচ্ছে। একটু পরেই অবশ্য বলা হয় দুটোর সমন্বয়ের কথা—'বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়কে যে একত্রে জানে, সে অবিদ্যায়া মৃত্যুং তীর্ত্বা' অবিদ্যার জ্ঞানে মৃত্যুকে অতিক্রম করে বিদ্যায়াহ্মৃতমশ্নুতে বিদ্যার সহায়ে অমরত্ব পায়।[৫২]

'নেতি-নেতি'র সাধনা এমন নয়। সেখানে মায়াকে খণ্ডন করে, অথবা তার দিকে পেছন ফিরে নিবাত নিষ্কম্প নিরাকার ব্রহ্মতেই কেবল নিমগ্ন হওয়া। অথচ এই শ্লোক মায়ার জগৎকেও সমান গুরুত্ব দেয়। অসংখ্য বন্ধনকে ছিন্ন করা নয়, নিরাসক্তভাবে তাদের জেনে 'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়' 'মুক্তির স্বাদ' লাভের কথাই এ বলে। দেখার দৃষ্টি অবশ্যই ভিন্ন। লক্ষ্য যদিও একই। বিশ্বজগৎ এতে বাদ পড়ে না; বরং তার সবটাই চোখ শুষে নেয়। শুষে নিয়ে এই বোধে এসে স্থির হয়, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি'—এই সব কিছুই ব্রহ্ম থেকেই এসবের জন্ম স্থিতি ও লয়।[৫৩] এদের আনন্দসঞ্চারী বাস্তবতায় উদ্ভাসিত হন ব্রহ্মাই। এবং ওই রসাবিষ্ট আনন্দ ব্রহ্মেরই অভিলাষ। সমুদয় বিশ্বভুবনে ওই অভিলাষের অন্তহীন অভিব্যাক্তি। সৃষ্টির নশ্বরতা তাকে পরাস্ত করে না। বরং নশ্বরতাকে অবলম্বন করেই তাকে তা অতিক্রম করে, ও স্থায়ী হয়।

উপনিষদ আরো বলে, স্বয়ংকর্তা ব্রহ্মাই রসস্বরূপ রসো বৈ সঃ।[৫৪] এই রসের আস্বাদনেই জীবের আনন্দ। কিন্তু এই রসের উপলব্ধি কেবলমাত্র একক অস্তিত্বে আত্মগত হওয়া সম্ভব নয়। তার জন্যে চাই দ্বৈতবোধ। চাই 'আর একটি একা'—রূপ-রস-শব্দ গন্ধ স্পর্শে যার সঙ্গে ঘটে আনন্দময় ঐক্য। তা ধারণ করে তাদের সবাইকে নিয়ে মন। আদিতে একক সত্তা ব্রহ্মাও তাই রসরূপে আনন্দের উপভোগের জন্য সঙ্গী চাইলেন। নিজেকেই তিনি পরিপূরক দুইভাগে ভাগ করে নর ও নারীতে পরিণত হলেন। মূলত এক অর্ধনারীশ্বর সত্তা এইভাবে নিজেকে প্রকাশ করে উভয়ের মিলনে রসোপলব্ধির আনন্দ পেলেন।[৫৫] প্রাণের অসংখ্য প্রকাশে সেই আনন্দকে তিনি ছড়িয়ে দিলেন। বহু বিচিত্র সৃষ্টির উল্লাসে ওই আনন্দধ্বনি গগনে গগনে বাজে। তার বিরাম নেই। তবে উক্তির উপলব্ধিতে উত্তরণ পার্থিব জীবনের বাস্তব ভূমিতেই অর্থবহ। অন্যথায় তা অবান্তর। উক্তিও বায়ুভূত নয়। প্রত্যক্ষের আলোয় বিশ্ব প্রকৃতির মুক্তাঙ্গনে ক্রিয়ায়-প্রতিক্রিয়ায় জীবনলীলার অব্যাহত অনুষ্ঠান সমষ্টিরও ব্যক্তির চৈতন্যে যে অনুরণন তোলে, তারই অনুশীলিত ও পরিশীলিত উচ্চারণে উক্তি জমাট বাঁধে। উপনিষদের আধ্যাত্মিকতাও এইভাবে মানুষের ইহজাগতিক আকুতিকেই চিনিয়ে দেয়। সে মানুষ নির্বিশেষ হতে চায় অবশ্যই। তবে অনিবার্যভাবে স্থান ও কালের শাসন চেতনায় সে ধারণ করে। উদার মুক্তির অভিসারী হলেও তার ছাপ সে রেখে যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র সৃষ্টির যে উপাখ্যান,[৫৬] তা ঈশ্বর নির্দেশিত মনে করা বাতুলতা ছাড়া আব কিছুই নয়। অবশ্য ঈশ্বব যদি হন সমকালীন সমষ্টি ভাবনায় সুষমা ও সামঞ্জস্য কল্পনার পুঞ্জীভূত নির্যাস, তা হলে ভিন্ন কথা। সেখানে ঈশ্বরের নির্দেশ আর স্থান-কাল নিরপেক্ষ থাকে না। ঈশ্বরও মানব-পরিবেশ অনুযায়ী নিজেকে ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রকাশ করেন। উপনিষদের দত্ত-দয়ধ্বম্-দময় বাণী[৫৭] এখনও প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। কিন্তু তা তুমুলভাবে ইহজাগতিক, এবং দান-দয়া-দমনও বিভিন্ন সমাজ বাস্তবতায় বিভিন্ন গুরুত্ব পায়। যেমন এই কাহিনীতে দেবতা মানব-ও-দানব-কল্পনা প্রাচীন ভারতেব আর্য-অনার্য অধ্যুষিত সমাজে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় উদ্ভূত অভাববোধ ও শুভচেতনার ফসল।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে অতি পরিচিত গায়ত্রী মন্ত্র : মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরান্তি

সিন্ধব : বায়ু মধুময় হোক, সব নদী মধু ক্ষরণ করুক, মাধ্বীর্ণঃ সন্তোষধীঃ - ওষধীসকল আমাদের মধু অর্থাৎ নিরাময় দিক; মধু নক্তমুতোষসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ - দিনগুলি রাতগুলি মধুময় হোক, পৃথিবীর ধূলি মধুময় হোক; মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা - দ্যুলোক মধুময়, পিতা মধুময় হোক; মধুমান্নো বনস্পতির্মধুমান অস্তু সূর্যঃ-বনস্পতি আমাদের জন্য মধুময় হোক, সূর্যকিরণ মধু ছড়াক; মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ - আমাদের সব গরু মধু দিক। এবং এই প্রার্থনার সঙ্গে ভূর্ভুবঃ স্বঃ - মর্ত্য অন্তরিক্ষ ও স্বর্গ, তিন লোকে দৃষ্টি প্রক্ষেপণ।[৫৮]

এই মন্ত্র রসো বৈমঃ - এই মূল উপপাদ্যের দিকেই আমাদের টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু লক্ষণীয়, এতে আধ্যাত্মিকতার বিন্দুমাত্র ছিটে ফোঁটাও নেই। সবটাই ইহজাগতিক, এবং পরিপূর্ণভাবে প্রাথমিক। এখানে যে প্রার্থনার উচ্চারণ, তা খোলাচোখে সব দিকে তাকিয়ে বিশ্বপ্রকৃতিতে মাধুর্যসঞ্চারী বাস্তবতার প্রার্থনা। পার্থিব জীবনকে সুখপ্রদ ও আনন্দময় করাতেই তাদের অবদান। যেহেতু প্রাথমিক, তাই দ্বান্দ্বিক নয়। সবার জন্যে সমান উন্মুক্ত। প্রার্থনাও নির্বিশেষে বহুবচনে। এর উদাত্ত স্বরে আমরা মুগ্ধ হই। প্রত্যক্ষের সঙ্গে মিলিয়ে জীবনের মৌলিক সুরই এতে শুনি। অবশ্য এটাও লক্ষ্য করি, এমন এক সমাজভূমিতে এই মন্ত্রের উদ্ভব, যেখানে বস্তুবিশ্বে মানুষের উৎপাদিকা শক্তির রূপান্তর ও বিকাশ বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। জীবনে ও চেতনায় প্রকৃতি নির্ভরতা অনেক বেশি। এক নির্মল সারল্য এতে পাই। মনে হয় যেন অপার্থিব। কিন্তু 'মর্ত্য কাছে স্বর্গ যা চায়' সেই মাধুরীই এতে ঝরে পড়ে। কোনো স্বর্গীয় সুষমা খোঁজা এখানে অর্থহীন। যদিও রসময় ব্রহ্মের স্বাদই অন্বিষ্ট। জগৎ জুড়ে সৃষ্টি ক্রিয়ায় আনন্দময় মাধুর্যের অনুভব, এবং এই মাধুর্যেই ব্রহ্মের উপলব্ধি, এমন কথা উপনিষদ আমাদের বারবার জানায়। তবে তত্ত্বজ্ঞান মৃত্তিকা সংলগ্ন হলেই তার বিশেষ রূপ শুধু যে বস্তুসীমাতে বাঁধা পড়ে, তাই নয়, ধ্যান-ধারণা-বিশ্বাস ও প্রয়োজনের স্থান-কাল নির্ধারিত তাগিদেরই তা প্রকাশ ঘটায়। অধ্যাত্মিকতা অনেক সময় সেখানে ধরা পড়ে না। লোকায়ত জীবনে ক্ষুদ্র প্রাণের প্রবৃত্তি ভাবনাই বড় হয়ে দেখা দেয়। আচার-বিচার-কাণ্ডজ্ঞানও সেই পরিবেশে আটকে থাকে।

উপনিষদে দেখি, চেতনার একটা স্তরে অন্নই ব্রহ্ম। এই স্তর অতিক্রম করার কথা বলা হয়েছে সত্য; কিন্তু অন্ন বাদ দিয়ে নয়, সঙ্গে নিয়েই। ছান্দোগ্য উপনিষদে আরুণি-শ্বেতকেতু সংবাদে পড়ি, পিতা পুত্রকে বোঝাচ্ছেন, মন অন্নময়, প্রাণ জলময়, বাক্ তেজোময়। একদিন অভুক্ত থেকে শ্বেতকেতুর বেদবিদ্যা কিছুই মনে পড়ে না। পিতা বলেন, আহার করো। তারপরে এসো। আমার কথা বুঝতে পারবে। খেয়ে তৃপ্ত হয়ে শ্বেতকেতু আবার তাঁর মানসিক শক্তি ফিরে পান। আরুণি তখন ব্যাখ্যা করেন, 'তোমার ষোড়শ কলার একটিমাত্র কলা অবশিষ্ট ছিল। তা অন্ন সংযোগে প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। এখন বেদ সমূহ অনুভব করতে পারছ। অতএব হে সোম্য, মন অন্নময়, প্রাণ জলময়, বাক তেজোময়।'[৫৯] তবে অন্ন সর্ব সাধারণের। যা সবার, তা একজনের আত্মসাৎ করা পাপ।[৬০]

ভুমা নয়, ভূমিতেই এখানে ঋষি দৃষ্টি নিবদ্ধ। একে ব্যতিক্রমী বা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার মনে করলে উপনিষদের সার্বিক সমন্বিত চেহারা বোধহয় খণ্ডিত হয়ে পড়বে। বস্তুবিশ্বের প্রয়োজনকে মেনে নিয়েই নিরাসক্তভাবে জীবনকে দেখার চেষ্টাটাই মূলে কাজ করে। অন্ন ব্রহ্ম এই উপলব্ধি তারই পরিণাম। এবং যে অন্ন সবার, তা একজনের আত্মসাৎ করা পাপ, এই বোধ জীবন বিমুখতার পরিচায়ক নয়। প্রবহমান রসের ধারায় শুধু ছন্দ ও সুষমা খোঁজা নয়, তাদের বাড়িয়ে তোলাও যে এক করণীয় কাজ, সর্বসাধারণের এই কল্যাণ এষণায় তার ইঙ্গিত মেলে। তবে পরিবর্তনশীল বস্তুবিশ্বের যে ছবি এখানে পাই তা আপন কালের ফ্রেমেই বাঁধা। আজকের বর্তমানে তার প্রতিস্থাপন কালাসংগতিই বাড়ায়। যদিও বাণীর নির্যাস এখনও প্রাসঙ্গিকতা হারায় না। এবং তা ইহজগতে কেমন করে বাঁচি, এই প্রশ্নেই সীমিত থাকে।

প্রাণের সমারোহে জীবনের উত্তরণ যেখানে ভাবনায় অনেকখানি দখল করে রাখে, রসের আনন্দময় উপলব্ধি যেখানে আবিষ্ট, সেখানে মৈথুন ও সৃষ্টির আদিম ও প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল বাস্তবতাকে কোনোভাবেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না। উপনিষদও তা পারে না। এড়াতে চাওয়া আত্মিক অসততাও বটে। শাকল্যের প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, কাম যাঁর আশ্রয়, হৃদয় যাঁর লোক, মন যাঁর জ্যোতি, সমুদয় আত্মবোধের অবলম্বন যে কামময় পুরুষ, তাঁর দেবতা হলেন নারী।[৬১] কারণ তিনি

সিদ্ধকাম হন কেবল নারীর অনুগ্রহেই। বস্তুজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এক সরল সত্যকে কুণ্ঠাহীনভাবে স্বীকার করে নিতে দেখি এই মীমাংসায়। অবশ্য বৃহদারণ্যক উপনিষদেই অন্যত্র পড়ি, এবং সুকুমারী ভট্টাচার্যও তা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, 'মলিনবাস পরিত্যক্তা যশস্বিনী স্ত্রীকে পুরুষ আহ্বান করলে যদি সেই স্ত্রী তাতে সাড়া না দেয়, তবে পুরুষটি তাকে উপহার দিয়ে বশ মানাবে। তাতেও যদি সে পুরুষের কামনা চরিতার্থ না করে, তবে তাকে সে হাত দিয়ে বা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে বশীভূত করবে।'[৬২] এটা জুলুম বা বলাৎকারের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। দেবোপাসনার কোনো লক্ষণ এতে দেখি না।

আসলে সমাজের গড়নই সম্পর্কের স্বরূপ নির্ধারণ করে। উপনিষদের আনুগত্য এখানে তাতেই। তাকে সে প্রশ্ন করে না। অন্তর্নিহিত অন্যায় তার চোখেও পড়ে না। এমনটিই ঘটে থাকে, এইটিই সে ধরে নেয়। উপনিষদের বাণী অভ্রান্ত বলে আমরাও অনেকে তা সগৌরবে অনুসরণ করে চলি। এটা খেয়াল করি না, কৃষি ও পশুপালন নির্ভর সমাজে উৎপাদনের উপকরণের বিকাশ যেখানে নিতান্তই প্রারম্ভিক পর্যায়ের, সেখানে লোকবলের ওপরেই জোর পড়ে বেশি। তার দ্রুত বৃদ্ধি যেখানে সর্বাধিক কাম্য, সেখানে কোনো নারীর পছন্দের বা অবসরের অধিকার বিন্দুমাত্র বিবেচনায় আসে না। প্রয়োজনের অগ্রাধিকার তাকে প্রধানত জনশক্তি বৃদ্ধির উপায়ে পরিণত করে। সেইটিই গণচেতনায় শিলীভূত আকার পায়। উপনিষদ তাকেই মান্য করে তার ওপর তত্ত্বজ্ঞানের পশরা সাজায়। প্রত্যক্ষের সম্পর্ক-সম্বন্ধ যতক্ষণ ওই সমাজ সংগঠনের সজীবতাকে ক্ষুণ্ণ না করে, ততক্ষণ তা নিয়ে কারো মনে কোনো প্রশ্ন না জাগা অস্বাভাবিক নয়। ভেতরের অন্যায় প্রয়োজনের তাগিদের কাছে পরাজয় মানে। প্রয়োজন জীবন যাপনের ইহজাগতিক চাহিদার সীমা অতিক্রম করে না।

বৃহদারণকে উপনিষদেই আরো দেখি, কীভাবে লোকাচার ও গ্রাম্য সংস্কার উপযুক্ত সন্তান কামনায় আহার-বিহাব ক্রিয়া কর্মের নির্দেশলিপি রচনা করে। উপনিষদ একেই শিরোধার্য করে নেয়, যদিও এর পেছনে কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা নেই। এবং পরবর্তীতে অনেক কিছুই এর খারিজ হয়ে যায়। শাস্ত্রবচন মানেই অভ্রান্ত এবং প্রাচীন বিশ্বাস মানেই সত্য. অন্ধের মতো এই কথা মেনে যাঁরা শূন্যে তরোয়াল ঘোরান, তাঁদের জন্য বিষয়টি ভেবে দেখা খুব জরুরি। আমরা দেখি, কালো অথবা গৌরবর্ণ পুত্র সন্তান লাভের আশায়, অথবা বিদুষী কন্যা সন্তান কামনায় স্বামী-স্ত্রীর সুনির্বাচিত ভোজ্য তালিকার বিধান দেওয়া হয়েছে।[৬৩] একইভাবে বলা হয়েছে, 'যদি কেউ চায়, আমার এমন ছেলে হোক, যে পণ্ডিত, প্রখ্যাত, বিচারক্ষম ও সুবক্তা হবে, আর হবে বেদজ্ঞ ও পূর্ণায়ু, তবে তারা স্বামী-স্ত্রী কচি অথবা বয়স্ক বৃষের মাংস দিয়ে পলান্ন রান্না করিয়ে তা খাবে। এতে তারা ওই রকম সন্তান লাভে সমর্থ হবে।'[৬৪] গোমাংস ভক্ষণের সঙ্গে মেধা ও আয়ুবৃদ্ধির সম্পর্ক নির্দেশ থেকে এমন অনুমান খুবই স্বাভাবিক যে সেকালে মুনি ঋষিরা এই খাদ্যটি নিয়মিত আহার করতেন, এবং এর প্রতি তাঁদের আসক্তি যথেষ্ট প্রবল ছিল।[৬৫] মুনি ঋষিরাই তখন সমাজে পণ্ডিত প্রখ্যাত ও বিচারক্ষম বলে পরিচিত ছিলেন। উপনিষদের সুপারিশ তেমন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল হতে পারে; তবে এতে কোনো যথার্থতা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। এই সব অজ্ঞানতা প্রসূত ধারণা জড়িয়ে নিয়েই তার আত্মানুসন্ধান। ওই সন্ধান আন্তরিক। এবং সেখান থেকেই ইষ্ট ভাবনায় যোগ হয় উপযুক্ত সন্তান কামনা। এ কামনা সর্বাংশে পার্থিব। তারই প্রকাশ আরো স্পষ্ট একটু পরের এই বাণীতে—'অতঃপর সন্তানকে তার মার কাছে নিয়ে গিয়ে স্তন্যপান করাবে, আর বলবে, 'হে সরস্বতি, তোমায় যে স্তনটি সর্বফলাধার, যা সবকিছুর পরিপোষক, যা দুধে পরিপূর্ণ, যা কর্মফল বিধাতা সুদাতা, এবং যা দিয়ে তুমি সকল বরণীয়কে পোষণ করো, সেই স্তনটি আমার সন্তানের পানের জন্য আমার ভার্যার স্তনে প্রবেশ করাও।'[৬৬] এই প্রার্থনা সংসারমুখী ও

মূলত প্রবৃত্তি নির্ভর। নেতির সাধনার এখানে কোনো ছায়াপাত ঘটে বলে মনে হয় না। তবে নেতির সাধনা কি সর্বাংশে জীবনবিমুখ? ইহজাগতিক মাত্রা কি এতে কিছুই নেই? মানুষে মানুষে সম্পর্ক-সম্বন্ধে অকল্যাণের প্রাচীর সব ভেঙে ফেলায় এর প্রেরণা কি কোনো কাজে আসে না? আলোচনার শেষ প্রান্তে এসে এই প্রশ্নে এবার ফিরে যাই।

আমরা দেখেছি, অন্তরে বাইরে যে সর্বব্যাপ্ত ব্রহ্ম, তাকেই উপনিষদ বলে প্রকৃত সত্য সত্যস্য সত্যম্। প্রত্যক্ষের জীবনলীলা মায়া। তা আড়াল করে সত্যকে। অতএব মোক্ষ লাভের উপায় তা থেকে মনকে সরিয়ে এনে তা পুরোপুরি ব্রহ্মে সমর্পণ করা। একনিষ্ঠ সাধনাই জাগাতে পারে তার উপলব্ধি। সংসারে আসক্তি তার অন্তরায়। অতএব বৈরাগ্য সাধনাই প্রকৃষ্ট পথ। এতে যে বিষয় বিমুখতা প্রশ্রয় পায়, তা অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু গভীরে অন্য এক উপলব্ধিও জন্ম নেয়। ব্রহ্মের প্রকাশ সব কিছুতে— রূপং রূপং প্রতিরূপে বভূব। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে পাই—তুমি নারী, তুমি নর, তুমিই কুমার ও কুমারী; তুমি জরাগ্রস্ত হলে লাঠি হাতে স্খলিত পায়ে চল, আবার তুমিই বিশ্বের সমস্ত প্রাণী হয়ে জন্মাও। তুমি নীল পতঙ্গ, তুমি সবুজরঙের লালচোখ-শুক পাখি, তুমিই বিদ্যুদ্‌গর্ভ মেঘ, ছয় ঋতু আর সমস্ত সাগর। তুমি আদি বিহীন ও সর্বব্যাপক— এই তোমা থেকেই নিখিল ভুবনের সৃষ্টি।[৬৭]

ব্রহ্ম যেহেতু এক ও অদ্বিতীয়, তাই এই সর্বভূতান্তরাত্মাও এক। শুধু বহু রূপে তার প্রকাশ। রূপের মায়া ছিন্ন করলে কোনো ভেদাভেদ আর থাকে না। মানুষে মানুষে জাতি ধর্ম বর্ণ বিভাজন সবই ভ্রান্ত সংস্কারের বিকার, এই বোধই দৃঢ়মূল হয়। 'সর্বজনের মনের মাঝে' তখন মুক্তি খোঁজা। এই মুক্তি তাদের শুদ্ধ সত্তার মৌলিক ঐক্যে। উপলব্ধি যখন এইখানে পৌঁছোয়, তখন দৃষ্টি প্রসারিত হয় সমগ্র মানব সমাজে। এবং মানব সমাজ থেকে প্রাণে-অপ্রাণে পরিপূর্ণ এই বিশ্বে। সব কিছুই তখন স্বয়ং, এবং সবাই সেখানে আপনার। এই উপলব্ধি অধ্যাত্মিকতা থেকে ফিরে এসে পার্থিব জীবনকেই আশ্রয় করে। সে জীবনে আত্মপর ভেদ উবে যায়। হিংসা-দ্বেষ-সাম্প্রদায়িকতা সব অর্থহীন মনে হয়। উপনিষদ তাই আরণ্যক জীবনে প্রস্থানের সঙ্গীত আর থাকে না। 'ভাই বলে ডাকি সবারে'—এই বাণীই বার বার উচ্চারিত হয়। শুধু পুরুষ নয়, নারী-পুরুষ মিলে সবাইকেই। এবং প্রত্যক্ষে অভিজ্ঞতার জগৎ সেখানে কর্মের বৃত্ত রচনা করে।

উপনিষদ কোনো একক ধর্মসংস্কারের কথা বলে না। একক মতবাদেরও না। মহৎ উপলব্ধির বিপুল ঐশ্বর্য নিয়ে এবং কালাক্রান্ত সব সীমাবদ্ধতা নিয়েও তা সমগ্র মানব সমাজের উত্তরাধিকার। প্রবহমান সব নদী যেমন নাম রূপ ছেড়ে সাগরে মেশে, ঈশ্বরভাবনার সব পথও তেমনি উপনিষদ জানায়, একই ব্রহ্মে এসে মিলে যায়। এই বোধ অধ্যাত্মিক; কিন্তু তার প্রায়োগিক রূপ ইহজাগতিক। এবং এখনও প্রবলভাবে প্রাসঙ্গিক। কল্যাণময় রূপ প্রত্যক্ষ করার জন্যে তার যে প্রার্থনা, তা আমাদের চেতনাতেও আলো জ্বালে।[৬৮] তবে এও মনে রাখি, উপনিষদ কোনো এক বিশেষ কালখণ্ডে ও বিশেষ পরিবেশে মানুষের জানা-অজানার সীমা ও বিস্তারকে পেছনে রেখে তার ওপরেই দাঁড়িয়ে থাকে। তার সব কথা অভ্রান্ত নয়। সব বিবেচনা ভিন্ন প্রেক্ষাপটে আজ প্রাসঙ্গিক নয়। জ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ সমাজকে বহু বিচিত্রভাবে বদলে দেয়। বাস্তব একজায়গায় থেমে থাকে না। একভাবেও থাকে না। তার সঙ্গে কোথাও কোথাও উপনিষদের তাল আর মেলে না। তাকে পরম ভেবে শুধু তার ওপরে নির্ভর করে চিন্তা ও কর্মের জগৎ গড়ে তোলার কথায় তাই উৎসাহিত হওয়া যায় না। তবু তাকে উপেক্ষাও করা যায় না। ঐতিহ্যের অন্বেষণই একমাত্র কারণ নয়। এই মর্ত্যভূমিতে আমাদের মুক্ত মানবিক শুভবোধকে উজ্জীবিত করায় এখনও তার কাছে আমরা হাত পাততে পারি। শূন্য হাতে ফিরি না। বরং সমৃদ্ধই হই।

টীকা ও নির্দেশিকা :

১। (ক) রমেশচন্দ্র মজুমদার, ভূমিকা, উপনিষদ অখণ্ড সংস্করণ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ১১

(খ) স্বামী নিখিলানন্দ, The Upanishads, George Allen & Unwin Ltd, London, 1963, p 13-23

২। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উপনিষদের দর্শন, উপনিষদ অখণ্ড সংস্করণ, পূর্বোক্ত; পৃ. ১৮

৩। (ক) স্বামী নিখিলানন্দ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

(খ) স্বামী গম্ভীরানন্দ; উপনিষদ গ্রন্থাবলী, প্রথম ভাগ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩৮১ (বাং, পৃ. ১)

৪। রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

৫। বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ২।৪।৩, ৪।৫।৪

৬। ওই, ৩।১।২

৭। ওই

৮। ওই, ৬।২।৭

৯। মহাভারতে খাণ্ডব দাহন এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার্য।

১০। যেমন, রামায়ণে বিশ্বামিত্রের আশ্রমে রাম-লক্ষ্মণের রাক্ষস বিতাড়ন, তারকা বধ।

১১। স্বামী গম্ভীরানন্দ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯

১২। বৃহদারণ্যকে উপনিষদ, ১।৪।১০

১৩। ছান্দোগ্য উপনিষদ, ১।১২।৪-৫

১৪। ওই, ১।১২।২

১৫। Mahadevan, T.M.P., The Upanisads, in *History of Philosophy Eastern and Western,* Vol I, Ministry of Education, Government of India, George Allen & Unwin Ltd, London, 1967, p 57

১৬। মুণ্ডকোপনিষদ, ১।২।৭-৮

১৭। বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৬।২, ছান্দোগ্য উপনিষদ, ১।৮; ৫।৩

১৮। বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ২।১

১৯। ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৫।১১

২০। বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৪।১-৪

২১। কৌষীতকি উপনিষদ, ১

২২। রমেশচন্দ্র মজুমদার, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১; *The History and Culture of the Indian People : The Vedic Age,* Allen & Unwin Ltd., London, 1951, pp. 280-82; F. E. Pargiter, *Ancient Indian Historical Tradition,* Oxford University Press, London, 1922, p. 176

২৩। রামায়ণে বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র বিরোধ ও পরে রামের হাতে পরশুরামের দর্পচূর্ণ ও তেজোহরণ এর উদাহরণ। পরশুরামের একুশ বার ক্ষত্রিয় নিধনের কাহিনী সংঘাতের চূড়ান্ত প্রকাশ।

২৪। ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৪।২।১-৫

২৫। পরশুরামের বংশ পরিচয়েও এমন ইঙ্গিত মেলে। ইনি বিশ্বামিত্রের বোনের পৌত্র। বিশ্বামিত্র জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ ছিলেন না। অনেক তপস্যা করে তা অর্জন করেছিলেন। তাঁর বোনও সেই সূত্রে ব্রাহ্মণ হয়ে যান, এমনটি যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। পরশুরাম ব্রাহ্মণ্য শক্তির ধ্বজা ওড়ালেও শুদ্ধ ব্রাহ্মণ রক্তের

তিনি অধিকারী ছিলেন না। দেখুন, রাজশেখর বসু, *বাল্মীকি-রামায়ণ, সারানুবাদ*, এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স, কলকাতা, ১৩৮৩ (বাং), পৃ. ৫৪

২৬। McNeill, W.H. *The Rise of the West, A History of the Human Community,* New American Library, Newyork, 1963; p. 327

২৭। রাজশেখর বসু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০

২৮। ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৪।৪।১-৫

২৯। বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৩।৬

৩০। ওই, ৩।৯।২৬; এমন উদাহরণ উপনিষদে ইতস্তত আরো আছে।

৩১। ওই, ৩।৮।১২

৩২। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ৫।১০

৩৩। বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ১।৩।২৮

৩৪। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ১।১

৩৫। ওঁ পূর্ণমদ: পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।।

৩৬। ঈশোপনিষদ, ১

৩৭। ওই, ৮

৩৮। ওই, ৫

৩৯। ওই, ১৬

৪০। ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৬।৮-১৬

৪১। কঠোপনিষদ, ২।২।৯

৪২। ওই, ২।২।১০

৪৩। ওই, ২।২।১১

৪৪। বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ২।১।২০
সত্যস্য সত্যমিতি প্রাণা বৈ সত্যং তেষা মেষ সত্যম।।
অর্থাৎ, ইনি সত্যের সত্য; প্রাণা:, বা ইন্দ্রিয়গণ সত্য, ইনি তাদের সত্য।

৪৫। ওই, ২।৫।১৯
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও পাই,
মায়াং, তু প্রকৃতিং বিদ্যাম্মায়িনন্তু মহেশ্বরম।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ।।
প্রকৃতিকে মায়া, এবং পরমেশ্বরকে মায়াধীশ বলে জানবে। সেই পরমেশ্বরেরই অবয়বরূপে কল্পিত বস্তুসমূহে এই অখিল জগৎ পরিপূর্ণ।

৪৬। ওই, ৩।৮।৮

৪৭। কঠোপনিষদ, ২।২।১৫

৪৮। বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৪।৫।১৫

৪৯। কঠোপনিষদ, ১।৩।১৪

৫০। মুণ্ডকোপনিষদ, ৩।২।৩

৫১। ঈশোপনিষদ, ৯

৫২। ওই, ১১

৫৩। ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৩।১৪।১

৫৪। তৈত্তিরীয় উপনিষদ, ২।৭

৫৫। বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ১।৪।৩

৫৬। ওই, ১।৪।১১-১৫

৫৭। ওই, ৫।২।১-৩

৫৮। ওই, ৬।৩।৬

৫৯। ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৬।৬।৫; ৬।৭।১-৬; আরো দেখুন, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *লোকায়ত দর্শন*, প্রথম খণ্ড, নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৬৯, পৃ. ২৫৩

৬০। বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ১।৫।২

৬১। ওই, ৩।৯।১১

৬২। ওই, ৬।৪।৭

সুকুমারী ভট্টাচার্য এটা যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এটা কি নিশ্চিত করে বলা যায়? বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য অবশ্যই প্রধান প্রচেতা, কিন্তু তিনিই একমাত্র নন। তত্ত্বজ্ঞানী আরো আছেন। তাঁরাও মূল্যবান কথা বলেছেন। এই বিধানটির দেখা পাই ষষ্ঠ অধ্যায়ে। সেখানে যাজ্ঞবল্ক্যের উপস্থিতি টের পাওয়া যায় না।

সুকুমারী ভট্টাচার্য, মন্থন, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০০০, পৃ. ৯৭-৯৮

৬৩। বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৬।৪।১৪-১৭

৬৪। ওই, ৬।৪।১৮

৬৫। শতপথ ব্রাহ্মণে গোমাংস ভক্ষণের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেও জানানো হয়েছে, যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, 'যদি কোমল হয়, তবে গোমাংস আমি ভোজনই করি।' দেখুন, উপনিষদ, অখণ্ড সংস্করণ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৮৭৬

৬৬। বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ৬।৪।২৭

মকবুল ফিদা হুসেনের দেবী সরস্বতি-চিত্রকর্ম বৈদিক এই রূপকল্পনা থেকে খুব দূরে সরে যায় না।

৬৭। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ৪।৩-৪

আগে দেখেছি, এই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেই বলা হয়েছে, জীবাত্মা নর নয়, নারী নয়, নপুংসকও নয়, অথচ এখানে বলা হচ্ছে, তুমিই ওই সব। মনে হতে পারে, এ স্ব-বিরোধিতা, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তা নয়। দুই বিপরীত দিক থেকে ব্রহ্মকে ও তার প্রকাশকে দেখার ফলে আমাদের চেতনায় দুই রকম ছবির সৃষ্টি।

৬৮। স্বামী বিবেকানন্দের ব্যাখ্যা প্রণিধানযোগ্য : Another peculier idea of Vedanta is that we must allow this infinite variation in reiligious thought and not try to bring everybody to the same opinion, because the goal is the same. As the Vedantist says in his poetical language : 'As so many rivers, having their source in different mountains, rock down, crooked or straight and at last come into the ocean, so all these various creeds and religions, taking their start from various standpoints and running through crooked or straight courses, at last come unto thee'.

দেখুন, Sale, John (ed), *What Religion is— in the words of Swami Vivekananda*, Phoenix House Ltd., London, 1962, p. 33.

অন্বেষায় কলিঙ্গ : যুগে যুগে দেশে দেশে

সুজিত কুমার আচার্য

উপমহাদেশীয় ভারত ভূখণ্ডে এমন অনেক স্থান নাম পাওয়া যায় যেগুলি দু'আড়াই হাজার বছর আগেও যে অঞ্চলে অবস্থিত ও যে নামে পরিচিত ছিল, আজও তাদেরকে সে অঞ্চলে এবং সে নামেই বা প্রায় সে নামেই পাওয়া যাচ্ছে। যেমন— গান্ধার (কান্দাহার), তক্ষশীলা, উজ্জয়িনী, কুরুক্ষেত্র, কোসাম্বী, বারাণসী, তোষালী (ধৌলী) ইত্যাদি। কিন্তু স্থান নাম বিচারে এদের মধ্যকার সর্বপ্রাচীনেব পূর্ববর্তী হলেও 'কলিঙ্গ' এই স্থান নামটি কেবল অন্ধ্র-উড়িষ্যাব সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলে সীমিত না থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের নানা প্রান্তে বিভিন্ন যুগে অস্তিত্বের চিহ্ন নিয়ে হয় আজও বর্তমান রয়েছে, নয়ত কোনো এককালে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা সেই 'কলিঙ্গ' নামের স্থানগুলি বা তাদের একদা অস্তিত্বের প্রমাণগুলি যে যে কালে প্রকট হয়েছিল তা তুলে ধরব। তবে একটু ব্যতিক্রমী পদ্ধতিতে আমরা পদচারণা করব। এই অন্বেষায় আমরা বর্তমান থেকে অতীতের দিকে যাব।

এই অন্বেষায় আমরা সেই 'কলিঙ্গ' নামীয় স্থানের বা এলাকার ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, আর্থিক, নৃতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের যে সব পরিচয় এখনও লভ্য সেগুলোও তুলে ধরাব চেষ্টা করব। আমরা দেখতে চেষ্টা করব যে নিছক স্থান নাম হিসাবে 'কলিঙ্গ' ছাড়াও উপরোক্ত বিষয়গুলির তথ্যাদি থেকে এই 'কলিঙ্গ' অভিধাযুক্ত স্থান নামগুলির মধ্যে কোনো সাধারণ যোগসূত্র আছে কিনা, তাও।

এইসব পূর্বশর্তগুলি স্মরণে রেখেই 'কলিঙ্গে'র অন্বেষায় আমাদের যাত্রা শুরু কবা যাক।

কাল - খ্রিস্টিয় একুশ শতকের প্রারম্ভ
স্থান - অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ ও বহির্ভারতস্থিত বাংলাদেশ ও নেপাল

অন্ধ্ররাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বংশধারা নদীর মোহানায় রয়েছে সুপ্রাচীন সমুদ্রবন্দর কলিঙ্গপট্‌নম্। এই বন্দব থেকেই প্রাচীন ও মধ্যযুগে দলে দলে ভারতবাসী (মূলত কলিঙ্গ ও বঙ্গের) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশে দেশে বা দ্বীপমালায় অভিবাসিত হয়েছিল। সে সব দেশের কোথাও কোথাও তারা সেখানকার রাজ্যপাটেরও অধিশ্বর হয়ে যান। তাই সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতোদ্ভূত এই জনগোষ্ঠী 'কলিঙ্গী' বা তার স্থানীয় সংক্ষেপিত রূপ 'ক্লিঙ্' নামে পরিচিতি লাভ করেছিল।[১]

এরপর উড়িষ্যায় ঢুকে গঞ্জাম জেলার গড়বান্ধা থানায় 'কলিঙ্গ' নামে একটি গ্রাম পাওয়া যাচ্ছে। আবার ওই জেলারই পাতালপুর থানায় একটি গ্রামকে পাচ্ছি 'খলিঙ্গী' নামে।[২] বোঝা যাচ্ছে যে একটু ধ্বনি বিপর্যয় ঘটে 'কলিঙ্গ' কথাটিই 'খলিঙ্গী'তে রূপান্তরিত হয়েছে। গঞ্জামের পূর্বদিকের জেলা পুরীতেও একটি গ্রাম রয়েছে, যার নাম 'কলঙ্গা'। এখানেও 'কলিঙ্গ' কথাটিরই একটু রূপান্তর ঘটেছে। এর পর অপর দু'টি সমুদ্রোপকূলীয় জেলা কটক ও বালেশ্বরে কিন্তু 'কলিঙ্গ' নামে আর কোনো গ্রামের অস্তিত্ব নেই।

এবার পশ্চিমবাংলায় প্রবেশ করা যাক। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মন্দিরবাজার থানায় পাচ্ছি একটি 'কলিঙ্গ' গ্রামকে। উত্তর চব্বিশ পরগণার বাদুরিয়া থানাতেও একটি 'কলিঙ্গ' গ্রামের অবস্থান রয়েছে। আর একটু উত্তরে গেলে নদীয়া জেলার চাপরা থানায় আবার একটি 'কলিঙ্গ' গ্রামের অবস্থান পাওয়া যাচ্ছে।

বর্তমান কালে, অর্থাৎ একুশ.শতকে ভারতবর্ষের আর কোথাও 'কলিঙ্গ' নামক গ্রাম বা স্থানের অস্তিত্বের কথা জানা যায় না। কিন্তু ভারতভূখণ্ডের বাইরে নেপাল রাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে আবার 'খলঙ্গা' নামে পাঁচটি গ্রামের সাক্ষাৎ পাওয়া যাচ্ছে। গঞ্জাম জেলার 'খলিঙ্গী'র মতোই নেপালের এই 'খলঙ্গা' গ্রাম সমূহ যে 'কলিঙ্গ' কথাটিরই একটু রকমফের সেটা বুঝতে কোনো অসুবিধা নেই।

বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত, কিন্তু বৃটিশ শাসনাধীন দিনাজপুর জেলায় পাওয়া যাচ্ছে 'কলিঙ্গজুরা' গ্রামকে। 'কলিঙ্গ' শব্দটির সঙ্গে যুক্ত এই 'জুরা' কথাটি যে দ্রাবিড় 'জোর' (যার অর্থ 'স্রোতস্বিনী') কথাটিরই একটু পরিবর্তিত রূপ সেটাও সহজেই অনুমেয়।

যেহেতু প্রাচীন কলিঙ্গ দেশের অন্তর্ভূক্ত অন্ধ্র ও উড়িষ্যায় 'কলিঙ্গ' নামক স্থানগুলি অবস্থিত, সে কারণে সেই গ্রামগুলির বা তাদের অধিবাসীদের দ্রাবিড়ীয় উৎসের কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে না, তাই এসব স্থান সম্পর্কে সে আলোচনা অপ্রয়োজনীয়। সেই একই কারণে খ্রিষ্টিয় শতকের প্রারম্ভ কাল থেকে মধ্যযুগের অন্তিম কাল পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে, দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে বা মধ্যভারতে যে সমস্ত কলিঙ্গ নাম যুক্ত বা বিযুক্ত দ্রাবিড়ীয় রাজ্যপাট সমূহের অভ্যুদয় ও অন্তর্ধান ঘটেছিল সেগুলোও আমাদের আলোচনার পরিসরের মধ্যে পড়ে না।

এবার আসা যাক 'কলিঙ্গ' নামাঙ্কিত পশ্চিমবঙ্গের স্থানগুলির আলোচনায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মন্দিরবাজার থানান্তর্গত 'কলিঙ্গ' গ্রামটি একই নামের মৌজার অন্তঃপাতি (জে এল ৮০)। এই মৌজার ম্যাপে এখানকার ভূপ্রকৃতি এরকম : বাঁধান দীঘি (পুকুব নয়) তিনটি এবং মৌজার এলাকাটিতে খাল রয়েছে পাঁচটি। নিকটবর্তী নদীটির নাম মাতলা নদী।

এখানকার বর্তমান অধিবাসীদের প্রধান অংশের বৃত্তি হলো 'মীন চাষ'। আর এই বৃত্তিতে নিযুক্ত মানুষদের জাতিগত পরিচয় হলো 'তিয়র' বা ধীবর। এরা বৃত্তিতে মৎস্যজীবী কৈবর্তদেরই অংশ বিশেষ। তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন অধিবাসী হিসাবে যারা একদা কৈবর্ত নামে পরিচিত ছিল, বিংশ শতকে তারা নিজেদের মাহিষ্য বলে পরিচয় দেয়, এবং সে পরিচয় সামাজিকভাবে এবং সরকারিভাবেও স্বীকৃতি পেয়েছে।

উত্তর চব্বিশ পরগণার বাদুরিয়া থানার অন্তর্গত 'কলিঙ্গ' গ্রামটিরও মৌজার নাম 'কলিঙ্গ'। এই মৌজার ম্যাপে (জে এল ৪২) দেখা যায় যে এখানে বাঁধানো দীঘি আছে সাতটি এবং পুকুর আছে অন্যূন বারোটি। নিকটবর্তী নদীটির নাম ইছামতি। এখানকার অধিবাসীদের একটা অংশ এখনও ওই দীঘি ও পুকুরগুলি এবং নদীটিকে অবলম্বন করে মৎস্যজীবীর পেশায় নিযুক্ত।

নদীয়া জেলার চাপড়া থানার অন্তর্গত 'কলিঙ্গ' গ্রামটিও 'কলিঙ্গ' নামক মৌজায় অবস্থিত। ওই মৌজার ম্যাপে (জে এল ৩৪) আছে— তিনটি বাঁধান দীঘি; মৌজাটির তিনদিক বেষ্টন করে রয়েছে একটি খাল; এ এলাকার বিশেষত্ব হলো যে এখানে চারটি ডহর রয়েছে। অতি বিশালাকায় বিলকেই 'ডহর' বলা হয়। এ ছাড়াও মৌজাটিতে আরো তিনটি খাল রয়েছে।

তৎকালে প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার সরকার নব্বই বছর পূর্বে এই গ্রামটি পরিদর্শন করে লেখেন, '...গড়ের উত্তর দিয়া কলিঙ্গের বিল প্রবাহিত। Bengal Revenue Settlement-এর Record-এ কলিঙ্গের নিচে বাহিত একটি নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই নদীর চূর্ণী নদীর সহিত যোগ

ছিল। বিলের কাদায় খনন উপলক্ষ্যে সময় সময় নৌকার খোল, মহিষের গাড়ি, কুম্ভীরের কঙ্কাল প্রভৃতি প্রোথিত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। কলিঙ্গের জমিদার শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার হালদার বি এ মহাশয়ের মুখে একথা *শুনিয়াছি।*'[৩]

সম্ভবত বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই কলিঙ্গ এলাকাটিতে বহু জলাধার ছিল এবং সেগুলি নিশ্চিতই মৎস্যপূর্ণ ছিল বলেই নৌকার খোলের অবশেষের সঙ্গে পাওয়া গেছে কুমীরের কঙ্কাল এবং মৎস্য লোভেই যে সেখানে 'কুম্ভীরের' (নিশ্চিতই মৎস্যভূক 'ঘড়িয়াল') আগমন ঘটেছিল সেটা নিশ্চিত। আজও স্থানীয় এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে মৎস্যজীবীদের যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া যায়।

●

বাংলাদেশেও 'কলিঙ্গ' নামাঙ্কিত একটি গ্রাম পাওয়া যাচ্ছে। বৃটিশ শাসনকালের দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ থানার অন্তর্গত একটি গ্রামের নাম 'কলিঙ্গজুরা'। ১৮৮১ সালের সেনসাস সম্পর্কিত এক মুদ্রিত সরকারি দলিলে এই স্থান নামটি পাওয়া গেছে। (তথ্যসূত্র ৬খ দ্রষ্টব্য)।

২০০৪ সালের মে মাসে নিবন্ধকারের গোচরে আসা এই স্থানটির মৌজার মানচিত্র এতাবৎ অলভ্য হওয়ায় ঐ এলাকার আর্থ-ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলা গেল না। কিন্তু ঐ 'কলিঙ্গ' নামটির উপান্তে 'জুরা' কথাটি যে অনিবার্যভাবে জলধারা জ্ঞাপক দ্রাবিড়ীয় 'জোর' কথাটিরই একটু বিবর্তিত রূপ সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে বলে মনে হয় না। সে কারণে সন্দেহাতীতভাবে বলা যায় যে ঐ গ্রামটির পত্তনিকারকেরা কেবল 'কলিঙ্গ' দেশের গর্বিত স্মৃতিবহণকারীই ছিলেন না, তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহে প্রধানতম অবলম্বন দিক জলধাবা বা নদী। নদীনির্ভর জীবিকাশ্রয়ী ছিলেন বলেই 'কলিঙ্গ' কথাটির উপান্তে 'জুরা' কথাটি যুক্ত করেছিলেন।

অন্যত্র বিশদভাবে দেখানো হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গের 'কলিঙ্গ' নামাঙ্কিত গ্রাম সমূহ যে সব এলাকায় অবস্থিত সে সব এলাকায় অবশ্যম্ভাবীভাবে জলধারা বা জলাশয়ের দ্রাবিড়ীয় প্রতিরূপ যুক্ত গুচ্ছ গুচ্ছ গ্রাম পাওয়া যায়। আর এই দ্রাবিড়ীয় প্রতিরূপগুলি হলো : জোর, জুর, জুরা, জুরী, জোবা, জুরিয়া; জোল, জুল, জোলা, জুলী; (দ্রাবিড় 'পুষ্কর' শব্দ থেকে নিষ্পন্ন) পুখব, পাখুব, পুখরিয়া, পুখুরিয়া, পাখুরিয়া, পোখর, পোখরা পোখরা প্রভৃতি (তথ্যসূত্র ৫৭ দ্রষ্টব্য)।

দিনাজপুর জেলার এই 'কলিঙ্গজুরা' গ্রাম নামটির উপান্তে স্থিত 'জুরা' কথাটি নিয়ে আলোচনা নিশ্চিতই অবান্তর বিবেচিত হবে না। বলাবাহুল্য এই উপান্ত শব্দ 'জুরা' দ্রাবিড়ীয় 'জোর' শব্দটিরই একটু বিবর্তিত রূপ। কিন্তু এই 'জোর'-জাত উপান্ত শব্দ সমন্বিত গ্রাম নামগুলির ভৌগোলিক ব্যাপ্তি আমাদের বিস্ময়ের উদ্রেক করে। উপমহাদেশীয় ভারতের পূর্ব প্রান্তে বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত বৃটিশ শাসনকালীন রংপুর জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার সন্নিহিত অঞ্চলে রয়েছে 'খাজুর' গ্রাম। বাংলাদেশের যশোহর জেলাতেও রয়েছে একটি 'খাজুরিয়া' গ্রাম। ভারতের নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর থানায় আছে 'খাজুরী' গ্রাম। আবার মধ্য-উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলায় গঙ্গার পাড়ে রয়েছে 'খাজুরিয়াঘাট'। লাগোয়া জেলা পূর্ণিয়াতে রয়েছে 'খাজুরী' গ্রাম। মেদিনীপুর জেলাব বিভিন্ন প্রান্তে 'খাজুরী' বা 'খেজুরী' অভিধা নিয়ে তিনটি গ্রাম রয়েছে। পাশ্ববর্তী পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুরে রয়েছে 'খাজুরা' গ্রাম। উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলাতেও রয়েছে 'খাজুরিয়া' গ্রাম। আর পূর্বতন বিহার রাজ্যের সাঁওতাল পরগণা জেলাতে দুটি গ্রামের অভিধা হল 'খাজুরী', অপর দুটির অভিধা 'খেজুরী', আর অন্যূন বারোটি গ্রাম 'খাজুরিয়া' অভিধা নিয়ে বিদ্যমান। (বাংলাদেশ ও সাঁওতাল পরগণার জন্য তথ্যসূত্র ৬ক, খ ও গ দ্রষ্টব্য, বাকী ভারতস্থ গ্রামগুলির জন্য ১৯৮১ সালের সেনসাস রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)।

নেপাল রাষ্ট্রের 'ধনুষা' জেলাতেও 'খাজুর চান্‌হো' নামে একটি গ্রাম রয়েছে। এমনকি বর্তমানে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্তর্গত বালুচিস্তানের সারওয়ান জেলাতেও 'খাজুরী' নামে একটি গ্রামকে পাওয়া যাচ্ছে। ১৯০৭ সালের Baluchistan Gazetteer-এর ৪৩ পৃষ্ঠায় আছে, "Traces of ancient water channels have been found in Khajuri and Zarakhi." ঐ গেজেটিয়ারের বিভিন্ন অংশে রয়েছে যে সেখানে বহু স্থানেই বিস্ময়কর কৌশলে নির্মিত জলপ্রবাহ ব্যবস্থার প্রত্নসাক্ষ্য পাওয়া গেছে। বছরে গড় ৭/৮ ইঞ্চি বৃষ্টিপাতযুক্ত বালুচিস্তানের সারওয়ান জেলায় অত্যন্ত সীমিত সমতল এলাকায় উচ্চমানের জলসেচ নির্ভর কৃষির একদা অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে ব্রাহুইভাষী অধ্যুষিত ঐ এলাকায় ব্রাহুইভাষীদের পূর্বপুরুষরা অভিবাসিত হওয়ার আগে কোনও এক সমৃদ্ধ কৃষি অঞ্চলের অধিবাসী ছিল। কিন্তু একই ভৌগোলিক তথা আবহাওয়ায় অবস্থানকারী বালোচ উপজাতিরা কিন্তু আদ্যন্ত যাযাবরীই থেকে গিয়েছে। সঙ্গত অনুমান যে কোনও কারণে সেচের জলের উৎস্য শুকিয়ে যাওয়ার পরই সমতলবাসী কৃষিজীবি ব্রাহুইভাষীরা কৃষিজীবন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল। তবে ব্রাহুইদের রাজ্য কালাতের মাকরাণ উপত্যকায় ব্রাহুই উপজাতির সনগুড়ি নামক অংশটি কিন্তু এখনও কৃষিজীবিই রয়ে গেছে। দ্রাবিড়ীয় 'গুড়ি' উপান্ত শব্দ যুক্ত এই উপজাতিটির নামটিও লক্ষণীয়। ঐ একই এলাকায় 'লগুড়ি' নামক আর একটি উপজাতিও বাস করে। (বহু উপজাতিকে নিয়ে গঠিত ব্রাহুইদের যে চারটি উপজাতিকে core হিসাবে গণ্য করা হয় তাদের মধ্যে অন্যতম হলো 'সারওয়ান' গোষ্ঠী, তাদের নামানুসারেই জেলাটির নামকরণ হয়েছে)। একথা নিশ্চিতই তর্কাতীত যে জীবনযাত্রা নির্বাহে জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত ঐসব 'খেজুরী, খাজুরি, খাজুর, খাজুরা, খাজুরিয়া' গ্রাম সমূহ পাকিস্তানে, ভারতে, নেপালে বা বাংলাদেশে যারা পত্তন করেছিল, আর্থ-সামাজিকভাবে তারা সকলেই কোনও কালে দীর্ঘ সময় ধরে একই ভৌগোলিক অঞ্চলে সহাবস্থান করত। আর তারা সকলেই কৃষিকাজে একই রকমের কৃৎকৌশলের ব্যবহারী ছিল এবং একই নামে সে সব কৃৎকৌশলকে অভিহিত করত। কিন্তু কোনও এক ঐতিহাসিক কারণে একসময় তারা বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু সর্বত্রই তারা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল কৃষিতে প্রযোজ্য একই রকমের কৃৎকৌশল। আর সে কারণেই 'খেজুর, খাজুরি, খাজুরিয়া, খাজুর' নামধেয় গ্রাম সমূহকে ভারতে, পাকিস্তানে, নেপালে ও বাংলাদেশে আজও পাওয়া যাচ্ছে।

পরবর্তী এক অনুচ্ছেদে সাঁওতাল পরগণার পশ্চিমবঙ্গীয় প্রান্তে অঙ্গাঙ্গীভাবে অন্বিত দুটি দ্রাবিড়ভাষী গোষ্ঠী নিয়ে আলোচনা থাকবে। এরা হলো কুরুখভাষী ওঁরাও এবং মালতোভাষী মালপাহাড়ী। আবার এদের সঙ্গে ভাষাগতভাবে ধন্যাত্মক বিবেচনায় একই গোষ্ঠীর মানুষ হলো বালুচিস্তানের ব্রাহুইভাষীরা। সঙ্গত অনুমান যে এই তিন ভাষাতেই খাজুর, খেজুরী, খাজুরী ইত্যাদি জলপ্রবাহ সম্পর্কিত অভিধা যুক্ত গ্রামের নামকরণ হয়। সে কারণেই কুরুখ ও মালতোভাষীদের বর্তমান কেন্দ্রিয় অঞ্চল সাঁওতাল পরগণায় খাজুর-খেজুরী-খাজুরিয়া গ্রাম সমূহের এত আধিক্য। সে কারণেই নেপালের কুরুখভাষী ধানওয়ার বা ধাঙ্গরদের একদা অধ্যুষিত এলাকায় পাওয়া যায় 'খাজুরচান্‌হো' গ্রামকে। আর সেই একই কারণে বালুচিস্তানের সারওয়ান জেলার ব্রাহুইভাষী অধ্যুষিত এলাকায় পাওয়া যায় 'খাজুরী' গ্রামকে। আর এটাও তাই নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে মেদিনীপুর জেলার 'খেজুরী' গ্রাম তিনটি, নদীয়া জেলার 'খাজুরী', যশোহর জেলার 'খাজুরিয়া', দিনাজপুর জেলার 'খাজুর' এবং রংপুর জেলার 'খাজুরিয়া' নামক গ্রামসমূহ ঐ সব এলাকায় অভিবাসিত ঐ তিন ভাষা গোষ্ঠীরই কোনও না কোন অংশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

'কলিঙ্গজুরা' প্রকটিত দিনাজপুর জেলায় স্বভাবতই দু'শতের কাছাকাছি দ্রাবিড় উপান্ত শব্দযুক্ত বা সম্পূর্ণ দ্রাবিড় অভিধাযুক্ত গ্রামের অবস্থান রয়েছে। এদের মধ্য থেকে তিনটি স্থান নামের বিশেষত্ব

নিয়ে কিছু আলোচনা প্রাসঙ্গিক। ঐ জেলার (বৃটিশ যুগের) পোর্শা থানায় 'কামদা' নামে একটি গ্রাম আছে। ঐ থানাতেই রয়েছে 'ইলম' (Ilam) গ্রাম ও 'ইলমপুর' গ্রাম। পাত্নীতলা থানায় আছে 'ইলমচক' গ্রাম। আবার পোর্শা থানাতে রয়েছে 'কৈবর্ত' গ্রাম. 'কেওটাল' নামে একটি গ্রাম রয়েছে রাণীশংকাইল থানায়। পাতিরাম থানায় আছে 'কেওটসর' গ্রাম। ঐ থানারই আর একটি গ্রামের নাম 'কৈবর্ত খণ্ড'। আর পূর্বতন দিনাজপুর জেলার ভারতীয় অংশের গঙ্গারামপুর থানায় আছে 'ইলমতৈর' (Ilamtair) গ্রাম, এবং কালিয়াচক থানায় আছে 'কেওটাল' গ্রাম।

সম্পূর্ণ দ্রাবিড় শব্দ 'ইলম' ও 'কামদা' নিয়ে নীতিদীর্ঘ আলোচনা পরবর্তী দুটি অনুচ্ছেদে থাকবে। তবে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর যে মানুষেরা 'কলিঙ্গজুরা' গ্রামটির পত্তন করেছিল, সেই একই গোষ্ঠীর মানুষেরা সন্নিহিত অঞ্চল সমূহে 'কেওট' অভিধাযুক্ত গ্রামগুলিরও পত্তনিকারক। সঙ্গত অনুমান যে এ সমস্ত গ্রামের পত্তনিকারকেরা আদিতে ছিল প্রাচীন 'কেট্রভোগের' নৌজীবী মানুষ। তাই তাদের পত্তনিকৃত গ্রাম নামে তারা তাদের আদি বৃত্তি বিজ্ঞাপিত করেছিল। ঐ অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবের কালে কয়েকটি নতুন গ্রামের পত্তনের সময় তারা 'কেওট' কথাটির সংস্কৃত রূপ 'কৈবর্ত' কথাটি ব্যবহার করে থাকতে পারে। আর 'কেবট্ট ভোগ' বা 'কৈবর্তভূমি' যে প্রাচীন কলিঙ্গদেশেই অবস্থিত ছিল সে সম্পর্ক বিশদ আলোচনা অন্যত্র করা হয়েছে (৫৩ সংখ্যক তথ্যসূত্র দ্রষ্টব্য)।

এবার নেপাল রাষ্ট্রের কলিঙ্গ নামাঙ্কিত স্থানগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

নেপালের পশ্চিমাংশে এখনও পর্যন্ত পাঁচটি স্থান পাওয়া যাচ্ছে 'খলঙ্গা' হিসাবে। তাদের একটি দর্চুলা জেলায়, একটি পিউথ্যান জেলায়, একটি সল্যান জেলায় একটি 'জাজোরকোট-খলঙ্গা' নামে জাজোর-কোট জেলায় এবং পঞ্চমটিকে 'ঝিমলি-খলঙ্গা' রূপে রৌলপা জেলায় পাওয়া যাচ্ছে। এই নামগুলি সংগৃহীত হয়েছে নেপালের কয়েকটি নির্বাচনী ক্ষেত্রের অধীনস্থ গ্রাম নামের তালিকা থেকে। এইগুলির বাইরেও বহু স্থান বা গ্রাম রয়ে গেছে। .নপালের আদমসুমারীর রিপোর্ট এখনও প্রবন্ধকারের গোচর হয়নি।

একটি প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে কোন তথ্যের ভিত্তিতে নেপালের ওই 'খলঙ্গা' অভিধাটিকে দ্রাবিড়ীয় 'কলিঙ্গ'-র বিবর্তিত রূপ হিসাবে গ্রহণ করা হলো? এবার সে আলোচনায় আসা যাক।

বিস্ময়কর তথ্যটা হলো যে, নেপালে এখনও যে একটি দ্রাবিড়ভাষী নরগোষ্ঠীকে পাওয়া যায় তারা বাস করে নেপালের সেই পশ্চিমাংশেই, যেখানে 'খলঙ্গা' নামধেয় গ্রামগুলি আজও বর্তমান। এই দ্রাবিড়ভাষী নরগোষ্ঠীর নাম হলো ধানওয়ার বা ধাঙ্গর। (ভারতে মহারাষ্ট্র ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে[৪] দ্রাবিড় সম্পর্ক-বিহীন 'ধাঙ্গর' এবং উত্তর বিহারে দ্রাবিড় সম্পর্কযুক্ত 'ধাঙ্গর' জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা করে দেখাতেই সম্ভবত নেপাল সরকারের দলিল সমূহে এদেরকে ধানওয়ার বলা হয়। কিন্তু নেপালেরই নৃতত্ত্ব তথা ভাষাতত্ত্বের আলোচকরা কিন্তু এদের 'ধাঙ্গর' বলেই অভিহিত করেন)। এদের সম্বন্ধে নেপালের একটি প্রখ্যাত জার্নালে আছে, "The Danwar constitute one of the many indigenous tribal groups of Nepal. They have supposedly long but unrecorded and unresearched history in the country. The inner terrai and the river valleys of the Chure region and part of lower terrai are known as the traditional homelands of the Danwar people. ...Interestingly, Danwar settlements are found almost always near small or big water systems... The Chure valley irrigated by the river Kamala in Sindhuli district could rightly called the home of Danwar people, although there

are offshoots of Danwar concentrations in the Western Sindhuli region and northern Sarlahi district inside the Chure system."[৫]

শ্রীযুক্ত প্রেম ক্ষত্রির প্রবন্ধটির শিরোনামে (তথ্যসূত্র দ্রষ্টব্য) উপত্যকাটির নাম রয়েছে 'কামদা' উপত্যকা হিসাবে। নেপালের ধানওয়ার বা ধাঙ্গরদের বাসস্থানের উপত্যকার নাম 'কামদা' কথাটি আমাদের মনযোগ আকর্ষণ করে। এই 'কামদা' কথাটিও একটি দ্রাবিড়ীয় শব্দ বলে বিবেচিত হবার লক্ষণাক্রান্ত। লক্ষণীয় যে 'কামদা' কথাটির মধ্যে 'কাম' শব্দটি রয়েছে। ভারত ভূখণ্ডে 'কাম' যুক্ত বহু স্থান নাম পাওয়া যায়। যেমন, আসামের কামরূপ, কামাখ্যা, কামাখ্যাগুড়ি। গোয়ালপাড়া জেলায় আছে ছটি 'কামগুড়ি' গ্রাম। কোচবিহার জেলায় কামতাপুর, অবিভক্ত বাংলাদেশের রংপুর জেলায় বিভিন্ন থানার অধীনে 'কামদেব' নামে অনুন দশটি গ্রাম ও তৎসহ কামবাড়ি গ্রাম, কামদেবপুর, কামদেবের ভিটা, কামাবাড়ি ইত্যাদি গ্রাম।[৬] আবার মধ্য যুগেও ভারতের অন্যত্রও যে 'কাম' শব্দযুক্ত স্থান নাম বা দেবস্থানের অস্তিত্ব ছিল সে সম্পর্কে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ P. C. Choudhury লিখেছেন, "It is suggested that there is evidence of Kāmarūpa-Kāmākhyā elsewhere than in Assam. The Padma Puran (Patala Khanda, V) states that Kāmākhyā Devi was the presiding deity of Ahicchatra, and the poet Mukakavi Sārbabhauma composed three works in honour of Kāmākhyā of Kanchipuram."[৭]

কেবল অহিছত্র বা তামিল দেশস্থিত কাঞ্চিপুরমে 'কামাখ্যা'র অবস্থিতি 'কাম' কথাটির দ্রাবিড়ীয় উৎস্য সম্পূর্ণত প্রামাণ্য করে না। আরও দক্ষিণে তেলেগু/কর্নট ভাষী এলাকার তুঙ্গাভদ্রা নদীতীরে একটি তীর্থকেন্দ্রিক রাজবংশের আবির্ভাব ঘটেছিল— যে বংশটি 'কামপিলা' রাজবংশ নামে খ্যাত। এই রাজ্য দিল্লি থেকে প্রেরিত আগ্রাসী তুর্কী সেনাদের সাময়িকভাবে প্রতিহত করতে সমর্থ হলেও, "In 1327, however, Mahmud Bin Tughlok overpowered the Kāmpila stronghold at Kammata."[৮]

ইতিহাসের এই বিবরণ থেকে 'কাম' কথাটির দ্রাবিড়ীয় উৎসাই শুধু প্রতিষ্ঠিত হলো তাই নয়। ওই 'কাম্মাতা' কথাটিরই একটু পরিবর্তিত রূপ 'কামতা' নামক যে কয়েকটি স্থানকে ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্বাংশে আজও পাওয়া যাচ্ছে তাদের প্রতিও আমাদের মনযোগ আকৃষ্ট না হয়ে পারে না।

স্বাধীনতা-পূর্ব বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলায় 'বড় কামতা' নামে একটি গ্রাম আছে যেটাকে প্রখ্যাত প্রত্নঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় প্রাচীন সমতট রাজ্যের রাজধানী হিসাবে সনাক্ত করেছেন।[৯] কোনো কোনো ভাষাবিদ মনে করেন যে, 'কুমিল্লা' কথাটির আদিরূপ ছিল 'কামিল্লা'। সে ক্ষেত্রে এই স্থান নামটি যে দ্রাবিড়ীয় সংস্কৃতির অবদান সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। এ অনুমান আরো দৃঢ় হয় যখন দেখি 'কুমিল্লা' শহরটির নিকটবর্তী দু'টি রেল স্টেশনের নাম হলো আখাউড়া ও কুলাউড়া। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে এই 'ড়া' যুক্ত স্থান নামসমূহ, যথা, বাঁকুড়া, চুঁচুড়া, বগুড়া, মাগুড়া, হাওড়া ইত্যাদি গ্রামসমূহ সংশয়াতীতভাবে দ্রাবিড়ভাষীদের দ্বারা পত্তনিকৃত। তাই কুমিল্লার 'বড় কামতা' গ্রাম নামটির উদ্ভব যে দ্রাবিড়ীয় পরিমণ্ডলে ঘটেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পরবর্তীকালে সমতট রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হলে 'কামতা' কথাটিকে সংস্কৃতায়িত করে 'কর্মান্ত বাসক'-এ রূপান্তরিত করা হয়ে থাকলেও সাধারণ মানুষের কাছে এটি পূর্বাপর 'কামতা'ই রয়ে গেছে।[১০] সেই একই দ্রাবিড়ীয় পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার 'কামদা' গ্রামটিরও উদ্ভব হয়েছিল। সেই বিচারেই নেপালের দ্রাবিড়ভাষী ধানওয়ারদের অধ্যুষিত 'কামদা' উপত্যকাও যে দ্রাবিড় ভাষা-সংস্কৃতির প্রভাবাধীন এলাকা তাতেও কোনো সন্দেহ থাকার অবকাশ নেই বলেই মনে হয়।

নেপালের এই ধানওয়ারদের সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রেম ক্ষত্রির প্রবন্ধানুসারে দেখা যাচ্ছে যে চূরে নদীর অববাহিকায় এবং নিম্নতরাই অঞ্চলই ছিল তাদের আদি বাসভূমি। সঙ্গত অনুমান যে সেখান থেকেই তারা বিভিন্ন দিকে কিছু দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল, নেপালের অভ্যন্তরে ও সংলগ্ন ভারতীয় এলাকাতেও। শ্রীযুক্ত ক্ষত্রী জানাচ্ছেন যে এঁদেরকে সেই সব অঞ্চলেই অবশ্যম্ভাবীরূপে পাওয়া যায় যেসব এলাকায় ছোটো ছোটো বা বড়ো আকারের জল সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আছে। তারা চূরে উপত্যকার কমলা (না কামলা?) নদী সেচিত সিন্ধুলী জেলা ও ওই জেলারই পশ্চিমাঞ্চলের উত্তরে অবস্থিত সরলাহি জেলার উত্তরাঞ্চলেও অধিষ্ঠিত। এই সিন্ধুলী জেলার দক্ষিণে ধনুষা জেলা অবস্থিত। আর সে জেলাতেই সেচ সম্পৃক্ত 'খাজুর' অভিধাযুক্ত গ্রামটি অবস্থিত। এ সব তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে প্রাচীনতম কাল থেকেই ধানওয়াররা কৃষিতে নিয়োজিত ছিল এবং কৃষির প্রয়োজনে জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণে অভিজ্ঞ ছিল।

পরবর্তীকালে নেপালের বহু নরগোষ্ঠীর মতোই ধানওয়াব বা ধাঙ্গরদের কিছু সংখ্যক মানুষ জীবিকার সন্ধানে পার্শ্ববর্তী ভারতের মির্জাপুর জেলায় অধিষ্ঠিত হয়। ১৯৮১ সালে জনগণনায় এদের সম্বন্ধে প্রতিবেদনে আছে, "Considered the original inhabitants of Mirzapur and the adjoining districts of Bihar, they are also known as Oraon... They are agricultural community."[১১] এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে নেপালের ধানওয়াররাও ওরাওঁদের ভাষা কুরুখ ভাষা ব্যবহার করেন।

এই জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতেই ৯২১ খ্রিস্টাব্দে উৎকীর্ণ উত্তরমেরুর শিলালেখগুলির পাঠ থেকে জানা যাচ্ছে যে, তৎকালে দাক্ষিণাত্যের সে অঞ্চলের গ্রাম সভাগুলি কয়েকটি উপসমিতি দ্বারা পরিচালিত হতো। এই উপসমিতিগুলি স্থানীয় ভাষায় 'ভারিয়াম' নামে পরিচিত। এরকম একটি উপসমিতির নাম কলিঙ্গু ভারিয়াম (Kalingu Vārium)। T. V. Mahalingam এই উপসমিতির অনুবাদ করেছেন Sluice Committee রূপে।[১২]

সুপ্রাচীন কলিঙ্গ রাজ্যটি বর্তমান উড়িষ্যা-অন্ধ্রের সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত ছিল। সমগ্র দেশটি অসংখ্য নদী ও খাঁড়িতে পরিপূর্ণ ছিল। সেখানে কৃষির পূর্ণ বিকাশের কালে (অশোক কর্তৃক বিজিত হবার পূর্বেই) জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ একটি অত্যন্ত আবশ্যিক প্রক্রিয়া ছিল। সঙ্গত অনুমান যে কালক্রমে 'কলিঙ্গ' কথাটি জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের দ্যোতকরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সে কারণেই মনে হয় উত্তরমেরুর শিলালেখে জলধারা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা 'কলিঙ্গু' বলে অভিহিত হতো।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই নেপালের 'কামদা' উপত্যকার অধিবাসী দ্রাবিড়ভাষী ধানওয়ার বা ধাঙ্গরদের অধ্যুষিত এলাকার ওই কয়টি 'খলঙ্গা' গ্রামের অবস্থিতিকে বিচার করতে হবে। সঙ্গত অনুসিদ্ধান্ত যে জলনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা থেকেই ওই পাঁচটি গ্রাম 'খলঙ্গা' অভিধা ধারণ করেছে, যার সম্ভাব্য আদিরূপ ছিল কলিঙ্গ বা কলিঙ্গু বা কলঙ্গা। আবার ওই গ্রাম পাঁচটির মধ্যে একটির নাম— 'জাজোরকোট-খলঙ্গা'— আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভাষাচার্য সুনীতি চট্টোপাধ্যায় বলেছেন যে, 'জোর' কথাটি অবিমিশ্রভাবেই একটি দ্রাবিড় শব্দ এবং তা স্রোতস্বিনীকেই বোঝায়।[১৩] এরই একটু পরিবর্তিত রূপ কটক শহরের 'কাটজুরী' নদী। দিনাজপুর জেলার 'কলিঙ্গজুরা' এরই রূপভেদ মাত্র। শ্রীচট্টোপাধ্যায় অন্যত্র লিখছেন যে, 'কোট্টৈ' কথাটি একটি দ্রাবিড় শব্দ[১৪] যার অর্থ সুরক্ষিত রাজালয়। বোঝা যায় যে এ কথাটি থেকেই 'কোট', 'কূট' ও 'কটক' কথাগুলির উদ্ভব হয়েছে, যার প্রতিটিরই আভিধানিক অর্থ হলো সুরক্ষিত রাজালয় বা সুরক্ষিত দুর্গ। (আর এই 'কোট্টৈ'র যে রক্ষক সে হলো কোট্টপাল যা থেকে এসেছে 'কোটাল' শব্দটি, যার অর্থ হলো দুর্গরক্ষক।) এ সমস্ত বিচারেও সমগ্র গ্রাম নামটির দ্রাবিড়ীয় উৎস্য স্বতই প্রতিষ্ঠিত।

প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাসবিদ শ্রীরামশরণ শর্মা লিখছেন, 'ধাঙ্গর দ্রাবিড়ীয় কুরুখভাষার একটি বাগধারা এবং এটি ছোটনাগপুরের ওরাওঁদের কথ্য ভাষার অন্তর্গত। এটি নেপালের তরাই জেলাগুলিতে বিদ্যমান। ...এই বাচনিক ভাষা উত্তর বিহারের মধুবনী জেলার ধাঙ্গর জনগোষ্ঠীর মানুষদেরও কথ্য ভাষা।'[১৫] কিন্তু ভারতের ১৯৮১ সালের আদমসুমারীর প্রতিবেদন[১৬] অনুযায়ী ধাঙ্গর জনগোষ্ঠীর ভাষা হিন্দী বলেই উল্লেখিত হয়েছে। মনে হয় বহির্জগতে তারা হিন্দীভাষা ব্যবহার করলেও নিজেদের মধ্যে কুরুখ (ওঁরাওঁদের) ভাষা ব্যবহার করে।

আর নেপালে এই দ্রাবিড়ীয় ভাষাটির অস্তিত্ব সম্পর্কে Leo Troyer লিখছেন. 'Recent studies by SIL[১৭] scholars confirmed what Dor Bahadur Bista[১৮] had posited that the Dhangar Language is Dravidian.'

নেপালের ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত Centre for Nepal and Asian Studies-এর Journal-এ (Vol 22 No 2) ১৯৯১ লোকগণনা অনুযায়ী তথাকার বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোকসংখ্যা (Ethnic population) দেওয়া আছে। তাতে দেখা যায় যে নেপালে 'কেওট' নামে একটি জাতি আছে যাদের জনসংখ্যা হলো ১০১৪৩২ জন, যেটা ধানওয়ার বা 'ধাঙ্গর'দের জনসংখ্যার প্রায় দ্বিগুণ। ভারতীয় উপমহাদেশের অনত্রও যেখানে কেওটদের দেখা যায়, তারা সর্বত্রই হয মৎস্যজীবী অথবা নৌজীবী। বলা বাহুল্য যে, নেপালের কেওটরাও আদিতে কৈবর্ত বা কেওটরূপে কলিঙ্গের অন্তর্গত কেবট্ট ভোগে জলনির্ভর জীবিকাশ্রয়ী ছিল। নেপালের কেওটরা বর্তমানকালে যে বৃত্তিতেই নিযুক্ত থাকুক না কেন, জাতিগত বৃত্তিতে তারা মৎস্য বা নৌজীবী হিসাবেই সেখানে পরিচিত।

সঙ্গত অনুমান যে একদা দাক্ষিণাত্য নিবাসী ওরাওঁদের অধস্তন পুরুষ ধানওয়ার বা ধাঙ্গররা যে এক ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নেপালে অভিবাসিত হয়েছিল, সেই একই ঐতিহাসিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে দাক্ষিণাত্যের কেওটরাও নেপালে অভিবাসিত হয়েছিল। যেহেতু অভিবাসন পূর্বে দাক্ষিণাত্যের ওরাওঁরা নিঃসন্দেহে কৃষিজীবী ছিল, তাই তরাইয়ের জঙ্গলে অভিবাসিত হবার পর সে জঙ্গলের উত্তরাঞ্চলের 'কামদা' নদীর উপত্যকায় চলে গিয়ে তাবা সুস্থিত কৃষিজীবীর জীবনযাপন করে চলেছে। আর সেই সুবাদেই জলপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের দ্যোতক 'কলিঙ্গু' কথাটি দিয়ে কতকগুলি গ্রামের পত্তন করেছিল। আর যেহেতু তাদের অবস্থান স্থল একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে বহু শতাব্দী ধরে সীমিত থেকেছে, এবং যেহেতু আর্থ-সামাজিক প্রথা-প্রকরণে সে অঞ্চলে তারাই অগ্রগণ্য, তাই তাদেরকে তাদের আদি মাতৃভাষা ভুলতে হয়নি। কিন্তু যেহেতু মৎস্য বা নৌজীবীরা জীবিকার প্রয়োজনে নদীর সমগ্র প্রবাহপথেই বিচরণ করে বেড়ায়, সে কারণেই তারা কোথাও সংঘবদ্ধভাবে কোনো একটি নির্দিষ্ট স্থান বা অঞ্চলে আবদ্ধ থাকতে পারে না। নেপালেও সেটা ঘটেছিল বলেই কেওটদের নেপালের বহু নদী অববাহিকাতেই বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যাচ্ছে। আর সে কারণেই তারা তাদের আদি মাতৃভাষা ত্যাগ করে স্থানীয় ভাষাকেই মাতৃভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছে। এ ঘটনা কেবল নেপালের কেওটদের ক্ষেত্রেই ঘটেনি— ভারতীয় উপমহাদেশের যে অঞ্চলেই তাদের পাওয়া যায় তার সবক্ষেত্রেই একই ঘটনা ঘটেছিল। সে কারণেই বর্তমানকালের কোনো দেশের কেওটই (ভারত বা বাংলাদেশের) দ্রাবিড়ভাষা গোষ্ঠীর কোনো ভাষা ব্যবহার করে না।

মনে হয় নেপালের ধানওয়ার বা ধাঙ্গরদের দ্রাবিড়ীয় উৎস্য সম্পর্কে আর সন্দেহের অবকাশ নেই। আর এটাও সম্ভবত প্রতিষ্ঠিত হলো যে, জলপ্রবাহ নির্ভর জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে তারা প্রাচীন কলিঙ্গভূমির প্রথানুসারী ছিল। সর্বশেষে এটাও লক্ষণীয় যে, একুশ শতকেও অন্ধ্র, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ

এবং নেপালে যেসব 'কলিঙ্গ' নামাঙ্কিত স্থানগুলি পাওয়া যাচ্ছে তার সবকটিরই অধিবাসীরা জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে অতীতেও জলনির্ভর ছিল এবং বর্তমানেও প্রধানত তাই আছে।

কাল - ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দ
স্থান - কোলকাতা

এই সময়সীমার মধ্যে সরকারি দলিলে, সংবাদ মাধ্যমে বা সাহিত্য কর্মে স্থান নাম হিসাবে কলিঙ্গের কলকাতায় অস্তিত্ব সম্পর্কে বহু উল্লেখ থাকার সম্ভাবনা। তারমধ্যে আমরা কেবল কয়েকটি কোলকাতার মানচিত্র, একটি সংবাদ সূত্র এবং একটি সরকারি দলিলে 'কলিঙ্গ'-এর অবস্থান নিয়ে আলোচনা করব।

প্রথমে কোলকাতার মানচিত্রের প্রসঙ্গে আসা যাক। আমাদের অবলম্বিত কালক্রম অনুসারে যেসব কোলকাতার মানচিত্রে কলিঙ্গের উপস্থিতি পাওয়া যাচ্ছে তার তালিকাটি নিম্নরূপ :

১৯০৩ : Plan of City of Calcutta – এই মানচিত্রে আছে Colinga Bazar Street, Calinga Police Station এবং Colinga Bazar.

১৮৫২-৫৬ : The City & Environs of Calcutta – Including the Government Estate of Punchunnagram... ইত্যাদি – এই মানচিত্রে আছে Colingah নামক একটি বড়ো অঞ্চল, একটি Colingah Tank এবং একটি Colingah Street.

১৮৫৬ : Map of Calcutta – Showing the latest development as existed in 1856. এতে আছে কেবল Colinga Bazar Street.

১৮৫০ : Drainage Map of Calcutta 1850. এতে কেবল South Colinga Street-এর উল্লেখ আছে।

১৮২৫-৩২ : Plan of the City of Calcutta and its Environs 1825-32 (Lottery committee). এতে কেবল আছে Colinga Lane.

১৮১৭ : Map of the Suburbs of Calcutta, Surveyed in 1817. এতে আছে Colinga Gully.

১৭৯২-৯৩ : Map of Calcutta & its Environs – এতে আছে Colingah নামক বড়ো অঞ্চল, Colinga Bazar এবং Colinga Tank.

১৭৮৪-৮৫ Plan of Calcutta-এতে আছে Colinga নামক বড়ো অঞ্চল আছে, আর মানচিত্রে চিহ্নিত 48 নং স্থানের Reference জানাচ্ছে যে সেখানে ছিল Colingaha Bazar.

এই সমুদয় মানচিত্রে প্রদর্শিত কলিঙ্গ, কলিঙ্গ বাজার, কলিঙ্গ ট্যাঙ্ক, কলিঙ্গ স্ট্রিট বা কলিঙ্গ গলি—এর সবগুলিই বর্তমান তালতলা অঞ্চলের কোনোটি পশ্চিমে, কোনোটি বা দক্ষিণে আর কোনো কোনোটি পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল। বোঝা যায় যে এককালে এই সমগ্র এলাকাটি জুড়েই ছিল কলিঙ্গ গ্রাম, যেটার উল্লেখ আছে একটি সরকারি দলিলে[১৯] এবং যেটি আমাদের প্রবন্ধের পরবর্তী পর্যায়ে আলোচিত হবে।

এ তো গেল কোলকাতার মানচিত্রে কলিঙ্গের অবস্থান। এবার একটি সংবাদ মাধ্যমের 'কলিঙ্গ'-এর আলোচনায় আসা যাক। কোলকাতায় একটি বিরাট অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাসূত্রেই একটি সংবাদপত্রে কলিঙ্গের উল্লেখ হয়েছিল। আর এই সংবাদপত্রটি একটি অসাধারণ ঐতিহাসিক দলিল

রূপে বিবেচিত। এটি হলো ভারতে প্রকাশিত সর্বপ্রথম সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট', যার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন জেমস অগস্টাস হিকি। সংবাদপত্রটির প্রথম বছরেই, অর্থাৎ ১৭৮০ গ্রীষ্মের এক দুপুর ১১টায় বউবাজারে একটি আগুন লাগে।[২০] লেলিহান শিখায় আগুন ছড়িয়ে পড়তে পড়তে জনবাজার এলাকা পর্যন্ত সমস্ত খড়ের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। সেখান থেকেও সেটি আরো ছড়িয়ে পড়ে 'বেঙ্গল গেজেট' সম্পাদক হিকির 'কলিঙ্গি'-স্থিত বাড়িটির বহির্বাটী ভষ্মীভূত করে।

পর পর দু'টি সংখ্যা বেঙ্গল গেজেটে এই অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে বিশদ সংবাদ পরিবেশিত হয়। তবে আমাদের পক্ষে লক্ষণীয় বিষয়টি হলো যে তখনও কলকাতার ইংরেজ মহলে ফারুখসায়েরের সনদে দেওয়া বানানেই এই কলিঙ্গকে 'কলিঙ্গি' নামে অভিহিত করা হতো। কিন্তু পূর্বোক্ত কোলকাতার সমস্ত মানচিত্রেই এই 'কলিঙ্গি' রূপ পেয়েছে Colingah বা শুধু Calinga-এ।

শতবর্ষের বেশি সময় ধরে কোলকাতার ম্যাপে প্রদর্শিত কলিঙ্গের অবস্থানের সঙ্গে জলের বা জলনির্ভর জীবিকার্জনে নিযুক্ত মানুষদের কোনো চিত্র পাওয়া যায় না। সঙ্গত প্রশ্ন : সেক্ষেত্রে কোলকাতার এই 'কলিঙ্গ' নামক স্থানের অবস্থানের সঙ্গে প্রবন্ধের শুরুতে ব্যক্ত উদ্দেশ্যের কি সম্পর্ক?

এ সম্পর্কের পাথুরে প্রমাণ কিন্তু রয়ে গেছে একটি দলিলে। ১৭৪৫ সালে মোগল সম্রাট ফারুখসায়েরের প্রদত্ত সনদ অনুযায়ী ইংরেজ কোম্পানি কোলকাতার আশেপাশের ৩৮টি গ্রাম ক্রয় করেছিলেন। শ্রীযুক্ত নাযার সম্পাদিত গ্রন্থে আছে— List of Villages for which Emperor Farrukhsiar Granted the English Company permission to acquire Zamindary/Talukdari. এই তালিকার ৩১-তম নামটি হলো Colimba, যেটি কোলকাতা পাইকানের অন্তর্ভূক্ত এবং যার বার্ষিক খাজনার পরিমাণ ছিল তিনশত তিরাশী টাকা আট আনা এক পাই, এবং ওই তালিকার ৩৫তমটি হলো Jola Colimba, যেটি শুধু কোলকাতায় অন্তর্ভূক্ত এবং যার বার্ষিক খাজনার পরিমাণ ছিল একশত চৌদ্দ টাকা তিন আনা আট পাই। তাই শহর কোলকাতার অনেক দূরে অবস্থিত অর্থনৈতিক বিচারে অকিঞ্চিৎকর এই 'জলা কলিম্ব' ইংরাজদের কোনো মানচিত্রেই ঠাঁই পায়নি। এবং সন্দেহ হয় যে কোম্পানির অধিকার সময়েই ওই 'জলা কলিম্ব' গ্রামটি পরিত্যক্ত এবং জনশূন্য হয়ে গিয়ে থাকবে। তবে এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে ওই 'জলা কলিম্ব' গ্রামটিই প্রাচীনতম। আর গ্রাম নাম থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে কোলকাতার নিকটবর্তী কোনো জলাভূমিতেই ওই 'জলা কলিম্ব' গ্রামটির পত্তন ঘটেছিল। আমরা জানি যে কোলকাতার সমগ্র পূর্বাঞ্চল জুড়ে দিগন্ত বিস্তৃত লবণ হ্রদের অবস্থান রয়েছে। সেই লবণ হ্রদের একটি অংশ পূর্ব কোলকাতার বেলেঘাটাকে ছুঁয়ে আছে। তাই সঙ্গত অনুমান যে একদল মৎস্যজীবী তাদের জীবিকার্জনের ক্ষেত্র হিসাবেই 'জলা কলিঙ্গ' গ্রামটির পত্তন করেছিল। হয়তো একসময় একদল মৎস্যজীবী বেলেঘাটার পশ্চিমের ডাঙ্গা জমিতে 'কলিঙ্গ' নামে আর একটি গ্রাম পত্তন করেছিল। কিন্তু দু'টি গ্রাম নামের মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে তারা প্রথমটির ভূপ্রকৃতি অনুযায়ী তার নতুন নামকরণ করেছিল 'জলা কলিঙ্গ' রূপে। কিন্তু উভয় গ্রামের ক্ষেত্রে একই নামকরণ থেকে বোঝা যায় যে বৃত্তিগতভাবে তারা নিশ্চিতই কৈবর্ত বা কেওট ছিল, আর সংস্কৃতিগত ভাবে তারা ছিল প্রাচীন কলিঙ্গের গর্বিত স্মৃতিবহণকারী।

কাল - ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৯৫ এবং ১৬০৪-এর মধ্যস্থ কোনো বর্ষ।
স্থান - মেদিনীপুর, গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী অঞ্চল, কোচবিহারের উত্তরাঞ্চল

ফারুখসায়েরের ১৭৪৫ সালের ফরমানের উল্লিখিত কলিম্ব ও জলা কলিম্বের উল্লেখের পর ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আর কোনো সূত্রে কলিঙ্গের সংবাদ পাওয়া যায় না। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজ

ভৌগোলিক Van Den Broucke বাংলাদেশের একটি মানচিত্র অঙ্কন করেন। এই মানচিত্রটির কথা মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস রচয়িতারা সকলেই উল্লেখ করেছেন। ১৩০৮ সালে মুদ্রিত শীবচন্দ্র শীল[২১] সম্পাদিত 'গোবিন্দ চন্দ্র গীত' নামক কাব্যোপাখ্যানের ১২১ পৃষ্ঠায় ৬০৬ সংখ্যক শ্লোকে এক 'কলিঙ্গ ভূপতি'র উল্লেখ আছে। শীল মহাশয় ঐ পৃষ্ঠার পাদটীকায় ওই কলিঙ্গ ভূপতির রাজ্যটি সম্পর্কে লিখছেন, "ব্রৌকি (Broucke) কৃত ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দের বাংলার মানচিত্রে দুই কলিঙ্গ বন (Karinkia Van) লিখিত আছে। প্রথম কলিঙ্গবন কোচবিহার ও আসামের উত্তরে অবস্থিত; দ্বিতীয় কলিঙ্গবন মেদিনীপুরের নিকট কাঁসাই ও ধামরা নদীর মধ্যে নিবিষ্ট।... প্রথমোক্ত ও শেষোক্ত বনের বানান একরূপ হওয়ায় প্রথমোক্ত বনকে কলিঙ্গ বলিয়া চিনিতে পারা যাইতেছে। এই দুই কলিঙ্গ ব্যতীত ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার মধ্যস্থিত দেশের নামও ওইরূপ বানানে কলিঙ্গ বলিয়া চিহ্নিত আছে।"

স্বাভাবিকভাবেই মানচিত্রে স্থান নাম থাকে, কিন্তু তথাকার অধিবাসীদের সম্পর্কে কিছুই থাকে না। তবে Van Den Broucke-এর মানচিত্র প্রমাণ করেছে যে সপ্তদশ শতকের শেষার্ধেও বঙ্গীয় ভূখণ্ডে অন্তত তিনটি স্থান ছিল যাদের নাম ছিল 'কলিঙ্গ' শব্দযুক্ত। এই তিন অঞ্চলেরই আর্থ-সামাজিক-ভৌগোলিক বিশেষত্ব আমাদের পরবর্তী আলোচনায় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কববে বলেই এই মানচিত্রের কথাটি স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

১৬২৭ খ্রিস্টাব্দের একটি দলিলে কোচবিহার-কামরূপের উত্তরে একটি কলিঙ্গ দেশেব সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। স্পষ্টতই এই স্থানটিকেই Van Den Broucke তাঁর অঙ্কিত মানচিত্রে Karinkiya Van রূপে চিহ্নিত করেছেন। ১৬২৫ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগীজ পাদ্রী স্টিফেন ক্যাসিলা ভূটান রাজ দর্শনে হুগলি থেকে এক পদযাত্রা করেছিলেন। "ক্যাসিলার ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবরের পত্রে লিখিত আছে যে... তাঁহারা লক্ষ্মীনারায়ণের এবং সত্রাজিতের পরিচয়পত্র সহ ৮ই অক্টোবর হাজো (Azo) ত্যাগ করিয়া সেই মাসের ২১ তারিখে বিহাবে উপস্থিত হন। সেই সময় 'বিহাব' নগর এক নদীতীবে অবস্থিত ছিল এবং বন্যার আতিশয্যে নগরের বিশেষ ক্ষতি হইতেছিল বলিয়া সেই নদীবই একটি উপনদীব (Tributary) তীরে 'কোলাম্বারিম' (Colambarim) নামক স্থানে আব একটি রাজধানী প্রস্তুত হইতেছিল"।[২২] আমানতউল্লা এই বিবরণেব সংগ্রহ সূত্র দিয়েছেন— Early Jesuit Travellers in Central Asia, 1603-1721 pp 126, 127, 131

প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে কোন যুক্তিতে 'কোলাম্বারিম'কে কলিঙ্গ বলে শনাক্ত করা যেতে পাবে? স্মরণ রাখতে হবে যে ক্যাসিলার ভূটান যাত্রার প্রায় একশত বৎসর আগেই গোয়ার সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল পর্তুগীজদের অধিকারে চলে গিয়েছিল। সে এলাকার চতুর্দিকস্থ যেসব স্থান নামের সঙ্গে তাদের পরিচয় ঘটেছিল তাদের মধ্যে গুচ্ছ গুচ্ছ স্থান নামের উপান্তে 'ইম' শব্দটি যুক্ত। যেমন, পঞ্জিম, মঙ্গিম, চন্দোলিম, বেলিম, সঙ্কেলিম, কার্লাটিম, দর্গালিম প্রভৃতি। সে কারণেই মনে হয় ক্যাসিলা বাংলাদেশের কয়েকটি স্থান নামের উপান্তে ইম যোগ করেছিলেন। তাই তাঁর লেখায় 'হুগলি'র হু বাদ পড়ে এবং উপান্তে ইম্ যোগ করে হয়েছে 'গোলিম', তেমনি এভাবেই 'কলম্ব' বা 'কোলাম্ব'-এর সঙ্গে 'ইম' যুক্ত হয়ে হয়েছে কোলাম্বরিম।

আমরা ফারুসায়েরের ফরমানে কলিঙ্গকে 'কলিম্ব' রূপে পেয়েছি। মনে হয় ফার্সী ভাষায় 'কলিঙ্গ' কথাটি রূপ পায় কলিম্ব-এ। তাই কোচবিহার রাজ্য মোগলশাসনাধীনে আসার পর সরকারি দলিলে স্থান নামটি কলিম্ব বা কোলম্ব রূপ নিয়েছিল। ক্যাসিলা তার সঙ্গেই 'ইম' যোগ করেছেন।

ক্যাসিলার চিঠি থেকেই জানা যায় যে এলাকাটি বহুতর নদী বিধৌত একটি অঞ্চল। আর এ অঞ্চলটি যে তরাইয়ের জঙ্গলের পূর্ব প্রান্তে সেটা প্রমাণের প্রয়োজন পড়ে না নিশ্চয়ই। তবে

ক্যাসিলার চিঠিতে এ অঞ্চলের মানুষের জীবিকা বা তাদের ব্যবহৃত বাগধারা সম্পর্কে কোনাও তথ্য নেই।

●

আনুমানিক আরো পঁচিশ বছর পিছিয়ে আমরা পাচ্ছি কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীকে। তাঁর রচিত 'চণ্ডীমঙ্গল' নামক মঙ্গলকাব্যেও এক কলিঙ্গ দেশ ও কলিঙ্গ বাজাব উপাখ্যান আছে। এই মঙ্গলকাব্যটির রচনা কাল সম্বন্ধে ডা. ক্ষুদিরাম দাসের অভিমত হলো যে ষোড়শ শতকের শেষের দশকেরও অন্তিমের কোনো কালে বা সপ্তদশ শতকের প্রথম দশকের শুরুর কোনো কালে এটি রচিত হয়েছিল। সে সময়ে দাক্ষিণাত্য ভিন্ন ভারতের আর সমস্ত ভূভাগই সম্রাট আকবরের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গিয়েছিল। তৎকালে মোগল সাম্রাজ্যের কোনো স্বীকৃত সামন্ত রাজা ছিল না। রাজা মহারাজা উপাধিধাবী কোচবিহাব, বিজনী, গৌরীপুর ইত্যাদি বাজ্যের রাজারা প্রকৃত প্রস্তাবে ওইসব মোগলাধীন এলাকার জমিদার মাত্রই ছিলেন। ডা. দাশ যুক্তিযুক্তভাবেই বলেছেন যে, এ কাব্যের কলিঙ্গদেশ হলো কাঁসাই নদীতীরস্থ একটি এলাকা যার এক সম্ভাব্য জমিদারই কবি কল্পনায় কলিঙ্গ রাজ হয়েছেন। তবে কোনো এক সুদূর অতীতে কাঁসাই তীরস্থ এই জঙ্গলে এক স্বাধীন বা আধাস্বাধীন সামন্ত রাজ্যেব হয়তো অস্তিত্ব ছিল এবং সে সম্বন্ধে উচ্চশিক্ষিত মুকুন্দরাম হয়তো অবহিতও ছিলেন।

এই কাব্যোপাখ্যানের নায়ক কালকেতু যে গুজরাট নগবটি নির্মাণ করেছিলেন সেটি এই কলিঙ্গ জঙ্গলেই অবস্থিত ছিল। কলিঙ্গেব রাজাব বিনা অনুমোদনে নগর নির্মাণেব কারণে কালকেতুর বাহিনীর সঙ্গে কলিঙ্গবাজের সৈন্যদলের এক যুদ্ধে কালকেতু কলিঙ্গী সৈন্যদের হাতে বন্দী হন। মঙ্গলকাব্যটিতে এই কলিঙ্গ রাজার কোনো জাতি পরিচয় পাওযা যায় না। কিন্তু রাজার যে বিশাল বন্দীশালায় কালকেতুকে বন্দী কবা হযেছিল সেই বন্দীশালার রক্ষকবা সকলেই ছিল 'পোতামাঝি'।[২৩] ডা দাশ 'পোতা' কথাটির প্রকৃতি প্রত্যয় নিরূপণ করেছেন— পোত + আ। 'পোত' অর্থাৎ নৌকা ও তার মাঝিগণ অবশ্যই জাতিগত বৃত্তিতে নৌজীবী ছিল। কাব্যসাক্ষ্য থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সম্ভবত কলিঙ্গের জমিদারের প্রজাদের এক প্রধান অংশই ছিল এই পোতামাঝিগণ, যারা নিশ্চিতই জলনির্ভর জীবিকাশ্রযী ছিল।

এর কিছুকাল আগে ১৫২০ খ্রিস্টাব্দে আনন্দভট্ট রচিত 'বল্লালচরিত'-এ উত্তরবঙ্গে আবার একটি দ্রাবিড় রাজ্যের অবস্থিতির পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। এই 'বল্লালচরিত'-এর একটি কাহিনীতে আছে যে বল্লাল সেন তাদের রাজবংশেব চিরাচরিত অনুসৃত শৈব ধর্ম ত্যাগ কবে বৈষ্ণবধর্মমতে দীক্ষিত হন। ফলে পূর্বতন শৈব রাজপুরোহিত মুহন্তগিরির পদচ্যুতি ঘটে। ক্ষুব্ধ মহন্ত গিরি নবনিযুক্ত বৈষ্ণব রাজপুরোহিতকে অপমান করলে বৈষ্ণব রাজপুরোহিতের প্ররোচনায় বল্লাল মহন্তগিরিকে তাঁর শৈবমঠের সমুদয় শিষ্যসহ সেন রাজ্য থেকে বহিষ্কার করে দেন। অপদস্থ মহন্তগিরি "ম্লেচ্ছাধিপতি বায়দুম্বের শরণ নিলেন। তাঁর পরামর্শে বায়দুম্ব বিক্রমপুর আক্রমণ করেন।..."[২৪] বল্লালচরিতের কাহিনী অনুযায়ী এই যুদ্ধে বায়দুম্বের পরাজয় ও মৃত্যু ঘটে।

অনেক ঐতিহাসিকই বায়দুম্ব কাহিনীটি জনশ্রুতি নির্ভর অলীক বিবেচনা করে একে ইতিহাসের অঙ্গনে স্থান দেননি। তাঁদের মতে কাহিনীটির মতোই রাজা বায়দুম্বও একটি বাস্তবতা বর্জিত অনৈতিহাসিক নাম। কিন্তু সেক্ষেত্রে আর একটি পাথুরে প্রমাণের কি ব্যাখ্যা থাকতে পারে? ৯৭১ খ্রিস্টাব্দে তামিলনাড়ুর তিরুক্কুয়ালুর নামক স্থানের এক মন্দির গাত্রে পাথরে উৎকীর্ণ আছে যে কোনো

এক বায়দুম্ব রাজা গ্রামসভার কাছ থেকে তিন ভেলী জমি কিনে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মন্দিরটিকে দান করেছিলেন।[২৫]

এই অন-অলীক কাহিনীটি থেকে সপ্রমাণ হচ্ছে যে দ্রাবিড় ভাষায় বায়দুম্ব একটি প্রচলিত রাজনাম (Royal Petronymic)। কিন্তু বাংলা বা সংস্কৃত ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে 'বায়দুম্ব' কথাটির অস্তিত্ব আছে বলে জানা যায় না। তাই প্রশ্ন জাগে, দশম শতাব্দীর তামিলভূখণ্ডের একটি রাজনাম কীভাবে দ্বাদশ শতকে উত্তর-পূর্ব ভারতের কোনো এক রাজ্যের রাজার অভিধা হিসাবে দেখা দেয়? মনে রাখতে হবে যে সে কাহিনীটি লিপিবদ্ধ করেছেন আনন্দভট্ট ষোড়শ শতকে।

বল্লালসেন সম্পর্কিত বায়দুম্ব কাহিনীটি অলীক হতেই পারে। কিন্তু যা কোনো মতেই অলীক হতে পারে না তা হলো এই যে : বল্লালের সমসময়ে বা কিছু আগে পরে উত্তরবঙ্গে 'বায়দুম্ব' নামে এক 'ম্লেচ্ছাধিনাথ' ছিলেন। তাঁর বায়দুম্ব নামই প্রমাণ করে যে সেই রাজবংশ সচেতনভাবে দ্রাবিড় সংস্কৃতির অনুসারী এবং তিনি যে ম্লেচ্ছ জনগোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিতেন তারাও ছিল সেই একই সংস্কৃতির অনুগামী। ইতিহাসে বল্লাল-বায়দুম্ব যুদ্ধের কোনোই তথ্য নেই। কিন্তু জনশ্রুতিতে বায়দুম্বের অস্তিত্ব উত্তরপূর্ব ভারতে একটি দ্রাবিড় রাজ্যের অস্তিত্বকে ইতিহাস গ্রাহ্য করে দিয়েছে। এই দ্রাবিড় রাজ্যটির সম্ভাব্য অবস্থান স্থল কিছু পরেই প্রকট হবে।

কাল - আনুমানিক খ্রিষ্টিয় একাদশ-দ্বাদশ শতক
স্থান - উত্তরবঙ্গ ও আসাম (তৎকালীন কামরূপ রাজ্য)

আবার আমরা কলিঙ্গের সাক্ষাৎ পাই দ্বাদশ শতক নাগাদ রচিত এবং বিভিন্ন নামে পরিচিত গোবিন্দ চন্দ্র রাজা সম্পর্কিত কাব্যোপাখ্যানে। এই কাব্য কাহিনীর কোনো একজন আদি রচয়িতা ছিলেন কিনা জানা যায় না। তবে ভারতীয় ভাষা বিশেষজ্ঞ Grierson সাহেব রংপুর জেলার কোনো যোগির মুখ থেকে এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করে ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে Asiatic Society-র Journal এ দেবনাগরী হরফে প্রকাশ করেন। এরপর (অন্যূন) আরো চারটি সংকলন প্রকাশিত হয়। এই সব সংকলনে বিভিন্ন নামে যথা— মানিকচাঁদ রাজার গান, ময়নামতীর গীত, গোবিন্দচন্দ্রের গীত, গুপীচাঁদের সন্ন্যাস ইত্যাদি নানা নামে মূখ্যত একই কাহিনী প্রচারিত হয় আসছে। বৌদ্ধ সহজযান ধর্মমতের উত্তরসূরী এই কাব্যোপাখ্যানে অনেকগুলি স্থান নামের উল্লেখ আছে। সেগুলি গোবিন্দচন্দ্র রাজার রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে আলোকপাত করলেও ঐ স্থানগুলি উত্তরবঙ্গে অবস্থিত না দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গের কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত সে সম্পর্কে পণ্ডিত মহলে দ্বিমত রয়েছে। কিন্তু রংপুর জেলার মধ্যেই গীতোক্ত স্থানগুলিকে পাওয়া যাচ্ছে। যেমন দুটি ফেরুসা গ্রাম আছে গোবিন্দগঞ্জ থানায়, একটি ফেরুসাপাঙ্গা গ্রাম আছে বড়োবাড়ি থাকায়, দারিয়াপুর পাওয়া যাচ্ছে পীরগঞ্জ থানায়, মেহেরপুরকে পাওয়া যাচ্ছে মিঠাপুখর থানায়। এমন কি গোবিন্দ চন্দ্রের রাজধানী পাট্টিকারা খুবই সম্ভবত সুন্দরগঞ্জ থানার অধীন পাট্টিকাপাড়া গ্রাম নামেরই পূর্বতন রূপ। সর্বোপরি গীতোক্ত করতোয়া নদী রংপুরের মধ্য দিয়েই প্রবাহিত, কুমিল্লায় নয়।[২৬]

এই কাব্য কাহিনীতে একটি কলিঙ্গ রাজ্য, একটি কলিঙ্গনগর, একটি কলিঙ্গ বন্দর একটি কলিঙ্গ বাজার এবং এক কলিঙ্গ ভূপতির উল্লেখ আছে। কাহিনী অনুসারে সিদ্ধাগুরু হাড়িপার নেতৃত্বে গোবিন্দচন্দ্র সন্ন্যাসী রূপে ওই কলিঙ্গ রাজ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে হাড়িপাকে হনুমানের সঙ্গে লড়তে হয় এবং যোগবলে হাড়িপা হনুমানকে কাবু করে ফেলেন। কাব্যোপাখ্যান আছে (বানান অপরিবর্তিত)

জা জারে হনুমান বেটা তোক দিলাম বর
মুখপোড়া হইয়া থাক শয়ালের ভিতর।
টীকৎ চাপড় দিয়া নিবে ত্যালেঙ্গা সক্কল।।[২৭]

এ থেকে কিছু পণ্ডিত অনুমান করেছেন যে হাড়িপা দণ্ডকারণ্যের নিকটস্থ দাক্ষিণাত্যের কলিঙ্গ রাজ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন, আর সে কারণেই সে রাজ্যের অধিবাসীরা ত্যালেঙ্গা নামে অভিহিত হয়েছে। ত্যালেঙ্গা অধ্যুষিত কলিঙ্গ রাজ্যটির দাক্ষিণাত্যে অবস্থান মেনে নেওয়া যেতে পারত যদি না রংপুব জেলার উলিপুর থানায় 'ত্যালেঙ্গাপাড়া' নামক গ্রামটি অবস্থিত হতো। বলা বাহুল্য যে সুদুর উত্তরবঙ্গের রংপুর জেলার এক অখ্যাত 'ত্যালেঙ্গাপাড়া' অবশ্যই এক কালে ত্যালেঙ্গা অধ্যুষিত ছিল। আর দাক্ষিণাত্যে নিশ্চিতই কোনো করতোয়া নদী কোনো দিনই প্রবাহিত ছিল না। সে কারণেই অতি সঙ্গত অনুমান যে করতোয়া নদীর সন্নিকটস্থ উত্তরবঙ্গের কোনো এক প্রান্তরেই এই কলিঙ্গ রাজ্যটি অবস্থিত ছিল।

এই গীতোপাখ্যানের কলিঙ্গ বাজ্যটি যে দ্রাবিড়ভূমিব উত্তরপুরুষদেব দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। আর সে রাজ্যের অধিবাসীরা যে গীত রচনাকালেও দ্রাবিড়ীয় 'ত্যালেঙ্গা সক্কলের' দ্বারা অধ্যুষিত ছিল তাও অনস্বীকার্য। তবে ওই দ্রাবিড়ভূমির উত্তরপুরুষরা জীবিকার্জনে জল নির্ভর ছিল কিনা গীতোপাখ্যানে সে সংবাদ সূত্র অনুপস্থিত।

Van Den Broucke এর মানচিত্রের কোচবিহার-আসামের উত্তরের কলিঙ্গ বন, পাদ্রী স্টিফেন ক্যামিলার 'কোলাম্বরিম', আনন্দভট্টের 'বল্লালচরিতে'র ম্লেচ্ছাধিনাথ রাজা রায়দুম্বের রাজ্য, আর গোবিন্দ চন্দ্রের গীতের রংপুর জেলার অদূরবর্তী কলিঙ্গ রাজ্য এ সমস্তগুলিই একদা বিদ্যমান উত্তরবঙ্গের এক কলিঙ্গ রাজ্যের সঙ্গেই সম্পর্কিত, একথা সম্ভবত অতিশয়োক্তি বিবেচিত হবে না।

●

কলিঙ্গের অন্বেষায় এবার যাওয়া যাক একাদশ শতকের কামরূপে রাজ্যে। কামরূপ রাজ্যের পালবংশীয় দ্বিতীয় সম্রাট রত্নপালের শুয়ালকুচি তাম্র শাসনে (একাদশ শতকে) একটি 'কলঙ্গাদণ্ডী' নামক গ্রামের উল্লেখ আছে। যেটি ছিল 'কলঙ্গা বিষয়ের' অন্তর্গত। বলা বাহুল্য যে 'কলঙ্গা' কথাটি 'কলিঙ্গ' কথাটিরই একটু বিবর্তিত রূপ। তাম্রশাসনটির ইংরাজী অনুবাদ করেছেন প্রখ্যাত প্রত্নলিপি বিশারদ শ্রীযুক্ত মুকুন্দ মাধব শর্মা। ঐ শাসনের যে অংশটুকুতে প্রদত্ত গ্রামটির সীমানা দেওয়া আছে এখানে কেবল সেটুকুরই উদ্ধৃতি দেওয়া হলো।

'The boundaries of this (land) are as follows To the east a Sakkarāmūla tree, and a mango tree with a bent, situated on a brick-field on the common boundary of *Candenaukī*. To the south-east (a cluster of) cane tree on the boundary common to *Daksapātinauki*. To the south a *hijjala* tree on the boundary common to *Sadhava nauki* ... to the south-west a tree known as *bhadrāksa*. To the west a silk-cotton tree, recently planted on the boundary common to *Candenaukī*. To the north-west the southern part of (the lands of) Kalangādandi, a *coraka* tree on the southern part of (the lands of) Sadhava and Kalangadandi at the end of the eastward curve, ...'

এই তাম্রশাসকটি সম্পর্কে শ্রীশর্মা লিখছেন, 'The whole area, where the land is situated seems to be full of rivers. Most of the inhabitants seem to be boatman. The

term *naukin* (as it occurs in Cande-naukī) seems to mean a boatman (the meaning of the word *nauka* being a boat.)[২৮]

রত্নপালের এই তাম্রশাসন প্রমাণ করে দিয়েছে যে কলিঙ্গ সংস্কৃতির উত্তরসূরীরা একটি বিস্তীর্ণ নদী বিধৌত অঞ্চলে অধ্যুষিত ছিল। আর সে এলাকার অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিল নৌজীবী অর্থাৎ কৈবর্ত বা কেওট। শুধু ওই কলঙ্গা বিষয়েই নয় সারা কামরূপ জুড়েই কৈবর্তদের অধিষ্ঠান সম্পর্কে শ্রীমতি লাহিড়ী[২৯] জানাচ্ছেন, 'A very significant section of the population in this period belonged to the Kaivarta community ... known alternately as Keyots.'

বর্তমানকালে আসামে কলিঙ্গ নামাঙ্কিত কোনো স্থানের অস্তিত্ব নেই। তাই এই কলঙ্গাবিষয় ও কলঙ্গাদণ্ডী গ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে সুনাব্য নদীবহুল এ কলিঙ্গ অঞ্চল কোচবিহার গোয়ালপাড়ার উত্তরস্থিত কলিঙ্গ দেশ না হওয়াই সম্ভব। বরং Van Den Broucke-এর মানচিত্র অনুযায়ী এই কলঙ্গা বিষয় ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গার মধ্যবর্তী অঞ্চলে হওয়াই স্বাভাবিক। মনে রাখতে হবে যে কামরূপ রাজ্যের পশ্চিম সীমা বহু দিন ধরে ব্রহ্মপুর নদের পশ্চিমাঞ্চলেও বহু বিস্তৃত ছিল।

কাল - ১১৫৯ খ্রিস্টাব্দ — ১০৭২ খ্রিস্টাব্দ (আনুমানিক)
স্থান - মুখ্যত বিক্রমপুর কেন্দ্রিক পূর্ব ও উত্তরবঙ্গ

আরো কয়েক দশক পিছিয়ে আবার এক কলিঙ্গ রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে রাজশাহী জেলার দেব পাড়ায় এক মন্দির গাত্রে খোদিত লিপিতে। বিজয় সেন (আ ১০৯৬-১১৫৯ খ্রিঃ) প্রতিষ্ঠিত এই প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দির লিপির একটি পংক্তিতে আছে, 'গৌরেন্দ্রমদ্রব্যৎপ্রাকৃতকামরূপ-ভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায়'।[৩০] এই পংক্তিটির মূল বক্তব্য হলো যে বিজয় সেন গৌর, কামরূপ ও কলিঙ্গ জয় করেছিলেন। রাজাদেশে বচিত প্রসিদ্ধ কবি উমাপতি ধরেব এই প্রশস্তিতে অনেক অতিশয়োক্তি আছে। যেমন, প্রশস্তিতে আছে যে বিজয় সেন গৌড় রাজকে পবাজিত করেছেন। কিন্তু ডাঃ দীনেশচন্দ্র সরকার এই গৌড় বিজয় সম্পর্কে লিখেছেন, 'কিন্তু সেন-লেখমালায়, বিজয় গৌড়রাজকে পরাজিত করেছিলেন এবং লক্ষ্মণ সেনও যখন কুমার (অর্থাৎ তাঁর পিতামহের আমলে) সেই গৌড়পতিকে পরাজিত করেন।'[৩১] এ থেকে এটা স্পষ্ট যে দুটি ঘটনাই সত্য হতে পারে না। বরং এটাই সত্য হতে পারে যে বিজয় সেনের বাহিনীর সঙ্গে গৌড়ের বাহিনীর যুদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু সেই যুদ্ধেই ক্ষয়িষ্ণু পাল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটেনি। কারণ, ডাঃ সরকার লিখেছেন, '... পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি বা উত্তর বাংলায় মদনপালের রাজত্বের অষ্টম বর্ষ অর্থাৎ ১১৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাল-সম্রাটের অধিকার স্বীকৃত হতো।'

বহু ইতিহাস প্রণেতার মতে বিজয় সেন দাক্ষিণাত্যের তৎকালীন কলিঙ্গ রাজ্য জয় করেছিলেন। বহু বিস্তৃত সে কলিঙ্গরাজ্যের সীমা ছিল উড়িষ্যার উত্তরসীমা পর্যন্ত ব্যাপ্ত। সুবিখ্যাত সম্রাট চোড়গঙ্গদেব শাসিত এই কলিঙ্গ এক মহাপরাক্রমশালী রাজ্য ছিল। যে বিজয়বাহিনী ক্ষয়িষ্ণু পাল রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ উৎখাতে ব্যর্থ প্রতিপন্ন, সেই বাহিনীই প্রবল পরাক্রান্ত চোড়গঙ্গদেবের বাহিনীকে পরাভূত করেছিল— সে দাবি মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। আর রমাপ্রসাদ চন্দের মতে, 'গৌড় রাষ্ট্রের পশ্চিমাংশ (পাশ্চাত্য চক্র) জয় করিবার জন্য তিনি যে 'নৌ-বিতান' প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। দক্ষিণ দিকে, বঙ্গে এবং রাঢ়ে বর্মরাজ কর্তৃক বিজয় সেনের গতিরূদ্ধ হইয়াছিল।'[৩২]

কিন্তু গৌড় রাজ্যের উত্তর-পূর্ব দিকস্থ এবং কামরূপ রাজ্যের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত ক্ষুদ্র কলিঙ্গ বাজ্যটিকে (যে রাজ্যের কথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে) কামরূপ জয়ের আগে বা পরে অধিকার করে নিতে বিজয় বাহিনী হয়তো সক্ষম হয়ে থাকতে পারে। এই ক্ষুদ্র কলিঙ্গ রাজ্যজয়কে গৌড়-কামরূপ-কলিঙ্গ বিজয় রূপে বর্ণনা করে উমাপতিধর নিশ্চিতই কোনো অনৃত ভাষণ করেননি। তবে ও সত্যভাষণটা অনেকটা 'অশ্বত্থমা হত ইতি গজ' জাতিয় সত্যভাষণ।

●

বিজয় সেনের রাজ্য প্রতিষ্ঠার কয়েক দশক আগে উত্তর-পূর্বভারতে একটি দ্রাবিড় রাজ্যের পরোক্ষ সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এ সাহিত্য সাক্ষ্যটি পাওয়া যায় সন্ধ্যাকরনন্দী রচিত 'রামচরিত' গ্রন্থে।[৩৩] পাল সাম্রাজ্যের বংশানুক্রমিক সন্ধিবিগ্রাহিকের পরিবারে জাত সন্ধ্যাকবনন্দীর ওই কাব্যেতিহাসে আছে যে সম্রাট তৃতীয় বিগ্রহ পালের রাজত্বকালে পাল সাম্রাজ্যের 'অনন্ত-সামন্ত-চক্র' বিদ্রোহী হয়ে উঠলে মহীপাল সসৈন্যে রাজধানী ত্যাগ করে বিদ্রোহ দমনে নির্গত হন। ইতিমধ্যে কৈবর্ত নায়ক দিবোক্কের নেতৃত্বে এক কৈবর্ত বাহিনী বাজধানীতে আগমন করে এবং শূন্য পাল সিংহাসনে দিবোক্ক স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমকে অধিষ্ঠিত করেন।

ববেন্দ্রীর সিংহাসন অধিকারী কৈবর্ত নায়কগণ এবং তাঁদের অনুগামীরা বরেন্দ্রীর সন্নিকটস্থ কোনো কৈবর্ত তথা দ্রাবিড়ীয় ঐতিহ্যবাহীদের দ্বারা অধ্যুষিত অঞ্চল থেকেই এসে থাকতে পারেন। কৈবর্ত আবাসিত অঞ্চলটি যে বরেন্দ্রীরাজ্যের নিকটবর্তী স্থানে ছিল তার পরোক্ষ প্রমাণও ওই রামচরিত কাব্যেই বয়েছে। বরেন্দ্রীর সিংহাসন পুনরুদ্ধারের যুদ্ধ রামপালের হাতে বন্দী ভীমের ছত্রভঙ্গ সৈন্যদলকে পুনরায় একত্রিত কবে ভীম সুহৃদ হরির নেতৃত্বে ওই রণক্ষেত্রেই অপ্রতুল অস্ত্র সজ্জিত ও নগ্নগাত্র আবো বহু নুতন সৈন্যদল মহিষ বাহিত হয়ে উপস্থিত হয়। ভীম বন্দী হবার কয়েকদিন পর পুনরায় ভীষণ যুদ্ধ শুরু হলে নবসন্নিবেশিত সৈন্যদলের নায়ক হরি, ধন ও পদলোভের বশবর্তী হয়ে, বিশ্বাসঘাতকতা করে রামপালের পক্ষাবলম্বন করার পরই ওই যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। বন্দী ভীমকে সপরিবারে হত্যা করাব পরই রামপাল বরেন্দ্রীর সিংহাসনে আবোহণ করেন।

বামপাল কর্তৃক পাল সিংহাসন পুনরুদ্ধার করার পরও দিবোক্কের সশরীরে বিদ্যমান থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় ভোজবর্মাব বেলাবো তাম্রশাসনে। সেখানে দাবি করা হয়েছে যে ভোজবর্মার পূর্বপুরুষ জাতবর্মা '... extending his supremacy among the Angas, conquering Kamrupa, putting to shame the strength of arms o· Divya' [৩৪] ইতিহাসবিদরা প্রায় একমত যে এই দিব্যই কৈবর্তনায়ক দিবোক্ক। যদি কামরূপ ও অঙ্গদেশকে পরাজিত কবার মতোই দিবোক্কও জাতবর্মার হাতে পরাজিত হয়ে থাকতেন তবে এই পরাজয়ের পূর্বে তিনি নিশ্চিতই একটি রাজ্যপাটের অধীশ্বর ছিলেন। অন্যথায় তাকে পরাজিত করার মধ্যে কোনো গৌরব থাকে না। আর কামরূপ অঙ্গ ও দিবোক্ককে পরাজিত করার কালে রামপাল যে বরেন্দ্রী সিংহাসনে আসীন ছিলেন তার প্রমাণ রয়ে গেছে 'রামচরিত' কাব্যের তৃতীয় স্বর্গের সাতচল্লিশতম শ্লোকে। তার ইংরাজী অনুবাদ এরকম, 'Did not the king (the great ally of Rāmpāla) who had returned from Kamrup and other countries conquered by him and as such a fit receipient of honours—receive honours from that king (Rampala)?'[৩৫] ইতিহাসে রামপালের রাজত্বকালে জাতবর্মা ভিন্ন অন্য কোনো রাজার হাতে কামরূপের পরাজিত হবার আর কোনো তথ্য নেই। তবে শুধু কামরূপ জয়ের জন্যই নয়, বরেন্দ্রীর সিংহাসন দীর্ঘদিন কৈবর্ত অধিকারে থাকার যে গ্লানি রামপাল ভুলতে পারছিলেন না, সেই কৈবর্তদের

নায়ককে পরাজিত করার জন্য রামপাল জাতবর্মাকে সম্মান প্রদর্শনে অধিকতর আগ্রহী হয়ে থাকতে পারেন।

মনে হয় উত্তর-পূর্ব ভারতে বরেন্দ্রীব এবং কামরূপের সন্নিকটস্থ একটি কৈবর্ত রাজ্যের অস্তিত্বের ঐতিহাসিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে এই কৈবর্ত রাজ্যটি আলোচ্য কালে উপজাতিয় রাজ্য ছিল। উপজাতিয়দের গোষ্ঠী নায়কই তাদের রাজ্যের সর্বেসর্বা হন। সে কারণেই সন্ধ্যাকর নন্দী বা ভোজবর্মা দিবোক্ককে কৈবর্ত নায়ক বলে অভিহিত করেছেন, রাজা হিসাবে নয়। এই দিবোক্ক বরেন্দ্রী অধিকারের পূর্বে যেখানে অধিষ্ঠিত ছিলেন, ভীমের পরাজয়ের পরেও তাঁর সেই অঞ্চলে অবস্থান প্রমাণ করে যে তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে কৈবর্ত রাজ্যটির রাজাই ছিলেন। শুধুই কৈবর্তনায়ক নয়।

এ অনুমান আর অনৈতিহাসিক বলে বিবেচিত হতে পারে না যে রামপাল-জাতবর্মার সময়কার এই কৈবর্ত রাজ্যটিকেই সম্ভবত বিজয় সেন কলিঙ্গদেশ রূপে জয় করেছিলেন। এখানকার রাজাই হয়তো বল্লালের কালের ম্লেচ্ছাধিনাথ বায়দুম্ব আবার এই রাজ্যেই হয়ত গোবিন্দচন্দ্রের গীতের গোবিন্দচন্দ্র হাড়িপার সাথে উপস্থিত হয়েছিলেন, যখন সেটা একটা সম্পূর্ণ কলিঙ্গ রাজ্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

কাল - আনুমানিক ৬৪০ খ্রিস্টাব্দ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক পর্যন্ত
স্থান - বালুচিস্তান, আফঘানিস্তান এবং বর্তমান উড়িষ্যা-অন্ধ্রের সমুদ্রোপকূলের প্রাচীন কলিঙ্গ রাজ্য

আনুমানিক ৬৪০ খ্রিস্টাব্দে হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণ কাহিনীতে এক বিশেষ বানানে 'কলিঙ্গ'কে পাওয়া যাচ্ছে। 'After having travelled from 1400 to 1500 *li*, he (Hewen Tsang) arrived at the kingdom of Kalingkia. .'[৩৬] স্মরণে আসে যে Van Den Broucke বঙ্গ ভূখণ্ডে তিনটি স্থানকে Karinkiya বলে চিহ্নিত করেছেন ও 'গোপীচন্দ্রের গানে' আছে কলিঙ্কা বন্দর (২২৬ পৃ.), কলিঙ্কার বাজার (২২৯ পৃ.)[৩৭]। সাধারণ মানুষের মুখের ভাষায় 'ল' ও 'র' প্রায়ই স্থান পরিবর্তন করে। তাই হিউয়েন সাঙের কলিঙ্কিয়া, Van Den Broucke-এর করিঙ্কিয়া এবং গোপীচন্দ্রের গানের কলিঙ্কা অভিধাগুলি যে কলিঙ্গকেই প্রতিবিম্বিত করে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে বলে মনে হয় না।

একটি সম্ভাব্য ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপটে স্থান নাম হিসাবে 'কলিঙ্গ' এবং সেই নামধারী এলাকা সমূহের আর্থ-সামাজিক-ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের বিষয় আলোচিত হলো। এখন আমরা এমন দুটি এলাকার মানুষদের কথা আলোচনা করব যারা একই ঐতিহাসিক ঘটনার ফলভোগী হলেও তাদের আবাসিত অঞ্চলে 'কলিঙ্গ' নামক কোনো স্থানের অস্তিত্বের কথা এখনো পর্যন্ত জানা যায়নি। 'এ স্থান দুটির একটি হলো বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্গত বালুচিস্তানের কালাৎ উপত্যকা এবং অপরটি হলো আফঘানিস্তানের লাঘমান জেলা। (এ দুটি ক্ষেত্রে কালানুক্রমকে মানা হয়নি।)

প্রথমে বালুচিস্তানের কালাতের সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। মধ্যবালুচিস্তানের সুউচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত এই কালাত অঞ্চলের আবহাওয়া এত শুষ্ক এবং শীতকালে এত 'হিংস্র শীত'[৩৮] পড়ে যে কৃষির সুযোগহীন এ অঞ্চলের অধিবাসী ব্রাহুইভাষীরা পশুপালক হিসাবে অংশত যাযাবরী বৃত্তি অবলম্বন করে প্রতি বৎসর শীতের আগমনের আগে তাদের পশুপালকে নিয়ে চতুর্দ্দিকস্থ সমতলভূমিতে নেমে আসে আর শীত শেষে অধিকাংশ মানুষই আবার তাদের পার্বত্য দেশে ফিরে যায়।

কিন্তু পরম বিষ্ময়ের ব্যাপারটা হলো এই যে, কালাতের সবচেয়ে নিকটবর্তী দ্রাবিড়ভাষা ব্যবহারকারী অঞ্চলটি ৮০০ মাইল দূরে অবস্থিত হলেও এই ব্রাহুইদের মাতৃভাষা (ব্রাহুইভাষা নামেই

পরিচিত) দ্রাবিড়ভাষা গোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য। এঁদের সম্বন্ধে বিস্ময়কর তথ্যটি দিয়েছেন বিখ্যাত সংস্কৃত ও দ্রাবিড় ভাষা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক এমেন্যু। তাঁর কথায়, 'It has been noted previously and indeed demonstrated to the hilt that Brahui joins with Kurukh and Malto in showing a unique phonological phenomenon within the Dravidian family.'[৩৯]

এই কুরুখ ও মালতোভাষীদের প্রধান বাসের এলাকা হলো পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তে ছোটনাগপুরের পার্বত্য এলাকায়। এই দুই ভাষাভাষীর সে অঞ্চলে অন্বিত অবস্থান সম্পর্কে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, '... two Dravidian dialects, *intimately connected with each other*, one found to the west of Bengal; Malto, which is spoken in Rajmahal hills, and Kurukh or Oraon, which just touches Bengal at its extreme western wing.'[৪০] দুই ভাষার মধ্যে উচ্চারণগত সাদৃশ্য কেবল তখনই গড়ে ওঠে যখন ভিন্নভাষী মানুষেরা একে অপরে অতি ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী বাস করে যায়। সে তত্ত্বানুসারেই তর্কাতীত ভাবে বলা যায় যে ওরাওঁ, মালপাহাড়ী এবং ব্রাহুইরা সুদূর অতীতে কোনো এক এলাকায় পরস্পরের অতি ঘনিষ্ঠ অবস্থানে শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত করেছিল। এটাও নিশ্চিতই তর্কাতীত যে এই তিন ভিন্নভাষী মানুষদের সেই একত্রে অবস্থান স্থানটি অবশ্যই দাক্ষিণাত্যের কোনো কৃষিপ্রধান অঞ্চলে ছিল, এবং সেখান থেকেই ব্রাহুইভাষীদের বিচ্ছিন্ন করে বালুচিস্তানের উষর মালভূমিতে অভিবাসিত হতে বাধ্য করা হয়েছিল। আর সে কার্যক্রমেরই অংশ হিসাবে ওরাওঁ ও মালপাহাড়ীদের ছোটনাগপুরের জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য অঞ্চলে অভিনিবিষ্ট করা হয়েছিল। আর ওরাওঁদের আর এক দলকে পশ্চিম নেপালের তরাইয়ের জঙ্গলে পাঠানো হয়েছিল, যাদের ধানওয়ার বা ধাঙ্গররূপে এখনো সেখানে পাওয়া যাচ্ছে।

আরো একটি বিস্ময়কর তথ্য প্রাচীনকাল থেকে নেপালে দ্রাবিড়ভাষীদের উপস্থিতির সাক্ষ্য দেয়। নেপাল রাষ্ট্রের সর্বপূর্ব প্রান্তের জেলাটির নাম 'ইলম'। খ্রি.পূ. তৃতীয় সহস্রেরও পূর্ব থেকে টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিসের সমগ্র অববাহিকা জুড়ে দীর্ঘদিন বিরাজিত থাকা দ্রাবিড় সাম্রাজ্যটিরও নাম ছিল 'ইলম'। আবার শ্রীলঙ্কার তামিলভাষীরাও সে রাজ্যের যে ভৌগোলিক অংশের মুক্তির জন্য সংগ্রামরত সেটাকে তাঁরা 'ইলম' নাম দিয়েছেন। সে কারণেই তাদের সংগঠনের নাম হয়েছে Liberation Tigers for Tamil Elam (L.T.T.E.). পাঁচ হাজার বছর আগের দ্রাবিড়ভাষীদের মধ্যপ্রাচ্যের পূর্বপুরুষরা নিজ দেশ বা রাষ্ট্র বোঝাতে যে অর্থে 'ইলম' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন, সেই একই অর্থে বর্তমান কালেও শ্রীলঙ্কার তামিলরা 'ইলম' কথাটি ব্যবহার করছেন। আর সেই একই অর্থেই নেপালেও 'ইলম' অভিধাটি ব্যবহৃত হয়েছিল। বলা বাহুল্য যে পূর্ব নেপালের আদিমতম এবং সর্বাগ্রগণ্য অংশ ছিল বলেই 'ইলম' কথা ব্যবহারকারী দ্রাবিড়ভাষীরা সে এলাকার এক ভৌগোলিক অংশের 'ইলম' নামকরণে সক্ষম হয়েছিল।

ভৌগোলিক বিচারে অনেক অপ্রশস্ত হলেও স্বাধীনতাপূর্ব দিনাজপুর জেলার যে চারটি 'ইলম' অভিধাযুক্ত গ্রামকে পেয়েছি সেগুলিও একই সংস্কৃতির আওতার মানুষদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একই কথা বীরভূম জেলার 'ইলামবাজার' ও সাঁওতাল পরগণার 'ইলামি' নামক স্থানগুলি সম্পর্কেও প্রযোজ্য বলেই মনে হয়।

এছাড়াও আরো একটি বিস্ময়কর তথ্যও প্রাচীন কাল থেকে নেপালে দ্রাবিড়ভাষীদের উপস্থিতির সাক্ষ্য দেয়। এ প্রসঙ্গে *কাটমাণ্ডুর পশুপতিনাথের মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের দাক্ষিণাত্য থেকে নির্বাচিত হবার প্রথার একটু আলোচনা প্রয়োজন।*[৪১]

এটা স্পষ্ট যে শৈব ধর্মের অন্যতম এবং আদিমতম ব্যাপ্তিভূমি বলে বিবেচিত দাক্ষিণাত্যের একদল শৈবধর্মী মানুষ নেপালে অভিবাসিত হয়েছিল। কালক্রমে তাদের প্রভাবিত এলাকায় তারা অনেক শৈব মন্দির স্থাপন করেছিল, যাদের মধ্যে কাটমাণ্ডুর পশুপতিনাথের মন্দিরটিই সর্বপ্রধান। দীর্ঘদিন নেপালে বাস করার ফলে বিশুদ্ধ দ্রাবিড়ীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল না। ফলে তাদের অনুসৃত ধর্ম ও সংস্কৃতিতে কিছু কিছু বিচ্যুতি দেখা দিয়ে থাকতে পারে। সে কারণেই শৈব ধর্ম ও দ্রাবিড়ীয় সংস্কৃতির একজন বিশুদ্ধ প্রবক্তা হিসাবেই দাক্ষিণাত্য থেকে শৈব পুরোহিত নিয়োগের প্রথা চালু হয়েছিল।

সঙ্গত অনুমান যে এই মন্দিরটির সূচনাকালে কাটমাণ্ডু এলাকার জনসমাজে দ্রাবিড়ীয় শৈবধর্মীদের প্রাধান্য ছিল। অর্থাৎ মন্দিরটির সূচনাকালে সে এলাকায় উত্তর ভারত বা তিব্বতাগতরা তথাকার সমাজের অগ্রগণ্য অংশ ছিল না।

●

এবার আসা যাক আফঘানিস্তানের লাঘমান নামক স্থানের প্রসঙ্গে। ১৯৬৯ একটি এবং ১৯৭৩ সালে আর একটি অশোকের নাতিদীর্ঘ শিলালেখ ওই লাঘমান অঞ্চলে দু'কিলোমিটার ব্যবধানে অবস্থিত দুটি পাহাড়ের চূড়ায় আবিস্কৃত হয়। শুধুই আরামায়িক ভাষায় ও লিপিতে রচিত ওই দুই শিলালিপির পাঠোদ্ধার এবং তার ইংরেজি তর্জমা করেছেন প্রখ্যাত প্রাচীন ভারতের ইতিহাসকবিদ্ শ্রীযুক্ত ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।[৪২] পণ্ডিতমহলে তাঁর পাঠটি প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত। ওই লিপি দুটির একটি অপরটিরই সংক্ষিপ্তরূপ। আমরা তাই প্রশস্ত লিপিটি নিয়েই আলোচনা করব। প্রশস্ত লিপিটির ব্রতীনবাবু কৃত সম্পূর্ণ পাঠ নিম্নরূপ :

In the month [of] Elul (Ululu) [of] year 16 king Priyadarsi scattered abundantly (i.e. dispersed) [and] pushed out of (or expelled from) the prosperous [population] [those who] rush [after] what is hunting of fishes and creatures [and] the lovers of what (i.e which) is worthless (or empty) work. 500 (?) 'bows' [measure] this mountain named 'hwty'. This road [is] Krpty (Kārpathi), [so] it is said. Towards the garden [the distance is] 300 [bows]. Trt' is [from] here 13 [bows]. The height [of the mountain] is 200 [bows] [or Trt'] is [from] here 13 [bows] in addition to 200 [bows]. The scribe ... with (i.e. together with) W'su the judge [and] the pure [one]. Whsu, the dispenser of meritorious work, the governor, the pure [one] [and] (settler of guilt and punishment?)' (অপ্রশস্ত শিলালেখটিতে Tadmor নাক আর একটি পাহাড়ের উল্লেখ আছে)।

দেখা যাচ্ছে যে এই লিপিটির তিনটি অংশে তিনটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। আমাদের আলোচনার পরিসরের মধ্যে প্রথম অংশটি প্রধান হলেও এ অংশের কয়েকটি তথ্য দ্বিতীয়াংশেরও কয়েকটি তথ্যের সঙ্গে জড়িত বলে এই দু অংশ নিয়েই আমাদের আলোচনা থাকবে।

অত্যন্ত শুষ্ক জলবায়ু এবং প্রায় বৃষ্টিপাতহীন এই লাঘমান এলাকার মধ্য দিয়ে দুটি পার্বত্য নদী যদিও লাঘমান জেলার দক্ষিণপ্রান্তে প্রবাহিত কাবুল নদীর সঙ্গে মিশেছে, তথাপি এ অঞ্চলে কোনো প্রকার তৃণজাতিয় শস্যের উৎপাদন সম্ভব নয়। এ অঞ্চলের অধিবাসী আরামায়িক ভাষীদের আদি নিবাস নিশ্চিতই ছিল সিরিয়র উত্তরাংশে, যে স্থান আরামায়িক ভাষার মূল এলাকা। শুধু আরামায়িক

ভাষায় অশোকের লিপি খোদিত হওয়াই প্রমাণ করে যে সে অঞ্চলে আরামায়িকভাষীরা অতীত কালে সিরিয়া থেকে এখানে অভিবাসিত হয়েছিল। হয়তো কোনো হিট্টী রাজা বা কোনো অবেস্তীয় ইরাণী রাজা উত্তর সিরিয়া জয় করে সেখানকার অধিবাসীদের একাংশকে তাদের তৎকালীন রাজ্যের সীমান্তবর্তী লাঘমান এলাকায় নির্বাসিত করে থাকতে পারে। সঙ্গতভাবেই বলা যায় যে অভিবাসন কালে সিরিয়ার পার্বত্য ও শুষ্ক আবহাওয়ার অঞ্চলে জীবিকার্জনে যে শুষ্ক ফলের বাগানের চাষ প্রচলিত ছিল, লাঘমানে অভিবাসিত আরামায়িকভাষীরা সেই একই আবহাওয়ায় তাদের জন্ম ভূমিতে অনুসৃত জীবিকার্জনের পন্থারই অনুসরণ করেছিল। লাঘমান শিলালেখে 'বাগান' এর অবস্থান সে অনুমানকে যথার্থ করেছে।

ওই শিলালেখ থেকেই জানা যাচ্ছে যে সে অঞ্চলে আরামাইকভাষীরা ছাড়াও আর একদল জনগোষ্ঠীর অবস্থান ছিল যারা, 'rush after what is hunting of fishes and creatures'. এ প্রসঙ্গে তিনটি বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। তার প্রথমটি হলো : সমাজ বিকাশের বিশ্বজনীন নিয়ম অনুযায়ী শিকারজীবীরা অনিবার্যভাবে খাদ্যসংগ্রাহক হয় এবং তারা প্রকৃতিতে প্রাপ্ত সমস্ত খাদ্যকেই বিনা বাধায় আহরণযোগ্য বলে বিবেচনা করে। দ্বিতীয়টি হলো : মানুষ যখনই দুটি বিষয় একসাথে উচ্চারণ করে তখন অনিবার্যভাবে যেটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটিকেই প্রথমে উচ্চারণ করে। সে বিচারেই বলা যায় যে লাঘমান এলাকার abundantly scattered মৎস্য ও প্রাণী শিকারী মানুষেরা জীবিকার্জনে মুখ্যত মৎস্যজীবী হিসেবেই চিহ্নিত হতো। আর সে বিবেচনায় সঙ্গতভাবেই বলা যায় যে তারা বৃত্তিগতভাবে কৈবর্ত জাতির মানুষ ছিল। আর তৃতীয়টি হলো : শিকারজীবী ওই গোষ্ঠীটি কোনো স্থায়ী গ্রাম বা কোনো এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা ছিল না—তারা ছিল যাযাবর। যে কোনো শিকারী খাদ্যসংগ্রাহক গোষ্ঠীর মতো তারা উপাজাতিয় ভ্রাতৃত্ববোধ সংঘবদ্ধ ছিল। আর সে কারণেই তো অশোককে তাদের abundantly scatter করতে হয়েছিল।

এই শিকাবী খাদ্যসংগ্রাহকদের যে অঞ্চল থেকে অশোক abundantly scatter করেছিলেন সে অঞ্চলটি চিহ্নিত করতে অশোক সেখানকার পরিমণ্ডলের তিনটি উপাদানকে ব্যবহার করেছেন। মনে হয় তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যেন বহু প্রজন্ম পরের আরামায়িকভাষী মানুষেরাও ওই তিনটি চিহ্ন থেকে তাঁর কার্যক্রমের ক্ষেত্রটি চিনতে পারে। এই তিনরকম উপাদানের মধ্যে আছে তিনটি পাহাড় : Whty, Tadmor এবং 'Trt', আর আছে Kārpathy নামক রাজপথটি, আর তৃতীয়টি হলো (ফলের) বাগান। পাহাড় তিনটি অবিনশ্বর, ইরাণীয় ভাষায় নামাঙ্কিত রাজপথটি অবশ্যই অশোকের তথা মৌর্যরাষ্ট্রের সে অঞ্চলে অধিষ্ঠানের অনেক আগে থেকেই রয়েছে এবং অশোকের মৃত্যুরও বহু যুগ পর পর্যন্ত টিকে থাকবে। আর তৃতীয় উপাদান বাগানটিকেও অশোক দীর্ঘস্থায়ী চিহ্ন হিসাবেই বেছে নিয়েছিলেন।

ওই ফলের বাগানের (মনে হয় আরো কয়েকটি ফলের বাগান সে অঞ্চলে না থাকলে এলাকাটি prosperous বলে বিবেচিত হতে পারে না) আর্থ-ইতিহাস বিচার করেই সুনিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে ওই মৎস্য ও প্রাণী শিকারজীবীরা সে অঞ্চলে নবাগত ছিল। না হলে একই ভৌগোলিক অঞ্চলে, অত্যন্ত সীমিত জীবিকার্জনের সুযোগ সমন্বিত এলাকায় দুই পরস্পর বিরোধী সমাজ তথা জীবিকার্জন ব্যবস্থার মানুষ সহাবস্থান করতে পারে না। হয় একদল অপরদলকে সম্পূর্ণ আত্তিকরণ করে নেবে, নয়ত একদল অপর দলকে সে এলাকা থেকে উৎখাত করবে। যেহেতু বাগানগুলি দীর্ঘদিন পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত তাই সে এলাকায় আরামায়িকভাষীদের অর্থনৈতিক বিকাশের কালে সে অঞ্চলে ভিন্নতর ব্যবস্থা যুক্ত গোষ্ঠীর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। এবং এটাও অত্যন্ত স্পষ্ট যে সেখানকার আরামায়িকভাষী

অধিবাসীদের তথা মৌর্য শাসকদের সম্মতিতে তাদের সে অঞ্চলে আগমন ঘটেনি বলেই স্বয়ং অশোককে তাদের abundantly scatter করতে হয়েছিল।[৪৩]

●

আজ থেকে আরো দু'হাজার বছরের বেশি পিছিয়ে আবার এক পাথুরে দলিলে কলিঙ্গকে পাচ্ছি। বর্তমান উড়িষ্যার হাতীগুম্ফা গুহাগাত্রে সেটি উৎকীর্ণ করেছিলেন 'illustrious Khāravela ... overlord of Kalinga... the increaser (of the) glory of the Chedi dynasty.'[88]

প্রথমেই এই সম্রাটের racial identity কি তা জানা যাক। তিনি নিজের সম্বন্ধে বলছেন যে তিনি চেদী বংশ জাত। সকল পণ্ডিতই একমত যে 'চেদী' কথাটি জাতিবাচক এবং তা দ্রাবিড় সম্পর্কযুক্ত। এ সম্পর্কে অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যটিই সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য, "রাজার এই অনুশাসন পড়ে কে বুঝবে যে তাঁর নাম আর্য ভাষার নয়— দ্রাবিড় 'কার' অর্থে 'কালো', কৃষ্ণ এবং 'বেল' অর্থে 'বল্লম'। কারবেল বা খারবেল শব্দের অনুবাদ হবে 'কৃষ্টার্ষ্টি' (অর্থাৎ কৃষ্ণ ঋষ্টি বা বল্লম যার)।[৪৫]

কলিঙ্গ সম্রাট খারবেলের হাতীগুম্ফার শিলালিপির দ্বাদশ পংক্তিতে যা আছে তার পাঠোদ্ধার করে বিখ্যাত প্রত্নবিশেষজ্ঞ বেনীমাধব বরুয়া তার এরূপ তর্জমা করেছেন। "And in the twelfth year... with the aid of thousands of Sivis (?) (His Majesty) produced consternation among the rulers of Uttarapathi, while generating an immense fear among the people of Magadha, Caused elephants and horses to drink in Gangas, and compelled Bahasatimitra, the king of Magadha, to bow down at his feet, (did something in connection with) the settlement of Kalinga people subjugated by King Nanda."[৪৬]

অধ্যাপক বরুয়া মূল লেখটির jana-sam(n)i(ve)sam কথাটির অর্থ হিসাবে settlement কথাটি ব্যবহার করেছেন। এই 'জনসন্নিবেশন' কথাটি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে 'জন-স্থানান্তর' অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

অতি উচ্চশিক্ষিত সম্রাট খারবেল স্পষ্টতই তৎকালীন ভারতভূখণ্ডের ইতিহাস ও ভূগোলের সঙ্গে সম্যক পরিচিত ছিলেন। দুটি উদাহরণেই তা স্পষ্ট হবে। প্রথমটি হলো : "Now in the fifth year he brings into the capital from the road of Tanusuliya the canal excavated in the year one hundred and three of King Nanda." এটি আছে শিলালিপিটির ষষ্ঠ পংক্তিতে। আর দ্বিতীয়টি হলো : "...(he) thoroughly breaks up the confederacy of the T(r)amira (Dramira) countries of one hundred and thirteen years, which has been a source of danger to (his) country..." এটি আছে শিলালিপিটির একাদশ পংক্তিতে।

এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে খারবেল শিলালিপিটির দ্বাদশ পংক্তিতে যে রাজাকে 'নন্দরাজা' (King Nanda) বলেছেন সেই একই রাজাকেই ষষ্ঠ পংক্তিতে তিনি 'নন্দরাজ' বলতে পারেন না। দুটি ঘটনার মধ্যে সময়ের দুস্তর ফারাক। বোঝা যাচ্ছে যে খারবেল প্রাচীন মগধরাজ মাত্রকেই 'নন্দরাজ' বলতে অভ্যস্ত ছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিত স্মরণে রেখেই হাতীগুম্ফা শিলালেখের দ্বাদশ পংক্তিটির ঐতিহাসিকতার মূল্যায়ন করতে হবে।

সে বিচারে শিলালেখটি থেকে এটা স্পষ্ট যে এক নন্দ রাজা কলিঙ্গ জয় করে তথাকার এক বৃহৎ সংখ্যক অধিবাসীকে স্থানান্তরে পাঠিয়েছিলেন। নজীরবিহীন সেই দুষ্কর্মের জন্যই পরাজিত বহষতিমিত্রকে সম্রাট খারবেল তার পদতলে নতজানু হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করতে বাধ্য করেছিলেন। প্রাচীন

ভারত ইতিহাসে অশোকই একমাত্র মগধরাজ যিনি স্বয়ং ত্রয়োদশ শিলালেখে উৎকীর্ণ করে গেছেন যে কলিঙ্গ যুদ্ধের পর বহু সংখ্যক মানুষকে তিনি নির্বাসনে পাঠিয়েছিলেন।

এ থেকেই সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে যুদ্ধান্তে কলিঙ্গের মানুষদের দূর দূরান্তে নির্বাসিত করার এই দানবীয় কাজ অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রায় দুশত বছর পরেও কলিঙ্গবাসীরা সেটা ভুলতে পারেনি, ক্ষমা করতে পারেনি। আর বহষতিমিত্রকে এই শাস্তিদানের তথ্যটি, কলিঙ্গ যুদ্ধান্তে সম্রাট অশোকের বহু রাজকীয় কার্যক্রমের মূল্যায়নে অবশ্য ব্যবহার্য তর্কাতীত এক পাথুরে দলিল।

●

এবারে আসা যাক কলিঙ্গ অন্বেষার সর্বশেষ স্থলে। "When King Devanampriya Priyadarsi had been annointed eight years (the country of) Kalinga was conquered (by him). One hundred and fifty thousand in number were deported thence.. "[৪৭] কলিঙ্গ যুদ্ধান্তে এই দেড়লক্ষ লোককে নির্বাসিত করার মধ্যেই আমরা সীমিত থাকব। কিন্তু সে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার আগে এই দুহাজার বছরের বেশিকাল ব্যাপী অতি বিস্তৃত ভূভাগ জুড়ে আমাদের এই অন্বেষায় কি কি পেলাম তার একটা সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরা দরকার।

একদা কলিঙ্গ উদ্ভুত কৈবর্ত্ত বা কেওটদের ও তৎসহ তথাকাব দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত কয়েকটি নরগোষ্ঠী সম্বন্ধে এই অন্বেষার মধ্য দিয়ে কয়েকটি বিষয় প্রতিপাদিত হয়েছে। **প্রথমত**, এই অন্বেষায় যেখানেই কলিঙ্গ নামধেয় গ্রাম, স্থান বা রাজ্যের অস্তিত্বের তথ্য পাওয়া গিয়েছে (অতীতে বা বর্তমান কালের) তার সবকটিতেই মৎস্যজীবী বা নৌজীবী কৈবর্ত বা কেওটদের উপস্থিতি বা একদা উপস্থিতির সাক্ষ্য পাওয়া যাচ্ছে। **দ্বিতীয়ত**, এইসব কলিঙ্গ অভিধাধারী সমস্ত অঞ্চলই হয় অতীতে জঙ্গলাকীর্ণ ছিল, নয়ত এখনও তাই আছে। অধিকন্তু এর সবগুলিই ছিল নদীবহুল অঞ্চলে, যার মধ্যে কতকগুলি ছিল পার্বত্য এলাকা। **তৃতীয়ত**, এই জঙ্গলাকীর্ণ স্থানগুলির সবগুলিই ব্যতিক্রমহীনভাবে কলিঙ্গ যুদ্ধপূর্ব মৌর্যসাম্রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত ছিল। **চতুর্থত**, দ্রাবিড়ভাষা গোষ্ঠীর ওরাওঁ, মালপাহাড়ী ও ব্রাহুইদের আজও যেসমস্ত অঞ্চলে পাওয়া যাচ্ছে সে সবগুলিও কলিঙ্গযুদ্ধপূর্ব মৌর্যরাষ্ট্রের সীমান্তস্থিত পার্বত্য অঞ্চল। এবং **পঞ্চমত**, যে সব স্থানে কৈবর্ত বা কেওটদের পাওয়া যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে যে তারা সে সব স্থানের স্থানীয় ভাষাকেই মাতৃভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছে, তাদের আদি মাতৃভাষাকে ভুলে গিয়েছে। কিন্তু যেহেতু ওরাওঁ, মালপাহাড়ী এবং ব্রাহুইরা তাদের অধিষ্ঠানের অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য, সে কারণে তারা তাদের আদি মাতৃভাষাকে ধরে রাখতে পেরেছে, ভুলে যেতে হয়নি।

এবার দেখা যাক অশোকের শিলালেখ সমূহে এইসব জঙ্গলবাসী ও সীমান্তবাসীদের প্রতি অশোকের কোন মানসিকতা প্রকাশ পাচ্ছে। প্রথমে জঙ্গলবাসীদের নিয়ে আলোচনা হবে, পরে হবে সীমান্তবাসীদের নিয়ে।

একটা কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে অশোক-নির্বাসিত কলিঙ্গীরা নিশ্চিতই মৌর্য রাষ্ট্রের দক্ষিণে বা দক্ষিণপূর্ব সীমান্তে প্রেরিত হয়নি। কারণটা সহজেই অনুমেয়। অশোকের রাজত্বকালেও আদি তামিল ভাষা চারটিভাবে বিভক্ত হয়ে যায়নি। তাই কলিঙ্গের যুদ্ধবন্দী সহ তাদের পরিবারের মধ্যে আদি তামিলভাষীরাই সর্বাগ্রগণ্য ছিল বলেই সঙ্গত অনুমান, এবং তারা ছিল অগণিত প্রিয়জন হারানোর এবং স্বভূমি থেকে উৎখাত হয়ে যাওয়ার তিক্ত স্মৃতিবহনকারী। তাদের দক্ষিণ বা দক্ষিণ-পশ্চিমের আদি তামিলভাষীদের এলাকায় প্রেরণ করে সেখানকার মানুষের মধ্যে সম্রাট অশোক তথা মৌর্যরাষ্ট্রের প্রতি

চরম বিরূপতা জাগরূক করে দেবার সুযোগ সৃষ্টির কার্যক্রম অনুসরণ করার মতো নির্বোধ নিশ্চিতই অশোক ছিলেন না।

ত্রয়োদশ শিলালেখে কলিঙ্গ যুদ্ধে অবর্ণনীয় লোকক্ষয় ও তথাকার মানুষের দুর্দশার জন্য সম্রাট অশোক সাধারণভাবে অনুতাপ প্রকাশ করেই বলছেন, "But the following is considered **more deplorable than this by Devanampriya**. (To) the Brahmins and Sramanas or other sects or house-holders who are living there (and) among whom the following is practised, obedience to mother and father, obedience to elders, proper courtesy to friends, acquintances, companions and relatives, to slaves and servants, (and) firm devotion, to them then happens injury or slaughter or deportation of their beloved ones." (গুরুত্ব সংযোজিত)

এই উদ্ধৃতির ব্রাহ্মণ ও শ্রমণরা সবাই আর্য সংস্কৃতির মানুষ। আর ক্রীতদাস ক্রয়ে বা ভৃত্য প্রতিপালনে সক্ষম বিত্তশালী গৃহস্থেরাও নিশ্চিতই কলিঙ্গের এক অংশ নন্দ অধিকারে থাকাকালীন মগধাগত ও আর্যসংস্কৃতির মানুষ ছিল। সে কারণেই এরকম পরিবারের মধ্যে যারা কলিঙ্গ যুদ্ধে আহত, নিহত বা নির্বাসিত হয়েছিল তাদের অবস্থান সম্রাট অশোকের কাছে ছিল 'more deplorable'। আর সেই মানসিকতাতেই ওপরের পংক্তিটির পর আরও কয়েক পংক্তি জুড়ে মানবতাবোধের তত্ত্ব আলোচনা করে হঠাৎই মানবতাবাদী অশোক রণমূর্তি ধারণ করে বলছেন, "And even (the inhabitants of) the forests which are (included) in the dominion of Devanampriya, even those he pacifies (and) induces to mediate, i.e. convert."

আর এর ঠিক পরের পংক্তি "And they are told of the power (to punish them) which Devanampriya (posseses) inspite of (his) repentance, inorder that they may be ashamed (of their crime) and may not be killed."

অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় অশোক জানাচ্ছেন যে কলিঙ্গ যুদ্ধে মানুষের ক্ষয়ক্ষতির জন্য তিনি অনুতাপ প্রকাশ করছেন। এবার জঙ্গলবাসীরাও তাদের কৃত অপরাধের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করুক, নইলে তাদের প্রাণ হারতে হবে।

কলিঙ্গ যুদ্ধে যুযুধান দুপক্ষের মধ্যে মৌর্যরা একপক্ষ। আর সেই যুদ্ধে অপর পক্ষ ছিল জঙ্গলবাসীরা; এই শিলালেখ প্রচারের অন্তত চারবছর পূর্বেই যাদের তিনি জঙ্গলবাসী হতে বাধ্য করেছিলেন। আর তা যদি না হয়ে থাকে তবে মানতে হয় যে মৌর্যরাষ্ট্রের সমস্ত জঙ্গলবাসীরা জঙ্গল ত্যাগ করে কলিঙ্গ প্রান্তরে অশোকের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছিল। এটাকে বিকৃত মস্তিষ্কের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু বলা যায় কি? এই জঙ্গলবাসীদের বিরুদ্ধে উষ্মার কারণ একটাই ছিল, আর সেটা হলো কলিঙ্গ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে দেবতাদের আশীর্বাদধন্য অশোকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ। সেই 'গর্হিত' কাজের জন্য অনুতাপ প্রকাশ না করলে তাদের যে হত্যা করা হবে, মহানুভব সম্রাট সে কথাটাও অত্যন্ত স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। মানবতাবাদী সম্রাট অশোকের এ মনোভাবের বিশ্লেষণের প্রয়োজন পড়ে কি?

এই ত্রয়োদশ শিলালেখের জঙ্গলবাসীরা যে প্রকৃত প্রস্তাবে আমাদের অন্বেষায় প্রাপ্ত দ্রাবিড় অধ্যুষিত মৌর্য রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী জঙ্গলসমূহের তৎকালীন অধিবাসী সেটা নিশ্চিতই প্রতিপাদিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের অন্বেষায় মৌর্য রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে এবং সীমানার বাইরেও যে কলিঙ্গাগতদের অভিবাসন চিহ্ন আমরা পেয়েছি সে সম্পর্কে কোনোও সূত্র কি সম্রাট অশোকের শিলালেখ সমূহে

পাওয়া যায়? এ প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তরের তথ্য অশোকের শিলালেখ সমূহেই রয়েছে। আর সেজন্য ইতিহাসবিদদের কাছে সম্রাট অশোক নিশ্চিতই ধন্যবাদার্হ। মৌর্য রাষ্ট্রের সীমান্তের বাইরের কলিঙ্গ উৎসাদিতদের সম্বন্ধে তাঁর দ্বিতীয় স্বতন্ত্র কলিঙ্গ শিলালেখে আছে, "The unconquered people beyond the borders of my dominon..." এই লেখেই তিনি আরও জানাচ্ছেন, "... that they may learn this also that the king will forgive them what can be forgiven."[৪৮] তৎকালীন রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অভিজ্ঞ সম্রাট নিশ্চিতই জানতেন যে অপর রাষ্ট্রের কোনোও নাগরিক বা অধিবাসীকে পুরস্কৃত করার বা শাস্তি দেবার অধিকারী তিনি ছিলেন না। তাই প্রশ্ন হলো অশোকের সময়ে মৌর্য রাষ্ট্রের কোন কোন সীমান্তের বাইরে মৌর্যরাষ্ট্রের একদা অধিবাসীরা অবস্থান করতে পারে যাদের তিনি ক্ষমা করার কথা বলছেন? সেরকম মৌর্যরাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলি হলো উ: পূ: ভারতের কোচবিহার ভূটান-গোয়ালপাড়া অঞ্চল এবং পশ্চিম নেপালের তরাইয়ের উত্তরস্থ 'কামদা' উপত্যকা। এ সব মৌর্য সীমান্ত এলাকায় পাঠানো নির্বাসিতরাই কালক্রমে অত্যাচারী মৌর্যরাষ্ট্রের আওতার বাইরে থাকার ইচ্ছায় এবং জীবিকার্জনের সুযোগের সন্ধানে মৌর্য রাষ্ট্র সীমান্ত অতিক্রম করে সেইসব জনবিরল এবং খুবই সম্ভবত রাষ্ট্র ব্যবস্থাহীন অঞ্চলে চলে গিয়েছিল; মৌর্য রাষ্ট্রের সাপেক্ষে তারা স্বাধীন হয়ে গিয়েছিল।

এ'ত গেল অশোককালীন মৌর্যরাষ্ট্রের সীমান্তের বাইরের অঞ্চলের মানুষদের কথা, অশোকের ভাষায় যারা ছিল 'the unconqured people beyond the borders of my dominion' তাদের কথা। এবার মৌর্যরাষ্ট্রের সীমান্তের অভ্যন্তরে থাকা সীমান্তবাসীদের কথায় আসা যাক।

এঁদের সম্পর্কে দ্বিতীয় স্বতন্ত্র কলিঙ্গ শিলালেখে অশোক জানাচ্ছেন, "...that I may discharge the debt I owe to the frontier peoples and that is my unshakable resolution and vow"— আর এ অনমনীয় প্রতিজ্ঞার উদ্দেশ্য কি? এর পরের পংক্তিতেই তিনি সেটা পরিষ্কার করেছেন "Therefore you must carryout your duties by acting in this way and install into them the confident belief that the king is to them like a father..." কিন্তু তাঁর মুখের কথায় যে এ কাজ হবে না সেটা তিনি ভালো করে বুঝতেন বলেই কিছু পরে লিখছেন, "In fact you are capable of inspiring them (the borderers) with confidence..." সেজন্যই সমাপ নগরের মহামাত্রকে উদ্দেশ্য করে প্রচারিত ঐ লিপিতে তিনি কবুল করেছেন যে তাঁর মুখের কথায় সীমান্তবাসীরা তাঁকে তাদের পিতার মতো ভাবতে রাজী নয়— একাজ কেবল মহামাত্রই করতে সক্ষম। সম্ভবত বলার অপেক্ষা রাখেনা যে যার বাহিনীর আগ্রাসনের ফলে যারা পিতা-পুত্র-বন্ধুদের হারিয়েছিল, সে যুদ্ধে যোগদানকারী কলিঙ্গীয়দের মৃত বা জীবিত প্রতি ব্যক্তির পরিবারকে তাদের চাষের ও বাসের জমি থেকে উৎখাত করে শত শত মাইল দূরবর্তী সীমান্তের জঙ্গলে আবার শিকারী খাদ্যসংগ্রাহকের জীবনে প্রবেশ করতে বাধ্য করা হয়েছিল, তারা অশোকের মুখের কথায় তাঁকে পিতার মতো দেখবেন এরকম আশা পোষণ করার মতো বাতুল সম্রাট অশোক ছিলেন না।

সম্ভবত আমাদের অন্বেষায় প্রাপ্ত দ্রাবিড় অধিষ্ঠানের চিহ্নযুক্ত মৌর্য রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী যে স্থানগুলিকে আমরা পেয়েছি স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে সে এলাকার মানুষেরাই হলো সেই সীমান্ত নিবাসীরা যাদের সম্বন্ধে অশোক লিখেছেন, "the debt I owe to the frontier people."

আর একবার একে একে মৌর্যরাষ্ট্রের সেইসব সীমান্ত এলাকাগুলির দিকে চোখ বোলান যাক। মৌর্য রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের নিকটতম দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্ত হলো ছোটনাগপুরের জঙ্গলাকীর্ণ মালভূমি— এখানে পাওয়া যাচ্ছে কুরুখভাষী ওরাওঁ এবং মালতোভাষী মালপাহাড়ীদের। আরো

দক্ষিণ-পূর্বে বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্তী সীমান্ত হলো মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, যার পাশেই রয়েছে কলকাতা ও নদীয়া। এই এলাকার অক্ষাংশ এবং জলবায়ু নোয়াখালী পর্যন্ত বিস্তৃত সুন্দরবনের অক্ষাংশ এবং জলবায়ুর মতই— তাই অতীতে এ অঞ্চলও সুন্দরবনের মতই জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। রেণেলের মানচিত্রও (মধ্য অষ্টাদশ শতক) তাই জানাচ্ছে। এখানে পেলাম কলিঙ্গ বন এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেপাখ্যানের এক কলিঙ্গরাজ্য; আর পেলাম বেশ কয়েকটি কলিঙ্গ নামক গ্রাম ও স্থানকে। আর এই সমগ্র অঞ্চল ছিল কৈবর্ত অধ্যুষিত— যারা বিংশ শতাব্দীতে মাহিষ্য অভিধায় পরিচিত। এরপর কয়েকশত মাইল উত্তরে পাড়ি দেবার পর এলাম করতোয়া নদী বিধৌত হিমালয়ের সানুদেশে; এখানেই পেয়েছি কলিঙ্গ বন এবং বিজয় সেন ও জাতবর্মা কথিত কলিঙ্গরাজ্য বা রামচরিত-বল্লালচরিতে কথিত কৈবর্ত তথা ম্লেচ্ছরাজ্য। কিছু দক্ষিণে করতোয়ার পশ্চিমাংশের দিনাজপুরে পেয়েছি 'কলিঙ্গজুরা' গ্রামকে। এবার পশ্চিমদিকে আরো কয়েকশত মাইল গিয়ে নেপালের পশ্চিমাংশের তরাই-এর জঙ্গলের প্রান্তে পেলাম দ্রাবিড়ভাষী ধাঙড়দের, আর সে এলাকায় কিছু উত্তরে পাচ্ছি একগুচ্ছ কলিঙ্গ (খলঙ্গা) গ্রামকে। এরপর কয়েকশত মাইল উত্তর-পশ্চিমে গিয়ে বালুচিস্তানের কালাতের দ্রাবিড়ভাষী ব্রাহুইদের পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে থেকে আরো কিছু পশ্চিমে আফগানিস্তানের লাঘমানে পেয়েছি একদল মৎস্য ও প্রাণী শিকারীদের, যাদের সম্রাট অশোককে স্বয়ং উপস্থিত থেকে abundantly scatter করতে হয়েছিল।

●

আমাদের এই অন্বেষায় দেখা গেল যে ভারতীয় উপমহাদেশের কতকগুলি বিশেষ অঞ্চলেই কলিঙ্গ বা তার সমোচ্চারিত বহু স্থান নামের অবস্থান পাওয়া যাচ্ছে। মহাকাব্যদ্বয়ের মুখ্য চরিত্রদের নামানুসারেও এই উপমহাদেশের বহু স্থানের নামকরণ হয়েছে। এক একজন দেবতার নামেও বহু স্থান চিহ্নিত। কিন্তু কলিঙ্গ কোনোও মহাকাব্যের কোন মান্য চরিত্র নয়— এমনকি কলিঙ্গ কোনোও পবিত্র স্থানও নয়।

কিন্তু এটা কি করে হলো যে 'কলিঙ্গ' নামাঙ্কিত সমস্ত স্থানই ব্যতিক্রমহীনভাবে মৌর্য রাষ্ট্রের সীমান্ত এলাকায় জন্ম নিয়েছিল? কোনও কোনও প্রাজ্ঞ ইতিহাসবিদ বলেন (তাঁরা কখনোই সে কথা লেখেন না— সম্ভবত 'শতংবদ মা লিখ' প্রবাদটিকে মান্য করেই) যে এটা নাকি একটা স্বাভাবিক ঘটনা। কেননা ভারতভূখণ্ডের বিভিন্ন জাতি চিরকালই একই ভৌগোলিক অঞ্চলে আবদ্ধ থাকেনি— তারা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। আর সেভাবেই নাকি দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়ভাষীরা স্বেচ্ছাপরিযান করেই ঐসব এলাকায় উপস্থিত হয়ে স্থান নামে এদের উপস্থিতির স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন।

এটা একটা অনস্বীকার্য ঐতিহাসিক সত্য। তবে স্বেচ্ছাপরিযান তো ভারতভূখণ্ডের সব নরগোষ্ঠীই করেছিল, কেবল ওই দাক্ষিণাত্যের মানুষেরাই নয়। ওই সব প্রাজ্ঞ ইতিহাসবিদদের কথা মেনে নিলেও প্রশ্ন থেকে যায়, কেন আর্যাবর্তের বিভিন্ন প্রান্তে প্রাচীন সৌরাষ্ট্র, গান্ধার, তক্ষশীলা বা উজ্জয়িনী নামক গুচ্ছ গুচ্ছ স্থান পাওয়া যায় না? কেন রাঢ়, সুহ্ম বা পুণ্ড্রনগরকে বাংলার বাইরে কোথাও পাওয়া যায় না? আসলে যে কালে ভারতের বিভিন্ন নরগোষ্ঠী এরকম স্বেচ্ছাপরিযান করত তখন তারা দিল শিকারী-খাদ্যসংগ্রাহকরূপে যাযাবর জীবন যাপক। স্থায়ী গ্রামের তখন সূচনাই ঘটেনি। তাই স্থান নামে তাদের এই পরিযানের সাক্ষ্য পাওয়া সম্ভব নয়।

তাই অনিবার্যভাবে আমাদের এই উপসংহারেই পৌঁছতে হয় যে যুগে যুগে, দেশে দেশে যে 'কলিঙ্গ' স্থান নামে পাওয়া গেছে তার সবগুলিই কলিঙ্গ যুদ্ধান্তে সম্রাট অশোক কর্তৃক কলিঙ্গীদের নির্বাসিত করারই ফলশ্রুতি।

তথ্যসূত্র ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১. Yule & Brunell– Hobson-Jobson. 1998 (Ed) pp 487-490

২. এই পর্বের উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গের 'কলিঙ্গ' বা সমোচ্চারিত গ্রামগুলি ১৯৮১ সালের সেনশাস রিপোর্ট থেকে গৃহীত।

৩. প্রফুল্ল কুমার সরকার— নদীয়া ও তাহার প্রত্নসম্পদ— ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩২৩ (পুরাবৃত্ত ১, ২০০০ পুনর্মুদ্রিত পৃ ৩১৯-৪০০)

৪. D. D. Kosambi– The Culture & Civilisation of Ancient India, Reprint 1997. p. 42

৫. Prem Khatry– The Manjani System of the Danwar State of the Kamda Valley– Journal of the Centre for Nepal and Asiatic Studies Vol. 22. No. 1. Jan 1995.

৬. Village Directory of Presidency Devision of Bengal :
(ক) Vol. XIV – District Rangpur, Calcutta, 1887
(খ) Vol. XII – District Dinagpore, Calcutta, 1885
(গ) Vol. XXXVII – District Sonthal Parguna, Calcutta, 1886.

৭. P. C. Choudhury– The History and Civilisation of the People of Assam up to 12th Century A. D. Gauhati 1959. p. 41.

৮. Richard M. Eaton– Essays on Islam and Indian History. N. Delhi, 2000. p. 172.

৯. নলিনী কান্ত ভট্টশালী— প্রত্নানুসন্ধানের সুখ দুঃখ— পুনর্মুদ্রিত পুরাবৃত্ত ১. পৃ. ৩৫৬

১০. নীহার রঞ্জন রায়— বাঙালির ইতিহাস— কলকাতা ১৩৮২, পৃ. ২৩১

১১. K. S. Singh– Scheduled Castes in India – N Delhi 1999 p. 421

১২. T. Mahalingam– Village Community in South India– in B.P. Salu (Ed). Land System & Rural Society in Early India, Delhi 1997. P. 186

১৩. Suniti Kumar Chatterjee- The Origin & Development of Bengali Language (henceforth ODBL). 2002 p. 66

১৪. সুনীতি চট্টোপাধ্যায়— ভারত সংস্কৃতি— কলকাতা ১৪০০ পৃ. ২০.

১৫. রামশরণ শর্মা— আর্যদের ভারত আগমন— কলকাতা ২০০১ পৃ. ৩৫

১৬. K. S. Singh– Ibid– P.421

১৭. Summer Institute of Linguistic (SIL)-এটি ত্রিভুবন বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত।

১৮. Dor Bahadur Bista– People of Nepal. Katmandu. p. 146.

১৯. T. Thankappam Nair সম্পাদিত–A Historical and Topographical Sketch of Calcutta– By Rainey– Calcutta 1876. Reprint 1986. p. 136

২০. Tarun Kumar Mukhopadhyay– Hicky's Bengal Gazette. Calcutta 1988. p. 27.
২১. দুর্লভ চন্দ্র মল্লিক— গোবিন্দচন্দ্র গীত— (সম্পা.) শিবচন্দ্র শীল, কলকাতা ১৩০৮ সাল
২২. আমানতউল্লা আহ্‌মদ— কোচবিহারের ইতিহাস- কলকাতা ১৯৯০ (পুঃ মুঃ) পৃ. ১৪৮
২৩. ক্ষুদিরাম দাস— কবিকঙ্কণ চণ্ডী— কলকাতা। ২য় সং ১৯৯৯ পৃ ২৪৫
২৪. দীনেশ চন্দ্র সরকার— পাল-সেন যুগের বংশানুচরিত। কলকাতা ১৯৮২ পৃ ২২২
২৫. Lalonji Gopal– Ownership of Agricultural Land in Ancient India– B.P. Sahu সম্পাদিত প্রাগুক্ত গ্রন্থ। পৃ. ১০৪-৫
২৬. তথ্যসূত্রের ৬ (ক) সংখ্যক গ্রন্থ।
২৭. দীনেশ চন্দ্র সেন ও অন্যান্য (সম্পা.)— গোপীচন্দ্রের গান— কলকাতা ১৯২২ পৃ. ২২৪.
২৮. Mukunda Madhab Sharma– Inscriptions of Ancient Assam. Gauhati 1978. p. 176-7.
২৯. Nayanjot Lahiri– Pre-Ahom Assam– Gauhati 1991. p. 115.
৩০. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত— বিক্রমপুরের ইতিহাস— কলকাতা ১৩৪৬ পরিশিষ্টের ১৪ পৃ.
৩১. দীনেশ চন্দ্র সরকার— প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ ২১৬
৩২. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত— প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ ২৫১
৩৩. R.C. Majumder et.el.– Ramcharit, Sandhakarnandi– Varendra Research Society. Rajshahi 1939
৩৪. K. L. Barua– Early History of Kámrup. Shillong 1933. p 136.
৩৫. R. C. Majumder. et. el. প্রাগুক্ত গ্রন্থ
৩৬. Yule & Brunell– প্রাগুক্ত গ্রন্থ, পৃ ৪৮৯
৩৭. দীনেশ চন্দ্র সেন ইত্যাদি— প্রাগুক্ত গ্রন্থ
৩৮. M. B. Emeneau– Brahui & Dravidian Comparative Grammer. 1962. p. 50-51.
৩৯. ঐ ঐ p. 62
৪০. S. K. Chatterjee– ODBL. p2.
৪১. এই তথ্যটি নেপাল-বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক জহর সেন মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত।
৪২. B.N. Mukherjee– Studies in Aramaic Edicts of Asoka. Cal. 1984 p. 14.
৪৩. Sujit kumar Acharya– Socio-Political Perspective of Laghman Edicts of Asoka– এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রদত্ত এই বক্তৃতায় লাঘমান শিলালেখ সম্পর্কে যাবতীয় প্রশ্নের বিশদ আলোচনা আছে।
৪৪. Kashi Kant– Hatigumpha Inscription of Kharavela. Delhi 1971.
৪৫. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়— ভারত সংস্কৃতি— কলকাতা ১৪০০ সাল। পৃ. ১২.
৪৬. Kashi Kant– Ibid. p 29-30.

৪৭. Sachchidananda Bhattacharya– Select Asokan Epigraphs. Calcutta 1990. প্রবন্ধকারের 'নির্বাসিত কলিঙ্গীদের ঠিকানা' গ্রন্থে (অতঃপর নি.ক.ঠি) ত্রয়োদশ শিলালেখের সম্পূর্ণটাই পরিশিষ্টে দেওয়া আছে।

৪৮. Sachchidananda Bhattacharya– Ibid. নি.ক.ঠি-র পরিশিষ্টে ২য় স্বতন্ত্র কলিঙ্গ শিলালেখ সম্পূর্ণটাই আছে।

৪৯. মৌর্য রাষ্ট্রের দুর্গম সীমান্ত অঞ্চলে কলিঙ্গীদের নির্বাসিত করার এই কর্মসূচীটি কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকেই নেওয়া। L. Rangarajan লিখিত Kautilya The Arthasastra, Penguine, N. Delhi 1992 পুস্তকে Peaceful Rule of Acquired Territory নামক অধ্যায়ে আছে (পৃ. ৭৪১) যে নববিজিত রাজ্যে বিজয়ী রাজা কি কি করবেন তার এক বিস্তারিত তালিকা। এর একটি বিধান হলো All prisoners shall be released (on a special amnesty)। বলা নিষ্প্রোয়জন যে এই বন্দীরা অপরাধে সাজাপ্রাপ্তরা নয়, এরা যুদ্ধবন্দী। কিন্তু সম্রাট অশোক তৎকালের একটি প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রনৈতিক প্রথাকে সম্পূর্ণ আগ্রাহ্য করে কোনো যুদ্ধবন্দীকেই মুক্তি দেননি।

আর একটি বিধানে আছে "Thieves and mleechas shall be removed from their usual places of residence and dispersed. Chiefs of the fort, army and police, ministers and purohits who were supporters of the enemy shall be dispersed to different parts of the frontier regions of the territory". সমস্ত ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মপুস্তকে কলিঙ্গদেশকে ম্লেচ্ছদেশ এবং তথাকার অধিবাসী কৈবর্তদের ম্লেচ্ছ জাতি বলা হয়েছে। তাই অর্থশাস্ত্রের অনুজ্ঞাকে আরো ব্যাপক করে তার প্রয়োগ করেছিলেন অশোক।

৫০. Critical Re-appraisel of Asoka's Two Kalinga Edicts.

৫১. Socio-Political Perspective of Laghman Edicts of Asoka.

৫২. Origin of the Brahui

৫৩. প্রাচীন ভারতে খনিজ তেলের পরিপ্রেক্ষিতে কেবট্ট ভোগ

৫৪. সম্রাট অশোকের সমদর্শিতা

৫৫. কলিঙ্গ যুদ্ধ ও দক্ষিণবঙ্গের কতিপয় লৌকিক দেবদেবী

৫৬. মধ্যযুগে কোচবিহারে দ্রাবিড় রাজ্য।

৫৭. বঙ্গে কলিঙ্গের জল চিহ্ন

ক্যাম্প প্রকাশিত 'নির্বাসিত কলিঙ্গীদের ঠিকানা' গ্রন্থটি ছাড়াও উপরে লিখিত ৫০ থেকে ৫৭ সংখ্যক প্রবন্ধগুলিতে (প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত) সম্রাট অশোক, কলিঙ্গ যুদ্ধের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, যুদ্ধান্তে নির্বাসিতদের অবস্থানের অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক-ভৌগোলিক অবস্থা। যুদ্ধান্তে কলিঙ্গের সমাজ জীবন ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা রয়েছে। প্রয়োজনে প্রবন্ধগুলির জেরক্স কপির জন্য ২২১৯০৪৬৫ নম্বরে ফোন বা Attention Sri Acharya শিরোনামে irdianabtshp@rediffarail.com-এ e-mail করা যেতে পারে।

সমকাল ভাবনা

বিপন্ন গণতন্ত্র

অমিয় কুমার বাগ্‌চী

আমাদের পরমশ্রদ্ধেয়া অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টাচার্য সারাজীবন শুধু যে প্রাচীন ভারতবিদ্যার ওপর অমূল্য গবেষণা করেছেন তা নয় সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন ভারতীয়ের মঙ্গল অমঙ্গল নিয়েও অনলস ভাবনা করে গিয়েছেন এবং ভারতবিদ্যার সঙ্গে সেই ভাবনার যোগসূত্র নির্দেশ করে দিয়েছেন। আমার বর্তমান ভারত ও পৃথিবীর মঙ্গল চিন্তার সঙ্গে তাঁর কাজ ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

জন্মের সময় থেকেই স্বকীয়তার আকাঙ্ক্ষা মানবশিশুর শরীরমনকে স্বনির্ভর বিকাশের দিকে এগিয়ে দেয়। সেই স্বকীয়তার প্রস্ফুটন বাধা পায় শুধু পুষ্টির ও যত্নের অভাবে। অন্য মানুষের প্রয়াস দিয়ে সমবেতভাবে মানবমানবীর ক্ষমতা বর্ধন করার প্রয়াসে জন্ম হলো প্রথমে স্বেচ্ছাগঠিত সমাজের এবং সেই সমাজে অকল্যাণকর কাজকর্ম বন্ধ করার তাগিদে জন্ম হলো রাষ্ট্রের — যে রাষ্ট্র দণ্ডনীতির কর্তা হয়ে বসল। কিন্তু রাষ্ট্রের দণ্ডনীতি প্রায়শই অন্যায়ভাবে প্রযুক্ত হলো, স্বেচ্ছাবদ্ধ সমাজ হয়ে দাঁড়াল মানবগোষ্ঠীকে কারাগারে বন্দী রাখার সংগঠন। সমাজের মধ্যে যখন থেকে বিধিনিয়মের রেখা টেনে শ্রেণী এবং গোষ্ঠীর বিভেদ তৈরি হলো তখন থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রের অত্যাচার বিশেষ করে বর্ষিত হলো দরিদ্র নারীপুরুষ, নিম্নবর্গের নারীপুরুষ, ভিন্ন গাত্রবর্ণের নারীপুরুষের উপর। পুরুষের আধিপত্য যেহেতু সমস্ত শ্রেণী-বর্ণবিভাজনের মূল খুঁটি, সুতরাং সমস্ত শ্রেণী-বর্ণবিভক্ত সমাজে নারীর উপর অত্যাচার স্মৃতিশাস্ত্রের বিধানে প্রাকৃতিক নিয়মের আকার গ্রহণ করল।

বহুজনের উপর এই ধরনের সমাজ-রাষ্ট্রভিত্তিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ যুগে যুগে নানা রূপে প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের দেশে সেই প্রতিবাদ প্রায়শই নতুন ধর্মের রূপ নিয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম থেকে আরম্ভ করে, বৈষ্ণব, বীরশৈব, সহজিয়া, সুফি, বাউল সম্প্রদায়ের উত্থান জনগণের স্বাধীনতা আলোর দিকে যাওয়ার প্রচেষ্টা বিভিন্ন রূপ। সুতরাং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা যে আমাদের দেশে এবং অন্য দেশেও শ্রেণী বা গোষ্ঠীর অত্যাচারের ইতিহাসের সমান্তরাল ভাবে প্রবাহিত হয়েছে তা দাবি করা যেতে পারে।[১]

রাষ্ট্রব্যবস্থা সাধারণ মানুষ পরিচালনা করবে এই দাবি প্রথম সোচ্চার হয়েছে ইয়োরোপে। বিশেষ করে অষ্টাদশ শতকে জঁ জাক রুশো, টম পেন, কঁদরসে, মেরী উলস্টোনক্রাফট্‌ এবং গডউইনের লেখায় এই দাবি তাত্ত্বিক রূপ পেয়েছিল। অ্যাব্রাহাম লিংকনের বক্তৃতায় Government of the people, for the people, by the people – এই সূত্রে গণতন্ত্রের মূল কথা ধরা হয়েছে বলা হয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইনিভাবে কৃষ্ণকায় দাসত্বের উচ্ছেদের দশ বারো বৎসরের মধ্যে আফ্রিকাগত আমেরিকানদের নির্বাচনের অধিকার প্রায় সম্পূর্ণভাবে কেড়ে নেওয়া হয় এবং ১৯৬৪ সালের Civil

১ আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভবের পূর্বে গণতন্ত্রের পদধ্বনির আলোচনা রয়েছে আমার ১৯৯৫ সালে লেখা, Bagchi, 1995-এর ভূমিকাতে।

Rights Act- এর আগে সেই আইনি অধিকারও তারা ফিরে পায়নি (Du Bois, 1935/1992; Carnoy, 1994)।

সমস্ত সাধারণ মানুষের দ্বারা শাসিত সমাজ ও রাষ্ট্র যে মানবমুক্তির পূর্ণতার জন্যে অবশ্য প্রয়োজনীয় তার সবচেয়ে জোরালো যুক্তি বোধ হয় দেওয়া হয়েছে লিংকনের বক্তৃতার প্রায় আঠারো-কুড়ি বছর আগে কার্ল মার্কস্ ও ফ্রেডারিক এঙ্গেল্সের তাঁদের জীবদ্দশায় অপ্রকাশিত Philosophical Manuscripts এবং German Ideology-তে (Marx and Engels, 1845-46/1976)।

মার্ক্স্ এবং এঙ্গেল্সের আদর্শ অনুযায়ী গণতন্ত্র বা রবীন্দ্রনাথের মহান কবিতার ('চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির') লক্ষ্য পূর্ণ করতে পারে এমন সমাজ পৃথিবীতে আজও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রতিষ্ঠিত হয়নি তার কারণ পূর্ণ গণতন্ত্রের জন্যে দরকার দুই ধরনের মুক্তির পরিবেশ, যাদের আইজায়া বার্লিন বলেছেন positive liberty এবং negative liberty : বাংলায় বলা যায় হ্যাঁ-ধর্মী স্বকীয়তা এবং না-ধর্মী স্বকীয়তা। না-ধর্মী স্বকীয়তার পক্ষে ধ্রুপদী যুক্তি খাড়া করেছিলেন জন স্টুয়ার্ট মিল, তাঁর On Liberty বইতে (Mill, 1859)। এই আদর্শে কোনও মানবমানবীকেই তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করানো যাবে না, বা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার ওপরে কোনও কিছু চাপানো যাবে না। যদি মনে হয় এতে তার মঙ্গল হবে তা হলেও অন্যের নির্ধারিত পথে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে চালানো যাবে না। এই না-ধর্মী স্বকীয়তার সোচ্চার প্রচারক বহু তথাকথিত উদারপন্থী দার্শনিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। আইজায়া বার্লিনও মোটামুটি না-ধর্মী স্বকীয়তার পক্ষেই সওয়াল করেছেন। সম্পূর্ণভাবে না-ধর্মী স্বকীয়তা সমর্থন করা শক্ত। তথাকথিত ক্রিশ্চান সায়েন্সে বিশ্বাসী বাবা-মা যখন তাদের শিশুর চিকিৎসার জন্যে পরীক্ষিত ওষুধ প্রয়োগে বাধা দেবেন, বা আমাদের দেশের গোঁড়া বাবা-মা তাদের সন্তানকে বসন্তের টিকা নিতে দেবেন না, সমাজ বা রাষ্ট্র কি হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? কিন্তু না-ধর্মী স্বকীয়তা বজায় না থাকলে সত্যিকারের গণতন্ত্র বেঁচে থাকবে না, এবং মানুষের অসন্তোষের ফলে তা যে ভেঙে পড়ে তাব তো সবচেয়ে ট্র্যাজিক উদাহরণ হলো সোভিয়েট ইউনিয়নের পতন।

অন্যদিকে হ্যাঁ-ধর্মী মুক্তির পরিবেশ না থাকলে মানুষের নিজস্ব মত প্রয়োগ করার স্বাধীনতা যে নিষ্ঠুর পরিহাসে পরিণত হয় তার উদাহারণ আজকের ভারতবর্ষে সারাক্ষণ প্রকট ভাবে বর্তমান। চমস্কি তাঁর একটি লেখায় বলেছেন "Freedom without choice is the devil's gift"। যে মাকে ভাবতে হচ্ছে সকালে উঠেই তার সন্তানদের কীভাবে খাওয়াবে, তাকে যদি বলা হয় যে সে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীকে নির্বাচিত করার অধিকারী, সে সেই কথাটা কীভাবে নেবে? অথবা একটা গোটা হরিজনপাড়ার লোকেদের নিত্য চলাফেরার রাস্তার ওপর যদি তথাকথিত উঁচুজাতের লোকেরা দখলদারি কায়েম করে, তা হলে তাদের ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা কীভাবে বজায় থাকে?

পৃথিবীতে মাত্র কয়েকটি দেশে হ্যাঁ-ধর্মী ও না-ধর্মী মুক্তির বা স্বকীয়তার মোটামুটি সমন্বয় ঘটেছিল। এই কয়েকটি দেশে যেমন সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, তেমনি ছিল রাষ্ট্রের উদ্যোগে প্রতিটি মানুষের শিক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্যের উন্নতির ব্যবস্থা এবং বার্ধক্য ও রোগজারির মোকাবিলা করার জন্যে সামাজিক সুরক্ষার আয়োজন।

আজ দেশে দেশে গণতন্ত্র দুইদিক থেকেই বিপন্ন, এবং এই বিপন্নতার মূল কারণ ধনীশ্রেণী এবং ধনীদেশের শাসকশ্রেণীর লাগামছাড়া লোভ ও হিংস্রতার বিজয়াভিযান। গণতন্ত্রের বিপদ এমনভাবে ঘনিয়ে এসেছে যে আমার বারবার কুরুক্ষেত্রে চক্রব্যূহ করে অভিমন্যুবধের ষড়যন্ত্রের উপমা মনে পড়ছে। তার মানে এ নয় যে গণতন্ত্রের সম্ভাব্য হন্তা শুধু সপ্তরথী। সপ্তরথীর সাঙ্গোপাঙ্গ সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। গণতন্ত্রঘাতক সপ্তরথীর নেতা নিশ্চয়ই বুশ-ব্লেয়ারের সরকার। ১৯৫৩ সালে

গণতন্ত্রী মোসাদেককে ইরানের প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে বিতাড়িত করে CIA-র পুতুল সম্রাট রেজাশাহ্ পহ্‌লবিকে ইরানের সম্রাট বানানো থেকে শুরু করে, ভিয়েতনামে বিধ্বংসীযুদ্ধে দশ থেকে কুড়ি লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটিয়ে, ইন্দোনেসিয়ার জেনারেল সুহার্তোকে দিয়ে দশলক্ষ লোকের গণহত্যা ঘটিয়ে, লাতিন আমেরিকা এবং আফ্রিকার সমস্ত মুক্তিকামী আন্দোলনকে যতরকমভাবে পারা যায় দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করে সাম্রাজ্যবাদী শাসকবর্গ এবং তাদের ফেউ সরকারগুলি 'মুক্ত দুনিয়া' কায়েম করার প্রতিজ্ঞা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেছে (Blum, 2002)। বুশ এবং ব্লেয়ার তাদের ঈপ্সিত গণতন্ত্র কায়েমের জন্যে ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার নামে চূড়ান্ত বর্বরতার নিদর্শন রেখেছে ২০০২ সালে আফগানিস্তান আক্রমণ করে এবং ২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণ করে। দুইক্ষেত্রেই 'মুক্ত' ও 'সন্ত্রাসমুক্ত' দুনিয়া প্রতিষ্ঠার খেসারত দিতে হয়েছে লক্ষ লক্ষ অশ্বেতকায় এশিয়াবাসীকে।

গণতন্ত্রের দ্বিতীয় প্রবল শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্তমান দুনিয়ার বিশাল বিশাল কোম্পানি (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বহুজাতিক কোম্পানি) নিয়ন্ত্রিত বিনোদন ও সংবাদমাধ্যম। ইরাকযুদ্ধের সময় আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে CNN এবং Fox News (যার নিয়ন্তা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মাধ্যম মালিক রুপার্ট মার্ডক) ইরাকে মার্কিনীদের ধ্বংসলীলার নিষ্ঠুর পরিণতি প্রায় কোনোও সময়েই দেখায়নি। এই পক্ষপাতিত্ব এতদূর গিয়েছিল যে BBC-র বড় কর্তা পর্যন্ত আমেরিকার সংবাদমাধ্যমের মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। আমাদের দেশে প্রধান প্রধান বাজারী কাগজ এবং টিভি চ্যানেল সারা পৃথিবীতে ধনীর বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে যে বিশাল আন্দোলন চলছে তার অধিকাংশ খবরই দেয় না। টিভির অধিকাংশ সময় এবং বড় কাগজের অধিকাংশ জায়গা জুড়ে থাকে তথাকথিত তারকাদের কীর্তিকলাপ এবং ক্ষমতাসীন রাজনীতিকদের প্রতিশ্রুতি অথবা রক্তজলকরা হুংকারধ্বনি।

গণতন্ত্রের তৃতীয় শত্রু হলো পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশে ধনিকশ্রেণীর তাণ্ডব এবং গণতন্ত্র বিকাশের বিরুদ্ধে তাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ। এর খুব স্পষ্ট উদাহরণ হলো আমাদের দেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইতালি। প্রথমে ইতালির কথাতেই আসি। গণতন্ত্রের পূর্বসূরী সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ইতালিকে প্রায় সর্বাগ্রণী দেশ বলে গণ্য করা যেতে পারে। জুলিয়াস সীজারের ভাইপো অক্‌টোভিয়াস সীজার নিজেকে সম্রাট বলে আজ্ঞা জারি করার আগে পর্যন্ত রোম ছিল সাধারণতন্ত্র। পরের যুগে ইতালির দুই পরাক্রান্ত রাষ্ট্র জেনোয়া এবং ভেনিস ছিল বণিকশাসিত সাধারণতন্ত্র। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইতালির রাষ্ট্রব্যবস্থা ছিল মুষ্টিমেয় নাগরিক পরিবারশাসিত সাধারণতন্ত্র। তারপর অবশ্য বহুযুগ চলে যায় যখন ইতালির শাসনকর্তা ছিল হয় পোপ, স্প্যানিশ সম্রাট, অষ্ট্রিয়ার সম্রাট অথবা তাদের বশংবদ ইতালীর ডিউক ইত্যাদি খুদে নরপতি। (ভেনিস সাধারণতন্ত্র উনিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত কোনমতে টিকে ছিল)। ১৮৬০-এর দশকে ইতালির সব অংশ জুড়ে এক রাজ্যে পরিণত হওয়ার পর থেকে মুসোলিনির উদ্ভব পর্যন্ত ইতালি সংবিধান-নিয়ন্ত্রিত রাজার সহযোগে চালিত গণতন্ত্র ছিল বলা যেতে পারে। মুসোলিনির শাসনের অবসানের পর ইতালির জনগণ আবার তাদের স্বাধীনতা ফিরে পায়।

দক্ষিণ এবং উত্তর অথবা মধ্য ইতালির মধ্যে আর্থিক সমৃদ্ধি এবং সাধারণ মানুষের গণতন্ত্র ব্যবহার করার প্রবণতার অনেক পার্থক্য দেখা যায়। মাফিয়া, কামোরা ইত্যাদি সংগঠিত অপরাধীসংঘের প্রধান কার্যক্ষেত্র ছিল দক্ষিণ ইতালি। দক্ষিণ এবং উত্তর ইতালির মধ্যে আয় এবং বৈষয়িক সম্বলের পার্থক্য আমাদের দেশে প্রায় বিহার এবং পাঞ্জাবের বৈষয়িক সম্বলের পার্থক্যের সমতুল বলা চলে। তার ওপর রবার্ট পাটনাম তাঁর ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত বইতে সওয়াল করলেন যে, উত্তর ও দক্ষিণ ইতালির জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিরাট পার্থক্য আছে। উত্তর ও মধ্য ইতালির নাগরিকরা তাদের সমষ্টিগত স্বার্থরক্ষার জন্য পৌরশাসনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ নিয়ে তাদের

এলাকার উন্নয়ন সাধন করে। কিন্তু পাটনামের সমীক্ষা অনুসারে দক্ষিণ ইতালির লোকেরা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে ঔদাসীন্য দেখায় এবং সেজন্য সেই স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থা তাদের উন্নয়নের পথকেও মসৃণ করতে সাহায্য করে না (Putnam, 1993)।

সেই দেশে উত্তর এবং দক্ষিণ ইতালির লোকেদের প্রভূত ভোট পেয়ে সিলভিও বের্লুস্‌কোনি ২০০১ সালে প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন হয়েছেন। বের্লুস্‌কোনি কীর্তিমান ব্যক্তি। তিনি তাঁর Fininvest নামের মহাজনী মূলধনের কোম্পানি ব্যবহার করে অন্য অনেক কোম্পানিকে গ্রাস করেছেন, তাঁর তিন টেলিভিশন চ্যানেল দিয়ে ইতালির শতকরা ৪৫ ভাগ লোকের বিনোদন করেন। কোম্পানির লাভ বাড়াবার জন্যে বহু লোককে তাঁর কোম্পানির কর্তারা ঘুষ দিয়েছেন, মাফিয়ার সর্দারদের টাকা দিয়ে খুশি রেখেছেন, আইন ভেঙে বিদেশে টাকা সরিয়েছেন। ১৯৯৪ সালে তিনি প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে তখন বিভিন্ন আদালতে প্রচুর জালজোচ্চুরির মামলা। প্রধানমন্ত্রী হয়ে সরকারের ক্ষমতা ব্যবহার করে তিনি নিজের কোম্পানির তোষাখানায় আরও টাকা মজুত করেছেন। কিন্তু সেই প্রথমবার তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্ব রক্ষা করতে পারেননি। ছমাস পরেই তাঁকে গদিচ্যুত হতে হয়। কিন্তু ১৯৯৪ থেকে ২০০১ সালের মধ্যে বের্লুস্‌কোনি তাঁর ব্যবসা আরও অনেক বাড়িয়ে ফেলেন, এবং ২০০১ সালের তাঁর পার্টি Forza Italia (ইতালি, এগিয়ে যাও — বের্লুস্‌কোনির মালিকানাধীন ফুটবল ক্লাবের স্লোগান) বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ফিরে আসে। বের্লুস্‌কোনির পার্টির সংসদে নির্বাচিত সদস্যদের অন্তত পঞ্চাশজন তাঁরই কোম্পানির কর্মচারী। যে আইনব্যবসায়ীদের হাতে ইতালির আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা, তাঁরাই আবার বের্লুস্‌কোনির বিচারের সময় তাঁর পক্ষে সওয়াল করেন (Ginsborg, 2003)।

বের্লুস্‌কোনি আইন করে দিয়েছেন যে সরকারে অধিষ্ঠিত কোনও মন্ত্রীকে তাঁর ক্ষমতাসীন থাকাকালীন আদালতে হাজির করা চলবে না। বের্লুস্‌কোনি এখন ইতালির টেলিভিশনের শতকরা ৯০ ভাগের হর্তাকর্তা। বেশ কয়েকজন সরকারি টেলিভিশনের সাংবাদিকের চাকরি গিয়েছে বের্লুস্‌কোনির বিরুদ্ধে প্রচার করার জন্যে। এইধরনের লোক যে মার্কিনী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে গলা মিলিয়ে জোর গলায় বলবে যে, মধ্যপ্রাচ্যে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন আক্রমণ খ্রীষ্টানদের তরফে নতুন ক্রুসেড তাতে আর আশ্চর্য কী? ইয়োরোপীয় নবজাগরণের উদ্গাতা ইতালির শাসনব্যবস্থা আজ গণতন্ত্রের পরিহাসে পর্যবসিত হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সমস্ত (শ্বেতাঙ্গ) পুরুষদের ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয় অষ্টদশ শতকের শেষভাগ থেকে। কিন্তু ১৮৬৪ সালের আগে অধিকাংশ কৃষ্ণাঙ্গ ছিল ক্রীতদাস। ক্রীতদাস প্রথা বিলোপের পর অল্প কিছুদিন তারা ভোটদানের অধিকার পেয়েছিল এবং তাদের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্যও রাষ্ট্র কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিল। কিন্তু ১৮৭৬ সালের পর থেকে বর্ণদ্বেষী শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণকায়দের অধিকাংশ নাগরিক অধিকার নস্যাৎ করেছিল। ১৯৬৪ সালের Civil Rights Act-এর ফলে কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীরা তাদের ভোটদানের অধিকার ফিরে পেলেও কার্যত তাদের একটা বড় অংশ হ্যাঁ-ধর্মী ও না-ধর্মী স্বকীয়তা থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনসমষ্টির এক তৃতীয়াংশের কোনও স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যবস্থা নেই। ফলে এমন সব পাড়া বা অঞ্চল আছে যেখানকার গড় আয়ু ভারতবর্ষের লোকের গড় আয়ুর থেকেও কম (Sen, 1999)।

ধনীদের স্বার্থে গণতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ঐতিহ্যের মর্যাদা পেয়েছে। কিন্তু বর্তমান খ্রীষ্টনীতি জর্জ ডব্লিউ (ডাবিয়া) বুশের নির্বাচনের সময় লোকদেখানো অধিকাংশের ভোটে নির্বাচন প্রথাকেও ষড়যন্ত্র করে ব্যর্থ পরিহাসে পর্যবসিত করা হয়েছে। জর্জ বুশের সুযোগ্য ভ্রাতা জেব বুশ

ফ্লোরিডার গভর্নর। ২০০০ সালের নির্বাচনের আগে তিনি একটা আইনের অপব্যবহার করে ৫৭০০০-এর বেশি লোকের নাম ভোটার তালিকা থেকে কেটে বাদ দিয়ে দেন। এদের অধিকাংশই ছিল কৃষ্ণাঙ্গ অথবা গরিব শ্বেতকায় নাগরিক যারা সাধারণত ডেমোক্র্যাটদের ভোট দেয়। তারপর এই ধরনের বহু লোককে তাদের নাম ভোটার হিসেবে নথিভুক্ত করতে দেওয়া হয়নি। ভোটের দিন যে সব বুথে আল গোরের সমর্থকদের সংখ্যা বেশি হতে পারে মনে করা হয়েছিল সেরকম অনেক বুথে ভোটদান মেশিনগুলোকে বিকল করে দেওয়া হয়। আমাদের মতো গরিব দেশে ভোটদান যন্ত্রে কোটি কোটি লোক ভোট দিতে পারে। কিন্তু পরিহাসের বিষয় এই যে আমেরিকার মতো প্রযুক্তিগর্বী দেশে ভোটদান যন্ত্র বিকল হলে তাড়াতাড়ি মেরামত করার ব্যবস্থা থাকে না। এত করেও বুশের নির্বাচন নিশ্চিত ছিল না। শেষমেশ যখন গণনা অসমাপ্ত এবং বুশ অল্প ভোটে এগিয়ে; তখন মার্কিন দেশের মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট বললেন যে একটা তারিখের মধ্যে নতুন প্রেসিডেন্টের নাম ঘোষণা করতে না পারলে সংবিধান বিঘ্নিত হবে। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে জর্জ বুশ আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হতে পারলেন। এ কথা স্মর্তব্য যে, সুপ্রিম কোর্টের অধিকাংশ বিচারকের চাকরি দিয়েছিলেন জর্জ ডব্লিউ বুশের বাবা জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ, যাঁর আমলে ইরাকের বিরুদ্ধে ১৯৯১ সালের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের ফলে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের গগনচুম্বী অট্টালিকাদ্বয় চূর্ণ হওয়ার পরে প্রেসিডেন্ট বুশ শুধু যে আফগানিস্তান ও ইরাকের সম্পূর্ণ নিরাপরাধ হাজার হাজার লোককে নরমেধযজ্ঞে বলি দিয়েছেন তাই নয়, নিজের দেশের মধ্যে বাক্‌স্বাধীনতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা হরণ করার জন্য কালা কানুন জারি করেছেন। এই হিটলারি ব্যবস্থায় পুরো সায় দিয়েছে আমেরিকার সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিকগুলি, বড় টিভি চ্যানেলগুলি— CNN এবং Fox News : এদের হর্তাকর্তা বিধাতা হলো কোটিকোটিপতি বড়লোক। Patriot Act নামে এক আইনের ফলে কয়েক শ' (অথবা কয়েক হাজার — আসল সংখ্যা সরকারিভাবে জানা যায় না) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসীকে বিনা বিচারে জেলে পুরে রাখা হয়েছে। এছাড়াও কিউবার ঠিক পাশে গুয়ান্‌টানামো বে-সামরিক ঘাঁটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানে পাকড়ানো কয়েক হাজার লোককে বিনা বিচারে দুই বৎসর ধরে আটকে রেখেছে। বলা বাহুল্য এই বিনা বিচারে বন্দীদের অধিকাংশই আরব অথবা পারস্য বংশোদ্ভূত মানুষ। বর্তমান আফগান সরকার যেহেতু মুৎসুদ্দি সরকার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন সমস্তরকম আন্তর্জাতিক আইন ভেঙে যথেচ্ছাচার করে যাচ্ছে, এই বিচারহীন বন্দীদের বিচার পাবার আশাও সুদূর পরাহত।

ভারতবর্ষে গণতন্ত্রবিকৃতিকরণের তিনটি প্রধান শক্তি হলো সাম্রাজ্যবাদ, ধর্মীয় মৌলবাদ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ওপর ধনীশ্রেণীর দৃঢ়মুষ্টি দখল। এই তিনটি প্রক্রিয়াই আবার পরস্পরের সঙ্গে মিলিজুলি করে গণতন্ত্রের প্রাণশক্তিহরণ করে। এর প্রকৃষ্ট (এবং মানবিকভাবে সর্বনিকৃষ্ট) উদাহারণ পাওয়া যায় গুজরাটের গণতন্ত্রবিকৃতির ইতিহাসে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত লোকের সংখ্যার নিরিখে গুজরাট বেশ কিছুদিন যাবৎ ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। আবার গত দুই দশক ধরে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধিতেও গুজরাট অগ্রণী রাজ্যগুলির মধ্যে পড়ে। হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্রীয়স্বয়ংসেবক সংঘ, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, বজরং দল এবং তাদের রাজনৈতিক বাহিনী ভারতীয় জনতাপার্টি গোধরায় সবরমতী এক্সপ্রেসের একটি কামরায় অগ্নিদাহে কয়েকজনের মৃত্যুকে মূলধন করে এবং রাষ্ট্রযন্ত্রকে যদিচ্ছাক্রমে ব্যবহার করে ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় দু'হাজার লোকের জীবনহানি ঘটিয়েছে। নারী, শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক লোক নির্বিশেষে সকলের উপর দাঙ্গাবাজরা যেরকম নারকীয় অত্যাচার করেছে ভারতবর্ষের দাঙ্গার ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব ঘটনা।

হাজার হাজার লোক সর্বস্বান্ত হয়েছে। শরণার্থী শিবিরে সরকারি সাহায্য পৌঁছয়নি। এসব সত্ত্বেও বৃহৎ শিল্পপতিরা গুজরাটে বিনিয়োগ করেছে। দাঙ্গাবাজদের টাকা ও রসদ যুগিয়েছে। দাঙ্গাবাজদের টাকা এবং রসদ যুগিয়েছে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত ডাক্তার, উকিল, ব্যবসায়ী। দাঙ্গাবাজরা আধুনিক বৈদ্যুতিন প্রযুক্তি ব্যবহার করে সংখ্যালঘুদের নামধাম, ব্যবসাস্থল সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেছে এবং তারপর সেই তথ্যের সাহায্যে বেছে বেছে মুসলিমনিধনে লিপ্ত হয়েছে। দাঙ্গাবাজদের অনেক টাকা যুগিয়েছে আমেরিকা বা ব্রিটেনে অভিবাসী গুজরাটীরা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শাসকদল এই ধরনের মানবিক অধিকার লঙ্ঘনে এতটুকুও বিচলিত হয়নি কারণ এই নরমেধের শিকার তো মুসলমান — যা বুশের কাছে সন্ত্রাসবাদীর সমর্থক।

গণতন্ত্র হন্তাদের সঙ্গে ধনী-নিয়ন্ত্রিত বিশ্বায়ন গলায় গলায় জড়িয়ে আছে। যে ধনীনিয়ন্ত্রিত বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া ধনীর সম্পদ সারাক্ষণ বাড়িয়ে চলেছে এবং গরিবকে ক্রমাগত সমাজের উচ্ছিষ্টের মতো আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করছে তার সবগুলি প্রবাহ বিষবর্ষী। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে রাষ্ট্রের মঙ্গলমুখী ক্ষমতাকে সর্বতোভাবে খর্ব করা। রাষ্ট্র গরিবের উন্নতির জন্য, গরিব দেশে উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য, বহুজাতিক বাণিজ্যসংস্থার উচ্ছৃংখলতা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনও নীতি নির্ধারণ করতে পারবে না। অন্যদিকে ব্যক্তি মালিকানাকে যথেচ্ছাচারের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। দেশে দেশে এখন বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর রাজত্ব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বুশ, ইতালির বের্লুস্‌কোনি, ক্যানাডার শাসক লিবেরাল পার্টির নতুন নেতা পল মার্টিন প্রত্যেকে ধনপতি, মেক্সিকোর রাষ্ট্রপতি ভিচেন্টে ফক্স এককালে কোকাকোলার উঁচুপদের আমলা ছিলেন। অন্যদিকে গোটা সাহারা সংলগ্ন আফ্রিকায় প্রতি বৎসর ৩০ লক্ষ লোক মারা যাচ্ছে এইড্‌স্‌ মহামারীতে, অন্য ব্যাধিতে অথবা যুদ্ধবিগ্রহে। সারা পৃথিবীতে নতুন কর্মসংস্থান প্রয়োজনের তুলনায় প্রায় শূন্যস্থানে গিয়ে পৌঁছেছে (ILO, 2003)। এই অগণিত বেকারের দল বাঁচার তাগিদে এবং অপমানের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে বিপথগামী হয়ে অপরাধ ও সন্ত্রাসের পথ বেছে নিচ্ছে। বিশ্বের আর্থসামাজিক ব্যবস্থাকে কোনও মতেই প্রতিযোগিতা চালিত ধনতন্ত্র বলা যাবে না, এর উপযুক্ত নাম হলো ভাষাবিদ্— দার্শনিক নোয়াম চমস্কি এবং নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী জন সালস্টনের ভাষায় Corporate feudalism— বড় কোম্পানি চালিত সামন্ততন্ত্র (Sulston, 2001)। বিভিন্ন দেশের প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি এই সামন্ততন্ত্রের বিভিন্ন ভূখণ্ডের পাহারাদার ক্ষত্রপ, মহাক্ষত্রপ মাত্র। আর তার শীর্ষে আছে মহাশক্তিধর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার সহযোগী রাষ্ট্রগুলির সৈন্য সামন্ত, বিশাল নৌবহর, চোরাগোপ্তা আক্রমণকারী কয়েক হাজার উড়োজাহাজ এবং সর্বধ্বংসী অস্ত্রসম্ভার। আর আছে এই সামন্ততান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণকে যৌক্তিকতা দেওয়ার জন্যে সশস্ত্র অপরাধী, সন্ত্রাসবাদী ও ভাড়াটে গুণ্ডার বাহিনী। নব্যসামন্ততান্ত্রিক কোম্পানিচালিত ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র রক্ষার জন্যে নতুনভাবে লড়তে হবে বিশ্বের সাধারণ মানুষকে।

লেখপঞ্জী

1. Bagchi, A. K. 1995, 'Introduction' in A. K. Bagchi (ed) *Democracy and Development*, London, Mcmillan.
2. Blum, W. 2002, *Rogue State : a guide to world's only superpower*, Monore, Maine (USA), Common Coverage Press.
3. Carnoy, M 1994. *Faded Dreams : the politics and economics of race in America*, Cambridge, Cambridge University Press.

4. Du Bois, W. E. B. 1935 / 1992, *Black Reconstruction in America 1860–1880*, Harcourt Brace, c. 1935; reprinted with and introduction by D. L. Lewis, New York.

5. Ginsborg, P. 2003. The patrimonial ambitions of Silvio B, *New Left Review*, New Series, no. 21, May–June.

6. Marx, K and Engles, F. 1845–46 / 1976. *The German Ideology*, translated from the German, Moscow, Progress Publishers.

7. Putnam, R. 1993. *Making Democracy Work : Civic traditions in modern Italy*, Princeton, Princeton University Press.

8. Sen, A. 1999. *Development as Freedom*, New York, A. A. Knopf.

9. Sulston, J. 2001. 'Genome for the people' summary of Sulston's Chatham Lecture, Trinity College, Oxford, as reported in *The Statesman* (Calcutta), 29 October.

সঙ্গীত ও শ্রেয়োনীতি

আবুল মোমেন

বাংলাদেশের পাহাড়পুরে অবস্থিত সোমপুর বিহারের একটি পোড়ামাটির চিত্রে দেখা যায় কুয়োয় জল তুলতে এসে মা কলসির বদলে ছেলের গলায় দড়ি বাঁধতে উদ্যত হয়েছেন।[১] পাহাড়পুরের পোড়ামাটির ফলক ছাড়াও এ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় সপ্তদশ শতাব্দীতে সংস্কৃত ভাষায় রচিত সেন আমলের সমাজচিত্র *শেক-শুভোদয়ায়*।[২] প্রশ্ন হলো, মায়ের এমন পাষণ্ডের মতো কাজের কি কারণ থাকতে পারে? না, তিনি স্বর্গীয় সঙ্গীতের সুরে বুঁদ হয়ে এমন নারকীয় কাজ করতে বসেছিলেন! মায়ের ঘোর যথাসময়ে কেটেছিল কিনা, শেষ পর্যন্ত ছেলেটি প্রাণে রক্ষা পেয়েছিল কিনা সে তথ্য আর জানা যাবে না, তবে এ চিত্র মানুষের ওপর সর্বগ্রাসী প্রভাবের পাথুরে প্রমাণ হয়ে থাকবে। তাছাড়া সুরপাগল ও গানপাগলা মানুষ সম্পর্কে সমাজের নেতিবাচক মনোভাব এবং গানবাজনা সম্পর্কে সন্দিগ্ধ মনের সাবধানতার পক্ষে ধোপে টেকার মতো অজুহাত যোগাতে পারে এ চিত্র। এ থেকে গ্রিক দার্শনিক-গুরু প্লেটোর দোহাই তুলে নীতিবাদীর পক্ষে সঙ্গীতের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোও সহজ হবে— কারণ মা হয়ে ছেলের চরম সর্বনাশ করার মতো এ কাজকে মানুষের ওপর সঙ্গীতসৃষ্ট 'দুর্বল ও স্থূল আবেগের অনৈতিক প্রভাব' হিসেবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।

আমরা ভালোই জানি সামাজিক মানস সাধারণভাবে সঙ্গীতের চূড়ান্ত ভূমিকা ও লক্ষ্য সম্পর্কে বেশ সন্দিগ্ধ। দেখা যায় সঙ্গীতভিত্তিক জীবিকার সম্ভাবনা নিয়ে সমাজের অনিশ্চিত মন যেমন সতর্ক তেমনি সন্দিগ্ধ; আদতে এ মন তো প্রায় নির্বিচারেই খোদ সঙ্গীতের বিরুদ্ধেই যত অভিযোগ খাড়া করে। সংসারীর বিচারে গানবাজনার মানুষ মানেই সমাজ-সামাজিকতার ধার-না-ধারা কিছু 'বিশেষ' মানুষ। হয়ত এ মনোভাবের অন্তঃস্থলে খানিকটা প্রশ্রয়ের সুরও থাকে, কিন্তু প্রশ্ন হলো সমাজের সাথে বা সামাজিক মূল্যের সাথে হঠাৎ কোনো সংঘাত বাধলে কী হবে সমাজের প্রতিক্রিয়া? সমাজ কি সমালোচনার খড়্গ আর অভিযোগের তরবারি তুলবে না? যে সমাজের সঙ্গীতের কদর আছে সেখানেও, অন্তত নৈতিক অবস্থান থেকে, সঙ্গীতের প্রতি অভিযোগের তর্জনী উদ্যত হবেই। পোড়ামাটি ফলকটির ভিত্তিতে সন্তানের প্রতি মায়ের চরম অন্যায় (এবং অপরাধ) আচরণ দেখে আঁৎকে উঠতে উঠতে সমাজ কি প্লেটোর সাথে গলা মিলিয়ে বলবে না একে 'immoral influence of emotions at expense of austere rational thought.'?[৩]

প্লেটো এবং অ্যারিস্টোটল উভয়েই একমত ছিলেন যে, সঙ্গীত এবং একইভাবে অন্যান্য শিল্পকলা কেবল মানুষের মনে নয়, তার স্বভাবচরিত্রের ওপরও প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এ ব্যাপারে প্লেটোর যুক্তি হচ্ছে 'সঠিক' জাতের মানুষ তৈরির যথার্থ পথ হচ্ছে তাদের জন্যে এমন শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাতে শরীরচর্চা ও সঙ্গীতের ভারসাম্য থাকে। *রিপাব্লিকে* তিনি লিখেছেন,'He who mingles music with a balanced combination of gymnastic in the fairest proportions, and best attempers them to the soul, may be rightly called the true musician and harmonist'।[৪] তবে সেই সাথে তিনি সতর্ক করে বলেছেন, 'melodies of

expressive softess and indolence' এড়িয়ে চলতে হবে আদর্শ রাষ্ট্রের প্রশাসকদের প্রশিক্ষণের শিক্ষাকর্ম।

আমেরিকার কর্নেলি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ডোনল্ড জে গ্রাউট গ্রিক দার্শনিকদের সঙ্গীত বিষয়ক মতবাদ আলোচনা করে সিদ্ধান্ত টেনেছেন যে, 'The Greek doctrine of *ethos*, then, was founded on the convicion that music affects character and that different kinds of music affect it in different ways'.[৫]

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রয়েছে শিল্পরস বিষয়ক সূক্ষ্ম সব বিচার-বিশ্লেষণসহ উন্নত তাত্ত্বিক ভিত্তি, এবং এ সঙ্গীত সাধনা ও চর্চায় যে নিষ্ঠা, একাগ্রতা ও নিবেদনের প্রয়োজন হয় তা মিলিয়ে এর রয়েছে প্রায় ধর্মীয় মর্যাদার শাস্ত্রীয় বিদ্যার স্বীকৃতি, যদিও সমঝদাররা সঙ্গীতের মাধ্যমে অবকাশ যাপন ও বিনোদনের ভাবনা বাদ দেননি। তবে এখানে নান্দনিক ও আধ্যাত্মিক ভাবনার বাইরে পশ্চিমের মতো শিল্পকলার শ্রেয়োনীতিক ভূমিকার মূল্যায়ন নিয়ে সঙ্গীতজ্ঞ ও পণ্ডিতরা ততটা মাথা ঘামাননি, সমাজের মাথাগুলো যারপরনাই ব্যতিব্যস্ত ও ঘর্মাক্ত হলেও।

তবে কে না জানে সামাজিক নীতির বা কেবল শ্রেয়োনীতির মানদণ্ডে বিচার যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ হয় না, তাতে বড়জোর শিল্পের সীমিত কিংবা আংশিক বিচার হওয়াই সম্ভব। শিল্প সমাজের ভিতরেই সৃষ্ট হলেও একবার পূর্ণতা পেলে সমাজের গণ্ডি ছাপিয়ে ওঠে। সমাজের সাথে শিল্পের সম্পর্ক অনেকটা মাটির সাথে গাছের সম্পর্কের মতো। গাছকে মাটিতে দৃঢ়ভাবে শিকড় চালাতে হয় কারণ সেখান থেকেই তার পুষ্টির সিংহভাগ আসে, আর সাফল্য পেতে অর্থাৎ ফুলেল ও ফলবান হয়ে উঠতে চাই গাছের মাথা তুলে দাঁড়াবার মতো ব্যাপ্তি। গানের ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় সঙ্গীতের এ বৈশিষ্ট্যটা চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন, '... আমাদের কালোয়াতি গানটা ঠিক যেন মানুষের গান নয়, তাহা যেন সমস্ত জগতের।'[৬] সৃষ্টির প্রক্রিয়াটিকে হয়ত সামাজিক কাজ হিসেবে গণ্য করে সামাজিক নীতির আওতায় বিচার করা যায়, কিন্তু যখনই এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়ে যায়, অর্জিত হয় একটি শিল্পকর্মের মান তখন তা গণ্য হবে একটি স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ সত্তা হিসেবে — অবশ্যই সামাজিক মাপকাঠিসমূহের আওতা এ ধরাছোঁয়ার ঊর্ধ্বে। সমাজ তো স্থান ও কালের দাগায় সীমাবদ্ধ এক বাস্তবতা, আর শিল্প, এসবের ফসল ও লক্ষণাদি ধারণ করেও উভয়কেই অতিক্রম করে যায়। জন্মসূত্রে অর্জিত উপাদানগুলোকে উত্তরণের গুণটুকু আছে বলেই শিল্প সময় ও ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে যায়। তাই মানতে হয় সামাজিক নীতি ও শ্রেয়োনীতির মানদণ্ডে শিল্পের বিচার পূর্ণাঙ্গ হয় না, সমাজের আওতায় মানুষই সম্পূর্ণ থাকে তার কৃতকর্মসহ; কিন্তু তার সৃষ্টিকর্ম যখন শিল্পের মানে পৌঁছে যায় তখন তা অর্জন করে নেয় স্বতন্ত্র সত্তা। তলস্তয়ের কোনো অপরাধের জন্যে 'ওঅর অ্যান্ড পিস' বা পিকাসোর ব্যক্তিজীবনের নৈতিক কোনো ত্রুটির জন্যে 'গের্নিকা' অভিযুক্ত হবে না। এগুলোর পূর্ণাঙ্গ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মানবসমাজে স্বীকৃত।

শিল্প হলো সম্পূর্ণ, অবিভাজ্য এবং পূর্ণতার মাধ্যমে এক খুঁতহীন অনন্য সৃষ্টি। অথচ সমাজ থাকে সর্বদা বিভক্ত এবং সবসময় অসম্পূর্ণ, কারণ এর তো সর্বক্ষণ নতুন-নতুনতর রূপ ধারণ চলতেই থাকে। শিল্প হয়ে ওঠে কেবলমাত্র তার রূপ-বৈশিষ্ট্যগুলো পূর্ণতা লাভ করার পরে, এর আগে সৃজ্যমান ক্রিয়াটিকে শিল্প বলে গণ্য করা সম্ভব নাও হতে পারে।

এ পর্যায়ে বোধহয় আমরা শিল্পের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি সম্পর্কে আরো একটু আলোচনা সেরে নিতে পারি। যখন আমরা বলি শিল্প সার্বিক ও পূর্ণ সম্পাদিত কাজ তখন আদতে এও স্বীকার করে নিই যে এটা নিজেই একই সাথে পথ ও পাথেয়। ক্লাইভ বেল বলেন, '...perheps (*it*) is the most direct

and potent (*means*) that we posses. Nothing is more potent because there is no state of mind more excellent or more intense than the state of aesthetic contemplation'।[৭] বোধহয় বেল-এর কাছ থেকে আমরা সঙ্গীতে বিমুগ্ধ জননীর অবস্থা সম্পর্কে একটা সঠিক ব্যাখ্যা পেয়ে যাই। তাই তো, পোড়ামাটির জননীটি কি গভীর 'নান্দনিক ধ্যানে' নিমগ্ন হননি? ওটা কি বিশুদ্ধ শিল্পের রসে সম্পূর্ণ ধ্যানস্থ হওয়া নয়?

শিল্পের বিশুদ্ধ রূপ নিয়ে আরও বাগবিস্তার করার আগে আমরা বোধহয় শিল্পের উদ্দেশ্য ও প্রকৃতির সূত্রে শ্রেয়োনীতির প্রসঙ্গটা আরেকটু টানতে পারি। প্রয়োজনটা একারণে বিশেষভাবে অনুভূত হয় যে এক মহান প্রতিভাধর স্রষ্টা— বলতে আপত্তি নেই মানুষটা তলস্তয়— কিনা বলে বসলেন শিল্প ন্যায়সঙ্গত হতে পারে একমাত্র ভালো কাজে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষমতার বিচারে। তিনি মনে করেন শিল্পের নৈতিক ন্যায্যতা মিলবে শুধুমাত্র ভালো কাজে অনুপ্রাণিত করার ওপর অথবা ভালো কাজে যুক্ত হতে কাউকে উদ্বুদ্ধ করার ওপর।[৮] নান্দনিক ধ্যানের মতো ধারণাকে আদৌ গণ্য করতে রাজী নন তিনি। হায়, এভাবে তিনি নিজের মাস্টারপিসগুলোরই পথ আগলে দাঁড়ালেন! বোধহয় একে বাহাত্তুরে পাওয়া বুড়োর ভুলবিচারের ঘটনা হিসেবেই ধরা উচিত, কারণ কার্যত তিনি যেন ফুলের সৌরভের বিচার করতে বসেছেন গাছের বস্তুগত প্রয়োজনীয়তার মানদণ্ডটি হাতে নিয়ে। এর ফলে তিনি শিল্পের মামলাটির দ্বিগুণ ক্ষতি করতে বসেছেন— প্রথমত, মানসিক (নান্দনিক ধ্যান) একটা কাজকে তিনি বস্তুগত (ভালো কাজ) কাজের সাথে গুলিয়ে ফেলেছিলেন, এবং দ্বিতীয়ত, শিল্পের নান্দনিক নীতিগুলোর বিশিষ্টতাকে একেবারেই এখতিয়ারে নেননি।

এ পর্যায়ে আমরা সঙ্গীতের শ্রেয়োনীতির ন্যায্যতার সন্ধান করতে পারি। কোনো শিল্পকর্মের নৈতিক ন্যায্যতা খোঁজা একেবারে অসঙ্গত নয় কেননা আমাদের সব কাজেরই ন্যায্যতার প্রশ্ন ওঠে, একভাবে বা অন্যভাবে। এক্ষেত্রে শিল্পীর উত্তরটা হয়ত ক্লাইভ বেল-এর আদলেই হতে পারে, 'Art is good because it exalts to a state of ecstasy better for than anything benumbed moralist can ever guess at; so shut up.'[৯]

আলোচনার এ পর্যায়ে আমরা একটা সিদ্ধান্ত টেনে বলতে পারি, 'there are no qualities of greater value then artistic quality since there is no greater means to good than art.[১০] এ অভিমতকে আরো জোরালো করার জন্যে রবীন্দ্রনাথের দ্বারস্থ হতে পারি আরেকবার: 'আমার বিশ্বাস যে সঙ্গীত কেবল চিত্তবিনোদনের উপকরণ নয়; তা আমাদের মনে সুর বেঁধে দেয়, জীবনকে একটি অভাবনীয় সৌন্দর্য দান করে।'[১১]

যদি কলসির স্থলে ছেলের গলায় দড়ি পড়ায় ছেলেটি মারা যেত তাহলে আধুনিক আইনে মা নিশ্চয়ই হোমিসাইডের মামলায় পড়তেন, শাস্তি হতো কড়া রকমের। এই শাস্তি নিয়ে যদি কিছু বলার থাকে তা আইনের বিষয় এবং আদালত তা বিচারের একমাত্র ক্ষেত্র; কিন্তু এই সূত্রে হত্যাকারী বা হত্যা প্রচেষ্টায় অভিযুক্তদের সাথে সঙ্গীতকেও যদি আদালতে সোপর্দ করা হয় তাহলে বিচার বিভাগের সীমা লঙ্ঘনের দায় ঘটবে। তবে সমাজ শিল্পকে সন্দেহের চোখে দেখে আসছে মানুষের ওপর এর প্রভাবের সর্বগ্রাসিতার জন্য। শিল্পের প্রভাবে মানুষের অনুভূতি তীব্রতা পায়, এবং তা এতটাই যে ইন্দ্রিয়গত অনুভূতির উত্তেজনায় মননগত চেতনাও আচ্ছন্ন হতে পারে। মানুষটাও বদলে যেতে পারে, যেমন পোড়ামটিচিত্রের মা সঙ্গীতে নিমগ্ন হয়ে পড়েন এবং এ অবস্থায় প্রয়োজনীয় সাংসারিক কাজ সারতে গিয়ে মস্ত বড় দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বসছিলেন। সঙ্গীতে নিমগ্ন অবস্থায় কুয়োয় জল তুলতে যাওয়া অবশ্যই অনুচিত; আর কুয়োয় জল তোলার সময় শিশুকে সঙ্গে আনা ঠিক কিনা সে প্রশ্নও উঠতে পারে, তবে, তারও চেয়ে মায়ের বড় ত্রুটি হচ্ছে শিশুসহ জল তুলতে কুয়োয় এসে সঙ্গীতে মজে যাওয়া। এটা

মায়েরই অন্যায়। কিন্তু নেহাৎ সুরপাগল নারীটি যদি বলেন, আমার কি দোষ, এমন ধারা গান শুনলে মজব না? কবির দোহাই দিয়ে আবার আমরাই বলি, যে সঙ্গীত ভালোবাসে না সে খুন করতে পারে। এদিকে চোখে আঙুল দিয়ে বিপরীতে চিত্রটি দেখিয়ে দিল সোমনাথ বিহারের পোড়ামাটিচিত্র— সঙ্গীতে নিমজ্জিত মায়ের হাতে পুত্রের সংহার।

২

প্রশ্ন উঠবে, কার দোষে ছেলেটি মরেছে বা মরতে বসেছিল— মায়ের না সঙ্গীতের? মা স্বর্গীয় সুরের দোহাই দেবেন, আর আইন মাকে অপরাধী করলেও সমাজ কিন্তু সঙ্গীতকেও দুষতে ছাড়বে না। সঙ্গীত অমন সৃষ্টিছাড়াভাবে মজায় বলেই না সমাজ তাকে সন্দেহের চোখে দেখে। সঙ্গীতে মজে যাওয়া, আচ্ছন্ন হওয়া, ঘোর লাগা, দশায় পাওয়া ইত্যাদি নানা কথায় মানুষের দেহমনে সুরের সর্বগ্রাসী ও সর্বনাশা প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতার কথা আমরা প্রকাশ করি। মানুষ যদি সুরেই মজে, দশাগ্রস্ত হয়ে থাকে তাহলে সংসার অচল হয়ে পড়বে। সমাজের স্বাভাবিক নিয়ম বিঘ্নিত হবে। এই সংসার ও সমাজ সঙ্গীত নিয়ে বরাবর সন্দিগ্ধ, আর সঙ্গীতসৃষ্ট ভাবাবেগেকে তিরস্কার করে প্লেটো এর মন্দ প্রভাব সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন। যখন রবীন্দ্রনাথ আন্তরিক উচ্চারণে বলেন, 'ভৈরোঁ যেন ভোরবেলার আকাশেরই প্রথম জাগরণ; পরজ যেন অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রাবিহ্বলতা; কানাড়া যেন ঘনান্ধকারে অভিসারিকা নিশীথিনীর পথবিস্মৃতি, ভৈরবী যেন সঙ্গবিহীন অসীমের চিরবিরহবেদনা; মূলতান যেন রৌদ্রতপ্ত দিনান্তের ক্লান্তিনিশ্বাস; পূরবী যেন শূন্যগৃহচারিণী বিধবা সন্ধার অশ্রুমোচন',[১২] তখন আমরা বুঝি সুরের অভিঘাতে কবির বেদনশীলতা কতটা তীব্র ও অভিব্যক্তিময় হয়ে উঠেছিল। কবির বর্ণনা থেকে বোঝা যায় সঙ্গীত কেবল যে তাঁর অনুভূতি ও আবেগের ওপর ক্রিয়া করেছে তা নয় তাঁর কল্পনাশক্তি ও বিশ্লেষণী ক্ষমতাকেও দারুণভাবে উজ্জীবিত করেছে। জেরল্ড লেভিনসন তাঁর নিবন্ধ Music and Negative Emotion এ লিখেছেন, 'Emotions presented in and imaginatively experienced through music, unlike those encountered in real life, have a character of inimitability, purposiveness and finality about them।'[১৩] হ্যাঁ, সুরের আবেশ কঠিন বাস্তব থেকে সরিয়ে নেয় আমাদের। তৈরি করে এমন আবেগ যা অননুকরণীয় এবং বাস্তবের তোয়াক্কা না করে নিজস্ব পরিণতিতে পৌঁছাতে চায়। এমনটা ঘটে কাবণ সুরের আবেগ গানের অগ্রগতির সাথে সাথে ধীরে ধীরে মার্গে পৌঁছায়। এই অপার্থিব বায়বীয় শিল্পকে তো বস্তুগত সৃষ্টি মতো একসাথে অখণ্ড রূপে দৃশ্যমান পাওয়া যায় না। এটা তৈরি হতে থাকে, অতিক্রমণ উত্তরণ ঘটে, এবং সমঝদারকে দ্বিগুণ ব্যস্ত রাখে তাঁর স্মৃতিতে ধ্বনিত হতে থাকা সুরকে ধারণ করে রাখা এবং সৃজ্যমান সুরকে তাদের অবধারিত চরম ও চূড়ান্ত রূপে বুঝে নেওয়ায় নিয়োজিত রেখে। ফলে ছবি দেখার চাইতে গান শোনা শিল্পের রসাস্বাদনের দিকের থেকে একেবারে ভিন্ন অভিজ্ঞতা। একটা কোনো সঙ্গীত— ধরা যাক রাগ ভৈরবীতে একটি গান— আমাদের শ্রবণে এক সাথে সম্পূর্ণটা ধরা পড়ে না, একটা সময়-পরিধির মধ্যে স্বরের নির্দিষ্ট বিন্যাসে তা নির্মিত হয়ে ওঠে। শ্রোতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার মনে (অর্থাৎ স্মৃতিতে) গানটা পুনর্নির্মাণ করে নেয় স্ব স্ব সাঙ্গীতিক জ্ঞান ও সঙ্গীতের প্রতি ভালোবাসাকে নিয়োজিত করে। জে. লেভিনসন ঠিকই বলেন, The emotional separateness and alienation which occur frequently in daily living are here miraculously swept aside in imaginative identification with the composer whose feelings are, on the Expressionist assumption, plainly revealed for any listener to hear and to mirror. Call this the reward of Emotional Communion।'[১৪]

সন্দেহ নেই আমাদের পোড়ামাটির ফলকের নারীটিকে সেই স্বর্গীয় গান 'আবেগিক সম্মিলনে' পুরস্কৃত করেছিল। এ বিষয়ে একমত হওয়া যায় যে সঙ্গীত উপভোগ করার সময় কারও জল তুলতে যাওয়া উচিত নয় অবশ্যই, তদুপরি, কুয়ো থেকে জল তুলতে যাওয়ার সময় শিশু সন্তানকে সঙ্গে নেওয়ার ঔচিত্য সম্পর্কেও আমরা প্রশ্ন তুলতে পারি। মনে হয়, নারীটির সব ত্রুটির মধ্যে অপরাধের পর্যায়ে পড়ে কুয়ো থেকে জল তোলার মতো অত্যন্ত সাংসারিক একটা কাজে ব্যস্ততার মধ্যে সঙ্গীতে মজে যাওয়া। কাজটা একজন মায়ের যথাযোগ্য কাজ হয়নি, তাঁর দায়িত্ববোধের পরিচয়ও মেলে না এতে।

এবারে প্রশ্ন তোলা যায় সঙ্গীত ও শ্রেয়োনীতির ক্ষেত্রে দারিদ্রের প্রাসঙ্গিকতা ও ভূমিকা নিয়ে। রাজা-বাদশাহ আর জমিদাররা হয়ত নিজেদের সুবিধার বাইরে অন্য কোনো বিবেচনা ছাড়াই গান শোনার স্বাধীনতা ভোগ করতে পারেন। তবে আমরা তো জানি সময় সময় এঁরাও তুচ্ছ কাজ বা রাজসিক দায়িত্বের চাপে পড়ে যান বলে সাধারণের চেয়ে তাঁরা বেশি স্বাধীনতা ভোগ করলেও এ স্বাধীনতাও আপেক্ষিক, সামূহিক বা পরম নয়। বরং বাউলদের মতো কোনো কোনো দলকে দেখি যারা সঙ্গীতের রসে মজেই যেন জীবন কাটিয়ে দেন। তারা এটা পারেন কারণ জাগতিক সাফল্য ও আয়েশ নিয়ে তাঁরা মোটেও মাথা ঘামান না। ফলে রাজারাজড়া বা ধনীদের চেয়ে তারা দরিদ্র হয়েও সঙ্গীতে বেশি স্বাধীনতা ও বেশি সময় পান। কিন্তু পোড়ামাটির মায়ের ক্ষেত্রে পুরো ঘটনাটা বিয়োগান্তক করে তোলার পিছনে দারিদ্রের ভূমিকা অস্বীকার করা যাবে না, এবং তাই মা ও সন্তানের দুর্ভাগ্যের জন্যে আমরা সঙ্গীতকে কেন দুষব সমাজব্যবস্থাকে দায়ী না করে? এক্ষেত্রে জননী, যাঁকে ভালো সঙ্গীতের একজন ভালো সমঝদার বলেই মনে হয়, আত্মপক্ষ সমর্থন করে সঠিকভাবেই প্রশ্ন তুলতে পারেন— যদি মধুর কোনো সুরে আমি মজে থাকি তা কি আমরাই ত্রুটি?

একজন মাও তো প্রথমে মানুষই, যিনি মাতৃত্বের দায় মেটানোর পরও তাঁর হৃদয় ও আত্মার এবং কোমল প্রবণতাসমূহের ডাকে সাড়া দেবেন। আমরা তো জানি যে হৃদয়, আত্মা বা কোমল বোধগুলো মানুষের শ্রেয়তর ও মহত্তর সত্তার সাথেই সম্পৃক্ত। আমরাই তো বলি সুরের বোধহীন মানুষ তার স্থূল প্রবৃত্তির কবলে পড়তে পারে সহজেই। আর তা আরও ভালোভাবে বোঝানোর জন্যে প্রায়ই উদ্ধৃতি দেই শেক্‌সপীয়রের *মার্চেন্ট অব ভেনিস* থেকে :

> 'The man that hath no music in himself
> Nor is not moved with concord of sweet sound
> Is fit for treason, strategems and spoils.'[১৫]

এখন সোমপুর টেরাকোটা কি এই বাণীর বক্তব্যকে উল্টে দিল যখন দেখি একজন সঙ্গীতনিমগ্ন অর্থাৎ কোমলবোধে-মগ্ন জননী তাঁর আপনপুত্রের মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠছেন!

মূল প্রশ্ন হলো কার দোষে ছেলেটা মরতে বসেছিল— মায়ের না গানের? আমরা অবশ্য সমাজের দিকেও তর্জনী তুলেছি তার বৈষম্য ও অন্যায়গুলো দেখিয়ে। মা হয়ত তাঁর সৎ অনুভূতি থেকে, অথবা অবিবেচক সমাজের পীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে, হয়ত বা সঙ্গীতকেই কাঠগড়ায় তুলবেন। কিন্তু মায়ের ওপর গানের প্রভাবের কথা বিবেচনা করে আইন কি মাকে রেহাই দিতে পারবে? যদি তাই হবে তাহলে আদালতকে নিষেধাজ্ঞা জারী করতে হয় সঙ্গীতের ওপর; নিদেন কিছু বিধিবিধান দিয়ে নিয়ন্ত্রণে উদ্যত হতে হয়। এতে সমাজের এই অভিভাবক-প্রতিষ্ঠান যুগপৎ সমাজ ও আইনকে সঙ্গীতের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছেন।

এ অবস্থায় আমাদের বর্ণিত বাস্তবতায় সঙ্গীতই অভিযুক্ত যখন সমাজ ও আইন বিচারিক ভূমিকায় বসে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকছে। তা বলে সঙ্গীত কোনো নৈতিক দায় নিয়ে সৃষ্ট হয়নি, কোনো

শিল্পই এরকম দায় গ্রহণ করে না। প্রশ্ন উঠবে, কোনো শিল্প কি আইন ও সমাজের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত হতে পারে? না, কারণ শিল্প কোনো সমাজের নিয়ম ও প্রচলিত মূল্যবোধের অধীনতা মেনে চলতে বাধ্য থাকে না, অর্থাৎ সমাজের স্বাক্ষর বহন করাই শিল্পের স্বাভাবিক নিয়তি হলেও তাকে অতিক্রমের স্বাধীনতা তার থাকতে হবে। শিল্প, যে কোনো শিল্প, তার নিজস্ব নান্দনিক নিয়ম মেনেই চলে যা কচিৎ সামাজিক নিয়মকানুনের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে যায়। এরকম ঘটলে অবশ্য সমাজে যথেষ্ট তোলপাড় সৃষ্টি হয়, আর তখন প্রায়ই শিল্প আর শিল্পী উভয়েই যুক্তিহীন মূঢ়শক্তির তাণ্ডবের শিকার হয়। তবে এরকম আক্রমণ শিল্পের নান্দনিক ভিত্তিকে দুর্বল বা খারিজ করে দেয় না, কিন্তু উচ্চশিল্পের সাথে সমাজের সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি করতে পারে। তাতে এ সমস্যা যে নান্দনিকের চেয়ে সামাজিকই বেশি তা অবশ্য প্রকট হয়ে ওঠে।

যখন ভারতের বর্ষীয়ান শিল্পী মকবুল ফিদা হুসেন সরস্বতীর নগ্ন স্কেচ আঁকেন তখন কেবল এই নগ্ন রেখাচিত্রটি আঁকার কারণে তিনি কোনো নান্দনিক রীতি লঙ্ঘন করেন না কারণ নগ্ন নারী (বা পুরুষ) অঙ্কনের বিরুদ্ধে কোনো নান্দনিক বিধান শৈল্পিক সংস্কার নেই। তবে সরস্বতী তো আর কোনো মডেল-কন্যা বা সংসারের সাধারণ রমণী নন, তিনি দেবী এবং লক্ষ ভক্তেব দ্বারা পূজিতা। এক্ষেত্রে অবশ্য মানুষের অনভ্যস্ত বা অনভিপ্রেত কোনো রূপ দেবী সরস্বতীকে আঁকা নিয়ে আপত্তি তোলার পিছনে একটা যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়, কারণ তাতে দেবী অসংখ্য ভক্তের মনে সত্যিই আঘাত লাগতে পারে। তাঁদের মনে হতে পারে এতে দেবীর পবিত্রতা বা মহত্ত্ব ক্ষুণ্ণ করা হয়। তবে হিন্দুশাস্ত্রের কোথাও এ নিয়ে নিষেধাজ্ঞা নেই, হয়ত দুটি কারণে তা নেই— এক. হয়ত হুসেনের আগে স্বর্গীয় এই দেবীকে নগ্নরূপে আঁকার কথা কারও ভাবনায় আসেনি, আর দুই. পৌরাণিক চরিত্রগুলোর শৈল্পিক রূপদানের বিষয়টি বারবার শিল্পকলা, পাণ্ডিত্যচর্চা কিংবা ধর্মীয় সাধনার আওতায় আবদ্ধ ছিল, কোনো রকম রাজনৈতিক অনুষঙ্গ ছাড়াই। কালীর ক্ষেত্রে আমরা দেখি নগ্নতাই নিয়ম, সম্ভবত কালীকে অঙ্কনের সেটাই প্রচলিত রীতি হওয়ায় এই সহনশীলতা। তবে হুসেনের সরস্বতী নিয়ে এত তোলপাড় হওয়ার পিছনে রাজনৈতিক অনুষঙ্গটি আমরা একেবারেই বাদ দিতে পারব না। যারা মারমুখী প্রতিবাদের উদ্গাতা তারা নিশ্চয় নান্দনিক বিবেচনায় নয় ধর্মরাজনৈতিক উন্মাদনা থেকেই এ কাজ করেছে। এ ধরনের তৎপরতা যখনই জনতার মধ্যে উত্তেজনা তৈরি করতে পারে তখনই পরিস্থিতি চলে যায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে। উত্তেজিত জনতার মারমুখী প্রতিবাদের মুখে শেষ পর্যন্ত শিল্প হয়ে পড়ে আঘাতের প্রধান লক্ষ্যবস্তু আর শিল্পী ভোগেন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতায়। সমাজে যারা বোঝেন এই পাগলামো কতটা অর্থহীন ও ক্ষতিকর তাঁদের এ সময়ে সতর্কতার সাথে চুপ থাকতে হয় যাতে সন্ত্রাসের বিস্তার না ঘটে যায়। যখন পরিস্থিতি প্রায় বিস্ফরণোন্মুখ হয়ে পড়ে তখন তো প্রথম অগ্রাধিকার দিতে হয় শান্তি-শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার ওপর— শুধু প্রশাসনিক দায় হিসেবেই নয়, সমাজের বিবেচক অংশকে রক্ষার স্বার্থেও। সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে আসা পর্যন্ত বোধহয় শিল্প ও শিল্পীকে নিয়ে অন্যান্য ভাবনাগুলোকে তুলে রাখতে হয়। ভারতের সবচেয়ে নামী এবং শ্রদ্ধেয় শিল্পী হুসেনকেও শেষ পর্যন্ত কোনো ওজর আপত্তি ছাড়াই সাধারণের ভাবাবেগে আঘাত দেওয়ার জন্যে ক্ষমা চাইতে হয়েছে। আঘাত লাগার অনুভূতির যে কথা বলা হচ্ছিল তা কতটা খাঁটি ও যুক্তিযুক্ত সেটা ঠান্ডা মাথায় ধর্মীয় নেতা বা নন্দনবিদ কিংবা আইনজ্ঞরা কেউই বিচার করে দেখার অবকাশ পাননি, কারণ যে ভয়ানক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল তাতে সমাজের ভিত্তিতে আঘাত লাগছিল বলে একটা জরুরি পরিস্থিতির উদ্ভব হযেছিল তখনকার মতো। বাংলাদেশে সমসাময়িককালে তসলিমা নাসরিনকে নিয়ে যে প্রতিবাদ ও আন্দোলন হয়েছে, যার ফলে শেষ পর্যন্ত বেচারিকে দেশ ছাড়তে হলো, তার পিছনেও রাজনৈতিক হাত বেশ স্পষ্টই।

উপরে বর্ণিত পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় বিধান না সামাজিক নিয়মের তোয়াক্কা কে করে, তাকে বরং যুক্তিহীন মত্ত প্রতিক্রিয়ার মোকাবিলা করতে গিয়ে আপোষ করতে হয়। হুসেন সমাজের অনড় গোঁড়া মূল্যবোধকে ধাক্কা (বা আঘাত) দিয়েছেন— যা যতটা বিচারিক তারচেয়ে বেশি ধর্মরাজনৈতিক, আর নান্দনিক হওয়ার প্রশ্নটা তো অবান্তর। পোড়ামাটির মায়ের কাণ্ডটা অবশ্য নান্দনিক সমঝদারি ও নৈতিক মূল্যের সাথে— সেই সাথে বিচারিক বিধানের সাথেও— দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে।

৩

কিন্তু তর্কটা এখানেই শেষ হয়ে যায় না। মানুষের সৃষ্ট আদিশিল্প সঙ্গীত— হোক তখন তা আদিম তুচ্ছ স্থূল। ভাষারও আগে এসেছে ধ্বনি, ধ্বনি থেকে সুর। ভ্যষা তৈরি হতে হতে মানুষ অনেক উন্নত হয়েছে এবং কালে ভাষা তার সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চালনা ও প্রকাশের মুখ্য বাহন হয়ে ওঠে। কিন্তু তা বলে সুরের আকুতি তার কখনও যায়নি, সেটা মানুষের মজ্জাগত। মানুষ যেমন ভাষানির্ভর তেমনই সুরগত প্রাণও তার সেই আদি তৃষ্ণা অনির্বাপ্য। সুরের তৃষ্ণা এবং শরীরে-মনে সুর ও ছন্দের প্রভাব তার জীবনে আদিম ও স্বাভাবিক।

সুজান কে. ল্যাঙ্গার ইতিহাসের সূচনালগ্নে সঙ্গীতপূর্ব একটি পর্বের কথা বলেছেন যখন সুবিন্যস্তধ্বনি ব্যবহার করা হতো কাজে ও আচার পালনে ছন্দ আনার জন্যে। এরকম অভিব্যক্তি পথ তৈরি করার সেটাই ছিল উপযুক্ত সময় যা শেষপর্যন্ত হৃদয় ও আত্মার সাথে সংযোগ সৃষ্টির উপযুক্ত প্রতীক ভাষা জোগাবে মানুষকে।[১৬]

আর পোড়ামাটিচিত্রে বিধৃত ভয়ঙ্কর বাস্তবতার বিপরীতে ভুরিভুবি সাক্ষ্য-প্রমাণ দেয়া যাবে সঙ্গীত কিভাবে অশান্ত হিংসা দূর করে তাতে শান্তি-স্নিগ্ধতার প্রলেপ দিতে পারে। প্রশ্ন উঠতে পারে কেমন করে সঙ্গীত এ কাজ করে? এর উত্তর পাশ্চাত্যসঙ্গীতের প্রতিভাধর স্রষ্টা হ্বাগনারের কাছ থেকেই পেতে পারি— 'সঙ্গীত যা প্রকাশ করে তা শাশ্বত, অসীম এবং আদর্শ।'

অবশ্য এক্ষেত্রে মায়ের মনে হিংসা ছিল না, তিনি কেবল সুরে মগ্ন অবস্থায় কায়িক শ্রমের কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনার জন্ম দিয়েছেন। এমনকি একটু সহানুভূতির সাথে বিচার করলে বলা যায় তিনিই দুর্ঘটনা কবলিত হয়েছেন। ভুল হোক আর যাই হোক মা তো আর নিজেকে বিবেকের পীড়ন থেকে মুক্তি দিতে পারবেন না। এক্ষেত্রে বরং তিনি সহানুভূতির দাবিদার হন। এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় যে কথাটি বলা যায় তা হলো, শুদ্ধ সঙ্গীত সত্যিই স্বর্গীয় অনুভূতি ও ভাবের জন্ম দেয় বলেই জাগতিক সাংসারিক নিয়ম ছন্দের তাল কাটে। স্বর্গে সত্যিই তো আর ছেলে মানুষ করার ও কুয়ো থেকে জল তোলার দায় বইতে হবে না কাউকে। তাহলে কথা উঠবে জগৎসংসারে কেন স্বর্গকে টেনে আনা! সেটাও আবার মজ্জাগত ব্যাপার।

এই কথাটা খানিকটা ব্যাখ্যা করেই বলতে হবে। মানুষ সংসারে আবদ্ধ সামাজিক জীব বটে; কিন্তু এ পরিণতি তার শারীরিক বেঁচে থাকার জন্য যোগ্যতরের রক্ষাপ্রাপ্তি নীতির মূলত জীবতাত্ত্বিক প্রক্রিয়া থেকেই ঘটেছে। সমাজ ও সংসারের চাপ থেকে মুক্ত হলে মানুষ তো বিশ্বনিখিলেরই বাসিন্দা, একেবারে প্রাকৃতিক সম্পদ। অথচ বেঁচে থাকার প্রক্রিয়ায় নিজেকে তার বিশ্বনিখিল থেকে বঞ্চিত ও বিচ্ছিন্ন করে চলতে হয়। মানবজীবনের বহু ট্র্যাজিক পরিণতির মতো এও এক ট্র্যাজিক দায় যে, একদিকে তার সৃষ্ট নিরাপদ ও উন্নত জীবনব্যবস্থা তাকে বঞ্চিত-বিচ্ছিন্ন করে বিশ্বপ্রকৃতির পট থেকে আর অন্যদিকে প্রাণের মজ্জাগত তাগিদে নানা সাধনায় সে বিচ্ছেদের গণ্ডি পেরিয়ে যায়, কিংবা পেরুতে চায়। সংসার প্রতিনিয়ত মানুষকে ক্ষয় করে, ছোট করে, তার মনুষ্যত্বকে অপমান ও ব্যর্থ করে দেয়। কারণ এর

সার্থকতা ব্যক্তির ভোগের মানদণ্ডেই নির্ণীত হয়। কিন্তু মানুষ শুধু সংসারের নয় বিশ্বজগতেরও বাসিন্দা বলেই তার মধ্যে এই ক্ষুদ্রায়নের তথা ক্ষয়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও উত্তরণের তাগিদ জন্ম নেয়। সে এমন কোনো অবলম্বন খোঁজে যা তাকে প্রতিদিনের ক্ষয় থেকে, প্রাত্যহিকের গণ্ডি থেকে মুক্তি দিতে পারে। তার মধ্যে ক্ষণকালের ব্যক্তিক গণ্ডি টুটে চিরকালের বৈশ্বিক ব্যাপ্তির উন্মোচন ঘটে। তাতে সাংসারিক ও ব্যক্তিগত হিসেবে গরমিল হতে পারে— ক্বচিৎ পোড়ামাটিচিত্রের সেই মেয়ের মতো দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাও ঘটতে পারে; কিন্তু মূলত সঙ্গীতের মতো শিল্পের ভূমিকাতেই সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডির বদ্ধ বাতাসের বিকার কাটে, জিঘাংসার মতো প্রবৃত্তি যা হত্যাসহ বহু অপরাধের কারণ হতে পারে, তার সম্ভাবনাও দূর হয়ে যায়।

৪

তা বলে সঙ্গীত কোনো নৈতিক দায় নিয়ে সৃষ্ট হয়নি, কোনো শিল্পই এরকম গ্রহণ করে না। তবে তার স্বকীয় ভূমিকা পালনের সূত্রে বহু মানবিক মহৎ দায় আপনি পালিত হতে পারবে— সামাজিক-নৈতিক দায় পালন করতে গিয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ছাড় দিতে শুরু করলে একদিকে শিল্পের গুণগত মান ক্ষুণ্ণ হয় ও অন্যদিকে তার নিজস্ব বিকাশের পথচ্যুতি ঘটে যায়। সঙ্গীতের মতো অত্যন্ত মৌলিক ও বিমূর্ত শিল্পে এ সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

সুজান কে. ল্যাঙ্গার ও অন্যদের মতো আমরাও খেয়াল করি যে সব শিল্পের মতো সঙ্গীতও মানুষের জীবনের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই সৃষ্ট হয়েছিল। তবে সময়ের সাথে সাথে, বিশেষত ভাষার বিকাশের পরে, শিল্পের আর ঘরোয়া দায় মেটানোর মধ্যে সীমিত থাকার দরকার পড়েনি। শিল্প, বিশেষত সঙ্গীত, ক্রমে মানুষের আত্মিক চাহিদা পূরণে নিয়োজিত হয়ে দিনানুদৈনিক থেকে শাশ্বত বৈশ্বিক চেতনাবেগে সাড়া দিতে শুরু করে। এও মানুষের অন্তর্গত চাহিদা।

কখন মানুষের মধ্যে সুর অনুরণন তোলে, সুর কিভাবে ব্যক্তিকে বিশ্বের সাথে মিলিত করে তা রবীন্দ্রনাথের একটি লেখা থেকে জানতে পারি। ১৩১৯ বঙ্গাব্দের ২৫ জ্যৈষ্ঠ আরব সাগরে জাহাজে বসে তিনি লিখেছেন: 'ভোরে কাবিনে বিছানায় যখন প্রথম ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, গবাক্ষের ভিতর দিয়া দেখিলাম সমুদ্রে আজ ঢেউ দিয়াছে, পশ্চিম দিক হইতে বেগে বাতাস বহিতেছে। কান পাতিয়া তরঙ্গের কলশব্দ শুনিতে শুনিতে এক সময় মনে হইল কোনো একটা অদৃশ্য যন্ত্রে গান বাজিয়া উঠিতেছে। সে গানের শব্দ যে মেঘ-গর্জনের মতো প্রবল তাহা নহে, তাহা গভীর এবং বিলম্বিত; কিন্তু যেমন মৃদঙ্গ করতালের কলকল শব্দের ঘটার মধ্যে বেহালার একটি তারের একটানা তাল সকলকে ছাপাইয়া বুকের ভিতরে বাজিতে থাকে, তেমনি সেই ধীর গম্ভীর সুরের অবিবাম ধারা সমস্ত আকাশের মর্মস্থলকে পূর্ণ করিয়া উচ্ছ্বসিত হইতেছিল— একটা কথা আমার মনে হইল— এভাবে মহাসমুদ্র আমার মনের যন্ত্রে এই যে গান জাগাইল তাহা তো বাতাসের গর্জন ও তরঙ্গের কলধ্বনির প্রতিধ্বনি নহে। তাহাকে কিছুতেই এই আকাশব্যাপী জল বাতাসের শব্দের অনুকরণ বলিতে পারি না। তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র: তাহা একটি গান; তাহাতে সুরগুলো ফুলের পাপড়ির মতো একটির পরে আর একটি ধীরে ধীরে স্তরে স্তরে উদ্ঘাটিত হইতেছিল।'[১৭]

জর্মন অপেরা সঙ্গীতের ধ্রুপদী স্রষ্টা হ্বাগনার বলেছেন- 'What music expresses is eternal, infinite and ideal; it does not express the passion, love, or longing of such and such an individual on such-and-such an occasion, but passion, love or longing in itself, and this it presents in that unlimited variety of motivation, which is the

exclusive and particular characteristic of music, foreign and inexpressible to any other language.'[১৮]

ব্যক্তির প্রাত্যহিক গণ্ডি-উত্তীর্ণ বৈশ্বিক পটভূমির পাশাপাশি সঙ্গীতের একান্ত স্বরূপটি সম্পর্কে কিছু ধারণা ওপরের দুটি উদ্ধৃতি থেকে আঁচ করতে পারি আমরা। ভাষা সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে মানুষের আত্মপ্রকাশের মূল বাহন ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছে তা। ভাষার প্রতীক নির্মিত হওয়া ও বিকাশের স্বাভাবিক প্রবণতার সূত্রে সকল আত্মিক উন্মোচনের ক্ষেত্রে মানুষ কিছুটা সাহিত্যিক প্রকাশের শরণাপন্ন হচ্ছে। এভাবে সাহিত্যের আধিপত্য অনেকাংশে মানুষ স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু সঙ্গীতের রয়েছে ধ্বনি থেকে সৃষ্ট স্বর ও সুরনির্ভর ধ্বনিবাহিত মৌলিক প্রতীক, আদর্শ কাঠামো, ব্যঞ্জনা, রূপ এবং এসবের বিচিত্র বিকল্প বিন্যাসে ভাব, কল্পনা ও আবেগ সৃষ্টির ক্ষমতা। সঙ্গীতের এই ক্ষমতাটি ভাষা-নিরপেক্ষ, সাহিত্য-নিরপেক্ষ; কিন্তু অবশ্যই সংস্কৃতি-নিরপেক্ষ নয়। ইউরোপীয় ধ্বনি-নির্ভর ধ্রুপদী সঙ্গীতের সাথে তাই আমাদের ধ্বনি-নির্ভর ধ্রুপদী সঙ্গীতের পার্থক্য চরিত্রগতভাবে মৌলিক।

ইউরোপের সঙ্গীত পারিপার্শ্বিক তুচ্ছ জিনিসের ধ্বনি (যেমন গোরুর গলার ঘণ্টাধ্বনি, কামারের হাপর ও হাতুড়ির শব্দ) থেকে একেবারে প্রকৃতির জাগতিক ধ্বনিকে (যেমন সমুদ্রের গর্জন, ঝড়ের শব্দ) যন্ত্রে বাজিয়ে তার সঙ্গীত সৃষ্টি করেছে— দুঃখ প্রেম ক্রোধের মতো বিমূর্ত আবেগকেও স্বরের ব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তোলার পাশাপাশি। এভাবে তৈরি হয়েছে তার নিজস্ব সঙ্গীত-ভাষা। আমাদের সঙ্গীতে প্রকৃতির ধ্বনি থেকে কেবল স্বরটি নেওয়া হয়েছে; এবং প্রকৃতির রূপ থেকে ভাব গ্রহণ করে এবং মানবচিত্তের বিচিত্র ভাবকে ফুটিয়ে স্বরের বিন্যাসের মধ্য দিয়ে সুরের কাঠামো তৈরি করে সৃষ্ট হয়েছে সঙ্গীত। এই আমাদের বিশুদ্ধ সঙ্গীতের ভাষা— এ প্রকৃতির ভাষা যেমন নয়, তেমনি নয় মুখের বা সাহিত্যের ভাষা। এ ভাষা সঙ্গীতের ভাষা। আপন সংস্কৃতির চিহ্ন বহন করেও চরিত্র রক্ষা করে এবং তার ঋদ্ধি ও বিকাশে ভূমিকা রাখতে রাখতে এর যোগ প্রকৃতির সাথে, সকল সীমা তুচ্ছ করে বিশ্বের সাথে, ব্যক্তির সকল সংস্কার ভেঙে তার অখণ্ড সত্তার সাথে।

এই বিশুদ্ধ বিমূর্ত শিল্পের সাথে কাব্যের সূত্রে ভাষাসহ অন্য যেকোনো উপাদান সংযোজনের অত্যন্ত সতর্ক থাকা দরকার- 'significance of music should be semantic, not symptomatic and if it has an emotional content, it'has' it in the sense that language has its conceptual content– symbolically'।[১৯] ফলে সঙ্গীতকে আবেগে ভরিয়ে তুললে শেষ পর্যন্ত তা সস্তা ভাবাবেগে তাড়িত ভাসাভাসা কিছুতে পরিণত হবে। গান তখনই হয়ে ওঠে যখন তার সাঙ্গীতিক তাৎপর্যগুলো বিকশিত হবে, অন্য কিছুতে নয়—সামাজিক রাজনৈতিক দায় মেটানোর মধ্যেও নয়। আসলে সকল সাংসারিক সংস্কার ত্যাগ করে একটা পর্যায়ে শিল্প নিখাদ স্বীকার সত্তায় প্রকাশিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'ভারতবর্ষের সঙ্গীত মানুষের মনের বিশেষভাবে বিশ্বরসটিকেই রসাইয়া তুলিবার ভার লইয়াছে।' ঠিক সুরটি বাজলে তাই মানুষ বিশ্বের সাথে তার আদি এবং আত্মিক যোগটি খুঁজে পায়, তার সাংসারিক সংস্কারের সকল নিষেধ-নিগড় কেটে যেতে থাকে— সঙ্গীত তাকে অখণ্ডতা দেয়, যে অখণ্ডতা তাকে দেয় নিমগ্নতা। তার ভিতরে ভাবের উত্তেজনা সৃষ্টি করে, আর সুর-সৃষ্ট আবেগ তাকে আত্মোন্মোচনের তাগিদ দেয়। এ আবেগ ও ভাব সাংসারিক আবেগের চেয়ে উন্নততর এবং তার মানুষের শ্রেয়তর সত্তারই জাগরণ ঘটায়।

তবে এত বড় অর্জন তো আর স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে হবে না, সঙ্গীতের রস পাওয়ার জন্যে শিখতে ও চর্চা করতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এ কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়ে লিখেছেন, 'আমাদের সঙ্গীতবিদ্যায় সুরের বাহুল্য এবং প্রভেদ অসীম, কিন্তু কেবল শিক্ষা এবং অভ্যাসেই তাহার তারতম্য

উপলব্ধ হইতে পারে।... শিক্ষাহীন মূঢ়েরা যাহাতে হাসে, ভাবুকেরা তাহাতে কাঁদেন। অতএব লোকের যে সাধারণ সংস্কার আছে যে, সঙ্গীতসুখানুভব মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ, তাহা ভ্রমাত্মক, কতক দূর মাত্র ইহা সত্য বটে যে, সুস্বর সকলেরই ভালো লাগে — স্বাভাবিক তাল বোধ সকলেরই আছে। কিন্তু উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গীতের সুখানুভব, শিক্ষা ভিন্ন সম্ভব না।'[২০]

৫

কিন্তু এই ভাবাবেগের সর্বগ্রাসিতা এবং এই জাগরণের সংসারাতিগ প্রবণতা মনে রেখে সামাজিক মানুষের সন্দিগ্ধতা ও অভিযোগের মুখোমুখি হতেই হয়। শুধু স্বর-নির্ভর বিশুদ্ধ সঙ্গীত-ভাষায় গীত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতই নয়, আমরা দেখি বাউল বা কীর্তনগানের মতো সাহিত্যিক ভাষায় রচিত গানেও মানুষ পরিপার্শ্ব ভুলে অভিভূত হয়ে যায়। গানের সার্থকতাও তো এইখানেই।

আধুনিক জীবনের প্রবণতা যেমন প্রকৃতিবিরোধী তেমনি তা হয়ে উঠেছে শুদ্ধ সঙ্গীতেরও বিরোধী। তার বাস্তবতা, গতিবেগ, খণ্ডিভবন এবং বস্তুগত ভোগবাদিতা সঙ্গীতের মতো বিস্তারসাপেক্ষ অখণ্ড নিমগ্নতা-নির্ভর আবেগের বিরুদ্ধাচারী। সে তৈরি করে নিচ্ছে প্রাত্যহিক আবেগের বর্ণনাভিত্তিক কাব্য, শরীরী আবেদন নির্ভর ছন্দোত্তেজনা এবং শব্দের তীব্র চীৎকৃত উচ্ছ্বাস। একদিকে মানুষ শুদ্ধ সঙ্গীতকে হারাতে বসেছে আর অন্যদিকে তার জীবনে জাঁকিয়ে বসছে সঙ্গীতের নানা বিকৃতি। যে সঙ্গীত মানুষকে তন্ময়তা দেয় তা চিরকালই মুষ্টিমেয় মানুষের চর্চার বিষয় হয়ে থাকবে, আবার যে সঙ্গীত সমাজের ওপর নেশার আকার সর্বগ্রাসী থাবা মেলে ধরেছে তা প্রথমত শুদ্ধ সঙ্গীত নয়, প্রধানত স্থূল কাব্যবোধ ও বিকৃত সঙ্গীতরুচির চমক জাগানো বিকার, আর দ্বিতীয়ত তা শিল্প হিসেবে তুচ্ছ, সংকীর্ণ ও সাময়িক; সঙ্গীতের জাগতিক অখণ্ড ও আত্মিক প্রেরণা তাতে অনুপস্থিত। সুর-নির্ভর উচ্চাঙ্গের হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েও রবীন্দ্রনাথ কেবল ধ্বনির মাধ্যমে সৃষ্ট এর সুরস্থাপত্যে স্বচ্ছন্দ বোধ করেননি। প্রথমত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের অপরিমিত এবং দ্বিতীয়ত এর বাণীর তুচ্ছতা নিয়ে তাঁর অন্তরের আপত্তি ছিল। সঙ্গীতজ্ঞ এবং বিশিষ্ট বাঙালি চিন্তাবিদ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সাথে হিন্দুস্থানী বিশুদ্ধ সঙ্গীত (pure music, যেমন আলাপ) নিয়ে পত্রালাপের এক পর্যায়ে তিনি বাংলা গানের, এমনকি সাধারণভাবে গানের আদর্শ হিসেবে বাণী ও সুরের 'অর্ধনারীশ্বর রূপের' কথা বলেছেন। ধূর্জটিপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথকে তর্কে অনেক দূর টেনে আনলে একদিকে যেমন তিনি বলে দেন 'সঙ্গীতে আমি নির্মমভাবে আধুনিক অর্থাৎ জাত বাঁচিয়ে আচার মেনে চলিনে' ;তেমনি এও জানিয়ে দেন 'বাঙালির চিত্তবৃত্তি প্রধানত সাহিত্যিক এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।' বিশুদ্ধ সঙ্গীতে বাংলার চেয়ে হিন্দুস্থানের অগ্রগামিতা মেনে নিয়েই তিনি ধূর্জটিপ্রসাদকে লেখেন, 'বাঙালির এই স্বভাব (*চিত্তবৃত্তির সাহিত্যিক প্রবণতা*) নিয়েই তাকে গান গাইতে হবে। বাংলার নতুন যুগের গান সৃষ্টি হতে থাকবে ভাষায় সুরে মিলিয়ে।... এই মিলন সাধনে ধ্রুবপদ্ধতির হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের সহায়তা আমাদের নিতে হবে, আর অনিন্দ্যনীয় কাব্যমহিমা তাকে দীপ্তিশালী করবে।'[২১]

এভাবে গানকে সুরের আতিশয্য ও আরোপিত অলংকারের বৈকল্য থেকে রক্ষা করে আপোষ হিসেবে গ্রহণযোগ্য মাঝারি অবস্থানে আনা হলো, এরকম কিছু প্রমাণ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। ঘটনাটা তা নয় বস্তুত হিন্দুস্থানী ধ্রুপদ শিখে ও তার রস গ্রহণ করে রবীন্দ্রনাথ রাগরাগিণীর বাহ্যিক কারুকৃতি অপেক্ষা গভীর সুরটিকে ধরতে পেরেছিলেন বলে নিজের অসামান্য কল্পনাশক্তি ও সৃজনক্ষমতার জোরে ভারতীয় উচ্চ সঙ্গীতকে প্রথার বন্ধনের বন্দিদশা থেকে মুক্তির স্ফূর্তি দিয়ে একটা নতুন উচ্চ সঙ্গীতধারা সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ও গবেষক সনজীদা খাতুন বলেন, 'সুরে চলনের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে প্রধানত ধ্রুপদরীতির অনুবর্তী বলা হয়। চার তুক এবং অন্তরা ও আভোগের প্রায় অনুরূপ সুরগতির মাঝখানে সঞ্চারীতে সুরের স্বতন্ত্র বিহার ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গানে সুর উচ্চারণের মৃদু ওজন শেষ পর্যন্ত তাঁর গানকে ধ্রুপদ ধারার শ্রেণীতে জায়গা করে দেয়। প্রবন্ধসঙ্গীতের সুসম্পূর্ণতা রবীন্দ্রনাথের গানে উপলব্ধি করা যায় বলেই ধ্রুপদের প্রজাতি হিসেবে এ গানের পরিচয়।'[২২] এই সুসংবদ্ধ সুগঠিত পরিমিত স্বরবিন্যাস তার হৃদয়স্পর্শী বাণীর সহযোগে যে সুরস্থাপত্য তৈরি করে তা মেজাজে যেমন একান্ত বাঙালি, চিত্তবৃত্তির প্রকাশে তাতে তেমনি ধরা থাকে ধ্রুপদী চারিত্র্য।

এ গান চরিত্রে ধ্রুপদী, মেজাজে রোমান্টিক — ভারতীয়ত্ব ও বাঙালিয়ানা, মহৎসভ্যতা ও বিকাশমান সংস্কৃতির এক অপূর্ব সম্মিলন।

আসলে উনবিংশ শতাব্দীর যে জাগরণের ফলে প্রাদেশিক গ্রামীণ স্থবির একঘেয়ে এ সমাজমানসে নাড়া পড়েছিল এবং সব অচলায়তন ভেঙে নতুন নাগরিক জীবনের সূচনা হচ্ছিল তার অন্যতম রূপকার ও শ্রেষ্ঠ ফসল ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ভাষা কাব্য সাহিত্যে যেমন তিনি বাঙালির জন্য বৃহত্তর সমকালীন বৈচিত্রময় পথ খুলে দিয়েছিলেন তেমনি তা ঘটেছে সঙ্গীতেও। প্রচলিত পাঁচালি, যাত্রার জুড়ি গান, বিদ্যাসুন্দরের গান বা এ জাতীয় কাব্যগীতির দিন শেষ হয়ে যায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতকৃতিরই ফলে। এমনকি সম্ভাবনাময় কীর্তনগান— যার গুণকীর্তন করেছেন ববীন্দ্রনাথ বারবার, এমনকি যার মধ্যে এ অঞ্চলের ধ্রুপদী সঙ্গীতের সম্ভাবনাও দেখেছিলেন তিনি— কিংবা অন্যান্য সমৃদ্ধ সঙ্গীত-রূপ বাউল ভাটিয়ালি প্রভৃতি গান, সমাজপরিবর্তনের অকাট্য কারণ ছাড়াও, সাঙ্গীতিক কারণেও অর্থাৎ তাদের চেয়েও সাঙ্গীতিকভাবে শ্রেয়তর সঙ্গীত রচিত হওয়ায়, স্থবির হয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের পবেও বাংলা অদ্যাবধি পল্লী প্রধানই, গ্রামীণ জীবনে মৌলিক পরিবর্তন সবেমাত্র অনুভূত হচ্ছে; এবং এখনো অজস্র কীর্তন ও বাউলগান ও অন্যান্য লোকগীতি রচিত হয়ে চলেছে বটে, কিন্তু এসবই হচ্ছে একই ছক ও ছাঁচের পুনরাবৃত্তির গতানুগতিকতায়, ভাব ও সুরের বাঁধা পথে মুখস্থ পরিভ্রমণে; একটির সাথে অন্যটির বাণীগত যে সামান্য তফাৎ তা ভাষার বা সুরের পুনরাবৃত্তির কারণে প্রায়শ ভানপ্রবণ ও কৃত্রিম হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে বরং রবীন্দ্রনাথের সমকালে অতুল-দ্বিজেন্দ্র-রজনী-নজরুল প্রমুখের যে সঙ্গীতকৃতি তা, রবীন্দ্রনাথের সাথে তুলনায় সীমাবদ্ধ হলেও, সেই সময়ের নবজাগরণের স্ফূর্তিরই সৃষ্টি।

৬

একটা কোনো সঙ্গীত নিশ্চয় আছে যা মানুষের সৃষ্ট এই সমাজ-সংসারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। সঙ্গীতের মৌল প্রবণতা তো সেই দিকেই-অন্তর্মুখী বা বহির্গামী যা হোক, মানুষকে ধ্যানস্থ বা জাগ্রত যা-ই করুক, সে তোয়াক্কা করে না সামাজিকতার, নেহায়েৎ মানুষী দুর্বলতার। এ গান সৃষ্টি করেন ও আজীবনের সাধনা হিসেবে নিতে পারেন সামান্য কিছু মানুষ। বঙ্কিমচন্দ্রের কথাটা আরেকবার মনে করিয়ে দেই, 'উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতের সুখানুভব শিক্ষা ভিন্ন সম্ভবে না'

সব সমাজে সর্বকালে সামান্য কয়েকজন, যারা সংসার নয় জগতের মানুষ, যারা সমাজ নয় প্রকৃতির মানুষ দৈনন্দিনের নয় চিরকালের মানুষ, যারা বন্ধনহীন ও অকৃত্রিম, যারা মৌলিক, অন্তহীন তারাই সঙ্গীতে নিবেদিত মানুষ। তবে সেই পাহাড়পুরের মায়ের মতো নেহায়েৎ সংসারী মানুষ ও কখনও কখনও এই অন্তহীন বাধাবন্ধহীন সুরের ডাক শুনে তাতে মজে যেতে পারেন। যে সমাজ বা কাল এ রকম মানুষকে বরদাস্তই করে না, এবং সকল বা আগ্রহীজনকে, অন্তত সাময়িককালের জন্য, সীমাতিক্রমের অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে দেয় না সে সমাজের অস্বাস্থ্য ও বদ্ধতা কিছুতেই কাটে না। তাতে

ক্ষয়ের অন্যান্য বিকৃতিও প্রকাশ পেতে থাকে। আর সৃষ্টির মধ্যে যে আগুন আছে তাকে এড়িয়ে গেলে হয় সে আগুন নিভে যাবে নতুবা বেপরোয়া প্রজ্জ্বলন ঘটাবে। সংস্কৃতিই আত্তীকরণের তুষ্টিতে এ অগ্নিতে সমাজকে আলোকিত করে। বলা দরকার শুদ্ধ সঙ্গীত মানুষকে কেবল অভিভূত করে রাখে না, তার উন্মীলন ঘটায়। অন্তরের গ্লানির চাপ ও ক্ষয়ের তপ্ত বাষ্প দূর করে তাকে বিকাশের সজীব প্রেরণা দেয়, গণ্ডিবদ্ধ মানুষের ম্লান ভীরুতায় আঘাত করে; তাকে সকল শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে। নেহায়েৎ ব্যক্তিগত দুর্বলতাকে পুঁজি করে যে ভাবালুতা সঙ্গীতের নামে চলে আমরা তার কথা অবশ্যই বলছি না। সে সঙ্গীত বরং আবেগকে ন্যাকামির পর্যায়ে নামিয়ে এনে মানুষকে দুর্বল ভঙ্গুর ও অস্থির করে তোলে। এ হলো অনৈতিক সঙ্গীত।

যদিও আমরা এ সঙ্গীতকে অনৈতিক বলছি তবুও এর বিরুদ্ধেও কোনো আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলব না। আমরা বড়জোর শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্যে আইনের দ্বারস্থ হতে পারি। এর অনৈতিকতাটা সাঙ্গীতিক এবং তাই নান্দনিক, যার আওতা সামাজিক নৈতিকতার বাইরে, আর তাই আদালতের এখতিয়ারে তা পড়বে না। নৈতিক সঙ্গীতের মতো অনৈতিক সঙ্গীতও বেআইনি নয়, উভয়েই আইনের এখতিয়ারের বাইরে। কিন্তু নৈতিক সঙ্গীত সমাজের বিধান ডিঙিয়েও সামাজিক শিল্প আর অনৈতিক সঙ্গীত অসামাজিক। এটা অসামাজিক প্রথমত কোলাহলের মাধ্যমে সমাজে উৎপাত সৃষ্টির কারণে, দ্বিতীয়ত সমাজের সঙ্গীতঐতিহ্য ও সঙ্গীতরুচিতে ভাঙন ধরানোর জন্যে। নৈতিক সঙ্গীত যখন মানুষের শরীর ও মনকে সমন্বিত করে ব্যক্তিসত্তাকে সংহত করে তখন অনৈতিক সঙ্গীত ব্যক্তিত্বে ভাঙন ধরায়, অসুখ বাধিয়ে দেয়।

তাহলে যে সঙ্গীত এক দুর্ভাগা মাকে সন্তানের অপঘাতে মৃত্যুর কারণ করে তোলে তার কি দায় মুক্তি ঘটল? একটু আগে আমরা বলেছি সমাজব্যাপী চিরকাল এমন উচ্চ সঙ্গীতের স্রষ্টা জন্মায় না। কিন্তু একটি বিকাশমনা সমাজের রসোত্তীর্ণ শিল্পের সমঝদারও সংখ্যায় বাড়বে, এটাই স্বাভাবিক। এতে যে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে তার বিপরীতে যে শান্তি স্থিতির অমিত সম্ভাবনা খুলে যায় সে কথাও আমরা বলেছি। বরং দুর্বল ও দুর্নীতিগ্রস্ত সঙ্গীতের অনাচারে সমাজের অনিষ্ট হয় সীমাহীন। অনৈতিক ও অসাঙ্গীতিক ভানপ্রবণ সঙ্গীতের এই আক্রমণ থেকে কোনো আইন বা নিষেধাজ্ঞার জোরে কোনো নবতর প্রযুক্তি প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে, নিস্তার পাওয়া যাবে না। এর একমাত্র প্রতিষেধক হচ্ছে সমাজে ঐ অসীম ও মুক্ত, শাশ্বত ও জাগতিক শুদ্ধ সঙ্গীতের চর্চার পথ খোলা রাখা। যে সমাজ শ্রেয়োনীতির ধ্বজাধারীদের চাপে সাধক শিল্পীকে মর্যাদা দেবে না তার সৃষ্টির উৎস যাবে ঘুচে, সে সমাজ খরাগ্রস্ত হয়ে ভিতর থেকে শুকিয়ে মরবে। আর যেহেতু এ সঙ্গীত উচ্চতর সাধনার বিষয় তাই সমাজে মূল বেগবান সঙ্গীতধারা যাতে অনৈতিক সঙ্গীতেব খপ্পরে না পড়ে সে জন্য চাই সাঙ্গীতিকভাবে চরিত্রবান সৎ ও বলিষ্ঠ সঙ্গীতের চলমান ধারা। বলা বাহুল্য বাংলা গানে ধ্রুপদধর্মী রবীন্দ্রসঙ্গীত সেই আদর্শ ধারা— যা উচ্চ সঙ্গীতের সাথে আমাদের সংযোগ রক্ষা করবে, আবার বাণীর ভাব ও সুরের নৈপুণ্যে স্বতন্ত্র এক ধ্রুপদী ধারার সূচনা করতে সক্ষম। এই সম্ভাবনা নিয়ে সঙ্গীত ও গুণীজনই ভাববেন। তবে আপাতত এটুকু বলা যায়, শুদ্ধ সঙ্গীতকে পেতে ও সঙ্গীত থেকে পেতে হলে বাংলাদেশে রবীন্দ্রসঙ্গীতের ব্যাপক চর্চা ও প্রসারের কোনো বিকল্প নেই। শুদ্ধ সঙ্গীতকে নির্বিকল্প বলে স্বীকার করলে সেই সাথে দায় মুক্তি ঘটে সেই সঙ্গীতের যা অভিভূত করে রাখে এক জননীকে, যা দুর্ঘটনাও ঘটায়। কিন্তু ক্বচিৎ ঘটা দুর্ঘটনাকে দুর্ঘটনার বেশি মর্যাদা দেওয়ার দরকার নেই, কারণ শুদ্ধ সঙ্গীতই হিংসায় উন্মত্ত এ পৃথিবীতে মানুষের মনে মহৎ ভাবের উদয় ঘটাতে পারে, ধ্যান দিয়ে কল্পনা দিয়ে তার শ্রেয়তর সত্তার উন্মোচন ঘটাতে পারে।

সূত্র

১. পোড়ামাটির এই ফলকের একটি অনুলিপি মুদ্রিত হয়েছে ড. সুকুমার সেন-এর গ্রন্থ *বঙ্গ-ভূমিকায়,* প্রকাশক পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, মে ১৯৯৯।

২. *শেক শুভোদয়া*-র রচনাকাল সপ্তদশ শতাব্দী। কবি হলায়ুধ মিশ্র সেন আমলের সমাজচিত্র বর্ণনা করেছেন এই সংস্কৃত কাব্যে।

৩. প্লেটো তাঁর *রিপাব্লিকের* তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত লিখেছেন সঙ্গীত, শিল্পকলা ও শিল্পী সম্পর্কে বিশেষত পৃ: ৩৯৫-৪০৩ এর মধ্যে। আরও দেখুন অ্যারিস্টোটলের পলিটিক্স ৭ম অধ্যায়।

৪. প্রাগুক্ত

৫. Donald J. Grout : *A History of Western Music,* W. W. Norton & Company, New York, 1960, p.10.

৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *সঙ্গীতচিন্তা,* বিশ্বভারতী, ১৯৯৫, পৃ: ৪৮।

৭. Clive Bell : *Art,* Rupa & Co. New Delhi, 2002, p. 114.

৮. তলস্তয়-এর *What is Art* গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ের আলোচনা জুড়ে নৈতিকতার প্রশ্ন ঘুরেফিরে এসেছে। এ বইয়ের একটি ভালো বাংলা অনুবাদ সুলভ— *শিল্পের স্বরূপ* : অনুবাদ- দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮১।

৯. *Clive Bell : Art p 106.10.*

১০. Ibid, p.117

১১. *সঙ্গীতচিন্তা* পৃ: ২৫১

১২. প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৮

১৩. Jerrold Levinson : essay in *Aesthetic* an anthology ed.by Susan Feagin & Patrick Maynard, Oxford. 1997, p. 336

১৪. Ibid

১৫. William Shakespeare : *The Merchant of Venice* Act 5, Complete Works of Shakespeare, Oxford and IBH Publishing Co. Ltd. New Delhi, p. 250.

১৬. Susanne K. Langer : *Philosophy in a New Key,* Mentor, New York, 1955, p. 185-199.

১৭. সংগীতচিন্তা পৃ: ২৫

১৮. *Philosophy in a New Key* গ্রন্থে উদ্ধৃত

১৯. Ibid.

২০. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : প্রবন্ধ 'সঙ্গীত' সংকলিত *বাংলা সংগীত মেলা,* সম্পাদনা : সৌমিত্র লাহিড়ী ও কঙ্কন ভট্টাচার্য, কলকাতা, ১৯৯৭ পৃ: ৩।

২১. সঙ্গীতচিন্তা পৃ: ১৬৭।

২২. সনজীদা খাতুন : রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাবসম্পদ।

ঔপনিবেশিক সম্পদের হস্তান্তর ও ব্রিটেনের শিল্পায়ন 'বিনা পয়সার ভোজ'

উৎসা পট্টনায়ক

উন্নয়নশীল দেশগুলির উপর উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব কী তা নিয়ে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির পণ্ডিতমহলে বহু দিন ধরেই আলোচনা চলে আসছে এবং এ সম্পর্কে অনেকরকম বিশ্লেষণও হয়েছে। কিন্তু উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ যে শুধুমাত্র আজকের যুগের উন্নয়নশীল দেশগুলিকেই প্রভাবিত করেছে তা নয়, পুঁজিবাদী বিকাশের প্রধান যে বৈশিষ্ট্যগুলি আজকের উন্নত দেশগুলির উন্নয়নের পথ ও অভিমুখ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল সেগুলিও সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের অবদান। যেমন, উন্নত দেশগুলির জনসংখ্যার নতুন অধিকৃত দেশগুলিতে বিপুল সংখ্যায় অভিপ্রয়াণ এবং উপনিবেশগুলির পুরোনো অধিবাসীদের স্বাধীনতা হরণ করে নিজেদের অধীনস্থ করা ইত্যাদি। অথচ উন্নত দেশগুলির উন্নয়নের ইতিহাস নিয়ে যে সব অর্থনীতিবিদ ও ঐতিহাসিকরা লেখালেখি করছেন তাঁদের আলোচনায় এই ঘটনাগুলির তাৎপর্য নিয়ে কোনও উল্লেখই দেখতে পাওয়া যায় না। পণ্ডিতরা বিশেষ করে অর্থনীতিবিদরা যে তাত্ত্বিক মডেল বা ধারণার সাহায্যে এই ইতিহাস লেখেন, বলা বাহুল্য তার অবাস্তবতার কারণেই এ ধরনের অবহেলা ঘটেছে।

ইংল্যান্ডের ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদরা— বিশেষ করে ডেভিড রিকার্ডো ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির গতিময়তা বিষয়ে আলোচনা করার সময় ঐতিহাসিক বাস্তবতা থেকে এতটাই দূরে সরে গিয়েছিলেন যে তাঁরা অভ্যাসবশত একটি বদ্ধ অর্থনীতির মডেলের ধারণা দিয়ে আলোচনা শুরু করতেন। অথচ বদ্ধ অর্থনীতির এই মডেল ছিল বাস্তবে যে দেশে তাঁরা বাস করতেন অর্থাৎ ব্রিটেন থেকে একেবারেই বিপরীত। বদ্ধ অর্থনীতির মডেলের ধারণার সাহায্যে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির গতিময়তা বিশ্লেষণ করার এই রীতি ও পদ্ধতি আধুনিক উন্নয়ন তত্ত্বের মূলধারাতেও চালু আছে।

একটি বদ্ধ অর্থনীতির ধারণা বলতে যা বোঝায় তা হল : যখন অন্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের সুবাদে একটি অর্থনীতির বদ্ধতা দূর হয়, তখন অন্য দেশের সঙ্গে এই বাণিজ্য এমনভাবে ও পদ্ধতিতে হবে যাতে বদ্ধ অর্থনীতির অবস্থার কোনও তারতম্য ঘটবে না। ধরেই নেওয়া হবে যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সব সময়ই দু'টি সমক্ষমতাসম্পন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘটিত হয়— বাণিজ্যে লেনদেন ও বিনিময়ের মধ্যে কোনও অসমতা নেই। এই ধরনের তাত্ত্বিক মডেল বা কাঠামোয় বাস্তবে ঔপনিবেশিক বাণিজ্য যেভাবে হয়ে থাকে তা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। বাস্তবে তো উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি উপনিবেশগুলি থেকে যা আমদানি করত তার খরচ মেটানো হতো উপনিবেশের অধিবাসীদের কাছ থেকে সংগৃহীত কর, খাজনা ইত্যাদি থেকে। দু'শো বছর ধরে যে সব অর্থনৈতিক তত্ত্ব গড়ে উঠেছে, তার কোনও একটিতেও একবারের জন্যও উপনিবেশগুলির সাথে সে দেশেরই মানুষের দেওয়া কর ও খাজনার দ্বারা পুষ্ট বাণিজ্যের কোনও উল্লেখ করা হয়নি। অথচ ঐ যুগে সারা পৃথিবী জুড়ে বেশিরভাগ বাণিজ্যই ছিল এ ধরনের। দাম ও মূল্য নির্ধারণের ক্লাসিক্যাল তত্ত্বটিও বদ্ধ

অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রেক্ষিতেই গড়ে উঠেছিল।[১] বাণিজ্য ও বিনিয়োগের বিষয়টি যখন এই তত্ত্বের মধ্যে যুক্ত করা হল, তখনও তাত্ত্বিক কাঠামোটির কোনও হেরফের ঘটল না। কারণ বাণিজ্য বলতে মনে করা হল যে, দেশের মধ্যে উৎপাদিত পণ্যের বা মূল্যের সঙ্গে বাণিজ্যের সহযোগী দেশের উৎপাদিত সামগ্রীর বা মূল্যের বিনিময় বা আদানপ্রদান। বাণিজ্যের ফলে পণ্য আদানপ্রদানের পর কোনওরকম ঘাটতি বা উদ্বৃত্ত না থাকার অর্থ হল যে দেশের ঘাটতি হবে সেখান থেকে স্বর্ণমুদ্রা যাবে উদ্বৃত্ত দেশে অথবা উদ্বৃত্ত দেশকে অনুমতি দেওয়া হবে ঘাটতি দেশের কাছ থেকে প্রাপ্য স্বর্ণমুদ্রার দাবি আদায় করতে। কিন্তু এই তাত্ত্বিক অবস্থান ছিল বাস্তব ঘটনার একেবারে বিপরীত কারণ, বাস্তবে কোনও উপনিবেশেরই— যতই তার বাণিজ্য উদ্বৃত্ত হোক না কেন— প্রভুত্বকারী দেশের থেকে কোন প্রাপ্য জুটত না বা তাদের ন্যায্য দাবি পূরণ হতো না। আমরা কোনও অর্থনীতিকে তখনই আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মুক্ত অর্থনীতি বলে অভিহিত করব যখন দু'টি সমকক্ষ দেশের মধ্যে সবরকম বাণিজ্য ও বিনিময় চলে। কিন্তু এ জাতীয় মুক্ত অর্থনীতির মডেল ঔপনিবেশিক শোষণের বাস্তবতাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে। উন্নত দেশগুলির শিল্পায়নের প্রক্রিয়া পুষ্ট করার ব্যাপারে উপনিবেশগুলি থেকে সংগৃহীত কর ও খাজনার টাকায় কেনা পণ্যসামগ্রীর স্থানান্তর যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিল— মূল স্রোতের অর্থনীতির শাস্ত্রে তা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হয়েছে এবং আজও পর্যন্ত এই অনুমানই করে চলেছে যে বাণিজ্য সবসময়ই দু'টি সমকক্ষ সার্বভৌম দেশের মধ্যে হয়ে থাকে।

যেমন বলা যায়, এরকম একটি সর্বজনগ্রাহ্য ধারণা আছে যে স্বল্প সময়কালে কোনও দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটাতে হলে জাতীয় উৎপাদনের যে অংশ সঞ্চয় ও বিনিয়োগ হিসেবে ব্যবহার করা হয় তার পরিমাণে বড়োসড়ো বৃদ্ধি হওয়া দরকার। ডব্লিউ. ডব্লিউ. রস্টো তাঁর The Stages of Economic Growth গ্রন্থে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণের বড় আকারের বৃদ্ধির ঘটনারই নাটকীয় অথচ যান্ত্রিক বর্ণনা দিয়েছিলেন 'টেক অফ্' অথবা 'ধারাবাহিক উন্নয়নের পথে যাত্রাশুরু'-এর পর্যায় হিসেবে। ক্লাসিকাল অর্থনীতিবিদদের মূলধন গঠন বিষয়ে যে আলোচনা তার মধ্যেই এই ধারণার দীর্ঘ তাত্ত্বিক ঐতিহ্য নিহিত। অর্থনৈতিক ইতিহাস যাঁরা চর্চা করেছেন সেই সব ঐতিহাসিকের কেউই ব্রিটেনের ইতিহাসের এমন কোনও পর্বকে চিহ্নিত করতে পারেননি যখন সে দেশের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণে প্রয়োজনীয় মাত্রায় পরিবর্তন ঘটেছিল যার সাহায্যে ব্রিটেনের জাতীয় আয়ের নাটকীয় বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল এবং শিল্পবিপ্লবের সময়ের কাঠামোগত পরিবর্তন এসেছিল।[৩] এঁরা কেউই উপনিবেশ থেকে যে পরিমাণ সম্পদের হস্তান্তর হয়েছিল তার উল্লেখ করেননি। অথচ এই ঘটনার মধ্যেই প্রকৃত উত্তর নিহিত আছে, কারণ উপনিবেশ থেকে সম্পদের হস্তান্তর ব্রিটেনে জাতীয় সঞ্চয় থেকে প্রাপ্তব্য সম্পদের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ করে দিয়েছিল— পরবর্তী অধ্যায়ে দেওয়া হিসেব থেকে এর প্রমাণ মেলে।

এরকমই একটি অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায় যখন শিল্পবিপ্লবের সূচনাকালে যে উৎপাদনবৃদ্ধি ঘটেছিল তা পরিসংখ্যানগতভাবে আমরা দু'টি ভাগে ভাগ করি— একটি হচ্ছে বিনিয়োগের বৃদ্ধিজনিত এবং অন্যটি হচ্ছে প্রযুক্তির উন্নতির ফলে উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধিজনিত। অর্থনীতির যে ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে উৎপাদনশীলতার সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি ঘটেছিল তা হল বস্ত্রশিল্প। কিন্তু বস্ত্রশিল্পে অর্থনীতির মোট মূলধনের মাত্র এক শতাংশ বিনিয়োগ হয়েছিল। সুতরাং মূলধনের বিনিয়োগ ও উৎপাদনশীলতার বৃদ্ধি এই দু'টি বিষয়ের সাহায্যে এই পর্বে যে পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি ঘটেছিল অর্থনীতিতে, তা ব্যাখ্যা করা যায় না। এই সময়ে ব্রিটেনে মোট জাতীয় উৎপাদন যে পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং উপরোক্ত দু'টি কারণে উৎপাদনের যে পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটেছিল— এই দুয়ের মধ্যে

ব্যবধান এত বেশি যে এ ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে একজন অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদ বিভ্রান্ত হয়ে এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, "১৭৮০ থেকে ১৮৬০-এর মধ্যে ব্রিটেনের ভাগ্যে নিঃসন্দেহে এক বিনিপয়সার মহাভোজ জুটে গিয়েছিল।" যদিও তিনি এই 'বিনিপয়সার ভোজ'-এর উৎসমুখ চিহ্নিত করতে সমর্থ হননি। সমর্থ না হওয়ার কারণ অবশ্য সেই বদ্ধ অর্থনীতির আলোচনার কাঠামো যার মধ্যে থেকেই তিনি এই বিশ্লেষণ করেছিলেন। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, 'বিনিপয়সার ভোজের' আয়োজন হয়েছিল উপনিবেশ থেকে সম্পদের হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে। প্রাগুক্ত লেখকের ব্যবহৃত এই শব্দগুলিই বর্তমান প্রবন্ধের শিরোনামের শেষ অংশে আমরা ব্যবহার করেছি।

শিল্পবিপ্লব সম্পর্কে যে কোনও প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকের একটি আবশ্যিক অঙ্গ হল কৃষিবিপ্লব নিয়ে আলোচনার একটি অধ্যায়। যদিও ব্রিটেনের জনসংখ্যার শ্রমজীবী অংশের ভোগ্যপণ্যের চাহিদা মেটাতে এই কৃষিবিপ্লব সক্ষম হয়নি। কারণ শিল্পবিপ্লবের মোটামুটি পাঁচ দশকের পর্ব জুড়ে (১৭৯০-১৮৪৬) বিদেশ থেকে আমদানী করা সস্তা খাদ্যশস্যের জন্য যে অনিয়ন্ত্রিত চাহিদার উদ্ভব ঘটেছিল তা এক অর্থে ছিল অভূতপূর্ব রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চাহিদা। ব্রিটেনের কৃষিবিপ্লব যে শিল্পক্ষেত্রের কাঁচামালের চাহিদাও মেটাতে সমর্থ হয়নি তার প্রমাণ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় যে কাঁচামাল— তুলো— তাও সম্পূর্ণভাবেই তাদের আমদানী করতে হয়েছিল। সুতরাং ভোগ্যপণ্যের উৎপাদনে অথবা কাঁচামালের উৎপাদনের ঘাটতি শিল্পবিকাশে কোনওরকম বাধা সৃষ্টি করতে পারল না কেন— অথবা আমদানীর মাধ্যমেই যদি এই ঘাটতি পূরণ করা হয়ে থাকে, তাহলে আমদানীর মূল্য পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার সমস্যা কেন শিল্পায়নে বাধা হয়ে দাঁড়াল না— এইসব প্রশ্নের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা প্রয়োজন। যেহেতু শিল্পায়ন ঘটেছিল অতএব ধবে নেওয়া যেতে পারে যে অভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক কোনও দিক থেকেই কোনওরকম বাধার অস্তিত্ব ছিল না— এরকম একটা পুনরুক্তিমূলক যুক্তি দিয়ে এই ঘটনার ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। প্রকৃত ব্যাখ্যা নিহিত আছে উপনিবেশগুলি থেকে বিপুল পরিমাণ সম্পদের হস্তান্তরের মধ্যে; বিশেষ করে শিল্পপ্রধান উপনিবেশগুলি থেকে। সম্পদের হস্তান্তরের অর্থ হচ্ছে শিল্পপ্রধান দেশগুলিতে উপনিবেশগুলি খাদ্যশস্য ও কাঁচামাল বিপুল পরিমাণে বিনা খরচে সরবরাহ করে গেছে।

২

স্বাভাবিক বাণিজ্য ও ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য কী এবং কীভাবে সম্পদের হস্তান্তর ঘটে?

যখন দু'টি সার্বভৌম দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলে এবং যেখানে কোনও দেশই অন্য দেশের উপর সামরিক শক্তির প্রয়োগে অর্থনীতি বহির্ভূত জোরজবরদস্তি খাটায় না, তখন ধরে নেওয়া যায় যে পারস্পরিক লাভ সম্পর্কে ধারণার ভিত্তিতেই এ ধরনের বাণিজ্য পরিচালিত হয়। কোনও দেশ যদি বাণিজ্য থেকে লাভবান না হয় তাহলে বাণিজ্য থেকে সরে আসার অধিকার থাকে। রিকার্ডোর বিখ্যাত আপেক্ষিক সুবিধার তত্ত্ব— যা সমস্ত বিশুদ্ধ বাণিজ্যতত্ত্বের ভিত্তি (হেক্সচার-ওহলিন-স্যামুয়েলসন-এর তত্ত্ব সহ) মূলত দু'টি সার্বভৌম দেশের মধ্যে স্বাধীন বাণিজ্যের সম্ভাবনার কথা অনুমান করেই গড়ে উঠেছে। রিকার্ডোর তত্ত্ব হচ্ছে দু'টি দেশ ও দু'টি পণ্যের একটি তাত্ত্বিক মডেল (স্মরণ করা যেতে পারে যে রিকার্ডো পর্তুগাল ও ইংল্যান্ড এই দু'টি দেশ এবং বস্ত্র ও মদ এই দু'টি পণ্যের দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন)। রিকার্ডো দেখালেন যে উভয় দ্রব্যের ইউনিট পিছু উৎপাদন খরচ কোনও একটি দেশে অন্য দেশের তুলনায় কম হলেও, যে দ্রব্যটি আপেক্ষিকভাবে কম খরচে উৎপাদন করা সম্ভব ঐ দেশ

কেবলমাত্র সেই দ্রব্যটিই উৎপাদন করবে এবং বাণিজ্যের মাধ্যমে ঐ দ্রব্যটির কিছু অংশের বিনিময়ে অন্য দেশ থেকে দ্বিতীয় দ্রব্যটি আমদানী করবে। এবং তা করা সে দেশের পক্ষে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হবে। একইভাবে দ্বিতীয় দেশটি কেবলমাত্র দ্বিতীয় দ্রব্য— যার উৎপাদনে তার আপেক্ষিক সুবিধা বেশি, উৎপাদন করবে এবং বাণিজ্যের মাধ্যমে লাভবান হবে। দু'টি দেশে দু'টি পৃথক দ্রব্য উৎপাদনের বিশেষায়ন ঘটবে এবং সামগ্রিকভাবে দু'টি দ্রব্যের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং বাণিজ্য শুরু হওয়ার আগের অবস্থার তুলনায় বাণিজ্য পরবর্তী অবস্থায় দু'টি দেশেই দু'টি দ্রব্য কম খরচে ও বেশি পরিমাণে পাওয়া সম্ভব হবে। এতে দুই দেশেরই উৎপাদন ও ভোগের বৃদ্ধি ঘটবে এবং অধিকতর কল্যাণ হবে। রিকার্ডোর মডেলের অনুমান ঠিক ধরে নিলে, তাঁর যুক্তির মধ্যে কোনও ত্রুটি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

উপনিবেশ ও প্রভুত্বকারী দেশের মধ্যে বাণিজ্যকেও পারস্পরিক দিক থেকে লাভজনক হিসেবে দেখার যুক্তি রিকার্ডোর তত্ত্ব থেকে পাওয়া যায়। সবাই জানেন যে উত্তর গোলার্ধের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির তুলনায় গ্রীষ্মপ্রধান উপনিশেগুলিতে শ্রমের ব্যয় অনেক কম এবং প্রায় সব দ্রব্যই সেখানে অনেক সস্তায় উৎপাদন করা সম্ভব। রিকার্ডোর মতে, বাণিজ্য লাভজনক হতে গেলে চূড়ান্ত সুবিধার চেয়ে আপেক্ষিক সুবিধার গুরুত্বই বেশি এবং উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি কিছু দ্রব্য উৎপাদনে অবশ্যই আপেক্ষিক সুবিধা ভোগ করে (যেমন যন্ত্রচালিত বস্ত্র উৎপাদনে)। সুতরাং গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের উপনিবেশগুলি কৃষি পণ্য উৎপাদনে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করে তার বিনিময়ে যদি উন্নত দেশ থেকে যন্ত্র উৎপাদিত সামগ্রী আমদানী করে তাহলে এই বাণিজ্য থেকে তারা লাভবান হবে। কিছু লোক রিকার্ডোর এই তত্ত্বের নানারকম সমালোচনা করেছেন— যেমন, 'আপেক্ষিক সুবিধা'র ধারণাটা সময়ের সাথে গতিশীল নয়, অথবা 'আপেক্ষিক সুবিধা'র ধরন সময়ের সাথে সাথে বদলেও যেতে পারে ইত্যাদি। কিন্তু এই যুক্তি ও সমালোচনা ঔপনিবেশিক বাণিজ্য যে উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদী দেশ উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকর, এই বিশ্বাস থেকে টলানোর পক্ষে যথেষ্ট জোরালো ছিল না। রিকার্ডো এই যুক্তির উপর ভিত্তি করেই তাঁর তত্ত্বকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি পূর্ণাঙ্গ সাধারণ তত্ত্ব হিসাবে উপস্থিত করেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে রিকার্ডোর আপেক্ষিক সুবিধার তত্ত্ব যা বাণিজ্যের এক সাধারণ তত্ত্ব হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে এবং পাঠ্যপুস্তকেও সেভাবে উপস্থিত করা হয়ে থাকে, যুক্তির দিক থেকে বেঠিক ও ত্রুটিপূর্ণ। রিকার্ডোর অনুমান থেকেই এই ত্রুটির উদ্ভব। দু'টি দেশ যখন বাণিজ্য শুরু হওয়ার আগে দু'টি দ্রব্যই উৎপাদন করে এবং যখন দুটি দেশের উৎপাদন-সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে আলাদা তখন দেখা যায় একটি দেশের পক্ষে আমদানীর মাধ্যমে বিকল্প দ্রব্য পাওয়া সম্ভব নয়। এ ঘটনা উন্নত দেশগুলির সাথে গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের উপনিবেশগুলির প্রাথমিক কৃষি পণ্যের লেনদেনের ক্ষেত্রে সব সময়ই ঘটতে দেখা যায় (যদিও শুধু ঔপনিবেশিক বাণিজ্যই নয়, গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের কোনও স্বাধীন সার্বভৌম দেশের সাথে বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও সমানভাবে একথা সত্য)। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের উপনিবেশের কৃষিপণ্যের কাঠামোর বৈশিষ্ট্য এমনই ভিন্ন ধরনের যে কোনও দেশের সঙ্গেই যার তুলনা চলে না। যেমন আখ, তুলো, কফি, পাট ইত্যাদি দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষমতা। শীতপ্রধান বা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের উন্নত দেশগুলির জলবায়ু ও জমিতে এসব পণ্য উৎপাদন করার ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং আপেক্ষিক সুবিধা বা উৎপাদন ব্যয় কোনও এক দেশের প্রেক্ষিতে হিসাব করা সম্ভব, কিন্তু অন্য একটি দেশের এই সব দ্রব্য উৎপাদনে সুবিধার আপেক্ষিকতার সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। যেমন ধরা যাক ব্রিটেনের সাথে ভারত অথবা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বাণিজের কথা। ভারত বা পশ্চিমভারতীয় দ্বীপগুলির

সুতীবস্ত্র এবং কাঁচা তুলো (অথবা আখ, কফি বা সেগুন কাঠ ইত্যাদি দ্রব্য উৎপাদনে) উভয় দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষমতা আছে। সুতরাং এই দুই দেশের ক্ষেত্রেই সুতীবস্ত্র ও কাঁচা তুলো (অথবা আখ, কফি ইত্যাদি যে কোনও গ্রীষ্মপ্রধান ফসল) উৎপাদন ব্যয়ের অনুপাত নির্ধারণ করা সম্ভব বা এই দু'ধরনের দ্রব্য উৎপাদনের সম্ভাবনা-রেখার সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব। কিন্তু ব্রিটেনের পক্ষে এই দু'টি দ্রব্যের মধ্যে একটিই কেবল উৎপাদন করা সম্ভব— প্রাকৃতিক কারণে অন্যটির উৎপাদন সম্ভাবনা সে দেশের নাই (অথবা আখ, কফি, সেগুনকাঠ ইত্যাদি যে কোনও গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ফসলের উৎপাদন সে দেশে অসম্ভব)। সুতরাং ব্রিটেনে এই দু'টি দ্রব্য উৎপাদন ব্যয়ের অনুপাত অথবা আপেক্ষিক সুবিধা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

যদি কোনও দ্রব্য উৎপাদন করতেই না পারা যায়, তাহলে আপেক্ষিক ব্যয় দূরের কথা, সে দেশে ঐ দ্রব্য উৎপাদনের ব্যয় কত তা নির্ণয় করার প্রশ্নই ওঠে না। এতৎসত্ত্বেও, এই ধরনের ত্রুটিপূর্ণ যুক্তির বশবর্তী হয়ে অর্থনীতিবিদ ও ঐতিহাসিকরা এরকম একটি অর্থহীন প্রতিপাদ্য উপস্থিত করে থাকেন যে : 'ব্রিটেন ভারত অথবা পশ্চিমী দ্বীপপুঞ্জ থেকে চা (অথবা আফিম, অথবা আখজাত চিনি, অথবা পাট বা সেগুন কাঠ ইত্যাদি) আমদানী করত এবং সুতীবস্ত্র রপ্তানী করত, কারণ সুতীবস্ত্র উৎপাদনে ব্রিটেনের আপেক্ষিক সুবিধা ছিল এবং প্রাথমিক কৃষিপণ্য উৎপাদনে আপেক্ষিক সুবিধা ছিল উপনিবেশগুলির।" এই যে অনুমান অর্থাৎ গ্রীষ্মমণ্ডলীয় কৃষিপণ্য উৎপাদনে ব্রিটেনের সক্ষমতা ছিল, তা বাস্তবের নিরিখে ছিল একেবারেই ভ্রান্ত।

ব্রিটেন ও পর্তুগালে সুতীবস্ত্র ও মদ উৎপাদনের যে দৃষ্টান্ত রিকার্ডো নিজেই উপস্থিত করেছিলেন, সে ক্ষেত্রের তাঁর অনুমান ছিল ভ্রান্ত। কারণ দ্রাক্ষাজাত মদ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ব্রিটেনের মাটিতে উৎপাদন হতো না। আপেক্ষিক সুবিধার পার্থক্য থেকেই দু'টি দেশে দু'টি পৃথক দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষায়ন ঘটে। কিন্তু যেখানে এই অনুমান একেবারেই ভ্রান্ত এবং ব্যয়ের অনুপাতও নির্ণয় করা সম্ভব নয় সেখানে বাণিজ্য থেকে সুবিধা লাভের সিদ্ধান্তও ভ্রান্ত হতে বাধ্য। সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে উৎপাদনের বিশেষায়ণ ও তদনুযায়ী দ্রব্যের লেনদেন অবশ্যই শুরু হয়েছিল কিন্তু তা রিকার্ডো কল্পিত পারস্পরিক সুবিধার কারণে ঘটেনি। এই ধরনের বিশেষায়ণ ও বাণিজ্যিক বিনিময়ের পিছনে যা কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল, তা হল সামরিক ক্ষমতার প্রয়োগ এবং পরবর্তীকালে উপনিবেশের অধিবাসীদের উপর বিপুল পরিমাণ খাজনা ও ট্যাক্সের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে অর্থনৈতি স্বাধীনতা হরণ। পর্তুগালের মত সার্বভৌম অথচ দুর্বল দেশের উপর নৌ-শক্তির আধিপত্য বিস্তার করে এ জাতীয় বাণিজ্য শুরু করা হয়েছিল। পল স্যামুয়েলসন (১৯৭০) রিকার্ডোর মডেল নিয়ে আলোচনা করার সময় এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা এড়িয়ে গেলেও পরোক্ষে এর স্বীকৃতি দিয়েছেন যখন তিনি তাঁর মডেলে দু'টি দ্রব্যের দৃষ্টান্তে নিঃশব্দে 'মদে'র পরিবর্তে 'খাদ্য'কে স্থান দিয়েছেন— যদিও রিকার্ডোর দৃষ্টান্ত কেন বদলে দিলেন তার ব্যাখ্যা করেননি।

ঔপনিবেশিক বাণিজ্য থেকে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি যে প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হয়েছিল এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ এর ফলে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অধিবাসীদের পক্ষে নিজেদের উৎপাদন ক্ষমতার উপর নির্ভর করে যতটা ভোগ্য পণ্য, কাঁচামাল এবং শক্তির উৎস ভোগ করা সম্ভব ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ দ্রব্য সম্ভার তারা এ ধরনের বাণিজ্যের সূত্রে লাভ করেছিল। এটা দু'ভাবে সম্ভব হয়েছিল। প্রথমত, উন্নত দেশগুলি সরাসরি প্রত্যক্ষভাবে এই সব পণ্য আমদানীর মাধ্যমে সংগ্রহ করত। দ্বিতীয়ত, উন্নত দেশগুলি পুনরায় রপ্তানীর মাধ্যমেও এই পণ্যসম্ভার আহরণ করত। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলির পক্ষে তাদের দেশীয় পণ্যের স্বাভাবিক রপ্তানীর বিনিময়ে যতটা

শস্য, পশুর মাংস, কাঁচামাল ও অন্যান্য সামগ্রী পাওয়া সম্ভব ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী তারা এই সব উপনিবেশ থেকে আহরণ করে নিয়ে যেত (সারণি ১ দ্রষ্টব্য)। উপনিবেশগুলির পক্ষে এ জাতীয় বাণিজ্য কল্যাণকর হওয়া দূরের কথা, এই ধরনের বাণিজ্য উপনিবেশগুলির সমূহ ক্ষতি করেছে। ভারত, শ্রীলঙ্কা, কোরিয়া বা জাভা দ্বীপের অধিবাসীদের পক্ষে ক্রমবর্ধমান হারে বাণিজ্যিক ফসলগুলি উৎপাদন করে প্রভুত্বকারী দেশগুলিতে রপ্তানী করার পিছনে কোনও অর্থনৈতিক যুক্তি ছিল না। কারণ একে এই দেশগুলিতে ছিল চাষযোগ্য জমির সীমাবদ্ধতা, তার ওপর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ও প্রশাসন কৃষির উন্নতির জন্য যে বিনিয়োগ করতো তাও ছিল অকিঞ্চিৎকর। যার ফলে উপনিবেশের অধিবাসীদের জন্য খাদ্যশস্যের যোগানের পরিমাণ বৃদ্ধি তো পায়নি, বরং দীর্ঘকালব্যাপী যে সব দেশ বিদেশী শাসনের অধীনে ছিল সে সব দেশে খাদ্যের যোগান হ্রাস পেতে শুরু করেছিল। ভারতের ক্ষেত্রেও বিপুল সংখ্যক হস্তশিল্পে নিযুক্ত কারিগরদের কর্মচ্যুত করে সুতীবস্ত্র আমদানী করার কোন অর্থনৈতিক যৌক্তিকতা ছিল না। কারণ সুতীবস্ত্র ভারতীয় হস্তশিল্পেই যথেষ্ট পরিমাণ উৎপাদন করা সম্ভব হতো। প্রথম ঘটনাটি মাথাপিছু খাদ্যের যোগান ক্রমশ কমিয়ে দিয়েছিল এবং উপনিবেশের অধিবাসীদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের ক্ষতি করেছিল আর দ্বিতীয় ঘটনাটি ভারতের মতো দেশে অবশিল্পায়ন ঘটিয়ে মাথাপিছু উৎপাদন হ্রাস করে দিয়েছিল। প্রথম ঘটনাটি বিপুল পরিমাণ নগদ ট্যাক্স ও খাজনা চাপিয়ে দিয়ে ও অন্যান্য ঔপনিবেশিক নীতির ফলশ্রুতিতে কৃষির বাণিজ্যিকরণ ও কৃষি উৎপাদনকে রপ্তানীমুখী করে তুলেছিল। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটেছিল কারণ সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশগুলির বাজার উন্মুক্ত করে রাখলেও সাম্রাজ্যবাদী প্রভু দেশগুলির বাজার কঠোরভাবে সংরক্ষিত করে রেখে দেওয়া হয়েছিল প্রায় ১৫০ বছর ধরে। যেমনটি করা হয়েছিল এশীয় দেশগুলিতে উৎপাদিত বস্ত্রসামগ্রীর বেলায়— ব্রিটেনে যা রপ্তানী করতে দেওয়া হয়নি। দেড়শো বছর বড় দীর্ঘ সময়— যে সময় সংরক্ষণের আড়ালে থেকে একটি শিশু দৈত্যে পরিণত হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট দীর্ঘ।

ঔপনিবেশিক বাণিজ্য ও দুই সমকক্ষ সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যের দ্বিতীয় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হল : উপনিবেশ থেকে রপ্তানী করা পণ্যসামগ্রীর দাম সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি পরিশোধ করত উপনিবেশ থেকে আহৃত কর ও রাজস্ব থেকে— যেমন ভারতের ক্ষেত্রে হয়েছে। অথবা উপনিবেশ থেকে যা রপ্তানী হতো তা ছিল দাস-আমদানীর খাজনার সমতুল— যা হয়েছিল পশ্চিমভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। উভয় ক্ষেত্রেই সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি স্থানীয় অধিবাসীদের উপর প্রভুত্ব ও মালিকানার অধিকার প্রতিষ্ঠা করে, কর ও রাজস্ব আদায়ের সার্বভৌম অধিকার কায়েম করে এবং এর সাথে জমির উপর মালিকানা স্থাপন করে এই বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। যেমন, পশ্চিমভারতীয় দ্বীপগুলিতে দাসশ্রমিক নির্ভর বাগিচা চাষ অথবা ভারতে চুক্তিনির্ভর শ্রমিক নিয়োগ করে বাগিচা শিল্প চালানো অথবা আয়ারল্যান্ডে ব্রিটিশ— আইরিশ সামন্তপ্রভুদের আইরিশ চাষীদের কাছ থেকে খাজনা আদায়— এই সব ক্ষেত্রেই ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের পেছনে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের প্রভুত্ব বিস্তারের সাক্ষ্য ছড়িয়ে আছে। প্রকৃত উৎপাদক যারা এই সব রপ্তানী দ্রব্য উৎপাদন করত তারা আপাতদৃষ্টিতে তাদের উৎপাদিত সামগ্রীর জন্য দাম পেলেও বাস্তবত কোনও দাম পেত না। কারণ দ্রব্যসামগ্রী তৈরি করে বিনিময়ে যা তারা পেত তা আসলে সাম্রাজবাদী শাসকদের দেওয়া কর, রাজস্ব বা খাজনা। তার থেকেই শাসকরা উপনিবেশের উৎপাদকদের দাম মেটাতো (ভারতে যা হয়েছে)। অথবা খাজনার আকারে যে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত নিষ্কাশন করা হতো তাই পণ্যের আকারে উপনিবেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদী কেন্দ্রে রপ্তানী করা হতো (পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপগুলিতে দাস ব্যবসায়ের খাজনা এবং আয়ারল্যান্ডে

জমির খাজনা ও কর ছিল উদ্বৃত্ত নিষ্কাশনের মূল ধরন)। এই নিবন্ধে অ্যাডাম স্মিথ বা কার্ল মার্কস[৪] যে অর্থে 'খাজনা' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, সেই অর্থেই আমরা তা ব্যবহার করছি। অর্থাৎ খাজনা হচ্ছে ভূমি রাজস্ব যা সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা বা সাম্রাজ্যবাদী দেশের নাগরিকরা উপনিবেশে ভূমির উপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব কায়েম করার সুবাদে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত হিসাবে আদায় করে অথবা ভূমির মালিকানা স্থাপন করে ও উপনিবেশের মানুষদের দাসত্বের শৃঙ্খলে এনে অর্থনৈতিক উদ্বৃত্ত 'খাজনা' হিসেবে ভোগ করত। 'খাজনা' কথাটি আমরা এখানে রিকার্ডো বর্ণিত জমির উর্বরতাজনিত পার্থক্যগুলি 'খাজনা' অর্থে ব্যবহার করছি না। এখানে যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে তার সঙ্গে রিকার্ডোর 'খাজনা'র ধারণা সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

ঔপনিবেশিক ভারত থেকে সারা পৃথিবীতে যে পরিমাণ নীট রপ্তানী হয়েছে সেই সব রপ্তানী সামগ্রীর উৎপাদকদের (কৃষক ও হস্তশিল্প কারিগর) দাম দেওয়া হয়েছে তারা ঔপনিবেশিক শাসকদের যে খাজনা, কর ও রাজস্ব দিয়েছে তা থেকেই। অন্যান্য স্বাধীন দেশগুলিতে রপ্তানী করে যে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হতো, তা সাধারণত ভারতে আসতে দেওয়া হতো না। সেই সব দেশগুলির সাথে ব্রিটেনের বাণিজ্যের হিসেব-নিকেশ মেলাতেই ভারতের উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করা হতো। কোনও স্বাধীন সার্বভৌম দেশের আর্থিক ব্যবস্থার সাথে বৈদেশিক বাণিজ্যের এমনধারা সচেতন যোগসাজশ থাকে না। কেবলমাত্র উপনিবেশেই যেখানে সাম্রাজ্যবাদী দেশের অধীনে অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়, সেখানেই এরকম দেখা যায়।

কোনও সার্বভৌম রাষ্ট্রেই তার বাজেটের অন্তর্ভুক্ত কররাজস্বের একটা বড অংশ রপ্তানী সামগ্রী কেনার জন্য সরিয়ে রাখা হয় না বা সংগৃহীত কর রাজস্বের একটা অংশ দেশের মধ্যেই অভ্যন্তরীণ নানা ব্যয় মেটানোর জন্য না রেখে দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য বিবেচনা করা হয় না— ঔপনিবেশিক ভারতে যা করা হতো। দুই শতাব্দীর বেশিরভাগ সময় জুড়েই এই ব্যবস্থা ভারতে কায়েম ছিল— যার প্রতি ১৮৮০ সালেই দাদাভাই নওরোজি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন (নওরোজি, ১৯৬২) এবং আর. সি. দত্ত ১৯৬৫ সালে যার সমর্থনে তথ্য প্রমাণ উপস্থিত করেন (দত্ত, ১৯৭০)।

উপনিবেশ থেকে পৃথিবীর নানা দেশে যে রপ্তানী উদ্বৃত্ত পাঠানো হতো তার থেকে বাণিজ্য খাতে কিছু স্বাভাবিক খরচ-খরচা বাদ দিয়ে নীট উদ্বৃত্তকেই আমরা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে 'সম্পদের হস্তান্তর' বলে অভিহিত করতে চাইছি। এটা ঠিক স্বাভাবিক রপ্তানী উদ্বৃত্ত নয়— তার কারণ হল, উপনিবেশের সঙ্গে বাণিজ্যের ধরন, উপনিবেশ থেকে সংগৃহীত কর, রাজস্ব ও খাজনার মাধ্যমেই এই বাণিজ্য পুষ্ট হতো। এর অর্থ হল, প্রথমত, সাম্রাজ্যবাদী দেশ উপনিবেশ থেকে যত খুশি আমদানী করতে পারত, তার জন্য বৈদেশিক বাণিজ্য খাতে তার কোন দায় ছিল না, যদিও অন্য কোনও স্বাধীন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যের বেলায় এরকম দায়হীন আমদানীর কোনও সম্ভাবনা ছিল না। সেক্ষেত্রে ব্রিটেন রপ্তানীর চেয়ে যে অতিরিক্ত আমদানী করত তার দায় মেটাতে হতো সোনা রপ্তানী করে অথবা বিদেশী রাষ্ট্র থেকে ধার করে। কিন্তু ভারত থেকে যে অতিরিক্ত আমদানী ব্রিটেন করত, তার জন্য ভারতে সোনা পাঠানো বা অর্থ ধার করার প্রয়োজন হতো না কারণ ব্রিটেন ভারতের জনগণের উপর কর, খাজনা বা রাজস্ব চাপানোর অবাধ অধিকার ভোগ করত। যদি কোনও ভারতীয় কৃষক বা কারিগর ঔপনিবেশিক শাসকদের ১০০ টাকা কর হিসেবে দিয়ে থাকে এবং তাদের দেশে সুতী বস্ত্র/আফিম/পাট/বা কাঁচাতুলো রপ্তানীর দাম হিসেবে ৪০ টাকা পেয়ে থাকে তাহলে এই একই ঘটনাকে আমরা আর একভাবে দেখাতে পারি। উপনিবেশের কৃষক বা কারিগর যে ১০০ টাকা কর

[illegible] তাকে আমরা দুভাগে ভাগ করতে পারি— এক ভাগ, দেশের অভ্যন্তরে দ্রব্য উৎপাদন ও বিনিময় করে প্রাপ্ত অর্থ থেকে ঔপনিবেশিক শাসকদের ৬০ টাকা কর হিসেবে প্রদান এবং অন্য ভাগ উপনিবেশের কৃষক বা কারিগর ৪০ টাকা মূল্যের রপ্তানী দ্রব্য বিনি পয়সায় দান হিসেবে ঔপনিবেশিক শাসকদের কাছে হস্তান্তর। ধরা যাক রপ্তানী দ্রব্যের ২০ টাকা মূল্যের অংশ সরাসরি সাম্রাজ্যবাদী দেশটিতে যাচ্ছে এবং বাকী ২০ টাকা মূল্যের দ্রব্য যাচ্ছে অন্য দেশগুলিতে। সাম্রাজ্যবাদী দেশটিতে *উপনিবেশ থেকে কাঁচা তুলো, পাট, আফিম ইত্যাদি যে দ্রব্যই আমদানী করা হোক, তা হল একেবারে বিনি পয়সায় পাওয়া— এটা যেন উপনিবেশের কৃষক কারিগরদের দেওয়া ২০ টাকা মূল্যের সামগ্রীর আকারে দেওয়া খাজনা বা কর। এর ফলে ব্রিটেনকে ভারতে সোনা পাঠাতে হয় না বা ব্রিটেনের কাছে ভারতীয়দের সমমূল্যের কোনও দাবী তৈরি হয় না। এতে ব্রিটেনের কোনও বৈদেশিক দায় থাকে না।* আর বাকী ২০ টাকা মূল্যের যে রপ্তানী ভারত থেকে অন্য দেশে হয়েছে, তার থেকে যে বিদেশী মুদ্রার উপার্জন হল তা ভারতের প্রাপ্য। কিন্তু ব্রিটেন এই বিদেশী মুদ্রা ব্যবহার করেছে ঐ সব সংশ্লিষ্ট দেশের সঙ্গে তার বাণিজ্যিক ঘাটতির দায় মেটানোর জন্য। সুতরাং উপনিবেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদী দেশে যে নীট রপ্তানী হয়ে থাকে তা কখনই নীট রপ্তানী নয় যা স্বাভাবিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। এ হচ্ছে প্রকৃত পক্ষে সম্পদের হস্তান্তর।

দ্বিতীয়ত, সাম্রাজ্যবাদী দেশটির কাছে সরাসরি রপ্তানী উদ্বৃত্ত ছাড়াও অন্যান্য দেশগুলিতেও উপনিবেশ থেকে আমদানীর অতিরিক্ত রপ্তানী হতো এবং উপনিবেশগুলি রপ্তানী উদ্বৃত্ত ভোগ করত। (সাম্রাজ্যবাদী দেশের উৎপাদিত সামগ্রীর বিরাট বাজারে পর্যবসিত হওয়ার আগে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম দিকে এই রপ্তানী উদ্বৃত্তের অস্তিত্ব ছিল) এর ফলে উপনিবেশগুলির যে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন হতো তার পরিমাণ ছিল বেশ উল্লেখযোগ্য এবং ক্রমবর্ধমান। অথচ এইসব রপ্তানী পণ্য উৎপাদকদের দাম দেওয়া হতো টাকার মূল্যে, বিদেশী মুদ্রায় নয়। পৃথিবীব অন্যান্য দেশগুলিতে রপ্তানীর মাধ্যমে উপার্জিত বিদেশী মুদ্রা কখনই ভারতে বা ভারতীয় উৎপাদকদের কাছে আসতে দেওয়া হতো না। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন এই বিদেশী মুদ্রাব তহবিল হস্তগত করত এবং তা দিয়েই অন্যান্য দেশের সঙ্গে তার যে বিপুল বাণিজ্য ঘাটতি তা মেটাত। ব্রিটেনেব অধিবাসীদের আমদানী করার প্রবণতা এতই বেশি ছিল যে ব্রিটেনের প্রায় সব দেশের সঙ্গেই বাণিজ্য ঘাটতি থাকত। ভারতের উপার্জিত বিদেশী মুদ্রা হস্তগত ও ব্যবহার করার পদ্ধতিটিও ছিল বেশ সরল। যতদিন কোম্পানির হাতে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার ছিল, ততদিন তাবা উপনিবেশ থেকে আমদানী কবা সামগ্রী সরাসরি পুনরায় রপ্তানী করত। সাধারণভাবে ব্রিটেনে উপনিবেশগুলি থেকে যে পণ্যসম্ভার আমদানী হতো, তার এক-তৃতীয়াংশ পুনরায় রপ্তানী করা হতো এবং এই পুনঃ-রপ্তানীর পাঁচ ভাগের চার ভাগ যেত ইউরোপের দেশগুলিতে। সুতরাং এই সব দেশ থেকে ব্রিটেন যে সব পণ্যসামগ্রী আমদানী করত তার দাম মেটানোর জন্য প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা ব্রিটেনের কাছে সহজলভ্যই ছিল।

বৈদেশিক বাণিজ্যে কোম্পানির একচেটিয়া কর্তৃত্ব শেষ হয়ে গেলে, এক ভিন্ন ধরনের লেনদেন ব্যবস্থা গড়ে উঠল— যার মাধ্যমে উপনিবেশের রপ্তানীকারকদের রপ্তানীপণ্যের দাম মেটানো হল সেই উপনিবেশ থেকে প্রাপ্ত কর-রাজস্ব-খাজনা থেকেই। তবে এক্ষেত্রে বিদেশের যারা ভারত থেকে পণ্য আমদানী করছে তারা স্টারলিং বা যে কোনও বিদেশী মুদ্রায় বিল অফ এক্সচেঞ্জ ভাঙিয়ে নিয়ে ভারতীয় রপ্তানীকারকদের টাকার মূল্যে দাম মেটানোর ব্যবস্থা করত। ১৮৬১ সাল নাগাদ এই ব্যবস্থা পাকাপোক্তভাবে চালু হল। বিদেশে যারা ভারতীয় পণ্য আমদানী করত তাদের এক্সচেঞ্জ ব্যাঙ্কের মাধ্যমে লন্ডনস্থিত সেক্রেটারী অফ স্টেট, ইন্ডিয়ার নামে অর্থ জমা দিতে হতো— যার প্রেক্ষিতে বিল

ছাড়া হতো, যেগুলি ভারতে টাকায় ভাঙিয়ে নেওয়া যেত। ভারত থেকে আমদানী করা সামগ্রীর দাম মেটানোর উদ্দেশে লন্ডনে বিভিন্ন দেশ থেকে স্টারলিং, মার্কিন ডলার, ফ্রাঁ এবং অন্য ইউরোপীয় মুদ্রা জমা হতে লাগল এবং এগুলির বিনিময়ে টাকায় প্রদেয় বিল ছাড়া হতে লাগল। বিদেশের আমদানীকারীরা এই টাকার বিলগুলি ভাঙানোর জন্য ডাক ও তার বিভাগ মারফৎ ভারতের রপ্তানীকারকদের কাছে পাঠাতে শুরু করল এবং ভারতের বাজেটে এই বাবদ টাকা বরাদ্দই থাকত, সেখান থেকে এই সব বিল জমা পড়লে রপ্তানীকারকদের হাতে টাকা পৌঁছে যেত। বলা বাহুল্য এই টাকা ভারতে সংগৃহীত কর-রাজস্বেরই অংশ। বাজেটে সরকারের যে আয় হতো তার প্রায় ২৫ থেকে ২৭ শতাংশ এই উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করা থাকত এবং ভারত থেকে যে নীট রপ্তানী হতো তার মূল্য টাকায় এভাবে প্রদান করে ভারত থেকে ২৮ থেকে ৩২ মিলিয়ন পাউন্ড অর্থ হস্তান্তর করা হতো ব্রিটেনে। ১৯২০ সালের পর মহামন্দার বছরগুলিতেও রপ্তানী পণ্যেব মূল্য ক্রমশ কমে যাওয়া সত্ত্বেও এরকম বিপুল পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা হস্তান্তবিত হয়েছে। পট্টনায়কের লেখায় (১৯৯৯) এর একটি চিত্ররূপ পাওয়া যাবে।

উপনিবেশের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা সম্পূর্ণভাবে যে আত্মসাৎ করা হতো তার জন্য একটা যুক্তিসম্মত হিসাব ব্যবস্থা বা পদ্ধতির প্রয়োজন ছিল। এই হিসাব ব্যবস্থা বা পদ্ধতি হল এরকম : ভারত ব্রিটেনকে কিছু চার্জ বা কর দেবে যা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে নির্ধারিত হবে এবং এর মাধ্যমেই ভারত চলতি খাতে পণ্য রপ্তানীর মধ্য দিয়ে নীট যে বিদেশী মুদ্রা উপার্জন করেছে তা ব্রিটেন নিজের স্বার্থে তার নিজের দেশে স্থানান্তরিত করবে। এই চার্জ বা খরচ দেখানো হতো কিছু অদৃশ্য খাতে— অর্থাৎ দ্রব্য লেনদেন খাতে নয় এবং তার পরিমাণ নির্ধারিত হতো ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের মর্জি অনুযায়ী। কোনও ব্যক্তি, ফার্ম বা কর্পোরেট সংস্থার অর্থনৈতিক কাজকর্মের প্রক্রিয়ায় ব্রিটেনকে দেয় এই চার্জের পরিমাণ স্থির হতো না। ঔপনিবেশিক সরকার এটা ইচ্ছামত স্থির করার ফলে, খুব সহজেই এর হেরফের ঘটানো যেত। এবং হেরফের এতটাই ঘটানো হতো যাতে এই চার্জ বা দেয় অর্থের পরিমাণ ভারতের উপার্জিত বিদেশী মুদ্রার সমান হয় এবং ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের চলতি খাতে উদ্বৃত্তজনিত উপার্জিত বিদেশী মুদ্রাব সবটাই ব্রিটেন হস্তগত করতে সক্ষম হয়।[৫]

ভারতের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে রাজনৈতিকভাবে নির্ধারিত দেয় চার্জ বা করের পরিমাণ ভারতের রপ্তানী উদ্বৃত্তের পরিমাণের সাথে সমান তালে ওঠানামা করেছে। ফলে উপনিবেশের রপ্তানীজনিত আয় যখনই বৃদ্ধি পেয়েছে (যেমন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় হয়েছিল) ব্রিটেনকে দেয় চার্জের পরিমাণও অনতিবিলম্বে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে 'স্পেশ্যাল' বা বিশেষ চার্জ হিসেবে, যাতে করে অতিরিক্ত বিদেশী মুদ্রার উপার্জনও তারা আত্মসাৎ করতে পারে। এরকমই দেখা গেল যে যুদ্ধের সময়ে ভারত যে অতিরিক্ত বিদেশী মুদ্রা উপার্জন করেছিল, সে সময় ১০০ মিলিয়ন পাউন্ড স্টারলিং-এর এক বিস্ময়কর ও বিপুল পরিমাণ চার্জ চাপানো হয়েছিল ভারতের উপর। এটা ছিল স্বাভাবিক সময়ে যে সম্পদ হস্তান্তরিত হতো তার চেয়ে অতিরিক্ত (যুদ্ধ পূর্ববর্তীকালে চার বছরেরও বেশি সময়ে যে 'হোমচার্জ' ভারতের কাছ থেকে ব্রিটেন আদায় করেছিল, তার সমান— বাগচী, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৫২২)। কিন্তু এর বিপরীতটা সব সময় ঘটেনি। যদি কোনও বছর মন্দা বা অন্য কোনও কারণে ভারতের রপ্তানীর পরিমাণ কম হতো, তাহলেও এই চার্জের পরিমাণ কমানো হতো না। এক্ষেত্রে ব্রিটেনকে প্রদেয় চার্জ বা করের পরিমাণ এবং ভারতের উপার্জিত বিদেশী মুদ্রার পরিমাণ— এ দুয়ের মধ্যে যে ফাঁক থাকত তা পূরণ হতো উপনিবেশ অর্থাৎ ভারতকে বাধ্যতামূলকভাবে দেওয়া ঋণের মাধ্যমে যার সুদের বোঝা চাপত ভবিষ্যৎ প্রজন্মের উপর। উপনিবেশের মুদ্রা ব্যবস্থার সহায়তায় যে পরিমাণ সোনা মজুত

হিসেবে রাখতে হয়েছিল এবং যে সোনার ভাণ্ডার উপনিবেশ থেকে আহৃত সম্পদ থেকেই গড়ে তোলা হয়েছে— তার বেশীরভাগটাই লন্ডনে বাধ্যতামূলকভাবে মজুত করে রাখা হতো এবং ব্রিটেনের প্রয়োজনে যেমন খুশি ব্যবহার করা যেত।

এরকম একটি হিসাব পদ্ধতি যে শুধু ভারতের ক্ষেত্রে করা হয়েছিল তাই নয়, অন্য সমস্ত উপনিবেশের বেলাতেও— যে সব জায়গায় উৎপাদকরা ঠিক দাস ছিল না, তবে তাদের কাছ থেকে কর, খাজনা আদায় করা হতো— এরকমই ব্যবস্থা চালু ছিল (যেমন নেদারল্যান্ডের অধীনস্থ জাভায়, জাপানের উপনিবেশ শ্রীলঙ্কা, মালয় ও বর্মায়)। উপনিবেশগুলি ক্রমবর্ধমান রপ্তানী উদ্বৃত্ত ভোগ করত (ভারত প্রায় ১৮০ বছর ধরে যা ভোগ করছিল) এবং সেই সঙ্গে চলতি বাণিজ্য খাতে কিছুটা কম হলেও ভাল রকমের উদ্বৃত্ত থাকত। কিন্তু শেষপর্যন্ত রাজনৈতিকভাবে নির্ধারিত নানা জাতের চার্জ ধার্য করার ফলে উপনিবেশের হাতে আর কোনও উদ্বৃত্তই থাকত না। রপ্তানী উদ্বৃত্ত যত উঁচু মাত্রাতেই উঠুক না কেন (১৯১৩-১৪ সালে ভারত ছিল পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানীজাত আয়ের অধিকারী— পরিমাণ প্রায় ৭১ মিলিয়ন পাউন্ড), অদৃশ্য নানা খাতে এত বিপুল পরিমাণ কর বা চার্জ ধার্য করা হতো যাতে উপার্জিত বিদেশী মুদ্রার সবটাই, এমনকী সম্ভব হলে তার চেয়েও বেশি অর্থ উপনিবেশ থেকে হস্তান্তর করা যায়। এতে রপ্তানীর উদ্বৃত্ত ভোগকারী দেশের চলতি খাতে ঘাটতিও দেখা যেত। এই অবস্থার সামাল দিতে উপনিবেশ দেশগুলিকে বিদেশ থেকে ঋণও করতে বাধ্য হতে হতো।[৬]

ঔপনিবেশিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের এই ধরন এমন এক পরিস্থিতি তৈরি করেছিল যেখানে পরাধীন উপনিবেশগুলি রপ্তানী উদ্বৃত্ত ভোগ করলেও মূলধন ঋণ করতে বাধ্য হয়েছিল। অন্যদিকে উন্নত সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি যাদের বাণিজ্য খাতে ঘাটতি ছিল, তারা হয়ে গেল মূলধন রপ্তানীকারী দেশ।

প্রতিটি দেশের অঞ্চল ও পণ্যভিত্তিক পরিসংখ্যান প্রাথমিক উৎস থেকে সংগ্রহ করে তার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা কয়েক প্রজন্মের বিদ্যাচর্চার কাজ। সে কারণেই এ কাজে আমাদের নির্ভর করতে হবে যে অনুসন্ধান ও চর্চা এ পর্যন্ত হয়েছে তার ওপর। ব্রিটেন ও তার সাম্রাজ্যবাদী শাসনের পর্বে আঞ্চলিক বাণিজ্যের ধরন ও চলতি খাতের উদ্বৃত্ত নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এমন একটি মূল্যবান পুস্তকের কথা বলা যায়— এম. বি. সয়ল্-এর 'স্টাডিজ্ ইন ব্রিটিশ ওভারসীজ ট্রেড'। এই আলোচনায় আমরা বাণিজ্য সম্পর্কে দীর্ঘকালীন চলমান রাশি না পেলেও দু'টি সময়কালের কিছু স্থিরচিত্র পাই। তা হল ১৮৮০ এবং ১৯১০ সাল সম্পর্কে। ব্রিটেন সমস্ত উপনিবেশেরই বিদেশী মুদ্রা নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এ ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে পরিমাণের দিক থেকে, দেশ হল ভারত। ১৮৮০ সালে আমেরিকা ও ইউরোপের অন্যান্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্যে ব্রিটেনের ঘাটতি ছিল ৭০ মিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশি— যা ছিল ব্রিটেনের তৎকালীন জাতীয় উৎপাদনের ৫ শতাংশ মতো। এই সময়েই ভারতের উপর রাজনৈতিকভাবে চাপিয়ে দেওয়া চার্জের বাবদে ব্রিটেনের প্রাপ্য ছিল ২৫ মিলিয়ন পাউন্ড। "অবস্থাটা এমন ছিল যে ইউরোপ ও আমেরিকার সঙ্গে ব্রিটেনের বাণিজ্য ঘাটতির এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি ভারতের মাধ্যমে মেটানো হয়েছিল (সয়ল্, ৫৬)। ১৯১০ সাল নাগাদ ইউরোপ, আমেরিকা ও কানাডার সাথে ব্রিটেনের সামগ্রিক বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১২০ মিলিয়ন পাউন্ড এবং অন্যান্য দেশের সঙ্গে যে ঘাটতি হয়েছিল তা মিলিত করলে ব্রিটেনের ঘাটতি ছিল ১৪৫ মিলিয়ন পাউন্ড। এই সময় ইংল্যান্ড ও অন্যান্য দেশে ভারতের রপ্তানীর পরিমাণ ছিল ৬০ মিলিয়ন পাউন্ড— যার সম্পূর্ণ অংশই হিসাবের দৌলতে ভারতের কাছে ইংল্যান্ডের প্রাপ্য দেখানো হয়েছিল (সয়ল, সারণি XX, পৃষ্ঠা ৫৮)।

সয়ল-এর বর্ণনায় "ব্রিটেনের বৈদেশিক লেনদেনের কেন্দ্রে ছিল ভারত, কারণ ব্রিটেনের মোট বাণিজ্য ঘাটতির পাঁচ ভাগের দু'ভাগ মেটানোর রসদ জোটাত ভারত (ঐ, ৬২)। ব্রিটেনের সর্ববৃহৎ এবং সবচেয়ে লাভজনক উপনিবেশ হিসেবে ভারত ১৯১৩-১৪ সালে তার রপ্তানী থেকে ৭১ মিলিয়ন পাউন্ড আয় করেছিল। সে সময় আমেরিকার পরেই দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানীকারী দেশের জায়গাটি ছিল ভারতের। হিসাবের বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে দেখানো হল ব্রিটেনের ভারতের সাথে বাণিজ্যের সুবাদে উদ্বৃত্ত হয়েছিল ১৯ মিলিয়ন পাউন্ড এবং এর সাথে অন্যান্য রাজনৈতিকভাবে নির্ধারিত চার্জের পরিমাণ ছিল অনেক বেশি।

অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্যের ফলে ব্রিটেনের চলতি খাতে যে ঘাটতি হয়েছিল, তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণ অর্থ ও সম্পদ উপনিবেশ থেকে চালান করা হয়েছে। "কিন্তু এটাই যথেষ্ট ছিল না— কারণ ভারতের সাথে বাণিজ্যের সূত্রেই ব্রিটেনের লেনদেন উদ্বৃত্তের ক্ষেত্রে এমন এক নমনীয়তা এসেছিল যা একটি বৃহৎ পুঁজি রপ্তানীকারী দেশের পক্ষে খুবই জরুরী ছিল (সয়ল, ৬২)।" এই ঘটনাকে একটু অন্যভাবে উপস্থিত করা যেতে পারে। ইউরোপীয় মহাদেশ ও আমেরিকার সাথে চলতি খাতে ঘাটতি সৃষ্টি করে ব্রিটেন এইসব নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের উন্নয়নশীল দেশগুলির চাহিদা উজ্জীবিত করে রাখতে পেরেছিল। পরবর্তীকালে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যভুক্ত অন্যান্য দেশগুলির— যেমন, আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া বা কানাডার— ক্ষেত্রেও এরকমভাবে চাহিদার স্তর উঁচু হারে বজায় রাখতে পেরেছিল। উপনিবেশগুলির উপার্জিত বিপুল পরিমাণ বিদেশী মুদ্রার তহবিল হস্তগত করতে না পারলে ব্রিটেনের পক্ষে এই সব অঞ্চলে পুঁজি বা মূলধন রপ্তানী করা অসম্ভব হতো। বস্তুত উপনিবেশগুলির রপ্তানীর কাজটির সমাধা হয়েছিল। সম্পদের এই হস্তান্তর না হলে চলতি খাতে ঘাটতি থাকা অবস্থায় ইওরোপে, উত্তর আমেরিকা ও ইওরোপীয় সাম্রাজ্যভুক্ত দেশগুলর উন্নয়নের উদ্দেশ্যে মূলধন রপ্তানীর প্রয়াস ব্রিটেনের লেনদেন উদ্বৃত্তের উপর ভয়ংকর চাপ সৃষ্টি করত। এই সব অঞ্চলে আরও পুঁজি রপ্তানীর অর্থই হলো ব্রিটেনের চলতি খাতে আরও ঘাটতির সৃষ্টি হওয়া— এর ফলে ব্রিটেন সোনা রপ্তানী করতে বাধ্য হতো, স্বর্ণমুদ্রামান থেকে অনিবার্য বিদায় নিতে হতো এবং ১৯৩১ এর কয়েক দশক আগেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার পতন ঘনিয়ে আসত।

৩

ঔপনিবেশিক শাসকদের সম্পত্তির অধিকার ও সম্পদ হস্তান্তরের সম্পর্ক

এই নিবন্ধে আমাদের আগ্রহ যে শুধুমাত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ ও বিংশশতাব্দীর ঘটনাবলীর মধ্যেই সীমিত থাকবে তা নয় — যদিও ঐ সময়ের ঘটনাবলী অনেক বেশি সুগ্রথিত শিল্প-বিপ্লবের প্রথম যুগ অর্থাৎ ১৭৭০ থেকে ১৮২০ এই পর্বের দিকেও আমরা নজর রাখব। এই সময়কালের সূচনা হচ্ছে যখন ব্রিটেন বঙ্গ প্রদেশে খাজনা ও রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করে এবং সমাপ্তি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকারের অবসানের পর। এই পর্বের শুরুতে দেখি ভারত হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সুতীবস্ত্রের সর্ববৃহৎ উৎপাদক ও রপ্তানীকারী দেশ। ১৭০০ এবং ১৭২১ সালের আইনের বলে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপর ভারত থেকে এই সব সুতীবস্ত্র আমদানী করে ব্রিটেনে তা বিক্রী করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ফলে এগুলি ইউরোপের অন্য দেশগুলিতে পুনঃরপ্তানী করে তার বিনিময়ে নৌবাহিনীর প্রয়োজনীয় অতি গুরুত্বপূর্ণ জিনিষপত্র, খাদ্যশস্য এবং লোহা কেনা হতো। কিন্তু উক্ত সময়কালের শেষে ভারতের বাণিজ্যের ধরন একেবারে বিপরীতমুখী হয়ে গেল— ভারত থেকে আমদানী করা কাঁচা তুলো ও রং করার সামগ্রীর উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভরশীল ব্রিটেনের নবজাগ্রত ফ্যাক্টরী ব্যবস্থায় উৎপাদিত যন্ত্রচালিত সুতীবস্ত্র বিপুল পরিমাণে ভারতে আসতে থাকল। এই প্রক্রিয়ায় ঔপনিবেশিক সম্পদের হস্তান্তরের কোনও ভূমিকা ছিল কী এবং থাকালে তা কী ধরণের?

উপনিবেশের সঙ্গে বাণিজ্য অবাধ প্রতিযোগিতামূলক ছিল না বরং তা ছিল নির্দিষ্ট বাণিজ্যিক সংস্থার একচেটিয়া অধিকার ভুক্ত। এই কোম্পানি উপনিবেশ থেকে যে দ্রব্য ব্রিটেনে আমদানী করে আনত এবং পুনরায় অন্যত্র রপ্তানী করত। সুতরাং জাহাজের পরিবহন খরচ ও আমদানী পণ্যের বীমা চার্জ বাদ দিয়ে ব্রিটেনের নীট আমদানী উদ্বৃত্তকে আমরা এই পর্বের ঔপনিবেশিক অঞ্চল থেকে সম্পদের হস্তান্তরের একটি পরিমাপ বলে মনে করতে পারি। যদিও পরের আলোচনায় দেখা যাবে যে এই পরিমাপও প্রকৃত হস্তান্তর থেকে অনেক কম। যখন কোম্পানির একচেটিয়া কারবারের দিন শেষ হলো এবং ফলে উপনিবেশ থেকে পৃথিবীর যে কোনও দেশে সরাসরি বিভিন্ন রপ্তানী পণ্য পাঠানো শুরু হলো তখন কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী কেন্দ্রের আমদানী উদ্বৃত্ত দিয়ে ঔপনিবেশিক হস্তান্তরের মোটামুটি পরিমাপ করাও সম্ভবপর নয়। যেমন দেখা যায় যে ১৮২০ সালের পর থেকে ভারত থেকে ব্রিটেনে আমদানী উদ্বৃত্তের পরিমাণ স্বাভাবিক ভাবেই হ্রাস পেতে শুরু করল। এর পেছনে ভারতের বাধ্যতামূলকভাবে খোলা বাজারের বিশেষ ভূমিকা ছিল কারণ তখন ভারতের বাজারে ম্যাঞ্চেষ্টার থেকে সুতো ও সুতীবস্ত্রের বিপুল সম্ভার রপ্তানী করা হচ্ছিল। অথচ একই সময়ে ঔপনিবেশিক ভারত থেকে ট্যাক্স ও খাজনা আদায়ের পরিমাণ বেড়ে চলছিল (বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রদেশে ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থা ১৮১৫-র মধ্যেই কায়েম হয়ে গিয়েছিল) এবং এই বর্ধিত রাজস্ব চালান করার নতুন পথও বার করা হলো। পৃথিবীর যে সব দেশের সঙ্গে ব্রিটেনের বাণিজ্য ঘাটতি ছিল সে সব দেশে ভারত থেকে পণ্য রপ্তানী করা হলো এবং এই দেশ থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা আত্মসাৎ করে ব্রিটেনের ঘাটতি মেটানো হলো। ঔপনিবেশিক সম্পদ হস্তান্তরের নতুন রাস্তা খুঁজে নেওয়া হলো। ভারতে আফিম চাষের এলাকা বাড়ানোর জন্য ব্রিটিশ শাসকদের নির্দয় প্রয়াস এবং চীনে আফিমের অবৈধ ব্যবসা প্রসারিত করার উদ্যোগ যার পরিণতিতে ১৮৪০ সালে আফিম যুদ্ধের প্রাদুর্ভাব— এসব ঘটনাই সম্পদ আত্মসাৎ হস্তান্তর করার প্রক্রিয়ার প্রতিফলন।

১৭৬৫ সালে মুঘল শাসকদের কাছ থেকে ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন বাংলা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের দেওয়ানি অর্থাৎ রাজস্ব আকারের অধিকার অর্জন করল— তখন বাণিজ্য করার জন্য প্রয়োজনীয় পণ্য সম্ভার কিনতে কোম্পানির নিজস্ব তহবিল থেকে কোনও রকম অর্থব্যায় করার প্রয়োজন হতো না। ভূমিরাজস্ব ও কর থেকে কোম্পানি যা আদায় করত তার কিছুটা অংশ এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হতো। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পঁচিশ বছরে ভারত থেকে রপ্তানিদ্রব্য কেনার জন্য সংগৃহীত কর ও রাজস্বের গড়ে এক তৃতীয়াংশ ব্যয় করা হতো। ক্লাইভ যখন দেওয়ানী লাভ করেন, সে সময় অর্থাৎ ১৭৬৫ সালে ইংল্যান্ড ও ওয়েলস্-এর জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৬.৭৫ মিলিয়ন অর্থাৎ সাড়ে ৬৭ লক্ষ (লী এবং স্কোফিল্ড্, ১৯৮১)। সে সময় ঐ দেশের মোট জাতীয় উৎপাদন ছিল ৭৭ মিলিয়ন পাউন্ড যার অর্থ ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের মাথাপিছু আয় ছিল ১১.৪১ পাউন্ডের মতো। সুতরাং ব্রিটেনের মাথা পিছু আয়ের পরিমাণ এর থেকে কিছুটা কম হওয়ারই কথা। বৃহত্তর বঙ্গ ও সন্নিহিত অঞ্চলের জনসংখ্যা যে সময় ছিল ৩০ মিলিয়ন। এই পরিমাণ জনসংখ্যা সমন্বিত বাংলার মাথাপিছু আয় ও ব্রিটেনের মাথাপিছু আয়ের পার্থক্যের অনুপাত নিশ্চয়ই ১: ৫ এর চেয়ে কম ছিল (ক্রয় ক্ষমতার সমতার ভিত্তিতে)। কারণ ১০০ বছর পরে দাদাভাই নওরোজি যখন দুই দেশের আয়ের পরিমাপ করার চেষ্টা করেছিলেন তখনই বাংলা ও ব্রিটেনের মাথাপিছু আয়ের পার্থক্যের অনুপাতটি ছিল এরকম অর্থাৎ বাংলার মাথাপিছু আয় ছিল ব্রিটেনের মাথাপিছু আয়ের এক-পঞ্চমাংশ (হেষ্টন, ১৯৮৫)। আমরা যদি অনুমান করি যে বাংলার মাথাপিছু আয় খুব কম হলেও ব্রিটেনের মাথাপিছু আয়ের এক চতুর্থাংশ থেকে এক পঞ্চমাংশের মধ্যে ছিল (ধরা যাক ২২.৫%), তাহলে হিসাব মতো বাংলার মোট জাতীয় উৎপাদনের

পরিমাণ দাঁড়ায় ৭৭ মিলিয়ন পাউন্ড (ক্রয় ক্ষমতার সমতার ভিত্তিতে)। অতএব দেখা যাচ্ছে যে ব্রিটিশ কোম্পানি একটি বিদেশী রাজ্যে কর ও রাজস্ব আদায়ের অধিকার পেয়েছিল যে দেশের অর্থনীতি তার নিজের দেশের (অর্থাৎ ব্রিটেনের) অর্থনীতির মতনই বৃহৎ ও বিস্তৃত। এই দেশ থেকে আহরণ করা রাজস্ব সম্পদের কিছুটা অংশ ব্যবহার করা হতো সাম্রাজ্যের সীমানা আরও বিস্তারিত করার কাজে; আর কিছুটা ব্যয় হতো তথাকথিত বিনিয়োগের কাজে। বিনিয়োগ বলতে অবশ্য সবসময়েই রপ্তানি দ্রব্য কেনার কাজে ব্যবহৃত সম্পদের ব্যয়কেই বোঝাত।

শতাব্দীর শেষ লগ্নে ভারতের দক্ষিণ ভাগে এবং বোম্বাই-দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে কোম্পানির রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ক্রমশ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮১৫ সালের মধ্যেই এসব অঞ্চলে ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থা কায়েম হয়। কর-রাজস্বের জাল এইভাবে যারা দেশে বিস্তৃতি লাভ করার ফলে বাংলা থেকে যা রাজস্ব সংগৃহীত হতো তার পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে দাঁড়াল (দত্ত, ১৯৭০)। এই ক্রমবর্ধমান রাজস্ব দিয়েই ক্রমশ আরও বেশি পরিমাণ রপ্তানি পণ্য কেনা হতে লাগল যেমন, রঙীন ও ছাপানো সূতীরবস্ত্র, লবণ, চাল এবং নানা ধরনের গ্রীষ্মকালীন ফসল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পরিধিও বিস্তার লাভ করল ক্রমশ— ১৮১৯ সালে সিঙ্গাপুর, ১৮২৬ সালে বার্মার উপকূল অঞ্চল এবং ১৮৫৬র মধ্যেই বর্মার সমগ্র নিম্নভাগ, অধীনস্থ হলো। ভারতের অভ্যন্তরেও সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব প্রসারিত হতে থাকল উত্তর ভারতে অযোধ্যা ও পাঞ্জাব রাজ্য অধিগ্রহণের মধ্য দিয়ে। ভারতে যে কর-রাজস্ব সংগৃহীত হয়েছে তার দ্বারা পুষ্ট ঔপনিবেশিক সম্পদের হস্তান্তরের ফলে ব্রিটিশ অর্থনীতির বিকাশ যে উল্লেখযোগ্য ভাবে সাধিত হয়েছে সে বিষয়ে সহজেই অনুমান করা যায়। তবে সে অবদানের যথাযথ পরিমাপের চেষ্টাও করা যেতে পারে।

ব্রিটিশ শিল্পায়নে উপনিবেশগুলির অবদান নিয়ে নানা বিতর্ক আছে। যেমন টমাস ও ম্যাক ক্লর্সাক (১৯৮১,৯৮) তুলনা করে দেখিয়েছেন যে, ব্রিটিশ গভর্ণমেন্টের বন্ডের উপর বিনিয়োগ করে আয় যা হতো (৩.৫%) তার থেকে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মতো উপনিবেশে বিনিয়োগ করে আয় হতো অনেক কম (২%)। সুতরাং তাঁর সিদ্ধান্ত যে উপনিবেশগুলি ছিল সাম্রাজ্যবাদের কাঁধে এক বোঝাস্বরূপ। কিন্তু তাঁদের যুক্তি কোনওভাবে গ্রহণযোগ্য নয় কারণ ব্রিটেনের আবহাওয়া বা জমিতে যতই বিনিয়োগ করা হোক না কেন তাতে তুলো, কফি, আখ, মেহগিনি বা সেগুন কাঠের মতো দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভব হতো না অথচ এগুলি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে সহজেই উৎপাদিত হয়েছে এবং ব্রিটেন তা ঔপনিবেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে ভোগ করেছে। রিকার্ডোর তত্ত্বের ভূত তাড়া করেছে উপনিবেশ ও ব্রিটেনে বিনিয়োগে তুলনামূলক আলোচনাতেও — যেন ব্রিটেন পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বা ভারতে বিনিয়োগ করেছে এই সব দ্রবয উৎপাদনে যদিও শীতপ্রধান অঞ্চলের দেশ ব্রিটেন এই সব দ্রব্য কখনই কোনও অবস্থাতেই উৎপাদন করা সম্ভব হতো না।

যে সময় ব্রিটেনের মোট জাতীয় উৎপাদন এবং মূলধন গঠনের প্রক্রিয়ার তুলনায় এশিয়া ও পশ্চিমী দ্বীপপুঞ্জ থেকে ঔপনিবেশিক সম্পদের হস্তান্তরের গুরুত্ব কী আপেক্ষিক ভাবে বেশি ছিল? এর উত্তর খোঁজার চেষ্টায় যে সব তথ্য ও পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে তা হল ঃ মিচেল ও ডীনের (১৯৬২) Abstract of British Historical Statistics- এ প্রদত্ত বাণিজ্য সংক্রান্ত পরিসংখ্যান (স্থির মূল্যে) এবং তার সঙ্গে ডীন ও কোল্-এর British Economic Growth : Trends and Structures (১৯৬৯) একই ভাবে আরও একটি সূত্র গুরুত্বপূর্ণ— এ. ডব্লিউ. কোল্ (১৯৮১) পরিবেশিত মোট জাতীয় উৎপাদনের সিরিজ (স্থির মূল্যে)।এই পর্বে এশিয় ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে যে সব পণ্য ব্রিটেনে রপ্তানী হতো যে সম্পর্কিত পরিসংখ্যান খুব সহজেই পাওয়া গেলেও সাম্যান্য

উপনিবেশগুলির সঙ্গে সাম্রাজ্যের বাণিজ্য বিষয়ক তথ্য আলাদা করে পাওয়া যায় না। ফলে আমরা যে হিসাব ও পরিমাপ করেছি তা ব্রিটেন অধিকৃত ভারত ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বাণিজ্য সম্পর্কেই প্রযোজ্য। দেখা যাচ্ছে যে সমস্ত গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের সঙ্গে ব্রিটেন যে বাণিজ্য করেছে তাব দশভাগের নয় ভাগের বেশি হয়েছে ভারত ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গে। এবং ব্রিটেনে মোট যা আমদানী হয়েছে এই পর্বে তার পাঁচভাগের চারভাগ এসেছে এই দুই অঞ্চল থেকে কারণ আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৮২০ সালের পর থেকেই (ডেভিস, ১৯৭৯-এ প্রদত্ত চলতি মূল্যে বাণিজ্যিক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়)।

৪
এশিয়া ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে ঔপনিবেশিক সম্পদের হস্তান্তরের পরিমাপ

সায়েরা হাবিব এশিয় ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে ইংল্যান্ডে ১৮০১ সালে সম্পদের যে পরিমাণ হস্তান্তর হয়েছিল তার হিসেব করতে গিয়ে ব্রিটেনে এই সব অঞ্চল থেকে আমদানী উদ্বৃত্তকেই এব পরিমাপ বলে দেখিয়েছেন। আমিও সায়েরা হাবিবের পদ্ধতি অনুসরণ করে চার বছরের জন্য ঔপনিবেশিক সম্পদের হস্তান্তরের হিসেব করেছি — ১৭৭০, ১৮০১, ১৮১১ এবং ১৮২১ এই চারটি বছরকে বেছে নেওয়া হয়েছে কারণ এই চার বছরের জন্য মোট জাতীয় উৎপাদনের হিসাবও পাওয়া যায়। এই হিসেব করতে গিয়ে আমি ভারত থেকে আমদানীর যা প্রাথমিক খরচ তাই ধরা হয়েছে— ব্রিটেনে আমদানী দ্রব্য পৌছনোর পর যা খরচ তা ধরা হয়নি। কারণ এতে চলতি বাণিজ্য খাতে প্রকৃত যা অবস্থা তাই প্রতিফলিত হয় এই ভাবে হিসেব করে দেখা যাচ্ছে যে হস্তান্তরিত সম্পদের পরিমাণ ছিল ব্রিটেনের মোট জাতীয় উৎপাদনের ৬ শতাংশ এবং হস্তান্তরিত সম্পদ ও ব্রিটেনের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের অনুপাত ছিল ৮৬% মতো— যা সায়েরি হাবিবের পরিমাপ থেকে একটু বেশি। এটা হয়ত আমার হিসাব পদ্ধতি আরও যথাযথ ও ক্রুটিহীন হওয়ার ফলেই হয়েছে।

মূল যে ফলাফল গুলি এই অনুসন্ধান থেকে পাওয়া গেছে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ হল ঃ

ভিত্তিবৎসর ১৭৭০-এ এশিয় ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে যে পরিমাণ সম্পদ ব্রিটেনে হস্তান্তরিত হয়েছে তা ব্রিটেনের মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৩ ভাগ। ১৮০১ সালে তা দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়িয়েছে ৬ শতাংশ এবং ১৮১১ সাল পর্যন্ত এই হারেই ঔপনিবেশিক সম্পদ হস্তান্তরিত হয়েছে এবং ১৮২১ সাল নাগাদ তা কিছুটা কমে হয়েছে শতকবা ৫.২ ভাগ। ব্রিটেনে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় থেকে মূলধন গঠনের পরিমার ছিল মোট জাতীয় উৎপাদনের অনুপাত হিসেবে এরকম : ১৭৭০-এ ৫ শতাংশ, ১৮০১-এ ৭ শতাংশ, ১৮১১-এ ৭ শতাংশ এবং ১৮২১-এ তা ছিল ৮ শতাংশ (ডীন ও হাবাকুক, ১৯৬৩ এবং ডীন ও কোল্ ১৯৬৯, ২৬১-৬৩)। এই অনুসন্ধান থেকে আমরা জানতে পারি যে ঔপনিবেশিক সম্পদের হস্তান্তরের পরিমাণ ব্রিটেনের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের অনুপাত হিসেবে ছিল এরকম : ১৭৭০-এ ৬৫.৪ শতাংশ, ১৮০১-এ ৮৬.৪ শতাংশ, ১৮১১-এ ৮৫.৯ শতাংশ এবং ১৮২১-এ তা ছিল ৬৫.৩ শতাংশ।

এই সব হিসেব থেকে যে স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা হলো, বৃটেনে অভ্যন্তরীন মূলধন গঠনের হার উপনিবেশ থেকে সম্পদ হস্তান্তরের কারণেই বৃদ্ধি হয়েছিল— এবং এই বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল ৬৬ শতাংশ থেকে ৮০ শতাংশ পর্যন্ত। এই হিসেবের মধ্যে নানা ধরনের অধোগতিমূলক উপাদান না থাকলে বলা যেত যে ব্রিটেনে মূলধন গঠন ঔপনিবেশিক হস্তান্তরে ফলে অন্তত দ্বিগুণ পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

শিল্প বিপ্লব ঘটেছিল এমন এক দেশে যে দেশ যুদ্ধকালীন আর্থিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল এবং যে দেশে ১৭৮০ থেকে ১৮১০— এই পঁচিশ বা তিরিশ বছরের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় থেকে মূলধন গঠন বা বিনিয়োগের হার দ্বিগুণ হতে দেখা যায়নি। অথচ ডব্লিউ. এ. লুইস থেকে ডব্লিউ. ডব্লিউ. রষ্টো পর্যন্ত উন্নয়নের তাত্ত্বিকরা এরকমই একটি শর্ত পালনের কথা বলেছিলেন। তাহলে ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব ঘটে যাওয়ার কারণ কী — এর কোনও তাত্ত্বিক উত্তর অর্থনৈতিক ইতিহাসবিদরা খুজে পাঁননি বহু দশক ধরে। কেবলমাত্র ঔপনিবেশিক সম্পদের হস্তান্তরের সত্যতা স্বীকার করে নিলেই এই ধাঁধার সমাধান হয়। উপনিবেশগুলি থেকে কাঁচামাল, খাদ্যশস্য ও অন্যান্য পণ্য সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে যেতে শুরু করতেই সেখানে মূলধন গঠন ও অভ্যন্তরীণ বিনিয়োগের পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশি হয়ে গেল যদিও তিরিশ বছরে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়নি (সারণি ৫ দ্রষ্টব্য)।

সারণি-৪ এ এশিয়া ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে ব্রিটেনে সম্পদ হস্তান্তরের পরিমাণ এবং ব্রিটেনের মোট জাতীয় উৎপাদন ও অভ্যন্তরীণ মূলধন গঠনের অনুপাতে এই হস্তান্তরের হিসাব দেখানো হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে ব্রিটেনের মোট জাতীয় উৎপাদনের অনুপাত ঔপনিবেশিক হস্তান্তরের পরিমাণ ১৭৭০ এবং ১৮০১ এর মধ্যে ৩ শতাংশ থেকে বেড়ে ৬ শতাংশে পৌঁছেছে। ১৮১১ সালে এই হারেই হস্তান্তর ঘটেছে এবং ১৮২১ এ সামান্য কমেছে।

ধরে নেওয়া যেতে পারে যে সম্পদের এই হস্তান্তর ব্যক্তিগত অথবা সরকারি বিনিয়োগের পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছিল তাহলে আমরা অভ্যন্তরীণ মূলধন গঠনের পরিমাণের সঙ্গে হস্তান্তরিত সম্পদের পরিমাণ যোগ করি তাহলে ব্রিটিশ প্রকৃত কী পরিমাণ মূলধন গঠন হয়েছিল তার একটা হিসাব পাব। সারণি-৫ এ দেখা যাচ্ছে যে এর পরিমাণ মোট জাতীয় উৎপাদনের শতাংশ হিসেবে ১৭৭০ থেকে ১৮১০ এর মধ্যে ৮ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৩ শতাংশ হয়েছিল। এর অর্থ ব্রিটেনের অধিবাসীরা ভোগের মাত্রা না কমিয়ে, সঞ্চয়ের হার না বাড়িয়ে বিনিয়োগের পরিমাণ দ্বিগুণেরও বেশি করেছিল ১৭৭০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যে এমনকী যুদ্ধ পরবর্তীকালে মন্দার সময়েও এই হার ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

শিল্পবিপ্লবের গুরুত্বপূর্ণ সময়কাল হচ্ছে ইওরোপের নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের সময়। এই সময়কালে ইওরোপে, বিশেষ করে ইংল্যান্ডেব ঘটনাবলীর সঙ্গে আমরা উপনিবেশ থেকে যে সম্পদের হস্তান্তর হয়েছে তা যুক্ত করে আলোচনা না করতে পারি তাহলে ইতিহাসের এই প্রথম শিল্পায়নের ঘটনার একটি সুসংহত ও যুক্তিসম্মত বিবরণ রচনা করতে পাবব না। ব্রিটেনের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হিসাবের সঙ্গে অভ্যন্তরীন মূলধন গঠনের হিসাবের কোনও সঙ্গতি নেই। ব্রিটেনের অর্থনীতির ইতিহাস রচয়িতারা ব্রিটেনের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার নানা অংশের উপাদানের মধ্যে ভাগ করতে গিয়ে বিপাকে পড়েছেন, কারণ এতে কোনও অঙ্কই মেলে না। বস্তুত ব্রিটেনে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে তাকে ভোগ, বিনিয়োগ, প্রযুক্তিগত উন্নতি এবং উৎপাদনশীলতা ইত্যাদি নানা অংশে বিস্তৃত ভাবে ভাগ করে দেখাতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন ঃ

"...সংশয়াতীত ভাবে ১৭৮০ থেকে ১৮৬০ এর মধ্যে ব্রিটেন বিনিপয়সার ভোজ খেয়ে গেছে। বিনিয়োগের উপর স্বাভাবিক প্রতিদানের হার ছিল বাৎসরিক ১০ থেকে ১৫ শতাংশ। ... অথচ ব্রিটেন এর থেকেও অতিরিক্ত ১২ শতাংশের মতো বেশি প্রতিদান পেয়ে গেছে কোনও খরচ না করেই।" (ডি. ম্যাক ক্লমকি, ১৯৮১)।

উপনিবেশের সম্পদের হস্তান্তর দ্বারা পুষ্ট হয়েছে ব্রিটিশ শিল্পায়ন— এ কথা স্বীকার না করেও উপরের উদ্ধৃতিটি করা হয়েছে। এর থেকে সংক্ষিপ্ত ও সারবান মন্তব্য এ বিষয়ে পাওয়া দুষ্কর। উপরের

উদ্ধৃতি থেকেই আমরা বর্তমান নিবন্ধে শিরোনামের একটি অংশ— 'বিনি পয়সার ভোজ' এই শব্দগুলি নিয়েছি। পরিহাসের কথা, এই একই লেখক অন্য এক লেখক পি. টমাস এর সঙ্গে যোথ ভাবে লিখিত একই বই-এর অন্য এক প্রবন্ধে ব্রিটেনের উন্নতিতে উপনিবেশ গুলি ও সাম্রাজ্যের অবদানের গুরুত্ব একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছেন।

সহজ ও স্বাভাবিক উত্তরটি কিন্তু ব্রিটেনের কোনও ইতিহাসবিদের মাথায় আসেনি যে বিনিপয়সার ভোজের উৎস খুঁজতে হবে ঔপনিবেশিক হস্তান্তরের প্রক্রিয়ার মধ্যে; ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন জনগণের কাছ থেকে যে উপায়ে কর ও রাজস্ব আদায় করা হয়েছে এবং বিপুল পরিমাণ কার্যকরী মূলধন ও মজুরী দ্রব্যের আকারে এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে রপ্তানি করে উপনিবেশগুলি যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে তা অর্থের আকারে বিনা খরচে ব্রিটেনে যে ভাবে হস্তান্তরিত হয়েছে তার মধ্যেই এর উত্তর খুঁজে নিতে হবে।

সারণি ১ : ব্রিটেন থেকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে পুনঃরপ্তানী ও দেশীয় রপ্তানীর পরিমাণের পাঁচ বছরের গড় ১৭৬৫ থেকে ১৮০৪ (সরকারি স্থির মূল্যে—' ০০০ পাউন্ডে)

Period	Re-exports RXM	*Index*	Dom exports DX	*Inex*	REM/DX	*REM/DX Average over Sub-period*
1765-69	4579.6	100	9636.6	100	47.5	
1770-74	5627.4	123	10050.0	104	56.0	
1775-79	5086.2	111	8986.6	93	56.6	53.3
1780-84	4109.8	90	9506.0	99	43.2	
1785-89	4948.8	108	12272.8	127	40.3	
1790-94	6842.2	149	16137.0	168	42.4	41.9
1795-99	12008.4	262	19257.8	200	62.4	
1800-04	15930.0	348	24609.0	255	64.7	63.7
All	7391.6		13807.0		53.5	53.5

সূত্র : মূল উৎস পুরো সিরিজের পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে পট্টনায়েক (২০০০)-এ শেষ স্তম্ভে দেখানো হয়েছে ১৭৬৫-১৭৭৯, ১৭৮০-১৭৮৯ এবং ১৭৯০-১৮০৪ এর গড় মূল্য।

সারণি ২ : এশিয়া ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে বৃটেনে যে পরিমাণ আমদানী উদ্বৃত্ত হয়েছে — ১৭৬৫ থেকে ১৮২২ (বাৎসরিক স্থির সরকারি মূল্যে —' ০০০ পাউন্ডে)

Period	ASIA M–X	W. INDIES M–X	COMBINED M–X	*Average over Sub-period*
1765-69	690.4	1573.0	2263.4	
1770-74	1003.4	1866.5	2870.0	
1775-79	436.0	1733.0	2169.0	2434.8
1780-84	762.0	1210.6	1972.6	
1785-89	1552.2	2347.8	3900.0	
1790-94	947.6	1411.0	2358.6	2743.7
1795-99	2871.6	796.6	3688.2	
1800-04	2998.0	3821.4	6719.4	
1805-09	2776.6	2889.4	5666.0	5357.9
1810-14*	3665.8	3174.8	6640.6	
1815-19	5203.8	2353.8	7557.6	
1820-22*	2903.3	3370.7	6274.0	
				6931.0

সূত্র : ১৮১০ থেকে ১৮১৪ এই সময়ের ৪ বৎসরের গড় মূল্য দেওয়া হয়েছে কারণ ১৮১৩ সালের নথি আগুনের নষ্ট হয়ে যায়। ১৮২০ থেকে ১৮২২ এই পর্বে তিনবৎসরের গড় দেওয়া হয়েছে।

সারণি ৩ : এশিয়া ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে ঔপনিবেশিক হস্তান্তরের ত্রিবাৎসরিক গড় (চলতি মূল্যে) '০০০ পাউন্ডে

Period	Asia	West Indies	Combined	GDP in Million pounds
1800-02	5413.73	8623.77	14037.50	232 *(1801)*
1803-05	8652.85	8287.83	16940.68	
1806-08	4240.22	8889.41	13129.63	
1809-11	66360.43	10463.70	16824.13	301.1 *(1811)*
1812-15	12375.90	10426.52	22802.42	
1816-18	12515.29	9745.39	22260.68	
1819-21	8847.89	8716.93	17564.82	288 *(1821)*

সারণি ৪ : ব্রিটেনে উপনিবেশগুলি যেয়ে সম্পদের যে হস্তান্তর হয়েছে তার সামগ্রিক পরিমাণ, মোট জাতীয় উৎপাদন এবং অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় থেকে ব্রিটেনে যে মোট মূলধন গঠন হয়েছে তার পরিমাণ (হস্তান্তরের হিসাব দেওয়া হয়েছে ত্রিবাৎসরিক গড় হিসাবে সব মূল্যই দেওয়া হয়েছে মিলিয়ন পাউন্ডে)।

Three year period Centred on	Transfer	GDP	GDCF *from domestic savings*	*Assumed savings rate*
1770	2.645	85.0	4.25	5
1801	14.037	232.0	16.24	7
1811	18.108	301.1	21.08	7
1821	15.186	288.0	23.04	8
1770	*Transfer figures above*	*3.11*	*62.2*	
1801	*expressed as precentage*	*6.05*	*86.4*	
1811	*to GDP and GDCF from*	*6.01*	*85.9*	
1821	*domestic savings :*	*5.27*	*65.9*	

সূত্র : চলতি মূল্যে মোট জাতীয় উৎপাদন ১৭৭০ থেকে ১৮০০ (কোল্, ১৯৮১)। অন্যান্য বছরের হিসাবে (ডীন এবং কোল্, ১৯৬৯)। অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় থেকে মূলধন গঠনের হিসাব করা হয়েছে এই অনুমানের ভিত্তিতে যে সংশ্লিষ্ট বছরগুলিতে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ছিল মোট জাতীয় উৎপাদনের ৫,৭ ৭ ও ৮ শতাংশ (ডীন ও হাবাকুক, ১৯৮৩; ডীন ও কোল্ ১৯৬৯) এবং এও অনুমান করে নেওয়া হয়েছে যে সমস্ত অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে।

সারণি ৫ : ব্রিটেনের মোট জাতীয় উৎপাদনের অনুপাতে ব্রিটেনের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় থেকে সৃষ্ট মূলধনের পরিমাণ ও সেই সঙ্গে উপনিবেশ থেকে সম্পদের হস্তান্তর যুক্ত করে মোট মূলধন গঠনের হিসাব — ১৭৭০ থেকে ১৮২১

Year	Capital Formation From			Percentage to Capital Formation		
	Transfer Savings	Domestic	Total	Transfer	Domestic	Total Savings
1770	2.645	4.25	6.895	38.4	61.6	100
1801	14.037	16.24	30.277	46.4	53.6	100
1811	18.108	21.08	39.188	46.2	53.8	100
1821	15.186	23.04	38.226	39.7	60.3	100

Precentage to GDP, formed by Cap. Fromation from

	GDP of Britain	Transfer	Domestic Saving	Total
1770	85	3.11	5.0	8.11
1801	232.0	6.05	7.0	13.05
1811	301.1	6.01	7.0	13.01
1821	288.0	5.27	8.0	13.27

সূত্র : সারণি - ৪

REFERENCES

COLE W A 1981 "Factors in Demand 1700-80" Ch.3 of Floud & McCloskey (Eds) q.v..

DAVIS R 1979 *The Industrial Revolution and British Overseas Trade Leicester* University Press

DEANE P 1965 *The Frist Industrial Revolution* (Cambridge University Press)

DEANE P & W A COLE 1967 *British Economic Growth 1688-1959 - Trends and Structure* (2[ND] edition, Cambridge University Press)

DEANE P H J HABAKKUK 1963 "The Take-of in Britain" in W W Rostow (ed) *The Economics of Take-off into Sustained Growth*

DRESCHER S S L ENGERMAN 1998 *A Historical Guide to World Slavery* (New. York, Oxford University Press)

DUTTA R C 1970 *The Economic History of India Vol. I* (Delhi; Govt of India Reprint)

FEINSTEIN C S POLLARD 1988 *Studies in Capital Formation in the United Kingdom 1750-1920* (Cambridge University Press)

FLOUD R D N McCLOSKEY 1981 *The Economic History of Britain since 1700 Vol. I 1700-1860* (Cambridge University Press)

HABIB I 1995 "The Colonialization of the Indian Economy 1757-1900" in *Essays in Indian History : towards a Marxist Perception* (New Delhi Tulika)

HABIB S 1975 "Colonial exploitation and Capital formation in England in the early stages of Industrial Revolution" *Proceedings* of the Indian History Congress, Aligarh.

HESTON A 1985 "National Income" in *The Cambridge Economic History of India* edited by Dharma Kumar and Meghnad Desai (Delhi, Orient Longman)

IMLAH A H 1958 *Economic Elements in the Pax Britannica : Studies in British Foreign Trade in the 19th Century* (Cambridge, Mass)

LEE R D and R S SCHOFIELD 1981 "British Population in the eighteenth century" in Floud and Mc Closkey eds. q.v. Marx, K., 1975 *Theories of Surplus Value (Volume IV of Capital), Part2,* Moscow : Progress Publishers.

MITCHELL B R and P DEANE 1962 *Abstract of British Historical Statistics* (Cambridge University)

NAOROJI D 1962 *Poverty and Un-British rule in India* (Delhi, Govt. of India Reprint)

PATNAIK, U, 1983 "Classical Theory of Rent and in Application to India" in T.J.Byres (Ed.) *sharecroppers and Sharecropping* (London : Cass)

PATNAIK, U., 1984, "Tribute Transfer and the Blance of Payments in the *Cambridge Economic History Of India Vol. II" Social Scientist* Vol. 12 No. 12, 1984. Reprinted In U Patnaik, 1999

PATNAIK U 1999 *The Long Transition - Essays on Political Economy* (Delhi Tulika)

PATNAIK, U., 2000 "New Estimates of 18th Century British Trade and their relation to Transfer from Tropical Colonies" in *The Making of History – Essays presented to Irfan Habib* (Delhi, Tulika)

RICARDO, D., 1970, *Principles of Political Ecnomy and Taxation.* Volume 1 of the *Works and Correspondence of David Ricardo,* edited by Piero Sraffa, with the editiorial assistance of M. H. Dobb, Cambridge, Cambridge University Press.

ROSTOW W W 1963 *The Economics of Take-off into Sustained Growth* (London, Macmillan) SAUL S B 1960 *studies in British Overseas Trade 1870-1914* (Liverpool University Press) SMITH, A., 1961, *The Wealth of Nations,* edited by E. Cannan, London : Methuen University Paperbacks. First published 1776.

THOMAS P & D N McCLOSKEY 1981 'Overseas Trade and Empire' in Floud & McCloskey eds *The Economic History of Britain since 1700 Vol. 1* (CUP)

ভাষান্তর : জয়ন্ত আচার্য

রবীন্দ্রনাথের পঞ্চমবার জাপান ভ্রমন

কাজুও আজুমা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপান ভ্রমণ করেছিলেন সর্বমোট পাঁচবার।

প্রথমবার জাপানি সংস্কৃতি গভীরে প্রবেশ মর্মকথা বুঝে নিয়েছেন এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব নানামুখি সংস্কৃতির প্রবল প্রভাব রাখতে পেরেছিলেন জাপানি ও জাপান-সংস্কৃতির উপর। তাঁর পঞ্চমবার ভ্রমণের সময় ১৯২৯ সালের মে মাসের ১০ থেকে জুন মাসের ৮ তারিখ পর্যন্ত।

তাঁর প্রথম থেকে চতুর্থবার জাপান ভ্রমণ থেকে এই পঞ্চমবার ভ্রমণের পটভূমিকা ও বৈশিষ্ট্য একেবারে আলাদা। রবীন্দ্রনাথ ক্যানাডা যাওয়ার পথে ১৯২৯ সালে চতুর্থবার মার্চ ২২ থেকে ২৮ তারিখ পর্যন্ত জাপানে ছিলেন। আসলে তিনি ক্যানাডার জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন, শিক্ষা সম্পর্কে বক্তৃতা প্রদান করার জন্য।

এপ্রিল মাসের ৬ তারিখে কবি ভিক্টোরিয়া বন্দরে পৌছলেন। সেখানে তিনি অবসর তত্ত্ব (Philosophy of Leisure) বিষয়ক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। পরের দিন ৭ তারিখে ভ্যানকুভারে পৌছলেন। ৯ তারিখে 'সাহিত্যের ধর্ম' (The Philosophy of Literature) শীর্ষক ভাষণ দিয়েছিলেন। সেখানে ক্যানাডার বুদ্ধিজীবী ছাড়া বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি এবং বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষার্থীরাও উপস্থিত ছিলেন। ফলে এই দেশের নানা জায়গা থেকে কবির কাছে বহু নিমন্ত্রণ এল। ভ্যানকুভার থেকে ফেরার পথে তিনি লসএঞ্জেলেসে এপ্রিল মাসের ১৮ তারিখে পৌছলেন। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেয়ার পর আরও পূর্বদিকে চলছিলেন। কিন্তু এই সময় অপ্রত্যাশিতভাবে এক দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। কবি তাঁর পাসপোর্টটি হারিয়ে ফেলেন। কোথাও খুঁজে না পেয়ে অবশেষে নতুন পাসপোর্ট পাওয়ার জন্য পাসপোর্ট আপিসে যান। সেখানে পাসপোর্ট আপিসের কর্মকর্তাদের অহেতুক অসম্মানজনক কথাবার্তা ও আচরণে কবি অত্যন্ত মনোক্ষুন্ন হন।

এই ঘটনায় তিনি বিরক্ত হয়ে কোনো প্রকার প্রতিবাদ না করেই আকস্মাৎ লস এঞ্জেলেস ত্যাগ করে জাপান অভিমুখে রওনা দেন। সে সময় এশিয়ানদের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আইনে জাতিভেদ বিদ্যমান ছিল এই ঘটনায় তাঁর অসীম ধৈর্যশীলতা ও আত্মসংযমবোধ এশিয়ানদের মর্যাদা ও মানবতাবাদকেই উর্ধ্বে তুলে ধরেছিল কাজেই বলা যায় নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি সত্যিই একজন মহামানব ছিলেন।

এই ঘটনার প্রভাব তাঁর চতুর্থবার জাপান ভ্রমণে প্রবল প্রভাব ফেলেছিল : জাপানের সব খবরের কাগজে এই দুঃখজনক ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। এশিয়ানদের প্রতি মার্কিনীদের অবমাননাকর আচরণে জাপানিরা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ Taiyo-maru জাহাজে চড়ে প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থান করছিলেন। এই সময় তিনি 'A Weary Pilgrim' নামক একটি কবিতা রচনা করেন মে মাসের ৩ তারিখে। সেই কবিতা পরে অনুবাদ করেছিলেন আজীবন রবীন্দ্র-ভক্ত Tomiko Wada (Tomio Kora), Tokyo Asahi Shimbun খবরের কাগজে মে মাসের ৭ তারিখে অনূদিত 'প্রশান্ত মহাসাগরের উপর' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথের শ্রান্ত-ক্লান্ত, দুঃখানুভূতি প্রকাশ পেয়েছিল। তিনি লিখেছেন, "খোলো পূর্ব দেশের প্রাচীন মন্দিরের সোনার দ্বার তোমার।" এইভাবে তিনি জাপানের প্রতি তাঁর আশা-ভরসার কথা ব্যক্ত করেছিলেন।

তাঁর এই প্রত্যাশার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে একদল জাপানি নাগরিক যে ভূমিকা রেখেছিলেন তা এক কথায় বিরল। কিন্তু এই সংবাদ জাপানি বড় বড় পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হয়নি, বাংলায় তো নয়ই : সেই অপ্রকাশিত ঘটনাটি তুলে ধরার প্রয়াসেই এই প্রবন্ধটি লেখা:

জাপানের ইবারাকি জেলার একদল জাতীয়তাবাদী নাগরিক Kenichiro Homma নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে রবিঠাকুরের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে আমেরিকায় ঘটিত ঘটনার প্রতি তীব্র প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদের কথা প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে চলমান জাহাজে প্রেরিত বার্তা মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ অবহিত হয়েছিলেন।

ইবারাকি জেলার Tsuchiura বিমান বাহিনী ঘাঁটির বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে Mito শহরের জাতীয়তাবাদীরা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ করে এই শহরে এসে বক্তৃতা প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেই অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন।

ইবারাকি জেলাতে Mitsukuni Mito (১৬২৮-১৭০০) নামে একজন জাপানি নাগরিক জাপানি জাতীয়তাবাদ শিক্ষা-সম্প্রদায়ের পথিকৃৎ। তিনি Edo যুগের শাসনকর্তা Tokugawa পরিবারে জন্মানো একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তিনি স্বাধীনচেতা মনোভাব ও বক্তব্যের জন্য জনপ্রিয়তা ও সুনাম অর্জন করেছিলেন। এই Mito জাতীয়তাবাদী সম্প্রদায় ধারাবাহিকভাবে বর্তমান যুগ অবধি চলে এসেছে।

সেই Mito জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের নেতা Kenichiro Homma দলের আশ্রম Shizan Juku স্থাপন করে দেশচর্চা ও কর্মকাণ্ড চালিয়েছিলেন। ইবারাকি জেলার প্রধান শহরে রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করার জন্য উকিল Ootani-এর বাড়িতে যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার আয়োজন করেছিলেন।

Mito শহরটি রাজধানী টোকিও থেকে ১০০ মাইল দূরে অবস্থিত এবং ইবারাকি জেলার প্রধান শহর। Homma মহাশয় সব আয়োজন করার পরে টোকিওতে রবীন্দ্রনাথের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য ছুটে যান। রবীন্দ্রনাথ ১০ মে য়োকোহামা পৌঁছলেন। সেদিনের মধ্যেই টোকিওর ইম্পেরিয়াল হোটেলে এসে উঠলেন। জাপানের বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা, কর্তৃপক্ষের লোকজন এসে রবীন্দ্রনাথের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার জন্য জল্পনা-কল্পনা করছিলেন। কিন্তু তাঁদের অনেককেই রবীন্দ্রনাথের কক্ষে প্রবেশের অনুমোদন দেয়া হয়নি সেই দলে ইবারাকি থেকে দৌড়ে যাওয়া Homma-র দলটিও ছিল। এই কারণে যে সুদীর্ঘ ভ্রমণের ফলে রবীন্দ্রনাথ ক্লান্ত ও অসুস্থতা অনুভব করেছিলেন। জাহাজের উপর থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ ওদের সাথে সাক্ষাতের প্রতিশ্রুতি প্রদান সত্ত্বেও তাঁর রক্ষণাবেক্ষণকারীরা সাক্ষাৎপ্রার্থীদেরকে ভেতরে প্রবেশ করতে দেননি। Homma মহাশয় অত্যন্ত উৎসাহ ও আশা নিয়ে এসেছিলেন ফলে জোর করে ভেতরে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পারেননি এই সময় Tomiko Wada এসে দোভাষীর ভূমিকা গ্রহণ করে অবশেষে দলের অন্যতম সদস্য Mr. Nagai-এর সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছিলেন। কক্ষে প্রবেশ করে Mr. Nagai কবির চেহারা ও দেহের সৌন্দর্য দেখে অভিভূত হয়েছিলেন কবি বললেন তিনি অসুস্থতার কারণে Mito শহরে যেতে পারছেন না, তাই বক্তৃতা দেয়াও সম্ভব হচ্ছে না। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে না পারার জন্য ক্ষমা চাইছিলেন। তিনি শান্ত স্বরে কথা বলছিলেন। তারপর শ্রী Homma এবং শহরের নাগরিকদের প্রতি নমস্কার জানিয়ে একটি বাণী লিখে দিলেন। শ্রী Nagai মুগ্ধ হয়ে শ্রী Homma কে টেলিফোনে খুঁটিনাটি বিষয় জানিয়ে দিলেন।

কিন্তু তাতে করে শ্রী Homma মনোক্ষুন্ন হয়ে বললেন, "এতো আশ্চর্য কথা। এখনি আমি টোকিওতে যাচ্ছি তার পরের দিন তিনি Mito-র Hiroshi Numajiri-কে সাথে নিয়ে টোকিওতে পৌঁছলেন। পৌঁছেই হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, "আজকের খবরের কাগজে রবীন্দ্রনাথ Asahi Shimbun সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের সভাতে উপস্থিত থাকবেন বলে খবর

প্রকাশিত হয়েছে। টোকিওতে বক্তৃতা সম্ভব হলে Mito শহরে সম্ভব নয়— এটা হতেই পারে না। সত্যিই যদি তাঁর শরীর খারাপ হয়ে থাকে তা হলে টোকিওতে বক্তৃতা সভা বন্ধ করাটাই হবে রবীন্দ্রনাথের প্রতি যথার্থ ভদ্রতা প্রদর্শন। টোকিওতে বক্তৃতা দিতে পারলে অবশ্যই Mito-তেও আমরা করতে পারব। Mito-তে যদি বক্তৃতা না হয় তা হলে আমরা টোকিওর বক্তৃতাসভা ভেঙে দেব। রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যের কবি, প্রাচ্যের রত্ন আমিও একজন জাপানি নাগরিক। ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে পারস্পরিক উঁচু-নিচুর ভেদাভেদ থাকা অনুচিত। পুরুষ হলে সে পুরুষের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাই কর্তব্য কবির Mito যাওয়া বন্ধ করা সম্ভবত: কবির সত্যিকারের ইচ্ছে নয়। তাঁকে সেখানে যেতে বাধা দেয়ার চক্রান্ত সব বন্ধ করব।"

অবশেষে Homma-দলের সদস্যদেরকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে Mito-তে কবির বক্তৃতা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আর সেটা সম্ভব হয়েছিল একমাত্র Homma-র অপরিসীম ঐকান্তিক উৎসাহের কারণে। শ্রী Numajiri বলেছিলেন "Homma আগের রাত থেকে খাদ্য গ্রহণ না করে উপোস থেকে বলেছিলেন, "যদি বাধা আসে, দু-তিন জনকে তরবারি দিয়ে মারব এবং মেরে শেষে আত্মহত্যা করব"— এই সংকল্প নিয়েই টোকিও গিয়েছিলেন।

জাপানে থাকতেই সত্যি সত্যি রবীন্দ্রনাথের শরীর খারাপ হয়ে পড়ছিল। কিন্তু শরীর অত্যন্ত ভেঙে যাওয়া সত্ত্বেও তিনি Mito তে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলেন। Homma মহাশয় দরিদ্র হলেও ট্রেনের একটি কেবিন পুরোটা রবীন্দ্রনাথের জন্য ভাড়া করেছিলেন ঋণ করে। Mito শহরে অবস্থিত Mito প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সভায় রবীন্দ্রনাথ বললেন, "Mito এমন একটি ঐতিহাসিক শহর জানতাম না। তা হলে প্রথমই এখানে আসতাম। আমার প্রিয় বন্ধুরা, আমি যখন তরুণ ছিলাম যখন গলার স্বর ছিল জোরালো, শরীরে তেজ ছিল প্রবল, সেই সময় আপনাদের কাছে আসতে পারলে ভালো হতো বলে অনুভব করছি এবং এই জায়গাতে উদ্বেলিত আপনাদের আত্মাকে নমস্কার জানাতে পারলে, আমার সত্যাদর্শকে উপস্থিত করতে পারলে আরও ভালো হতো এখন ভাবছি।

প্রাচ্য দেশগুলোতে প্রাচীনকাল থেকেই তীর্থযাত্রা রীতি রয়েছে। তার ফলাফলও স্পষ্ট। আমি জানি এই কথা জাপানেও ভারতেও একইভাবে প্রযোজ্য। লোকে তীর্থস্থানকেই অনেকসময় জীবনের শ্রেষ্ঠস্থান হিসেবে বেছে নেয়। যেখানে মহাপ্রকৃতির ভিতরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পবিত্র আত্মা আলোড়ন তুলছে, সেখানটা লোকে বেছে নেয়। দেবপাহাড় হিমালয়ের চূড়া, সমুদ্রের তট ইত্যাদি অসীমের সুদৃশ্যে পরিপূর্ণ। মহামানুষ ও মুক্ত মানুষের সাহসী আত্মা মহাপ্রকৃতির মধ্য সুউচ্চ দণ্ডায়মান গিরি ও অসীম নীল আকাশের মতো সুমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

আমি এখানে আসার পথে এই অঞ্চলের ইতিহাস শুনে এসেছি। এখানকার সাহসী মহামানুষের আবির্ভাব সম্বন্ধে নানা কাহিনী জানতে পারলাম। তাঁদের আত্মার প্রেরণার কারণেই এইখানে উপস্থিত হতে পেরেছি বলে মনে করছি। যা আত্মাকে পরম আনন্দ দিয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে যে সব তীর্থস্থান রয়েছে, যেখানে মহাপুরুষদের আত্মারা নিভৃতে বিরাজিত, মানুষ সেসব ভ্রমণ করে সেখানকার লোকদের কাছে আমাদের বার্তাকে বহন করে পৌছে দিচ্ছে। জাপানের মহাত্মাদের সত্যিকারের মহাপ্রাসাদ এই Mito-তে রয়েছে। তা জানতে পেরে আমার মন আনন্দে ভরে উঠল। কিন্তু আমার ক্ষমতার অভাবে আপনাদের সাথে এখানে দীর্ঘ দিন থেকে আপানদের সঙ্গ উপভোগ করতে পারছি না বলে দুঃখিত। এখানকার লোকে যে গভীর অনুভূতিসম্পন্ন সে অনুভূতি আমি স্বল্প অবস্থানের কারণে সম্পূর্ণ উপভোগ করতে পারছি না। তা পরিতাপের বিষয়।

আমি এখনও শুধুমাত্র একজন ভ্রমণরত যাত্রী। তথাপি আপনাদের প্রেরণার অনুভূতিকে আমাদের দেশে নিয়ে যেতে প্রত্যাশী। মানুষের বীরোচিত চেতনা-উদ্ভাসিত এই জায়গার স্মৃতি আমার গভীরে

প্রবেশ করেছে আপনারা যদি কোনো প্রকার সংকীর্ণতার বশবর্তী হয়ে জাপানের ইতিহাস শুধু জাপানিদের জন্য মনে করে থাকতেন, আমাদের মতো বিদেশীদেরকে কৌতূহলের বাইরে রাখা উচিত বলে মনে করতেন, তাহলে আপনারা আজ আমাকে এখানে আমন্ত্রণ করে কিছু বলার জন্য আহ্বান করতেন না। তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনাদের সমস্ত গৌরবে আমাদেরও গৌরবান্বিত হওয়ার অধিকার রয়েছে।

এই বীরোচিত চেতনা যদি দেশের মঙ্গলের জন্য লাগানো হয়, সব ক্ষুদ্র চিন্তা সাহস করে বিসর্জন দেয়া হয়— সেটা হবে একটি মহান জাতির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই সুচেতনা বিশ্বমানবতার জিনিস। সেটা একদিন আপনশক্তিতে দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে বিস্তার লাভ করবে। একটি দেশ যদি সুচেতনার অধিকারী হয়, সেটা অন্য দেশের জন্যেও কাজে লাগবে। এই চেতনাতেই সত্যিকারের মহৎ মানুষ সৃষ্টির ক্ষমতা রয়েছে। মানবতার যে কোনো যুগে যে কোনো ইতিহাসে যাঁরা উচ্চ আদর্শকে জীবন-দর্শন বলে পাথেয় করেছেন তাঁদের কথা শোনা লোকের পক্ষে মহানন্দের। কেননা এর ইতিহাস একটি সম্পূর্ণ কবিতার অন্তরে বিরাজিত প্রাণশক্তি— যা মানুষের সত্যিকার সুবুদ্ধির প্রকাশ— আর সেটা আজ মহাকাল অতিক্রম করে বিস্তারিত হয়ে চলেছে। সেটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জিনিস। এটা জাপানের সব মানুষের অন্তর্নিহিত গুণ, আকাঙ্খিত অনন্য এক গুণ। আমি আশা করছি সূর্যোদয়ের দেশের আপনারা পৃথিবীর সব দেশে সেই গুণ ছড়িয়ে দেবেন।

দুর্ভাগ্যক্রমে ইতিহাসের মঞ্চে কোনো কোনো ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ ও বীরোচিতবাদ মারাত্মক অহংবোধের ভ্রান্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। ফলে একটি দেশ যখন প্রবল পরাক্রমশালী হতে থাকে তখন অন্য শক্তিশালী দেশগুলোর কাছে তা অস্বস্তিকর ও বিশেষ প্রতিবন্ধকতা বলে মনে হয়। নতুন একটি উন্নয়নশীল দেশ যখন আন্তর্জাতিক সমরবাদী প্রতিযোগিতায় সমরশক্তির আবির্ভাব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে অন্য দেশ সে সম্পর্কে ব্যঙ্গ ও কটূক্তি করেই থাকে। তা ছাড়া এক দেশের শক্তির উন্নয়ন কোনো কোনো দেশের জন্য নিরাশা ও সংশয়ের কারণ— এই বিচলিত অনুভূতি মনে স্থান দেয়াও বিশ্বমানবতার পক্ষে লজ্জার বিষয়।

আমরা দেখছি এই বর্তমান অবস্থাকে অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জাজনকভাবে এই সংকটের সমাধান গভীর মানবতাবোধ দিয়ে করা দরকার। এটা বর্তমান যুগের মানুষের পক্ষে একটি কঠিন কাজ। একদল মানুষের আগ্রাসী মনোভাব ক্রমে ক্রমে প্রবল হতে হতে বিশ্বব্যাপী ব্যাপৃত হচ্ছে। সেটা দুর্বল ও ক্ষমতায় ক্ষুদ্র জাতির পক্ষে স্বস্তিকর নয়। আমি বলছি না যে সেইসব দেশগুলোর ক্ষেত্রেও এই মনোভাব শুভকর— যে দেশগুলো বর্তমান রাজনীতি ও কূটনীতির ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিনিধিত্ব করে চলেছে। কূটনীতির উচ্চ চেতনাই মূলত, বিশ্বের দেশগুলোকে ও আসন্ন যুগকে শান্তি ও সহবস্থানের দিকে সঞ্চালিত করার কথা। কিন্তু বাস্তবে তা হচ্ছে না। দেশ আর দেশ পরস্পরকে মারে, মনের গভীরে হিংসা পোষণ করে অন্যদের ক্ষতি করছে। বিশ্বের এহেন অবস্থাকে অন্য কোনোভাবে সমাধানের উপায় নেই— এটা সত্যিই দুঃখের বিষয়। এটা আমার মনকে গভীরভাবে বিচলিত করছে। এটা নতুন উন্নয়নশীল দেশের পক্ষেও দুঃখজনক। আপনারা যেন ভালো মানুষী গুণের জন্ম দিয়ে ন্যায় ও মুক্তির চেতনাকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারেন, আপনাদের চেতনার যেন আরও উদারতা প্রকাশ পায়— আমি সেই প্রত্যাশাতে রয়েছি। আজকে আমরা আপনাদের দেশের ইতিহাস দেখছি যা সত্যিকারের বীরত্বে বলীয়ান। চিন্তার সংকট ও সকল জড় বাধা সরিয়ে ফেলে নৈতিক বিঘ্নবাধা অতিক্রম করে শুধু নিজের জন্য নয় বরং সমস্ত মানবতার জন্য সাহসিকতার জাগরণ ও অশেষ অনুপ্রেরণাদায়ক চেতনাবোধ সৃষ্টি করতে সক্ষম। সেই চেতনা যেন আপনাদের মধ্যে প্লাবিত হয় এবং বাস্তবে প্রকাশ পায় আর আপনাদের সেই উদ্দীপ্ত অতীত আপনাদের উত্তর পুরুষদের মধ্যেও প্রবাহিত হতে পারে সেই ভূমিকাই যেন হয় আপনাদের প্রধান কাজ।

এখন পৃথিবীর বহু জায়গাতেই অন্ধকার বিরাজমান। কিন্তু মানবতার ইতিহাস প্রমাণ করছে— মানুষের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি প্রকাশ পাওয়াটা শুধু সহযোগিতা, কর্তব্য পালন, সংগঠন এবং পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্ভবপর। এখানে সকল মানুষের বিশেষ অধিকার রয়েছে। সাহিত্যে হোক, ধর্মে হোক, কলাশিল্পে হোক— যা কিছু মূল্যবান জিনিস তা যে কোনো বিদেশী অধ্যয়ন করতে পারেন এবং তা বিশ্বের সকলকে প্রদানের কর্তব্য পালন করে প্রকৃত মানুষে উন্নীত হন।

যে সকল বিদেশী সেই চেতনার প্রতি অহিংসুক, সেই বিদেশী সেইটা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হচ্ছেন। আর বিদেশীরা যারা এমন চেতনায় অনুপ্রাণিত হতে অক্ষম, তাঁরা জাপানের প্রতি বিরাগ বা হিংসার বশবর্তী না হয়ে সেই চেতনাকে একদিন নিজেদের শক্তি বলে ধারণ করে নেবেন। কেননা এটাই হচ্ছে গভীর সমুদ্রের মধ্যে আধ্যাত্মিক ঐক্য এবং মানবতার শ্রেষ্ঠচিন্তা। অথচ বর্তমান বিশ্বে চন্দ্রকলঙ্কের মতো কলঙ্ক রয়েছে আমাদের আশেপাশে, বিনাশ ও সন্দেহের মেঘগুলো জড়ো হচ্ছে।

রাজনীতির ক্ষেত্রে সেইটা দেখা যাচ্ছে, অর্থনীতিতেও। সেইখানে লোকে পরস্পর ঝগড়া করছে কেউ কাউকে সহযোগিতা করছে না। লোকে যদি সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহার ও আচরণের মাধ্যমে পরস্পরকে সহযোগিতা করে, তাহলে রাজনীতিতে, কূটনীতিতে, বাণিজ্যেতেও একেবারে অন্য চেহারা দেখা দেবে। সত্যিকারের যোগাযোগ দ্বারা শান্তি প্লাবিত হবে, অবশেষে অসীম শান্তির সন্ধান মিলবে।

যন্ত্রসভ্যতা মানুষিক উপাদান দিয়ে গঠিত নয় তাই এর দ্বারা মানুষের গুণাগুণ উপেক্ষিত হয়। যন্ত্রসভ্যতার চিন্তাধারাকে বাণিজ্য তথা কেবল অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে, যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে মানুষের নৈতিক চিন্তার ধ্বংস হতে বাধ্য; লোকে "শান্তি" "শান্তি" বলে যে শান্তির কথা বলেন সেটা কোনো যান্ত্রিক সংগঠনের মাধ্যমে বা কারখানাতে নির্মিত শান্তি হতে পারে না। লোকে বিশ্বাস করে যে শান্তিতে সেটা আত্মার সর্বমুক্তি যা আসলে বিশ্বশান্তি।

মানুষের ভেতরে রয়েছে অন্তর্নিহিত উচ্চনৈতিক গুণ যা সে অনেক সময় আবিষ্কার করতে পারে না। কিন্তু লোকে যদি সেটাকে অবিষ্কার করে এই নৈতিক গুণকে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে প্রবেশ করাতে পারে সে যে কোনো কষ্ট বাধা অতিক্রম করে একদিন এই বিশ্বাস ধারণ করে যে সমস্ত দিকেই তার সত্যিকারের শক্তি ছড়িয়ে পড়বে। অতীতে সব সমাজে লোকেরা এই সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা করে এসেছে। এই ধারা এখনও শেষ হয়নি।

ইবারাকি জেলা থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র Joyoshi Shimbun-তে ছাপা ১৯২৯ সালের জুন মাসের ১৩ তারিখে Homma মহাশয়ের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতার জাপানি অনুবাদ এটি Tomiko Wada (Tomiko Kora) দোভাষীর কাজ করেছিলেন। এই লেখা পরের দিন ঐ পত্রিকায় ১৪ জুন তারিখে বেরিয়েছে। আমরা জাপান-ভারত রবীন্দ্র সংস্থার বিশিষ্ট কয়েক জন ভারতীয় শিল্পীদের নিয়ে এই Mito বালিকা বিদ্যালয় (বর্তমান Mito দ্বিতীয় উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়) পরিদর্শন করি ১৯৯৪ সালে। সেই সময় ১৯২৯ সালে সেই সভাতে উপস্থিত জনৈক মহিলা এসে তাঁর স্মৃতিচারণ করেছিলেন। "সেই সভা ছিল অগণিত দর্শক ও শ্রোতাতে পরিপূর্ণ। আমরা সকলে খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ, সুন্দর চেহারা ও ব্যক্তিত্ব আমাদের সকলকে মুগ্ধ করেছিল। আমি আজকে আবার কবি স্মৃতি বিজড়িত এখানে এসে মুগ্ধ হচ্ছি", ভদ্রমহিলার বয়স তখন আশির উপরে।

রবীন্দ্রনাথের শরীর অত্যন্ত খারাপ থাকা সত্ত্বেও তিনি আসল জাপানের ঐতিহ্যবাহী জাতীয়তাবাদের চেতনাকে অনুভব করেছিলেন। তিনি কিন্তু সেটা সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠুক, বিশ্বমানতার উদার ভালোবাসাকে গ্রহণ করুক তাই কামনা করেছিলেন।

Homma-র শিষ্য Hiroshi Numajiri কবিকে নিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের পাড়ে Ooarai তে গিয়েছিলেন। Hiroshi, Nagai জুজুৎসুতে বিখ্যাত ছিলেন। Kenichiro Homma-র ঐতিহ্যগত জাতীয় শিক্ষা ও জাতীয়তা আন্দোলনের দলের একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

আমি Hiroshi Numajiri-র মেজ পুত্র Arsushi Numajiri-র কাছে গিয়ে নানা কাহিনী শুনলাম। কবি জুজুৎসু ক্রীড়াবিদ Hiroshi Numajiri-কে শান্তিনিকেতনে একজন জাপানি জুজুৎসু খেলোয়াড়কে পাঠিয়ে দেয়ার অনুরোধ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, রাসবিহারী বসুকেও একই কথা বলেছিলেন তিনি। বাস্তবে শ্রী বসুর সুপারিশে Shinzo Takagaki বিশ্বভারতীর জুজুৎসু প্রশিক্ষক নির্বাচিত হয়ে ভারতে গিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ দৈহিক সাধনাও ভালোবাসতেন। যেমন সাঁতারকাটা, লাঠিখেলা, কুস্তি, হাডুডু ও জুজুৎসু জাপানের জুজুৎসু ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রথম থেকে ছাত্রদের শেখানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। কলাশিল্প, দৈহিক কৃচ্ছ্রতা সাধন ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের আজীবনের শিক্ষা। তাই তিনি Hiroshi Numajiri-কে খুব পছন্দ করেছিলেন। কবি তুলিতে জাপানি কাগজে লিখে দিলেন :

ফলের লাগিয়া ফুল করি দিল দান
আপন নবীন প্রাণ।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মে ১৭, ১৯২৯

তাতে করে বোঝা যায় সত্যি কবি ওঁদের উৎসাহকে কতখানি মূল্যায়ন করেছিলেন।

প্রশান্ত মহাসাগরের তটে Homma জাপানি জাতীয়তাবাদী সম্প্রদায়ের লোকেরা কবিকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য অপেক্ষা করছিল। Hiroshi Numajiri কবিকে সেখানে নিয়ে গেলেন। সেই অভ্যর্থনা সভাতে তাঁকে Homma প্রদান করলেন— কয়েক খণ্ডের "Dainihonshi" অর্থাৎ মহা জাপানের ইতিহাস। ইবারাকি জেলার Mito কেন্দ্রিক ঐতিহ্যগত জাতীয়তাবাদ-শিক্ষার বিশিষ্ট কর্তা হিসেবে তিনি নিজেও সেই ইতিহাস লিখেছিলেন এবং সম্পাদনা করেছিলেন। সেই পুস্তকগুলো এরপরে সারা জাপানে জাতীয়তাবাদীদের প্রভুত শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল এবং ইবারকি জেলার জাতীয়তাবাদীদের গর্বের বিষয় হয়েছিল।

এখন সেগুলো শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রভবনে সুরক্ষিত রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে যাওয়ার পর দেশ থেকে Homma-কে কৃতজ্ঞপত্র পাঠালেন Homma সেই পত্র দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় টোকিওর বাসাতে যত্ন করে রেখেছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৯৪৫ সালের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বোমাবর্ষণে টোকিওর পূর্বাঞ্চল সমস্ত পুড়ে গিয়েছিল। সেই সময় Homma-র বাসাও আগুনের কবলে ভস্ম হয়ে গেল মহাযুদ্ধের পরে Homma শেষ জীবন পর্যন্ত অনুতাপ করে ঘন ঘন বলতেন, "কবির চিঠি ইবারাকি জেলার Tsuchiura-র আমার বাড়িতে রাখলে ভালো হতো।" কেননা তাঁর বাড়িতেই রবীন্দ্রনাথ জাপানি তুলিতে সেই বাণীটি লিখেছিলেন।

১৯২৯ সালে রবীন্দ্রনাথ পঞ্চমবার আসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জাপানের উত্তর দিকে মুক্ত হাওয়ায় ভ্রমণ করে ক্যানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালীন মানসিক ও শারীরিক শ্রান্তি ও ক্লান্তি দূর করবেন।

রবীন্দ্রনাথ তাই খুব আশা করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে অন্যভাবে কবির ভ্রমণ মোড় নেয়। কবিকে জাপানের সব জায়গাতে উদীপ্ত অভ্যর্থনায়, বহু সভ্য-সংস্থায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে হয়েছিল। পূর্বভ্রমণের স্মৃতিময় স্থানগুলোতেও যেতে হয়েছিল। একটার পর একটা বক্তৃতা করতে হয়েছিল। তাঁর অবসর তত্ত্বের ধারাবাহিক বক্তৃতামালা ও ভ্রমণসাহিত্যের কাজ করতে করতে রবীন্দ্রনাথের শরীর একেবারে ভেঙে পড়ল।

তৎকালীন Tokyo Imperial Univ-র চিকিৎসক শ্রী Kure জুন মাসে ২৮ তারিখের বিকালে পাঁচটার ডায়াগনোসিসে লিখেন :

Edema of lungs and dropsical swelling of the lower extremities are declining, breath 23/a minute pulsation 96/a minute often light fits of heart attack happen.

অবসর তত্ত্বের বক্তৃতামালা ধারাবাহিকভাবে কবি শেষ করতে না পারায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গী প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রী অপূর্ব কুমার চন্দ মে মাসের ২৭ ও ২৮ তারিখে কবির বদলে অবসর তত্ত্বের লেখা পাঠ করলেন রবীন্দ্রনাথ অবশেষে কুনিহিকো ওওকুরার বাড়িতে আশ্রয় নিলেন মে মাসের ২৮ তারিখে। শ্রী ওওকুরা প্রাচ্য চেতনার প্রবক্তা ও বিশ্বাসী। তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ ভক্ত। এবারে তাঁর বিরাট বাড়িতে কবিকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতে দিয়েছিলেন। তিনি কবিকে কাছে পেয়ে গর্ব অনুভব করেছিলেন। স্বদেশে ফিরে যাওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বরচিত গ্রন্থ কয়েকশ পাঠান যেগুলো এখনও ওওকুরা স্মৃতিশালায় সংরক্ষিত আছে। কবি শারীরিক অসুস্থতার কারণে জুন ৮ তারিখে ভারতাভিমুখে রওনা হন।

আসাহি শিম্বুন সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের আয়োজনে জাপানের উত্তর দিকে (তোহোকু-হোক্কাইদো) তে ভ্রমণ করার আর সময় হয়ে ওঠেনি। রবীন্দ্রনাথের শরীর জাপানে ভ্রমণের অর্ধেক সময় থেকে ক্রমশ, খারাপ হয়ে পড়ছিল।

ইবারাকি জেলার ভ্রমণের সময়ও একটু শরীর খারাপ ছিল তবুও তিনি প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য গিয়েছিলেন। গিয়ে Mito-র ঐতিহ্যকে স্পর্শ করে কবি একদিকে আনন্দ ও আশা অনুভব্ করেছিলেন। কিন্তু সেটা বিশ্বমানবতাবাদের ভিত্তিতে উন্নত হোক তা তিনি উচ্চারণ করলেন।

গত দশ বছর পূর্বে আমি যখন Mito-তে যাই তখনো কতিপয় প্রবীণ নাগরিক দীর্ঘদিন ধরে কৃতজ্ঞচিত্তে রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করেছেন দেখে অত্যন্ত অনন্দবোধ করি।

আমি ২০ বছর ধরে এই ব্যাপারে গবেষণা করে আসছি। অনেক জায়গা ও রবীন্দ্রঘটনার সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিদের কাছে গিয়ে এবং অনেক কাগজপত্র ঘেঁটে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করেছি। যার অধিকাংশই ভারত বা জাপানে প্রকাশিত হয়নি। এখনি এইসব না লিখলে ইতিহাসের অগোচরে একদিন মিলিয়ে যাবে। তাই আমার দীর্ঘদিনের তথ্য সন্ধানের ফলাফল এখানে লিখছি।

ভবিষ্যতে রবীন্দ্রনাথের Mito ভ্রমণের মূল্যায়ন ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলোচিত ও নির্ধারিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।
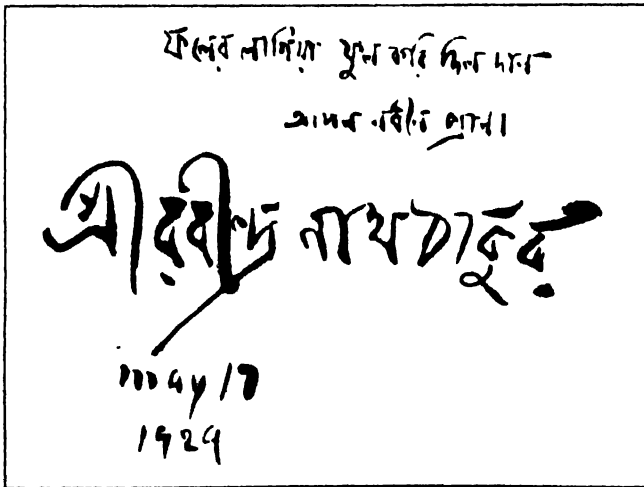
Hiroshi Numajiri-কে কবির উপহার

(কাজুও আজুমা-র ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে পাওয়া)

বাংলায় নীল আন্দোলন (১৮৫৯-৬১) ও খ্রিস্টান ধর্মযাজকদের ভূমিকা

নূরুল হোসেন চৌধুরী

ঔপনিবেশিক বাংলায় কৃষক আন্দোলনগুলোর মধ্যে নীল আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্রিটিশ বস্ত্রশিল্পের প্রয়োজনে এবং ভারতের ঔপনিবেশিক সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এদেশে নীল চাষ শুরু হয়। এই চাষের সাথে যুক্ত হয় অত্যাচার ও শোষণ, আর এর প্রতিবাদে নীল চাষীরা গড়ে তোলে আন্দোলন। গ্রাম বাংলার নীল চাষ এলাকায় এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে এবং ১৮৫০-এর দশকে এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। প্রথমে চাষীরা নিজেদের শক্তির ওপর নির্ভর করে আন্দোলন শুরু করে। পরবর্তীকালে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ এই আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। এদেশে কর্মরত খ্রিস্টান ধর্মযাজকরা আস্তে আস্তে আন্দোলনকারী নীল চাষীদের পাশে এসে দাঁড়ায়। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে— ইউরোপীয় নীলকরদের একই জাতিগোষ্ঠী ও একই ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও ধর্মযাজকরা কেন তাদের বিরোধীতা করে? নীল চাষীদের ওপর অত্যাচারের কারণেই কি তারা নীলকর বিরোধী হয়েছিল? অন্যকথায়, প্রধানতঃ মানবতার তাগিদেই কি তারা নীলকর বিরোধী হয়ে ওঠে? তাদের এই বিরোধীতার প্রকৃতিই বা কেমন ছিল? আলোচ্য প্রবন্ধে এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হবে। তবে প্রথমে বাংলায় নীল চাষের সূত্রপাত এবং প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রথম শতক থেকে ভারতে নীল চাষ হয়ে আসছে। প্রথম দিকে ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে এবং পরে দক্ষিণাঞ্চলে এই চাষ সীমাবদ্ধ ছিল।[১] *আইন-ই-আকবরিতে*উল্লেখ আছে যে, ক্রমান্বয়ে এর চাষ আগ্রা, আজমীর এবং দিল্লী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।[২] তবে এ কথা নিশ্চিত যে সতের শতকের আগে বাংলায় নীল চাষ শুরু হয়নি।[৩] যাহোক, পুরোপুরি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষ করতে আঠার শতক লেগে যায়। লুই বোনার্ড এবং ক্যারেল ব্লুম ছিলেন বাংলায় প্রথম ইউরোপীয় নীলকরদের অন্যতম।[৪]

বাংলায় নীল ব্যবসা প্রথমে ছিল পর্তুগীজদের নিয়ন্ত্রণে। তারপর ওলন্দাজদের এবং সব শেষে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর।[৫] সতের শতকের মাঝামাঝি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের উৎপাদিত উৎকৃষ্টমানের রং ইউরোপের বাজার দখল করেছিল। ব্রিটেনের বস্ত্রশিল্পের মালিকরাও এদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নীলকরদের সাথে এঁটে উঠতে না পেরে ১৭২৪ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নীল ব্যবসা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নীলকররা যখন স্বেচ্ছায় নীল ব্যবসা পরিত্যাগ করে চিনি এবং কফির মতো আরও লাভজনক সামগ্রীর প্রতি ঝুঁকে পড়ে, তখন ব্রিটিশ বস্ত্রশিল্পের মালিকরা স্প্যানিশ গুয়াতেমালা, ফরাসী সান্তো দোমিঙ্গে এবং দক্ষিণ ক্যারোলাইনা থেকে আমদানিকৃত নীলের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। ১৭৭০-এর দশকে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলে নীলের এই উৎসও হারিয়ে গেলে ব্রিটিশ বস্ত্রশিল্পের মালিকদের বেশ অসুবিধা হয় এবং আরও চড়া দামে নীল কিনতে তারা বাধ্য হয়।[৬] লণ্ডনের স্বার্থ সংরক্ষণ করাই যার উদ্দেশ্য ছিল, সেই কোম্পানী ইংল্যাণ্ডের ক্রমবর্ধমান বস্ত্রশিল্পের চাহিদা মেটাবার জন্য অপেক্ষাকৃত

কম দামে নীল সরবরাহ করার আশ্বাস দেয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকরা বাংলায় এই অর্থকরী ফসলের চাষ শুরু করার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৭৮৮ সালে কোম্পানীর পরিচালকরা লেখে :

> Indigo by creating from the soil and labour of the natives an export commerce capable of being carried to a very large extent as well as ultimately to benefit this country [England] in supplying an article so necessary to its manufacturers and for which large sums are annually paid to the foreigners.[৭]

একই সাথে কোম্পানীরও প্রয়োজন ছিল তার কর্মচারীদের অর্থ দেশে পাঠাবার উপায় হিসেবে একটি রপ্তানীযোগ্য পণ্য। সুতরাং বলা যায় যে একদিকে ব্রিটিশ বস্ত্রশিল্পের রং-এর প্রয়োজন এবং অন্যদিকে কোম্পানীর কর্মচারীদের দেশে অর্থ পাঠাবার প্রয়োজন নীল ব্যবসার পথকে সুগম করেছিল। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে নীল চাষের পদ্ধতির অনুকরণে বাংলায় নীল চাষ শুরু করতে আগ্রহী এমন ৮/১০ জন ইউরোপীয় নীলকরকে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য এগিয়ে আসে।[৮] বাংলায় ভাল মানের নীল উৎপাদনের জন্য কিছু পদক্ষেপও গ্রহণ করে। এর মধ্যে অন্যতম ছিল আগ্রা ও অযোধ্যা থেকে বাংলায় আমদানিকৃত নীলের ওপর শতকরা পনের ভাগ কর আরোপ করা। সেই সাথে কোম্পানী পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অভিজ্ঞ নীলকরদের বাংলায় নীল চাষ শুরু করতে উৎসাহ দান করে।[৯] বিশেষ করে এই শেষোক্ত পদক্ষেপটির মারাত্মক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় বাংলার চাষীদের ওপর।

উন্নতমানের নীল চাষের সাথে তাদের দীর্ঘদিনের সম্পৃক্ততা এবং বাংলায় নীলের মান উন্নয়নে তাদের উদ্যোগের কথা অস্বীকার করা না গেলেও মনে রাখতে হবে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে সে সময় নীল চাষে ক্রীতদাসদের কাজে লাগানো হতো। বিউকানন লক্ষ্য করেছেন যে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বেশ কিছু নীলকর আমেরিকায় ক্রীতদাসদের দিয়ে জবরদস্তিমূলকভাবে এই চাষ করাতো এবং এই অভ্যাসটি তারা সঙ্গে করে বাংলায়ও আনে।[১০] সুতরাং বাংলায় তাদের উপস্থিতি এ অঞ্চলে চাষীদের জন্য যে সুখকর হবে না তা সহজেই অনুমান করা গিয়েছিল।

নীল চাষ নীলকরদের জন্য লাভজনক হলেও, চাষীদের জন্য তা মোটেও লাভজনক ছিল না।[১১] এ অবস্থায় চাষীদেরকে একমাত্র ক্ষতিপূরণ প্রদান করে অথবা জবরদস্তি করে নীল চাষ করানো সম্ভব ছিল অন্যভাবে নয়। নীলকররা শেষোক্ত পন্থা-ই বেছে নিয়েছিল এবং বাংলায় নীল চাষ করানো আর জবরদস্তি চালানো সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। ব্রিটিশ বস্ত্র উৎপাদকদের সস্তায় নীল সরবরাহ এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে তা রপ্তানি করে অর্থ উপার্জনের বদ্ধপরিকর বাংলার সরকার চাষীদের স্বার্থ উপেক্ষা করে নীলকরদের সবরকম সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে।

সাধারণভাবে অনুমান করা হয় যে ইউরোপের বাজারে নীলের মূল্য হ্রাস পেলে এবং বাংলায় ইউনিয়ন ব্যাংক দেউলিয়া (১৮৪৭) হয়ে যাওয়ায় নীলকরদের আর্থিক অসুবিধা দেখা দিলে তখনই কেবল নিজেদের ক্ষতিপূরণের জন্য তারা নীল চাষীদের ওপর অত্যাচার শুরু করে।[১২] আসলে জবরদস্তি ও অত্যাচার নীল চাষের অংশে পরিণত হয়েছিল, এমনকি যখন ইউরোপের বাজারের নীলের প্রচুর চাহিদা ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে নীল চাষ শুরুর প্রথম দিকে অর্থাৎ ১৭৯৬ সালে ২৬ জানুয়ারি সদর দেওয়ানী আদালতে সৈয়দ রহিম আলী ও সৈয়দ রমজান আলীর পক্ষে উকিল রহমতুল্লাহ অভিযোগ করেন যে নীলকররা চাষীদের নীল চাষ করতে বাধ্য করছে। তিনি উল্লেখ

করেন যে নীলকরদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য অন্য কোনো উপায় না দেখে চাষীরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। রহমতুল্লাহ স্থানীয় বিচারক ও কালেক্টর-এর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ এনে বলেন "If your petitioners complain to the Judge and the Collector, they refuse to hear them for the sake of the indigo gentleman."[১৩] বাংলায় নীল চাষ যে জবরদস্তি ও নানান প্রতারণার মাধ্যমে করানো হচ্ছিল ছোটলাটও পরবর্তীকালে তা স্বীকার করেন এবং ১৮৬০ সালে ১৭ জানুয়ারি তার Minute-এ স্পষ্ট করে বলেন :

> The records of Government show that the system of indigo manufacture in the province of Bengal proper has been unsound from a very early time. Whilst in other trades all parties concerned have been bound together by the usual commercial ties of mutual interests, in this one trade, in this one province, the indigo manufacture has always been a remarkable exception to this mutual and healthy state of things.[১৪]

এইসব অত্যাচারী নীলকরদের বিরুদ্ধে সরকার প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করে ১৮১০ সালে। যেভাবে নীলকররা দাদনের মাধ্যমে নীল চাষীদের নীল চাষ করতে বাধ্য করতো তাতে ভারতের বড়লাট লর্ড মিন্টো বিচলিত হন। তিনি চারজন নীলকরের নীল চাষের লাইসেন্স বাতিল করেন এবং যে সব নীলকর চাষীদের আটক করে রাখতো, চাবুক মারতো বা আরও বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার করতো তাদের বিষয়ে ম্যাজিস্ট্রেটদের রিপোর্ট করতে নির্দেশ দেন।[১৫] সরকারের এই পদক্ষেপ সত্যিকার অর্থে জনস্বার্থ সংরক্ষার্থে গৃহীত হয়েছিল কিনা বলা কঠিন। বিবাদমান দুই পক্ষের মধ্যে (নীলকর ও নীল চাষী) ভারসাম্য রক্ষা করার এটি ছিল প্রথম পদক্ষেপ।

এরপর থেকে লক্ষ্য করা যায় যে, যখনই চাষীরা চুক্তি অনুযায়ী নীল চাষ করতে ব্যর্থ হয়েছে তখনই তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নীলকররা সরকারের দ্বারস্থ হয়েছে। ১৮২৩ সালে এ রকম একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার Regulation VI পাশ করে, যার সাহায্যে সংক্ষিপ্ত বিচারের মাধ্যমে নীলকররা চাষীদের দাদনকৃত অর্থ আদায় করার আইনগত অধিকার লাভ করে। যে জমিতে নীল চাষ করার জন্য চাষীকে দাদন প্রদান করা হয়, চাষী সেই জমিতে নীলের পরিবর্তে অন্য কোনো ফসল চাষ করলে নীলকরকে সেই ফসল অধিগ্রহণ করার অধিকারও প্রদান করে এই আইন।[১৬] অন্য কথায়, এই আইন চাষীকে তার ক্ষতি সত্ত্বেও নীল চাষ চালিয়ে যেতে বাধ্য করে।

বেন্টিং মনে করেন নীল চাষীদের ওপর নীলকরদের অত্যাচার নীল চাষ থেকে প্রাপ্ত অর্থনৈতিক সুবিধার তুলনায় ছিল যৎসামান্য। তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন, "The occasional misconduct of the planters is as nothing when compared with the sum of good they have diffused around them"[১৭] স্পষ্টত তিনি নীল চাষে অত্যাচারের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করেন। অত্যাচারিত চাষীদের যাদের নিরাপত্তার প্রয়োজন ছিল তাদের উপেক্ষা করা হয়। অন্যদিকে অত্যাচারী নীলকরদের হাতকে আরও শক্তিশালী করা হয়। তবে Court of Directors বেন্টিং-এর পক্ষপাতমূলক আইন মেনে নিতে পারেনি।[১৮] দৃশ্যত Court of Directors দুই পক্ষের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখেছিল, কিন্তু প্রশাসনের স্থানীয় কর্মকর্তারা সম্পূর্ণ অন্য নীতি অনুসরণ করে। ম্যাজিস্ট্রেটদের অনেকে ছিল নীলকরদের আত্মীয় অথবা বন্ধু। আবার অনেক ক্ষেত্রে নীলকরদেরকে অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ করা হয়।[১৯] এমতাবস্থায় অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক নিরাপত্তার সুযোগও

হারিয়ে গেল। এ ছাড়া আদালতের অবস্থানও বিষয়টি জটিল করে তোলে। ১৮৫০-এর আগে সাধারণত আদালতগুলো জেলা সদর দপ্তরে থাকায় প্রত্যন্ত অঞ্চলের চাষীদের পক্ষে আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা অসুবিধাজনক ছিল। তবু যদি কখনও কোনো নীল চাষী আদালতে মামলা দায়ের করতো, নীলকর ও ম্যাজিস্ট্রেটদের মধ্যে পূর্ব বর্ণিত সম্পর্কের কারণে তার পক্ষে ন্যায় বিচার লাভ করা একরকম অসম্ভবই ছিল। নীলকররা ম্যাজিস্ট্রেটদের সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা গর্বের সাথে বলতো এবং চাষীদের এই বলে ভয় দেখাতো যে তারা (চাষীরা) যদি আইনের আশ্রয় গ্রহণ করে তবে পাঁচ বছরের আগে রায় পাবে না।[২০] পাঁচ বছর ধরে মামলা চালানোর মতো আর্থিক সঙ্গতি চাষীদের ছিল না, এটা নীলকররা ভালো করেই জানতো। অতএব, গ্রাম বাংলায় নিপীড়ন চালানোর ব্যাপারে ম্যাজিস্ট্রেটরা কম দায়ী ছিল না। তাদের একনিষ্ঠতা ও সততার অভাব নীলকরদের বেআইনী কাজ চালিয়ে যেতে সাহায্য করে।[২১]

ধর্মযাজকরা ভারতে প্রধানত ধর্ম প্রচারের কাজেই নিয়োজিত ছিল, তবে তারা অনুধাবন করেছিল যে এদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি না ঘটলে তাদের ধর্ম প্রচারের কাজ ব্যাহত হবে। আঠার শতকের শেষে এবং উনিশ শতকের প্রথম ভাগে যারা এই অবস্থার উন্নতির উদ্যোগ গ্রহণ করে যাজকরা তাদের সাহায্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তারা নিজেরাও সামাজিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে।[২২]

নীল চাষীদের দুরবস্থা এবং বিশেষ করে তাদের ওপর নীলকরদের অত্যাচার বাংলায় কর্মরত ধর্মযাজক সংস্থাগুলোর নজর কেড়ে নেয়। এই সংস্থাগুলোর অন্যতম ছিল Baptist Missionary Society, London Missionary Society, Church Missionary Society, Cathedral Mission, Kirk of Scotland Mission এবং Free Church of Scotland Mission. উল্লেখ্য যে Church Missionary Society অত্যাচারী নীলকরদের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর অধিকাংশ সদস্য ছিল জার্মান লুথারান এবং তারা বাংলার গ্রামাঞ্চলে কর্মরত ছিল। তখন সেখানে ব্রিটিশ যাজকদের সংখ্যা খুবই কম ছিল।[২৩] Church Missionary Society-র পাদ্রী জি. জি. কুথবার্ট বলেন যে তারা নিপীড়িত মানুষকে সেবা করার তাগিদেই নীল সমস্যার সাথে সম্পৃক্ত হন।[২৪] যখনই যাজকরা বাংলার নীল চাষের জেলাগুলোয় যায়, তখনই চাষীরা তাদেরকে নীলকরদের অত্যাচারের বিষয়ে অবহিত করে। এই অত্যাচারীদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য তারা যাজকদের অনুরোধ করে। ফলে নীল কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দেবার সময় প্রায় সব যাজক নীল চাষীদের ওপর নীলকরদের অত্যাচারের এক করুণ চিত্র তুলে ধরে।

শুধুমাত্র মানবতার কারণেই খ্রিস্টান যাজকরা অত্যাচারিত চাষীদের পাশে এসে দাঁড়ায়নি। ধর্ম যাজক হিসেবে খ্রিস্টানধর্ম প্রচারের স্বার্থে তারা এ কাজটি করে। তারা অনুভব করে যে, ইউরোপীয় নীলকরদের আমানবিক কর্মকাণ্ড গ্রাম বাংলায় খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের কাজ ব্যাহত করছে। কমিশনের সমানে সাক্ষ্য দানকালে Church Missionary Society-র পাদ্রী জেম্স্ লং বলেন বিভিন্ন সময়ে তাঁকে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। উদাহরণস্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন যে, তাঁকে একবার প্রশ্ন করা হয় : "Why do you not tell your countrymen, the indigo planters, to be less oppressive; go preach to them first." মিশনারী স্কুলের ছাত্ররা একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করে : "Why are your Christian countrymen as bad we are, and yet you say, your religion is better than ours".[২৫] যশোর জেলার চূড়ামনকাঠির ব্যাপ্টিষ্ট যাজক জে. এইচ. এ্যাণ্ডারসনকে নীল চাষীরা অনুরোধ করে বলে, "আগে আমাদের নীলকরদের অত্যাচার থেকে রক্ষা

করুন, তাহলে আমরা খ্রিস্টান হতে পারি"।[২৬] প্রকৃতপক্ষে বাংলার নিপীড়িত মানুষের মঙ্গলের জন্য যে সমস্ত খ্রিস্টান ধর্ম যাজক কাজ করছিল তাদের কাছে একই ধর্মাবলম্বী অত্যাচারী নীলকরদের মুখোশ উন্মোচন করাই ছিল নীল চাষীদের প্রধান উদ্দেশ্য। যাহোক নীল চাষীদের দুর্দশা লাঘব করার চেয়ে এদেশে খ্রিস্টানধর্ম প্রচারের অনুকূল ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য মূলত যাজকরা নীল চাষের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়।

ধর্ম যাজকদের কোনো সন্দেহ ছিল না যে বাংলায় জবরদস্তিমূলকভাবে নীল চাষ করানো হতো এবং সে জন্য তারা এই ব্যবস্থার পরিবর্তনের পক্ষে মত ব্যক্ত করে। Church Missionary Society-র সম্পাদক পাদ্রী জি. জি. কুথবার্ট-কে লেখা এক চিঠিতে একই সংস্থার এফ শার উল্লেখ করেন :

> In some places the poor cultivators told us, that they had *nothing to* eat, because they had to sow indigo in their rice fields... Year after year the exactions increased... not only the planters grind the ryots, but their unprincipled Native assistants crush them altogether... Surely it is time, that the Indian Government put a stop to such inhuman and cruel proceedings; every indigo factory deserved to be closed, yea [utterly] abolished.[27]

১৮৫৫ সালের সেপ্টেম্বরে কোলকাতায় প্রটেস্ট্যান্ট যাজকদের এক সম্মেলনে বাংলায় কর্মরত সকল যাজক অংশগ্রহণ করে। এই সম্মেলনে নীল চাষের বিষয়টি প্রাধান্য পায় এবং "On the Influence of the System of Indigo Planting on the Spread of Christianity" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়।[২৮] স্পষ্টত নীল চাষ ও খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার পরস্পর নির্ভরশীল বিষয়ে পরিণত হয়।

তাদের অবস্থানের সমর্থনে এই কোলকাতা সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ২৫জন যাজক ১৮৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ছোটলাটের কাছে একটি দরখাস্ত পেশ করে। তারা বাংলার মানুষের সামাজিক অবস্থা অত্যন্ত করুণ বলে উল্লেখ করে এবং এর কারণ অনুসন্ধানের দাবী জানায়। তারা বাংলার পুলিশ ও বিচার ব্যবস্থার তদন্তের দাবী জানায়।[২৯] সরকারী কর্মকর্তাদের ভূমিকা সমালোচনা করে পাদ্রী এফ. শার বলেন, "If the planter enjoys the friendship of the Civil servants, he can oppress, imprison and ill treat the Ryots with impunity".[৩০] পাদ্রী লং Indigo Commission-কে জানান, "They [indigo cultivators] see the Magistrates and the Deputy Magistrates, when sent to adjudicate disputes between the ryots and the planters, becoming in various cases the guest of the planters while the case in pending..."[৩১]

দৃশ্যত ধর্ম যাজকরা নীল চাষী-নীলকরদের সম্পর্ক এবং সরকারী সংস্থা ও নীলকরদের মধ্যে সহযোগিতার বাস্তবতা সম্বন্ধে অবহিত ছিল। একই সাথে তারা ন্যায়নীতির বিষয়ে খ্রিস্টান ধর্মের মৌলিক আদর্শের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিল। তারা নীলকরদের শোষক হিসেবেই জানতেন। নিঃসন্দেহে, যাজকরা চাষীদের স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। তাদের প্রস্তাব প্রথম দিকে প্রত্যাখাত হলেও পরে তারই আলোকে বাংলায় নীল চাষ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য ১৮৬০ সালে কমিশন গঠন করা হয় এবং একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজককে এই কমিশনের অন্যতম সদস্য রাখা হয়।

ছোটলাটের কাছে তাদের দরখাস্ত বাতিল হলেও যাজকরা তাতে নিরুৎসাহিত হয়নি। গ্রামাঞ্চলে উৎপীড়নের মূল কারণ পুলিশ বাহিনী ও ম্যাজিস্ট্রেটদের অক্ষমতা এই উপলব্ধি থেকেই যাজকরা

ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সব সময় চাষীদের পাশে দাঁড়ায়। নীল চাষীদের আইনের পথে থাকতে বলে এবং কখনও নীলকরদের প্রতিহত না করতে বা তাদের দিকে অঙ্গুলী না ওঠাতে পরামর্শ দেয়।[৩২] মোটকথা, তারা নিপীড়নমূলক নীল চাষ যেমন বিরোধিতা করেন তেমনই চাষীদের কোনো বেআইনী কর্মকাণ্ডকেও অপছন্দ করে। অন্যদিকে, তারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন সমর্থন করে এবং চাষীদের এ ধরনের আন্দোলনে তাদের পাশে দাঁড়ায়।[৩৩]

নীতিগতভাবেই ধর্মযাজকদের পক্ষে হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড সমর্থন করার কথা নয়; কিন্তু তাদের এই নীতি জটিল আকার ধারণ করে যখন তাদের কেউ কেউ বাংলায় নীল কুঠির মালিক হয়ে বসে। উইলিয়াম কেরী ও টমাস অন্য অপর একজন প্রটেস্ট্যান্ট যাজক মালদহ-র কয়েকটি নীল কুঠির মালিক ছিলেন। অবশ্য এই নব্য মালিকরা মনে করেন নীল চাষের মাধ্যমে কিছু লোকের উপকার করার সুযোগ পাবেন এবং এর ফলে খ্রিস্টান ধর্মের সেবা করার সুযোগ পাবেন।[৩৪]

নীলকরদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অংশ হিসেবে জেম্‌স্‌ লং লণ্ডনস্থ Church Missionary-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের Parliamentary Committee on Colonisation in India-এর সামনে হাজির হয়ে নীলকররা বাংলায় নীল চাষীদের ওপর যে ধরনের অত্যাচার করছে তার পূর্ণ বিবরণ পেশ করতে বলেন।[৩৫] এই অত্যাচার বন্ধ করার জন্য তিনি ইংল্যান্ডের প্রভাবশালী ব্যক্তিদের কাছে নিয়মিত তথ্য পাঠান। একই সাথে জেম্‌স্‌ লং বাংলায় খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারে নীলকররা কিভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে সহকর্মীদের কাছে তা ব্যাখ্যা করার জন্য কোলকাতায় ধর্ম যাজকদের সামনে "The Ryot–His teacher and torture" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।[৩৬]

নীল চাষ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ধর্ম যাজকরা যুক্ত হবেন কি না এ ব্যাপারে ১৮৬০ সালের এপ্রিল মাসে কোলকাতায় যাজকদের এক সাধারণ সভায় বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদের মধ্যে জেম্‌স্‌ লং এবং আলেকজাণ্ডার ডাফ্‌ (Scotland Church Mission) যুক্ত হবার পক্ষে মত ব্যক্ত করেন।[৩৭] একই সময়ে তাঁদের অবস্থান সমর্থন করে Bengal Harkara-র ১৮৬০ সালের ৫ এপ্রিল সংখ্যায় বেনামে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। লেখক নীল চাষকে প্রতারণাপূর্ণ বলে আখ্যায়িত করে বলেন :

> I am sorry to write this, Sir, of the doings of certain men, but it is the [indigo] system which is at fault... the system of forced advances and fictitious arrears ... the system which pauperises the ryots of a whole district to prop up a serfdom.[৩৮]

ভারত এবং ইংল্যান্ডে ধর্ম যাজকরা যে আন্দোলন করছিল তা নিঃসন্দেহে নীলকরদের বিপক্ষে ছিল। নীল চাষের ব্যাপারে যাজকরা ব্যাপকভাবে জড়িত হওয়ায় নীলকররা ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়। গ্রাম বাংলায় ধর্ম যাজকদের প্রভাব এবং কর্মকাণ্ড খর্ব করার জন্য নীলকররা কোলকাতার বিশপের সাহায্য প্রার্থনা করে।[৩৯] তাঁর সাহায্য লাভে ব্যর্থ হয়ে নীলকররা যাজকদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য প্রচারণায় লিপ্ত হয় এবং তাদের বিরুদ্ধে বিবিধ অভিযোগ উপস্থাপন করে। এর মধ্যে অন্যতম ছিল রাজনৈতিক ও পার্থিব বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা এবং চাষীদের উত্তেজিত করা। নীলকররা এতই ক্রুদ্ধ হয়েছিল যে তারা কোনো কোনো যাজকের চরিত্র নিয়েও প্রশ্ন তোলে।[৪০]

নীল চাষের ফলে গ্রাম বাংলায় চাষীদের মধ্যে এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতা লক্ষ্য করা যায়। নীল চাষ তাদের জন্য লাভজনক ছিল না অথচ নীলকরদের ইচ্ছামতো এর চাষ না করলে তাদের নানা ধরনের নিপীড়নের সম্মুখীন হতে হয়। স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেটদের সময়মতো হস্তক্ষেপ ঘটলে অবস্থার

উন্নতি হতে পারতো, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা নীলকরদের হাতকে শক্তিশালী করে। নীলকরদের অত্যাচার বাড়তে থাকলে বাংলায় কর্মরত খ্রিস্টান ধর্মযাজকরা বিচলিত হয়ে ওঠে। তারা উপলব্ধি করে যে, নীলকরদের অত্যাচার এ দেশে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের অন্যতম প্রধান অন্তরায়। সে কারণে নীলকরদের হাত থেকে নীলচাষীদের বাঁচাবার জন্য তারা চাষীদের পাশে এসে দাঁড়ায়। তারা ভারতে এবং ইংল্যান্ডে জনমত গঠনের জন্য সভা ও সেমিনারের আয়োজন করে। যাজকরা গোটা নীলচাষ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য সরকারের সাথে দেন-দরবার শুরু করে। ১৮৬০ সালে এ ব্যাপারে একটি কমিশন গঠনে সরকারের সিদ্ধান্তের পেছনে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। কমিশনের রিপোর্টে নীল চাষীদের অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হয়। বস্তুত এই রিপোর্টের আলোকে সরকারী পদক্ষেপের পর থেকে বাংলায় নীল চাষীদের ওপর নীলকরদের অত্যাচার শুধু কমেনি বরং এ অঞ্চলে নীল চাষও বহুলাংশে কমে যায়।

তথ্যসূত্র ও পাদটীকা

১. George Watt, *A Dictionary of Economic Products of India,* Vol. IV (Delhi : Periodical Experts, 1972, second print), p. 389.

২. Abul Fazal, *Ain-i-Akbari,* Translated by H. S. Jarrett. (Calcutta : Royal Asiatic Society, 1949), Vol. II, pp. 99, 101, 103, 107 and 109.

৩. George Watt, *The Commercial Products of India.* (London : J. Marray, 1908), p. 66.

৪. N.K. Sinha, *The Economic History of Bengal,* Vol. I (Calcutta : Firma K.L. Mukhopadhyay, 1965) p. 66.

৫. Safat A. Khan, *The East India Trade in India in the 17th Century,in its Political and Economic Aspect.* (London : Oxford University Press, 1923), pp. 13, 158.

৬. B. B. Kling, *The Blue Mutiny : The Indigo Disturbances in Bengal, 1859-1862.* (Philadelphia : University of Penusylvania Press, 1966), pp. 16-17.

৭. Quoted in N.K. Sinha, *op. cit.* pp. 29-30.

৮. Holden Furber, *John Company at Work : A Study of European Expansion in India in the Late Eighteenth Century.* (Cambridge : Cambridge University Press, 1951), p. 291.

৯. B. B. Kling, *op. cit.*, p. 18.

১০. D.H. Buchanan, *The Development of Capitalist Enterprise in India.* (London : F. Cass, 1966, new impression), pp. 37-38.

১১. দেখুন Nurul H. Choudhury, *Peasant Radicalism in Nineteenth Century Bengal : The Faraizi Indigo and Pabna Movements.* (Dhaka : Asiatic Society of Bangladesh, 2001), B. B. Kling, *op.cit.*

১২. *Report of the Indigo Commission.* (Calcutta : 1860), Q1470-1471 (hereafter RIC), Parliamentary Papers, 1857-58, Vol. VII, Part I, pp. 60, 98, 142, 190, 209-213.

১৩. N.K. Sinha, *The Economic History of Bengal,* Vol. I, *op.cit.*, p. 210.

১৪. Minute by the Lieutenant-Governor of Bengal on the Report of the Indigo Commission (এরপর) Minute by the Lieutenant-Governor of Bengal), *Parliamentary Papers, 1861,* Vol. XIV Para 1, p. 70.

১৫. *Parliamentary Papers, 1812-13*, Vol. VIII, p. 387. আরও দেখুন B.B. Kling, *op.cit.*, p. 40; H.R. Ghosal, *Economic Transition in the Bengal Presidency, 1793-1833*. (Calcutta : Firma K. L. Mukhopadhyay, 1966), p. 18 and Manju Chattapadhyay, *Petition to Agitation : Bengal 1857-1865*. (Calcutta : K. P. Bagchi, 1985), p. 23.

১৬. *Parliamentary Papers, 1831-32*, Vol. VIII, p. 271.

১৭. A Tripathi, *Trade and Finances in Bengal Presidency, 1793-1833*. (Calcutta : Oxford University Press, 1979 revised ed.), p. 160.

১৮. B. B. Kling, *op.cit.*, p. 66.

১৯. R. F. Larmour, J. Forlong, I. Burrell, In Nadia; H. Deverell, G.M. Jackson and J. Watson in Murshidabad were among the planters appointed honorary magistrates, RIC Appendix 25.

২০. দীনবন্ধু মিত্র, *নীল দর্পণ* (খন্দকার সিরাজুল হক সম্পাদিত)। (কলিকাতা : ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল, ১৯৭৫), অংক ৩, দৃশ্য ১। পৃ. ৮৮-৮৯।

২১. একটা অনুমান করা হতো যে, "জেলা কর্তৃপক্ষ, বিশেষ করে ম্যাজিস্ট্রেটরা সুষ্ঠুভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করলে" নীলকরদের অত্যাচর লোপ পেত। *Hindoo Patriot*, January 2, 1861.

২২. See K. Ingham, *Reformers in India 1793-1833 : An Account of the Work of Christian Missionaries on Behalf Social Reform*. (Cambridge : Cambridge University Press, 1956); E.D. Potts, *British Baptist Missionaries in India 1793-1837 : The History of Serampore and its Missions*. (London : Cambridge University Press, 1967); G.A. Oddie, *Social Protest in India : British Protestant Missionaries and Social Reform, 1850-1900*. (New Delhi : Manohar, 1979).

২৩. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন M. K. Chanda, "The Indigo Revolt and the Christian Missionaries", *Bengal Past and Present*, Vol CII, Parts i and ii, January-December 1984, p. 48; Julius Richter, *A History of the Missions in India*. (Edinburgh : Oliphant, 1908), p. 193.

২৪. RIC Q 1675.

২৫. RIC Q 1625.

২৬. RIC Q 870.

২৭. Quoted in G.A. Oddie, *op. cit.*, p.151.

২৮. M.K. Chanda, *op.cit.*, p. 48; G.A. Oddie, *op.cit.*, p. 155.

২৯. *Ibid.*, pp. 159-160.

৩০. Quoted in *Calcutta Review*, Vol. XXVI, 1861, p. 361.

৩১. RIC Q 1626.

৩২. RIC Q 1644,. Q 784.

৩৩. শংকর সেনগুপ্ত, পাদ্রী লঙ, *বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী জীবন* (কলিকাতা : ১৯৮০), পৃ. ২০২।

৩৪. M. K. Chanda, *op.cit* p. 46.

৩৫. B.B. Kling, *op.cit.*,p. 122.

৩৬. শংকর সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০-১৩১।

৩৭. B. B. Kling, *op.cit.*, pp. 122-123.

৩৮. *Calcutta Review.* Vol. XXVI, 1861, p. 362.

৩৯. From J. Forlong, an indigo planter, to E.H. Lushington, Officiating Secretary to the Government of Bengal, November 24, 1859, *Selections from the Records of the Government of Bengal : Papers Relating to the Indigo Cultivation in Bengal,* No. XXXIII, Part I, pp. 280-286.

৪০. For details see G. A. Oddie, *op. cit.* p. 157; M. K. Chanda, *op.cit.*, p. 49; Sankar Sengupta, *op.cit.*, p. 195; RIC Q 748, Q 2781-2782, Q 2932, Q 2954 and Q 3298.

ইতিহাস ও রাজনীতি

ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

গত উনবিংশ শতকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বের চর্চাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের কথা আজ পণ্ডিত মহলে সুপরিচিত। তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের মধ্যে আর্য জাতির খোঁজ, ইউরোপে বা ইউরোপীয় অঞ্চলে তাদের আদি বাসস্থানের সন্ধান এবং নর্ডিক জাতির সঙ্গে তাদের অভিন্নতা বোধ অনেক ইউরোপীয়দের ধারণায় "আর্য"দের "সবচাইতে সংগঠিত, উদ্যম ও সৃজনশীল জাতি বলে" চিহ্নিত করল। ১৮৫৮তে উইলসন অভিমত প্রকাশ করলেন যে, বহুপূর্বে যেমন আর্যদের এক শাখা ভারতে এসে দস্যু দমন করেছিলেন, তেমনি ঐ জাতির আর এক শাখাভুক্ত লোকেরা অর্থাৎ ইংরেজরা ভারতে "আদি" আর্যদের ও দস্যুদের বংশধরদের উপরে আধিপত্য স্থাপন করেছে। অতএব ব্রিটিশরা ভারতে আর্যশাসনের ন্যায্য ও সঙ্গত উত্তরাধিকারী।[১]

মাঝে মধ্যে কোনও কোনও ভারতীয় ভারততত্ত্ববিদ আর্যদের ভারতীয় বলে মত প্রকাশ করলেও পশ্চিমী পণ্ডিতরা এবং তাদের অনুসরণকারী প্রায় সব ভারতীয় ঐতিহাসিকরা আর্যদের বহিরাগত বলেই বিশ্বাস করলেন। এই বিশ্বাসের প্রাবল্য একে ঐতিহাসিক সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়েছিল। সুখের কথা যে গত দুই দশকে বেশ কয়েকজন পণ্ডিত নানা তথ্যের সাহায্যে এই বিশ্বাসের ভিত নড়িয়ে দিয়েছেন। এই শ্রেণীর পণ্ডিতরা মনে করেন যে ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমেই "আর্যদের" আদি বাসভূমি। এখন যা অবস্থা তাতে "আর্যরা বহিরাগত" এবং "ভারতীয় উপমহাদেশই আর্যদের আদি বাসভূমি"— এই দুই মতবাদের কোনোটার পক্ষেই অকাট্য প্রমাণ হাজির করা যাচ্ছে না। যা ছিল ইতিহাসের সত্য, তা এখন ইতিহাসের সমস্যা।[২] কিন্তু যা সত্য বলে প্রমাণিত নয়, তাকে জনসাধারণের মধ্যে "সত্য" বলে প্রচার করার চাইতে তাকে "সমস্যা" হিসাবে চিহ্নিত করা অনেক বেশি সমীচীন।

এখন আবার এই সমস্যাকে নিয়েও রাজনীতির খেলা চলছে। বেশ কিছু পণ্ডিতের ধারণা যে **ঋগ্বেদের** সংস্কৃতি সিন্ধু সভ্যতার পূর্ববর্তী এবং **ঋগ্বেদের** আর্য সভ্যতা, সিন্ধু সভ্যতা ও পরবর্তী সভ্যতা এক এবং অবিচ্ছিন্ন একটি ধারা। গ্রীক, শক, কুষাণ ইত্যাদি বহিরাগতরা এই ধারায় মিশে গিয়েছিল। এই ধারায় ব্যতিক্রম ইসলাম। সুতরাং ভারতীয় ইতিহাসে বহিরাগত উপাদান আর্যধর্ম নয়, বরং ইসলাম। যেহেতু ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি "একশৈলিক" (Monolithic) ইসলামকে ভারতীয় "সভ্যতার" সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে বা মিশে যেতে হবে।[৩]

এই মতবাদ কিন্তু একেবারেই সত্য নয়। ভারতীয় সংস্কৃতি বিভিন্ন সংস্কৃতির সমন্বয়— তার যেমন কতকগুলি সর্বভারতীয় চরিত্র আছে, তেমন অনেকগুলি স্থানীয় ও পরস্পর বিরোধী বৈশিষ্ট্যও আছে।

আলোচ্য বিতর্কে ইদানীংকালে এক নূতন মাত্রা যোগ করা হয়েছে। মনে করা হচ্ছে যে **ঋগ্বেদের** বিখ্যাত নদী সরস্বতী খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দ নাগাদ শুকিয়ে যেতে আরম্ভ করেছিল এবং আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ২০০০/১৯০০ অব্দে একেবারেই শুকিয়ে গিয়েছিল। সুতরাং বেগবতী সরস্বতীর কথায় ভর্তি **ঋগ্বেদের** রচনাকাল সিন্ধু সভ্যতার (আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩৬০০, বা প্রকৃতপক্ষে ২৬০০ বা ২৪০০ (?) থেকে ১৮০০ বা ১৭৫০ বা আরও পরবর্তী কোনো (১৫০০?) অব্দ) পূর্ববর্তী।[৪] এই মতের

সমর্থনে প্রত্নতত্ত্বের ও বিজ্ঞানের নানা শাখার তথ্যকে এমনভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে যা প্রকৃতপক্ষে সত্যানুসন্ধানের চাইতে সত্য গোপনের প্রয়াস বলে মনে হতে পারে।[৫] এই মত প্রচারকারীদের জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে যে সিন্ধু সভ্যতার আগেই সরস্বতী শুকিয়ে যেতে আরম্ভ করে থাকলে ঐ সভ্যতার বেশ কিছু কেন্দ্র এই নদীতীরে গড়ে উঠল কেন?[৬] এই বুনিয়াদী প্রশ্নের কোনো উত্তর দেওয়া হচ্ছে না।

ইতিহাসের নিজের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, কিন্তু অনেক ঐতিহাসিকরা, বিশেষত রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ঐতিহাসিকের এই বাধ্যবাধকতা আছে। এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে আর যাই হোক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে ইতিহাসের সত্যানুসন্ধান করা যায় না।[৭]

টীকা :

১. এই সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্যাবলীর জন্য দ্রষ্টব্য ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, **ইতিহাসের আলোকে আর্য সমস্যা**, কলিকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ১ ইত্যাদি।

২. ঐ

৩. ঐ; ডি. ফ্রাউলি, **দি মিথ অফ দি এরিয়ান ইনভেশন অফ ইন্ডিয়া**, দিল্লি, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৫, পৃ. ২৫; **দি পলিটিক্স অফ হিস্ট্রি— দি এরিয়ান ইনভেশন থিয়োরি এ্যান্ড দি সাবভার্সান অফ স্কলারশিপ**, নিউ দিল্লি, ১৯৯৫, পৃ. ১০ ইত্যাদি।

৪. নীচের টীকা নং ৬ দ্রষ্টব্য।

৫. টীকা নং ১ দ্রষ্টব্য।

৬. এই সম্পর্কিত তথ্যগুলির জন্য দ্রষ্টব্য **দি জিওগ্রাফিকাল জার্নাল**, ১৯৪২, পৃ. ১৭৩ ইত্যাদি; এইচ. সি. রায়চৌধুরী, **স্টাডিজ ইন ইন্ডিয়ান এন্টিকুইটিজ**, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, ১৯৫৮, পৃ. ১২৫-১২৬; **ইম্পিরিয়্যাল গেজেটিয়ার অফ ইন্ডিয়া**, খণ্ড নং ১২, অক্সফোর্ড, ১৯০৮, পৃ. ৩৬৮-৩৬৯; খণ্ড নং ২৬, **এ্যাটলাস**, অক্সফোর্ড, ১৯৩১, মানচিত্র নং ৩৪, ৩৬ ও ৩৮; পি. পুবেন্দ্রণ; **দি এ্যাটলাস অফ ইন্ডিয়ান স্টেটস**, মাদ্রাস, ১৯৯৫, মানচিত্র নং ১৫, ২৫, ২৬; ইস্টার্ন এ্যানথ্রপোলজিস্ট, খণ্ড নং ৪৫, পৃ. ৮৭-১০৩, ডি. এস. ওয়াকাঙ্কার; **লুপ্ত সরস্বতী নদী শৌধ** (হিন্দী), নাগপুর, ১৯৯২; ইত্যাদি।

৭. এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে সাম্প্রতিককালে চীনের পূর্বাংশের অন্তর্গত দক্ষিণ-পূর্ব মধ্য এশিয়ার (চীনা তুর্কিস্তানের) তারিম অববাহিকায় (Tarim basin) কিছু প্রয়োজনীয় প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী আবিষ্কৃত হয়েছে, যাদের সাক্ষ্য উত্তর-পূর্ব মধ্য এশিয়ার একাংশে ইন্দো-ইউরোপীয়দের (বা তথাকথিত আর্যদের) আদি বাসস্থান ছিল বলে ইঙ্গিত করে। এই সম্পর্কে দ্রষ্টব্য বি. এন. মুখার্জি; **কুষাণ স্টাডিজ : নিউ পারস্পেকটিভস** (কলকাতা, ২০০৪), পরিশিষ্ট নং ৩, "দি তারিখ মামিজ", পৃ. ৩৮১ ইত্যাদি।

রবীন্দ্র সাহিত্যের ভাষাতাত্ত্বিক ও সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক

রবীন্দ্র কাব্যগ্রন্থ নিয়ে সচরাচর যে ধরনের বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে আমাদের পরিকল্পনা তা থেকে পৃথক। গতানুগতিকভাবে রবীন্দ্রকাব্যে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ না করে রবীন্দ্রকাব্য ভাষার অবয়ব সংস্থানের ভৌত বিশ্লেষণই আমাদের লক্ষ্য। একাজে কম্পিউটারের সাহায্য নিয়ে ভাষাবিজ্ঞান ও সংখ্যাতত্ত্বের সূত্র অনুসারে রবীন্দ্রকাব্য ভাষার অবয়ব সংস্থান সম্পর্কে নানা তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং শেষপর্যন্ত অবয়ব-উপকরণের বিভিন্ন ছাঁচ অনুকরণের চেষ্টা করা হয়েছে। আমাদের আশা এই যে, রবীন্দ্রকাব্য ভাষার এবম্বিধ বিশ্লেষণ যদি চরিতার্থ হয় তবে হয়তো এই মডেলে অনুশীলন করে সাধারণভাবে বাংলাভাষার গবেষণারও একটি নতুন পথ খুলে যেতে পারে। এব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে অবলম্বন করার সুবিধা হলো, তাঁর কাব্যভাষায় বাংলা কাব্যভাষার সনাতন ঐতিহ্য ও উদীয়মান নবীন প্রবণতাগুলি একাধারে সমারিত হয়েছে।

এই গবেষণা পরিকল্পনায় আমাদের পদক্ষেপ গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থকে অবলম্বন করে। গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থ ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো। তিনি হলেন প্রথম এশিয় কবি যিনি নোবেল পুরস্কার অজন করেন অর্থাৎ তাঁর আগে এশিয়ার কোনো সাহিত্যিক বা কবি নোবেল পুরস্কার পাননি। সেই কারণে গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও গুরুত্ব অনুমান করে এই কাব্যগ্রন্থ বিশ্লেষণের কাজে আমরা হাত দিয়েছি। এই কাজে আমাদের আকর সম্পদ মূল কাব্যগ্রন্থ, Concordance বা (Key Words in Context) বর্ণানুক্রমিক শব্দ তালিকা ইত্যাদি।

এই পরিকল্পনা রূপায়ণে আমাদের সামনে যেহেতু কোনো পূর্বপ্রতিষ্ঠিত মডেল নেই, সেইজন্যে অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের তা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করে নিতে হয়েছে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে আমরা গতানুগতিকতাকে লঙ্ঘন করেছি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণতা ও সীমাবদ্ধতার সম্ভাবনাও থেকে গেছে। মূল বিশ্লেষণ শুরু করার আগে পাঠকদের আমরা এই সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবহিত রাখতে চাই। এই গবেষণা কার্যে ভাষাবিজ্ঞান ও রাশিবিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। উদ্দেশ্য, বিভিন্ন তথ্যের সমাহারে রবীন্দ্ররচনার রীতিবিচার। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে যে ভাষাতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে কাজ করা হয়েছে তা অবশ্যই সংগঠনমূলক (Structural)। তবে সংগঠনমূলক চিন্তনে অন্যতম ধারা বিবরণমূলক (Description) ঘরানা ও পদ্ধতি যেভাবে ভাষার স্তর বিভাজন করে, তাকে অনুসরণ করে ভাষা সংগঠনের প্রতিটি স্তর বিশ্লেষণ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে।

কনকরডান্স পাঠের নিয়মাবলী :

যেমন GTJ	পৃষ্ঠা সংখ্যা	যতি চিহ্নিত বাক্য
[Geetanjali]	053	05

'ওগো পথিক, আজকে আমার সকল পরান ব্যেপে....' অর্থাৎ বৈশাখ ১৩৮৮-র সংস্করণে এই

চয়নটি পাওয়া যাবে ৫৩ পৃষ্ঠার যতি চিহ্নিত পঞ্চম বাক্যে। উল্লেখ্য, কবিতা সংখ্যাকেও (৩৪) একটি যতি চিহ্নিত বাক্য ধরা হয়েছে।

গীতাঞ্জলিতে ব্যবহৃত মোট শব্দ সংখ্যা ১১,৩২১। এরমধ্যে সংস্কৃত ৫,৩৬১, বাংলা ৭,৫৬১, মিশ্র ১৫০ ও বিদেশি ৪১। শতকরা হিসেবে সংস্কৃত ৩১.৫ এবং বাংলা ৬৬.৮। রবীন্দ্রনাথ দেশি শব্দকে বাংলা বলেছেন, আমরাও তাই বলবো। কবিতার রচনাকাল হিসেবে আমরা মোটামুটি দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণে সর্বাধিক কবিতা লিখেছেন গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থের জন্য। রবীন্দ্র কাব্যগ্রন্থগুলি যে ক'খানা আমরা কম্পিউটারের মাধ্যমে গবেষণা করেছি তাতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নানা ধরনের তত্ত্ব ও তথ্য উঠে আসছে যা পাঠক সমাজকে বিচলিত করে। এ ধরনের গবেষণার সুযোগ পূর্বে হয়নি। ধরুন, যদি কমপিউটার আজও আবিষ্কৃত না হতো অথবা ভাষা সংস্কৃতির প্রয়োজনে কম্পিউটারকে ব্যবহার করার সুযোগ পাওয়া না যেত, যদি তা কেবলমাত্র অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করার জন্য প্রথম বিশ্বের হাতে থাকতো, তাহলে বিদ্বজন কম্পিউটার ব্যবহারের সুযোগ পেত না। যেমন আমাদের এতকাল ধারণা ছিল রবীন্দ্রনাথ তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন বেশি মাত্রায়; কিন্তু কম্পিউটার আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে তৎভব অর্থাৎ বাংলা শব্দের সংখ্যার উপরেই কবি জোর দিয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি। অর্থাৎ, বাংলা শব্দ যাতে কালে মহীরুহ হয়ে উঠতে পারে এই ছিল কবির আকাঙ্ক্ষা।

কবিতা রচনার স্থান-কাল

১৫৭টি কবিতার মধ্যে ৮৬টি কবিতায় কোনো স্থানের উল্লেখ নেই। অর্থাৎ কোথায় রচনা হয়েছে গীতাঞ্জলিতে তার কোনো উল্লেখ নেই। সর্বাধিক কবিতা লিখেছেন বোলপুর, শান্তিনিকেতনে, সংখ্যা হলো ২৬। নদীপথে, রেলপথে এমনকি কোলকাতায় ঠিকা গাড়িতে বসেও কবি গীতাঞ্জলির কবিতা রচনা করেছেন।

কবিতা রচনার স্থান-কাল-পাত্র এবং স্থান-কাল-পাত্র বাচক সমার্থক শব্দগুচ্ছের পরিসংখ্যা

কবিতাগুলির মধ্যে থেকে বিভিন্ন শব্দ ও শব্দগুচ্ছ সংকলন করে তাদের কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। যেমন,

১। জীবন (মানবজীবন, মানবমন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইত্যাদি)। যেমন— মাথা, চরণ, চোখের জলে, আঁখি, জীবন (মাঝে), হৃদয় (সভা), পায়ে, গায়ে, চিত্ত, চরণমূলে, করতলপুটে ইত্যাদি।

২। প্রকৃতি : যেমন— দ্যুলোক-ভূলোক, নদীর চরে, ধানের ক্ষেত, জোয়ার জলে, বিজুলি, বন, গিরি, পর্বত, ঢেউ, সন্ধ্যাগগন, ধরণীতে, শিশির ভেজা ইত্যাদি।

৩। রঙ : যেমন— বরণে, নীল, সাদা, শ্যামল, শ্বেত (শতদল), অরুণ রাঙা চরণ, নিকষঘন কালো, সোনার বরণ, নিবিড় নীল অন্ধকারে, অস্তরবির শেষ আলোটি ইত্যাদি।

৪। পশুপাখি : গীতাঞ্জলিতে পশু-পাখির বর্ণনা যৎসামান্য। যেমন— ভ্রমর, চখাচখি, মরাল, সিন্ধু পারের পাখি ইত্যাদি।

৫। বৃক্ষ-কানন-ফুল-ফল-লতাপাতা : যেমন— সন্ধ্যাবনের কুসুম, শতদল, কাশের গুচ্ছ, শেফালি মালা, আম্র মুকুল সৌগন্ধে, পল্লবে পল্লবে, পারিজাত, বনবনান্ত, বনলতা, কাননভূমি, নীপের বন ইত্যাদি।

৬। ঈশ্বর-আত্মীয়-বন্ধু-সুহৃদ-শুভার্থীবোধক : যেমন— বন্ধু, ভাই, জননী, বেদনাদূতী, প্রিয়তম, পরানসখা, পাগল, হৃদবিহারী, মাঝি, পিতা, আর্য, অনার্য, হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, পতি ইত্যাদি।

একটি তালিকার অন্তর্ভুক্ত কোনো চিত্রকল্প বা বিবরণ অপর একটি তালিকাভুক্ত হতে পারে। যেমন— রঙ-তালিকায় কয়েকটি ধারণা বা প্রতীতী অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যদিও কবিতার স্থান-কাল-পাত্র অংশটি ভাষা তাত্ত্বিক আলোচনার মধ্যে আসে না তবে তালিকা যখন প্রস্তুত কবা হয় তখন 'আচার্য সুকুমার সেন এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। তাঁর কথায়, "যাবতীয় আলোচনাই ভাষাতাত্ত্বিক গণ্ডির মধ্যে ধরে রাখতে হবে এমন মাথার দিব্যি কেউ দেয়নি।"

প্রতিটি শ্রেণীতে পরিসংখ্যা পাঁচের উর্ধ্বে এমন যে সমস্ত শব্দ বা চিত্রকল্প পাওয়া গেছে তাদের অধোক্রম তালিকা দেওয়া হলো। যেমন—

জীবন শ্রেণীতে	—	**পরিসংখ্যা**
মনে/হৃদয়/চিত্ত/হিয়া	—	৯৪
প্রাণ/পরান	—	৬৩
চোখ/আঁখি/আঁখিপাত/নয়ন	—	৩৭
প্রকৃতিশ্রেণীতে		
আলো/আলোক	—	৪৪
নীলাম্বর/আকাশ/গগন	—	৪০
তিমির/রাত/রাত্রি/নিশা/নিশি/নিশীথ		
রজনী/ধরা/ভুবন/ধরণী/বসুন্ধরা/	—	৩৮
বিশ্ব/ধরিত্রী/পৃথিবী		
বৃক্ষ-কানন-ফুল-লতাপাতা শ্রেণীতে		
কুঁড়ি/ফুল/পুষ্প/কুসুম	—	২৫
বন/কানন	—	১৬
শতদল/পদ্ম	—	৪
ঈশ্বর-আত্মীয়-বন্ধু-সুহৃৎ-শুভার্থীবোধক শ্রেণীতে		
প্রভু	—	১৮
বন্ধু/সখা/সখী/সাথী	—	১৮
ভগবান/বিধাতা/দেবতা/ঠাকুর/অন্তর্যামী		
ত্রিভুবনেশ্বর/রাজার রাজা/বিশ্বনাথ	—	১৩

আমাদের আলোচনায় দেশি শব্দ বাংলার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যেসব শব্দ সংস্কৃত রূপ তত্ত্বের নিয়মানুযায়ী হয়নি তা বাংলা বলে গণ্য হয়েছে। যেমন— জ্যোতি, মন ইত্যাদি। যেসব সংস্কৃত নামধাতু হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তাদের বাংলা ধরা হয়েছে। যেমন ঝঙ্কারো, ধ্বনিবে ইত্যাদি। মিশ্র শব্দ বলতে বোঝানো হয়েছে সংস্কৃত + বাংলা, বাংলা + সংস্কৃত; সংস্কৃত + বিদেশি ইত্যাদি। বিদেশি শব্দের মধ্যে ভারতীয় দ্রাবিড়, অস্ট্রিক ও ভোটবর্মী— এই চারটি ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয় এমন শব্দগুলিকেই বিদেশি শব্দের মধ্যে ধরা হচ্ছে। অনুসর্গ জাতীয় শব্দসমূহকে শব্দ শ্রেণীভুক্ত করা হয়নি।

এইভাবে অজস্র আলোচনার মধ্যে দিয়ে বাংলাভাষার একটি রূপ তৈরি করা হয়েছে।

গীতাঞ্জলি কাব্যগ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৯৪ সালে। এদেশে এ জাতীয় গ্রন্থ এই প্রথম। গীতাঞ্জলি ছাড়া অন্য কাব্যগ্রন্থ যেমন শৈশবসঙ্গী, বনফুল, কবিকাহিনী, সন্ধ্যা সঙ্গীত, প্রভাতসঙ্গীত, বলাকা, পলাতকা, পূরবী ইত্যাদি পঁচিশটিরও বেশি কাব্যগ্রন্থ কম্পিউটারে তোলা হয়। তাছাড়া গল্পগুচ্ছের তথ্যগুলি ১৯২৯ সাল পর্যন্ত আমরা গ্রহণ করেছি।

প্রথম পর্যায়ের কাজ টোকিওতে এক বছরে যতটুকু সম্ভব তা করা হলো। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ অর্থাৎ বিশ্লেষণ কোলকাতায় ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে করা হয়। এব্যাপারে জাপানের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের একটি চুক্তি হয়েছিল। এই চুক্তির ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রবীন্দ্র গবেষণা দুই দেশের মধ্যে এক যৌথ গবেষণার রূপ নিল।

তাছাড়া কোলকাতার একাধিক প্রবীণ ও নবীন ভাষাবিজ্ঞানী সংস্কৃত পণ্ডিত তাদের জীবনের সঞ্চিত জ্ঞান এই গবেষণাকার্যে ব্যবহার করেছেন। এটি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসাবে দেশের পণ্ডিত সমাজের কাছে তুলে ধরা হলো। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে আরও প্রবীণ ও নবীন গবেষক এই প্রকল্পে উৎসাহী হবেন।

[দ্রষ্টব্য : এই আলোচনায় যে বিষয়ের অবতারণা করা হলো তাই নিয়ে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে বিশদ গবেষণা করা হয়। আমি এবং আমার সহযোগী এক পূর্ণাঙ্গ গবেষক দল এই কাজে নিয়োজিত ছিলাম। সেই গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে একটি বই প্রকাশিত হয়। বইটির নাম গীতাঞ্জলি : ভাষাতাত্ত্বিক ও সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ।]

ভারতীয় মুসলমান সমাজে সংস্কার আন্দোলনের ধারা

মইনুল হাসান

যে কোনো সমাজে সংস্কার অত্যন্ত জরুরী। কোনো কোনো সময় তা অনিবার্য হয়ে পড়ে। সমাজ কোনো জড়বস্তু নয়। যে সমাজ জীবন্ত, বিকাশমান এবং নিত্যনতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত হচ্ছে— সে সমাজের কাছে সংস্কার আরও জরুরী। সমাজটা যাতে বদ্ধজলার মধ্যে পড়ে না যায় বা সমাজের অভ্যন্তরীণ গতি নষ্ট না হয় বা যে চিরায়ত দার্শনিক চিন্তা সমাজটি পরম আত্মীয়তায় ধরে রেখেছে তার সত্য আবেদনগুলি নষ্ট হয়ে না যায় তারজন্যও সংস্কার প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। যেকোনো সমাজের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে একটা অংশ ভ্রু-কুঁচকে উপরের দিকে তাকান। সবসময় মনে করেন খারাপ কিছু চালু করার চেষ্টা করা হচ্ছে। কেউ কেউ আবার সময়মত নিজেদের বদলে নিতে পারেন। কিন্তু একটা অংশ স্বার্থবাদী থেকে যান। নিজেদের জানাবোঝার বাইরে যেতে চান না। তাদের সংখ্যা কম নয়।

আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমান দু'টি ধর্মীয় সম্প্রদায় পাশাপাশি বাস করছেন শতাব্দীর পর শতাব্দী। প্রত্যেকটা সমাজই নিজস্ব গতিতে সংস্কারেব পথ দিয়ে গেছে। আজও তার খামতি নেই। আমরা যাকে এখন হিন্দুধর্ম বলে জানি— তাকে ঘিরে যে সমাজটা গড়ে উঠেছে— সেই সমাজটা গতিশীল হয়েছে সংস্কারের মধ্য দিয়েই। পুরাতন ধারণাগুলিকে বাদ দিয়ে সমাজটা এগিয়ে গেছে। তার পিছনে রয়েছে শিক্ষা, বুদ্ধির মুক্তি, প্রগতিশীল চিন্তার অনুপ্রবেশ। বহুমতের সমন্বয় সমাজে গতি আনতে পারে। হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ, মেয়েদের পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকার, সতীদাহ প্রথা একসময় সমাজের অগ্রগতিকে আটকে দিচ্ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায়, মহাত্মা ফুলে- এদের মূল কাজটা ছিল— যে ধর্মীয় দার্শনিক চিন্তাকে ভিত্তি করে সমাজটা গড়ে উঠেছে তাকেই ভিত্তি করে প্রগতির কথাগুলোকে বিচার বিশ্লেষণ করা এবং প্রকৃত সত্য মানুষের কাছে তুলে ধরা। এগুলো কোনো ব্যক্তির কাজ ছিল না। সামগ্রিক প্রক্রিয়াটার পিছনে বহুমানুষের সমর্থন আন্দোলন আকার না থাকলে পুরো প্রগতির মনোভাবটা সমাজে গ্রহণীয় হতে পারে না। এক্ষেত্রে সবচাইতে বড় প্রয়োজন শিক্ষার। বিদ্যাসাগর মশায়ের কৃতিত্ব সেখানেই। সবার শিক্ষার সঙ্গে নারীশিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। সেখানেই থেমে থাকেননি, সহজলভ্য বই লিখেছেন, ছাপাখানা তৈরি করেছেন, জেলায় জেলায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। বিদ্যাসাগরের সংস্কার আন্দোলনটি ছিল সামগ্রিক অর্থে সংঘবদ্ধ। কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে নয়। শিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দু সমাজ-এর একটা বড় অংশ তাঁকে মেনে নেয়নি। অসুস্থ বিদ্যাসাগরের বাড়ির সামনে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে মিছিল হয়েছে। শ্লোগান হয়েছে 'বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিররুগী হয়ে।' বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানকে এমনতর ঘটনার করুণ সাক্ষী হতে হয়েছে। জ্যোতিবা ফুলে, মহারাষ্ট্রে একজন মহান সংস্কারক ছিলেন। তিনি ধর্মীয় বৈষম্যের বিরুদ্ধে ডাক দিয়েছিলেন এবং স্ত্রী শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে প্রচার করেছিলেন। তিনি বিপুল বিরোধিতার মধ্যে পড়েছিলেন এবং সমাজে একঘরে হবার মুখে পড়েছিলেন। তাঁর সময়ে প্রায় সমস্ত সমাজই বর্ণভেদ ব্যবস্থার পক্ষে দাঁড়িয়ে ছিল আর এই ব্যবস্থাকে চিরস্থায়ী করার একটা কায়েমি স্বার্থও ছিল

বর্ণহিন্দু নেতাদের। কায়েমি স্বার্থবাদীরা সমগ্র সমাজটিকে বদ্ধজলা করে ফেলেছিলো, মহাত্মারা তাদের হাতে সবকিছু সঁপে দিতে বাধ্য ছিলেন না। এই বাংলার শ্রী চৈতন্যদেবের কথা আমি নানা প্রসঙ্গে বলে থাকি। ব্রাহ্মণ্যবাদের তুমুল চাপাচাপিতে হিন্দু সমাজের যখন নাভিশ্বাস উঠেছিল। তখন বাংলায় শ্রী চৈতন্যের আগমন। ছোট্ট কয়েকটি কথা বলেছিলেন মাত্র। তারমধ্যে সবাই যদি ভগবানের সৃষ্টি হয় তাহলে ভগবানকে ডাকার এবং তার মন্দিরে যাবার ক্ষমতা সবার আছে। এই লোকায়ত আবেদন হিন্দু সমাজে এক ঝলক সতেজ বাতাস ঢুকিয়ে দেয়। একটার পর একটা এমন ধারা আন্দোলন বা কার্যকরী পদক্ষেপ হিন্দু সমাজকে সংস্কারমুখি করেছে। ভালো-মন্দ মিশিয়ে এগিয়ে চলেছে হিন্দু সমাজ।

আমাদের মূল আলোচনা মুসলমান সমাজ নিয়ে। মুসলমান সমাজে সংস্কারের কথা বললে হৈ হৈ রৈ রৈ পড়ে যায় বিভিন্ন মহলে। সকলকে ঠান্ডা মাথায় সামগ্রিক বিষয় ভাববার জন্য বলবো। ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার দুটো আলাদা বিষয় এটা অনেকে মানতে চান না। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের কাছে রাষ্ট্র, ধর্ম, প্রশাসন প্রাত্যহিক জীবনচর্চা সব কিছুই একই মাত্রাতে আবর্তিত হয়। ফলে সমাজসংস্কারের কতকগুলো বিষয় ধর্মসংস্কার বলে অনেকের মনে হয়। আসলে স্বার্থান্বেষীরা ধৈর্য্য ধরে বিষয়গুলো ভাবতে চান না।

ইসলাম ধর্মের একটা বড় সুবিধা হচ্ছে— এটি একটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ের ধর্ম। সমাজ জীবনের বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এই ধর্মে চর্চা করা হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যেহেতু ইসলাম নানাভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, তার ফলে রাষ্ট্রপরিচালনা, কূটনীতি, পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি নিয়েও মহান ধর্মগ্রন্থে আলোচনা হয়েছে। যে কোরান মজীদকে কেন্দ্র করে সমগ্র ধর্মটি কেন্দ্রভূত হয়েছে, সেই গ্রন্থ একদিনের রচনা নয়— বহুদিন ধরে অবতীর্ন হয়েছে। ফলে সমাজ, রাষ্ট্রজীবন ইত্যাদি বহুবিষয় তারমধ্যে সন্নিবেশিত হয়েছে। সামগ্রিক সুবিধাগুলি খানিকটা আলোচনা করা যেতে পারে। আমি বহুবার অনেক আলোচনাতে বলেছি যে, মুসলমান সমাজের দুর্ভাগ্য যে এই সমাজে বিদ্যাসাগর বা রামমোহন জন্ম নেননি। অনেকে বলেছেন যে, মুসলমান সমাজে নাকি তার কোনো প্রয়োজন ছিল না? কারণ বিধবা বিবাহ অথবা সতীদাহপ্রথা মুসলমান সমাজে কোনোদিন সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়নি। হায়! বিদ্যাসাগর। তোমাকে কেবল বিধবাদের জন্যই জন্মাতে হয়েছিল? আজ বিতর্কের প্রয়োজন নেই। সহজ সত্যকথা বলতে চাই যে, রামমোহনের আমল থেকে ভারতীয় মুসলমান সমাজে সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়েছে। কিন্তু আন্দোলনটি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে— পূর্ণ গতি পায়নি। ইসলাম ধর্মের প্রগতিশীল, মানবিক, সামাজিক আন্দোলনগুলি চর্চিত হয়নি। যদি তা হতো তবে এই সমাজ এগিয়ে যেতে পারতো একটা বড় উচ্চতায়। আসলে তা কিন্তু হয়নি। সারা পৃথিবীতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ভৌগলিক সীমানা পেরিয়ে ইসলাম রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজজীবন, দর্শন চিন্তা, প্রগতির পক্ষে আলো ছড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু এখন সেটা অন্তর্হিত। তার অনুসন্ধান মুসলমান সমাজের অগ্রবর্তী অংশকেই করতে হবে। কোরান-হাদীসের শিক্ষা নিয়ে একদিন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে আলোয় ভাস্বর হয়ে উঠেও আজ পরিস্থিতি এত নিষ্প্রভ কেন? নিশ্চয় শিক্ষাগুলি প্রয়োগের ক্ষেত্রে ত্রুটি দেখা যাচ্ছে। আমাদের মুক্ত বুদ্ধির বিকাশ ঘটিয়ে বিষয়গুলি ভেবে দেখতে হবে। সারা পৃথিবীতে প্রায় ৫০টি ছোট বড় দেশ আছে যাদের রাষ্ট্রের ধর্ম ইসলাম অথবা মুসলমানরা সংখ্যাধিক্য। ২০০২ সালে ইউ এন ডি পি কেবলমাত্র মুসলিম দেশগুলির উপর মানবোন্নয়ন রিপোর্ট তৈরি করেছিল। চিত্রটি অত্যন্ত ভয়াবহ। প্রায় কোনো দেশে গণতান্ত্রিক সরকার নেই। ২-১টি জায়গায় যা আছে তা অত্যন্ত বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা। কি বিপদ ইসলামের সামনে ভাবুন? যে ধর্ম গণতন্ত্রের ধ্বজা উর্ধ্বে তুলে ধরেছিল। হজরত মহম্মদ (দ:) যিনি জীবিত অবস্থায় তার উত্তরাধিকারি ঠিক করে যাননি। সেটা তুলে দিয়েছিলেন তার 'সাহাবা'দের হাতে।

সেই ধর্মের পরিচালিত রাষ্ট্রের কি দুর্দশা। যে ধর্ম শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে বার বার। সেই ধর্মের নামে পরিচালিত রাষ্ট্রগুলিতে উপেক্ষিত হচ্ছে আধুনিক শিক্ষা। দেশগুলির কোথাও বৈভব বা প্রাচুর্যের অভাব নেই। কিন্তু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য দরজা প্রায় বন্ধ। জ্ঞানের আকর গ্রন্থগুলি যেখানে ধূলায় মণ্ডিত। পুরাতন ঐতিহ্যগুলি যেখানে অপাংক্তেয় হয়ে পড়েছে। মুসলিম সমাজকেই তার জবাব দিতে হবে এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারের রাস্তায় যেতে হবে। যে শিক্ষা একদিন আলো দেখিয়েছে তাকে গ্রহণ করতে হবে মনেপ্রাণে। তাকে ভিত্তি করেই, মর্য্যাদা দিয়েই আধুনিক হয়ে উঠতে হবে। এ অস্বীকার করার উপায় নেই আর বিকল্পও নেই।

সারা ভারতের প্রেক্ষাপটে কয়েকজন উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের কাজ কিছুটা হলেও আলোচনা করা প্রয়োজন। অন্তত একথাটা প্রমাণিত হবে যে মুসলমান সমাজ একেবারে অনড় এবং 'আনপড়' থাকার চেষ্টা করেনি। স্যার সৈয়দ আহমেদ-এর নাম আমার কাছে খুবই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়েছে। স্যার সৈয়দ ভারতীয় মুসলমান সমাজের মধ্যে কিছু সংস্কারের প্রস্তাব এনেছিলেন। সেই সময় (১৮১৭-১৮৯৮) মুসলমান এলিটদের মধ্যে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রচারের ব্যাপারে সবচাইতে বড় প্রবক্তা ছিলেন তিনি। তার মতামত ও চিন্তাভাবনা প্রকাশ করার ব্যাপার তিনি উর্দুতে 'আহ্জিব-আল-আখলাব' বলে পত্রিকা প্রকাশ করেন। পশ্চিমী বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার প্রতি তিনি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। ঘনিষ্ট সহযোগীদের নিয়ে তিনি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাবলী দেশজ ভাষায় প্রকাশ করেন, মুসলমানদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তার বিকাশের স্বার্থে। স্যার সৈয়দ তাঁর বিভিন্ন লেখাতে ও বক্তৃতাতে উল্লেখ করেছেন যে, ঈশ্বরের উৎকীর্ণ বাণীর সঙ্গে ঈশ্বর সৃষ্ট এই প্রকৃতিকে নিয়ে বিজ্ঞান চর্চার কোনো বিরোধ নেই। স্যার সৈয়দ আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাঁর চিন্তাতে ব্যক্ত করেছিলেন যে ঈশ্বরের বাণীর মূলবয়ান এবং ভাষ্য ও টীকার মধ্যে পার্থক্য বুঝতে হবে। মূল বয়ান পবিত্র কিন্তু টীকা ও ভাষ্য তা নয়। তার বক্তব্যের সমর্থনে তিনি কোরান ও গ্রীক এ্যাস্ট্রোনমি থেকে একটি জরুরী বিষয় আলোচনা করেছিলেন। মুসলমান টীকাকাররা গ্রিক মহাকাশ বিদ্যাকে স্বীকার করতেন এবং কোরানের ভাষ্যের সঙ্গে গ্রিক এ্যাস্ট্রোনমির নিয়মগুলোকে প্রতিফলিত দেখে এটাকেও মৌলিক ধর্মশাস্ত্র হিসাবে মান্য করতেন। ক্রমে ক্রমে এবং প্রায় সবার অজান্তে কোরানের দু'টি বাণীর ব্যাখ্যা এবং গ্রিক মহাকাশ বিজ্ঞানের নীতিগুলি একাকার হয়ে যায়। স্যার সৈয়দ আহমেদ এই প্রক্রিয়াটির বিরোধিতা করেছিলেন। সেদিন সবাই তাঁর মত প্রত্যাখ্যান করেছিল। কিন্তু আজ তাঁর কথাই সত্য প্রমাণিত হয়েছে। গ্রিক মহাজাগতিক বিষয় কেউ আর উল্লেখ করে না। কোরান যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেছে। মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে তিনি সর্বাধিক কাজ করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে মুসলমান সামন্ততান্ত্রিক আধিপত্যবাদী বুদ্ধিজীবীরা রুখে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু সব বাধার চ্যালেঞ্জ তিনি গ্রহণ করেছিলেন।

স্যার সৈয়দ পাশ্চাত্য ভাবধারায় অত্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন বৌদ্ধিক দিক দিয়ে প্রাচ্যের চাইতে পাশ্চাত্য অনেক বেশি এগিয়ে এবং উন্নতমানের। তিনি চাইতেন ভারতের মুসলমানরা এই শিক্ষা ও চিন্তার সমকক্ষ হবার চেষ্টা করুক। কিন্তু সেটা এমন সময় ছিল যে, পুরাতনপন্থী অগ্রসর অংশও এটা মেনে নিতে পারছিল না। কারণ তারা মনেই করেছিলেন যে, মুসলমানদের কাছ থেকে রাজ্যপাট ইংরাজরা নিয়ে নিয়েছে সুতরাং তাদের সঙ্গে কোনো সহযোগিতা চলতে পারে না। উলেমারাও ধর্মীয় উত্তরাধিকারের দিক দিয়ে ইংরেজদের ঘৃণা করতেন।

রামমোহনের মতো তিনিও ভারতীয়দের রাজভক্ত করার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। স্যার সিপাহী বিদ্রোহের বিরোধিতা করেন। রামমোহন নীলকরদের পক্ষে দাঁড়িয়ে ইংরাজদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ

প্রশমনের চেষ্টা করেছিলেন। স্যার সৈয়দ ১৮৬৯ বিলাতে যান। ফিরে এসে Mohamedan Social Reform বলে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। স্যার সৈয়দ ১৮৭৩ সালে আলীগড়ে মুসলিম অ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজের সূচনা করেন। বিলেতে থাকাকালীন তিনি ২টি পুস্তক রচনা করেন। তার মধ্যে একটি হজরত মহম্মদের (স:) জীবনী। এখানে তার যুক্তিধর্মিতার প্রাধান্য গোঁড়া মুসলমানদের ক্ষুব্ধ করেছিল। মক্কায় ধর্মগুরুরা তাকে ধর্মত্যাগী বলে ঘোষণা করেন। তাকে যেসব হুমকি দিয়ে চিঠি দেওয়া হতো তার একটার বয়ান হলো— 'লর্ড মেয়োর হত্যাকারী শের আলী একটা আহাম্মকের মতো কাজ করেছে— সৈয়দ আহম্মদকে খতম করে সেতো অনায়াসেই অক্ষয় স্বর্গবাসের ব্যবস্থা করতে পারতো।'

ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষকে তিনি 'দারুল-ইসলাম' আখ্যা দিয়েছিলেন। যেটা সেই সময় একটা দারুণ প্রগতিশীল চিন্তা ছিল। যার আধার ছিল ধর্মনৈতিক। হজরত মহম্মদ (দ:) যে প্রেরিত পুরুষ ছিলেন এবং কোরান শরিফ যে প্রত্যাদিষ্ট সেটা তিনি বিশ্বাস করতেন। এ সত্ত্বেও, কোরান ও হাদিসের মর্মোপলব্ধির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিচার ও ব্যাখ্যা এবং যুক্তি প্রয়োগের আবশ্যকতার উপরে তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তারপর একথাও জোর দিয়ে বলেছেন, ধর্মের মূল নীতি ও নির্দেশসমূহ প্রকৃতির বিধানসম্মত হওয়া দরকার। ধর্মজীবনে এই যুক্তি প্রয়োগের আবশ্যকতা নির্দেশ করে সৈয়দ তার চিন্তাধারার প্রগতিশীল রূপ চিরস্থায়ী করে রেখে গেছেন।

স্যার সৈয়দ সম্পর্কে আরও অনেক কথা বলা যায়। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর বহু মতামতের সঙ্গে একমত নই। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা, বিজ্ঞান চিন্তার প্রসার, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে তাঁর বস্তুনিষ্ঠ মনোভাব মুসলমান সমাজকে শুধু নয় ভারতীয় জনগণকে আলোড়িত করেছে। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নতা ও হত্যার হুমকি থাকা সত্ত্বেও তিনি অনড় ছিলেন। আজ আলীগড় কলেজের অবস্থান আমাদের সবাইকে গর্বিত করে। কিন্তু স্যার সৈয়দ এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে মুসলমান সমাজের যোগাযোগ নিবিড় করতে পেরেছিলেন। স্যার সৈয়দকে আর একটি কারণে কেউ ভুলবে না সেটা হলো উর্দু ভাষাকে তিনি সহজ করে জনগণের ভাষাতে রূপ দিয়েছিলেন, আর মানুষের জীবনের স্তরে নামিয়ে এনেছিলেন।

আর একজন বদরুদ্দিন তায়েবজি। তখন সদ্য গঠিত জাতীয় কংগ্রেসের তিনি সভাপতি হয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন ভারতীয় মুসলমানরা জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিক। স্যার সৈয়দ তা চাইতেন না। দু'জনের মতের অমিল ছিল অনেক। কিন্তু একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ১৮৮৮ সালে ১৮ ফেব্রুয়ারি তায়েবজি স্যার সৈয়দকে একটা চিঠি লেখেন। তাতে বলেন 'আমি জানি, আমরা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে বিষয়গতভাবে পরস্পর বিরোধী মত পোষণ করি। তা সত্ত্বেও এই চিঠি লেখার উদ্দেশ্য হলো মহান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে বসবাসকারী মুসলমান সমাজের সার্বিক উন্নতির লক্ষ্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে এবং কী কী উপায়ে আমরা যুক্তভাবে কাজ করতে পারি তা নির্ধারণ করা।' সহজেই বোঝা যায় এই মহান ভারত সন্তান সংখ্যালঘু মসলমানদের আলোর দিকে টেনে আনতে কতখানি আন্তরিক ছিলেন। তায়েবজির মনোভাব কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্যার সৈয়দের চাইতে এগিয়ে ছিল। তিনি মুসলমানদের প্রতি বলেছিলেন, তোমরা যে সমস্ত বিষয়ে হিন্দু ভাইদের সঙ্গে একমত হবে তা নিয়ে এক সঙ্গে কাজ করো। আর যেগুলো তোমাদের কাছে অনিষ্টকর মনে হবে সেগুলো তীব্রভাবে বিরোধিতা করবে। তার অভিমত ছিল, এটা হলেই ভারতের অগ্রগতি নির্দিষ্ট হবে। ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার তিনি অন্যতম প্রবক্তা ছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কোনো ধর্মের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, সেটা ছিল তায়েবজির অন্যতম শিক্ষা। তায়েবজির সমাজসংস্কারের শিক্ষা তখনকার বোম্বাই শহরে বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছিল।

হাজী শরিয়তউল্লাহ বাংলার মুসলিম সমাজে কৃষক ঘরের সন্তান। তিনিও মুসলমান সমাজের বহুবিধ সংস্কারে এগিয়ে আসেন। তাঁর কাজ ছিল ১৮১৮ থেকে ১৮৪০ পর্য্যন্ত। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন দুঃখ-দুর্দশা তিনি নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন। এইরকম বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং বিদেশ ভ্রমণের ফলে অর্জিত জ্ঞান নিয়ে, দুরদৃষ্টি সম্পন্ন এই সংস্কারক গ্রামেগঞ্জে জনসাধারনের দুঃখ দূর করার জন্য ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে কোম্পানী কর্তাদের সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার তিনি দেখেছেন, আইনের নামে, প্রশাসনিকবলে, নব্য জমিদারদের যে অত্যাচার তিনি দেখেছেন। সামগ্রিক এই অধঃপাতের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি জাগতিক কর্মকাণ্ড বাদ দিয়ে ধর্মপ্রচারের কাজে তিনি যোগ দেন। দ্বিতীয়বার মক্কা থেকে ফিরে আসার পর তিনি 'ফরায়জী আন্দোলন' আরম্ভ করেন। আসলে ফরায়জী আন্দোলন ছিল আরবের ওহাবী আন্দোলনের কিছু পরিবর্তিত রূপ। আরবের ওহাবী আন্দোলনের প্রভাবে সারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে তখন অনেকগুলি সংস্কার আন্দোলন মাত্রা চাড়া দিয়ে ওঠে। উত্তর আফ্রিকার সনুসী আন্দোলন, মিশর ও সিরিয়ার সলদী আন্দোলন, সুদান থেকে নাইজেরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার ফুলানী আন্দোলন, বাংলার ফরায়জী আন্দোলন, উত্তর ভারতের তরিকায় মহম্মদীয়া ও আহলে হাদীস আন্দোলন, ইন্দোনেশিয়ার পান্দুরী ও মুহাম্মদীয়া আন্দোলন।

আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মুহম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব-এর উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের ব্যক্তিজীবনে এবং পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের মৌলনীতি প্রতিষ্ঠা করা। তারই অনুসারী আন্দোলনগুলির উদ্দেশ্য তাই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ওয়াহাবী ভাবধারা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে মান্য করা অসুবিধা নয়। সমস্যা দেখা দিল সামাজিক ও রাষ্ট্রজীবনে। কারণ, রাষ্ট্রের ধর্ম নেই ভারতবর্ষের মতো বেশিরভাগ জায়গায়। সেখানে ইসলামের মৌলনীতি প্রয়োগের কী হবে? তখনই আসবে মুক্ত চিন্তার বিষয়। তখনই প্রশ্ন এসেছে সামাজিক সংস্কারের। তাকে বাদ দিয়ে চলা সম্ভব নয়। হাজি শবীয়তউল্লাহ মুসলিম সমাজের মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন।

আর একজনের কথা কিছুটা বলা প্রযোজন। মৌলভী নিসার আলী। তিতুমীর। সৈয়দ আহমদ বেরিলভী-প্রবর্তিত সংস্কার আন্দোলন এবং জেহাদ সম্পর্কে তার মতামত বাংলাতে একসময় প্রবল সমর্থন পেয়েছিল। বাংলায় এই আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন তিতুমীর। মক্কা থেকে ১৮২৯ সালে ফিরে এসে তিনি ধর্ম সংস্কারের কাজে মন দেন। তিতু'ব অনুগামীরা নিজেদের মতামত সম্পর্কে অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন। মুসলমান সমাজে পীরমানা, মাজার তৈরি করা, মৃতের উদ্দেশ্যে কিছু নিবেদন করা, মহরম উৎসবে যোগ দেওয়া নিষিদ্ধ করার আন্দোলন শুরু করেন তিতুমীর। তিতুমীরের মূল অভিপ্রায় ছিল প্রচলিত ইসলাম ধর্মের সংস্কারসাধন। কিন্তু জমির সঙ্গে যুক্ত দরিদ্র মানুষ সংগঠিত হচ্ছিলেন বলে জমিদাররা ভয় পেয়ে অত্যাচার শুরু করেন। ঘটনাচক্রে বাংলাতে মোটা দাগে বিষয়টা ছিল এমনই যে, জমিদাররা ছিল হিন্দু আর খেতমজুররা ছিল মুসলমান। এই লড়াইতে সাম্প্রদায়িক মনোভাবও ছড়িয়ে পড়ে।

ভারতের মুসলমান সমাজের মধ্যে সংস্কারমুখীন কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করলাম এই কারণে যে, যখন হিন্দু জনগণের মনে সংস্কার আন্দোলন তুঙ্গে, রামমোহনের দেখানো পথেই ব্যতিক্রমী অর্থে নবজাগরণের সূচনা হয়েছে। সমস্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য ধর্মের চাইতে তুলনামূলক আধুনিক ধর্ম হলেও মুসলমান সমাজ তা থেকে বিশেষ কার্যকরী লাভ তুলতে পারেনি। তার একটা প্রধান কারণ হলো সমাজের যে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত অংশটা সংস্কার আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তাদের

অভাব। মাতৃভাষায় শিক্ষা, ইংরাজি শিক্ষা দীর্ঘদিন এই সমাজে উপেক্ষিত থাকার ফলে এটা হয়েছে। আর একটা সমস্যা অথবা জটিলতা হলো যেকোনো ধর্ম বা সমাজসংস্কারের কথা আমাদের দেশে বলা হয়েছে ধর্মের চৌহদ্দি'র মধ্যেই। এই দেশে আপামর জনসাধারণের উপর ধর্মের প্রভাব অস্বীকার করার উপায় নেই। বিদ্যাসাগরমশাইকেও শাস্ত্র খুঁজে দেখাতে হয়েছে যে বিধবা বিবাহ অবৈধ নয়, রামমোহন বলেছেন সতীদাহ প্রথা শাস্ত্রসম্মত নয়। কিন্তু মুসলমান সমাজ যদি কোরান ও হাদিসের প্রকৃত শিক্ষাগুলিই মান্য করে চলতো তাহলে অগ্রগতির কোনো অসুবিধা ছিল না। একটা পর্ব পর্যন্ত পৌছাতে পারলে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা, ব্যক্তি স্বাধীনতার কথাগুলো নিয়ে আলোচনা করা সহজ হতো। যা আজকের সমাজে, একবিংশ শতাব্দীতে আর অপেক্ষা করার সময় নেই। যেকোনো আলোচনা এবং পর্যালোচনাকে ধর্মবিদ্রোহী বলে আখ্যা দেওয়া সহজ হয়ে যাচ্ছে ভারতীয় মুসলমান সমাজে। একাংশের সামন্ততান্ত্রিক আধিপত্যবাদীরা এব্যাপারে অগ্রণী। কিন্তু ইসলামের মূলনীতিগুলি যদি ভারতীয় মুসলমান সমাজ কার্যকরী করে তাহলে একটা পর্যায় অতিক্রম করা যাবে। আধুনিক শিক্ষা, বিজ্ঞান প্রযুক্তি গ্রহণ ইত্যাদিতে বাধা কোথায়? এছাড়াও সমাজ এগিয়ে যাবার স্বার্থে আরও কিছু সিদ্ধান্ত মুসলমান সমাজকে নিতে হবে। কোনো বিকল্প নেই।

ভারতীয় মুসলমান সমাজে সংস্কারের কথা বলতে গিয়ে একটি বই বিষয়ে কয়েকটি কথা না বললে ঠিক করা হবে না। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহর পর, হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ শক্তি যখন ইংরেজের কাছে বিপজ্জনক হিসাবে দেখা দিয়েছে সেই সময় ভাইসরয় লর্ড মেয়ো'র নির্দেশে এক ব্রিটিশ রাজকর্মচারী, ডব্লু ডব্লু হান্টার লিখলেন 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' (১৮৭১)। স্যার সৈয়দ এই পুস্তকের তীব্র সমালোচনা করেন। বইতে মুসলিম সমাজের করুণ সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থানের কথা আলোচিত হয়। এর কারণ হিসাবে ব্রিটিশ শাসনের কঠোরতা ও অদূরদর্শিতাকে দায়ী করা হয়।

হান্টারের বইটির তথ্যাবলী সবই বাংলা থেকে গৃহীত। একপেশে। অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়ে যাওয়া বইটি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা যায়। প্রথমত শিক্ষা ও চাকুরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিশেষ সুযোগ দেওয়ার নীতির সমর্থন হান্টারের বক্তব্যে আছে। বইটি লেখা শেষ হবার মাত্র তিনদিন আগে লর্ড মেয়ো একটি ঘোষণা করেন মুসলমানদের বিশেষ সুবিধা শিক্ষা ও চাকরী সম্পর্ক এবং উচ্চবর্ণীয় মুসলমানদের এটা অপব্যবহার না করতে বলেন। দ্বিতীয়ত, নষ্টগৌরব ও শক্তি পুনরায় ফিরে পাওয়া ও সরকারি সাহায্যে বিশেষ সুযোগ প্রত্যাশী মুসলিম হান্টার অঙ্কিত নিপীড়িত ও দুঃসহ মুসলমানের চিত্রে বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করে ভারতবর্ষব্যাপী মুসলমানদের এই কল্পিত বিবরণ পরবর্তীকালের শিক্ষিত মুসলমান সমাজের সাম্প্রদায়িক আন্দোলনেরও বীজমন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়।

ভারতের অন্যান্য প্রান্তে মুসলমানদের অবস্থা কিছুটা উন্নত ছিল। যদিও সামাজিক সংঘাতগুলিতে তারাও আলোড়িত হচ্ছিল। উত্তর প্রদেশের তালুকদার ও সরকার-পদভোগী, পাঞ্জাবের ভূম্যধিকারী, পশ্চিমভারতের জাহাজী, ইত্যাদি অংশ ব্রিটিশ শাসনেও নিজেদের কিছুটা রক্ষা করতে পেরেছিল। বাংলা ছিল এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর সামরিক পদের ক্ষেত্রে মুসলিম একাধিপত্য একেবারে তলানিতে ঠেকে যায়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমান জমিদারের সংখ্যা কমে যায়। কারণ তাদের হাতে নগদ টাকা ছিল না। ১৮৩৭ সালে সরকারি কাজে ইংরাজি ভাষার প্রবর্তনের ফলে, সরকারি কাজে শিক্ষিতের অধিকার স্বীকৃত হওয়ায় (১৮৪৪), বিচার ও আইন বিভাগেও মুসলমানদের যে একাধিপত্য ছিল সেটা নষ্ট হয়ে যায়। ১৮৫১ সালে কলকাতায় হিন্দু ও খ্রিস্টান উকিলের সংখ্যা কম মুসলমানদের চাইতে। ১৮৫২ থেকে ১৮৬৮ সালে হাইকোর্টে নতুন কোনো মুসলমান উকিল নথিভুক্ত হয়নি। চাকুরি ও বৃত্তি উভয়ক্ষেত্রেই উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমানদের চরম অবনতি

লক্ষ্য করা গেছে। ১৮৫৬ সালে ৫০ টাকা বা তার বেশি বেতনের সরকারি চাকুরিতে ৩৬৬ জন দেশী কর্মচারির মধ্যে মাত্র ৫৪ জন ছিলেন মুসলমান।

উনিশ শতকের তিনজন সংস্কারপন্থী মুসলমান নেতার কথা উল্লেখ করতে হবে। যারা প্রায় একই সময়ে কাজ করেছেন। সৈয়দ আমির আলি (১৮৪৯-১৯২৮) নবাব আব্দুল লতিফ (১৮২৪-১৯১৩) ও দেলওয়ার হোসেন আহমদ (১৮৪০-১৯১৩)। নবাব আব্দুল লতিফ ব্যবহারিক প্রয়োজনে ইংরাজি শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। এ ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন। কিন্তু সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ঘোর রক্ষণশীল। তারই জোর পীড়াপীড়িতে এদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা সম্প্রসারণ হয়। আব্দুল লতিফ মুসলমান সমাজের গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতার সঙ্গে আপোষ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সৈয়দ আমির আলি চিন্তার দিক দিয়ে অনেক প্রগতিশীল ও সংস্কারপন্থী ছিলেন। তিনি ইংরেজি শিক্ষার জোর সমর্থক ছিলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা তুলে দিয়ে মুসলমানদের জন্য ইংরেজির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আধুনিক ও কারিগরী বিদ্যা শিক্ষা প্রচলনের জন্য সুপারিশ করেছিলেন। ধর্ম চিন্তার ক্ষেত্রেও আমির আলি ছিলেন খানিকটা প্রগতিশীল ও সংস্কারপন্থী। তিনি হাজার বছর আগে মুসলমান উলেমাদের দ্বারা ব্যাখ্যা করা ইসলামি আইন ও অনুশাসনকে নির্বিচারে গ্রহণ না করে সমকালীন যুগের প্রয়োজনে এবং যুক্তির আলোকে ইসলামের চিরন্তন মর্মবাণীকে গ্রহণ করার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রকৃত অর্থে আমির আলী ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদের আলোকে ইসলাম ও তার অনুশাসনকে ব্যাখ্যা ও পুর্ণমূল্যায়ন করেছেন। কিন্তু ইসলামের কোনো কোনো অনুশাসন ও বিধি সমকালীন যুগের প্রয়োজনে পরিবর্তন করা উচিত সে সম্পর্কে কোনো উক্তি তিনি পরিষ্কারভাবে করেননি। তাঁর কাজে এটাই ছিল সীমাবদ্ধতা।

কিন্তু হুগলি জেলার অধিবাসী এখন প্রায় বিস্মৃত দেলওয়ার হোসেন-এর মতামত ছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠ। ১৮৬১ সালে তিনি কলকাতা থেকে স্নাতক। খুব সম্ভবত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এই উপমহাদেশের মধ্যে তিনিই প্রথম মুসলমান স্নাতক। তিনি মনে করতেন যে, যে অনুশীলন ও বিধি প্রত্যক্ষভাবে ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে যুক্ত নয়, সেগুলো পাল্টাতে হবে, প্রয়োজনে তা বর্জন করতে হবে। তাঁর একটা বক্তব্য ছিল—

When we see how the business of banking facilities commence and how it unders possible of creation of new trades and industries, it becomes apparent how amongst Mohammadans the connection of religious purely so called with subject altogether foreign to it—with criminal law, laws of inheritence, law of property, law of contacts, laws of begnests has acted most injuriously on their material interests... we have suffered mentally and morally as well as in our worldly print of veiw from the connection of our Religion with law.

এই পরিবর্তন বিমুখতা মুসলমান অধ্যুষিত দেশগুলিতে স্বৈরাচারী শাসন কায়েম হয়েছে বলে তিনি মনে করতেন। এই সমস্ত দেশে ব্যক্তি ও সম্পত্তির নিরাপত্তা সব সময় সুরক্ষিত হয়নি। হোসেন মনে করতেন ধর্মীয় গোঁড়ামি ও সহনশীলতার অভাব মুসলমানদের অনেক ক্ষতি করেছে। যদিও তা শাস্ত্রসম্মত নয়। মুসলমান দেশগুলিতে স্বৈরাচারী শাসনের উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন মুসলমানদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও স্বনির্ভরতার অভাবের জন্যই এটা হয়েছে। ইয়োরোপীয় দেশগুলিতে, জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার, স্বাধীন সংবাদপত্র তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। 'No Mahammadan nation has ever been able to Provide any constitutional means of checking the immense authority and arbitrary power of kings. In the most advanced Christian countries

the power of the sovereign—whether by law, but in all Mohammadan countries the sovereign is above the law and is responsible to none for what he may choose to do or not to do.

মুসলিম সভ্যতার অবনতির কারণ হিসাবে দেলওয়ার হোসেন ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রের একত্রীকরণকে দায়ী করেছেন। কতকগুলো বিষয়কে তিনি চিহ্নিত করেছিলেন (১) কোরান বিভিন্ন দেশের প্রচলিত ভাষায় অনুদিত না হওয়ার ফলে অধিকাংশ মুসলমান এর মর্মবাণী বুঝতে পারে না, (২) সুদ গ্রহণের উপরে নিষেধাজ্ঞার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও পুঁজির বিকাশ সম্ভব হয়নি, (৩) মুসলমানরা ইচ্ছামত নিজের সম্পত্তি অন্যকে দান করতে পারে না, (৪) পর্দা প্রথা, (৫) বহু বিবাহ।

মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, "... utterly unsuited to the times, and it is a more waste of means to supply people with what has no present value and will be of no future use. মুসলমানদের বাংলাভাষা চর্চার উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। আগেই বলেছি দেলওয়ার হোসেন একজন বিস্মৃত প্রায় বুদ্ধিজীবী। তাঁর বই ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়েছে Muslim Modernism in Bengal : Selected writings of Delwar Hossain Ahmed Meerza (1840-1913) সমকালীন মুসলমান সমাজে হোসেনের চিন্তাধারা রেখাপাত করেনি। কিন্তু একশত বছর আগে একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত মুসলমান সমাজের অধোগতির যে কারণগুলি নির্দিষ্ট করেছিলেন, পথনির্দেশ করেছিলেন তার প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি।

আধুনিক সময়ের দু'জনের কথা উল্লেখ করবো। কাজী নজরুল ইসলাম। দরিদ্র মুসলমান পরিবার থেকে উঠে এসেছিলেন। বহু কাজের মধ্য দিয়ে তিনি জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করবো না। কিন্তু পিছিয়ে-পড়া মুসলমান সমাজের প্রতি মমতার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়েছেন। ক্ষুব্ধ হয়েছেন। নিজের মতামত দিয়েছেন। কামাল আতার্তুকের আন্দোলন তাঁকে নাড়া দিয়েছিল। তিনি বললেন, 'যাক, এতদিনের পর একটা ছেলের মতো বেটাছেলে দেখলাম। এমন দেখা দেখে মরতেও আর আপত্তি নাই।' আবার 'এই তো সত্যিকারের ইসলাম। এই তো ইসলামের রক্ত-কেতন। দাড়ি রেখে, গোশ্‌ত খেয়ে নামাজ রোজা করে যে খেলাফতের উদ্ধার হবে না, দেশ উদ্ধার হবে না, তা সত্য মুসলমান কামাল বুঝেছিল, তা না হলে সে এতদিন আমাদের বাংলার কাছা-খোলা মোল্লাদের মতন সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে কাছা না খুলে কাবার দিকে মুখ করে হরদম ওঠবোস শুরু করে দিত। কিন্তু সে দেখলে যে বাবা, যত পেল্লাই দাড়িই রাখি আর ওঠবোস করে যতই পেটে খিল ধরাই। ওতে আল্লার আরশ কেঁপে উঠবে না। আল্লার আরশ কাঁপাতে হলে হায়দরি হাঁক হাঁকা চাই। মারের চোটে স্রষ্টারও পিলে চমকিয়ে দেওয়া চাই। ওসব ধর্মের ভণ্ডামি দিয়ে ইসলামের উদ্ধার হবে না—'

ধর্ম সম্পর্ক সহজ সত্যটা দারুণভাব উপলব্ধি করেছিলেন কাজী নজরুল। মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সংগ্রামের সঙ্গে ধর্মের কোনো বিরোধ নেই। বরং জীবনের মূল সূত্রগুলি পালন করার মধ্যে ধর্মের মূল নীতিগুলি জড়িয়ে আছে বলেই তাঁর বিশ্বাস ছিল। ধর্ম সম্পর্ক একটা প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন—'ওগো তরুণ, আজ কি তুমি ধর্ম নিয়ে পড়ে থাকবে—তুমি কি বাঁচবার কথা ভাববে না? ওরে অধীন, ওরে ভণ্ড তোর আবার ধর্ম কী? যারা তোকে ধর্ম শিখিয়েছে, তারা শত্রু এলে বেদ নিয়ে পড়ে থাকত? তারা কি দুশমন এলে কোরান পড়তে ব্যস্ত থাকত? তাদের রণ কোলাহলে বেদমন্ত্র ডুবে যেত, দুশমনের খুনে তাদের মসজিদের ধাপ লাল হয়ে যেত। তারা আগে বাঁচত।' পথভ্রষ্ট, পিছিয়ে পড়া ভারতীয় মুসলমান সমাজকে 'বাঁচার' মন্ত্র তিনি শেখাতে চেয়েছিলেন। তার আবেগ এবং মমত্ববোধের সঙ্গে কোনো তুলনা চলে না। মুসলমান সমাজের মধ্যে আধুনিকতার প্রসারে তিনি ছিলেন অগ্রণী। খেদের সঙ্গে তিনি বলেছিলেন, সারা পৃথিবী যখন এগিয়ে চলেছে তখন আমরা কোরান হাদিস

চষে বিবি তালাকের ফতোয়া দিচ্ছি। কথাটা এক অর্থে রূপক। কিন্তু সামান্য কয়েকটা লাইনের মধ্যেই প্রকৃত সমস্যা এবং পরিস্থিতি তিনি ধরে ফেলতে পেরেছিলেন।

কাজী নজরুল চিরদিন মৌলবাদীদের আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছেন। মৌলবাদীরা তাকে 'কাফের' বলেছেন। নিজের জীবনে বহু সমস্যার মুখোমুখি হয়েছেন। পারিবারিক জীবনে তিনি বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছেন। চরম দারিদ্র তাঁকে একসময় গ্রাস করেছে। কিন্তু মৌলবাদীদের সামনে তিনি মাথা নত করেননি। মৌলবাদীরা তার নামে এমন কুৎসা করেছে যাতে বাঙালি মানুষ হিসাবে লজ্জিত হয়েছে। মৌলবাদীরা বলেছে নজরুলের জীবনে যেন 'আল্লার গজব' নেমে আসে। নজরুলের শেষ জীবন সুখের হয়নি। বাঙালির দুর্ভাগ্য সেটা।

কাজী নজরুল ইসলাম, নিজেই তিনি তাঁর পরিচয়। হিংস্র, অশিক্ষিত, ফতোয়াবাজদের কথা কেউ মনে রাখেনি। সবার কাছে নজরুলের অবদান আজ আদরণীয়। মুসলমান সমাজ তাকে মাথায় করে রেখেছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। তার চাইতেও বড়ো ব্যাপার হলো, বাংলাদেশ একটি ইসলামিক রাষ্ট্র। তার জাতীয় কবি হয়েছেন কাজী নজরুল। যাঁর সমাধি হয়েছে ঢাকাতে।

কাজী আব্দুল ওদুদের কথা না বললে এই ক্ষেত্রে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকবে। ১৮৯৪ সালে ফরিদপুর জেলাতে তাঁর জন্ম। সারা জীবনধরে মুক্ত চিন্তার চর্চা কবে গেছেন ওদুদ। কোরানের বাংলা অনুবাদ করেছেন। হজরত মহম্মদ (দঃ) জীবনী লিখেছেন। মুসলিম সাহিত্য সমাজ গড়ে তুলেছেন। বাংলার বুদ্ধিজীবী মুসলমানদের কাছে ভাবনা চিন্তার খোরাক জুগিয়েছেন। সমাজের কুসংস্কার দূর করতে চেষ্টা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সেই অমোঘ উপলব্ধিকে প্রাণে ধারণ করেছিলেন 'যা শাস্ত্র তাই বিশ্বাস্য নয়, যা বিশ্বাস্য তাই শাস্ত্র।' ১৯২৭ সালে মুসলিম সাহিত্য সমাজেব মুখপত্র 'শিখা'-র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হলো। আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্প্রতি তার এক প্রবন্ধে বলেছেন 'প্রগতিতে ছিল উত্তর রৈবিক আধুনিক সাহিত্যের উৎসার; 'শিখা'য় নবজাগ্রত বাঙালি মুসলমানের ভাবনা বেদনার বহুধা বিকাশ।'

কাজী ওদুদ মুসলমান সমাজে একটা নবজাগরণের স্বপ্ন দেখতেন। কবি নজরুলের চিন্তা এক্ষেত্রে তার মধ্যে প্রবাহিত ছিল। ১৯২৬ সালে প্রবন্ধ লিখলেন 'সম্মোহিত মুসলমান'। এই প্রবন্ধে তিনি হজরত মহম্মদ, ইসলাম ও ধর্ম সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ব্যক্ত করেন। প্রবন্ধটি একটি ইস্তেহারের মর্যাদা পেয়েছে। 'জগতের জন্য ইসলামের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায়নি। বরং ইসলামের যে একান্ত ঈশ্বরপরায়ণতা, সাম্য, মৈত্রী, বীর্যকান্ত সাধনা, জগতের জন্য আজও সেই সমস্তেরই দারুণতম প্রয়োজন। কিন্তু এই কল্যাণময় ইসলামকে বহন করে জগতের আর্ত, ক্লিষ্ট নরনারীর সেবায় পৌঁছে যাবে কে? নিশ্চয়ই সেটি সেই কৃপার পাত্রের দ্বারা সম্ভবপর নয় যে, 'আলেম' বলে নিজের পরিচয় দেয়, কিন্তু হৃদয়ের দ্বার যার সাংঘাতিকভাবে বন্ধ। শত শত বৎসরের পুরাতন বিধিনিষেধের তুচ্ছ তালিকা থেকে চোখ উঠিয়ে আল্লাহর এই জীবন্ত সৃষ্টির অন্তহীন সুখ-দুঃখ ব্যথার পানে এতটুকু প্রীতি ও সমবেদনার দৃষ্টিতে চাইতে সে অপারগ।'

মুক্ত বুদ্ধি'র প্রচারক ছিলেন ওদুদ। 'সম্মোহিত মুসলমান' প্রকাশিত হবার পর মুসলমান সমাজে নাড়া পড়ে যায়। কাজী ওদুদ কে 'আপদ' বলে অভিহিত করেন অনেকেই। মৌলবাদীরা তার বিরুদ্ধে নানা কটুমন্তব্য করেন। কিন্তু পণ্ডিত মানুষটি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ভারতে রয়ে গেছেন কেবল ভারতীয় থাকবেন বলে। অকুতোভয়ে বলতে পেয়েছিলেন 'মুক্ত বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে ইসলামের কোনো বিরোধ নেই। বরং ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, ইসলামের যে প্রাণভূত তৌহীদের সাধনা, মুক্ত বিচারবুদ্ধির সঙ্গে তার অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ-বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর আল্লাহকে যে জানতে চায়, তার চিত্তে

ভিন্ন বিচার, কাণ্ডজ্ঞান, অপরের প্রতি স্নেহ ও শ্রদ্ধা প্রভৃতি মুক্তির লক্ষণ আর কোথায় যোগ্যভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে।'

কাজী আব্দুল ওদুদের চিন্তা-ভাবনা কি ব্যর্থ? এ কালের অন্যতম চিন্তাবিদ আনিসুজ্জামান বলেছেন 'না, তা হয়নি।' 'তিনি যতটা রসস্রষ্টা, তার চাইতে চিন্তাশীল হিসেবে অনেক বড়— যতবড় সাহিত্য সমালোচক, তার চাইতে বড় সমাজ সংশোধক। এ চিন্তা, এ সংশোধন প্রয়াস খুব ব্যাপকতা লাভ করতে পারতো না সেদিনে— এদিনেও তা সর্বব্যাপী হতে পারে না। কিন্তু যে প্রশ্ন তিনি উত্থাপন করেছিলেন, যে জীবন চেতনার স্বাক্ষর তিনি রেখে গেছেন, তা বহুজনকেই নাড়া দিয়েছে। তার প্রমাণ আমাদের সমাজ (বাংলাদেশে) অসাম্প্রদায়িক চেতনার সমৃদ্ধিতে। মানবিক মূল্যবোধের বিকাশে, জীবনকে নতুন করে দেখবার প্রয়াসের মধ্যে নিহিত।'

ওদুদ ভারতে চলে এসেছেন বলে তাকে 'সমাজত্যাগী' বলা হয়েছে, 'মুসলমান ধর্ম বিরোধী' বলা হয়েছে, 'হিন্দু ভাবধারার মানুষ' বলা হয়েছে, কিন্তু তিনি হতাশ হননি। নৈরাশ্য তাঁকে গ্রাস করেনি বলেই তাঁর 'সম্মোহিত মুসলমান' তিনি এই বলে শেষ করতে পেয়েছিলেন 'তবে, শুধু নৈরাশ্যে একান্ত ম্রিয়মান না-হলেও আধুনিক মুসলমান সাধকদের চলে। একটা বড় সত্য সাধনার পূর্ণ পরিস্ফুরণের জন্য তেরশত বৎসর খুব বড় কাল নয়। বিপুল ভবিষ্যৎ তাঁদের সামনে। সেই ভবিষ্যতে ভীত সম্মোহিত মুসলমানের পরিবর্তে মুক্তদৃষ্টি ভূমার প্রেমিক মুসলমানকে জগত পাবে, তাতে করে বিশ্বমানবের আত্মপ্রকাশের চিরসংগ্রামে এক দৃঢ়-মেরুদণ্ড সমন্বিত অকুতোভয় সৈনিক জগতের লাভ হবে। ইসলামও এক অপূর্ব সার্থকতার শ্রীতে মণ্ডিত হবে— এই আশায় ও বিশ্বাসে তাঁরা তাদের অতীত ও বর্তমানের সমস্ত ব্যর্থতা ও লজ্জা বহন করতে পারেন।'

আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ এখন সংস্কার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছেন। ইসলামের মৌলনীতিগুলিকে অক্ষুণ্ণ রেখেও এই সংস্কার করা সম্ভব- যা সারা পৃথিবীতে নতুন আলো নিয়ে আসতে পারে। কিন্তু তা কেন সংগঠিত আন্দোলনের রূপ নিচ্ছে না সেটা একটা জরুরী প্রশ্ন। এদেশের বিশাল মুসলমান জনগোষ্ঠীর কাছে এখনও আধুনিক শিক্ষা পৌঁছায়নি— এটা একটা বড় বিষয় সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমি একসময় বলেছিলাম যে, আধিপত্যবাদী সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন একাংশের ধর্মনেতারা যদি কোরান হাদিসের কথাগুলো সহজ করে মানুষের মধ্যে প্রচার করেন তাহলেও কিছুটা কাজ হতে পারে। অন্যধর্মের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের কাঠামোগত পার্থক্য থাকার ফলে সেটা সম্ভব ছিল— কিন্তু তা হচ্ছে না। হিন্দু ধর্মে একটা বড় সুবিধা হচ্ছে কেউ খোঁজ নিচ্ছেনা আপনি কি করছেন? প্রাত্যহিক জীবনে ধর্ম পালন অথবা অবিশ্বাসের কোনো ছাপ নেই বল্লেই চলে। কিন্তু মুসলমান সমাজে আলাদা করে মৌলভী মৌলানা হওয়ার লোক না থাকলেও (সবাই হতে পারে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে) নিজের উদ্যোগ প্রাত্যহিক জীবনচর্চ্চার মধ্যে ধর্ম জড়িয়ে আছে অঙ্গাঙ্গীভাবে। তার ফলে সকলের জানা মুসলমানদের কি করতে হয়। কারও অজান্তে কিছু না করে মৌলনীতিগুলি'র আরও প্রচার দরকার। সেটাই একটা বড় কাজ হবে। কিন্তু অসুবিধা কোনো আলোচনা করলেই একাংশের কুচক্রী ধর্ম পাল্টানো হচ্ছে বলে শোরগোল শুরু করছেন। আর একটা বড় সমস্যা আশেপাশে যে বৃহত্তর হিন্দু সমাজ আছে তারা মুসলমান সমাজ সম্পর্কে প্রায় কিছু না জানার ফলে যে কোনো অদায়িত্বশীল মন্তব্য অনেকেই করে ফেলেন। তাতে সংস্কার আন্দোলনটা বাধাপ্রাপ্ত হয়। আর একটা বড় সমস্যা হচ্ছে দেশে চলে ভোটের রাজনীতি— ফলে সংখ্যালঘুদের ভালো-মন্দ নানারকম প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভোট পাওয়ার অনুশীলন করেন কম-বেশি সবাই। ফলে এই সমাজের আধুনিক হয়ে ওঠাটা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। মুসলমান বাড়ির বুদ্ধিজীবী সমাজকে ধৈর্য্য ধরে এগিয়ে আসতে হবে।

কয়েকটি প্রসঙ্গ আলোচনার শেষে আনতে চাই যা ভারতীয় মুসলমান সমাজে আলোচনার জন্য জরুরী হয়ে পড়েছে। মুসলমান মানেই সন্ত্রাসবাদী, অশিক্ষিত, বহু বিবাহেরত, অমার্জিত এবং কারও সঙ্গে এক সাথে থাকতে পারে না— এই শ্লোগানে ভারতবর্ষ নয়, সারা পৃথিবী মাতোয়ারা। বুশ থেকে বাজপেয়ী সকলেই এ সব মতামত বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করেছেন। প্রকৃত অর্থে ভিত্তিহীন অভিযোগগুলি আরও আলোচনা হওয়া দরকার।

কিছুদিন আগে ব্যাঙ্গালোরে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পারসোন্যাল ল বোর্ডের মিটিং হয়েছিল। তার আগে কতকগুলি বিষয় জানিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের মন্ত্রী বসিরুদ্দিন বাবুখান একটা খোলা চিঠি ল' বোর্ডের সামনে রেখেছিলেন। তিনি বার বার বলেছিলেন তিনি শরীয়তপন্থী। কিন্তু সারা পৃথিবীর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো বিষয় ল' বোর্ড-কে সিদ্ধান্ত করে জানাতে হবে। এই পৃথিবীতে তা জরুরী হয়ে পড়েছে। (১) বিভিন্ন ব্যাঙ্কে টাকা রাখা এবং তা থেকে সুদ নেওয়া। কোরানে সুদ খাওয়া হারাম। কিন্তু তৎকালীন পরিস্থিতি এখন নেই। পুঁজি ব্যবস্থার বিশাল পার্থক্য হয়ে গেছে। ব্যাঙ্কে জমানো টাকাতেই বহু মুসলমানের সংসার চলে। কিন্তু এটা পরিস্কার করে জানানো হোক। (২) কোরানশরীফ যে আরবী ভাষাতে লেখা তা বেশির ভাগ ভারতীয় জানেন না। না জেনে আবৃত্তি করেন। অর্থ বুঝতে পারেন না। কোরানের ভাষাকে অসম্মান না করেও বলা হোক মাতৃভাষায় ভালো করে কোরান পড়ুন। এখন তা আয়ত্ত করা সম্ভব। আর যদি তা করা যায় তাহলে অনেক ভুল বোঝাবুঝি'র অবসান ঘটে। (আমার অভিজ্ঞতায় বলতে পারি এখনও বাংলাভাষায় কোরান পড়া বাঙালিদের মধ্যে জনপ্রিয়তা পায়নি)। (৩) হজ পালন একটি অবশ্য কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। কিন্তু অনেকেই পিতামাতার দায়িত্ব পালন করেন না। জাকাত ফেতরা দেননা— কিন্তু হজ পালনে ব্যগ্র। এ ব্যাপারে মতামত দেবার প্রয়োজন। (৪) চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি এখন বিশাল। অঙ্গপ্রতঙ্গ প্রতিস্থাপনের মতো ঘটনা সহ অন্যান্য বিষয় ঘটছে। এগুলো সম্পর্কে মতামত জানানো প্রয়োজন। (৫) পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে নির্দিষ্ট মতামত থাকতে হবে। ভ্রূণ হত্যা নিষেধ আছে (সম্প্রতি ল' বোর্ডে চেয়ারম্যান পরিবার পরিকল্পনার পক্ষে মতামত দিয়েছেন)। (৬) উত্তরাধিকার আইনে এবং অন্যান্য কতকগুলো সামাজিক বিষয়ে মহিলারা বেশি বঞ্চিত হচ্ছে। যদিও ইসলাম মহিলাদের প্রভূত সম্মান দিয়েছে। সেটাকে ভিত্তি করে বর্তমান সামাজিক অবস্থার মোকাবিলা করতে ল' বোর্ডকে আবেদন জানানো হয়। (৭) মাদ্রাসা শিক্ষার বৈজ্ঞানিককরণ করতে নির্দেশ দেওয়া। মুশকিল হচ্ছে ল' বোর্ড কার্যকলাপ, সিদ্ধান্তের কথা সবভাষাতে নেই বললেই চলে। ল' বোর্ডের কার্যবিবরণী রাখা হয় উর্দুতে (মি. বানাতওয়ালা আমাকে বলেছেন) কোটি কোটি মুসলমানের কাছে তার সরাসরি যোগাযোগ নেই।

মুসলমান সমাজের মধ্যে প্রচলিত কতকগুলো বিষয় যা আজকে বিভিন্নভাবে আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। বহু বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, সম্পত্তির অধিকার, নারীর অধিকার, শিশুর দায়িত্বভার ইত্যাদি। বিষয়গুলির দিকে ভালো করে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। মনে করবার কোনো কারণ নেই যে, অমুসলমানরা প্রশ্ন তুলছে বলে এটা প্রয়োজন তা নয়, এ সব ব্যাপারে সবাই মুসলমানদের দোষারোপ করছে তার জন্য ভাবতে হবে সেটা নয়, মুসলমান সমাজের নিজের স্বার্থেই এগুলো পর্যালোচনা করতে হবে। দেখা যাচ্ছ কোরান হাদিসে বিষয়গুলো সম্পর্কে যা বলা হচ্ছে তাই যদি মান্য করা হয় তাহলেই অনেক আধুনিক কাজ হবে— অন্য পর্যায়ের জন্য অপেক্ষা করা অনেক সহনীয় হবে। যেমন বিবাহ— অনেকেই মনে করেন মুসলমান মানেই ৪-টে বিয়ে। একেবারেই ঠিক নয়। প্রত্যেক পুরুষ যদি ৪-টে করে বিয়ে করে ৩/৪ ভাগ পুরুষ অবিবাহিত থাকবে। আর প্রকৃত সংখ্যাতত্ত্বও সেকথা বলছে না যে, মুসলমানদের মধ্যে বহুবিবাহ বেশি। বিষয়টি কোরান শরীফ থেকেই আমি বলতে চাই 'নারীদের মধ্যে

হতে তোমরা দুটো তিনটে কিংবা চারটে বিয়ে করো। কিন্তু যদি আশংকা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে পারবে না। তবে একটি মাত্র বিয়ে করবে।' (সুরা নিসা ৪:২) আবার একই সুরাতে বলা হচ্ছে 'তোমরা যত ইচ্ছাই কর না কেন, তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের প্রতি সমান ব্যবহার করতে পারবে না।' (৪.১২৯)। দুটো একসঙ্গে পড়লে বুঝতে অসুবিধা হয় না এক বিবাহই প্রকৃত। ধর্মগ্রন্থ পড়ার সময় আক্ষরিক অর্থের সঙ্গে কেন এবং কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে এগুলি আলোচিত হয়েছে তাও বিবেচনায় আনতে হবে। কোরানে এ সংক্রান্ত কথাগুলি আসার সময় আরবীয়রা শত শত বিয়ে করতো, ব্যভিচার চলতো, বেশ্যাবৃত্তি চালু ছিল আর যুদ্ধে প্রচুর পুরুষ মারা যায়। হঠাৎ এক বিবাহের কথা চালু করা প্রায় অসম্ভব ছিল। সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিবাহের কথা হয়েছিল। মূল নির্দেশ কিন্তু এক বিবাহের দিকে। কোরানের প্রকৃত অর্থটিই যদি মান্য করে মুসলমান সমাজ তাহলে এই ঘৃণ্য অপপ্রচার থেকে মুক্ত হতে পারে। যারা ৪ বিবাহকে পুরুষের অধিকার বলে চালাতে চাইছে তাদের বিচ্ছিন্ন করতে হবে। সেটাই তো সমাজ সংস্কারের অভিমুখ নির্দিষ্ট করে দিতে পারে।

বিবাহ বিচ্ছেদ বা তালাক— আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মুসলমানদের জীবনে। এক্ষেত্রে কোরানের নির্দেশও মানা হচ্ছে না। বহু আদালতে বহু মামলা চলছে— কোনোটার ফয়সালা হচ্ছে না। ল' বোর্ড নির্দিষ্ট নির্দেশ নিয়ে এগিয়ে আসতে পারে। একই সঙ্গে তিনবার তালাক উচ্চারণ করলে বিচ্ছেদ হয়ে যাবে এই পাশবিক পদ্ধতি ইসলাম সম্মত নয়। এমনকি এদেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ও এ ব্যাপারে তাদের অসম্মতি জানিয়েছেন। এমনকি পাশের ইসলামিক রাষ্ট্র বাংলাদেশে তালাক দিতে হলে আগে নোটিশ দিতে হবে। আমি আবার কোরান শরীক থেকে বলবো, সুরা বাক্কারাহ ২:২২৭-২৪১, সুরা আযহাব ৩৩:৪৯ সুরা তালাক ৬৫:১-১২-তে তালাক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। ইসলামে তালাক স্ত্রী-নির্ভর। ৪টি পথ ব্যতীত ইসলামে তালাক নাই। (১) স্ত্রী যদি চিররুগ্ন হয়, (২) স্ত্রী যদি বন্ধ্যা হয়, (৩) স্ত্রী যদি ব্যাভিচারিনী হয়, (৪) স্ত্রী যদি ঘর-সংসার করতে একেবারেই অনিচ্ছুক হয়। আবার বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কে হজরত মহম্মদ (স:) বলেছেন, 'আল্লার নিকট' যত বৈধ বস্তু আছে তার মধ্যে তালাক অত্যন্ত অপ্রিয়।' একই সঙ্গে তিনবার তালাক উচ্চারণ করে বিচ্ছেদ ইসলামে বৈধ নয়— আর সর্বোপরি বিচ্ছেদ বৈধ হলেও তার ব্যবহার মহানবীর অপছন্দ ছিল। এ নিয়ে বহু কথা বলা যায়। কিন্তু মূল কথাটা এই। কিন্তু এটা অত্যন্ত খারাপভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। স্বামীর অনুমতি না নিয়ে প্রিয় সন্তানকে মা পোলিও রোগ থেকে বাঁচাবার জন্য পোলিও ওষুধ খাইয়েছেন এই অপরাধে তালাক দিয়ে দেওয়া হলো, আকণ্ঠ মদ খেয়ে বাড়ি এসে স্ত্রী সামান্য প্রতিবাদ করাতে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেওয়া হলো, এর চাইতে আরও আরও তুচ্ছ কারণে ঘটনাগুলি ঘটছে। পবিত্র গ্রন্থের কথাই যদি মান্য করতে হয় তাহলে এর প্রতিরোধ করা ছাড়া উপায় কি? সেটাই হবে সংস্কারের প্রথম ধাপ। এই দায়িত্ব কে নেবে? শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের ইসলাম ধর্মের নির্দেশগুলি বুঝতে হবে এবং সমাজটাকেও জানতে হবে— দুটো মিলে একাজ হওয়া সম্ভব। আর এলাকায় এলাকায় যে মাদ্রাসাগুলি গড়ে উঠেছে তাদের পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে মানুষকে বোঝাতে হবে। এই লোকশিক্ষা আজ বড় প্রয়োজন।

সম্পত্তির অধিকার নিয়ে আলোচনা এখন অনেক জরুরি নানা কারণে। প্রথমত, ইসলাম ধর্মে মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার যখন দেওয়া হয়েছে তখন কোনো ধর্মে এই অধিকার মেয়েদের ছিল না। দ্বিতীয়ত, পৃথিবী এগিয়ে এসেছে বহু বছর। একদিন যা গণতান্ত্রিক ছিল, সারা পৃথিবীকে পথ দেখিয়েছে, অন্যদের সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছে তা নিয়ে আলোচনা না করা অন্যায় হবে। সেই কাজটা শুরু করা অত্যন্ত জরুরী। ইসলামিক রাষ্ট্রেও নারী এবং পুরুষের অধিকার সমান রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। শুধু তাই না প্রধানমন্ত্রী, দেশের বিচারপতি হচ্ছেন মহিলারা। কিন্তু স্বামী অথবা পিতার সম্পত্তি থেকে প্রকৃত

সমান ভাগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এটা সম্পর্কে আরো নির্দিষ্ট আলোচনা প্রয়োজন। ধর্মমত অনুযায়ী সম্পত্তির বণ্টন ইসলামে হয়ে থাকে। কে কোনো অংশ পাবেন সেটা আমি আগেও বিস্তারিত বলেছি। এখানে কতকগুলি মূল সমস্যা যা আমাদের মুখোমুখি হতে হচ্ছে সেটার আলোচনা করা প্রয়োজন। নিজের পুত্র সন্তান না থাকলে কন্যারা বাবার সম্পত্তি সব পাচ্ছে না, সন্তানহীন হলে স্বামীর পুরো সম্পত্তি স্ত্রী পাচ্ছে না, বাবা মারা গেছেন দাদুর সম্পত্তিতে নাতির কোনো অধিকার নেই, সম্পত্তি ইচ্ছামতো দান করা যাচ্ছে না। তাছাড়া বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েরা বাবার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রচার করা হচ্ছে বাবার সম্পত্তি মেয়েদের (বিবাহিত) 'সয়' না। যেন তেন প্রকারে মেয়েদের বঞ্চিত করার প্রবণতা চলছে। সারা দেশ জুড়ে আদালতগুলিতে মামলার পর মামলা ঝুলে আছে। অন্য ধর্মাবলম্বীদেরও এই ব্যাপারে কম ঝামেলা নেই। কিন্তু কথায় কথায় মুসলমানদের 'মামলাবাজ' বলাটা একটা রেওয়াজ— আর তার মধ্যে আছে এই সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা। আসলে একদিন যে ধর্ম মেয়েদের সম্পর্কে একটা প্রগতিশীল অনুকরণযোগ্য পথ দেখিয়েছিল সেটা কিছু কুচক্রীর হাতে পড়ে মুসলমান সমাজের গলায় ফাঁস হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই আলোচনা না করে কি উপায় আছে! এ কথার পিঠে আর একটা কথা বলবো, সেটা কোরানেই বলা হয় মানুষের জ্ঞান-গরিমা বৈভব মানুষকে যেন অমানুষ না করে। আল্লাহ কোনো অমানুষ, সীমা লংঘনকারীরকেই পছন্দ করেন না, তখন তিনি শাস্তি দেন। (৯১:১৫) প্রাসঙ্গিক হচ্ছে ধন হোক, মান হোক আর যাই হোক, সবার ঊর্ধ্বে বিবেকের আসনটি যেন সুরক্ষিত থাকে। তা যদি রক্ষিত না থাকে তাহলে জীবনের অন্য কিছুকে কে রক্ষা করবে। সম্পত্তির অধিকার নিয়ে সেই মুসলমানকে বিবেকবান হয়ে উঠতে বললে কার কোথায় অন্যায়? এর চাইতে বড় সংস্কারের কাজ আর কি থাকতে পারে। পণপ্রথা যে কোনো সমাজের কলঙ্ক হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। আমি আগেই বলেছি অন্যান্যদের তুলনায় অনেক ব্যাপারে ইসলাম ছিল অনেকখানি এগিয়ে। পণপ্রথা সেইরকম একটি ক্ষেত্র। ইসলামে পণপ্রথা সিদ্ধ নয়। এক্ষেত্রে মুসলমান মেয়েদের অবস্থান ইসলামে অনেক প্রগতিশীল। এই ধর্মে বিবাহ একটি আইনী চুক্তি। মেয়েরা 'মোহর' নিয়ে চুক্তিবদ্ধ হবেন। মোহরের কোনো ঊর্ধ্বসীমা নেই। মোহরের অর্থে কন্যা'র বাবা মা'র কোনো ভাগ নেই। এটা কোনো প্রতীকী ব্যবস্থা নয়। কন্যা যে কোনো সময় এই টাকা দাবি করতে পারে।

একটা সময় অন্তত মুসলমানদের কিছুটা সাধুবাদ দেওয়া হতো এই বলে যে, মুসলমান সমাজের মধ্যে পণপ্রথার প্রকোপ নেই। একদিক দিয়ে দেনমোহরের টাকা কন্যার, অন্য দিকে পিতার সম্পত্তিতে মেয়ের অধিকার অবশ্যই প্রগতিশীলতা এবং মেয়েদের কাছে কিছুটা স্বস্তিদায়ক। এখন প্রায় পুরো পাল্টে গেছে চিত্র। বহু মুসলমান পরিবার পণপ্রথার জ্বালায় জর্জরিত। স্বামী মনে করে স্ত্রীর বাবা মারা গেলে তার ভাই-রা সম্পত্তি থেকে ঠকাবে সুতরাং আগেই যতটুকু পারা যায় যৌতুক হিসাবে নিয়ে নিতে পারলে সেটা হবে লাভজনক।

একটি স্বস্তিদায়ক পরিস্থিতি থেকে একটি ঘৃণ্য পরিস্থিতিতে উত্তরণের এমন হৃদয়বিদারক ঘটনা আর নেই। পণপ্রথার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাব বধূ হত্যাও মুসলমান সমাজে দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি কিছু উর্দু কাগজে এ ব্যাপারে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু যে উলেমা বা ধর্মীয় পণ্ডিতদের কাছ থেকে এই ঘটনার তীব্র কার্যকরী প্রতিবাদ প্রয়োজন ছিল তা হচ্ছে না। কয়েক জায়গায় ক্ষীণ কণ্ঠে কয়েকটি স্বর শোনা যাচ্ছে কিন্তু তাতে পরিস্থিতি পাল্টাবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। মেয়েদের বাবার সম্পত্তি পাওয়াটাকে নিশ্চয়তা দান করতে না পারলে এব্যাপার এগুনো যাবে না। মেয়েদের আত্মনির্ভর করে গড়ে তোলার প্রশ্নটা গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে। ইসলামের মৌলচিন্তার সঙ্গে এর কোনো বিরোধ নেই।

পরিবার পরিরকল্পনা সম্পর্কেও মুসলমান সমাজের মধ্যে দোদুল্যমানতা আছে। গ্রাম এলাকায় রাজনৈতিক কাজ করতে গিয়ে আমি মহিলাদের মধ্যে এ ব্যাপারে প্রবল আগ্রহ দেখেছি। কিন্তু ধর্মের নাম করে বাধা দেওয়া হচ্ছে। ইসলাম সব ব্যাপারেই অনমনীয় নয়। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বহুক্ষেত্রে ইসলাম নমনীয় অবস্থান নিয়েছে। প্রিয় নবী অবস্থার বিচারে সন্তান ধারণ না করার কথা বলেছেন। ১১ শতকের বিশিষ্ট ধর্মতত্ত্ববিদ ইমাম ফজলিও ভ্রূণহত্যা অনুমোদন করেছিলেন। তবে সেটা মায়ের স্বাস্থ্যের বিচারে। যদি মায়ের স্বাস্থ্য বিপজ্জনক হয় তাহলে ভ্রূণ হত্যা সিদ্ধ। স্বাস্থ্যের অবনতির পরিপ্রেক্ষিত ৩ মাস বয়স পর্য্যন্ত ভ্রূণহত্যা চলতে পারে। তবে এ ব্যাপারে বহু সমাজ সমীক্ষক দেখেছেন, মুসলমানরা পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণে কঠোর বিরোধী নয়। এ কথা অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই যে, ক্রমশ বর্ধমান মুসলমান মধ্যবিত্ত পরিবারগুলিতে জন্মনিরোধক পদ্ধতি খুবই প্রাধান্য পেয়েছে। সম্প্রতি অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের সভাপতি পরিবার পরিকল্পনার পক্ষে তাঁর মতামত জ্ঞাপন করেছেন।

শিশু দত্তক নেওয়া প্রসঙ্গে ২/১টা বিষয় উল্লেখ করতে চাই। অনেকে প্রচার করেন যে, ইসলামে দত্তক নেওয়া চলবে না। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো হজরত মহম্মদ (সঃ) জায়েদ কে দত্তক নিয়েছিলেন। হজরত নিজেও তাঁর পিতৃব্যের কাছে কার্যত দত্তক ছিলেন। একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে কোরান শরীফে দত্তক সম্পর্ক একটি নির্দেশ জারি হয়। 'আল্লাহ তোমাদের পালক বা পোষ্যপুত্রদের তোমাদের পুত্র করেননি। এ তোমাদের কাছে মৌখিক কথা মাত্রা।' (সুরা আয্হাব ৩৩:৪)। তার মানে এটা নয় যে পালিত পুত্র নেওয়া যাবে না। নিজ পুত্র আর পালিত পুত্র এক নয়। ভারতীয় আইনে যখন দত্তক সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় তখন মুসলমানদের তার বাইরে রাখা হয় বিভিন্ন সংগঠনের চাপে পড়ে। তবে দত্তক না হলেও আইনগতভাবে 'অভিভাবকত্ব' নিতে কোনো বাধা নেই।

যে বিষয়গুলো আলোচনার জন্য উত্থাপন করা হলো তার বাইরে সামাজিক জীবনে অনেক বিষয় ঘটে যাচ্ছে যার সম্পর্কে মুসলমানদের দৃঢ় মতামত জ্ঞাপন করতে হবে। সংস্কারের কথা বললে অনেকেই হৈ হৈ করছেন— কিছু ইসলামে বিচার বুদ্ধি বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার দিয়েছে। সেগুলো করলেই কোরান হাদীসের দোহাই দেওয়া একটা অংশের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। ভাবখানা এমন যে, তারাই একমাত্র কোরান হাদীসের রক্ষক আর কেউ কোরান হাদীস পড়েনি। পবিত্র কোরান এবং হাদীসে মুসলমান সমাজের জন্য প্রাত্যহিক জীবন চর্চার জন্য যা বলা হয়েছে তাই যদি মান্য করা হতো তাহলে একটা আধুনিক মানুষ হয়ে ওঠার প্রথম পর্যায় অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে অতিক্রম করা যেতো। আসলে নানা কারণে সেটাই বন্ধ হয়ে আছে। আর একটা বিষয় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে মুসলমানরা যে দেশে বাস করছেন সেটাই তাদের দেশ। শত্রুর দেশ বলে চিহ্নিত করা যাবে না। অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে বিভিন্ন ব্যাপারে আদান-প্রদান হবে। নিজেদের সমস্ত স্বকীয়তা বজায় রেখেও মুসলমানরা প্রগতির পক্ষে দাঁড়াতে পারেন। তারই চর্চা মনপ্রাণ দিয়ে করতে হবে। সুতরাং এই সংস্কারে বাধা কোথায়? অনেকে আবার মনে করেন যে এসমস্ত কথা প্রথম শুনছেন। মুসলমান সমাজ ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়েই যাচ্ছে। মূলগ্রন্থ এবং জীবনচর্চার কথা অস্বীকার না করেও আধুনিক শিক্ষা ও আধুনিক জীবনযাত্রা পালনের পদ্ধতি ইসলামের মধ্যেই আছে। অযথা গোঁড়ামি আর আত্মবিশ্বাসহীনতার মধ্যে পড়ে পরিস্থিতি জটিল হয়ে পড়েছে। এই পরিস্থিতি পাল্টাতে হবে। সেটাতো সংস্কার আন্দোলন ছাড়া হতে পারে না। আর সংস্কার মানেই সবকিছুকে অস্বীকার নয়। এই ধুয়োটা তুলে একাংশের কুচক্রী তাদের আখের গুছিয়ে চলেছে। মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত মুসলমান সমাজের অংশকে এগিয়ে আসতে হবে। মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত অংশের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছাড়া পৃথিবীতে কোনো সংস্কার বা অগ্রগতি হতে পারেনি।

পাশাপাশি আধুনিকতারচর্চা থেকে আমাদের বিরত হলে চলবে না। কিছুদিন আগে হাসান ইউসেফি এস্কেভারি ফ্রান্সের সরবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতা দেন। আমি মনে করি ইসলামপন্থীদের কাছে তা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। আমাদের অনেক শিক্ষণীয় রয়েছে তাতে। এস্কেভারির বক্তৃতাটির মূল বিষয়গুলি সূত্রাকারে নীচে দিয়ে রাখলাম।

(ক) ইসলামে ফেরা মানে সাধারণভাবে এর ঐতিহাসিক নীতি ও মূল্যবোধগুলিতে ফেরা। কিন্তু ইসলামিক চিন্তাভাবনা ও তার আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার সংস্কার ও পুর্ননির্মাণের প্রয়োজন।

(খ) শরিয়ত, ঐতিহ্যগত পদ্ধতি-প্রকরণ, রীতিনীতি আর মূল ইসলামের তত্ত্ব—এই দুইয়ের মধ্যে ফারাক রয়েছে। ধর্মীয় চেতনা ও মূল্যবোধ চিরকালীন। কিন্তু সামাজিক রীতিনীতি অপরিবর্তনীয় হতে পারে না।

(গ) ধর্মের গভীর অর্থ খুঁজতে হবে। শুধুমাত্র আচারবিচারের আনুষ্ঠানিকতার প্রাণহীন নিগড়ে আটকে পড়লে চলবে না। ফর্ম বা আঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আঙ্গিকসর্বস্বতা বর্জনীয়। ধর্মের অন্তর্লীন মানবিক অন্বেষায় ফিরতে হবে।

(ঘ) আধুনিকতাবাদীরা ইজ্‌তিহাদ বলতে সমসাময়িক পৃথিবীর সমস্যা ও প্রশ্নাবলীর উত্তর খোঁজায় বিশ্বাসী। সমস্যাগুলি থেকে মুখ ফেরানোয় তাদের আপত্তি। তারা মনে করেন ব্যক্তিমানুষ তার নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ মোতাবেক আদর্শগত ধ্যানধারণাগুলিকে বিচার করবে। যদি ব্যক্তির পালনীয় ধর্মীয় বিধান, রীতিনীতির অর্থ বুঝতে তিনি নিজে অপরাগ হন, তবে তিনি গোষ্ঠী বা ব্যক্তি ধর্ম-বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নেবেন। সামাজিক রীতিনীতিগুলির ব্যাখ্যা করবেন এহেন বিশেষজ্ঞরাই। তাঁরা ধর্মীয় কর্তৃত্ব লাভ হতে পারেন। (এ ধরনের প্রস্তাব রেখেছেন ইকবাল, ডা. শরিয়তি এবং আয়াতোল্লা তালে কোয়ানি)।

(ঙ) ধর্ম ও রাজনীতির সমন্বয় হবে। কিন্তু দুইয়ের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট বিভাজন রেখাও থাকবে (রাজনীতি বলতে এখানে সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বলা হয়েছে)।

(চ) কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অভিভাবকত্ব বা কর্তৃত্ব নয়। যৌথ নেতৃত্ব এবং চিন্তার বহুত্ববাদী বিকাশ চাই। মতাদর্শের অস্তিত্ব থাকবে। কিন্তু আদর্শবাদী একজন শিক্ষক হতে পারেন মাত্র। নিদান হাঁকার একচেটিয়া অধিকার তাঁর বা তাঁদের নেই।

(ছ) ইসলামি সরকার হোক বা অন্য ধরনের সরকার; তা লৌকিক প্রতিষ্ঠান মাত্র। ঐশ্বরীয় কোনো বৈধতা বা মান্যতার দাবিদার তা হতে পারে না। শুধু তাই নয়, ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থাতেও গণতন্ত্র থাকবে। শাসক বা শাসকেরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হবেন। আমজনতার ইচ্ছা শিরোধার্য করেই ক্ষমতা থেকে সরে যেতে হবে। এহেন ব্যবস্থাটি ধর্মীয় শাসনব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু ধর্ম কখনো সরকারি ধর্ম হয়ে উঠবে না।

(জ) ধর্ম মানে নিজস্ব উপলব্ধির মাধ্যমে চরম সত্য আবিষ্কার বা ঈশ্বরের স্বরূপসন্ধান। এখানে কোনো মধ্যবর্তী যোগসূত্রের প্রয়োজন নেই। ধর্মীয় শিক্ষকেরা থাকবেন। কোরানের বাণী এবং পয়গম্বরের শিক্ষা চলার পথের পাথেয় হয়ে থাকবে। কিন্তু ব্যক্তিবিশ্বাসীকে ঈশ্বর-চেতনার পূর্ণতায় পৌছতে হবে নিজের তাগিদেই।

(ঝ) ধর্মের সৃষ্টি মানুষের সেবার কারণে। মানবিক সত্ত্বার বিকাশ, চেতনা এবং স্বাধীনতার বোধ ছড়াতেই। ধর্মকে বোঝার জন্য শুধু কোরান বা ঐতিহ্যই নয়, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হবে।

(ঞ) ইসলাম একটি সুবিন্যস্ত মতাদর্শ এবং অন্যান্য মতাদর্শের সঙ্গে তার প্রতিযোগিতা চলবে। ইসলামি সংস্কৃতি এবং আদর্শকে প্রাথমিকতা দেওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে গ্রহণ করলে ইসলাম লাভবান হবে।

(ট) ধর্ম, মতাদর্শ, মতামত ব্যতিরেকে প্রত্যেকটি মানুষের মানবাধিকার আছে। ইসলাম মানুষের শুভচেতনা এবং নৈতিকতাবোধ উন্নতির জন্য, কারো অধিকার হননের জন্য নয়। এই শুভাশুভবোধ বিকাশে যুক্তিবুদ্ধির প্রয়োগ ঘটাতে হবে। যদিও সামান্য কিছু ক্ষেত্রে ধর্মীয় নিদান মানা আবশ্যিক হতে পারে।

সর্বোপরি মুসলমানকে তার আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে হবে। তারজন্য নিজেদের শিক্ষার ভিত্তি আরো দৃঢ় করা প্রয়োজন। হুমায়ুন কবীর বিষয়টিকে দেখেছিলেন এইভাবে 'যাহার মন স্বাধীন, আত্মবিশ্বাস যাহার প্রবল, সে কখনই অন্যের যাহা ভালো তাহা গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করে না। যাহার নিজের কিছু নাই, সেই অপরের জিনিষ লইতে দ্বিধাবোধ করে— পাছে তাহাতে তাহার নিজের সত্তাহানি হয়। ভারতবর্ষের মুসলমানেরও সেই দশা হইয়াছে। যতদিন তাহার প্রাণশক্তি সতেজ ছিল, আপনার উপরে বিশ্বাস ছিল, ততদিন সে অসংকোচ বিনা বাধায় ভারতবর্ষকে আপন করিয়া লইয়াছে। আজ সে প্রাণশক্তি নাই বলিয়া এত বাধা, এত দ্বিধা, এত আশঙ্কার কথা উঠে'। ইসলাম এমন একটা ধর্ম যার প্রতিনিয়ত প্রচার হচ্ছে বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়। সামাজিক সংস্কারের কাজগুলি রাজনীতি নিরপেক্ষভাবে তারাও হাতে নিতে পারেন। তারা কোরান-হাদীসকে ভিত্তি করেই সেটা করবেন, তাতেও সমাজ উপকৃত হবে। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত, উঠতি তরুণ মুসলমানদের দায়িত্ব নিতে হবে আধুনিক শিক্ষা ও আধুনিক মনন তৈরি করার জন্য। প্রতিযোগিতাপূর্ণ এই পৃথিবীতে তাদের আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। তাদের উন্মুক্ত হৃদয় দেখে সব মানুষ যেমন ভরসা পাবে মুসলমানরাও পাবে। আকাশের মত হৃদয় না থাকলে নেতা হওয়া যায় না। আমি ব্যক্তিগতভাবে সেই হৃদয়বান অংশের জন্য অপেক্ষা করছি যারা মুসলমান সমাজের পশ্চাদপদতা দূর করে আলোর সন্ধান দেবে। শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, তাতে উপকৃত হবে আমাদের দেশ ভারতবর্ষ।

বৈধব্য ও বৈরাগ্য : বৃন্দাবন পর্বের নারী

মালিনী ভট্টাচার্য

'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই।'

১৮৯২ সালে লেখা রবীন্দ্রনাথের 'জীবিত ও মৃত' গল্পের বহুল-উদ্ধৃত এই শেষ বাক্য হিন্দু বিধবার যে 'সামাজিক মৃত্যু'র কথা বলে, তা নিয়ে সম্প্রতি বহু বিশ্লেষণ ও আলোচনা হয়েছে।[১] এর ইতিহাস এবং সমাজতাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট আজ আর আমাদের অজানা নয়। যুগবদলের সঙ্গে যেমন বৈধব্যের তাৎপর্য পাল্টে যায়, তেমনি জাতি, বর্ণ বা অর্থনৈতিক শ্রেণীভেদেও যে তার তারতম্য ঘটে, তার বহু বিশদ সমীক্ষা আজ আমাদের সামনে উপস্থিত। এইসব চর্চার থেকে মোটামুটিভাবে এটাই দেখা যাচ্ছে যে, বৈধব্যগ্রস্ত নারী যে কোনো পিতৃতান্ত্রিক সমাজেই কিছু সমস্যার সৃষ্টি করে—পারিবারিক বিন্যাসে তার স্থান কোথায় হবে, সম্পত্তিতে সে কতদূর অধিকার পাবে এবং তার যৌন সক্রিয়তা (যদি তা অবশিষ্ট থাকে) নিয়েই বা কী করা হবে, এইগুলিই হল মূল সমস্যা। এই সমস্যা যাতে সমাজ-শরীরে উদ্বেগ সৃষ্টি করতে না পারে, তার জন্য কখনো সহমরণের বিধান দেওয়া হয়েছে, কখনো অবিরত গৃহকর্ম বা ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তার কামনাবাসনাগুলিকে দমিয়ে রাখার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, কখনো বা সম্পত্তির বাঁটোয়ারা অক্ষুণ্ণ রেখে পরিবারের মধ্যেই তার পুনর্বিবাহের আয়োজন। আর এইসব ব্যবস্থায় তাকে সম্মত করার জন্য ভিতরে বাইরে তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে পারিবারিক সংস্কার, শিক্ষাব্যবস্থা, ধর্মশাস্ত্র, সাহিত্য ও কাব্যের অনুষঙ্গ, গণমাধ্যম ইত্যাদি। আমাদের দেশে উনিশ শতক থেকে শুরু করে সমাজ চর্চায় ও সৃজনশীল সাহিত্যে বিধবা নারীর দুরবস্থাকে তার অধঃস্তন অবস্থানের একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হিসাবেই দেখা হয়েছে, যদিও বৈধব্য সম্বন্ধে বদ্ধমূল প্রাক্‌ধারণাগুলিকে অধিকাংশ সমাজতাত্ত্বিক বা সাহিত্যসাধক এড়িয়ে যেতে পারেননি। বিধবাকে একটা সমস্যা হিসাবে দেখাটাই স্বতঃসিদ্ধতা পেয়েছে সমাজ বিশ্লেষকদের চোখেও; বিপত্নীক পুরুষ কিন্তু সেই অর্থে সাহিত্যে বা সমাজচর্চায় সমাজের একটি মূর্ত সমস্যা হিসাবে উপস্থাপিত হয়নি।

১৯৮১ সালের আদমসুমারির হিসাবে দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে মোট জনসংখ্যার মধ্যে বিধবার হার শতকরা ৯.২ এবং বিপত্নীক পুরুষের হার শতকরা ১.৪; নিত্যবিবাহিত (ever-married) জনসংখ্যার মধ্যে বিধবার হার ১৭.৯%, অন্যদিকে বিপত্নীক পুরুষের হার ৩.৪%। এরাজ্যে বৈধব্যের হার এই তথ্য অনুযায়ী জাতীয় হারের চেয়ে বেশ খানিকটা বেশি (জাতীয় হার : মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৮.০%, এবং নিত্যবিবাহিত জনসংখ্যার মধ্যে ১৪.৮%)। রাজ্যগুলির মধ্যে একমাত্র অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুতেই বৈধব্যের হার পশ্চিমবঙ্গকে ছাপিয়ে গেছে।[২] বৈধব্যের হারের তারতম্য নির্ভর করে একাধিক কারণের ওপর; যেমন, স্বামী ও স্ত্রী মধ্যেকার বয়সের তফাৎ, বিধবাদের মধ্যে পুনর্বিবাহ প্রথার প্রচলন, এবং বিধবাদের মৃত্যুহারের তারতম্য। সাধারণভাবে মনে করা হয় উত্তর ভারতের রাজ্যগুলির তুলনায় দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে বৈধব্যের ঝুঁকি বেশ কিছুটা বেশি; পরিবারের মধ্যে পুনর্বিবাহের প্রচলন ও তুলনায় কম। অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতে এবং পশ্চিমবঙ্গেও বয়স্ক

বিধবাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা উত্তর ভারতের রাজ্যগুলির চাইতে অধিক। পশ্চিমবঙ্গে বিধবাদের সংখ্যা হার বেশি কেন, তা এই সব কটি কারণ মিলিয়ে খুঁজতে হবে।[৩]

পশ্চিমবঙ্গে বিধবাদের কোনো কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে অভিবাসনের একটি প্রথা আছে। কয়েকটি তীর্থস্থানে তাঁদের উপস্থিতির ঘনত্ব লক্ষণীয়। কাশী এবং বৃন্দাবন ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের কিছু বৈষ্ণবতীর্থে তাঁরা যে শুধু যাতায়াত করেন তাই নয়, অনেকে সেখানকারই স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। কয়েকবছর আগে বৃন্দাবন বা ব্রজধামের এই অভিবাসী বিধবাদের নিয়ে একটা খুব হৈচৈ হয়েছিল। সংবাদপত্রে এমন খবরও বেরিয়েছিল যে বৃন্দাবনে ১৬,০০০ বাঙালি বিধবা রয়েছেন এবং ভয়ানকভাবে ফাঁপিয়ে তোলা এই গুজবের ভিত্তিতে এরকম রাজনৈতিক প্রচারও চলছিল যে পশ্চিমবঙ্গে বিধবারা সমস্ত ভারতের মধ্যে সব চাইতে বেশি উৎপীড়িত বলেই তাঁরা দলে দলে বৃন্দাবনে এসে বসবাস করেন।[৩] সে সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সমাজ-কল্যাণ মন্ত্রকের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা কমিশনকে দিয়ে বৃন্দাবন ও তার আশপাশের পুরো এলাকায় বসবাসকারী দুঃস্থ বাঙালি মেয়েদের একটি সার্বিক সমীক্ষা করা হয়েছিল, দেখা গিয়েছিল এঁদের অধিকাংশ বিধবা হলেও, কিছু স্বামী পরিত্যক্তা বা বিবাহিত গৃহত্যাগিনীও এঁদের মধ্যে আছেন। কিন্তু পুরো ব্রজধাম মিলিয়েও তাঁদের সংখ্যা কোনোক্রমেই ২০০০ এর খুব বেশি হতে পারে না। রাজ্যে বৈধব্যের হার বেশি বলে বা তাঁরা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বেশি অত্যাচারিত বলেই তাঁরা অভিবাসী হয়ে যান। এই অনুমানকে সমর্থন করার মতো তথ্য আমরা তেমন কিছু পাই না। কিন্তু সংসারের মায়াগণ্ডি ভেঙে অভিবাসী হয়ে যান বলে একদিক থেকে তাঁদের দৃশ্যমানতা বেশি। তাঁদের যদি আমরা ভালোভাবে নিরীক্ষণ করি, তাহলে হয়তো অন্যান্য রাজ্যের যে বিধবারা গৃহের চার দেয়ালের মধ্যে প্রায় অদৃশ্যভাবে থেকে যান, পরোক্ষে তাঁদের হাল হকীকৎ সম্বন্ধে কিছুটা অনুমান করতে পারব। গৃহের বাইরে আছেন বলে অভিবাসিনীদের মাধ্যমে পতিহীন নারীর অর্থনৈতিক অসহায়তার ছবি আমরা কতকটা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই, তার মানে এই নয় যে গৃহবাসিনী বিধবারা এই অসহায়তায় ভোগেন না। কিন্তু এই কারণটি ছাড়াও ধর্মবিশ্বাস অভিবাসনকে কতটা কীভাবে উৎসাহিত করে, বৈরাগ্যের আঙ্গিককে কিছু বিধবা কেমন করে আত্মস্থ করেন, এটাও আমাদের একটা জানার বিষয় হতে পারে।

বৈদিক যুগের শেষদিকে চতুর্বর্ণের ধারণার মতোই চতুরাশ্রমের আদর্শও একটি ছকে বাঁধা শাস্ত্রীয় আদল পায়। গার্হস্থ্যপর্বের শেষে পরিবারের কর্তা ও গৃহিনী বানপ্রস্থ বা আশ্রমিক জীবন অবলম্বন করবেন এরকম একটা মতাদর্শগত নির্দেশ কোথাও কোথাও দেওয়া হয়েছে। মহাভারতের আশ্রমিক পর্বে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর সঙ্গে সঙ্গে বিধবা কুন্তীও বানপ্রস্থ গ্রহণ করেন। এখানে বয়সই প্রাথমিক ব্যাপার, বৈধব্য নয়। লক্ষণীয় যে বিধবা হবার অব্যবহিত পরে বনবাসিনী কুন্তী শিশুসন্তানদের নিয়ে মৃত স্বামীর আত্মীয়স্বজনের আশ্রয়েই ফিরে এসেছিলেন। বস্তুত তাঁর বানপ্রস্থ গ্রহণের সময়ে যখন তাঁর সন্তানরা তাঁকে এই সিদ্ধান্ত থেকে বিরত করার চেষ্টা করছিলেন, তখন তাঁর পুত্রদের মধ্যে স্পষ্টভাষী বলে পরিচিত ভীম তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন : সেই যদি তুমি বনেই চলে যাবে, তাহলে আমাদের দিয়ে পৃথিবীকে বীরশূন্য করালে কীসের জন্য? কেনই বা শিশুকালে আমাদের এবং মাদ্রীপুত্রদের বনের জীবন থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এলে?[৪] বৈধব্যের পরেও যে তিনি সম্পূর্ণ ভাবেই সংসারে লিপ্ত ছিলেন, সেই ইঙ্গিতই এখানে করা হয়েছে। কোনারকের একটি খোদাই চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি এক বর্ষীয়সী নারী (স্পষ্টতই তিনি বিধবা) সংসার ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন, এবং তাঁর পুত্র, পুত্রবধূ এবং তাঁদের শিশুসন্তান তাঁকে বিরত করার চেষ্টা করছে। বৈরাগ্যের এই ছবিটিতেও বৈধব্যের চাইতে বয়সের ব্যাপারটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় শিল্প সাহিত্যের এই দু'একটি উদাহরণ

গৃহত্যাগকে বয়সের ধর্ম হিসাবেই দেখাচ্ছে, বৈধব্যের ধর্ম হিসাবে নয়। এছাড়া প্রাচীনকালে বর্ষীয়সী বিধবা ছাড়াও কোনো কোনো মেয়ে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন, এমন নজির আছে। ধর্মশাস্ত্রের যুগে কিন্তু সন্ন্যাসিনীকেও মোক্ষলাভের শর্তহিসাবে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে হত, এমন কাহিনি পাওয়া যায়।[৫] 'মেরিগাথা'র রচয়িতা বৌদ্ধ ভিক্ষুণীরা সংসারের বাইরে নিজেদের জন্য একটি সম্মানজনক পরিসর তৈরি করে নিতে পেরেছিলেন, খ্রিস্টজন্মের পাঁচশত বছর আগের কথা সেটা। মধ্যযুগেও ভক্তি আন্দোলনের কোনো কোনো ধারায় কোথাও কোথাও বৈরাগ্য মেয়েদের জন্য সংসারের বাইরে একটা স্বাতন্ত্র্যের জায়গা সৃষ্টি করেছিল।[৬] এইসব ঐতিহ্যগুলিকে ব্রজবাসিনী বিধবারা সংসারের চৌহদ্দি পেরিয়ে যাবার ক্ষেত্রে কতখানি ব্যবহার করেছিলেন, তা খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

ষোড়শ শতাব্দীতে চৈতন্যদেবের সময় থেকে তাঁর ভক্তি আন্দোলনের ধারা তৎকালীন বঙ্গ সমাজের যে অংশটিকে নিষিক্ত করেছিল, তাদের কাছে বৃন্দাবন একটি জনপ্রিয় তীর্থস্থান হয়ে ওঠে। চৈতন্যের ছয় শিষ্য, যাঁরা ছয় গোস্বামী বলে পরিচিত, তাঁরা বৃন্দাবনেই তাঁদের ধর্মচর্চা ও ধর্মপ্রচারের কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। কথিত আছে, বৃন্দাবন তখন কয়েকটি ছোটো ছোটো গ্রামের সমষ্টি ছিল, সেখানে মূলত মুসলমান পশুপালকরা বসবাস করতেন। জয়পুরের রাজা মানসিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং স্বয়ং সম্রাট আকবরের 'সহৃদয় সমর্থনে' এই ছয় গোস্বামী এখানে জমির স্বত্ব পান, এবং এখানে প্রথম কয়েকটি মন্দির স্থাপন করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের একটি পীঠস্থান হিসাবে বৃন্দাবন ও সংলগ্ন এলাকাগুলিতে 'ব্রজধামে'র প্রতিষ্ঠা করেন।[৭] বৃন্দাবন ও বঙ্গদেশের মধ্যে স্বভাবতই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের একটি ব্যস্ত তীর্থযাত্রার পথ গড়ে ওঠে। ক্রমে ক্রমে মুর্শিদাবাদের 'লালাবাবু' (দেওয়ান কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ), রাজশাহীর চৌধুরানী কালিসুন্দরী, বর্ধমানের মহারাজা প্রমুখ ধনী বাঙালী ভূস্বামীরা এখানে বহু ভূসম্পত্তি খরিদ করে মন্দির, বাগিচা ও ঘাট বানানোর ব্যবস্থা করেন, ও বহু দাতব্য সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেন।

ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে কখন যে প্রথম বাঙালি বিধবাদের মধ্যে সংসার ত্যাগ করে বৃন্দাবনে বসবাস করার প্রথাটি চালু হয়, তা বলা মুশকিল।[৮] তবে উনিশ শতকের সাহিত্যে এরকম আলেখ্য একাধিক পাওয়া যাচ্ছে। উপরে উল্লিখিত F. S. Grouse এর বইতে বিধবাদের ব্যাপক উপস্থিতির কোনো নজির নেই, যদিও উৎসবের সময়ে বহুসংখ্যক বাঙালীর জড়ো হবার কথা আছে। বয়স্ক ভূস্বামিনীরাও দানধ্যান করার উদ্দেশ্যে এখানে বসবাস করতেন। কিন্তু তাছাড়াও সব ধর্মস্থানেই যেমন ভিক্ষাবৃত্তি ও নানা বেআইনি ব্যাবসার রমরমা হয়, অনুমান করা যায় ব্রজধামও তার থেকে কোনো ব্যতিক্রম ছিল না; নিঃস্ব ভিক্ষাজীবিনী বিধবা, 'বাড়ির বার হয়ে আসা' বা পাচার-করা তথাকথিত 'ভ্রষ্টা' নারী, বা বয়স্ক বেশ্যা — এই বিভিন্ন ধরনের মেয়েদের কাছেও বৃন্দাবন যে একটা আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই। বৈষ্ণব মঠ বা আখড়ায় 'সেবাদাসী' প্রথার প্রচলন মেয়েদের উপস্থিতির আরো একটা কারণ ছিল, যদিও এই সংসার ত্যাগিনীরা সবাই বিধবা ছিল না। ১৮৭২ সালে 'জামাইবারিক' নাটকে পদ্মলোচনের এক স্ত্রী আরেক স্ত্রীকে ব্যঙ্গ করে ছড়া কেটে বলে: 'আমি বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী এসেছি বৃন্দাবন'। ছড়াটি অবশ্যই বৃন্দাবনের আশ্রয়প্রার্থিনীদের মধ্যে বয়স্ক, তথাকথিত 'ভ্রষ্টা' নারীর উপস্থিতিকে চিহ্নিত করে। ১৮৮৬ সালে প্রকাশিত দুর্গাচরণ রায়ের 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন' শীর্ষক ব্যঙ্গাত্মক রম্য কাহিনিতে দেবতারা বৃন্দাবন দর্শনে উপস্থিত হলে একটি 'দুঃখিনী বঙ্গরমণী' তাঁদের ঘরদোর পরিষ্কার করে দেন, জিজ্ঞাসিত হয়ে তিনি জানান, স্বামী বিয়োগের পর জ্ঞাতিরা বিষয় কেড়ে নেওয়াতে তিনি বৃন্দাবনবাসিনী হন এবং তীর্থযাত্রীদের কাজ করে দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন। পরে চৈতন্যদাস বাবাজির আখড়ায় সেবাদাসীদের হাত এড়িয়ে ঘরে ফিরে বরুণের কাছে তাঁরা খবর পান :

> বঙ্গদেশের মহাবংশসম্ভূত অনেক স্ত্রীলোককেও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহারা পতিপুত্রবিহীনা হইয়া সংসার সুখে জলাঞ্জলি দিয়া বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করিতেছেন। অনেক দুশ্চরিত্রা রমণীও স্বদেশে লোকলজ্জার ভয়ে বৃন্দাবনে আসিয়া বসতি করে। সর্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ ইত্যাদিতে তাহাদের বেশ এত পরিবর্তিত হইয়াছে যে হঠাৎ দেখিলে চিনিতে পারা যায় না।[৯]

এই একটি পাঠ্যবস্তু থেকে উনিশ শতকের শেষ দিকে বৃন্দাবন বা ব্রজধামে আমরা তিনধরনের বাঙালি নারীর উপস্থিতির কথা পাচ্ছি : (১) বিষয়বঞ্চিতা 'দুঃখিনী বঙ্গরমণী', যিনি ভদ্রলোকের বাড়িতে ঝি-এর কাজ করে দিনগুজরান করেন; (২) 'মহাবংশ সম্ভূত' কিন্তু 'পতিপুত্র বিহীনা' স্ত্রীলোক, যাঁরা বৈরাগ্যবশত ও পুণ্যঅর্জন করার উদ্দেশ্যে বৃন্দাবনে এসে বসবাস করছেন এবং (৩) তথাকথিত 'দুশ্চরিত্রা রমণী', যাঁরা বৈষ্ণবী ভেক নিয়ে নিজেদের প্রকৃত পরিচয় লুকিয়ে বৃন্দাবনে আছেন। মনে হয়, এই তিনটি শ্রেণীর একটি থেকে অন্যটিতে অধঃপতনেরও প্রচুর সুযোগ ছিল। ফলে এটা একেবারে জল-অচল কোনো বিভাজন ছিল না। বস্তুত এখনও এরকম মেয়েদের উপস্থিতির কথা জানা যায়, যাঁদের বিষয় সম্পত্তি যথেষ্টই ছিল। কিন্তু বৃন্দাবনে এসে গুরুর নামে সম্পত্তি লিখে দেবার ফলে এখন তাঁরা কপর্দকহীন, এবং সংশ্লিষ্ট মঠ বা আখড়ার ওপর একান্তই নির্ভরশীল। এছাড়া উনিশ শতকে যখন সতীদাহপ্রথা রদ হয়ে গেল, তখন বিধবাকে সম্পত্তির ভাগ থেকে বঞ্চিত করার জন্যই কাশী-বৃন্দাবনে তাঁদের বসবাস করতে পাঠানোর প্রথা চালু হয়েছিল কিনা তা একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয় হতে পারে। অন্যদিকে তরুণী বিধবাকে ফুসলিয়ে তাঁকে সংসারচ্যুত করে বৃন্দাবনে এসে পরিত্যাগ করার ঘটনাও সাহিত্যিক নজিরে বর্তমান। রণজিৎ গুহের মতে, বৈষ্ণবী আখড়াগুলিতে বসবাসকারী মেয়েদের বেশির ভাগই হিন্দু ঘরের বিধবা। এবং তাঁদের অনেকেই এখানে এসে পৌঁছেছিলেন ধর্মীয় আবেগের ফলে নয়, কোনো যৌন অপরাধের কারণে সমাজচ্যুত হয়েই তাঁদের এখানে উপস্থিত হওয়া, এবং কিছু আখড়াতে যে অবৈধ সন্তানের জন্মরোধ করার জন্য গর্ভপাত করানোর ব্যবস্থাও থাকত, এমন কিছু কিছু প্রমাণ তিনি পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন।[১০] অভিবাসনের একটি কারণ এটা হতেই পাবে, কিন্তু অধিকাংশ সময়ে বিভিন্ন কারণে বা একাধিক কারণ একযোগে ঘটার ফলেই মেয়েরা সংসার ছেড়ে বৃন্দাবনবাসিনী হতেন এরকম মনে করারও যথেষ্ট অবকাশ আছে।

এক্ষেত্রে ধর্মীয় আবেগের ভূমিকাকে খাটো করে দেখা যায় না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদ যথেষ্ট রক্ষণশীল; কিন্তু ওর চৈতন্যের ভক্তি আন্দোলন বাংলার নিম্নবর্গীয় বা অধস্তন জনসাধারণের মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তার থেকে একেবারে সরে থাকতে পারেনি। গোস্বামীদের 'রাগানুগা ভক্তি' ও মঞ্জরী সাধনার তত্ত্ব উচ্চ দার্শনিকতার স্তরে বিহার করলেও তা ছিল বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের অপর মেরুতে। ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও তাই সহজিয়া সাধনার সঙ্গে যে সবসময়েই তার জল-অচল সম্পর্ক ছিল এমনটা বলা যায় না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতবাদে 'রাগানুগা' ভক্তির আকর হিসাবে রাধাকে যে প্রাধান্য দেওয়া হয়, তার তাৎপর্য ভাবগত এবং আধ্যাত্মিক। তবু সহজিয়া সাধনায় নারী যে গুরুত্ব পায় তার সঙ্গে এই মতাদর্শের এক নিগূঢ় বন্ধন আছে। যে রূপ গোস্বামী সম্পর্কে এমন প্রচলিত কাহিনি আছে যে নারী বলে তিনি বৃন্দাবনে আগত মীরাবাঈ-এর সঙ্গেও দেখা করতে চাননি, অন্য লোকশ্রুতি অনুযায়ী তিনিও ছিলেন সহজিয়া পথের পথিক। হিতেশরঞ্জন সান্যালের মতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের রক্ষণশীলতার পাশাপাশি আবার তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদী আদর্শ থেকে চ্যুতির কিছু কিছু রেশও আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতাবলম্বী নারী বা বৈষ্ণবীদের মধ্যে যে সচলতা ও শিক্ষার প্রসার তা লক্ষ্য করার মতো। যেখানে সত্যিই তারা সমসাময়িক 'ভদ্রঘরে'র মেয়েদের থেকে অনেক এগিয়ে

রয়েছে, সেখানে তিনি এই চ্যুতিরই ফসল দেখতে পেয়েছেন। তাঁর মতে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব ভিন্ন অন্য কোনো সম্প্রদায়ে স্ত্রীলোকদের শিক্ষা ও স্বাধীনতা তখনকার দিনে অভাবনীয় ছিল'।[১১] 'বঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম' শীর্ষক বইটিতে রমাকান্ত চক্রবর্তীও বলেছেন বৈষ্ণব সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদের আধিপত্য থেকে যাওয়া সত্ত্বেও ব্রাহ্মণেতর জাতিরা এবং বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত নারীরা এক ধরনের 'ধর্মীয় স্বাধিকার' লাভ করেছিলেন।[১২] যেখানে ব্রাহ্মণ্যবাদী পিতৃতান্ত্রিক সমাজ মেয়েদের গৃহ-অন্ত ভূমিকাতেই ধরে রাখতে চায়, সেখানে বৈষ্ণবী ভক্তির চর্চা যে তাদের জন্য ভিন্ন একটা পরিসরকেও সম্ভব করেছিল, এমন অনুমান হয়তো করা যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের মধ্যে স্বকীয়া-তত্ত্ব প্রবল হওয়া সত্ত্বেও বৈষ্ণব সাধিকার চূড়ান্ত দায়বদ্ধতা কখনোই সংসারের প্রতি গৃহবধূর দায়বদ্ধতার সঙ্গে সমার্থক নয়। বরং এটা একটা বিশেষ ধরনের অবস্থা যখন সংসারের প্রতি প্রবল বিরাগ ভক্তির ঐকান্তিকতারই প্রকাশ। যে নারীকে সাধারণত সংসারগতপ্রাণ বলে ভাবা হয়, ভক্তিসাধনা তার সংসার সম্বন্ধে নিগূঢ় অনীহার আশ্রয় হয়ে দাঁড়াতে পারে।

নানা ধরনের ভক্তি-আন্দোলনের মধ্যে অনেক সময়েই নারীর জন্য এরকম একটি বিকল্প পরিসরের হদিশ পাওয়া যায়। মীরাবাঈ-এর প্রচলিত কাহিনিতে যেহেতু বৃন্দাবনের সঙ্গে তাঁর একটা যোগসূত্র তৈরি করা হয়েছে, তাই এই প্রসঙ্গে মীরাবাঈ-এর আদর্শটিই আমাদের সবচেয়ে আগে মনে আসে। মীরাবাঈ বিধবা ছিলেন না, তাঁর স্বামী কে ছিলেন তা নিয়ে মতভেদ আছে; কিন্তু কিংবদন্তি তাঁর যে ভাবমূর্তি তৈরি করে সেখানে তিনি কৃষ্ণের প্রণয়িনী এবং সেবিকা হিসাবেই নিজেকে কল্পনা করেছেন; এবং বৈষ্ণবশাস্ত্রের রাধার মতোই এই প্রেমের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে কুল ও সংসার ত্যাগ করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছেন। সাধারণ কুলবধূর ক্ষেত্রে যা কলঙ্ক বলে মনে করা হত, সাধিকার পক্ষে সেই ব্যবহার স্বাভাবিক বলে গণ্য হয়েছে। মহিলা কমিশনের সমীক্ষাটিতে দেখা গেছে, সাধিকার জীবনের এই ভাবাদর্শ বিবাহিতা, স্বামী পরিত্যক্তা বা বিধবা যে কোনো নারীর কাছেই বিশেষ পরিস্থিতিতে সংসার যাত্রার তুলনায় লোভনীয় মনে হতে পারে। সংসার ত্যাগ করা সাধিকার একটি মূল চরিত্র লক্ষণ। এখানে সাধিকা অন্য নারীর থেকে আলাদা।

বিভিন্ন প্রাচীন ভাষাগোষ্ঠীর কিংবদন্তিতে আমরা থেকে থেকে এরকম একটি নারীচরিত্র দেখতে পাই যে কোনো রহস্যময় বহির্জগৎ থেকে এসে একজন পুরুষের কাছে বাঁধা পড়ে যায়, তার ঘরকন্নার তার গ্রহণ করে, তার ঔরসে সন্তান ধারণ করে, তারপর একদিন কোনো প্রাক্‌শর্ত লঙ্ঘিত হবার অজুহাতে তার যৌন দোসর ও সন্তানদের ফেলে রেখে উধাও হয়ে যায়। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে উর্বশী ও পুরূরবার কাহিনিতে এমনই একটি বিভঙ্গ দেখা যাচ্ছে। অনেক নৃতত্ত্ববিদ্ মনে করেন, এর মধ্য দিয়ে প্রাচীন সমাজে অসবর্ণ বা গোষ্ঠীবহির্ভূত বিবাহের ঘটনার প্রতীকী উপস্থাপনা রয়েছে। কিন্তু কেউ কেউ আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে এধরনের একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে এসব কাহিনি এমন সমাজের সৃষ্টি যেখানে নারী চিহ্নিত হয়েছে সংসারের মধ্যে একটি বহিরাগত শক্তি হিসাবে, যে শক্তির কাছে বিবাহিত জীবনের দায়গুলি কোনো একান্ত নিজস্ব ব্যাপার নয়, এগুলি যেন তার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এর থেকে সে সব সময়েই মুক্তির সুযোগ খুঁজছে।[১৩] এই ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করে আমরা বলতে পারি, মেয়েদের নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যাপারে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগ যেমন এখানে প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি অন্যদিকে সাধারণভাবে সংসারগতপ্রাণ বলে পরিচিত মেয়েদের সংসার সম্বন্ধে অবদমিত অনীহা, বিতৃষ্ণা এবং তার থেকে মুক্তি পাবার গূঢ়েষা এই কাহিনির প্রতীকী বিন্যাসে ধরা পড়েছে। কমিশনের সমীক্ষায় বহু নারী সাক্ষ্য দিতে গিয়ে এই বিতৃষ্ণা প্রকাশ করেছেন, এবং সংসারে ফিরে যাবার ব্যবস্থা করে দিলেও তাঁরা ফিরে যেতে রাজি নন, এমন কথা জানিয়েছেন।

আমাদের মনে হয়েছে, ব্যক্তিস্তরে ছেলে, ছেলের বৌ, ভাই বা স্বামীর প্রতি অভিবাসিনীর যে অনাগ্রহ, তার পেছনে ব্যাপক আগ্রহের একটা প্রেক্ষাপট অনেকক্ষেত্রেই রয়েছে। এখানে আরেকটি লক্ষ্য করার মতো বিষয় এই যে স্মৃতিভিত্তিক ব্রাহ্মণ্যবাদে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান যেখানে মেয়েদের সংসারযাত্রার চাকায় বেঁধে রাখার একটি উপায় হিসাবে প্রাধান্য পেয়েছে, সেখানে বৈষ্ণব ভক্তি আন্দোলনের আপেক্ষিক উদারতার সুযোগ নিয়ে ধর্মবিশ্বাস কোথাও কোথাও মেয়েদের ঘরের বাইরে বেরোবার একটা রাস্তা করে দিয়েছে। তরুণী বিধবার মন যাতে সংসারের গণ্ডির মধ্যেই আটকা থাকে, সেজন্য তার কাঁধে গৃহকর্মের ভার তুলে দেওয়া ছাড়াও তাকে অনেক সময়ে গৃহদেবতার সেবার পূর্ণ দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হত। শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাসে এমন উদাহরণ একাধিক। অনেক সময়ে বিধবাকে বলা হত গৃহদেবতাকেই স্বামীজ্ঞানে পূজা ও সেবা করতে। অন্যদিকে আবার এই ধর্মীয় আবেগ এবং পুণ্যঅর্জনের তাগিদকে আশ্রয় করেই তাঁদের পক্ষে বাড়ি থেকে বাইরে বেরোনোর যে অনন্য উপায় অর্থাৎ তীর্থযাত্রা, সেই সুযোগ তাঁদের হাতের কাছে এসে যেত। তীর্থযাত্রিণীদের পুণ্যসঞ্চয়ের আকুলতার সঙ্গে সংসার থেকে সাময়িক মুক্তি পাবার সুস্বাদ কতটা কীভাবে মিশে যেত সেটা আমাদের অনুমানের বিষয় হতে পারে। স্বামীপুত্রপরিবৃতা সধবার চাইতে বিধবার পক্ষে তীর্থযাত্রায় যোগ দেবার সুযোগ যেমন বেশি ছিল, তেমনি বিকল্প হিসাবে সাধিকার জীবন বেছে নেওয়াও হয়তো কিছুটা সহজ ছিল। সংসারের আবদ্ধতা, তার একঘেয়ে চাপ, তার দমবন্ধ-করা অবহেলা ও পীড়ন থেকে বাইরের জগতে বেরোবার একটা উপায় হয়তো মিলেছিল তার মধ্যে।

এই সমীক্ষা করতে গিয়ে আমাদের দেখা হয়েছিল রাধাগোবিন্দ আশ্রমের বনলতা দাসীর সঙ্গে (আসল নামটি গোপন রাখা হল)। তাঁর বয়স তখন ষাটের ওপরে। এই আশ্রমের কাজকর্মে তাঁর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। তিনি এখানকার 'জমাদারনি', অর্থাৎ আশ্রমের ভাণ্ডারের চালডাল ও অন্যান্য যেসব সামগ্রী জমা পড়ে, তার বিলিবণ্টন করার দায়িত্ব তাঁর ওপরে। তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, ওপার বাংলার এক বৈষ্ণব মাহিষ্য পরিবারে তাঁর জন্ম। তিনি বালবিধবা। বাপের বাড়ির অবস্থা সচ্ছল। দেশভাগের পরে তাঁর বাবা এই তরুণী বিধবার নিরাপত্তার কথা ভেবে তাঁকে এপারে পাঠিয়ে দেন। একটি রিফিউজি ক্যাম্পে থেকে তিনি ভালোভাবে সেলাই ও হাতের কাজ শেখেন। হয়তো এখানেই তাঁর নিজের পায়ে দাঁড়াবার একটা ব্যবস্থা হয়ে যেত। বাবা তাঁকে টাকাও পাঠাতেন। কিন্তু এই সময়ে সঙ্গিনীদের সঙ্গে 'মীরাবাঈ' নামে একটি চলচ্চিত্র দেখে তাঁর মনে একটা পরিবর্তন আসে। ছবিটি তিনি বারবার দেখেন এবং এর ফলে তাঁর মনে হয় যে মীরা যদি কৃষ্ণের ভজনায় সারা জীবন কাটাতে পেরে থাকেন, তবে তিনিই বা কেন পারবেন না? অতঃপর আশ্রয়দাতাদের সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করে তিনি সাথীসঙ্গতি জোগাড় করে বৃন্দাবনে চলে যান এবং তারপর থেকে এখানেই থাকতে আরম্ভ করেন। এই কাহিনীর অনেকটাই হয়তো পুনর্নির্মিত; তাই আক্ষরিক সত্য নয়, ব্যক্তিগত প্রেক্ষণের সত্যই এখানে আমাদের অনুসন্ধিৎসার বিষয়। অর্থাৎ আমরা জানতে চাইছি, আজকের বনলতা দাসী নিজের অতীত জীবনের স্মৃতি যেভাবে তৈরি করে নিয়েছেন, তার উপকরণগুলির বাছাই কীভাবে হল।

তাঁর বয়ানে কিন্তু কোথাও বনলতা নিজেকে সমাজ ব্যবস্থা বা পারিবারিক ব্যবস্থার অসহায় শিকার হিসাবে দেখেননি। বরং এই ইঙ্গিতই তিনি বারবার করেছেন যে বালবিধবা হিসাবে নিজস্ব সংসার করার তাগিদ নয়, বরং অন্য কয়েকটি বিকল্পই তাঁর সামনে ছিল। বৃন্দাবনবাসিনী হবার বিকল্প হতে পারত সচ্ছল পিতৃগৃহে ফিরে যাওয়া, অথবা হাতের কাজ শিখে নিজের জীবিকা অর্জন করা। এই বিকল্পগুলিকে স্বেচ্ছায় বাদ দিয়ে তিনি রাধানাম বিজড়িত বৃন্দাবনে সাধনভজন করার জন্য নিজের

তাগিদেই এসেছিলেন, তাঁর কাহিনির স্পষ্ট প্রতিপাদ্য এটাই। ইনিই আমাদের জানিয়েছিলেন যে কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী হিসাবে উমাভারতী যখন বৃন্দাবনে বাঙালি বিধবাদের বিষয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, এদের সবাইকে লাথি মেরে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে এরা বৃন্দাবনে আসতে বাধ্য হয়েছে, তখন উপস্থিত বিধবারা বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন এবং বলেছিলেন, আমরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই সাধনভজনের জীবনযাপন করতে বৃন্দাবনে এসেছি; নিরুপায় হয়েই আমরা এ জীবনগ্রহণ করেছি, একথায় আমাদের অপমান করা হচ্ছে। বনলতা দাসীর মুখে স্বেচ্ছায় ধর্মীয় জীবনে আসার এই রূপকল্পটি যে শুধু বারবার উচ্চারিত হয়েছে তাই নয়, এই জীবনে পা দেবার ক্ষেত্রে যে অনুপ্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন, তাঁর মতে তা এসেছিল তাঁর পিতৃগৃহের বৈষ্ণব পরিবেশ থেকে নয়, যখন তিনি পরিবারের বাইরে ক্যাম্পে কিছুটা স্বাধীনভাবে থাকছেন, তখন অন্য মেয়েদের সঙ্গে 'মীরাবাঈ' ছবিটি দেখতে যাওয়ার ব্যাপারটাই এক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করেছিল। বিধবার প্রথাবদ্ধ জীবনে সিনেমা আধুনিকতার দূত হয়ে কড়া নেড়েছিল; চিরাচরিত ভক্তিভাবের বশবর্তী হয়ে নয়, সিনেমার রূপকল্পে আলোড়িত হয়েই তিনি এত বড়ো সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এমনটাই তাঁর নিজস্ব বক্তব্য। কোনো পুরুষের বাক্যকৈতবে ভুলে তিনি বৃন্দাবনে এসেছিলেন, এমন কোনো ধারণাও তাঁর বয়ান থেকে তিনি হতে দেননি। তবে আমাদের প্রশ্নের উত্তরে আরেকটি কথাও তিনি বলেছিলেন, যা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, বৃন্দাবনে আসার আগে ধারণা ছিল সেখানকার কুঞ্জে কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণের জীবন্ত উপস্থিতি এবং সাধনভজনের পুণ্য পরিবেশ এখানকার প্রতিটি ধূলিকণায় প্রতিবিম্বিত। এখানে এসে দেখলাম, অন্যান্য জায়গার মতোই বৃন্দাবনও একটি জায়গা, ভালোমন্দ সবই এখানে আছে, তবে এখন এখানে থাকাটাই অভ্যাস হয়ে গেছে, তাই বৃন্দাবন ছেড়ে আর কোথাও যেতে চাই না।

বনলতা বনলতাই। তাঁর মধ্যে যে চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং নিজেকে প্রকাশ করার যে ক্ষমতা আমরা দেখেছি, তা নিশ্চয়ই বৃন্দাবনের অভিবাসিনীদের মধ্যেও দুর্লভ। কোন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গিয়ে সেদিনকার সেই অনভিজ্ঞ তরুণী বিধবা আজ একটি বড়ো আশ্রমের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও প্রাত্যহিক পরিচালনায় নেত্রীস্থানীয় একটা ভূমিকা নিতে পারলেন, সেকথাও তিনি উহ্যই রেখে দিয়েছেন। কিন্তু সাধারণভাবেই, এই অভিবাসিনীদের মধ্যে ধর্মভাব কেবল অর্থনৈতিক দুরবস্থার ওপর বাইরের একটা পলেস্তারা মাত্র, একথা বললে সেটা হবে অতিসরলীকরণ। বনলতার কাহিনি এঁদের অভিজ্ঞতার একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিককে উন্মোচিত করে। এবং এখানেও আরো একবার সেই প্রশ্নটি উঠে আসে, ১৯৮৬ সালে রূপ কানোয়ারকে স্বামীর চিতায় পুড়িয়ে মারার পরে যে প্রশ্নটি ভারতের নারী-আন্দোলনের মধ্যেও একটা দ্বিধা সৃষ্টি করেছিল : 'স্বেচ্ছা'য় স্বামীর চিতায় সতী হবার অর্থ কী? 'স্বেচ্ছা'য় সংসার ত্যাগ করে একজন নারী সাধনভজনের জীবনকে বরণ করে নিল, এ কথার অর্থ কী? খুব অল্প কথায় বলতে গেলে, সীমাহীন স্ব-ইচ্ছার প্রয়োগ একটি বায়বীয় ধারণা মাত্র। ব্যক্তির স্ব-ইচ্ছা সংগঠিত হয় একটা সামাজিক চৌহদ্দির মধ্যে, যেখানে সাধারণত কাজের দ্বারা ইচ্ছার রূপায়ণের কিছু বিকল্প পরিসর থাকে, আবার কতগুলি বিকল্প আদৌ থাকে না। অষ্টাদশ শতকে যাঁরা 'স্বেচ্ছা'য় স্বামীর চিতায় উঠতেন, যাঁদের আত্মহনন থেকে কিছুতেই ঠেকানো যেত না, তাঁদের এই স্ব-ইচ্ছার বিকল্প পরিসর কতটুকু ছিল তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। বিশ শতকের শেষভাগে শহরের মধ্যবিত্ত ঘরের একটি শিক্ষিত একুশ বছরের মেয়ের পক্ষে পরিসরের সংকীর্ণতা বেশ কিছুটা কমেছে, এমনটা মনে করার সঙ্গত সামাজিক ভিত্তি আছে। তাই অষ্টাদশ শতকের স্বেচ্ছা-সতীত্বের ঘটনা উল্লেখ করে বিশশতকে স্বেচ্ছা-সতীত্বের ঢাকঢোল পেটানো যায় না। বনলতাদের স্ব-ইচ্ছাও একটা বিশেষ সামাজিক

পরিবেশের মধ্যে নির্মিত হয়েছে। সেই সামাজিক পরিবেশ একদিকে যেমন নারীর মানসিকতায় স্বামী সন্তান সংসারের প্রতি শর্তহীন বিশ্বস্ততার বিস্তীর্ণ আকর তৈরি করে, অন্যদিকে তার বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় সংসারের নিগড় থেকে মুক্তিলাভের গূঢ়েষাকেও তার মধ্যে বুনে দিতে পারে। কিন্তু এই গূঢ়েষা বাস্তবে কীভাবে রূপ পাবে, সামাজিক কাঠামোর মধ্যে তার কয়েকটিই নির্ধারিত পদ্ধতি আছে। বাঙালী বিধবার পক্ষে তারই একটি হল কাশী বা বৃন্দাবনবাস।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'দ্রবময়ীর কাশীবাস' ছোটো গল্পটিতে দুই পরিণত বয়স্কা বিধবার ছবি এঁকেছেন, যাঁদের একজন গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে আধ্যাত্মিকতায় মজে রয়েছেন, আর অন্যজন ফেলে আসা সংসারের খুঁটিনাটির স্মৃতিতে এত উদ্বেল যে শেষ পর্যন্ত কিছুতেই কাশীতে টিকতে পারেন না। গল্পটি দ্বিতীয় বিধবার চোখ দিয়েই দেখা, এবং তার মাধ্যমে প্রথমার ধর্মকর্মের বাড়াবাড়ি নিয়ে লেখক পরোক্ষে বেশ খানিকটা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন। গল্পটির মাধ্যমে মেয়েদের সংসার ত্যাগের বাসনার পরাজয়ই ঘোষণা করা হয়েছে, এবং সংসারগতপ্রাণ নারীর গতানুগতিক প্রাক্‌ধারণাকে ঘিরেই কাহিনিটি গড়ে উঠেছে। দ্রবময়ী স্বেচ্ছায় কাশী গেলেও অন্তর্নিহিত নারীস্বভাবের তাগিদেই তাঁকে ফিরতে হয়, গল্পটি একথাই বলে। কিন্তু এই গল্পে কতগুলি কথা উহ্য রয়ে গেছে। অভিবাসিনীর নিত্যকৃত্যে শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্যবোধের একটা উপাদান রয়েছে, সামাজিকতার একটা বাতাবরণ রয়েছে; সকালে উঠে নদীতে স্নান করা, ফুলতোলা, মালা গাঁথা, চন্দন বাটা, সম্ভব হলে দেবতার ভোগ রান্না করা ও ভোগ দেওয়া, আশ্রমে সকাল-সন্ধ্যায় চামর দুলিয়ে, মন্দিরা ও খমক বাজিয়ে ভজনের অনুষ্ঠান— এই সব কিছুর মধ্যে সাংসারিক প্রয়োজনের উর্ধ্বে একটা নিরপেক্ষ ভাবাশ্রয়ী ছন্দ আছে, যার সঙ্গে গুরুবাদী নিয়মতন্ত্রের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ক্ষীণ। এই জীবনে স্ব-আশ্রয়ী মেয়েদের মধ্যে একটা সখ্য ও সমিতির বোধ তৈরি হয় একই সঙ্গে করা নানা কাজের মাধ্যমে। ধর্মীয় জীবন বলতে যদি শুধু রেচক কুম্ভক আর গুরুর উপদেশ শোনা বোঝাত, তাহলে সংসারে নিস্পৃহ নারীর কাছে তার আকর্ষণ এমন নিবিড় ও বহুমুখী হত না। বিভূতিভূষণ তাঁর গল্পে ধর্মীয় আচারেব বাড়াবাড়িকে ব্যঙ্গ করতে গিয়ে তাঁর শক্তিকে কিছুটা খাটো করে দেখিয়েছেন। তীর্থধামে অভিবাসন যখন মেয়েদের কাছে সংসারের বিকল্প একটা পরিসর হিসাবে দেখা দেয়, সংসারের অবিরল আনকোরা চাহিদার বাইরে যখন একটা নির্মিত নিজস্বতার আভাস তার মধ্যে পাওয়া যায়, তখনই নিছক বিতৃষ্ণার থেকে বৈবাগ্যে উত্তরণ ঘটে। বৃন্দাবন তখন মানসবৃন্দাবনে পরিণত হয়। তার পরবর্তী পর্যায়ে বনলতা দাসীর মতো যদি স্বীকার করে নিতেও হয়, যে বৃন্দাবনেও ভালোমন্দ সবই আছে অন্য যে কোনো জায়গার মতোই, তবু তা সংসারের চাইতে সহনীয়। কারণ সেখানে নিজের মতো করে সিদ্ধান্ত নেবার অবকাশ আছে।

বিভূতিভূষণের গল্পে সম্পন্ন এবং দরিদ্র বিধবার মধ্যে একটা নিহিত তুলনা আছে। বৈরাগ্যের জীবন সম্পন্ন বিধবার মানসিক বিলাস এরকমও একটা ইঙ্গিত রয়েছে। কাশী বৃন্দাবনের ইতিহাসে সম্পত্তিশালিনী মহিলাদের বৈরাগ্যবরণ এবং দানধ্যানে জীবন কাটানোর বহু নজির রয়েছে। যে বিধবাদের নিজস্ব সম্পত্তি ছিল, তাঁদের পক্ষে তীর্থধামে এসে বসবাস করা যে অনেক সহজ ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এটা একটা পরিচিত তথ্য, যে প্রথাগত হিন্দু আইনে স্বামীর ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সম্পত্তিতে স্ত্রী অধিকার ছিল খুবই সীমিত। স্বামীর মৃত্যু ঘটলে 'মিতাক্ষরা' প্রথার তুলনায় 'দায়ভাগ' প্রথায় বিধবা একটু বেশি সুবিধা পেতেন : বঙ্গদেশে 'দায়ভাগ' প্রথাই প্রচলিত ছিল। তবু স্বামীর বিষয় আশয়ের ওপর তাঁর কতটুকুই বা নিয়ন্ত্রণ ছিল। স্ত্রীধনের ব্যাখ্যাও অনেক সময়েই এমনভাবে করা হত যে তা একমাত্র অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারত। তবু পারিবারিক সম্পত্তির যেটুকু সুবিধা তা শুধু বিধবাদেরই পাওয়া সম্ভব ছিল। সধবার পক্ষে কখনোই সংসার ত্যাগ

করে বৃন্দাবনে বাস করা এবং একই সঙ্গে স্বামীর কাছে আর্থিক নিরাপত্তার দাবি করা অধিকার বলে গণ্য হয়নি। এ দাবি পূরণ হবে কিনা, তা স্বামীর সহৃদয়তার ওপরই নির্ভর করত। 'কুলত্যাগিনী' হয়ে বৃন্দাবনে এসে নিঃস্ব অবস্থায় কোনো ধর্মীয় আখড়ায় আশ্রয়লাভ করার ঘটনা যে ঘটত, একথা আগেই বলেছি। এর থেকে এটাই প্রমাণ হয় যে অভিবাসনের বিকল্প, অর্থনৈতিক দিক থেকে মূলত বিধবাদেরই লভ্য ছিল। 'স্ত্রীর পত্র' গল্পটির মৃণাল তীর্থস্থান থেকে ফিরবে না স্বামীকে জানিয়েছিল। কিন্তু তার ভরণপোষণ কীসে চলবে তা গল্পে বলা নেই। স্বামীহীনার যৌনসত্তার সমাজের কাছে গভীর উদ্বেগের বিষয় ছিল। তাঁরা সংসারে না থেকে ধর্মীয় জীবন যাপন করলে এই উদ্বেগ প্রশমিত হতে পারে। সহায়সম্বলহীনা স্বামীগৃহত্যাগিনী, স্বামী পরিত্যক্তা বা বিধবাদের কাছেও তাই বৃন্দাবনে সাধিকা হতে পারাটা অহরহ সন্দেহের তাড়না থেকে মুক্তির পথ, সংসারে থেকে যে মর্যাদা পাওয়া যেত না, সেই মর্যাদা লাভের উপায়। অভিবাসনে বিকল্প যাঁরা গ্রহণ করতেন, তাঁদের স্ব-ইচ্ছার আদল এইভাবেই তৈরি হত।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সম্পত্তিশালিনী, দানধ্যানে নিযুক্ত বিধবারা ছাড়াও সাধারণ ঘরের বিধবারা এইসব নানা কারণে বৃন্দাবনে ভিড় জমাচ্ছিলেন এমন অনুমান হয়তো আমরা করতে পারি। যাঁদের অন্য আশ্রয় ছিল না, তাঁরা আখড়াগুলিতে থাকতেন, ছত্রে খাওয়া মিলত; যাঁরা বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিতেন, তাঁদের কাছে মাধুকরী বৃত্তিতে কোনো অসম্মান ছিল না। সাধন জীবনেরই একটি অঙ্গ ছিল সেটা। এইভাবে ন্যূনতম প্রয়োজন মিটিয়ে সংসারবৃত্তের বাইরে তাঁদের ধর্মীয় জীবন কাটত। ১৯১৪ সালে এই কাহিনি এক নতুন মোড় নেয়, যখন নওয়ালগড়ের শেঠ জানকিদাস পতৌদিয়া বৃন্দাবনে শ্রীভগবান ভজনাশ্রম নামে একটি ধর্মীয় সংস্থার পত্তন করেন। ধর্মস্থানে প্রতি বৎসর যে হাজার হাজার তীর্থযাত্রী আসতেন এবং দানের মাধ্যমে পুণ্য অর্জন করতেন, তাঁদের দিকে চোখ রেখে এই শেঠ এই জনপ্রিয় তীর্থে পুণ্যের উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের একটি অভিনব ও সহজ পন্থা বার করলেন। যে বিধবারা আখড়ায় আখড়ায় থেকে ভজন কীর্তন ও মাধুকরী বৃত্তিতে দিন কাটাচ্ছিলেন, এই ভজনাশ্রমগুলিতে সকালে ও বিকালে রাধাকৃষ্ণের নামগান করার পরিবর্তে তাঁদের প্রত্যেককে কিছু চাল-ডাল, কখনো বা সেই সঙ্গে দুটি করে টাকা দেবার ব্যবস্থা হল। পুণ্যার্থীরা আশ্রমের পরিবেশে নামগান শুনে পাপক্ষয় করার সুযোগ পেতেন; অন্যদিকে নিঃসম্বল বিধবাদেরও এখানে পুণ্য এবং রুজি দুই-ই একসঙ্গে অর্জন করার একটা জায়গা তৈরি হল। এই বিধবাদের সম্মানসূচক আখ্যা হল 'মাঈ'। এঁদের দৌলতে এবং এঁদের শ্রম ব্যবহার করে ভজনাশ্রমগুলি প্রতিবছর তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা আয় করত। বৃন্দাবন ও অন্যত্র এই ভজনাশ্রমগুলির অনেক শাখা গড়ে উঠল। কালক্রমে অন্যান্য অনেকেও পুণ্য উৎপাদনের এই ব্যাবসায় পুঁজি বিনিয়োগ করা শুরু করলেন। মনে হয় এই ব্যবস্থা গড়ে ওঠার ফলে অভিবাসন আরো উৎসাহিত হয়েছিল, এবং বৃন্দাবনে এসে সাধনজীবন যাপন করতে চাইলে দুমুঠো ভাতের অভাব হবে না এরকম একটা ব্যাপক জনশ্রুতিও তৈরি হয়েছিল। পরবর্তী বছরগুলিতে যখনই কোনো প্রাকৃতিক বা রাজনৈতিক আলোড়নের ফলে গৃহচ্যুত মানুষের সংখ্যা বেড়েছে, তখনই বেশ কিছু পরিবার যেমন বৃন্দাবনে পৌঁছে গেছে, তেমনি কিছু নিঃসঙ্গ নারীও এসেছেন। ইদানীংকালে অভিবাসনের এই ধারা অনেক ক্ষীণ। তবু ১৯৪৭ সালে দেশভাগ হওয়া থেকে শুরু করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, বা আরো কাছাকাছি সময়ে উড়িষ্যার সাইক্লোন বা মুর্শিদাবাদের বন্যার সূত্র ধরেও কিছু নিরাশ্রয় পরিবার বৃন্দাবনে এসে পৌঁছেছে। তার মধ্যে নিঃসম্বল বিধবারাও ছিল। এদের একাংশ পরে ঘরে ফিরে গেছে, কিন্তু কিছু মহিলা যে থেকে গেছেন তা এই ভজনাশ্রমগুলির ভরসাতেই, এমন অনুমান আমরা করতেই পারি।

পুঁজি বিনিয়োগভিত্তিক যে কোনো ব্যবস্থাতেই শ্রমশক্তিকে শোষণ করে উদ্বৃত্ত মূল্য আদায় করার বিষয়টি যেমন থাকে, পুণ্যের এই সংগঠিত প্রাত্যহিক উৎপাদনের ব্যবস্থাতেও তা আছে। ভজনাশ্রম থেকে 'মাঈ'রা টাকা এবং সামগ্রীতে তাঁদের শ্রমের মজুরি পান দিন বা ঘণ্টার হিসাবে। এর বাইরে তাঁদের আর কোনো দায় ভজনাশ্রমগুলি নেয় না। তাঁরা কোথায় থাকেন, রোগ হলে কীভাবে চিকিৎসা করান, মারা গেলে তাঁদের সৎকার কেমন করে হয়, সে সব তাদের দেখার দরকার নেই। দ্রব্যসামগ্রী বা টাকার পরিমাণ আগেও যা ছিল এখনও তাই রয়ে গেছে। বিশেষত বাসস্থানের অভাব তাঁদের একটা বড়ো সমস্যা, যাঁরা পারেন ঘরভাড়া করে থাকেন; যাঁদের সে সংগতি নেই তাঁদের আখড়ার বারান্দায় মাথা গুঁজে থাকতে হয়। তবু এই সব কিছু সত্ত্বেও অধিকাংশ বিধবাই সংসারে ফিরে যাওয়ার চাইতে এই সাধন ভজনের জীবনকেই শ্রেয় মনে করছেন। কিন্তু 'স্বেচ্ছা'য় বৃত এই ধর্ম জীবনের একটি যে অদৃশ্য কিন্তু কার্যকরী গণ্ডি রয়েছে, তার ইঙ্গিত আমরা পাচ্ছি ভজনাশ্রগুলির ওপর এই মহিলাদের একান্ত নির্ভরশীলতায়। এই ব্যবস্থাটা যতদিন চিরাচরিত পদ্ধতিতে কাজ করছিল ততদিন সংসারের বিকল্প এই পরিসরটির সঙ্গে তাঁরা এমনই একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন, যে শোষণের বোধও তাঁদের বিশেষ ছিল না। খুব সাম্প্রতিক কালে, বিশেষত 'বিশ্বায়নে'র হাওয়ায় এই পরিস্থিতির কতগুলি গুণগত পরিবর্তন ঘটছে, যার ফলে তাঁদের এই পরিসরটুকুও বিপন্ন। দিল্লি থেকে মথুরা পর্যন্ত যমুনার ধার ধরে যে কারখানাগুলি ছিল, তার অনেকগুলি বন্ধ। আজ বাঙালী বিধবাদের সঙ্গে তাই বৃন্দাবনে রুজির সন্ধানে আসা স্থানীয় পরিবারগুলির মেয়ে বউরা একটু বাড়তি রোজগারের আশায় ভজনাশ্রমগুলিতে ভিড় বাড়াচ্ছে। Pilgrimage Tourism-এর দৌলতে পাউন্ড বা ডলার পকেটে নিয়ে বহু বিদেশী ট্যুরিস্ট বা অনাবাসী ভারতীয় ধর্মস্থানগুলিতে আসছে, তাদের চাহিদা মেটাতে ভজনাশ্রমগুলি তিনতারা-পাঁচতারা হোটেলে বা অতিথিশালায় পরিণত হচ্ছে। 'মাঈ'দের কাছ থেকে যে পরিষেবা পাওয়া যায়, তা আর তাদের মুনাফার মূল উপাদান নয়। এ ব্যবসা তারা আর ছড়াতে চায় না। ভজনাশ্রমগুলিতে বয়স্কা বিধবাদের সঙ্গে কম বয়েসী মেয়েদের একটা সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটতে দেখা যাচ্ছে। পরিষেবার ধরনটা পালটাচ্ছে কিনা সেটাও বিবেচ্য। এরাও কি 'স্বেচ্ছা'য় ধর্ম জীবনযাপন করতে আসছে? এছাড়া বৃন্দাবনের ভূসম্পত্তি পুরনো মালিকদের হাত থেকে এক ধরনের জমি-মাফিয়া ও প্রোমোটারদের হাতে চলে যাচ্ছে। ফলে বয়স্ক বিধবারা যেসব পুরনো বাড়িতে ঘরভাড়া করে থাকতেন, অনেক জায়গায় সেখান থেকে তাঁদের উৎখাত হয়ে যেতে হচ্ছে।

সংসারবৃত্ত থেকে মুক্তির আশায় যে মেয়েরা ধর্মীয় জীবনের মধ্যে হাঁফ ছাড়ার মতো একটা বিকল্প পরিসর খুঁজেছেন, যাদের কাছে বৈরাগ্য একটা উত্তরণের চেহারা নিয়ে এসেছে, পরিবারের চাইতে বৃহৎ এবং শক্তিশালী অথচ অদৃশ্য এক আত্মীকরণের যন্ত্র তাঁদের কী করে আপন গহ্বরে টেনে নেয় তার একটা পরিষ্কার উদাহরণ বৃন্দাবনের অভিবাসিনীদের মধ্যে আমরা দেখি। প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় হিন্দু সমাজের সংকীর্ণ আচারনিষ্ঠতার বিপরীতে লৌকিক ধর্মবিশ্বাসে কিছুটা উদারতার স্থান আছে যারা অধঃস্তন অবস্থায় রয়েছে তাদেরই রচিত সেই স্থান। কিন্তু এই জায়গাটাও অনেক বড়ো এক বেড়াজালে ঘেরা, বৈরাগ্যের বর্ণমালাতে সেই জবরদস্তির পরোক্ষ ইঙ্গিত থাকে।

প্রাসঙ্গিক টীকা

১. 'Widowhood in India among the upper most castes was traditionally, and until quite recently, a state of social death. The widow's social and civil death stemmed from her abination from reproduction and sexuality, following the loss of her husband and her

exclusion from the functioning social unit of the family'. *Gendering Caste : Through a Feminist Lens*, Uma Chakravarti, Stree, Kolkata, 2003. P. 82.

২. 'Widowhood and Mortality in India', P.N. Mari Bhat, *Widows in India : Social Neglect and Public Action.* ed. Maria Alter Chen. Sage publications, New Delhi, 1998, P. 173-188.

৩. Martha Alter Chen, যিনি ভারতীয় বিধবাদের নিয়ে বিস্তারিত চর্চা করেছেন, তাঁর একটি প্রকাশিত পুস্তকে বলেন 'Vrindaban is also home to some ten thousand widows, most of whom are from West Bengal' Perpetual Mourning : Widowhood in Rural India, Oxford University, Press, 2000. P. 148) এই তথ্য তিনি কোথা থেকে পেলেন তা কিন্তু জানাননি। তাঁর মতে অবশ্য এই বিধবাদের বৃন্দাবনে আসার প্রধান কারণ বৈষ্ণব ধর্ম—বিশেষত রাধাকৃষ্ণের লীলা-অনুষঙ্গের আধ্যাত্মিক আকর্ষণ।

৪. কালীপ্রসন্ন সিংহের অনূদিত মহাভারত; সম্পাদনা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়; বসুমতী সাহিত্য মন্দির, সন বাংলা ১৩১১; পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ৪৯৩।

৫. *The Position of Women in Hindu Civilization*, A. S. Altekar, Motilal Banarasidass Publishers, New Delhi, 1959, P.33.

৬. *Gendering Caste : Through a Feminist Lens*. P. 94-95.

৭. Mathura : A District Memoir, F. S. Grouse, 1882, P. 197.

৮. ১৮৫৭ সালে যদুনাথ সর্বাধিকারীর লেখা তীর্থভ্রমণ (সম্পাদিত : নগেন্দ্রনাথ বসু, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩২২) গ্রন্থটিতে 'শ্রী বৃন্দাবনের পরিচয়' দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন : 'বঙ্গ দেশীয় ব্যক্তি অধিক থাকে, বিশেষতঃ বিধবাজাতি, শুঁড়ি, সুবর্ণবণিক, তাঁতি, অধিকাংশ অন্য অন্য সকল জাতি আছে।' (পৃ. ৯০-৯২)

৯. দেবগণের মর্ত্যে আগমন, দুর্গাচরণ রায়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৪। পৃ. ৭২।

১০. 'Chandra's Death', in *Subaltern Studies V, Writings in South Asian History and Society.* ed. R. Guha Delhi, O.U.P. 1987, P.158.

১১. *বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস*, হিতেশরঞ্জন সান্যাল, সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্সেস, কে. পি. বাগচী, কলকাতা, ১৯৮৯। পৃ. ৪৩।

১২. *বঙ্গে বৈষ্ণবধর্মের একটি ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন*। রমাকান্ত চক্রবর্তী, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৬। পৃ. ১৬৭।

১৩. 'I will propose that the swan maidan tale could at one time be found virtually in every corner of the world because in most of the cultures that retained it and that were reflected in its variants, woman *was* a symbolic outsider, was the *other*, and marriage demanded an intimate involvement in a world, never quite her own. The stories themes depict this estrangement. *In Search of The Swan Maiden. A Narrative on Folklore and Gender*. Barbara Fass Learcy. New York University Press, 1994. P.2.'

১৪. 'Widows Versus Daughters or Widows as Daughters? Property, Land and Economic Security in Rural India', Bina Agarwal, in *Widows in India : Social Neglect and Public Action*, Ed. Martha Alter Chen, Sage, 1998, P. 132.

বাংলা লোকগীতিতে প্রেম

রমাকান্ত চক্রবর্তী

প্রেম সম্বন্ধে সংখ্যাতীত লোকগীতি প্রচলিত আছে। কিন্তু তার কোনও নির্ভরযোগ্য সঙ্কলন নেই। অথচ, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি কবিদের দ্বারা রচিত প্রেমগীতি-সংকলনের অভাব নেই। এর বহু কারণের মধ্যে একটা কারণ, লোকগীতি সম্বন্ধে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালির নাসিকা কুঞ্চন। নাসিকাকুঞ্চনের একটি দৃষ্টান্ত ঋষি অরবিন্দ-শিষ্য, এবং খ্যাতনামা গায়ক দিলীপকুমার রায়ের পল্লীগীতি বিষয়ক নেতিবাচক সমালোচনা।[১] তাঁর ধারণা শাস্ত্রীয় মার্গসঙ্গীতের শিল্পীগণ যেরকম অনুশীলন করে সিদ্ধি অর্জন করেন, পল্লী-সঙ্গীতে সেই অনুশীলন অপ্রাসঙ্গিক ও নিষ্প্রয়োজনীয়। এই ধারণা ঠিক নয়। আব্বাস-উদ্দীন আহ্‌মদ্‌-এর মতো প্রসিদ্ধ লোকসঙ্গীত শিল্পীকে সিদ্ধি অর্জনের জন্য অনুশীলন কবতে হয়েছিল।[২] অনেক লোকসঙ্গীত শিল্পী গলা সাধেন। লোকসঙ্গীতের রসগ্রহণ অবশ্যই ভাষাব আঞ্চলিকতার জন্য বিঘ্নিত হতে পাবে। নবদ্বীপেব মানুষের পক্ষে চট্টগ্রামের, চট্টগ্রামেব মানুষেব পক্ষে ঝাড়খণ্ডের গানের ভাষা ও তার উচ্চারণ দুর্বোধ্য হতে পারে, কিন্তু মাধুর্যময সুরেব আবেদন, গায়নশিল্পের বিশিষ্টতা— এ সব যাবে কোথায়? তবে লোকসঙ্গীতের চর্চা, লোকসঙ্গীত বিষযে গবেষণা পশ্চিমবঙ্গে ক্রমশ ক্ষীণ হযে যাচ্ছে। সমস্ত জোব এসে পড়ছে বাউল গানেব উপবে। অথচ সে গান আদৌ প্রেমের গান নয়, ধর্মের গান। বিচ্ছেদমূলক ভাওয়াইয়া গানের ভাষায ও সুরে যে মর্মন্তুদ দুঃখ প্রকাশিত হয়, তা অনুভব কবতে হ'লে সেই ভাষা ও সুব সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা দবকাব। এই জ্ঞান চর্চা এখন বেশ কিছুটা দুর্বল। লৌকিক প্রেমের গান একটা বড় বিষয়; এর বিভিন্ন উপাদান ও প্রকবণ সম্বন্ধে ভাল গবেষণা অবশ্যই হতে পাবে।

বাংলা লোকগীতিতে প্রেম বিষয়ক আলোচনায় প্রথমে মাত্রাব প্রসঙ্গ আসে। লোকগীতিতে বর্ণিত প্রেম বিশেষভাবে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনীর দ্বারা প্রভাবিত। 'সুভাষিতরত্নকোষ'-এ সঙ্কলিত একটি শ্লোকে দেখি, এক বাউল-গাযক রাধাকৃষ্ণের গোপন প্রেমের গান গেয়ে নগরের মানুষের নিদ্রা প্রত্যুষেই অপনোদন করছেন।[৩] রাধাকৃষ্ণের প্রেমের গান তা হলে খ্রিস্টীয় একাদশ শতকেও আমাদের দেশে গাওয়া হতো। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকের উল্লেখযোগ্য রচনা। এখনও তা জনপ্রিয়। কিন্তু বাংলা লোকগীতিতে 'গীতগোবিন্দ'-এর প্রভাব দুর্লক্ষ্য। লোকগীতির রাধাকৃষ্ণ কখনও সংস্কৃত অলঙ্কারিক গুণ ও রীতির ধার ধারেন না। অথচ, জয়দেব তাঁর কালে প্রচলিত লোকগীতি ও লোকনাট্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।[৪] 'প্রাকৃত কল্পতরু' এবং 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' সংকলন দু'টিতে প্রাকৃত ভাষায় রচিত. রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কবিতার সঙ্গেই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক লোকগীতির সাম্য দেখা যায়।

রাধাকৃষ্ণের এই প্রাকৃত রূপ বড়ু অনন্ত চণ্ডীদাসের ''শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ সুস্পষ্ট। এই প্রসিদ্ধ রচনাটিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা অগ্রাহ্য করলেও এর অসামান্য গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এখানে অনেক সুর, তাল ও গায়ন-পদ্ধতি উল্লিখিত হয়েছে।[৫] এই রচনায় কৃষ্ণ এক দাম্ভিক গ্রাম্য লম্পট এবং রাধা তাঁর আত্মীয়া গ্রাম্য তরুণী। রাধা কৃষ্ণের লাম্পট্যের শিকার। এইরূপ রাধাকৃষ্ণ (সম্ভবত) সপ্তদশ শতকের

শেষার্ধে রচিত ভবানন্দ নামক অজ্ঞাত পরিচয় কবি-রচিত, 'হরিবংশ' বাংলা-কাব্যের নায়ক-নায়িকা। বাংলা লোকগীতির রাধাকৃষ্ণ ঠিক এমনটা নন। আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন:[৬]

> বাংলার প্রেম-সঙ্গীত প্রথমত রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক।
> এই রাধা বা কৃষ্ণ কেহই ভাগবত হইতে আসেন নাই;
> ইহারা বাংলারই পঙ্কশেষ পানা পুকুরের ধারে
> বাঙালীর জীর্ণ কুটীরে জন্মলাভ করিয়াছে।

এই রাধাকৃষ্ণ অত্যন্ত গরিব; এই কারণে বাধভাঙ্গা যৌবনেও তাঁরা নিরানন্দ, কখন কখন বিষাদগ্রস্ত। তাঁদের কোনও ভান বা বড় বড় কথা নেই। একটি গানে "রাধে গোয়ালিনি" বৃন্দাবনে ধান ভানে।[৭] ঝাড়খণ্ডের লোকগীতিতে ক্লান্ত কৃষ্ণ রাধার কাছে চা পানের আবদার ধরেন; চাওয়া মাত্রই চা আসে না; তাই অভিমানী কৃষ্ণ বলেন: "ঝাঁপ দিব যমুনায়।"[৮] কৃষ্ণ গামছা পরে খালের জলে মাছ ধরতে নামেন। এই তো অবস্থা! ইনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবের 'উজ্জ্বলনীলমণি' নন; রাধাও নন, বৈষ্ণব-আলঙ্কারিক নায়িকা।

তবে কী চৈতন্যের ভক্তি আন্দোলনের কোনও প্রভাব রাধাকৃষ্ণবিষয়ক লোকগীতিতে পড়েনি? অবশ্যই পড়েছে। পদাবলি কীর্তনের দ্বারাও লোকগীতি প্রভাবিত হয়েছে; তবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব অলঙ্কারের প্রভাব তাতে বিশেষ ভাবে দেখা যায় না। শচীনদেব বর্মণ-গীত এই গানটি। যথা :[৯]

> মনদুখে মরি রে সুবল সখা
> ব্রজের কিশোরী রাধা বিনে..
> যখন আমার প্রাণ যাবে
> বাইন্ধো তমাল ডালে
> জলের ছলে শ্রীরাধিকা
> দেখিবে আমারে

এই গান ভাটিয়ালি গান, কীর্তন নয়; কিন্তু শচীনদেব বর্মনের অসামান্য কণ্ঠধ্বনির ও সুরের মাধুর্যে এই গান অবিস্মরণীয়। কবিগান, কৃষ্ণযাত্রা, পাঁচালী গান, বিশেষভাবে এই তিন শ্রেণীর গান অবশ্যই বৈষ্ণব ভাবময়, অবশ্যই বৈষ্ণবীয় বিষয় দ্বারা প্রভাবিত। আরও অনেক লোকগীতিতেও বৈষ্ণব প্রভাব আছে; এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ঘাঁটু, হোলির গান, ধামালী, বিবাহের গান, নৌকাবিলাস, প্রভাতী, রাসলীলা, পটুয়ার গান, নৌকা বাইচ্-এর গান, শিশু-বিষয়ক গান, ইত্যাদি। লোকসঙ্গীতের অন্তর্নিহিত লৌকিকতা বা Secularism এ সব গানে দেখা যায়। "দে দে কানাইয়ালাল, বসন আমার হাতে দে",— এই হলো ছাদ-পেটানো গানের পদ। এই গানের প্রধান উদ্দেশ্য, ছাদ-পেটানো মহিলা শ্রমিকের শ্রমের অপনোদন এবং হাস্যরসের অবতারণা। এ গানের রাধা পূর্ণভাবেই প্রাকৃত নায়িকা।

এক শ্রেণীর প্রেমগীতির নায়ক গৌরাঙ্গ/চৈতন্য। এ সব গানে বর্ধমানের শ্রীখণ্ডে উদ্ভাবিত "গৌরনাগরবাদ" প্রতিফলিত হয়েছে। 'গৌরনাগরবাদ' অনুসারে নবদ্বীপের নাগরীগণ অত্যন্ত সুদর্শন ও গুণবান গৌরাঙ্গের প্রেমে পড়েছিলেন; কিন্তু নীতিবাগীশ গৌরাঙ্গপণ্ডিত তাঁদের দিকে ফিরেও তাকাতেন না। ফলত গৌরনাগরবাদ প্রভাবিত লোকগীতি সুখের নয়, দুঃখের গান, যথা:[১০]

> আমার কি হ'ল গো সই
> বাঁচি না আমি গৌর অনুরাগেতে॥...

সেই মানুষ। এই দেখলাম
সে গেল কোথায়, পলকেতে॥
জল থাকিতে নিলাম না জল
কি কহিব, দৈবের ছল
চোখের জলে কলস ভরলাম (প্রাণ সই রে)
ঐ রূপ দেখিতে দেখিতে।
বাঁচি না গৌর অনুরাগেতে॥

বৈষ্ণব প্রভাবে একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটছে; পল্লীগানে, পল্লীসমাজে প্রচলিত পাতিব্রত্য, সতীত্ব, সাধ্বীত্ব, নির্ভেজাল অননুমোদিত প্রেমকে জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে। এবং কুলবধূ 'গৌর-অনুরাগে' চোখের জলে কলস ভরছেন। এই গান ভদ্র সমাজে প্রশংসিত হচ্ছে। রুচির বা ভাল লাগার শাস্ত্রীয় নিয়ম কানুন মানা হচ্ছে না। লোকগীতিতে প্রেমিকের নাম হ'ল 'কালা' বা 'কালিয়া' অর্থাৎ কৃষ্ণ। শ্রীহট্টের ইসলাম-ধর্মাবলম্বী সাধক-কবি 'কালার নাম' উচ্চারণ করেই অশ্রুসিক্ত আধ্যাত্মিক গান রচনা করেছিলেন। যথা :

কালা, তর নাম শুইনা রে কালা হইয়াছি পাগল।...
আরে! জঙ্গলিয়া মস্তানে (বনবাসী ঈশ্বর প্রেমিক) বলে
কালা বড় ধন।
লোভলালসা ছাড়লে পাইবায়
কালার দরিশন।।[১১]

অনাধুনিক কালেও ঝুমুর গান প্রচলিত ছিল। পদাবলি কীর্তনে ঝুমুর গান গাওয়া হ'ত। কবিগানের মতো ঝুমুর গানও বহুলাংশে বৈষ্ণব গান; আধুনিককালে কবি ভবপ্রীতানন্দ ওঝা রচিত একটি ঝুমুর গান এইরূপ : [১২]

হের গো প্রাণ সজনী
বিগত দুখ- রজনী
নম্র সুধাকর
শুকাইল পুষ্প মালা
শয্যা মনোহর
কুঞ্জে এলো না নাগর॥

এই গান পদাবলি-কীর্তনের অনুকরণ। কিন্তু ঝাড়খণ্ডে প্রচলিত ভাষায় রচিত ঝুমুর সুরে তালে আসল লোকগীতি। যেমন : [১৩]

ঝিঙা ফুল লিলেক জাতি কুল গো
পিরিতি হৈল শূল।
বর্ণ ছিল চাঁপার কলি
ভাইবে ভাইবে হলেম কালি
কালার এ পিরিতি আমার
ডুবাল দু'কুল॥

পূর্ব-বিহারে, উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চলে, মধ্যপ্রদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে হিন্দী ভাষায় রচিত ঝুমুর গান প্রচলিত আছে।[১৪]

লোকগীতিতে বর্ণিত বিরহিণী রমণীর দুঃখ সুগভীর। কিন্তু তার স্মৃতি সতত সুখের। সুখদুঃখের অনুভূতি-সমৃদ্ধ গান বারমাস্যা গান। 'বারমাস্যা' গানে সারা বৎসরের সুখদুঃখের আশা আকাঙ্খার বিবরণ থাকে। 'ফুল্লরার বারমাস্যা' এই গানের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বঙ্গের সঙ্গে উত্তর ভারতের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ক্রমশ নিবিড় হয়ে ওঠে। 'বারমাস্যা' উত্তর ভারতেও প্রচলিত হয়। আবার এমন মতও আছে যে, মৈমনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত 'রাধা বারমাস্যা' উত্তর ভারত থেকে এসেছিল।[১৫]

স্বামীর বিদেশে অবস্থানকালে স্ত্রীর দিনযাপনের বিবরণ 'বারমাস্যা' গানে থাকে। এ গানের তিনটি বিভাগ, যথা : শ্রীরাধার বারমাস্যা, কন্যার বারমাস্যা, ও লৌকিক বারমাস্যা।[১৬] এ সবের কয়েকটি নিদর্শন :

[ঝাড়গ্রামের গান][১৭]
ফাল্গুনে দ্বিগুণ আগুন চিত্তে উতরোল
গোকুলে গোবিন্দ নাই... কে করিবে দোল
কে করিবে রামলীলা কে সাজাবে দান
কে আর বাজাবে বংশী কে ভাঙিবে মান.

স্বামীগৃহ থেকে পিতৃগৃহে যেতে চায় মেয়ে; তার মনের ব্যথা :[১৮]

[কাছাড়ের গান]
বৈশাখে দেখ না, মাগো, খরা তালু পুড়া
বিল থাইক্যা পানি আনি কাঙ্কে লইয়া ঘড়া
(তোমার) অভাগী কন্যারে মা গো নাইয়র নিলা না...

লৌকিক বারমাস্যা : [পচাপানি, ঝাড়গ্রাম] [১৯]

মাঘেতে শিম মিষ্টি ফাল্গুনে দ্বিগুণ মিষ্টি'
বুড়া বেগুন নিম গো,
তারামণি,
খেলিতে মন সরে না নীল সরোবরে॥

লক্ষণীয়, রাধার বারমাস্যা গানে, "লৌকিক" বারমাস্যাগানে, যে সুখস্মৃতির ব্যঞ্জনা দেখি, কন্যার বারমাস্যা গানে তা নেই। কন্যার বারমাস্যা দুঃখের গান।

লোকগীতিতে বিশদভাবে বর্ণিত বিরহের বাস্তব প্রেক্ষিত ছিল। ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দে উচ্চপদস্থ আমলা Luke Scrafton লিখেছিলেন :

> The women are married in their infancy,
> and it is common to see a woman of
> 12 with a child in her arms... yet
> they bear but few children, for at
> 18 their bent in on the decline,
> and at 26 they are strongly marked
> with age. [২০]

যৌবন ক্ষণস্থায়ী; পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত; রাস্তাঘাট বিপদসঙ্কুল, নিরাপত্তা শঙ্কাতুর। এমন অবস্থায় লোকগানে বর্ণিত বিরহিনীর অবস্থা সহজেই অনুমেয়। প্রায় সব "বিচ্ছেদী" গানে কৃষ্ণের বিরহে রাধা কাঁদেন। এখানে কৃষ্ণ স্বামী বা প্রেমিক; রাধা তাঁর স্ত্রী বা প্রেমিকা: [২১]

দুখিনীরে অকূলে ভাসাইয়া
কোথা যাও হে প্রাণ বন্ধু কালিয়া
ও বন্ধু রে
আর কি বলিব তোরে
সকলই কপালে করে
এখন কেনে যাইবারে ছাড়িয়া..
আমি মরলে যেন তোমারে পাই
পুনর্জন্ম লইয়া॥

কিন্তু বিরহিনী যদি হন মুসলমান, তবে তিনি 'কালিয়া'-র উল্লেখ নাও করতে পারেন, যথা : [২২]

সুখ বসন্ত আসে যায়
কুকিল গাছে ডাকে, হায়
খসম হামার গ্যালা রে বিদ্যাশ
ফির‍্যা ত আর আইলা না...
ঝড় বাদলের শীতে বে
খসম তোষক নাহি পাও
হামার শাড়ির আঁচল দিযা
ঢাইকো তোমাব গাও॥

অথবা, [২৩]

আমার মন যে কেমন কবে
বন্ধু রে,
আমার বুকের মাঝে চিতার আগুন
জ্বলছে শাঁ শাঁ করে...
মনের বেথা মনে রইল
আমি জানাই বন্ধু কারে
আমার মন যে কেমন করে..

'বারমাস্যা' সম্বন্ধে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে। এসব তথ্য দিয়েছেন এককালে বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামের একনিষ্ঠ সৈনিক, এবং পরবর্তীকালে 'ভাগবত পাঠক' ও প্রাচীন পূর্ববঙ্গ-গীতিকার সঙ্কলক শ্রদ্ধেয় ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক।[২৪] তিনি লিখেছেন যে, কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত থাকার জন্য অষ্টাদশ শতকে "বিবাহ ব্যবসায়ী" ঘটকরা পূর্ববঙ্গের নদীনালার নৌকায় উঠিয়ে "ভরা" (বা বজরা)-র মেয়ে সস্তা দামে বিক্রয় করত। মৌলিক লিখেছেন : [২৫]

> কুলীন ঘরে যে সব কন্যার বিবাহ দেওয়া অভিভাবকের আর্থিক সামর্থ্যে কুলাইত না, এবং যে সব কন্যা বিবাহের রাত্রে সাতপাক ঘুরিয়া কুলীন বরের নাকের ডগা এক ঝলক

দেখিয়াছে মাত্র, তাহাদের নিরুপায় অভিভাবক ঘটকের নির্দেশ মতো ভরা (নৌকা) ঘাট ছাড়িয়া যাইবার রাত্রে মেয়েগুলিকে আনিয়া ভরায় তুলিয়া দিতেন। রাতের অন্ধকারে মেয়ে ভরায় তুলিয়া দিয়া বাপ, মা অথবা অভিভাবক ঘটকের হাতে 'তামা-তুলসী-গঙ্গাজল' দিয়া প্রতিজ্ঞা করাইতেন, মেয়েটিকে যেন স্বজাতির ঘরে বিবাহ দেওয়া হয়।... ভরার ঘটক ভরা বোঝাই মেয়ে বহু দূর দেশে লইয়া অকুলীন সমাজে আনুপাতিক অল্পপণে বিবাহ দিতেন। এই পণের তকটা মোটা অংশ সমাজপতির প্রাপ্য ছিল।

অল্প সংখ্যক মেয়ের বিয়ে হ'ত; অনেকেই বৈষ্ণব মোহান্তদের পাটবাড়িতে স্থান পেত এবং মালা বদলের বিয়েতে বোষ্টুমি হ'ত। বেশ কিছু মেয়েকে "নীলামে বিক্রয় করা হইত"।[২৬]

ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক "ভরার মেয়ের বারোমাসী" সংগ্রহ করেছেন।[২৭] ভরার মেয়ে তার "ছোট ভাইটির" কথা ভেবে চোখেব জল ফেলে। বাপের বাড়ির কতো কথা মনে পড়ে।

শিশু কাইল্যা সুখের স্বপন
যৈবন কাইল্যা আশা
সগলি মিলাইয়া গেল
(যেমন) আঘণের কুয়াশা॥
...
ভাদ্দর মাইস্যা ভরা গাঙ্গ
গাঙ্গে বিষম ঢেউ
ডুইব্যা গেল ভবার কইন্যা
(হায়রে) দেইখ্‌ল না আর কেউ॥

'ভারার মেয়ের বারমাসি' অবশ্যই দুঃখের গান; কিন্তু তাতে না আছে 'কালিয়া', না আছে 'পতিধন'। এ গান প্রকৃত ক্রীতদাসীর গান।

যেমন আছে বিরহের ও বিচ্ছেদের দুঃখ, নিদারুণ দাসত্বের যন্ত্রণা, তেমন আছে আনন্দ, সুখ, আশা, বাসনা। উত্তরবঙ্গে প্রচলিত চট্‌কা গানে তা শব্দের ঝংকারে সুন্দর ছন্দে প্রকাশিত হয়। বাড়িতে 'সাইটোল পূজা' উপলক্ষে কন্যা তার "চেংড়া বন্ধুকে" নিমন্ত্রণ করে। পূজা উপলক্ষে মেয়েটি মনের আনন্দে নাচবে। "চেংড়া বন্ধু' যেন তার বাঁশিটি নিয়ে আসতে ভুলে না যায়। বাদ্যের তালে তালে নাচ জমে উঠবে।[২৮] তরুণী পত্নীর দাদা খবর না দিয়ে হঠাৎ তাকে নাইয়র নিতে এসে উপস্থিত; কিন্তু স্বামীকে ছেড়ে তার বাপের বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা নেই। দাদা ঘন ঘন তাগাদা দিচ্ছেন; কিন্তু স্বামীকে একলা রেখে মন যে কোথাও যেতে চায় না; অথচ, না গেলেও ভাল দেখায় না :

মনটা মোর একবার আগায় সাতবার পাউচায়
হোলোক শোলোক করে মন মোর যাবারে না চায়...[২৮ক]

এই চমৎকার গানে দাম্পত্য প্রেমের বিবরণ অসাধারণ।

বন্ধু ঘুঙ্গুর উপহার দিয়েছিল; কিন্তু এই ঘুঙ্গুরে সোনার বেণে কালাই ভরে দিয়েছে। হাঁটলেই ঘুঙ্গুর বাজে। বাড়িতে সবাই জেগে আছে; কত কৌশল করে, ছল করে অভিসার করতে হয়, তা কি ঐ সোনার বেণে জানে? কোনও বৈষ্ণব মহাজন এমন অভিসারের গান রচনা করতে পারেননি।[২৯] মুসলমান কৃষক তার পত্নীকে বলে :

আনাজের মদ্যে [মধ্যে] আলু রে আল্লা
শাকের মধ্যে পুঁই
মাইয়ার মদ্যে সলিমের মা তুই
পুরুষের মদ্যে মুই॥

উত্তরবঙ্গে প্রচলিত 'নিকা' বা পুনর্বিবাহ প্রথা সম্বন্ধে অনেক গান রচিত হয়েছিল। একটি গান এইরূপ : [৩০]

কত সাধ করে সৌখিন পুরুষের ঘর করতে গেলাম;
কিন্তু কোথায় সুখ? খেটে খেটে হাড়মাস কালি হ'ল।
দু'দিন যে বাপের বাড়ি গিয়ে থাকব, তাও অসম্ভব।
পান থেকে চুন খসলেই ঘর বন্ধ করে মারে।
একবার বাপের বাড়ি গেলে আর ফিরে আসব না।

ইটভাটার মজুর যে প্রেমের গান গায়, তার কথায় কোনও মারপ্যাঁচ থাকে না: [৩১]

ও সে হোক্ না কালো
আমার বড় ভালো লেগেছে
কাঁঠাল গাছের আঠার মতো
জড়িয়ে ধরেছে
মুচ্‌কি হাসি হেসে আবার
চাক্কু মেরেছে॥

ভাষার এবং অলংকারের বাহুল্য বর্জিত এই গানই আসল প্রেমগীতি। "কালোছোকড়া" বৈষ্ণব পদাবলিতে ভগবান কৃষ্ণ। এ বিষয়ে বিনয়কুমার সরকার লিখেছিলেন : [৩২]

> Most of what has been passing in India for other worldly literature and art is in reality the literature and art of human passions, human ideals, human interests and conflicts. To be definite, it may be said that folk-life and sex-life have been the two chief motifs of a considerable portion of Indian literature and art... Indeed, in the Candidasa. Vidyapati complex, as in the Candi poems, it is the masses that speak. We encounter here the direct delineations of the diverse incidents in the life that is actually lived by the folk : the hunters, the milkmen, the cowherds, the traders, the boatmen, the cultivators...

এ সম্বন্ধে আশুতোষ ভট্টাচার্যের মত একটু অন্যরকমের। তিনি লিখেছেন : "বাংলার যে অঞ্চলে বৈষ্ণব ধর্মের কিছু প্রভাব স্থাপিত হইয়াছে, সে অঞ্চলেই কেবলমাত্র রাধাকৃষ্ণের নাম প্রবেশ করিয়াছে। অন্যত্র তাহা হইতে পারে নাই। পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গই প্রধানত বৈষ্ণবধর্ম দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছে। সেইজন্য এই দুই অঞ্চলের প্রেম-সঙ্গীতে রাধাকৃষ্ণের নাম যত শুনিতে পাওয়া যায় অন্য অঞ্চলে তাহা তত শুনিতে পাওয়া যায় না। উত্তরবঙ্গের প্রেমসঙ্গীত ভাওয়াইয়া গান প্রধানত রাধাকৃষ্ণের সম্পর্ক হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত।"[৩৩]

ভাওয়াইয়া প্রেমগীতি কিন্তু "রাধাকৃষ্ণের সম্পর্ক" থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত নয়। হরিশচন্দ্র পাল-সংগৃহীত আটত্রিশটি ভাওয়াইয়া গানের মধ্যে উনিশটি গানে কালার বা কৃষ্ণের প্রসঙ্গ দেখা যায়।[৩৪] দুইটি ভাওয়াইয়া গানের বিষয় চৈতন্য সন্ন্যাস।[৩৫] কিন্তু অধ্যাপক ভট্টাচার্যের এই মত সমর্থন করি যে, ভাওয়াইয়া গান প্রধানত লৌকিক (Secular), এবং প্রধানত দুঃখের গান। এই বিষয়টি সম্বন্ধে বিশেষত গবেষক হরিশচন্দ্র পাল লিখেছেন : [৩৫ক]

> যন্ত্রের তন্ত্রীতে আঘাত না দিলে যেমন সুরের বিকাশ সম্ভব নয়, তেমনি হৃদয়তন্ত্রীতে ব্যথা বিচ্ছেদ ও বিরহের আঘাত না পেলে প্রকৃত সুর সৃষ্ট হ'তে পারে না। সেই কারণে ভাওয়াইয়া গান বিচ্ছেদ ও বিরহের মূর্ত প্রতীক।... ভাওয়াইয়া গান— বেদনাহত নারীর ক্রন্দন যেন, ধীরে ধীরে এই ব্যথা সুরে বিকশিত। এই গান বিলম্বিত লয়ের গান।...

পাঁচ রকমের ভাওয়াইয়া গান উল্লিখিত হয়েছে। যথা: [৩৬]

১. চিতান ভাওয়াইয়া: "ব্যথায় ভেঙে পড়ার গান"
২. ক্ষীরোল ভাওয়াইয়া : "বিরহের প্রতীক এই গান"
৩. দরীয়া ও দীখলনাসা: ভাওয়াইয়া : "দীর্ঘ প্রসারিত সুর"
৪ গড়ান ভাওয়াইয়া : বিরহিনীর ধূলায় গড়াগড়ি যাওয়ার অবস্থা
৫. মইষালী ভাওয়াইয়া আশার ও বাসনার গান; গানে গতির ছন্দ থাকে॥

দীখলনাসা— ভাওয়াইয়ার একটি মর্মন্তুদ দৃষ্টান্ত, আব্বাসউদ্দীন আহ্‌মেদের অশ্রুরুদ্ধ স্বরে গীত। "ও কী গাড়িয়াল ভাই, কত রব আমি পন্থের দিকে চায়া (চেয়ে) রে।" গীতপদের সারল্যে, সুরের বিলম্বিত লয়ে, দুঃখের গভীরতায় এই গানটি অতুলনীয়।[৩৭] বৈধব্যের অসহনীয় দুঃখ প্রকাশিত হয়েছে এই গায়কের অপর দীখলনাসা গানে: "ও ওরে বাবার দেশের কুরুয়া (কুরুর পাখি)। আজি কেনে কান্দেন তোমরা চন্দন বৃক্ষের ডালে রে।"[৩৮] আব্বাসউদ্দীনেরই গাওয়া চিতান ভাওয়াইয়া, "ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে।"[৩৯]

এই দুঃসহ দুঃখের একটা বাস্তব প্রেক্ষিত উত্তরবঙ্গের কৃষকদের দুঃসহ দারিদ্র্য। রংপুর জেলার একটি গ্রামের বিবরণ এইরূপ : [৪০]

> Land and labour loom as awesome, eternal categories in the lives of Katni's people. Pressure on the land is intense... the peasants try to make up for the scarcity of land by the intensity of their labour. They work hard, driven by a most powerful incentive : the need to fill their stomachs... (But) few take a daily meal for granted. Villagers often greet each other with the question : "Have you eaten"?

স্বামী পরিত্যক্তা বা বিধবা রমণী শিশু-সন্তান সহ টাকার বা কাজের বিনিময়ে ধনীর উপপত্নী হয়ে অশেষ নির্যাতন ভোগ করে। এইরকম "স্বীকৃত" উপপত্নীকে বলা হয় "সাংনা"। এই-রমণীর দুঃখের গান, "ও কি ও হো সাংনা মারিলু কেনে।"[৪১] সাংনার অত্যাচারের বিবরণ :

> ভাতের দুখে ওহো সাংনা, কাইনৎ বসিনু মুই
> কোন দোষেতে দুয়োর বান্ধিয়া মারিলু আজি তুই॥

পূবের খরোৎ মারিতে মারিতে রান্ধন খরোৎ আনিলু
ভাতে রান্ধা হাড়ি পাতিল ন্যদেয়া (লাথি মেরে) ভাঙ্গিলু...
কোলের ছাওয়া মোর কান্দিয়া আকুল ঐ না প্যাটের ভোকে॥

স্বামী প্রবাসে। স্ত্রী তার অপেক্ষায় ঘর সাজিয়ে দীর্ঘশ্বাসপূর্ণ বিরহে কষ্ট পাচ্ছে। এই নিয়ে দীঘলনাসা ভাওয়াইয়া, "ও হো মোর কালা রে কালা"[৪২]। এই অসামান্য গানের শেষ চরণ :

বন্ধুধন মোর দূর দেশে
মইলাম্ (ময়লা) পৈল (পড়ল) কালা চিকন ক্যাশে (কেশে)
কালা, নারীর হিয়া বল কতই ধৈরজ ধরে॥

"ভাওয়াইয়া— ঝুমুর" গানেরও নিদর্শন আছে।[৪২ক] পশ্চিমবঙ্গের ঝুমুর গানেও বিরহের অন্তর্গূঢ় জ্বালা প্রকাশিত হয়। তবে সেই গান প্রধানত বৈষ্ণব ভাবাপন্ন। "ভাওয়াইয়া-ঝুমুর"-এ বৈষ্ণব ভাব নেই। দুঃসহ রৌদ্রে মেয়েটি ডোবার বা খালের জল থেকে জলজ শাক তুলছে। তার সমস্ত শরীর ঘর্মাক্ত। এর মধ্যে তার গলার চন্দ্রহার কোথায় পড়ে গেল। সেই নিয়ে গান: [৪৩]

বক্ষ বাইয়া পড়ে নারীর ঘাম রে
যে জন বঁধুয়া হবে
ঘাম মুছিয়া কোলে লবে...
ওরে, ছিঁড়ি পইল্ মোর গলার চন্দ্রহার রে
মাও নাই যে বলিম্
ভাই নাই যে কহিম্
আজি কে তুলিয়া দিবে গলার চন্দ্রহার রে॥

একটি অতি আধুনিক ভাওয়াইয়া গানের বিষয় ব্যর্থ প্রেম। মেয়েটি স্কুলে পড়ার সময়ে এক সহপাঠী ছাত্রকে ভালবাসত। মেয়েটি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে না পেরে ঘরে আছে; বিয়ে হয়নি। ছেলেটি কলেজে স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে অন্যত্র চলে যায়। এই বিচ্ছেদে মেয়েটির বড় কষ্ট :

বন্ধুধন, না দেখিয়া তোমার মুখ
ভাঙ্গে মোর নারীর বুক
মন কান্দে মোর তোমার বাদে।
তোমরা ইস্কুল ছাড়ি কলেজ গেইলেন
চলিয়া গেইলেন দিনহাটা ছাড়িয়া॥[৪৪]

পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালি গানে আধ্যাত্মিকতা প্রাধান্য পেলেও তাতে প্রেমের কথা আছে, যেমন : [৪৫]

১. রুনুঝুনু বাদ্য বাজে লিলুয়া বাতাসে
আমারে ছাড়িয়া বন্ধু রইয়াছে কোন দ্যাশে...
২. এমন প্রেমের নদীতে সই গো ডুব দিলাম না
নদীর কূলে কূলে ঘুইরা বেড়াই
পাই না তো ঘাটের ঠিকানা...
৩. চণ্ডীদাস আর রজকিনী, তারা প্রেমের শিরোমনি গো
তারা এক মরণে দুইজন মরে, এমন মরে কয়জনা"

বাংলার সীমান্তে প্রচলিত অনেক রকমের গানে বিরহের কথা আছে। সাঁওতালদের পট গানে, মুণ্ডারি-জনগণের গানে, খড়িয়াদের গানে বিচ্ছেদ একটা দুঃখময় অভিজ্ঞতা। জারি গানে, টুসু গানে, ভাদু গানে, তেলেনা, ধামাইল ও বোলান গানে বিরহ অন্যতম বিষয়। কয়েকটি নিদর্শন এইরূপ :

চাটি চুটি দিয়ে
সঙ্গ করলে হে ঘরে
ফাঁকি দিয়ে পালালে আসাম
হে লম্পট শ্যাম॥[৪৬]

শিমুল ফুলটি ঝবে পড়ে,
বঁধু মিলন হল না হল না
তুমার বন্ধু আমি হলাম
তুমি আমাব হলে না।[৪৭]

করেছিলাম মানা
বলি টুসু প্রেমের শশা খেয়ো না
সামান্য আস্বাদ পেয়ে আমার নিষেধ শুনলে না
.. বিরহ বিকার ঘটিলে আর তো প্রাণে বাঁচবে না
কোরেছিলাম মানা[৪৮]

আমি আখ বইলে চাবাইলাম বাঁশ
বাঁশে না পাইলাম শাঁস
কেবল গালের সর্বনাশ।[৪৯]

পুর্ববঙ্গে প্রচলিত লৌকিক প্রেমগীতিময় পালাগান সম্ভবত মধ্যকালীন মুসলমান কবিদের প্রেমপ্রীতিমূলক কাব্যাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। মধ্য এশিয়া ও উত্তব ভারত থেকে বহু লৌকিক প্রেমকাহিনী ইসলাম ধর্মাবলম্বী ভ্রাম্যমান বণিক্‌দের সঙ্গে বঙ্গে এসেছিল। এসব প্রেমকাহিনীর জনপ্রিয়তার বা প্রভাবের বিষয়টি এখনও অস্পষ্ট; পূর্ববঙ্গ গীতিকায় অবশ্য 'ইসলামি' পটভূমি কোন কোন পালায় থাকলেও তার আঞ্চলিকতা সন্দেহাতীত। এইসব পালার রচনাকাল দুর্নির্ণেয়। কয়েকটি প্রসিদ্ধ পালা, যথা .[৫০]

মহুয়ার পালা
মলুয়া ও চাঁদ বিনোদের পালা
চন্দ্রাবতী ও জয়ানন্দের পালা
বিরহিনী আয়না বিবির পালা
কাঞ্চন কন্যার পালা
পীব-বাতাসী পালা
লীলা-কঙ্কের পালা
পরীবানুর পালা

একটি মত অনুসারে এসব পালার রচয়িতাগণ গ্রামবাসী হলেও যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলেন। শিক্ষিত ছিলেন বলেই নানা ধরনের জটিল ঘটনাকে পালায় সুন্দরভাবে সাজিয়ে দিতে পেরেছিলেন।[৫১] পালার ভৌগোলিক প্রেক্ষিত পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চল; অর্থনৈতিক প্রেক্ষিত জমিদারি-ব্যবস্থা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

জমিদার স্বেচ্ছাচারী। অনেক পালাই বিয়োগান্ত; নায়ক-নায়িকার দুর্দশার উপরে গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে। গ্রীষ্মের দাবদাহে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি যখন রুক্ষ, শুষ্ক, তখন কোন কোন পালা গাওয়া হয়; তাতে মেঘ হবে, মেঘ থেকে বৃষ্টি হবে, এই ছিল লোকবিশ্বাস।[৫২] এসব গানের মূল সুর ভাটিয়ালি; তবে তাতে আঞ্চলিক বিভিন্নতা থাকে।

ভাটিয়ালির পাঁচটি ধারা যথাক্রমে 'সুসংগী' (মৈমন সিংহের সুসং অঞ্চল), ভাওয়াইল্যা (ভাওয়াল পরগণা, ঢাকা), বিক্রমপুরী (বিক্রমপুর পরগণা, ঢাকা), বাখরগঞ্জিয়া (বরিশালী) এবং গোপাল গঞ্জিয়া (ফরিদপুর)। চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা ও নোয়াখালিতে এই সব গানের তিনটি রীতি বা শৈলী উল্লিখিত হয়েছে, যথা, 'হলদিফাটা', 'সাইগরি' ও 'মুড়াই'। ''সাইগরি'-র অর্থ সামুদ্রিক; এই সুর নোয়াখালিতে জনপ্রিয়। ''সাইগরি সুর খোলা যায়গা ও রাত্রি একটু গভীর না হইলে সে প্রকার আমেজ আনে না। নীরব নিঝুম রাত্রে নদীর বুকে একটু দূরে থাকিয়া এ সুরের গান শুনিলে জীবনে তাহা ভুলা যায় না।''[৫৩]

এইসব পালা গানে যে প্রেমের কাহিনী আছে, তার বিশুদ্ধ লৌকিকতা তাৎপর্যমণ্ডিত। ঘটনাসমূহের পটভূমি গ্রাম্যসমাজ; কিন্তু গ্রামের মাতব্বরদের ভালমন্দের ধারণা প্রেমিক-প্রেমিকারা মানেননি। ব্রাহ্মণ-জমিদারের ছেলে নইদ্যার চাঁদ বেদের মেয়ে মহুয়ার প্রেমিক, এবং একনিষ্ঠ প্রেমিক। জাতবিচার প্রেমের ক্ষেত্রে অমান্য করা হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন মাত্র নেই। এইসব কারণে কবি জসীমউদ্দীন এবং নন্দগোপাল সেনগুপ্ত ''মৈমনসিংহগীতিকা''-র যাথার্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন।[৫৪] তাঁদের যুক্তি ছিল এই যে, যখন প্রায় সমগ্র মধ্যকালীন বঙ্গ-সাহিত্য ধর্মের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত, তখন মৈমনসিংহগীতিকার লৌকিকতা (Secularism) সন্দেহজনক মনে হয়। কিন্তু 'লৌকিক' গান তো সমগ্র বঙ্গেই ছিল, এবং এখনও আছে। এমন অনেক লোকগীতি আছে, যেখানে জনপ্রিয় দেবতাদের কোনও অস্তিত্ব নেই। কবি জসীমউদ্দীন এমনও ভেবেছিলেন যে, পালাগুলি অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সেনের বন্ধু চন্দ্রকুমার দে লিখেছিলেন। এই ধারণা ছিল ভুল। ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক গ্রামে গ্রামে ঘুরে বহু পালার সন্ধান পেয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন: ''দেখা যায় উত্তর মৈমনসিংহ জামালপুর মহকুমার অধিবাসী গায়েনের খাতায় লেখা পালার সঙ্গে বিক্রমপুরের অধিবাসী গায়েনের খাতার ভাষায় বেশ কিছু পার্থক্য আছে।''[৫৫]

এখন লোকগীতিতে বর্ণিত নারীর অবস্থা এবং চরিত্র সামান্য ভাবে আলোচ্য। প্রায় সব ধরণের লোকগীতিতেই নারী ''অবলা''। তার প্রাতিস্বিকতা, বাসনা, আশা-আকাঙ্খা— এ সবই স্বীকৃত। কিন্তু তার স্বাধীনতা নেই। বিরহের গান প্রধানত বিরহিনীদের জন্যই রচিত হয়েছে; দু'একটি গানে কৃষ্ণ রাধার জন্য কাঁদেন। লোকগীতিতে বর্ণিত গরিবের সংসার রমণীর গুণেই সুখী; কিন্তু উপার্জনের প্রয়োজনে স্বামী যদি বিদেশে যায় বা বিপদে পড়ে তবে সুখী জীবনের ছন্দ আর থাকে না। এই বিশেষ ক্ষেত্রে কোনও বহিরঙ্গ উপাদান (যেমন বৃহত্তর সমাজ, বা পরিবারের অন্যান্য লোকজন), বিরহিনীর মনে শান্তি আনে না। নারীর প্রাতিস্বিকতাও আপেক্ষিক; স্বামী-স্ত্রী, বা প্রেমিক-প্রেমিকা বাগর্থের মতো সম্পৃক্ত।

লোকগীতির নায়ক-নায়িকারা রসশাস্ত্র সম্মত কী না, এ প্রশ্ন তোলা যায়। রসশাস্ত্রের নায়িকা আলংকারিক বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু পুরুষের উপরে নির্ভরতা ছাড়া লোকগানের নায়িকার আর কোনও অসুবিধা নেই। নিজস্ব ভঙ্গিতে মনের কথা বলার পূর্ণ স্বাধীনতা তাদের আছে। লোকগীতি সতীত্বের উপরে গুরুত্ব আরোপ করে। সীতা সাবিত্রী ও বেহুলা সতীত্বের আদর্শ। কিন্তু, বিশেষ ভাবে পূর্ববঙ্গগীতিকার মুসলমান স্ত্রীলোকদের সতীত্ব পাতিব্রত্য ঐতিহ্যাশ্রয়ী নয়; তা তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এবং অসামান্য প্রেম থেকে উৎসারিত। বিস্মিত হ'তে হয় এই দেখে যে, দীনেশচন্দ্র সেন

মুসলমান-রমণীর সতীত্বের বিবরণ পড়ে বিস্মিত হয়েছিলেন এবং তাতেও সীতা-সাবিত্রীর ঐতিহ্য দেখেছিলেন।[৫৬] শশিভূষণ দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছিলেন যে, বাংলার আকাশে বাতাসে 'পিরীতি' আছে।[৫৭] তাঁর মতে এই 'পিরীতি'-কে রূপ দিয়েছিলেন চণ্ডীদাস। আমরা বলি, শুধু চণ্ডীদাস কেন, সংখ্যাতীত লোককবি 'পিরীতি'-কে গানে গানে ফুটিয়ে তুলেছেন। লোকগীতিতে প্রেমের প্রেক্ষিত বিভিন্ন হতে পারে; কিন্তু দুইটি হৃদয়ের মিলনই তাতে প্রাধান্য পায়।

তথ্যসূত্র

১. দিলীপকুমার রায়, 'ভ্রাম্যমান' (কলিকাতা, ১৯৬৫) পৃ. ১৩৭-১৪০

২. দ্রষ্টব্য, আব্বাসউদ্‌দীন্ আহমদ, 'আমার শিল্পীজীবনের কথা' (কলিকাতা তারিখ নেই)

৩. বিদ্যাকর, 'সুভাষিতরত্নকোষ', ডি. ডি. কোসাম্বি ও ভি. ভি. গোখেল সম্পাদিত (কেম্‌ব্রিজ্, মাসাচুসেট্স্, ১৯৫৭, শ্লোক ৯৮০ রচয়িতার নাম ডিম্বোক)।

৪. আলোচনা দ্রষ্টব্য, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, 'কবি জয়দেব ও শ্রীশ্রীগীতগোবিন্দ' (কলিকাতা, ১৩৬২)

৫. আলোচনা দ্রষ্টব্য, রমাকান্ত চক্রবর্তী, 'বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম' (কলিকাতা, ১৯৯৬) পৃ. ১৫৩-১৫৪

৬. সুরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী-সম্পাদিত, 'বাংলার লোকসঙ্গীত', স্বরলিপি সহ ৩ খণ্ড (কলিকাতা ১৩৬৮, ১৩৬৯, ১৩৭০), প্রথম খণ্ড, ভূমিকা, পৃ. ৭

৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলার লোক সাহিত্য', ৩য় খণ্ড, (কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃ. ৬৩৩)

৮. পূর্ণিমা সিংহ, "বরাহভূমের লোক সঙ্গীত ও মার্গ সঙ্গীতের বিবর্তনের সূত্র" 'সাহিত্য পত্র, (আষাঢ় ১৩৭৭) পৃ. ৪৪-৪৫

৯. Flok-songs of Bengal, Hindustan Long-Playing Record, Sachin Deb Burman, No. XXgE 10067-68, LHX. 14, দ্বিতীয় গান।

১০. তদেব, ষষ্ঠগান।

১১. গুরুসদয় দত্ত, নির্মলেন্দু ভৌমিক, 'শ্রীহট্টের লোক সঙ্গীত' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৬) এখানে এইরকম ৩৭৯-টি গান দ্রষ্টব্য।

১২. সুরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, 'বাংলার লোক সঙ্গীত', ৩, পূর্বোক্ত পৃ. ৬৯

১৩. চিত্তরঞ্জন দেব, 'বাংলার পল্লীগীতি' (কলিকাতা, ১৯৬৬), পৃ. ৭২

১৪. তদেব, পৃ. ৭৫; একটি বহুশ্রুত এবং সুগীত দৃষ্টান্ত: "ঝুম্‌কা গিরা রে। বরেলি বাজার মে ঝুম্‌কা গিরা রে।"

১৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বাংলার লোক সাহিত্য', ৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৪-৮৪; হিন্দী ও পাঞ্জাবি ভাষায় রচিত বারমাস্যা-গান-বিষয়ক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, M.S. Randhwa, *Kangra Paintings on Love* (New Delhi, 1962) PP. 133-146.

১৬. আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বঙ্গীয় লোকসঙ্গীত রত্নাকর', তৃতীয় খণ্ড, (কলিকাতা, ১৯৭৭), পৃ. ১৩৪৮-১৩৫৪

১৭. তদেব, পৃ. ১৩৫১-৫২ : পাঠভেদ আছে।

১৮. তদেব, পৃ. ১৩৫৩

১৯. তদেব, পৃ. ১৩৫৫

২০. Luke Scrafton, *Reflexions on the Government of Hindostan* (London 1770), PP. 10-11

২১. চিত্তরঞ্জন দেব, 'বাংলার পল্লীগীতি', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৯

২২. তদেব, পৃ. ২৭০

২৩. তদেব, পৃ. ২৭১

২৪. ক্ষিতীশ চন্দ্র মৌলিক, 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ-গীতিকা', প্রথম খণ্ড, (কলিকাতা ১৯৭০) সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-রচিত "পরিচয়", পৃ. ৩-৭

২৫. তদেব, চতুর্থ খণ্ড (কলিকাতা ১৯৭২), পৃ. ১৯৭-২২৬,

২৬. তদেব, পৃ. ২০৬

২৭. তদেব, পৃ. ২০৭-২২৬ : বারমাস্যা গানের এই পর্যায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২৮. হরিশচন্দ্র পাল সম্পাদিত, 'উত্তর বাংলার পল্লীগীতি, চট্‌কা খণ্ড' (কুচবিহার, ১৯৭৫), পৃ. ৭৬ · এই গানের গায়ক বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন গঙ্গাচরণ বিশ্বাস

২৮.ক. তদেব, পৃ. ৮৩; গঙ্গাচরণ বিশ্বাস গেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে শঙ্কর সেনগুপ্তের মন্তব্য স্মরণীয়। তিনি লিখেছিলেন : "বাঙালীর প্রেম ভালোবাসার গতি চিরদুর্বার। সে অলঙ্কার শাস্ত্র হাতে নিয়ে সেই ছাঁচে প্রেম-ভালোবাসার আদর্শ গড়ে তোলেনি। যে নারীর মুখের কথা ঠোঁটে আনতে বাধ-বাধ ঠেকে সে সর্বপ্রকার শাস্ত্রীয় বা সামাজিক আব্রু উপেক্ষা করে দেওয়ালীর তুবড়ীর মতো ফেটে পড়তে পাবে তার মনের মানুষের জন্য.." 'বাঙলার মুখ আমি দেখিয়াছি', (কলকাতা, ১৯৭২) পৃ ৪১,

২৯. 'উত্তর বাঙলার পল্লীগীতি, চট্‌কা খণ্ড', পূর্বোক্ত, ১১৮, বিখ্যাত শিল্পী টেপু মিঞাগীত এই গান অবিস্মরণীয়।

৩০. তদেব, পৃ. ৮৫; গায়ক গঙ্গাধর দাস।

৩১. চিত্তরঞ্জন দেব, 'বাংলার পল্লীগীতি', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৪, এই গানই রামকুমাব চট্টোপাধ্যায়েব পবিশীলিত সুকণ্ঠস্বরে অসাধারণ টপ্পাতে রূপান্তরিত হয়েছে।

৩২. Benoy Kumar Sarkar, *The Positive Background of Hindu Sociology* (Allhabad, 1937), PP. 480-81, 486.

৩৩ সুরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী, 'বাংলার লোকসঙ্গীত', ১, পূর্বোক্ত, আশুতোষ ভট্টাচার্য বচিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৩৪. দ্রষ্টব্য, হরিশচন্দ্র পাল সম্পাদিত, 'উত্তর বাংলার পল্লীগীতি, ভাওয়াইয়া খণ্ড' (কুচবিহাব, ১৩৮০)

৩৫. তদেব, পৃ. ১০৫ · ধীরেন দে সরকাব গেয়েছেন, পৃ ১০৭ . এই গানকে "ভাওয়াইয়া (লাচারি) বলা হয়।

৩৫ক. তদেব, "নিবেদন"— অংশ দ্রষ্টব্য

৩৬. তদেব, "নিবেদন', এবং শিবেন্দ্রনাবায়ণ মণ্ডলের "মতামত-২"

৩৭. তদেব, পৃ. ৫

৩৮. তদেব, পৃ. ১৬

৩৯. তদেব, পৃ. ৩০ : এই গানটি প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ কণ্টস্বরে মর্মবিদারণ করে।

৪০. Betsy Hartmann, James Boyce, *A Quiet Violence : View from a Bangladesh Village* (Delhi, 1983) pp. 18-19.

৪১. উত্তরবঙ্গের পল্লীগীতি, ভাওয়াইয়া খণ্ড', পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২; গায়ক, গঙ্গাচরণ বিশ্বাস।

৪২ক. তদেব, পৃ. ২০৪; গায়ক সুরেন দাস। এই গান বিরহিনী কৃষক রমনীর গান।

৪৩. সুরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী-সম্পাদিত, 'বাংলার লোক-সঙ্গীত', পূর্বোক্ত তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ২২

৪৪. চিত্তরঞ্জন দেব, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪১-২৪২।

৪৫ তদেব, পৃ ২৫৬, সুবেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, 'বাংলাব লোক-সঙ্গীত', ১, পৃষ্ঠা ১, তদেব, পৃ ১

৪৬ আশুতোষ ভট্টাচার্য, 'বঙ্গীয় লোক সঙ্গীত বত্নাকব', পূর্বোক্ত, ২, পৃ ৭৪০

৪৭ তদেব, ২, পৃ ৭৫০

৪৮ তদেব, ২, পৃ ৮৩২

৪৯ তদেব, ৩, পৃ ১২০৭

৫০ ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক, 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' পূর্বোক্ত, ছয়টি খণ্ড দ্রষ্টব্য।

৫১ Dusan Zbavitel, *Bengali Folk Ballads from Mymensingh And the Problem of their Authenticity* (Calcutta, 1963) P 207

৫২ ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক, পূর্বোক্ত, ১, পৃ ১১

৫৩ তদেব, ১, পৃ ১২

৫৪ আলোচনা দ্রষ্টব্য, Dusan Zbavitel, পূর্বোক্ত PP 17 22, Zbavitel এব সিদ্ধান্ত "I sincerely believe that all the doubts concerning the authenticity of the Mymensingh ballads are groundless P 22

৫৫ ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক, পূর্বোক্ত, ৬টি খণ্ডেব ভূমিকা, এবং প্রতিটি পালাব ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৫৬ দীনেশচন্দ্র সেন, 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা', চতুর্থ খণ্ড দ্বিতীয় ভাগ (কলিকাতা, ১৯৩২) পৃ ৪৮৪।

৫৭ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, 'শ্রীবাধাব ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে' (কলিকাতা, ১৩৫৯), পৃ ৩০৯, "বাঙলাদেশেব আকাশে বাতাসে পীবিতিব এই যে কাব্যরূপ টুকবা টুকবা হইযা ভাসিযা বেড়াইত তাহাব সুবিন্যস্ত গ্রথিত রূপই প্রচলিত চণ্ডীদাসেব বাধাপ্রেমেব পদাবলী "

বাঙালীর আত্মচিন্তায় বাংলা ও ভারতবর্ষ

সব্যসাচী ভট্টাচার্য

বঙ্গদেশ ও ভারতবর্ষের সম্বন্ধনির্ণয় যেন নূতন করে চিন্তিত হলো বাঙালী মনে উনবিংশ শতকে। রামমোহন রায় থেকে চিন্তার জগতের বিবর্তনকে খুব সহজেই জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি নাম দিয়ে নিষ্পত্তি করা অনেক ইতিহাস লেখকের অভ্যাস। এই অভ্যাস মন্দ বলছি না। তবে এর মধ্যে বিবেচনার যোগ্য দু-একটি সমস্যা আছে। প্রথমত এক ধরনের দ্বৈত বাঙালীর আত্মচিন্তায় 'দেশপ্রেম' ও 'জাতীয়তাবাদ'-এর মধ্যে পার্থক্যের দরুন। এই পার্থক্যের বিষয়ে ইতিহাস লেখকের বয়ান (১৯৮৯)

> "দেশপ্রেম ইংরিজিতে শিক্ষিত শহুরে বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সৃষ্টি নয়। তা আগেও ছিল, যদিও দেশের ধারণা বিভিন্ন মাতৃভাষার গর্ভে নানা রূপ ধারণ করেছিল: আর্যাবর্ত, পিতৃভূমি, হিন্দুস্তান, ওয়তন, কওম, ইত্যাদি। সাবেকি দেশপ্রেম যেটা জনমানসে নানা সংকেতে ও ভাষায় লিপিবদ্ধ, যেটা হাটের মাঠের মানুষের দেশপ্রেম, আর বুদ্ধিজীবী নেতাদেব সভা-সমিতির জাতীয়তাবাদের মধ্যে দূরত্ব আছে, আবার সহযোগও আছে। দেশপ্রেম মাঝে মাঝে টুপি এঁটে জাতীয়তাবাদী নেতাদের কাজে লেগে পড়ে। কিন্তু দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদকে একাত্ম ভাবা ভুল হবে।"[১]

এই লেখা পনেরো বৎসর আগে, বর্তমানে এই দ্বৈত বিষয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে ও চলছে, বিশেষ উল্লেখযোগ্য আশীষ নন্দীব প্রবন্ধাবলী (১৯৯৪)।[২] এই প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করতে চাই অপব একটি দ্বৈত সম্বন্ধে। উনবিংশ শতক থেকে এক দিকে 'বঙ্গমাতা' অপব দিকে 'ভাবতমাতা' এই দুই প্রতিমাকরণ (iconisation) প্রক্রিয়ার দিকে চোখ দিয়ে একটা প্রাথমিক চেষ্টা করা যেতে পারে আপাতত। যেহেতু অধ্যাপিকা সুকুমারী ভট্টাচার্য চিন্তনের ইতিহাসের একজন পথিকৃৎ তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এই বিষয়ে লেখা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।[৩]

বঙ্গীয় দেশভক্তি ও ভারতীয়ত্ব চেতনার মধ্যে টানা পোড়েন নানা রূপে দেখা যায় উনবিংশ শতকের গোড়া থেকেই। রামমোহন রায়ের লেখায় ও জীবনে দেখি কেবল আদি ভারতীয় ঔপনিষদিক ধর্মীয় আদর্শের প্রতি অনুরাগ ও অনুরূপ ধর্মভাব সৃষ্টি করার সংগঠিত চেষ্টাই নয়, উপবন্তু সচেতন ভাবে ভারতীয়ত্বকে তুলে ধরা রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে। এর নানা উদাহরণের মধ্যে যেটা আমার সবচেয়ে আশ্চর্যজনক মনে হয় যেটা হলো মোগল বাদশাহেব পক্ষাবলম্বী হয়ে ইংরেজ শাসকদের সঙ্গে তাঁর বিরোধ। তাঁর জীবনকালে বাদশাহ নিতান্তই নগণ্য; প্রবাদ ছিল উত্তর ভারতে 'বাদশাহ্ শাহ আলম, দিল্লীসে পালম' — অর্থাৎ পালম অবধি কেবল তাঁর সাম্রাজ্য! কোথায় দিল্লীতে বিগত শৌর্য দুঃস্থ দ্বিতীয় আকবর শাহ নামক বাবর বংশের উত্তরাধিকারী এবং কোথায় কলকাতার ধর্মসংস্থাপক এবং লিখিয়ে এক বাঙালী। যেমন আশ্চর্য আকবর শাহ কেন এই বাঙালী ভদ্রলোককে তার প্রতিনিধি করলেন, তেমন আশ্চর্য সেই ভদ্রলোক কেন এই ভার নিলেন সরকারি বিরূপতা সত্ত্বেও। রামমোহনের চিঠিপত্রে, জাতীয় অভিলেখাগারে সংরক্ষিত, হদিশ পাওয়া যায় কেন তিনি এই ভার নিলেন। তাঁর মতে

বাদশাহ্ এবং ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি'র মধ্যে যে সন্ধিমূলক বন্দোবস্ত হয়েছিল ১৮০৫ সালে, তা একটা "জাতীয় চুক্তি" ("national contract") যার দ্বারা ইংলন্ড আবদ্ধ।[৪] সম্পূর্ণ আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে রামমোহন তর্ক করেছেন যে ভারতের মোগল ও ইংরেজ রাজার সম্বন্ধ আইনত সমান সমান হওয়া বিধেয়। আরও লক্ষণীয় যে রামমোহন সমগ্র ভারতীয় জাতির পক্ষে কথা বলছেন, কেবল মোগল পক্ষে ওকালতি নয়। যথা : "আমি এমন পরিস্থিতিতে অবস্থিত যে আমি দায়বদ্ধ কেবল দিল্লীশ্বর-এর নিকট নয়, উপরন্তু আমার স্বদেশস্থ সমস্ত মানুষের নিকট (the whole body of my country men) যুগপৎ তাদের কল্যাণের জন্য এবং দিল্লীশ্বরের স্বার্থ রক্ষার্থে।"[৫] এই ভাবে রামমোহন ভারতীয়ত্বকে একটা রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে দেখেছিলেন; তাঁর স্বদেশবাসী কেবল বাঙালী নয়। ভারতের সকল মানুষ। ১৮২৯-৩০ সালের এই সব দলিল।

একই সময়ে হেন্‌রি লুই ডিভিয়ন ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) এবং ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর মধ্যে অনুরূপ ভারতীয়ত্বের ধারণা প্রকাশমান। ডিরোজিও'র "my country is thy glory past", বা কাশীপ্রসাদ ঘোষ-এর (১৮০৯-১৮৭৩) "O India, Fair India" ইত্যাদি কাব্যোচ্ছাস তার উদাহরণ। হিন্দু সমাজের মূল স্রোতের আরও সমীপবর্তী ভূদেব মুখোপাধ্যায়-এর (১৮২৭-১৮৯৪) 'স্বপ্নলব্ধ ভারতের ইতিহাস' বা 'সামাজিক প্রবন্ধ' ইত্যাদিতে দেশবাসী বলতে "ভারতভূমির মাতৃভক্ত পুত্রেরা।" হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩) ১৮৭২ সালে 'ভারত বিলাপ' লিখে সরকারি কোপানলে; তৎসত্ত্বেও ১৮৮৬ সালে তিনি জাতীয় কংগ্রেস-এর কলকাতা সম্মেলনের সময়ে লিখলেন "কি আনন্দ আজি ভারতভুবনে, ভারতবাসী জাগিল।" উদ্ধৃতি ও উদাহরণ অনায়াসে বাড়ানো যায়। কিন্তু এখন প্রশ্ন নিম্নরূপ।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্', যা অবধারিত রূপে এসে পড়ে এই আলোচনায়, বঙ্গজননীর প্রতি উদ্দিষ্ট। এ লেখা ১৮৭২ থেকে ১৮৭৫ সালের মধ্যে কোনও সময়ে, পরে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে সংযুক্ত। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বঙ্গজননীকে মাতৃরূপে কল্পনা করেন : "রেখো মা দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে" ইত্যাদির শেষে "শ্যামা জন্মদে" বঙ্গদেশ। মাইকেলে'র ক্ষেত্রে ভাষা জননী স্বরূপা, "জন্ম যদি তব বঙ্গে" তবেই তিনি তোমার উদ্দেশ্যে লিখছেন। বঙ্কিমের ক্ষেত্রে বঙ্গজননী প্রধান কিন্তু একমাত্র নন। বন্দেমাতরম্ নিঃসন্দেহে বঙ্গমাতার পূজা— সপ্তকোটি সন্তান বেঙ্গল প্রেসিডেন্‌সির, এর মধ্যে মুসলমান জনসংখ্যাও সামিল আছে।[৬] কমলাকান্তের মাতৃপূজা ('আমার দুর্গোৎসব', ১৮৭৪) "কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমির" পূজা, "কালস্রোতে দেখিলাম, এই সুবর্ণমূর্তি বঙ্গ-প্রতিমা... সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে, শিবে আমার সর্বার্থসাধিকে..."। আবার অন্য সময় বঙ্কিমচন্দ্র পুরোদস্তুর ভারত বন্দনায় সামিল : যেমন রাজনারায়ণ বসুর গ্রন্থে সত্যেন ঠাকুর-এর যে গান উদ্ধৃত— "মিলে সবে ভারত সন্তান, এক তান মন প্রাণ, গাও ভারতের যশগান"— তার উল্লেখ করে বঙ্কিম লিখেছেন "বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয় যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক ... এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হোক্" ইত্যাদি।[৭] এই যে ভারতমাতা, যিনি চিত্রেও ভবিষ্যতে আবির্ভূত হলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভারতমাতা' নামক অঙ্কনে— আর বঙ্কিমের যে বঙ্গমাতা আনন্দমঠে বিরাজমান, তারা কি একই? যে বঙ্গীয় প্রতিমাকরণ (iconisation) চলেছিল তার সঙ্গে ভারতীয়ত্বের কি সম্বন্ধ?

এই প্রশ্নের একটা সহজ উত্তর উঠতে পারে যে বঙ্গমাতা আর ভারতমাতা একই পূজনীয়ার দুই অবতার। এমন ভাবা যেতে পারে। কিন্তু এই দ্বিত্ব কি প্রয়োজনে? বঙ্কিমের কল্পনায় কি সত্যই একটা দ্বিধা-বিভক্ত মন দেখা যায় না? আমার অনুমান : যেসব আবেগের সমিধ দ্বারা দেশভক্তি প্রজ্জ্বলিত করা হয়েছিল তার অনেকাংশই বঙ্গীয়। বুদ্ধির পথে বাঙালী মনের একার্থ ভারতীয় জাতীয়তার বৃহত্তর

ধারণার প্রতি আকৃষ্ট হলেও অপরার্ধের হৃদয়ের আকর্ষণ ছিল বঙ্গমাতার প্রতিমার প্রতি। অর্থাৎ যুক্তি-তর্কের মণ্ডপে ভারতীয়ত্বের প্রতি একটা প্রণাম ঠুকে, গর্ভগৃহে ঢুকে বঙ্গমাতার প্রতিমাকেই হৃদয় সমর্পন করতে উৎসুক ছিল।

বঙ্গমাতা ও ভারতমাতা দুইই আসলে এক এমন একটা অদ্বৈতবাদের পক্ষে যুক্তি আছে অনেক। কিন্তু এই দুই প্রতীক-সমাহারের মধ্যে দ্বন্দ্ব, আনুগত্যের বিরোধ একেবারে অচিন্তনীয় নয়। বাঙালীর আত্মানুসন্ধান এই দ্বন্দ্বোর দ্বারা চিহ্নিত অনেক ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীতে। প্রধান ক্ষেত্রটি হলো এই. বাঙালীর অর্দ্ধেক ও ক্রমবর্ধমান একটা অংশের অনেকেই নিজেদের 'বাঙালী কিন্তু ভারতীয় নয়' এই ভাবতে শুরু করল। মুসলমান বাঙালী মনে এই ভাবটি শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ সালে বঙ্গবিভাগে পরিণতি লাভ করল। দ্বিতীয়ত বঙ্গীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেও কেন্দ্রীয় ভারতীয় নেতৃত্ব ও তাদের নীতি সম্বন্ধে ক্ষোভ, অভাববোধ, এবং বিরোধিতা দেখা যায় বঙ্গীয় নেতৃত্বের একটি অংশে। এটা প্রকাশ পায় কেবল বঙ্গীয় কংগ্রেস বনাম কেন্দ্রীয় কংগ্রেস সংঘর্ষে নয়, বঙ্গীয় রাজনীতিতে অন্য নানা রূপেও দেখা যায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে কেন্দ্রস্থিত নীতির প্রতিদ্বন্দী স্বরূপ বিকল্প সৃষ্টি করার প্রয়াস। যথা স্বরাজ্য দল চিত্তরঞ্জন দাসের আমলে, ২০ শতকের প্রথম তিন দশকে বিপ্লবী বা তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী জাতীয়তাবাদ, গান্ধীবাদী কংগ্রেসিদের সঙ্গে বিরোধ সুভাষচন্দ্র বসুর সময়ে, ইত্যাদি।

এই প্রবণতাটিকে খুঁটিয়ে দেখা যাক্। ১৯০৫-এর পর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে স্বভাবত বঙ্গীয় দেশপ্রেম, ভারতীয় জাতীয়তা চেতনার সঙ্গে সহজেই যুক্ত হয়েছিল। এর পর থেকে, বিশেব দশক থেকে বঙ্গীয় আত্মচেতনা বৃদ্ধি পায় সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মাধ্যমে। রাজনীতিতে এই প্রবণতা একটি বহু দূর-পাল্লার ধারার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সেটা হলো ক্রমান্বয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে শহরে নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও গ্রামীণ বর্দ্ধিষ্ণু শ্রেণীর প্রবেশ সেই মঞ্চে যেখানে উচ্চকোটী শহুরে গণ্যমান্যদেব আধিপত্য ছিল। উঁচুমহলের ব্যাপাব যতদিন ছিল কংগ্রেসের কাজকর্ম, মোটামুটি দলের প্রথম তিন দশক ১৮৮৫ থেকে, ততদিন যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি (political culture), বোলচাল, ইংরেজিপনা কোট-পাৎলুন, বক্তৃতার ঢং, সামাজিক আচার ব্যবহার, ইত্যাদি ছিল তার সঙ্গে ১৯২০ এর শতক থেকে রাজনৈতিক বাতাবরণ অনেক ভিন্ন। ইংরেজি ভাষণের জায়গায় বাংলার ব্যবহার প্রাদেশিক সভা-সমিতিতে, গ্ল্যাডস্টোন বা ডিজরেইলির বাগ্মিতার অনুকরণের অন্ত, প্রাদেশিক ভাষায় সংবাদপত্রাচার, রাজনীতির খেলায় ইংলন্ডের পার্লামেন্টরি কায়দার জায়গায় দিশি ঢং — এই সব নূতন একটা রাজনৈতিক সংস্কৃতিব লক্ষণ। উঁচুমহলের ঈঙ্গবঙ্গদের নীচের মানুষেরা যতই সামিল হতে লাগল কংগ্রেসের আন্দোলনে, যতই কংগ্রেস প্রাদেশিক অঙ্গনে প্রবেশ করল, ততই স্থানীয় সংস্কৃতির মাধ্যম ব্যবহার শুরু হলো। ফলে কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদের সঙ্গে আঞ্চলিক দেশভক্তির একটা বোঝাপড়া ও আপোষ (negotiation) দেশজ বা আঞ্চলিক সংস্কৃতির মিশেল এল পূর্বতন টুপি-পাৎলুন পরা রাজনীতির জগতে। ১৯১৯ এবং ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন দ্বারা ভোটাধিকার প্রসারিত হওয়ার ফলে ইংরিজি-না-জানা নূতন নির্বাচক যারা এল তাদের লক্ষ্য করে রাজনৈতিক কার্যক্রম ও জনসংযোগ স্বভাবত বাড়তে লাগল।

এই উল্লিখিত প্রক্রিয়াটিকে আমি রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রাকৃতায়ন বল্‌তে পারি। এর সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেননি স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির মতন প্রবীণ নেতারা, পারলেন চলতা-ফেরতা নতুন নেতারা— যেমন মহাত্মা গান্ধী ও চিত্তরঞ্জন দাস (১৮৭০—১৯২৫)। চিত্তরঞ্জন ১৯১৭ সালে নজিরবিহীন একটা কাজ করলেন— তাঁর সভাপতি ভাষণ কংগ্রেসের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে দিলেন বাংলা ভাষায়, ইংরিজিতে নয়।[৮] বিষয় মূলত বাংলার স্বাতন্ত্র্য— সাহিত্যে, সংগীতে, ধর্মে,

সমাজে, সর্বত্র বাংলার বৈশিষ্ট্য তাঁর উপপাদ্য। বক্তব্য এই যে বাঙালী "জাতির জাতিত্ব" ইংরেজ আমলের আগেই পরিষ্কার হয়েছিল এবং সেই বাঙালীয়ানাকে না ধরতে পারলে কেবল রাজনৈতিক দৌড়-ঝাঁপ কার্যসিদ্ধি করবে না। এরই সঙ্গে চিত্তরঞ্জনের বক্তব্য ছিল যে, হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতির যে মিলন দেখা যায় সাংস্কৃতিক জগতে তারই মধ্যে আছে হিন্দু-মুসলমান সুসম্পর্ক গড়ে তোলার চাবি। (পরে অবশ্য 'বেঙ্গল প্যাক্ট' করে হিন্দু-মুসলমান সুসম্পর্ক গড়ার চেষ্টা তাঁর বিফল হয়েছিল।) বাংলার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন এতদূর দৃঢ়মনস্ক ছিলেন যে ১৯২৫ সালে তাঁর শেষ রাজনৈতিক বক্তৃতা, ফরিদপুরে প্রাদেশিক সম্মেলনে, প্রস্তাব করেন যে স্বাধীনোত্তর ভারত একটা যুক্তরাজ্য বা ফেডারেশন হবে যেখানে প্রতি প্রদেশ তার নিজস্বতা বজায় রাখবে।

রাজনীতিতে যেমন চিত্তরঞ্জন, আর্থসামাজিক চিন্তায় অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪)। সাধারণ বাংলা কথোপকথনের ভাষায় তাঁর লেখা, এবং তদুপরি তাঁর নিজ জীবনের কর্মধারা দ্বারা তিনি চেষ্টা করেছিলেন বাঙালীকে কর্মাভিমুখী ও ব্যবসানিপুণ করে তুলতে। তাঁর বক্তব্য: ইংরিজি শিক্ষার ফলে বাঙালী কেবল নিচু কিংবা উঁচু পদে কেরাণীগিরি করতে শিখেছে. চোখের সামনে দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইংরেজ ও মারওয়াড়ি ব্যবসাদারদের কারখানা বা বাণিজ্যের উদ্যোগ বাঙালীকে কিছু শেখাতে পারেনি। "বোম্বে ও কলকাতা একবার তুলনা করে দেখুন। বোম্বের ধন বোম্বাইবাসীর, কিন্তু কলকাতার অর্থসম্পত্তি বাঙালীর নয়— ইংরেজ, মারওয়াড়ি, ভাটিয়া, বা দিল্লীবাসী মুসলমানের।" অনুরূপ শ্রমিক শ্রেণীতে বাঙালী পিছে হটে আছে, শ্রমের মর্যাদা বোঝে না: 'বাংলা দেশের ধনধান্য কি এতই অপর্য্যাপ্ত যে কাহারো মুটে, মজুর, বেহারা, প্রভৃতি হবার দরকার নেই? আমরা নবাবী করেই চলেছি, কি যে দুর্দশা এতে হচ্ছে তা বুঝতে কাহারো কষ্ট হয় না..." ইত্যাদি।[৯] যদিও তিনি পঞ্চাশ বৎসর ধরে এমন লিখেছিলেন নানা পুস্তিকায় ও প্রবন্ধে— "বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার" (১৯০৯), "বঙ্গীয় যুবসমাজের ভবিষ্যৎ জীবিকা অর্জন" (১৯১০), "অর্থনৈতিক সমস্যা : বাঙালী কোথায়?" (১৯২০, "অন্ন-সমস্যা" (১৯২৮) এবং নিজে রসায়ন ও ঔষধ উৎপাদনের কারখানা চালিয়েছিলেন— পরবর্তী ইতিহাসের দিকে তাকালে বোঝা যায় সে ছিল অরণ্যে রোদন। পিছিয়ে পড়া বাঙালীর প্রাদেশিকতা-দুষ্ট অবজ্ঞা অন্য অনেক প্রদেশবাসীর প্রতি, এবং পিঠো-পিঠি তারই সঙ্গে ভিত্তিহীন আত্মগরিমা তিনি দেখিয়েছেন। কিন্তু বাঙালীকে প্রণোদিত করার চেষ্টা তাঁর সফল হয়নি।

চিত্তরঞ্জন ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক চিন্তার অনুরূপ বঙ্গকেন্দ্রিকতায় বিদগ্ধ সংস্কৃতিবান মহলে প্রতিনিধিস্থানীয় ধরা চলে প্রমথ চৌধুরীকে (১৮৬৮—১৯৪৬)। যথা "বাঙালী পেট্রিয়টিজম্" শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধে (১৯২০) লিখেছেন : "বাঙালী পেট্রিয়টিজম্‌কে মনে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেওয়াটা বাঙালীর পক্ষে যদি দোষের হয় তা হলে সে দোষে আমি চিরদিনই দোষী আছি। এ অপরাধের আমার এত প্রমাণ আছে যে সকল একত্র করলে একখানি নাতিদীর্ঘ পুস্তিকা হয়ে ওঠে।... বহুকে এক করার চেষ্টা ভাল, কিন্তু একাকার করার চেষ্টা মারাত্মক.. আমার বাঙালী ন্যাশনালিজম্ মুখ্যত মানসিক এবং গৌনত রাজনৈতিক। আমাদের মনের স্বরাজ রক্ষা এবং তার ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করাই হচ্ছে আমাদের প্রধান ভাবনা... আমার বাঙালী পেট্রিয়টিজম্ বর্তমান ভারতবর্ষীয় পেট্রিয়টিজম্-এর বিরোধী নয়।"[১০] ইত্যাকার লেখায় ভারতমাতা ও বঙ্গমাতার মধ্যে সমঝোতা কেমন হতে পারে এটা যেমন স্পষ্ট, তেমনই চিন্তার বঙ্গকেন্দ্রিকতা।

এই একই সময়ে, অর্থাৎ ১৯১০ ও ১৯২০-এর দশকে ঘটল বাংলা ভাষা ও ইতিহাস-চর্চার পুষ্টি এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি সংস্থাপন যার ফলে বঙ্গীয় আত্মচেতনা দৃঢ়তর হ'ল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৮৯০-১৯৭৭) বাংলা ভাষার উৎপত্তি ও বিকাশের ওপর গবেষণা লন্ডনে পেশ করলেন ১৯২১

সালে; অনেকে তখন হয়ত এই অসাধারণ নূতন কাজ বুঝলেন না কিন্তু তবু হয়ত 'শেষের কবিতার' নায়কের মতন অন্তত হাতে ধরেছিলেন। তুলনীয় সাহিত্যের ইতিহাস উদ্ধারে দীনেশচন্দ্র সেন-এর (১৮৬৬-১৯৩৯) কৃতি। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩— ১৯৩১) দ্বারা চর্যাপদ আবিষ্কার (১৯১২), এবং উত্তরসূরীদের মধ্যে মহম্মদ শহীদুল্লাহ'র (১৮৮৫-১৯৬৯) কৃতি বাংলাকে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় স্থাপিত করে মর্য্যাদা দিল। রমাপ্রসাদ চন্দ (১৮৭৩-১৯৪২) কৃত "গৌড়রাজমালা' (১৯১২) অক্ষয়কুমার মৈত্রের (১৮৬১-১৯৩০) প্রাথমিক প্রচেষ্টাকে ('গৌড়লেখমালা', ১৯১২) সম্পূর্ণতার পথে এগিয়ে দিল।[১১] রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৫-১৯৩০) লিখিত বাংলার ইতিহাস প্রকাশ পায় ১৯১৫-১৭ সালে। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষোভ যে "সাহেবরা পাখি মারিলেও তার ইতিহাস লিখিত হয়" আর বাংলার ইতিহাস নেই, এই তাড়নায় সংগঠিত চেষ্টায় শুরু হয়: বিশেষ উল্লেখযোগ্য অক্ষয় মৈত্র, গুলাম ইয়াজ্‌দানি ইত্যাদির চেষ্টায় তৈরি বরেন্দ্র রিসর্চ সোসাইটি (১৯১০), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচীন ইতিহাস বিভাগে রমাপ্রসাদ চন্দের নিয়োগ (১৯১৯), তাঁরই সহকর্মী দীনেশচন্দ্র সেনের হাতে পুরাতন বাংলা কাব্য ও পুঁথির সংগ্রহ (১৯২৩-৩২)। বাংলা ভাষার চর্চা উৎসাহিত হলো ১৯২৫ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিপারটমেন্ট অফ ভারনাকুলার লিটরেচর' পত্তন হওয়ায় এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়-এর উদ্যোগে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলার মাধ্যম স্বীকৃতি লাভ করে (১৯৩২)। ইতিমধ্যে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন পূর্ববঙ্গের ও মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। মোট ফল এই সবের : ভাষা সম্বন্ধে চেতনা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন, অতীত সম্বন্ধে ভাবালু আবেগপ্রবণতাকে বিদ্যার জগতে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর চেষ্টা এবং সাধারণভাবে বঙ্গীয় আত্মপ্রত্যয়।

সাংস্কৃতিক এই বঙ্গকেন্দ্রিকতা রাজনীতির জগতে কোন্ পথে গেল? রাজনৈতিক ইতিহাসের ছক সকলেরই জানা, তাই কেবল এই প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তবেব সূত্র কয়েকটি তুলে ধরা যথেষ্ট হবে এই সংক্ষিপ্ত সমাচারে। মোটামুটি বলা চলে যে বঙ্গীয় রাজনীতির মূল প্রবণতা স্বাধীনতাপূর্ব শেষ তিন দশকে এই: কেন্দ্রস্থিত নেতা ও নীতির বঙ্গীয় বিকল্পের অনুসন্ধান, ফলে প্রবণতা কেন্দ্রাতিগতা অর্থাৎ প্রান্তাভিমুখীনতা ১৯২০-এর দশক থেকে গান্ধীবাদীরা কেন্দ্রীয় কংগ্রেস চালিয়েছে যখন, সেসময় বঙ্গীয় নেতরা গান্ধীবাদী রাজনীতির বিকল্পের অনুসন্ধান তিনটি ধারায় করেছেন। প্রথম, পূর্বতন ধারায় বিপ্লবী জাতীয়তাবাদ; দ্বিতীয় চিত্তরঞ্জনের আমলে স্বরাজ্য দল; তৃতীয়, বামপন্থা। বলা নিষ্প্রয়োজন যে অরবিন্দ ঘোষের সময় থেকে প্রথম পন্থাটি বাঙালী মনে খুবই প্রভাবশালী এবং গান্ধীবাদের প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে রয়ে গেল ত্রিশের দশক-এর মাঝামাঝি পর্যন্ত। চিত্তরঞ্জনের উদ্যোগে বিপ্লবীদের অনেকে কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগ করেন, বিশেষতঃ' বিশের গোড়ায় অসহযোগ আন্দোলনে। কিন্তু অনুশীলন ও যুগান্তর দলের স্বকীয়তা কংগ্রেসের মধ্যে উপদলের মতন হয়ে বজায় ছিল, কংগ্রেসের নেতারা তাদের অগ্রাহ্য করতে পারেননি কখনও। এই দলগুলির প্রভাব যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও সুভাষ বসুর আমলে প্রাদেশিক কংগ্রেসে প্রকট । দ্বিতীয় বিকল্প চিত্তরঞ্জনের সৃষ্ট: গান্ধীবাদীদের বিপক্ষতা সত্ত্বেও নির্বাচনে অংশগ্রহণ, আইন সভায় প্রবেশ, বিপ্লবী জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, এবং সর্বোপরি স্বরাজ্য দলের প্রতিষ্ঠায়, চিত্তরঞ্জন বঙ্গীয় রাজনীতিকে নূতন পথে নিয়ে গিয়েছিলেন। ভারতীয় কংগ্রেসের গান্ধীবাদী মহলের রণকৌশলের ছকের বাইরে স্বতন্ত্র এই বিকল্প রণনীতি গান্ধীবাদীদের কংগ্রেসের মধ্যেই কাবু করেছিল। ১৯২৫ সালে তাঁর মৃত্যু না হলে কি পরিণাম হতো এটা কৌতূহলের বিষয়। গান্ধীবাদের তৃতীয় বিকল্প বামপন্থী রাজনীতি। মানবেন্দ্রনাথ রায় কিংবা মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ-এর

মতন প্রতিপক্ষ সত্ত্বেও কংগ্রেস অবশ্য বামপন্থাকে বিশের কি ত্রিশের দশকে আশু আশঙ্কাজনক মনে করেনি কেননা বামপন্থা তখনও আধিপত্য লাভের কাছাকাছি আসেনি। যে বামপন্থী শক্তি প্রকৃত বিকল্প রূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এল পশ্চিমবঙ্গে তা তখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। কিন্তু তবু বামপন্থা বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী এবং অনেক হতাশ কংগ্রেস কর্মীকে আকর্ষণ করতে তখনই শুরু করে।

মোদ্দা কথা গান্ধীবাদীদের আধিপত্যে ভারতে যে কংগ্রেস 'হাইকমাণ্ড' কেন্দ্রস্থলে, তার মত ও পথের পরিবর্তে বিকল্পের সন্ধান.বিশ ও ত্রিশের দশকে বঙ্গীয় রাজনীতির বিশেষত্ব। এই স্বতন্ত্র-পথের সন্ধান অবশ্য তখন ফলপ্রসু হয়নি, কিন্তু নিঃসন্দেহে বঙ্গীয় স্বাতন্ত্র্যাভিলাষ সূচিত করে। অপর দিকে প্রদেশ কংগ্রেসের বড় একটা অংশ গান্ধীবাদের প্রতি আস্থাশীল। ফলে দেখা য'য় দুই-বিপরীত শক্তি বঙ্গীয় রাজনীতিতে, কেন্দ্রাভিমুখী এবং প্রান্তাভিমুখী। ত্রিশের দশকের গোড়াতে মারাত্মক অন্তর্কলহ। যতীন্দ্রমোহন ও সুভাষ বসুর মধ্যে সংঘর্ষের বিষয়ে প্রচুর দলিল দেখা যায় এ. আই. সি. সি. দলিল সংগ্রহে (নেহরু মিউজিয়ম, নতুন দিল্লী), বিশেষ করে এম. এস. আনে'র প্রতিবেদনে বাংলার অন্তর্কলহ বিষয়ে ১৯৩১ সালে। অসংখ্য অভিযোগ ও প্রত্যুত্তর : সুভাষ বলছেন যে যতীন্দ্রমোহন "কংগ্রেস দলের ঐক্য ছিন্নভিন্ন করছেন।"[১২] অপর দিকে কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রিয় যতীন্দ্রমোহন বলছেন সুভাষের বক্তব্যে কেবল "অর্ধসত্য ও অসত্য"।[১৩] কেন্দ্রীয় কংগ্রেস প্রেরিত আনে সাহেব লিখছেন প্রতিবেদনে : "এখানে সমস্ত কংগ্রেসে পার্টি দুই প্রতিদ্বন্দ্বী উপদলে বিভক্ত। একটির নেতা সুভাষ চন্দ্র বসু, অপরটির নেতা জে. এম. সেনগুপ্ত... সংগঠনের সর্বনাশ করছে এদেব, অর্ন্তকলহ ও রেষারেষি...।"[১৪] ১৯৩৬ সালে বাংলার গভর্নর এন্ডরসন লিখছেন গোপন চিঠিতে ভাইসরয়কে, বঙ্গীয় কংগ্রেস-এর "পুরোন ইতিহাস আছে অন্তর্কলহের... আগে লড়াই ছিল যুগান্তর দলের কাছের লোক সুভাষ বসু এবং অনুশীলন দলের সঙ্গে যোগাযোগ যার, জে. এম. সেনগুপ্তর মধ্যে ... এখন সুভাষ ও তাঁর ভ্রাতা শরৎ এর সঙ্গে বিরোধ চলছে বিধান চন্দ্র রায়ের।"[১৫] সুভাষ চন্দ্রের বিরোধী সেনগুপ্ত (মৃত্যু : ১৯৩৩) এবং তার পর বিধানচন্দ্র এবং গান্ধীবাদী নেতারা কেন্দ্রীয় সমর্থন পেয়েছিলেন ত্রিশের প্রথম থেকেই।[১৬] শেষে ১৯৩৯ সালে সুভাষ গান্ধীবাদীদের সর্বভারতীয় মঞ্চে হারিয়ে দ্বিতীয়বার সভাপতি নির্বাচিত হলেও গান্ধীবাদীদের অসহযোগিতার জন্য পদত্যাগে বাধ্য হলেন। "গত কংগ্রেস অধিবেশনের ব্যবহারে বাঙালী জাতির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়েছে এই অভিযোগ বাংলাদেশ ব্যপ্ত", লিখলেন রবীন্দ্রনাথ। (১৯৩৯); "দুর্ভাগ্যক্রমে দেশে মিলনকেন্দ্র রূপে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষে এক প্রদেশের সঙ্গে আর এক প্রদেশের বিচ্ছেদের সাংঘাতিক লক্ষণ নানা আকাবেই থেকে থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। ... এই ব্যবহার বিকৃতির মূলে আছে শক্তিস্পর্ধার প্রভাব। ... যারা এর কেন্দ্রস্থলে এই শক্তিকে বিশিষ্ট ভাবে অধিকার করে আছেন, সংকটের সময় তাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে...।"[১৭]

প্রান্তাভিমুখী মানসতা এবং কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধ মনোভাব বাংলা রাজনীতি জগতে তৈরি হয়েছিল এক বিশেষ পরিস্থিতিতে তিরিশের দশকের আরম্ভ থেকে। প্রথমত চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর পর (১৯২৫) কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্বে প্রথম সারির মধ্যে বঙ্গদেশের আর কেউ ছিল না; সুভাষ বসুর উত্থান ও বহিষ্কার প্রাদেশিক মানসতায় বঞ্চিত হওয়ার মনোভাব আরও বাড়ালো। কংগ্রেসের হাইকমাণ্ডের বিরুদ্ধে দ্বেষের দ্বিতীয় কারণ ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইনে বর্ণ-হিন্দু, মুসলমান, তফশিলী জাতি ও শ্বেতকায়দের যে অনুপাতে বিধানসভায় বঙ্গদেশে আসন দেওয়া হলো; এই বন্টন প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড্ যখন কায়েম করেন তখন বঙ্গদেশ থেকে বহু তদ্বির সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় কংগ্রেস কোনই প্রতিবাদ করল না, "গ্রহণ করছি না, আবার বর্জনও করছি না" বলে হাত গুটিয়ে থাকল। ১৯৩৫-এর আসন বণ্টনের ফলে বিধান সভায় হিন্দু ভদ্রলোক আধিপত্য খতম হয়েছিল;

আনুপাতিক হিসেবটাও ছিল অতি গোলমেলে এবং শ্বেতকায়দের আসন অনুপাতের অনেক অধিক ছিল। তৃতীয় অভিযোগ বাংলা রাজনীতিকদের এই যে ১৯৩৭-এর নির্বাচনের পর যখন কোনও দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি, এবং কৃষক প্রজা পার্টির ফজলুল হক্ সাহেব বঙ্গীয় কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাতে প্রস্তুত ছিলেন, তখন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব, বিশেষ করে বল্লভভাই পটেল ও জওয়াহরলাল নেহ্রু, কংগ্রেস কোনও কোওলিশন মন্ত্রীসভায় যোগ দেবে না বলে ফতোয়া দিলেন। ফলে সৃষ্টি হলো ফজলুল হক্ মন্ত্রীসভা (১৯৩৭-৪১, ১৯৪১-৪৩), খ্ওয়াজা নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভা (১৯৪৩-১৯৪৫), এবং সহরওয়র্দি মন্ত্রীসভা (১৯৪৬-৪৭) এবং কংগ্রেস পড়ে রইল ক্ষমতার বাইরে স্বেচ্ছানির্বাসনে। এতে বাঙালী হিন্দু নেতারা বিশেষ ক্ষুব্ধ। অন্তর্কলহে দুর্বল বঙ্গীয় কংগ্রেস কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হলেও প্রতিকারে অপারগ। এই পরিস্থিতিতে, পারস্পরিক দোষারোপে দুর্বল কংগ্রেস সম্মুখীন হলো এক অগ্নিপরীক্ষার— ক্রমবর্ধমান সাম্প্রদায়িকতাব আধিপত্য এধং শেষ পর্যন্ত বঙ্গবিভাগ।

স্বাধীনতার পরের কাহিনী আমাদের এই আলোচনার পরিধির বাইরে, তবে এটা তর্কাতীত বোধহয় যে বঙ্গীয় প্রান্তভিমুখীনতা একদিকে যেমন প্রকাশ পেয়েছে পূর্ব বাংলায় বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে, অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গে ভারতের কেন্দ্রস্থ রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রকদেব সঙ্গে নিয়ত সংঘর্ষ-সহযোগেব টানাপোড়েনেব ইতিহাসে। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে জাতীয়তাবাদী অথবা বামপন্থী মূল ভাবধারায় প্রাদেশিকতা-মূলক বিছিন্নতাবাদ জায়গা পায়নি এবং কেন্দ্রীয় সবকাবেব "বিমাতৃসুলভ" মনোভাব সম্বন্ধে অভিযোগ মাঝে মাঝে শোনা গেলেও সেই পাবিবারিক উপমাটাও অর্থবহ, বিচ্ছিন্নতা সূচনা করে না। যে দ্বন্দ্ব এখনও প্রতীয়মান তার সমাধান হতে পারে অপেক্ষাকৃত বিকেন্দ্রীকৃত যুক্তরাজ্য বা ফেডাবল ধবনেব সাংবিধানিক পুনর্গঠনে। ইতিমধ্যে পুঁজিবাদী ভুবনায়নেব (globalization) প্রভাবে যে সংস্কৃতি তৈবিব পথে তার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বে বাঙালীব আত্মপরিচয় কি নির্মিতি লাভ করবে সেটাও এখনও অজানা, ভবিষ্যতে ভাববার বিষয়।

উৎসনির্দেশ

১ সব্যসাচী ভট্টাচার্য '**ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি**, ১৮৫০-১৯৪৭' আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃঃ ১৯

২. আশিষ নন্দী, '**The Illegitimacy of Nationalism**' OUP, Delhi, 1994

৩. বর্তমান প্রবন্ধেব অনেক অংশের পূর্ব সংস্করণ 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, কৃতজ্ঞতা স্বীকার্য।

৪. National Archives of India, Political Committee of Govt of India, 31 March 1829, no 19, and 21 January 1831, no 16, Raja Rammohun Roy to Chief Secretary, Govt of India, forwarding Petition of King of Delhi, 23 February 1829, Public Consultation, 13 March 1829

৫. Rammohun Roy to Charles Grant, 11 October 1831, in K Nag (ed) **English Works of Rammohun Roy** (Calcutta, 1947) P. 122

৬ Sabyasachi Bhattacharya **Vande Mataram : the biography of a song** (Penguin, Delhi, 2003) p.

৭. অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য **বঙ্কিম চন্দ্র জীবনী** (আনন্দ, পাবলিশার্স কলকাতা, ১৯৯১, ইঃ ২০১-২০২)

৮. এন. সি. ঘোষ '**চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন**' (কলকাতা, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ) ফরিদপুব সম্মিলনে ভাষণ, ২ মে, ১৯২৫

৯. প্রফুল্ল চন্দ্র রায় '**প্রবন্ধ ও বক্তৃতাবলী**' (কলকাতা, ১৯২৭) পৃঃ ৪০

১০. প্রমথ চৌধুরী, 'বাঙালী-পেট্রিয়টিজ্‌ম্‌', **সবুজপত্র**, অগ্রহায়ণ, ১৩২৭ বঙ্গাব্দ।

১১. প্রবোধ চন্দ্র সেন '**বাংলার ইতিহাস সাধনা**' (পুনর্মুদ্রন, কলকাতা, ১৯৯২)

১২. Subhas Chandra Bose to M.S. Aney, 17 October 1931, All India Congress Committee Papers, File no. P-15-1931, Nehru Memorial Museum, Delhi

১৩. J. M. Sengupta to V Patel, 6 September 1931, AICC Papers, File no. P-15-1931, NMM, Delhi.

১৪. Report by M S Aney on Bengal PCC, AICC Papers, File no P-15-1931, NMM, Delhi

১৫. J. Anderson, Governor of Bengal, to Linlithgow, Viceroy, (Private and Confidential), 3 December 1936, National Archives of India, Microfilm reel no. 3169

১৬. Private Papers of Bidhan Chandra Roy, File No 37, Nehru Memorial Museum, Delhi

১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'কংগ্রেস' '**প্রবাসী**' আশ্বিন, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ, পুনর্মুদ্রিত, '**কালান্তর**' (কলকাতা, ১৪০০ বঙ্গাব্দ) পৃঃ ৩৭৩-৭৪; রবীন্দ্রনাথ-এর লেখায় বঙ্গকেন্দ্রিক মনোবৃত্তির সমর্থন বড় একটা দেখা যায় না, যথা এমন কি ১৯৩৯ সালেও তিনি লিখছেন "বাংলাদেশকে প্রাদেশিকতার অভিমানে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন করা" তাঁর কাছে অভাবনীয়, তাঁর উদ্দেশ্য "সমগ্র ভারতবর্ষের কাছে বাংলাব সম্মিলন যাতে সম্পূর্ণ হয়।" প্রকৃতপক্ষে ১৯০২ সাল থেকে, যখন 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধ লিখিত হয়, এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মতের ধারাবাহিকতা কারোর চোখ এড়াতে পারে না; এবং শেষ পর্যন্ত, মৃত্যুর আগে শেষ কয়েকটি বক্তৃতার মধ্যেও একই সুব, যথা মহাজাতি সদন প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে ভাষণ · "আত্ম গৌরবে সমস্ত ভারতের সঙ্গে বাংলার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য থাকুক।" মনে হয় এই সময়ে প্রান্তাভিমুখী চিন্তার প্রাবল্য দেখেই রবীন্দ্রনাথ এই কথা বাব বার বলেছিলেন। দ্রষ্টব্য 'দেশনায়ক' (১৯৩৯ সালে রচিত, তৎকালে অপ্রকাশিত), এবং 'মহাজাতি সদন' **কালান্তর** (কলকাতা, ১৪০০ বঙ্গাব্দ) পৃঃ ৩৮৭, ৩৯১।

ভাটি অঞ্চলের গণগীতিকার : শাহ্ আবদুল করিম

সুধীর চক্রবর্তী

'ভাবিয়া দেখো মনে মাটির সারিন্দারে বাজায় কোন্ জনে'

শ্রীহট্টের ভাটি অঞ্চলের ধলা নামের এক গ্রামে দুই যুবা দেখা করতে এসেছে এক লোকগীতিকারের সঙ্গে। মানুষটি প্রবৃদ্ধ, অশীতিপর। সময় ১৯৯৮ সাল। ধলায় আসতে গিয়ে ঐ উৎসাহী যুবাদের ধকল গেছে। তিনঘণ্টা বাসে চড়ে, তারপরে দুঘণ্টা ট্রলারে এবং সবশেষে মাইল খানেক প্রচণ্ড কাদা ভেঙে হাঁটা পথে । সারা পায়ে কাদা থিকথিক, তাতে লেগেছে হাওরের জোঁক। তবু তারা আত্মপ্রসাদ পায় পৌঁছতে পেরে অমন মানুষটির কাছে। এবারে শোনা যাক মানুষটি ও তাঁর ঘরের বর্ণনা টি. এম. আহমেদ কায়সারের কলমে ·

> তাঁর পিচুটি পড়া রক্তবর্ণ চোখ থেকে জল ঝরতেছিলো অবিরাম আর ভাঁজ পড়া, স্থানে স্থানে কুঁচকে যাওয়া গালে, থুতায় ছিলো সাত-আটদিন ধরে না কামানো দাড়ির সূক্ষ্ম ভগ্নাংশ আর চোখ দুটো যদিও যে তা ছিলো খুবই গভীর এবং অন্তর্ভেদীও। একখানি ভাঙা খাট, যাতে বাড়তি একজন মাত্র লোক বসতে গেলেও মড়মড় শব্দ করে ভেঙে যাবার ভয় দেখায়, তার উপর ছেঁড়া, ময়লা এবং স্থানে স্থানে বিশ্রী রকম দাগ পড়া বিছানার চাদর ফলত দুর্গন্ধই ছড়ায় যা অবশ্য বাড়ীর চাবদিকে বিশাল হাওরের জল, কাদা ও পচা শ্যাওলার গন্ধের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে যায় পরবর্তীতে। খাটের পাশে ঘুণে খাওয়া একখানি জীর্ণ টেবিল এবং প্রায় একই অবস্থার এক খানি লম্বা বেঞ্চ, আমরা বসে পড়লাম বেঞ্চেই...। এদিকে সূর্য অস্তমিত হচ্ছিলো... আকাশ ছিলো মেঘে ঢাকা, তার উপর বৃষ্টি পড়ছিলো গুঁড়ি গুঁড়ি।... যতদূর দৃষ্টি যায় সাদা হাওর, এমনকি এই মেঘে ঢাকা সন্ধ্যাবেলাও যা চিক চিক করে ওঠে, তা দেখে ভেতরটা জুড়িয়ে গেল। ... ঐ জল থৈ থৈ হাওরের মধ্যে কোথাও থেকে থাকবে একটা নদী, নদীর নাম কালনী, কালনী নদীর দুপাশে কাস, গোড়ার আর বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত।

গড়পড়তা বাঙালী পাঠক, বিশেষত যাঁরা নাগরিক, তাঁদের মনের মধ্যে এ পর্যন্ত বর্ণনা পড়ে কেমন একটা অস্বস্তি বা আশংকা জাগার কথা। না জানি এরপর কী হবে। অশীতিপর মানুষটি বিপত্নীক। তাঁকে দেখাশোনা করে নূর হোসেন আর নুরুন্নেছা— শিষ্য ও শিষ্যা। এরপরের বর্ণনা :

> কেউ রুগ্ন খাটের উপর, কেউ বেঞ্চিতে বসে যাবার পর নুরুন্নেছা লণ্ঠন জ্বালিয়ে দেন ঘরে, বাইরে উৎসুক কয়েকজন গ্রামবাসী উঁকিঝুঁকি মারেন, একসময় ঘরের ভেতরেও ঢুকে পড়েন কেউ কেউ, পরবর্তীতে অবশ্য এঁদের সবার অংশগ্রহণে প্রাণবন্ত এক গানের আসর জমে উঠবে, আমরাও আমাদের নিজেদের বেসুরো গলা দিয়ে তাল মেলানোর জন্যে হন্যে হয়ে উঠবো কিন্তু সেটা মধ্যরাত্রিরও অনেক পরে।

যাঁর সন্নিধ্য কামনায় এত আয়োজন আর আততি, তাঁকে বলা হচ্ছে বাউল সম্রাট শাহ্ আবদুল করিম। আশি উর্ধ্ব এই ভঙ্গুর শরীর নিয়েও এখনো আপোষহীন এক বাউল, এখনো গান লিখে যান সমান তালে, এমনকি এখনো সুর করে গানের কলি আওড়ালে সংলগ্ন পবিবেশে ঝিম ধরে যায় যেন।

খানিক পরে আবদুল বলে উঠলেন, 'আমি বেহেস্ত চাইনা, দোসখ চাইনা, জীবিত অবস্থায় আমার ভাটি অঞ্চলের বিপন্ন মানুষের সুখ দেখতে চাই। এই মানুষ গুলোব মুখ যারা কেড়ে নিয়েছে আমার লড়াই তাদের বিরুদ্ধে। একদা তত্ত্বের সাধনা করতাম, এখন দেখি তত্ত্ব নয়, নিঃস্ব বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। দেহতত্ত্ব, নিগূঢ় তত্ত্ব আর সোনার বাংলা সোনার মানুষ বললে হবে না, লোভী, শোষক, পাপাত্মাদেব আঘাত করতে হবে।' বলেই গান ধরে ·

তত্ত্বগান গেয়ে গেলেন যারা মবমী কবি
আমি তুলে ধরি দেশের দুঃখ দুর্দশার ছবি।
বিপন্ন মানুষের দাবী করিম চায় শান্তিবিধান
মন মজালে রে বাউলা গান।

পাঠক, এই পর্যন্ত পড়ে বোধহয় ভাবছেন, কোথাকাব কে এক গ্রাম্য গাযক, বড়জোর গীতিকার, আউড়ে যাচ্ছেন বড় বড় কথা। গরিব অন্ত্যেবাসী, শ্রমিক পরিবেশের সামান্য এই আবদুল করিম, অগণ্য নগণ্য বাঙালি গীতিকারদের মধ্যে একজন হবেন। না, তা তো নয়। ১৯৬৪ আর ১৯৮৫ দু'দুবার গেছেন ইংলন্ডে গান শোনাতে। লিখেছেন শত শত গান। গান গেয়েছেন একই মঞ্চে রমেশ শীলের সঙ্গে। গান শুনিয়ে মুগ্ধ করেছেন মৌলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী আর বঙ্গ বন্ধুকে। কাগমাবী সম্মেলনে গান গেয়ে যখন নামলেন এই লোকগায়ক, মৌলানা ভাসানী বললেন, 'সাধনায় একাগ্র থাকলে তুমি একদিন গণমানুষের শিল্পী হবে।' তাঁর অনুমান সফল হয়েছে। বাউল তত্ত্ব, নবিতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, মনঃশিক্ষা, পির-মুর্শিদ-ওলিদের নিয়ে শত শত গান লেখার পরে চলে এসেছেন মাটির মানুষের দুঃখ দুর্দশার গানে— শোষণ'পীড়নের প্রতিবাদী গানে। এতটা বদলে গেলেন কী মন্ত্রে কোন টানে? আবদুল করিমের জীবন ও গানের সন্ধানে আমার মনে পড়ে যায় আরেক জনের কথা।

আবদুল করিমের জন্ম সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলার অন্তর্গত উজান ধল গ্রামে ১৩২২ বঙ্গাব্দে। তাঁর জন্মের বিরাশি বছর আগে জন্মেছিলেন কাঙাল হবিনাথ অখণ্ড নদিয়া জেলার কুমার খালি গ্রামে ১২৪০ বঙ্গাব্দে। কোথায় শ্রীহট্ট আর কোথায় কুমারখালি। কাঙাল হরিনাথ বা ফিকিরচাঁদের ছিল লালন ফকিবের সঙ্গে ভাবেব লেনদেন— তাঁর আশেপাশে ছিলেন গগন হরকরা, গোঁসাই গোপাল আর পাঞ্জু শাহ্ ফকির। আর আবদুল কবিমের ঘরানা হলো রশীদ উদ্দীন দুর্বিন শাহ, শীতলাংশাহ, রাধারমণ ও শাহ নূবের। তবু কেন কাঙালের কথা উঠে এলো করিমের প্রসঙ্গে? তার কারণ বুঝতে তাকাতে হবে হরিনাথের জীবনের দিকে।

একেবারে ছেলেবেলায় মাতৃহারা হন হরিনাথ। নিতান্ত গরিব তাঁর বাবা হলধর মজুমদার যখন মারা যান তখন হরিনাথ শৈশবে। পরের বাড়িতে খেতে পেতেন 'পান্তা ভাত, জামিরের (লেবু) পাতা আর লবণ'। পাঠশালার পর লেখাপড়া শিখতে পারেননি। পরে কাকার চেষ্টায় কুমারখালির ইংরাজি বিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও হঠাৎ কাকার মৃত্যুতে সে শিক্ষায় ছেদ পড়ল। মেধা ছিল, তাই সহপাঠীদের বই পড়ে নিজে নিজে কিছুটা এগোলেন। ভাগ্য ফেরাতে গেলেন কলকাতা, ফল হলো না। সেই সময়ে কুমারখালিতে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করতে এলেন পণ্ডিত দয়াল শিরোমনি। হরিনাথ তাঁর কাছে খানিকটা

শেখেন ব্যাকরণ, পড়েন কটা বইপত্র আর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। এই পর্যন্ত তাঁর বিদ্যার্জনের বৃত্তান্ত। এবারে জীবিকার চেষ্টা। একটা কাপড়ের দোকানে দৈনিক দু'পয়সা বেতনে কাজ জুটল। কিন্তু দোকান মালিকের অসৎ কাজকর্মে সায় ছিলনা বলে কাজ ছাড়লেন। নিজের নাম নিলেন কাঙাল হরিনাথ।

এবারে একটা নতুন চাকরি জুটল কাঙালের ভাগ্যে। একান্নটি কুঠির প্রধান কার্যালয় কুমার খালিতে নীলকুঠিতে শিক্ষানবিশী শুরু করলেন। স্বাধীনচেতা স্বভাবের এই যুবা রায়ত প্রজার উপব সাহেব কুঠিয়ালদের অত্যাচার ও শোষণ দেখে কাজ ছেড়ে দিলেন কিন্তু ভেতর ভেতর তাঁর মধ্যে জেগে উঠল সাংবাদিক হবার ইচ্ছা, তারই রসদ যেন জুটতে লাগল নীলকুঠির কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে। এরপরে হরিনাথ যা করলেন তা ভাবলে এখনকার দিনেও অবাক লাগে। নিজে লেখাপড়া শেখার সুযোগ পাননি বলে ১৮৫৪ সালে স্বগ্রামে একটি পাঠশালা খুলে অবৈতনিক শিক্ষকতা শুরু করে দিলেন। ক্রমে পাঠশালাটির সুনাম হলো, সরকার সামান্য কিছু অর্থ অনুদান দিতে থাকল, তার থেকে হরিনাথের বেতন ধার্য হলো মাসে কুড়ি টাকা করে। কিন্তু তিনি ভেবে দেখলেন নিজের কুড়ি টাকা মাইনে নিলে নিম্নশ্রেণীর শিক্ষকদের মাইনে বাড়বে না, তাই নিজে পনেরো টাকা নিয়ে অন্যদের মাইনে বাড়িয়ে দিলেন। এই ব্যবস্থার বর্ণনা করে হরিনাথ মন্তব্য করেছেন : 'এই পনেরো টাকা পর্য্যন্তই আমার বৈতনিক উপার্জন।'

শিক্ষকতার কাজে হরিনাথের দক্ষতা ছিল, ভালো গদ্য লিখতে পারতেন, চোখ কান খোলা ছিল, তাই কলকাতার বিখ্যাত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রে গ্রামের নানারকম সংবাদ পাঠিয়ে সাংবাদিক বৃত্তিব হাতেখড়ি সারলেন। অচিরে কলকাতার প্রখ্যাত সাংবাদিক হরিশ মুখোপাধ্যায় তাঁকে সাংবাদিকের কাজে শনাক্ত করে নদীয়া আর যশোহরের সংবাদ প্রেরকের দায়িত্ব দিলেন। তাঁরা 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'-এর জন্য। দক্ষতার সঙ্গে হরিনাথ গ্রাম্য পরিবেশে ইংরেজ নীলকরদের অত্যাচারের প্রচুর প্রতিবেদন পাঠাতে লাগলেন। সুনাম হলো তাঁর কাজের। কিন্তু হরিশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মতান্তর হলো। হরিনাথ জানালেন শুধু শাসক ইংরেজের অত্যাচার কেন, জমির মাপে ফসলের মাপে চক্রবৃদ্ধি হারের সুদে আর দাদনেব ব্যবসায়ে দেশীয় জমিদারদের শোষণই বা কম কী? সেই সব শোষণ আর শাসনের বিবরণও কলকাতার 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' মারফৎ দেশের মানুষের জানা উচিত। প্রস্তাবটি হরিশচন্দ্রের মনঃপূত না হওয়ায হরিনাথ সংবাদ পাঠানো বন্ধ করলেন।

ইতিমধ্যেই ভেতরে ভেতরে তাঁর ইচ্ছা জাগছিল স্বাধীনভাবে একটা পত্রিকা বার করবেন। নিজের বাড়িতে ছাপাখানা বসালেন। প্রকাশ পেল অত্যাশ্চর্য পত্রিকা : 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা', সম্পাদক হরিনাথ মজুমদার। ১২৭০ থেকে ১২৯২ বাইশ বছর চলেছে এই পত্রিকা— প্রথমে মাসিক, পরে পাক্ষিক, শেষপর্যন্ত সাপ্তাহিক। মাঝে মাঝে অর্থাভাবে পত্রিকা প্রকাশে ছেদ পড়েছে। শিক্ষকতার কাজ ছেড়েছেন তিনি পত্রিকার স্বার্থে বা দেশের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরবেন বলে। পত্রিকা চালাতে গিয়ে জড়িয়ে পড়েছেন ঋণের জালে। একদিক থেকে বলা যায় হরিনাথের জীবনের তিরিশ থেকে বেয়াল্লিশ বছব বয়স পর্যন্ত 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' ছিল জীবন সর্বস্ব বিষয় এবং ভাবতে গেলে তাঁর সর্বনাশেরও কারণ। সেকালের অনুন্নত গ্রাম পরিবেশে, প্রায় অশিক্ষিত সমাজে, হরিনাথের লোকহিতের উচ্চাদর্শ মানুষ বোঝেনি। জমিদার ও ধনীদের মর্মন্তুদ অত্যাচার ও অবিচারের কাহিনী ছেপে তিনি সামন্ত সমাজের বিষদৃষ্টিতে পড়েন। অথচ গ্রাহক পাঠকদের তরফে সহানুভূতি ও সহৃদয়তার অভাব ঘটে। কুষ্টিয়ার ঠাকুর জমিদার (সম্ভবত দেবেন্দ্রনাথ) হরিনাথকে উচিত শিক্ষার জন্য লাঠিয়ালদের পাঠান। বান্ধব অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ক্ষোভের সঙ্গে লিখেছেন : 'যতদিন গ্রামবার্ত্তা জীবিত ছিল, প্রায় ততদিনই কোনো-না কোনোরূপে হরিনাথের জমিদারের উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইত।'

হরিনাথের দুর্ভাগ্য যে সময়ের একটু বেশি এগিয়ে ছিলেন তিনি তাই পাঠকসমাজ তাঁর স্বার্থহীন মহৎ উদ্দেশ্য বুঝতে পারেননি। সম্পাদকরূপে তাঁর স্পষ্ট লক্ষ্য ছিল একটাই : কৃষক রায়ত তাঁতী আর শ্রমজীবীদের ওপর শোষণ ও বঞ্চনার ঘটনা সকলকে জানানো। কিন্তু 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'-র পাঠকরা সেই বিষয়ে খুব একটা উৎসাহ দেখাননি। হরিনাথ হতাশ হয়ে লিখেছিলেন :

> গত বৎসর নানা বিপদে বিপন্ন হইয়া গ্রামবার্ত্তা মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করে। তাহার তাদৃশ্য অবস্থালোকনে অনেক গ্রাহক নির্দয় হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করেন এবং অনেক দাতা তাহার নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া যান।

দরিদ্র প্রজাদের দুঃখ দুর্দশার কথা জানাবার জন্যই তাঁর কলম ধরা অথচ যখন মিথ্যা মামলা, হুংকার ও তর্জনগর্জনে তিনি বিপদগ্রস্ত ও অসহায় তখন কেউ তাঁর পাশে দাঁড়াননি। স্বখেদে তাই তিনি লেখেন :

> জমিদারেরা যখন আমার প্রতি অত্যাচার করে এবং আমার নামে মিথ্যা মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে যত্ন করে, আমি তখন গ্রামবাসী সকলকেই ডাকিয়া আমি এবং আত্মাবস্থা জানাই। গ্রামের একটি কুকুর কোনো প্রকারে অত্যাচারিত হইলেও গ্রামের লোক তাহার জন্য কিছু করে, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমার এতদূরই দুর্ভাগ্য যে, আমার জন্য কেহ কিছু করিবেন, এরূপ একটি কথাও বলিলেন না। যাঁহাদের নিমিত্ত কাঁদিলাম, বিবাদ মাথায় করিয়া বহন করিলাম, তাহাদিগের এই ব্যবহার!

এরপরেই আসে সেই প্রত্যাশিত বিপর্যয়। নানা বিরুদ্ধ ঘটনায় বিপন্ন, অবসাদে ও প্রতিরোধে হতাশ হরিনাথ বিশেষত গ্রামবার্ত্তা বন্ধ করতে বাধ্য হবার মর্মান্তিক যাতনায়, কোণঠাসা হয়ে পড়েন। ঋণভারে জর্জরিত হয়ে কপর্দকশূন্য হয়ে যান। কিন্তু তাঁর মধ্যে এসে পড়ে এক আশ্চর্য মানস পরিবর্তন— শুরু হয় সাধক জীবন আর গানের জীবন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হরিনাথের জীবনীতে লিখেছেন : 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা— সম্পাদনের গুরুভার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া হরিনাথ সাধন-ভজনে মন দিয়েছিলেন।'

কিন্তু আমাদের মনে এক অস্বস্তিকর প্রশ্ন জাগে। সাংবাদিকতা ছেড়ে সাধন ভজনে প্রবৃত্ত হওয়া, বাস্তবতা থেকে ভাবের রাজ্যে ঢুকে পড়া, পত্রিকার উত্তেজনাকর সম্পাদকীয় রচনা বাদ দিয়ে অধ্যাত্ম গান রচনা— একে কি বলা যাবে উত্তরণ? ঠিকই যে, যৌবনে তিনি ব্রাহ্মধর্মের অনুরাগী ছিলেন, মধ্যজীবনেও তাই কিন্তু শেষজীবনে তিনি শুধু হিন্দুধর্ম নয়। তন্ত্র মতে দীক্ষা নেন। তন্ত্রাচার্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণবের পিতা কুলদানন্দ ছিলেন তাঁর তন্ত্র দীক্ষাব গুরু। ভাবতে অবাক লাগে হরিনাথের মতো মাটিমাখা মানুষ, যিনি চিরসংগ্রামী, প্রতিবাদী স্বভাবের পরদুঃখকাতর ও শ্লেষব্যঙ্গ পরিহাসে ছিলেন লেখনীনিপুণ তাঁর পরিণতি ঘটল সাধক রূপে? তাঁর অনুরাগী সাহিত্যিক চন্দ্রশেখর কর বর্ণনা করে লিখেছেন :

> শেষজীবনে হরিনাথের গৈরিক বসনাবৃত সৌম্যমূর্তি দর্শন করিলে দেবদূত বলিয়া ভ্রম হইত। কার্তালের ব্রহ্মাণ্ডবেদেই পড়িয়াছি সাধনায় কতদূর অগ্রসর হইলে শরীর হইতে একরূপ দিব্য গন্ধ বাহির হইয়া থাকে, হরিনাথের দেহে এইরূপ গন্ধ আমি অনুভব করিয়াছি।

১৩০৩ বঙ্গাব্দে তেষট্টি বছর বয়সে হরিনাথের প্রয়াণ ঘটে।

হরিনাথের জীবনের এমন মর্মান্তিক রূপান্তর আমাদের সমাজ চিত্রের এক বিচিত্র উদাহরণ। অচিরে তিনি 'ফিকিরচাঁদ' ভণিতা দিয়ে বিপুল পরিমাণে বাউল বর্গের গান রচনা করে এবং গানের দল গঠন করে বহু জায়গায় ভ্রমণ করেন। সারা পূর্ববঙ্গ বলতে গেলে তাঁর গানের দলের প্লাবনে ভেসে যায়। সাধক বিজয়কৃষ্ণ তাঁকে নিয়ে যান ঢাকার ব্রাহ্মসমাজে গান গাইতে। 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' প্রকাশ করে বাইশ বছর তিনি যশ অর্থ প্রতিষ্ঠা কিছুই পাননি কিন্তু ফিকিরচাঁদী গান তাঁকে অভূতপূর্ব সমাদর এনে দিল। দেখা যাচ্ছে, ১২৯৩ থেকে ১৩০০ বঙ্গাব্দের মধ্যে ১২ পৃষ্ঠা করে ১৬ খণ্ড 'কাঙাল-ফিকিরচাঁদ ফকীরের গীতাবলী' বেরোয এবং ১৩২৩-এ বেরোয় 'কাঙাল ফিকিরচাঁদের বাউল সঙ্গীত' সংকলন। তাঁর গানের এমন আশ্চর্য সমাদরে অভিভূত হরিনাথ নিজেই লিখেছেন :

> অল্প দিনের মধ্যেই কাঙাল-ফিকিরচাঁদের গান নিম্নশ্রেণী হইতে উচ্চশ্রেণীর লোকের আনন্দকর হইয়া উঠিল। মাঠের চাষা, ঘাটের নেয়ে, পথের মুটে, বাজারের দোকানদার এবং তাহার উপর শ্রেণীর সকলেই প্রার্থনা সহকাবে ডাকিযা কাঙাল ফিকিরচাঁদের গান শুনিতে লাগিলেন।

হরিনাথের পক্ষে কি এটি চরম পরাজয় নয়? সমাজ সচেতন লড়াকু একজন ব্যক্তি এভাবে যে নিলেন বাউল দর্শনের আড়াল, সার করলেন Despair ও Resignation-এর তত্ত্ব, এতে তাঁর আত্মপ্রসাদেব কী থাকতে পারে? 'ওহে দিন তো গেল সন্ধ্যা হলো/পার করো আমারে' কিংবা 'যদি ডাকার মতো পারিতাম ডাকতে' বর্গের গান তাঁকে এতটাই বিখ্যাত করে দিল যে তাঁর বাইশ বছরের দৃপ্ত সাহসী সম্পাদকতার সত্তার কথা সবাই ভুলে গেল। হেমাঙ্গ বিশ্বাস তাঁর একাধিক লেখায় বাউল জীবন ও তত্ত্বের মধ্যে পরাজয় ও পরগাছা অস্তিত্বের বিরুদ্ধে নিন্দা করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ একবাব বলেছিলেন 'মৃত্যুভয়ের শাসনে মানুষকে বৈরাগীদলে টানবার প্রচারক গিরি' হলো বাউল গান। সবচেয়ে বড় কথা, হরিনাথ তো জীবনচর্যা ও বিশ্বাসের দিক থেকে বাউল ছিলেন না। তাঁর রচিত গানকে বলা হয়েছে 'সখের বাউল' গান। অথচ তাঁর সমকালেই ছিলেন কুমারখালির অদূরে ছেউরিয়া গ্রামের লালন ফকির— যাঁর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। তাঁর গানের তত্ত্ববস্তু, মানবচেতনা, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ ও অনুপম প্রকাশভঙ্গি এখনও সকলকে বিমুগ্ধ করে, কিন্তু ফিকিরচাঁদের গানের সমসাময়িক জনাদর আজ আর কতটুকু? এখন তো বরং সমাজবিজ্ঞান ও সমাজইতিহাসের নতুন গবেষকরা খুঁজে বাব করছেন গ্রন্থাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠ থেকে 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা'-র কালধূসর পৃষ্ঠাগুলি।

বোঝা যায় সেই ব্যথিত মানুষটির স্ববিরোধ, যখন তিনি সম্পাদক থেকে বাউলগানের পদকার হয়ে গেলেন। ফিকিরচাঁদ হতে তাঁর আপত্তি ছিল না সম্ভবত, একটা আড়াল তাঁর জীবনের সেই ভ্রান্ত পর্যায়ে ছিল নিতান্ত দরকার। বাউল গানের ফিকিরে সেটি জুটে গেল তাঁর। কিন্তু কেমন সেই গান? শোনা যায়, একবার লালন ফকিরকে ডেকে তাঁর রচিত কটি ফিকিরচাঁদী গান শুনিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমার এগানের কথা— তোমার কেমন লাগল?' লালন হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'তোমার এ ব্যঞ্জন বেশ হয়েছে, তবে নুনে কিছু কম আছে।'

লালনের দ্যোতনাপূর্ণ এই মন্তব্য খুবই অর্থপূর্ণ ও চিরন্তন।

আবদুল করিম প্রসঙ্গে হরিনাথের জীবনকথা এতখানি বিস্তারে বলার কারণ এইটা বোঝানো যে দুজনের জীবন পরিণতি বিচিত্রভাবে বিপ্রতীপ। হরিনাথ শ্রেণীগত শোষণ পীড়ন বঞ্চনা দেখে, ক্ষমতা ও প্রভুত্বকে চিহ্নিত করে, তাকে নিন্দিত করেও শেষ পর্যন্ত মেনে নেন অধ্যাত্ম জগতের অলীক মোহ। আবদুল করিম অধ্যাত্ম পথের গান দিয়ে শুরু করে, তাতে যশস্বী ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেও চলে আসেন দরিদ্র ও জর্জরিত মানুষের পক্ষে। অসাম্যের প্রতিবাদে লেখেন :

এই কি তোমার বিবেচনা
কেউ যে খায় মাখন ছানা
কেউর মুখে অন্ন জোটেনা
ভাঙ্গা ঘরে ছানি নাই।

চকিতে মনে পড়ে যায় আবদুল করিমের চেয়ে অনেক কাল আগেকার রাঢ়ের গীতিকার যাদুবিন্দু গোঁসাইয়ের (১২১৪-১৩০৯) গান :

যে ভাবেতে রাখো গোঁসাই
আমি সেই ভাবে থাকি।
আমি আর অধিক বলবো কি?
কখনও দুগ্ধ মাখনছানা ক্ষীর নবনী
কখনও জোটেনা ফেন আমানী
তখন অ-লবণে কচুর শাক ভখি'।

এ-গানের ব্যক্তির আত্মনিবেদন প্রকট হয়ে উঠেছে, প্রতিবাদ নেই। ভোজ আর অনাহারকে সমদর্শিতায় মেনে নেওয়া তো ভক্তচিত্তের প্রশ্নহীন সমর্পণের আনন্দ। আবদুল করিমের গান সাঁইযের প্রতি প্রশ্নাকারে পেশ করা ('জিজ্ঞাস করি তোমার কাছে বল ওগো সাঁই')। কিন্তু তাতে প্রশ্নহীন এমন অবস্থান নেই যে, 'যে-ভাবেতে রাখো গোঁসাই / আমি সেইভাবে থাকি।' বরং প্রশ্নাতুর আধুনিক গীতিকার করিম মনে করেন :

দোষ করিলে বিচার আছে, সেই ব্যবস্থা রয়ে গেছে
দয়া চাইনা তোমার কাছে, আমরা উচিত বিচার চাই।

এবং তাবপরে উচ্চারিত হয় আরও কঠিন প্রশ্ন ·

তোমার এমন ব্যবহাবে অনেকে মানে না তোমারে
কথায় কথায় তুচ্ছ করে— আগের ইজ্জত তোমার নাই।
রাখতে চাইলে নিজের মান, সমস্যাব কর সমাধান
নিজেব বিচার নিজেই কর, আদালতেব দরকার নাই।
দয়াল বলে নাম যায় শোনা, কথায়-কাজে মিল পড়ে না,
তোমার মান তুমি বোঝনা, আমরা তো মান দিতেই চাই।

ছটি মাত্র পংক্তিতে যে অভিনব স্বর শোনা গেল তার থেকে আবদুল করিম সম্পর্কে আরও জানতে ইচ্ছা করে।

ভাটি অঞ্চলের উজান ধল গ্রামের বাসিন্দা আবদুল করিমের জীবনে উজান ভাঁটা খুব বেশি নেই। শান্ত সরল পল্লীজীবনের সন্তান, পল্লীমায়ের কোলে পিঠে লালিত। অস্তিত্বের চারপাশে শুধু জল আর নৌকা, শস্য আর অনাহার। তবু তার মধ্যে বাস করে এসে যায় প্রকৃতিজ দার্শনিকতা, কারণ আসলে তো তিনি ভাবুক। তাই প্রকাশ ভঙ্গির সাবলীল সারল্য সবচেয়ে আগে চোখ টানে তাঁর গানের বিশ্বে। কেমন অনায়াসে তিনি বলতে পারেন :

আমি ফুল বন্ধু ফুলের ভ্রমরা
কেমনে ভুলিব আমি বাঁচি না তারে ছাড়া।

না আসিলে কালো ভ্রমর কে হবে যৌবনের দোসর
সে বিনে মোর শূন্য বাসর আমি জীয়ন্তে মরা।

একই ব্যক্তি দেহতত্ত্বের গানে লেখেন কেমন অনায়াসে :

কোন্ মেস্তরী নাও বানাইল— কেমন দেখা যায়
চন্দ্রসূর্য বান্ধা আছে নায়েরই আগায়।
রং বেরঙ্গের কত নৌকা ভবের তলায় আয়
রং বেরঙ্গের সারী গাইয়া ভাটি বাইয়া যায়।
মদন মাঝি বড় পাজি কত নাও ডুবায়।

নদী-নৌকা-ভবের ঘাট-মদন মাঝি-নাও ডোবা এসব তো আকছার আছে বাংলা লোকায়ত গানে কিন্তু এমন সহজ ভাবে তা গানে আনা কঠিন। ভাটি অঞ্চলের একটা প্রসারিত জীবনের অভিজ্ঞতা এ গানের ছাপ রেখে গেছে। যেন তার জলের গন্ধটুকুও নাকে আসে। আদিগন্ত প্রসারিত এই চিত্রকল্পের পটে, যার আগায় চন্দ্র সূর্য বাঁধা আর অন্তহীন এক অভিযান, তার পরিণামে কেউ কেউ ডুবে যায় মদন মাঝির কারসাজিতে। তখন সাধকেরা অত সাধনায় গড়ে তোলা দেহতরী বানচাল হয়ে যায়। করিম তাই পারঘাটাতে বসে শেষ প্রশ্নটি করেন নিজেকেই :

বাউল আবদুল করিম বলে বুঝে উঠা দায়
কোথা হইতে আসে নৌকা কোথায় চলে যায়।

এ প্রশ্নের জবাব থাকে না, থাকে রহস্য আর সংবিত। মানুষটা কিন্তু তেমন রহস্যময় নন— কেননা তিনি যে খেটে খাওয়া মানুষের শরিক। গান লেখেন তাঁদেরই জন্য। সেই কারণে করিমের গানে উদ্বিগ্ন, শংকিত, তপ্ত সামূহিক গ্রাম্য সহবাসীদের মুখ ফুটে ওঠে— তাঁর একার মুখ নয়। আহমদ সিন্‌হাজ তাঁব এক ছোট নিবন্ধে সুন্দর করে লিখেছেন :

> ভাটির মানুষ করিমের গানে তাদের চিরচেনা ভাটিকে খুঁজে পায় ভাটির গন্ধ, তাব আলো-আঁধারী। করিমের গান থেকে আমরা জেনে যাই : ভাটি বিচিত্র, তার প্রকৃতি বিচিত্র, প্রকৃতির সঙ্গে যুঝে যাওয়া মানুষগুলো আরও বিচিত্র। নদী এখানে জীবনের উপমা, আর হাওর— সে তো উপমার অতিরিক্ত। করিম জানান দেন; অবিশ্রান্ত বর্ষণ না হলে ভাটি জাগে না, জনপদ তচ্‌নচ্ করে দেয় এমন ঢল না এলে ভাটির হাওরগুলো কথা কয় না— হাওর এই দেশে মাটিকে টানে ফসলকে টানে মানুষকে টানে, মানুষের কণ্ঠের গানকেও টানে। ভাটির মানুষ জানে বর্ষণ হবে, হাওর সমুদ্রের বিলাস আনবে; কোথাও পা ফেলার এক রত্তি মাটি থাকবে না এবং তারা মন থেকেই জানে, হয়তো বা এ তাদের রক্তের কণায় কণায় ঢুকে গেছে যে হাওরোল ঢেউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাঁচতে হয়, মাছের জন্য জাল ফেলতে হয় এবং আগামী দিনটির জন্য অপেক্ষা করে যেতে হয়।

সমতলভূমির মানুষ আমরা, নিরুপদ্রব জীবনপ্রিয়, অতিবৃষ্টিকে ভাবি উৎপাদন— সেইজন্যই অলস দর্শনের গান 'আমি আর বাইতে পারলাম না' আমাদের ভারি মনঃপূত। আমাদের যেন কেবল স্মৃতি আছে, শপথ নেই। শপথ যদি থাকেও তার উদ্‌যাপনের দায় নেই।

কিন্তু সুখে দুঃখে দারিদ্র্যে ক্ষুধায় ভাটির জীবন চক্রাবর্তে ঘোরে। তাতে মাঝে মাঝে আনন্দের ছন্দ জাগে। মিনহাজ চমৎকার বলেছেন :

> এরই মধ্যে ঋতু থেকে ঋতুতে ভাটির জীবন ঘুরে চলে— ভাটিতে মেলা হয়, নৌকা দৌড় হয়, গান হয়— অনেককিছু, হয়, অনেককিছু হারিয়েও যায়—অতীত ও বর্তমানের মধ্যে আসা-যাওয়া করতে করতে গান বাঁধেন একজন বাউল, জীবনের গান মাটির গান মানুষের গান।

এই প্রাক্‌কথনটুকু পড়ে নিয়ে এবারে আমরা আবদুল করিমের গানের পাঠে ঢুকে যেতে পারি। বুঝতে পারি তাঁর জীবনে বর্তমানের খাঁজে খাঁজে মিশে আছে স্মৃতির খেলা। তাঁর সেই যৌবনের দিনগুলি, সেই মেলামেশা, সেই হিন্দু মুসলিমের মিলিত জীবনের জ্যোতিরুৎসবের ভ্রষ্টলগ্ন গাঁথা আজকের শূন্যতা— সেও বড় সত্যি। তাই প্রবীণ গায়কের মনে পড়বেই :

আগে কী সুন্দর দিন কাটাইতাম।
গ্রামের নওজোয়ান হিন্দু মুসলমান।
মিলিয়া বাউলা গান ঘাঁটু গান গাইতাম।
বর্ষা যখন হইত গাজীর গান আইত
রঙ্গে ঢঙ্গে গাইত আনন্দ পাইতাম।
বাউলা গান ঘাঁটু গান আনন্দেব তুফান
গাইয়া সারিগান নাও দৌড়াইতাম।

এই বর্ণনা কি আজ অলীক লাগছে করিমের? একি তবে শুধু স্বপ্ন দিয়ে তৈরি আর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা? বুঝতে কঠিন লাগে না যে করিম নিজেও এই নাও দৌড়াইতামের ভাগীদার ছিলেন— শুধু পাড়ে বসা দ্রষ্টা ছিলেন না। কোথায় গেল সেই হিন্দু মুসলমান লোকশিল্পীদের সম্মিলিত বাউলা, ঘাঁটু আর গাজীর গানেব দিন? করিম বেশ মনে করতে পারেন :

হিন্দু বাড়িন্‌ত যাত্রাগান হইত
নিমন্ত্রণ দিত আমরা যাইতাম।

গানে গাঁথা আছে একটা চাপা মর্মজ্বালা— কোথায় উজান ধলা অঞ্চলের সেই সব সম্পন্ন হিন্দু পবিবাব? সবাই যে আজ দেশত্যাগী বাস্তুহারা। এখন তাদেব নাকি ভিন্‌দেশে বসত।
করিমেব খেদ শুধু ওটাই নয় যে তাঁর ভাটি অঞ্চলের বিনোদনের লোক উৎসবের সব উৎস বরবাদ হয়ে গেছে— তাঁব দুঃখ যে মানুষের প্রবৃত্তি ও শুভ বুদ্ধির গতিপ্রকৃতি গেছে বদলেই মনে পড়ে একদা,

বিবাদ ঘটিলে পঞ্চাইতের বলে
গরীব কাঙ্গালে বিচার পাইতাম।
মানুষ ছিল সরল ছিল ধর্মবল
এখন সবাই পাগল বড়লোক হইতাম।

মরমি গীতিকার তিনি— বৈরাগ্যপন্থী বাউল নন — জীবন সন্ধ্যায় পারগামী বুভুক্ষু মানুষ নন। তিনি জড়িয়ে রয়েছেন এই পবিবর্তমান দেশকালের ভাগ্যভবিতব্য নিয়ে, বর্তমানের শংকা মেখে, আরও বড় চিন্তনের বোঝা নিয়ে। তাই তাঁকে দেখতে হয়, এমন ভরা দেশ কেমন করে রিক্ত হয়ে গেল মূল্যবোধের বিচারে। তাঁর গান ও জীবনকে মিলিয়ে নিয়ে বরং সঠিক বলার কথাটা এমনই যে,

> এইসব গানে যে মানুষটি ধরা আছেন তিনি বাউল, কিন্তু প্রচলিত অর্থের বাউল নন, — এই বাউল তাঁর সময়কে পাঠ করে চলেছেন নিজের গানে, একদা চারণ কবিরা যেমন করতেন।

একথা সত্যি বলেই ক্রান্তদর্শীর ভূমিকা নিয়ে করিমকে বলতেই হয় এই আশংকিত বাস্তববাণী যে

দিন হতে দিন আসে যে কঠিন
করিম দীনহীন কোন্ পথে যাইতাম।

গানের শেষ উচ্চারণে ভণিতার ছলে·যে কথা বলছেন তা করিমের একার কথা নয়, আত্মনিষ্ক্রমণের কথাও নয়, কারণ তিনি তো পলায়নবাদী আর ভাববাদী বৈবাগী নন। তিনি বর্তমান মানবভাগ্য ও তার ভ্রষ্ট চৈতন্য নিয়ে ভাবী সংকটের দুশ্চিন্তায় গ্রস্ত হয়ে ভাবছেন মানুষ শেষ পর্যন্ত কোন্ পথে যাবে? এমন এক সামূহিক ও সর্বাতিশায়ী ভাবনার সূচনা করে আবদুল করিম পার হয়ে যান উজান ধলের প্রাকৃতিক সীমা— হয়ে ওঠেন বিশ্বমানবের প্রতিনিধি। তাঁর অন্যান্য গানের মধ্যে ক্রমশ প্রবেশাধিকার অর্জন করতে করতে আমরা মানুষটির প্রস্থাবিত চেতনলোককে আরও বুঝতে পারব। যেমন আরেকটা গানের শেষে করিম তো বলেই ফেলেছেন :

কখন কি হয় না জানি ভাবি তাহা দিনরজনী
চৌদিকে অস্ত্রের ঝন্ঝনি শুনিয়া ভয় হইতেছে।

কত সরল ভাষায় কী ভয়ানক আশংকার উচ্চারণ! ইরাক ইরান আফগানিস্তান যুদ্ধের অনেক অনেক দিন আগে ১৯৮১ সালে এই গান বেঁধেছিলেন কবিম। তার মানে কি এই নয যে জল-হাওর-নৌকা সেবিত ধলার খণ্ডিত ভূখণ্ডে বসে এক জাগ্রত বিবেকের মতো আবদুল করিম মানুষের অন্তিম ভাগ্য প্রায় জীবনানন্দের মতো অনুভব করছিলেন? 'চৌদিকে অস্ত্রেব ঝন্ঝনি' বাংলাদেশেব পরিপ্রেক্ষিতেও নিশ্চয় সত্য—কারণ তাঁকে তো দেখতে হয়েছে মুক্তিযুদ্ধেব পরবর্তী কত হত্যা ও ষড়যন্ত্র তাঁর নিজেব রাষ্ট্রেই—দেখতে হয়েছে ঘাতক-দালালদের অনপনেয় দাপট। কিন্তু তবু চৌদিকে যে অস্ত্রের ঝন্ঝনি শুনে তাঁর মনে ভয়ের সংকেত এবং দ্যোতনা তা খুব সামান্য পরিধির তো নয। মানুষ নিজেই কীভাবে তার মূঢ়তার ইতিহাস রচনা করে চলেছে তাব ইংগিত দিয়ে করিম বলছেন

বাউল করিমের বাণী শুনেন যত জ্ঞানী গুণী
মনে মনে আমি গনি সরিষারে ভূতে পাইয়াছে।

তাঁর স্বভূমিতে বসেই তিনি টের পান

ভালোর যে আদর ছিল সেদিন কি আর আছে বলো
দুগ্ধ নয় মদ খাইয়া আনন্দে মানুষ নাচে।

ছোটখাট নমুনা থেকেই তিনি পেয়ে যান দুর্নিমিত্তের সংকেত এবং কেবলই আমাদের কানে রিনরিন করে বেজে চলে তাঁর পাংশু ভাবনা · 'দিন হতে দিন আসে যে কঠিন'। বাংলাদেশের মেধাবী গবেষক টি এম আহমেদ কায়সাব খুব মুনসিয়ানার সঙ্গে বিশ্লেষণ করে দেখিযেছেন করিমের গানের ঐ দুটি অমোঘ পংক্তি (যাতে একই সঙ্গে দিন থেকে আরও কঠিনতর দিনের সংকেত এবং কোন্ পথে আমাদের দিশা তার ব্যঞ্জনা বা নীঘবতা) জুড়ে :

> মাত্র দুটো পংক্তি আমি তুলে রাখতে চাই একবিংশ শতাব্দী অথবা তৎপরবর্তী শতাব্দীর জন্যে। আপাত অর্থে কোন পথে যাইতাম তীব্র কোনো প্রশ্ন নয়, এর মধ্য দিয়ে যতোটা হতাশা, যতোটা ক্ষোভ, জ্বালা, আর্তি ও অসাহয়ত্ব ফুটে ওঠে, ততো ধারালো কোনো প্রশ্ন কিন্তু প্রতিভাত হয় না। কেননা প্রশ্নের অব্যবহিত পরেই উত্তরণের মৃদু আভাস বা ইঙ্গিতও কিন্তু রেখাঙ্কিত থাকে।

> দিন হতে এখন ভাঙছে— পার ভাঙার মতো প্রবল শব্দে, দিন হতে দিন রহস্যময় হয়ে উঠছে ঘূর্ণনরত সপ্তবর্ণা চরকির মতো, দিন হতে দিন অগ্নিময়, বহ্নিময় হয়ে উঠছে। সুতরাং দিনযাপনের সমীকরণ কি থাকবে এখনো সরল, একপদী, একঘাত বিশিষ্ট?

মাত্র দুটি পংক্তির মধ্যে এতটা যে অন্তঃশক্তি, যা টেনে আনে এমন গভীর বিশ্লেষণ ও আত্মদর্শন, তার থেকে বোঝা যায় আবদুল করিম হয়তো ততোটা সরল গীতিকার নন। কায়সার ঠিকই বুঝেছেন :

> করিম, যতদূর ধারণা করি, আধুনিক সভ্যতার মূল গতিপ্রকৃতি অথবা কেন্দ্রবিন্দুটিকেই অব্যর্থ ভাবে সনাক্ত করতে পেয়েছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন; অন্য আর কিছুই নয় কেবল সময়ই পাল্টাচ্ছে প্রতিনিয়ত। কালের সঙ্গে সঙ্গেই সভ্যতা ক্রমশ জটিল ও কুজ্ঝটিকাপূর্ণ হয়ে উঠছে। বিশ্বব্যাপী মানুষের সংকট ক্রমান্বয়ে আরো ঘনীভূত হচ্ছে। সংকটের প্রকার-প্রকৃতিও পাল্টে যাচ্ছে আমূল। চিরচেনা পরিবেশ-পারিপার্শ্বে এক ধরনের অপরিচিতিকরণ প্রক্রিয়া সাধিত হচ্ছে নিঃশব্দে।... 'দিন হতে দিন আসে যে কঠিন' চরণটি পরবর্তী শতকগুলোয়ও একইভাবে নতুন তাৎপর্য, যুগপৎ, নতুন আরো শত সহস্র সংকটের ইঙ্গিত নিয়ে অবতীর্ণ হবে। কেননা সময় তখনো হবে আরো পরিবর্তন মুখর, আরো সূক্ষ্ম ও জটিলতাশ্রয়ী। .. তিনি মূলত সময়কেই বিবৃত করে যান, সময়ের গূঢ় ইঙ্গিত ও কূটাভাসকে মূর্ত করে তোলেন।

এই সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায় অতি সহজেই, আবদুল করিমের জীবন ও ধারণা বিবর্তনের ছবি। কেন তিনি একতারার নির্জন এককের গানের পথ ছেড়ে জনপথের পদাতিক হলেন, কেন তিনি একক কণ্ঠে আনতে চাইলেন সমন্বয়, কেন তিনি গড়ে তুললেন 'বাঁচতে চাই' নামে গণসংগঠন সেকথা জানা জরুরি।

আবদুল করিমের সঙ্গে আলাপচারির সুবাদে একবার জানতে চাওয়া হয়েছিল তাঁর জন্ম-পরিচয়, বাবা-মা পরিজনদের কথা। এ নিয়েও তাঁর একটা গান বাঁধা ছিল, তাই গেয়ে দিলেন :

> পিতার নাম ইব্রাহিম আলী মাতা নাইওরজান
> উস্তাদ ছমরু মিয়া মুনসী পড়াইলেন কোরান।
> বাউল ফকির আমি একতারা সম্বল
> সরলা সঙ্গিনী নিয়ে আছি উজান ধল।
> নূরজালাল নামে মোর আছে এক ছেলে...

সাজিয়ে গুছিয়ে গদ্যে বলা চলে ইব্রাহিম আর নাইওরজানের সন্তান আবদুল করিম শাহ্-র জন্ম ১৩২২ (১৯১৫) বঙ্গাব্দে ফাল্গুন মাসের প্রথম মঙ্গলবার। স্ত্রীর পোশাকী নাম আপ্তাবুন্নেসা, করিম তাঁকে ডাকতেন 'সরলা' নামে। করিম কবুল করেছেন : তাঁর প্রথম গানের সংকলন 'আফতাব সঙ্গীত' স্ত্রীর নামের দ্যোতক। বলেছেন :

> আজকের এই করিম কখনই করিম হয়ে উঠতে পারতো না যদি কপালের ফেরে সরলার মতো বউ না পেতাম। আমি সরলাকে এখনো মুর্শিদ জ্ঞান করি। দীর্ঘ বাউল জীবনে দিনের পর দিন ঘরবাড়ি ছেড়ে ঘুরে বেড়িয়েছি, সরলা তার ন্যূনতম কষ্টও আমাকে বুঝতে দেয়নি।... এমন বউকে ধরে রাখতে পারিনি। মৃত্যুই তার সকল কষ্টের অবসান ঘটিয়েছে।

করিমের একমাত্র সন্তান নূরজালালের জন্ম ১৩৭১ (১৯৬৪) বঙ্গাব্দে। তিনি গান বাঁধেন।

করিমের বর্ণমালা জ্ঞানের হাতে খড়ি (মুসলিম সমাজে বলা হয় 'কাগজ ধরা') তৈমুর চৌধুরীর কাছে। মারফতি পথের দীক্ষা শিক্ষার মুরশিদ ছিলেন মৌলা বক্স। গানের সাধনায় তাঁর দীক্ষাগুরু ধলা গ্রামেরই কমরউদ্দিন। পরে গানের তত্ত্বে এগিয়ে যান প্রখ্যাত রসীদউদ্দিনের প্রেরণায়। পীর শাহ্ ইব্রাহিম মস্তানের কাছেও তত্ত্ববিদ্যা শেখেন।

আবদুল করিমের গানের দুটি মান্য সংকলনের নাম 'কালনীর ঢেউ' (১৯৮১) এবং 'কালনীর কূলে' (২০০১)। এছাড়া অন্য বইয়ের মধ্যে উল্লেখ্য বই 'ধলমেলা' (১৯৯০) ও 'ভাটির চিঠি' (১৯৯৮)। এর মধ্যে 'কালনীর ঢেউ' প্রসঙ্গে করিম জানিয়েছেন : 'আমার সর্বশেষ সম্বল নয় বিঘা জমি বিক্রি করে ১৯৮১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বইটি প্রকাশ করেছিলাম।' পরে জনগ্রহণীয়তার চাপে ও পাঠকদের চাহিদায় এই গীত সংকলন দ্বিতীয় সংস্করণ (১৯৮৯) ও তৃতীয় সংস্করণের (১৯৯৯) গৌরব পেয়েছে। 'কালনীর ঢেউ' সংকলনে আছে ১৬৩ টি গান এবং 'কালনীর কূলে' সংকলনে আছে ১৩৭টি গান। বলাবাহুল্য করিমের প্রাপ্য মর্যাদা শহরবাসী বাংলাদেশের প্রকাশকরা সম্ভবত দেননি— তাই তাঁর অগ্রন্থিত শত শত গান রয়ে গেছে আমাদের অজানা। ২০০১ সালে করিম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সম্মানজনক 'একুশে পদক' পেয়েছেন। কিন্তু ঢাকার বাংলা একাডেমী করিমের গীত সংকলন প্রকাশ করেননি এখনও।

করিম তাই আজও হয়ে রয়েছেন ভাটি অঞ্চলের গান গীতিকার। 'বাঁচতে চাই' নামে করিম যে সংগঠন করেছেন তার 'চাওয়াটা সামান্য। দু'বেলা দুমুঠো খেয়ে শুধু বেঁচে থাকা।'

কিন্তু সবচেয়ে আগে জানা দরকার অমন নিম্নবর্গের ঘরগৃহস্থির মধ্যে আবদুল করিমের শৈশবে বা কৈশোরে লেখাপড়া কীভাবে এগোল। তিনি সাক্ষাৎকারে যেটুকু জানিয়েছেন সেইটুকু সম্বল। এখানে মনে পড়ে যায় লালন ফকিরের প্রসঙ্গ। তাঁর সারাজীবনটাই তো রেখে দিয়েছিলেন আড়ালে ভিটে মাটি জমি বাস্তু পিতা মাতা কোনো কিছুর হদিশ দেননি। এমনকি তাঁর জাতি পরিচয়টুকু পর্যন্ত রয়ে গেছে অজ্ঞাত। মৃত্যুর পরে না হয়েছে দাহ, না পড়া হয়েছে জানাজা নামাজ— তাঁর নিষেধ ছিল দুটোতেই। তাঁর মানব মূর্তিটা শুধু তাই এখন আমাদের লক্ষ্যবস্তু। লালন রেখে গেছেন পরাক্রান্ত একটি নাম আর অজস্র গানের পরম্পরা। আবদুল করিমের কথা অবশ্য জানতে পারি তাঁর বাচনিক ভাষ্যে। বলেছেন :

> একে তো ভাটি অঞ্চল, এই যুগেও... যোগাযোগ শিক্ষাদীক্ষায় কতো অবহেলিত, উপেক্ষিত তখনকার যুগে তো লেখাপড়া করা ভয়ানক কষ্টের ব্যাপার ছিলো। ছোট বেলায়ই দুঃখ যে কী জিনিস, দারিদ্র্য যে কী জিনিস মর্মে মর্মে টের পেয়েছিলাম। আমার মা চাইতেন একটু লেখাপড়া করি। বাবা... প্রায়ই বলতেন, 'আগে হলো খায়্যা বাঁচা, তারপর লেখাপড়া।' ফলে প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ার সুযোগ আর হয়ে ওঠেনি। বেঁচে থাকার জন্যে মোড়লের ঘরে গরু রাখালের কাজ করেছি। পরে নৈশ বিদ্যালয়ে কিছুদিন পড়াশুনা করেছি। ইতিমধ্যে বিশ্বযুদ্ধের গুজব উঠলে সবাই বিদ্যালয়ে আসা বন্ধ করে দেয়। ফলে নিজের চেষ্টায় যতটুকুই পারি নিজের বুঝবাঝটুকু সেরে নিয়েছি। আর গান তো ছিল রক্তের ভেতর। গাইতামও। মাঠে গরু রাখতে রাখতে গান গাইতাম। রাখাল বন্ধুরা তখন গোল হয়ে গান শুনতো। আস্তে আস্তে গান আমাকে কব্জা করতে শুরু করে। আমি বুঝে যাই সারিন্দাই আমার প্রথম এবং শেষ।

যত অনাবিল ভাবে এমন আত্ম-কথন আমরা পড়ে যাচ্ছি জীবন তো অত স্বচ্ছ সহজ নয়। শরিয়তবদ্ধ মুসলমান সমাজে গান গাওয়া না-জায়েজ। তাই করিমের গানের শ্রোতা যতো বাড়তে লাগল ততো রক্তিম হতে থাকল কাঠমোল্লাদের চোখ। কিন্তু করিম নিজেই বেশ মনে করতে পারেন, 'গানের দুশমন

যতো ছিল তারচেয়ে অনেক বেশি ছিল গানের ভক্তকুল। বাউলাগানের আসর শুনলেই মানুষ আট/দশ মাইল পথ হেঁটে আসত অনায়াসে।' কাজেই শুক্রবারের মসজিদে করিমের বে-শরিয়তি গানের কথা উঠলেও শেষ পর্যন্ত মুসল্লিমরা থেমে যান। কিন্তু লক্ষ করলে দেখা যাবে করিমের গান গাওয়ার চেয়ে যেটা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো গানের বক্তব্য। তিনি অনায়াসে গানে বলেন :

সব দেশে সব জায়গায় মানুষ
প্রেম খেলাতে নারী পুরুষ
মানুষেতে আছে মানুষ
রয়না মানুষ মানুষ বিনা।।

আল্লার বদলে এই যে মানব মহিমার জয়গান তার কোনো পূর্বসূত্র কী আছে? সেকথা বিচারের আগে শোনা যেতে পারে গান গাওয়ার স্বপক্ষে তাঁর সওয়াল,

গান খোলে তজল্লীর দ্বার অন্ধ দিল হয় পরিষ্কার
ভাবশূন্য হৃদয় যার কী বুঝবে সে জন।।

আসলে আমরা যখন বাউল ফকিরদের নিয়ে আলোচনা করি তখন দেশকাল ও আঞ্চলিক বৃত্তের কথা খেয়াল থাকে না। ফলে রাঢ় অঞ্চলের বাউল, মধ্যবঙ্গের নদিয়া-মুর্শিদাবাদ-যশোহর-কুষ্টিয়ার বাউল আর নেত্রকোণা-শ্রীহট্ট-চট্টগ্রামের বাউল সব এক করে ফেলি। এঁদের সব আলাদা আলাদা ধারা ও গুরু-শিষ্য বা মুর্শিদ-মুরিদ পরম্পরা আছে। যেমন রাঢ়ের বাউলদের মধ্যে প্রধান পরম্পরা হলো জাতিবৈষ্ণবদের, তাই রাঢ়ে ফকিররা একটা অন্য তরিকায় চলেন। মধ্যবঙ্গে বাউল ফকিররা মিলেমিশে থাকেন বটে কিন্তু করণকারণে আলাদা। এঁদের মধ্যে আবার নানা গৌণ ধর্মের আচার আচরণ বিশ্বাস ঢুকে আছে। তাই কে কর্তাভজা, কে সাহেবধনী, কে বলরামভজা, কে লালনপন্থী, কে পাঞ্জুশাহের ঘরানা এসব বিচার না করে আমরা সব বর্গের বাউল ফকিরদের এক অভিধায় পুরে ফেলেছি। পূর্ববঙ্গে বাউল পরম্পরা অনেক বিস্তৃত এবং তাঁদের মধ্যে ফকিরদের স্থান প্রধান। সেইজন্য পূর্ববঙ্গে বাউল বা কেউ গেরুয়াধারী নন, তাঁদের পোষাক হলো সাদা তহবন্দ আর সাদা পাঞ্জাবি ('সিন্দাদেহে মরায় বসন')। বাউলদের মধ্যে সেখানে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে মারফতি ফকিরদের ধারা— যাঁরা শরিয়তের আচার বর্গকে পাশ কাটিয়ে দেহাত্মবাদী। অর্থাৎ নামাজ-রোজা-হজ-জাকাতের বাহিরানা ত্যাগ করে আত্মস্থ। উপবাস, তীর্থভ্রমণ, হাদিস ও কোরানের ভাষ্য, মসজিদ ও মোল্লার কর্তৃত্ব তাঁরা মানেন না। দেল-কেতাব তাঁদের পাঠনীয়। দেহ-মক্কা বা মন-মসজিদ তাঁদের লক্ষ্য। জপধ্যান জিকিরের সাহায্যে, মুর্শিদের নির্দেশে তাঁদের দেহতত্ত্বের সাধনা আর দেশে দেশে পরিক্রমা। তাঁরা হলেন বর্তমানবাদী, তাই যা প্রত্যক্ষ তাকেই ভজেন। যা আনুমানিক্ ও অদৃশ্য তাকে মান্য করেন না। সেই জন্য তাঁদের প্রত্যক্ষ উপাস্য মুর্শিদ, অদৃশ্য আল্লা নন। তাঁরা এমনকি এতদূর বলেন : 'যে হি মুর্শেদ সে হি খোদা'।

স্বাভাবিক যে ও সব অনৈস্লামিক হালচাল মোল্লা মৌলবীদের অনুমোদন পেতে পারে না। তাই শরিয়তবাদীদের সঙ্গে মারফতি ফকিরদের সংঘাত ও মনোমালিন্য বরাবর আছে। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পূর্ব ও মধ্যবঙ্গে 'বাউল ধ্বংস ফতোয়া' জারি করে বই বেরিয়েছে। কুষ্টিয়ার লালনপন্থী ফকিরদের উপর দৈহিক অত্যাচার হয়েছে। মধ্যবঙ্গে বহু গ্রামে 'বাউল খেদা' আন্দোলন চলেছে। মুর্শিদাবাদের অনেক গ্রামে এখনও, এই একবিংশ শতাব্দীতেও, ফকিরদের দমন-পীড়ন-একঘরে করার ঘটনা প্রায়ই পত্রপত্রিকায় আমরা পড়ি। লালনগীতি বা হাসন রাজার গানের ক্যাসেট সমাদৃত হচ্ছে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজে, বিজয় সরকারের নামে সংগঠিত হচ্ছে বিজয় মেলা, বাউলদের গানে জ্ঞাতি

সমন্বয় ভাবনা সম্পর্কে সেমিনার হচ্ছে, গৌণ ধর্মের প্রতিবাদী চেতনা বিষয়ে সাব-অলটার্ন তাত্ত্বিকরা গবেষণা করছেন— এসব হলো মুদ্রার একপিঠ। অন্য পিঠে রয়ে গেছে যুগে যুগে বাউল-ফকিরদের নীরব ভাবান্দোলন। যার মূল লক্ষ্য মানুষের মধ্যে জাতিবর্ণ ঘটিত ভেদাভেদ থেকে মুক্তির সাধনা, কবচ তাবিজ জলপড়া দর্গাতলায় হত্যে দেওয়া থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করা। শাস্ত্র-মন্ত্র-মন্দির-মসজিদ-মক্কা-কাশী-বৈরাগ্য-জঙ্গলবাস থেকে মানুষের মনকে সরিয়ে তাদের প্রবৃত্ত করা মানবপ্রেমে। মানুষের অন্বেষণই বাউলদের সাধনা।

আবদুল করিম এই অর্থে বাউল যে তিনি গান লিখে আর গান গেয়ে দেশে দেশে (বিশেষত ভাটি অঞ্চলে) ঘুরেছেন। মুর্শিদের জয়গান করেছেন। সর্বহারা চিরদুঃখী মানুষ যাতে সহজভাবে বাঁচতে পারে তারই চেষ্টা করেছেন।

আবদুল করিমকে মারফতি বিশ্বাসের মধ্যে নিয়ে আসেন তাঁর মুর্শিদ মৌলা বক্স মুন্সী এবং ইব্রাহিম মস্তান। এঁদের প্রশংসা করে করিম যে গান লিখেছেন, তা এখানে পড়ে নিতে হবে। যেমন:

মরি হায় হায় রে গুণগান গাই
মৌলা বক্স মুন্সি সাহেবের গুণের সীমা নাই।
ধন্য মৌলা বক্স মুন্সি
উকার গ্রামে বাড়ি
কলিব যুগে করে গেলেন আশ্চর্য ফকিরি।

মৌলা বক্সের সাধন ভজনের পরিচয় এইভাবে আছে যে,

শরিয়তে পায়বন্দ ছিলেন
তরিকতের রাহাদার
সুফি সাধক ছিলেন মারিফত করে বিচার।

তাঁর আরেক মুর্শিদ ইব্রাহিম মস্তান সম্পর্কে গানে আছে,

বিশ্বনাথ থানায় বাড়ি শ্রীপুরে বাসা
পশ্চিমদিকে হাসন রাজার বঙ্গের রামপাশা।
হাসন রাজা ছিলেন একজন মরমি কবি
ইব্রাহিম মস্তান হলেন মারিফতের ছবি।
চেহারায় নূরের জ্যোতি দেখতে মনোহর
বনজঙ্গলেতে ঘুরলেন কত ছেড়ে বাড়ি ঘর।

বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, আবদুল করিমের ছিল মারফতের দীক্ষা এবং তাঁর মুর্শিদবা গৃহত্যাগ করে বহুদিন ধরে নির্জনে সুফি তরিকায় ফানা-বাকার সাধনা করেছিলেন। ইব্রাহিমের বসতবাড়ি শ্রীপুরের পশ্চিমদিকে ছিল বিখ্যাত হাসন রাজার রামপাশা গ্রামের জমিদারি। এ সবই সুনামগঞ্জ অঞ্চলের বহুদিনের সাধক পরম্পরা। করিমের ভাটি অঞ্চলে ও নেত্রকোণা অঞ্চলে তাঁর আগে ও সমকালে অনেক বাউল গীতিকার ও সাধক ছিলেন যাঁদের প্রভাব ও প্রেরণা তাঁকে গান রচনায় উদ্বুদ্ধ করে এবং যাঁদের গানের মারফতি অন্তর্বস্তু করিমের গানে অজস্র ভাবে পাওয়া যায়। শাহনূর, শীতলা শাহ্, দুর্বিন শাহ, শাহ আরকুম, মজিদ তরফদার প্রভৃতির নাম তো আসবেই, তবে করিমের গান পাঠ করবার আগে রশীদউদ্দিন আর জালালউদ্দিনের কিছু পদ দেখে নেওয়া উচিত। কারণ তাঁদের প্রতিবাদী

ভাবনাচিন্তা করিমের মনে ছাপ ফেলেছিল নিশ্চিতভাবে। এঁদের দুজনের মধ্যে রশীদের কাছে করিম তত্ত্বমতের লেনদেন করেছিলেন। রশীদের একটি পদে আছে :

দেহরাজ্যের আচার বিচার যে করিতে পারে
কী হবে আর তপে জপে স্বর্গে যাবে সশরীরে।

দেহাত্মবুদ্ধির এই মারফতি সাধনা যার জীবনে কায়েম হবে তাকে আর নামাজের দেখনদারি করতে হবে না। রশীদ স্পষ্ট করে বলেছেন :

ঘুচিবে সকল যাতনা ওরে মন আমার
তোমার ঘরে বসে পাবে তারে
কেন সন্ধান কর না।
ঘরে ঘরে তারই ঘটা
দেখিলে ঘুচিবে লেটা
না চিনে কপালে কালসিটা
আর ফেল না।
শুধু জায়নামাজে মাথা তোমার ঠুকো না।।

নিষ্ঠাবান মুসাল্লি যাঁরা তাঁদের দেখা যায় নামাজের জন্য জায়নামাজ মাটিতে পেতে সর্বদাই আল্লার উদ্দেশ্যে 'সেজদা' (প্রণিপাত) দিচ্ছেন এবং এই প্রক্রিয়ায় কপাল ঠুকে ঠুকে কালসিটে পড়ে যায়। রশীদের গানে এই আচার সর্বস্বতাকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে এই বলে যে,

সামনে রয়েছে খোদা কেন দেখনা—
না চিনে ভুতের সেজদা আর কোরো না.

রসীদের এই দৃষ্টিকোণ নিঃসন্দেহে ইসলামী বাহ্যাচারের সমালোচনা। তাঁর চেয়ে জালালউদ্দিনের গানে অবশ্য অনেক বেশি আক্রমণ রয়েছে। তাঁর দুয়েকটা পদাংশ ওখানে প্রাসঙ্গিক।

১. আমি না থাকিলে খোদা তোমার জায়গা ভবে নাই
স্থান না পেয়ে অন্য কোথাও আমাতে লয়েছ ঠাঁই।
২. বিশ্ব প্রাণের স্বরূপ-ছায়া আঘাতে তোমারই মায়া
ছেড়ে দিলে এ সব কায়া তুমি বলতে কিছুই নাই।

বক্তব্যের আধুনিকতা শুধু নয়, প্রকাশভঙ্গির সাবলীলতাও বিশেষ লক্ষণীয়। 'আমাব মধ্যে তোমার মায়া' রবীন্দ্র সংগীতের পংক্তিটি চকিতে মনে পড়ে যায়। কিন্তু কোথায় রবীন্দ্রনাথ আর কোথায় জালাল— কোনো যোগাযোগই তো সম্ভব ছিল না। জালালের গানে সাহস ও ধর্মব্যবসায়ীদের প্রতি ব্যঙ্গ প্রতিপদে ব্যক্তিত। যেমন :

১. খোদার ঘর হয় মক্কাশরিফ এ কথা পাগলে বলে
এমত প্রত্যয় কেমনে হবে বিচারবোধ জাগ্রত হলে।
প্রতি ঘটেই খোদা আছে এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডময়—
সে তো পাখির মতো খাঁচায় পুরে একস্থানেতে রাখার নয়।
২. দেখবে আল্লার রঙ ছুরত অবিকল এই জালালের মতো
তার সঙ্গে অবিরত করে চলাচল

৩. মানুষ থুইয়া খোদা ভজ এই মন্ত্রণা কে দিয়াছে
মানুষ ভজ কোরান খোঁজ পাতায় পাতায় সাক্ষী আছে।

মানব মহিমার এমন গান লালনের পদে আমরা আগে পেয়েছি। তিনি এতদূর বলেছিলেন যে, দেবদেবতারাও নাকি লালায়িত মানুষ সঙ্গের জন্য। লালন আরও বলেছেন :

কাশী কিংবা মক্কায় যাও রে মন
দেখতে পাবে মানুষের বদন।

জালালউদ্দিন আর এক পা এগিয়ে বলে দেন :

মারিফত সিদ্ধের ঘাট সকলই মানুষের কাছে।

সৃষ্টির আগে পরোয়ারে মানুষেরই রূপ নেহারে
ফেরেস্তা যাইতে নারে মানুষ তথায় গিয়াছে।

জালাল ও করিমের মতো বিংশ শতাব্দীর কবি, তবে তিনি করিমের চেয়ে বয়সে কিছু বড়। কিন্তু তাঁর গান অনেক বেশি প্রচারিত। তবে করিমের তুলনায় জালাল ছিলেন অনেক সচ্ছল অবস্থার মানুষ। তবে হাসন রাজার মতো তাঁর মধ্যেও এসেছিল বৈরাগ্যের বোধ। মারফতি ফকিররা জালালের গান খুব বেশি গেয়ে থাকেন— 'জালালগীতি' নামে তাঁর চারখণ্ড গানের সংকলন ব্যাপক প্রচারিত। তাঁর গানে যে আধুনিক চিন্তা ভাবনার ছাপ আছে তাতে মৌলবাদী মুসলমান সমাজ বিচলিত হতেই পারে। বিশেষত যখন তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, খোদার ঠাঁই মক্কা শরিফ এ হলো বাতুলের প্রলাপ তখন ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের মনে আঘাত লাগে। তারপরে মারফতি চেতনা থেকে যখন জালাল বলেন, খোদার বর্ণ ও সৌন্দর্য অবিকল জালালের মতো এবং দুজনের মধ্যে চলছে অবিরত ভাবের চলাচল, তখন আশ্চর্য হতে হয় তাঁর প্রত্যয়ের দৃপ্ত সাহসিকতায়। সবচেয়ে চমকপ্রদ অবশ্য জালালের এই উচ্চারণ যে, ফেরেস্তা যেখানে যেতে পারে না, মানুষ সেখানে গিয়েছে, এতো স্পষ্টই মানুষের চন্দ্রাভিযানের উল্লেখ।

আবদুল করিম এতটা অবস্থানগত স্বাতন্ত্র্য দাবি করতে পারেন না— কেননা তিনি গহীন জলের ভাটি অঞ্চলের নিরন্ন মানুষের শরিক-হওয়া বাসিন্দা। সাধারণ খেটে খাওয়া অসহায় কৃষিজীবীদের কথাই যেন তিনি গানে গেঁথে বলেন :

দিরাই থানায় বসত করি হাওড় এলাকায়
অবস্থা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা দায়।
হাড়ভাঙা খাটনীর বলে জমিতে যে ফসল ফলে
হয়তো নেয় বন্যার জলে নইলে নেয় খরায়।
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বছরে এক ফসল মিলে
সে ফসল নষ্ট হইলে প্রাণে বাঁচা দায়।
ঘরে বসে ভাবাগুনা নৌকা বিনা চলা যায় না
বর্ষার দিনে রুজি পায়না গরীব নিরুপায়।।

এক ফসলী জমির চাষীর জীবনগাথা, খরা বা বন্যার সুনিশ্চিত অন্তর্ঘাত ভরা আশংকিত সম্বৎসর, রুজিরোজগার হীন বর্ষণ মুখরিত হাওড়ের অনাহারক্লিষ্ট মানুষের গীতিকার তিনি। এ সব মানুষের

আবার জাতিধর্ম কী? কীসেরই বা নামাজ রোজা? হারাম আর হালালের তফাৎই বা বোঝে কে? করিম তাই গানে বলে নেন গরীবদের সম্পর্কে ধনীদের ধারণার কথা :

ধনীদের আমিরানা বলেন গরীবে ভালা না
হারাম হালাল বুঝে না ধার ধারে না নামাজ রোজার।

পাঠকদের অভ্রান্ত ভাবে মনে পড়ে যাবে করিমের সমকালের গীতিকার দুর্বিন শাহ্-র (১৩২৭-১৩৮৪) মর্মন্তুদ আত্মকথনের গান :

নামাজ আমার হইল না আদায়—
নামাজ আমি পড়তে পারলাম না
বিষম খান্নাতের দায়।

দারিদ্র্যে দুঃখে অনাহারে শ্রমের চাবুক খেয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত শ্রমজীবী কৃষিদৈনন্দিনে নামাজ পড়ার অবকাশ কই? কোথায় তাদের দোজখের ভয় বা বেহেস্তের স্বপ্ন কল্পনা? দুর্বিন শাহ্ যে কথা বলতে পারেননি, তা বলে দিতে পেরেছেন করিম স্পষ্ট ভাষায়,

বেহেস্ত্ ধনীর জন্য রয় গরীবের নাই অধিকার
স্বচক্ষে দেখিলাম যাহা গরীব হলে দোজখ তাহার।

এমন সিদ্ধান্তের পরেও গানের শেষে তিনি টিপ্পনী কাটতে ভোলেন না,

গরীব হয় খোদার দুশমন না হলে কি জ্বালাতন?

তবে দুর্বিন শাহ্-র সঙ্গে আবদুল করিমের তফাৎ অনেকখানি, কারণ করিম তত্ত্বগান থেকে ক্রমশই ঝুঁকে পড়েছেন গণসংগীতের দিকে। এককালে 'মালজোড়া' গানের শিল্পীরূপে তাঁর সুনাম ও জনাদর ছিল। গ্রামে গ্রামে ঘুরে গেয়ে বেড়াতেন 'মালজোড়া'। এ ধরনের গান আসলে দুজনের বা একাধিক গায়কের মধ্যে পাল্লাদারি বা লড়াই— প্রধানত মারফতি বা শরিয়তি তত্ত্ব-নিয়ে, কিংবা নবীতত্ত্ব, মুর্শিদতত্ত্ব বা দেহতত্ত্ব নিয়ে। মোস্তাক আহমদ দীন চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন :

> বাউলের মনে ঢেউ লাগলো তো সঙ্গে সঙ্গে তিনি বেরিয়ে পড়লেন, পথে এ গাঁ থেকে ও গাঁয়ে; বাউল যাচ্ছেন, হাতে একতারা অথবা লাউয়া, তখন হয়তো সবেমাত্র বৈশাখী তোলা হলো কিংবা অঘ্রাণের ধানগন্ধে বড় মউজে আছেন গাঁয়ের রসিকজনরা—বাউল যখন যাচ্ছেন তো তারা ডাক দেয়, 'বাউল ভাই'— তারপরই ঐ রাতে বাউলকে তাঁর বাঁধা গান গাইতে দেখা যেত, কখনো একা কখনো বা দুচার গ্রাম খুঁজে নিয়ে আসা অন্য বাউলের সঙ্গে একই আসরে, যাকে বলে মালজোড়া, কবিতে কবিতে লড়াই..
> করিম ভাই হয়তো বলবেন, এতো সেদিনের কথা; তখন তাঁর যৌবন, কণ্ঠের তাগদ ও মাধুর্য এমন যে, রাত ক্রমশ গভীর হয়ে পড়ত কিন্তু একটা লোকও মাথা তুলতো না।... অনুবোধের উপরোধের ঝড়।

অতি বৃদ্ধ বয়সেও আবদুল করিম তাঁর গানের চারণীর দিনগুলি রাতগুলি ভোলেননি। ঐ যে তাঁর সর্বংসহা স্ত্রী আপ্তাবুন্নেসা (সরলা) প্রসঙ্গে বলেছিলেন : 'দীর্ঘ বাউল জীবনে দিনের পর দিন ঘরবাড়ি ছেড়ে ঘুরে বেড়িয়েছি, সরলা তার ন্যূনতম কষ্টও আমাকে বুঝতে দেয়নি।' সেই ভ্রাম্যমান সময়ে তিনি এক আসরে গান গেয়েছেন সাত্তার মিয়া, কামালুদ্দিন, আবেদ আলী, সিরাজ আলী, বারেক

মিয়া, মজিদ তালুকদার, দুর্বিন শাহ্-র সঙ্গে। 'এছাড়া দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে গান করতে গিয়ে অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হয়েছে তাদের সবার নাম এখন মনে নেই' তিনি কবুল করেছেন। করিম স্মরণ করেন : 'জালালউদ্দিন, উকিল মুন্সী আমার চাইতে বয়সে যদিও অনেক বড় ছিলেন তাদের সঙ্গেও দু-এক আসরে গান করেছি। দুর্বিন শাহ তুলনামূলক ভাবে তত্ত্বগানের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন।' কিন্তু করিম ক্রমশ তত্ত্বগান ছেড়ে চলে আসলের মানুষের দুঃখকষ্ট শোষণ পীড়ন আর অসহায় জীবনের কথাকারের ভূমিকায়।

আশি পেরোনো বয়সে তিনি অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে আহমেদ কায়সারদের বলতে থাকেন :

> বর্তমান আমার কাছে কোনো গৌণ বিষয় নয়।.. কিন্তু আমার কান্না পায়, ভেতরে তীব্র হাহাকার অনুভব করি যখন দেখি যে চোখের সামনে অবিকল যন্ত্র হয়ে উঠল মানুষগুলো। ... সবচেয়ে আক্ষেপ লাগে, যখন দেখি যে এই বিজ্ঞান বা যন্ত্রসভ্যতার ফল ভোগ করছে কয়েকজন হাতে গোনা কোটিপতি। এই যন্ত্র সভ্যতা ফলত ধনী-গরীবের মধ্যকার বৈষম্যকে আকাশ-পাতাল পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

এই পর্যন্ত বলে করিম উত্তেজিত হয়ে পড়েন। অশ্রুধারায় সিক্ত চোখে বলতে থাকেন :

> আপনারা আবার গাঁয়ে এসেছেন, দেখে যান এখানে, এই বিশাল ভাটি-অঞ্চল জুড়ে মানুষগুলো কী অপরিসীম দুঃখ দুর্দশা নিয়ে বাস করছে। যখন শহরে যাই মাঝে মাঝে, স্তম্ভিত হয়ে এই ব্যবধান লক্ষ করি। লোকে কয়, আমি নিরন্ন দুঃস্থ মানুষেব কবি, আমি আসলে তাক ধরে দুঃস্থদের জন্যে কিছু লিখিনি। আমি শুধু নিজের কথা বলে যাই, ভাটি অঞ্চলের একজন বঞ্চিত দুঃখী মানুষ আমি, আমার কথা সব হাভাতে মানুষের কথা হয়ে যায়।... দ্যাখেন তো এই অঞ্চল ঘুরে, মানুষেব আয়ের কোনো উৎস আছে কীনা? চারদিকে ভাসান পানি। জলে থৈ থৈ করছে প্রত্তিটি বাড়িব উঠোনে। মানুষ কী খেয়ে বাঁচবে? দিন তিনবেলা নয়; শুধু এক বেলা দু' মুঠো যদি খেতে না পারে, এই জন্ম কি মানুষের জন্ম?

এর জবাব তিনি রাষ্ট্র, সমাজ বা রাজনৈতিক দলের কাছে না পেয়ে প্রশ্ন করেন তাঁর বহুদিনের চেনা জানা সাঁইয়ের কাছে। কারণ আসলে তো তিনি একতারা মখল বাউল? তাঁর একান্ত পরিচিত হলো পথ আর পথের মানুষ। বুঝতে পারেন এবং বলেন, 'একদা তত্ত্বের সাধনা করতাম, এখন দেখি তত্ত্ব নয়, বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে।' এ উচ্চারণে কোনো খাদ নেই।

ভাটি অঞ্চলের গান সম্পর্কে একজন প্রাজ্ঞ লোকসংস্কৃতিবিদ্ মন্তব্য করেছিলেন, 'এ হলো সেই গান যা ছন্দের বন্ধনে সুরকে চঞ্চল করে তোলে না। সুর তার স্বচ্ছন্দ গতিতে মাঝির মনের কথাব দু'একটিকে মাত্র একেকবাব সঙ্গে নিয়ে লম্বা টানা পথে ঢেউয়ের সাথে সাথে দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে।' তাহলে তো এ-বর্গের গানে এক জল মাত্রিকতা, মন্থর নৌকাবাওয়া, ঢেউ আর ঢেউয়ের গতিবেগ এবং ভেসে যাওয়া জীবনেরই রূপকল্প থাকে। আবদুল করিম এই ভাগ্যহত অসহায় ভেসে যাওয়া ভাটি মানুষের গানে একটি আলাদা মাত্রা এনেছেন বিষয় বস্তুতে। তাঁর গানে আসে বিপন্নতার পাশে এক পুনরুত্থানের শপথ, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ঘোষণা। একজন গণকর্মীর অবস্থান থেকে তাঁর এই দ্রোহ, কেননা তিনি যে দেখছেন সব বদলে যাচ্ছে। মানুষের মন-প্রবৃত্তি হয়ে উঠছে ভোগাতুর, প্রকৃত সৎ জীবন যাপনের বনেদ ভেঙে যেন এক দিশাহীন রাজনীতি মানুষকে টানছে ঘূর্ণিপাকে। তাঁর সতর্ক চোখ দেখতে পায় :

১. এখন পত্র পত্রিকায় উলঙ্গ ছবি দেখা যায়
মন দিয়ে দেখে ছেলেরায় পথ ভুলে কই যাইতেছে।

২. মিথ্যা কথার বাজায় ডঙ্কা রাক্ষস হয় গিয়ে লঙ্কা
রাজনীতি নেতার সংখ্যা অনেকগুণ বেড়ে গেছে।

৩. শোষকের শাসন ব্যবস্থা যেখানে রয়েছে জারি
ভোটে মুক্তি আসিবে না শুঁটকির নায়ে বিড়াল ব্যাপারী।

তিনটি গীতাংশে সমকালীন বাংলাদেশের সংকটেব তিন রকমেব ছবি বয়েছে। যুবসমাজের দিশাহীনতা, বাজনীতিতে নেতার সংখ্যাবৃদ্ধি এবং শোষকের শাসনব্যবস্থা ও ভোটব্যবস্থার স্ববিরোধ করিম সঠিকভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছেন। শেষ উদ্ধৃতির শেষে একটি দ্যোতক লৌকিক উপমা আশ্চর্য এক পবিহাসের বাতাবরণ তৈরি করেছে। শুঁটকি মাছেব নৌকায় বেড়াল যদি হয় ব্যাপারী তবে শুঁটকির আর নিরাপত্তা কোথায়? তেমনই হলো শোষকের পরিকল্পিত ভোটের ছলাকলা।

লক্ষ করলে দেখা যায়, আবদুল কবিমের পবিপার্শ্ব বা তাঁব দেশ কাল সমাজই যেন তাঁকে চক্ষুষ্মান করে তুলেছে। তাঁর গ্রামে প্রতিবছর পয়লা ফাল্গুনে একটা মেলা বসে বহুকাল ধরে, তাকে লোকে বলে 'ধলমেলা'। সেই মেলা একদা ছিল সারা গ্রামেব সব মানুষের আনন্দের মেলা। কিন্তু এখনকার হৃতদরিদ্র গ্রাম কাঠামোব সেই মেলা সম্বৎসর যখন আসে তখন যেন অভিশাপেব মতো মনে হয়। বাড়িতে অতিথি অভ্যাগত আসে, খরচ সামলাতে মোটা সুদে টাকা ধার করতে হয়। সমস্ত ধল গাঁয়ের অসহায় বিপন্নতা বোঝাতেই যেন করিম লেখেন

ওরে মেলা দিতে জ্বালা কাব মন্ত্রণা পাইলে
এই দেশে কেন বা তুমি আইলে।
বল্ তুই কেন এসে গরীবকে কাঁদাইলে?

আবদুল করিমের মনে এই ধলমেলাব অনেক উজ্জ্বল স্মৃতি আছে বলেই এখনকার দৈন্য ও বিকৃতি তাঁকে পীড়া দেয়। তাঁর মনে পড়ে, ধলমেলা একদা ছিল হিন্দু-মুসলিমের সৌহার্দ্যেব সমাবেশ— কত কিছু গ্রামীণ বস্তুব কেনাকাটাব বিচিত্র বাজার ছিল, কত বকম খাদ্যবস্তু, কত আনন্দ। আর আজ? প্রথমেই চোখে পড়ে তাঁর

পূর্বে যে জায়গাতে ছিল মেলাব স্থান
এই জায়গায়তে এখন ফলায় ইরি ধান।

মেলাব জমি হয়ে গেছে ধানখেত। সারা বছর একশো টাকায় বিশ টাকায় সুদ নেয় মহাজন আর এই মেলার সময় সেই সুদ দাঁড়ায় ত্রিবিশ টাকা। সেইসঙ্গে চলে আত্মনাশা জুয়ার কারবার। করিম বলেন তাই :

মানবতার পক্ষে বলি বলুক না কেউ দোষী
এখন আনন্দ নয় জুয়া খেলা হয় বেশি।

ব্যথিতচিত্তে জানান,

দুই দিন দুই রাত জুয়া খেলা হয়
কড়া পাহারা থাকে নাই কোনো ভয়।

কড়া পাহারার মধ্যে বেআইনি জুয়া খেলা এবং গরিবের সর্বস্বান্ত হওয়া আজ ধলমেলার চরিত্র। তাই করিমের আক্ষেপ গরিবকে কাঁদানোর জন্য কেন এই মেলার আয়োজন?

সব মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত আবদুল করিমের জীবন ও গান এক বিন্দুতে মিলে যায়। তাঁর কথা জানতে পেরে, তাঁর নিঃসঙ্গ সংগ্রামের মানবমুখী চেহারা দেখে নিজেদের আশ্বস্ত লাগে। তারপরে পড়ি তাঁর জীবনদর্শন এতটাই দীপ্র ভাষায় ও প্রত্যয়ে যে,

> আমি কখনোই আসমানী খোদাকে মান্য করি না। মানুষের মনের মধ্যে যে খোদা বিরাজ করে আমি তার চরণেই পূজা দেই। মন্ত্রপড়া ধর্ম নয়, কর্মকেই ধর্ম মনে করি। লাখ লাখ টাকা খরচ করে হজ্জ্ব পালনের চেয়ে এই টাকাগুলো দিয়ে দেশের দুঃখী দরিদ্র মানুষের সেবা করাটাকে অনেক বড় কাজ মনে করি। কতিপয় হীন মোল্লা-পুরুতরা আমাদের ভাইয়ে ভাইয়ে বিভাজনই নিয়ে এসেছে। এই বিভাজনই যদি ধর্ম হয় সেই ধর্মের কপালে আমি লাথি মারি। মনে হয় একাই আবার যুদ্ধ করি। একাই লড়াইয়ের ময়দানে নামি, জীবনের ভয় এখন আর করি না।

তাঁকে যখন জিগ্যেস করা হয় ঈশ্বর সম্পর্কে তার কী ধারণা? পীর পয়গম্বর সম্পর্কে কোন্ বিশ্বাস তাঁর। তিনি গানে বলেন—

মহামানব আসলেন যাঁরা
আসলে সর্বহারা—
ভোগী নয় ত্যাগী তাঁরা
নবি বলি পয়গম্বর।

আসল কথা হলো আত্মসচেতনতা ও বিশ্বাস। তাই,

আপনাকে ভালোবাসি
বিশ্বাস করে হও সাহসী
আপন ঘরে মক্কা-কালী
আছে গোপনে।

এবং

মসজিদকে খোদার ঘর বলি
মন্দির ভগবানের ঘর।
আসলে খোদার আরশ হয়
মোমিনের অন্তর।

আল্লা বা খোদা সম্পর্কে করিমের বক্তব্য

> আমি ঈশ্বরকে এক বিশাল শক্তি হিসাবে গণ্য করি, ব্যক্তি হিসাবে নয়। ব্যক্তি কখনো একই সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপে অবস্থান করতে পারে না, শক্তি তা পারে। বৈদ্যুতিক শক্তির কথা ধরুন, একই সাথে কোথাও বা ফ্যান ঘুরাচ্ছে, কোথাও বাতি জ্বালাচ্ছে, কোথাও ইণ্ডাস্ট্রি চালাচ্ছে

মক্কা শরীফ আল্লার বাড়ি বোঝে না মন পাগলে
ব্যক্তি নয় সে শক্তি বটে আছে আকাশে পাতালে।

করিম সবশেষে বলেন,

আমি কোনো অবাস্তব জিনিসে বিশ্বাস করি না। বেহেস্ত, দোজখ, দুই কান্ধে দুই ফেরেস্তা এগুলো আমার কাছে অবাস্তব মনে হয়। আল্লাহ নিজেই যেখানে কর্তা, তার তাহলে এতো কেরানী রাখার কী দরকার?

অখণ্ড বাংলার লোকায়ত সাধনার একজন মরমি গীতিকার রূপে আবদুল করিমের একটি স্থায়ী আসন এ বারে তবে আমাদেরই পাততে হবে।

ব্যক্তিঋণ : হাবিব রহমান । তপোধীর ভট্টাচার্য।

স্বীকৃতি : খোয়াব, সম্পাদক : হাবিবুর রহমান এনার। ৩য় সংখ্যা। অক্টোবর ১৯৯৮। সিলেট।

সুনৃত, সম্পাদক : আহমদ সায়েম। ২য় সংখ্যা। সেপ্টেম্বর ২০০১

চলমান সিলেট : ভোরের কাগজ। ৯৯ সংখ্যা, ২৪ জুন ১৯৯৯

ধলবেলা : শাহ্ আবদুল করিম । ১৯৯০

কালনীর ঢেউ : শাহ্ আবদুল করিম। ৩য় প্রকাশ ১৯৯৯

কালনীর কূলে : শাহ্ আবদুল করিম। ২০০১

আলোর পথযাত্রী

সোমনাথ ভট্টাচার্য

আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন
সকল মন্দিরের বাইরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হলো
দেবলোক থেকে
মানবলোকে। (রবীন্দ্রনাথ)

প্রিয় কবির উপরের পংক্তিটিকে নিজের জীবনদর্শন বলে গ্রহণ করেছিলেন সুকুমারী ভট্টাচার্য। তফাৎ শুধু একটাই। তাঁর এই মন্ত্রহীন মানবলোকের পূজা আজ তিরাশি অতিক্রান্ত বয়সেও সমাপন হয়নি, বহমান ধারায় নিরন্তর ছন্দে তা শুধু চলছে আর চলছে।

খ্রিস্টের জন্মের কয়েক শতাব্দী আগে লাতিন মহাকবি টেরেন্স লিখেছিলেন, *Nothing Human is alien to me*। যে উক্তি বারবার উদ্ধৃত হতো মার্ক্সের কণ্ঠে, খুব সঙ্গত কারণেই এর মর্মার্থ সুকুমারী ভট্টাচার্য একাত্ম করে নিয়েছিলেন তাঁর নিজের জীবনের প্রতি পদক্ষেপে। তাঁর কথা, কাজ, ভাবনা, শিক্ষা, অভিরুচি, বিদ্রোহ, সংগ্রাম, সংস্কৃতি, জীবনবোধ এবং জীবনদর্শন এরই সাক্ষ্য দেয়। অগাধ পাণ্ডিত্য, প্রথিতযশা অধ্যাপক, নারী-পুরুষ সমানাধিকারের অগ্রণী সংগঠক, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মূর্ত প্রতীক, ব্যতিক্রমী রন্ধনপটিয়সী, অসাধারণ গল্পবাজ, সঙ্গীতের মুগ্ধ শ্রোতা, এই সব বিশেষণ যোগ করলেও সুকুমারী ভট্টাচার্যকে পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ তিনি তার থেকেও আরো বেশি কিছু। মনে পড়ে যায় জোসেফ শ্যুমপিটারের সেই কথা, *The whole is always more than the sum of its parts*। ফলে এ হেন মানুষকে নিয়ে কিছু বলতে যাওয়া ত্রুটিপূর্ণ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক এবং সেটিই হতে চলেছে বর্তমান রচনায়।

১৯২১ সালের ১২ জুলাই জন্ম সুকুমারী ভট্টাচার্য-র। জন্মদিন কবে জিজ্ঞাসা করলে কৌতুক করে বলেন জুলিয়াস সিজারের জন্মদিনই আমার জন্মদিন। সরসীকুমার দত্ত ও শান্তবালা দত্তের চার সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সুকুমারী। জন্মসূত্রে মাইকেল মধুসূদন দত্তের উত্তরসূরী। বাবা স্কটিশচার্চ স্কুলে ইংরেজী, বাংলা ও ইতিহাস পড়াতেন। সেইসঙ্গে দর্শনেও ছিল তাঁর অগাধ প্রজ্ঞা। শান্তিনিকেতনে এলেই কবির সঙ্গে গভীর আলোচনা এবং আদানপ্রদান হতো দেশবিদেশের দর্শন নিয়ে। জ্ঞানের তৃষ্ণাকে তৃপ্ত করতে এবং পড়ার উপলব্ধিকে অনুভব করতে যে আনন্দপাঠের অভ্যাস সুকুমারী ভট্টাচার্য-র হয়েছিল তার মূল সুরটি খুব ছোটবেলায় বেঁধে দিয়েছিলেন তাঁর বাবা। সুকুমারীর সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাসের প্রতি অনাবিল ভালবাসা বাবার হাত ধরেই। এমনকী তাঁর সংস্কৃত পাঠের শুরুও বাবার কাছেই। মেয়ের জিজ্ঞাসা যত গভীর হয় বাবাও তাকে ততই উৎসাহিত করেন আরও গভীরে গিয়ে আরও মূল্যবান রত্ন সংগ্রহ করতে। পিতাপুত্রীর জ্ঞানসাগরে মুক্তো আহরণের এই খেলা তাঁদের জীবনে স্নান-খাওয়া-ঘুমানোর মতনই অনিবার্য করে ওঠে। পাঠের পরিধিকে আরো কতটা বিস্তৃত এবং বহুমুখী করা যায় পিতার পরম উৎসাহে কন্যার সে পথে যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই শৈশবেই।

সরসী-সুকুমারীর সেই জ্ঞানান্বেষণ অবশ্য মোটেই এক তরফা ছিল না। কখনও কখনও মেয়ের নতুন জ্ঞানভাণ্ডার থেকে বাবা গভীর আগ্রহে শুনছেন মার্ক্স ও ফ্রয়েডের কথা। এভাবেই এগিয়ে চলেছিল সুকুমারী ভট্টাচার্য-র শৈশব, কৈশোরের বিদ্যাচর্চা।

মায়ের দিক থেকেও কতকগুলো অমূল্য শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন। অসাধারণ দৃঢ়চেতা এবং বলিষ্ঠ চরিত্রের মহিলা ছিলেন তাঁর মা। সেইসঙ্গে যে কোন রকম পশ্চাদ্‌পদতা, কুসংস্কার ও সংকীর্ণতার তিনি বিরুদ্ধে ছিলেন। আর একই সঙ্গে তিনি ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক। সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর মায়ের সবক'টি গুণই আয়ত্ত করেছিলেন নিজের জীবনচর্চায়। মায়ের ছত্রচ্ছায়ায় দেশকে এতটাই নিখাদভাবে ভালবাসতে শিখেছিলেন যে স্কুলে তাঁর কাছে *গার্লগাইড* হবার প্রস্তাব এলে তিনি ঋজুভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন। *গার্লগাইডকে* ঈশ্বর, রাজা এবং দেশের নামে আনুগত্য প্রকাশ করে শপথ নিতে হয়। সুকুমারী ভট্টাচার্য স্কুলের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়ে দেন তাঁর প্রাণের প্রিয় জন্মভূমি এবং তাকে যারা পরাধীন করেছে সেই সাম্রাজ্যবাদী প্রভু, এই দুয়ের প্রতি একই সঙ্গে আনুগত্য প্রকাশ তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি কিছুতেই রাজার প্রতি তাঁর আনুগত্য দেখতে পারবেন না। সেই ছিল তাঁর প্রথম প্রতিবাদের ভাষা। নির্ভেজাল দেশপ্রেম সেই কিশোরী জাতীয়তাবাদীকে এমনভাবে নাড়া দিয়েছিল যে ঐ বয়সেই তিনি স্কুলের বলনাচের ক্লাস বয়কট করেন। তাঁর প্রশ্ন, *যদি শিখতেই হয় উদয়শংকরের নৃত্যশৈলী শিখব, বলনৃত্য কেন? সে তো আমাদের সংস্কৃতির উত্তরাধিকার নয়!*

পরিবারের আরও দু'জন মানুষ তাঁর জীবনবোধ গড়ে তুলতে পথ দেখিয়েছেন। একজন তাঁর ঠাকুরমা। খ্রিস্টান পরিবারের সুকুমারী দত্ত এবং হিন্দু ব্রাহ্মণের ছেলে অমল ভট্টাচার্য নিজেদের পছন্দ অনুসারে পরস্পরকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বৃহত্তর পরিবারের অনেকেরই এতে আপত্তি। সে কথা তারা জানিয়েও দিয়েছেন। সকলের সব আপত্তিতে জল ঢেলে প্রবীণা ঠাকুরমা বললেন বাড়ীর মেয়েকে তোমরা শাড়ি গয়না পছন্দ করার স্বাধীনতা দেবে অথচ তার জীবনসঙ্গী পছন্দের অধিকার দেবে না— এ কেমন করে হয়? প্রাচীনা এক নারীর সময়ের চেয়ে অনেক দূর এগিয়ে ভাবার সেই বিরল অভিজ্ঞতা আজও ভোলেননি সুকুমারী ভট্টাচার্য।

আব একজন হলেন তাঁর বড় পিসিমা। বিদ্যুৎপ্রভা বসু। পেশায় চিকিৎসক। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে ঘর বেঁধেছিলেন শান্তিনিকেতনে রোগীদের সেবায় ব্রতী হয়ে। রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত স্নেহধন্য এবং সি.এফ.এন্ড্রুজের বিশ্বস্ত বন্ধু বিদ্যুৎপ্রভা এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। পাঁচজনের মধ্যে তাঁকে একদম আলাদা করে চেনা যেত। তাঁর বুদ্ধিমত্তা এবং প্রজ্ঞার কথা কবিও বলে গেছেন তাঁর চিঠিপত্রে। এই বিদ্যুৎপ্রভা সুকুমারী ভট্টাচার্য-র অনেকটা জুড়ে রয়ে গেছেন। পথের ধারে পড়ে থাকা মৃত্যুপথযাত্রী রোগীকে নিজের ঘরে তুলে এনে চিকিৎসা করে বিদ্যুৎপ্রভা রোগীর মৃত্যুকে প্রলম্বিত করলেন কয়েকদিন। মৃত্যু তার অবধারিত ছিল। কারণ সে রোগের চিকিৎসা ছিল না। চিকিৎসক বিদ্যুৎপ্রভা তা ভাল করেই জানতেন। তবু কেন এই চিকিৎসার দায়িত্ব নিলেন? এ প্রশ্ন করলে উত্তব দিতেন, একজন মানুষ জন্তুর মত রাস্তায় মরবে? তাই নিয়ে এসেছি নিজের ঘরে। মানুষটা অন্তত মানুষের মত করে মরুক। মানুষকে মানুষ হিসাবে মর্যাদা দান প্রসঙ্গে বিদ্যুৎপ্রভার ভাবনা সুকুমারী ভট্টাচার্য-র জীবনে এক অক্ষয় শিক্ষা। একে তিনি সযত্নে লালন করেন হৃদয়ের গভীরে।

সেন্ট মার্গারেট স্কুলে ছাত্রী অবস্থাতেই স্কুলের প্রিন্সিপাল মিস লিন্ডসে এবং ইংরেজীর শিক্ষিকা মিসেস থরু-র প্রেরণায় শেলী, কীট্‌স্ এবং বায়রণের বেশির ভাগ রচনা পড়ে ফেলেন। এঁদের অনবদ্য রচনার স্বাদ নিতে নিতেই কেমন করে যেন তাঁর বিদ্রোহী মনে বিশেষ স্থান করে নেন ফরাসি বিপ্লবের সন্তান, *Prometheus Unbound*-এর কবি P. B. Shelley। আজও কেউ যদি সৎ কার্যে অসৎ-এর কাছে পরাজিত হয়ে হতাশ হন সুকুমারী ভট্টাচার্য তাকে প্রেরণা যোগান দৃপ্ত এবং বলিষ্ঠ উচ্চারণে প্রিয় কবি শেলীর *The Mask of Anarchy*-র তাঁর অতিপ্রিয় কয়েকটি লাইন আবৃত্তি করে।

Rise like lions after slumber
In unvanquishable number,
Shake your chains to the earth like dew
Which in sleep had fallen on you –
Ye are many – they are few.

সুকুমারী ভট্টাচার্যকে তাঁর ছাত্রাবস্থা থেকেই প্রচলিত ব্যবস্থাকে কুর্নিশ করার বিরুদ্ধে লড়াই করে এগোতে হয়েছে। খ্রিস্টান পরিবারের মেয়ে অথচ সবচেয়ে বেশি পড়তে ভালোবাসেন সংস্কৃত। তাঁর নিজের জবানীতে, 'সংস্কৃতই আমার প্রথম প্রেম।' অথচ ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে প্রতিটি বিষয়ে প্রথম হয়ে সংস্কৃতে অনার্স পাশ করার পরও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ.পড়তে গিয়ে গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। এক সময় তা এমন পর্যায় পৌঁছায় যে তিনি বিরক্ত হয়ে টস্ করে সিদ্ধান্ত নেন সংস্কৃত ছেড়ে ইংরেজীতে এম. এ. পড়াব। যদিও এর দশ বছর পরে তিনি নিজের অদম্য প্রচেষ্টায় সংস্কৃতে এম.এ পাশ করেন। সেইসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর আমন্ত্রণে লেডি ব্রাবোর্ণ কলেজের ইংরেজীর শিক্ষিকার পদ ছেড়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপনায় যুক্ত হন এবং এর কয়েক বছর পর ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগে নিযুক্ত হন। এখান থেকেই ১৯৮৬ তে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

ছাত্রজীবনে আরও দুজন মানুষের সান্নিধ্য তাঁকে পুষ্ট করেছিল। প্রথমজন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। 'বিদ্যা বিনয়ং দদাতি' বা প্রকৃত বিদ্যা সত্যিসত্যিই মানুষকে বিনয়ী করে — সুনীতিকুমারের এই শিক্ষা তিনি আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন। আত্মতুষ্টি যে অধ্যয়নের ভয়ঙ্কর শত্রু — একথা সুনীতিকবাবু সযত্নে শিখিয়েছিলেন তাঁর অন্যতম প্রিয় ছাত্রীটিকে। সেদিনের সেই ছাত্রীটি আজও তাঁর কনিষ্ঠদের মনে করিয়ে দেন আচার্য সুনীতির উচ্চারিত সেই লাতিন কথা 'Excelsior' অর্থাৎ ক্রমাগত উৎকর্ষের দিকে এগিয়ে চলো।

এই পর্যায়ের দ্বিতীয় মানুষটি হলেন অধ্যাপক অমল ভট্টাচার্য। ১৯৪৫-এ এম.এ. ক্লাসের ছাত্রী সুকুমারীর নতুন নতুন জ্ঞানের উন্মেষ ঘটছে প্রতিদিন। মার্ক্সের রচনার সঙ্গে আগেই পরিচয় ঘটেছে। বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা ভবানী সেনের লাইব্রেরী থেকে পড়ছেন একের পর এক রুশ সাহিত্যের দিকপালদের রচনা। সেইসঙ্গে শুরু করেছেন দেশবিদেশের বিপ্লবের ইতিহাস। পড়ছেন মার্ক্সীয় সাহিত্য। কিন্তু তখনও তিনি ধর্মপ্রাণ খ্রিস্টান। এই সময় শিক্ষক হিসেবে পেলেন আর এক জ্ঞানতাপস নাস্তিক ব্রাহ্মণ অমল ভট্টাচার্যকে। আর শিক্ষক হিসেবে অমলবাবু কোন স্তরের মানুষ ছিলেন তা তাঁর ছাত্রছাত্রী এবং পরিচিতজন মাত্রেই জানেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের বিভিন্ন স্মারক পত্রিকার পাতায় পাতায় তাঁর ছাত্রছাত্রী এবং গুণমুগ্ধদের স্মৃতিচারণে সেই ইতিহাস ছড়িয়ে আছে। এ হেন মানুষটির সঙ্গে আলাপ আলোচনা তর্ক বিতর্ক জ্ঞান এবং বীক্ষার তন্নিষ্ঠ পথপরিক্রমা করতে করতে সুকুমারী দীক্ষা নিলেন নাস্তিকতাবাদে। আর এই নাস্তিকতাবাদ মানবতাবাদের সমার্থক রূপ নিল সুকুমারী ভট্টাচার্য-র জীবনচর্চায়। ১৯৪৮-এ বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুকুমারী-অমল শুরু করেছিলেন তাঁদের যুগল পথচলা। কিন্তু পরিতাপের কথা ১৯৭০ এ যথেষ্ট অপরিণত বয়সে অমল ভট্টাচার্য-র প্রয়াণ ঘটে। আশার কথা একটাই, তাঁর প্রয়াণের আগেই প্রকাশিত হয়েছে সুকুমারী ভট্টাচার্য-র প্রথম বই ***The Indian Theogony***; যেটি পরে বিশ্ব জুড়ে সমাদর লাভ করেছে।

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে সুকুমারী ভট্টাচার্যকে সংস্কৃত পাঠ শুরুই করতে হয়েছে বিদ্রোহের বীজ বপন করার মধ্য দিয়ে। এবার সেই জ্ঞানের চর্চা যত গভীর হলো ততই পূর্বের বিদ্রোহের বীজটি ক্রমে মহীরূহের রূপ পরিগ্রহ করল। সংস্কৃত চর্চার শুরুতেই তিনি প্রয়োগ করলেন মার্ক্সবাদী বিশ্ববীক্ষার সুগভীর উপলব্ধিকে। *Doubt everything* মার্ক্সের এই উক্তিকে তিনি গ্রহণ করলেন বেদ, উপনিষদের

বিভিন্ন অধ্যায় অধ্যয়নের সময়। এবং এটা পাঠকবর্গের জানা কথা যে মার্ক্স *Doubt*-কে *সন্দেহ* অর্থে বলেননি, বলেছেন *যাচাই* অর্থে। সুকুমারী ভট্টাচার্য সেই যাচাইয়ের কাজ শুরু করলেন অধ্যয়নের প্রতিটি পরিচ্ছদে। ধ্রুপদী সংস্কৃত সাহিত্যে প্রতিবাদী এবং বস্তুনিষ্ঠ যে সব ঘটনা এবং চরিত্র ছিল অমাবস্যার অন্ধকারে ব্রাত্য সেগুলোকেই তিনি নিয়ে এলেন পাদপ্রদীপের আলোয় নতুন প্রাণের সঞ্চার করে। প্রচলিত প্রথায় বিশ্বাস রেখে নামজাদা দলে নাম লিখিয়ে নিশ্চিন্ত জীবন তিনি বেছে নিলেন না; তিনি হলেন বদনামী দলের শিরোমণি। তাঁর ছাত্রছাত্রী এবং প্রিয়জনদের বহুবার বলেছেন, *সংস্কৃত চর্চার চিরাগত পদ্ধতির অচলায়তনে আঘাত করে চলিষ্ণুতার প্রবাহ নিয়ে আসতে হবে। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষ কী ভেবেছে তা জানতে হলে সংস্কৃত জানতে হবে। আর সঠিকভাবে তাকে বুঝতেও হবে।* ধর্মের গোঁড়ামি অনুযায়ী অজর, অনড়, অব্যয় কোন ধারণার বশবর্তী হলে চলবে না — এই বিশ্বাস থেকেই ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করেছেন বেদ, গীতা, মহাকাব্য এবং উপনিষদকে। পার্থিব এবং মানবিক মাত্রা যুক্ত করেছেন সেইসব গ্রন্থের মূল্যায়ণে। মহাভারতের একটি উক্তি তাঁর অত্যন্ত প্রিয়। শুধু প্রিয়ই নয়, কথাটি তিনি নিজে ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাসও করেন। শরশয্যায় ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন, *গুহ্যং ব্রহ্ম যদিদং তে ব্রবীমি ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ।* অর্থাৎ

একটি গোপন সত্য তোমাকে বলে যাই,
মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এ দুনিয়ায় কিছু নাই।

এ ভাবেই তিনি দেখতে চেয়েছেন, দেখাতে চেয়েছেন ধর্মের আড়ালে থাকা প্রকৃত সত্যকে।

তাঁর বিভিন্ন রচনা এবং মূল্যায়ণ একটা বিশেষ তাগিদ থেকে। সে তাগিদ হলো মানুষের স্বার্থে সত্যের উদ্‌ঘাটন। এই লক্ষ্যেই তিনি লিখে চলেছেন ক্লান্তিহীন কলমে, সত্যের সন্ধানে।

সময়টা ১৯৯৭। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পঞ্চাশ বছরে পা দিল। সেই উপলক্ষ্যে প্রতিদিন টেলিভিশনে *সুজলাং সুফলাং* শুনতে শুনতে তাঁর অনুসন্ধিৎসু মন জেহাদ ঘোষণা করল। বেদের পাতায় পাতায় খাদ্যের জন্য হাহাকার এবং আর্তি ছড়িয়ে আছে। এখন তিনি পুনর্পাঠের জন্য বেদ এবং বেদ সম্পর্কিত সমস্ত বই জড়ো করলেন একের পর এক। এরপর একবছর ধরে তন্নতন্ন অনুসন্ধান এবং গবেষণা। ফলশ্রুতি ***বেদের যুগে ক্ষুধা ও খাদ্য***। এভাবেই তিনি এগিয়ে চলেছেন আর রচিত হয়েছে একের পর এক বই। ***নিয়তিবাদ : উদ্ভব ও বিকাশ***; ***বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য***; ***রামায়ণ ও মহাভারত : আনুপাতিক জনপ্রিয়তা***; ***উত্তরাধিকার***; ***মন্থন*** বা ***প্রাচীনভারত : সমাজ ও সাহিত্য*** এভাবেই সৃষ্ট।

কোন জিনিসকেই তিনি ওপর ওপর দেখতে শেখেননি, শেখানওনি। কেন্দ্রে তৎকালীন ক্ষমতাসীন এনডিএ সরকার শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢুকিয়ে সর্বনাশ করছে। দেশজুড়ে সেই নিয়ে প্রবল হইচই। নানান যুক্তি তর্কের মাঝে সুকুমারী ভট্টাচার্য সমস্যাটিকে ধরিয়ে দিলেন একেবারে একটি অন্য মাত্রায়। তিনি বললেন ইংরেজী Education লাতিন E Duco শব্দটি থেকে এসেছে। যার অর্থ to bring out বা বের করে আনা। শিক্ষার্থীর ভেতরের সুপ্ত ক্ষমতাকে সত্য, তথ্য, জ্ঞান ও যুক্তির দ্বারা স্পর্শ করলে ছাত্রটি যে প্রতিক্রিয়া জানাবে সেটাই তার শিক্ষা। সাম্প্রদায়িকতার জেরে যদি সেই সত্য, তথ্য এবং যুক্তিই হারিয়ে যায় তবে তো ব্যাপারটা আর শিক্ষাই থাকে না। এভাবেই তিনি অত্যন্ত সহজে অথচ বলিষ্ঠ যুক্তির ওপর দাঁড়িয়ে মানুষের হাতে অস্ত্র তুলে দেন মানবতাকে রক্ষা করার স্বার্থে।

ধর্মের সঙ্গে যে পুঁজির কোন বিরোধ নেই; দু একটি দুলর্ভ ব্যতিক্রম ছাড়া ধর্ম যে সর্বদাই ধনীর কুক্ষিগত এ নিয়ে চলতে থাকা তাত্ত্বিক আলোচনায় তিনি শুধু ছোট্ট এক তথ্য সংযোজন করলেন। তিনি জানালেন নানান দেবতার নানা ধরনের জীবজন্তু বাহন হলেও ধনের দেবতা কুবেরের বাহন কিন্তু মানুষ। এরপর আর বলবার অপেক্ষা রাখে না এর থেকে কী অনুসিদ্ধান্ত আমরা করতে পারি।

শিক্ষাকে এত সহজভাবে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছিলেন বলেই তিনি পেয়েছিলেন শিক্ষার যথার্থ আনন্দ। তাঁর সঙ্গে যার সামান্য পরিচয় তিনিও জানেন বাংলা, ইংরেজী, পালি, প্রাকৃত, ফরাসি, জার্মান ছাড়াও, এমনকী সাধারণ কথোপকথনের সময় লাতিন এবং সংস্কৃতের যথাযথ উদ্ধৃতি এবং তার সাবলীল ভাষান্তর সুকুমারী ভট্টাচার্য-র সঙ্গে আলাপচারিতার এক পরমপ্রাপ্তি।

প্রসঙ্গত একটি কথা বলা অত্যন্ত জরুরী। তাঁর পাণ্ডিত্য যতই আকাশছোঁয়া হোক, তাঁর জ্ঞানের গভীরতা যতই অতল হোক কোনোদিনই তিনি নিজেকে বুদ্ধিজীবীর খোলসে আবদ্ধ করেননি। যে কোন ধরনের সমস্যা তা সে রাজনৈতিক হোক বা সামাজিকই হোক মুখোমুখি তার মোকাবিলা করেছেন। ভালো-মন্দ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে নিজের মত ব্যক্ত করেছেন। তাতে কে কী ভাববে কোনো দিনই তার পরোয়া করেননি। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে ***কমিউনিস্ট ইস্তেহার*** উদ্ধৃত করে বলেন, *কমিউনিস্টরা আপন মতামত গোপন রাখতে ঘৃণাবোধ করে।* তিনি নিজের পরিচয় দেন একজন দায়বদ্ধ মার্ক্সবাদী (committed marxist) বলে। কেন মার্ক্সবাদকে গ্রহণ করেছেন? প্রশ্নের উত্তরে বলেন একজন মানবতাবাদী তবে কোন্ মতবাদকে গ্রহণ করবে! ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উচ্চারণ করেন মার্ক্সের সেই লাইন, *Philosophers have so for interpreted the world in many way but the point is to change it*। মার্ক্স কথিত এই *change* কথাটির মধ্যেই রয়েছে মানবতার পক্ষে সবচেয়ে শক্তিশালী বিপ্লবী শক্তির বার্তা। সমাজে বেশির ভাগ মানুষ নিপীড়িত। এর পরিবর্তনের অর্থ বেশিরভাগ মানুষের নিপীড়নের অবসান। এই নিপীড়িতের কথা ভাবতে গিয়েই তিনি একাংশের কাছে নিজেকে ব্রাত্য করে তুলেছেন। এ নিয়ে বিন্দুমাত্র খেদ তাঁর নেই। বরং অন্যদের উৎসাহ দেন সেই পথে হাঁটতে। মনে করিয়ে দেন আমেরিকার কালো চামড়ার মানুষদের মধ্যে প্রচলিত প্রবাদকে। *If you want to run half as far, you are to run twice as fast*। তিনি বলেন, আমরা যে স্রোতের প্রতিকূলে খেয়া বাইছি। ফলে কোন কার্পেট বিছানো ফুল ছড়ানো পথ আমাদের জন্য অপেক্ষা করে নেই। কাঁটা মাড়িয়ে রক্তাক্ত হয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আজকে আঁধারের আল বেয়ে পথ পরিক্রমা আগামীকাল এক আলোকিত সকালকে বরণ করার জন্যই — এ প্রত্যয় হারালে চলবে না।

সুকুমারী ভট্টাচার্য-র কথা শেষ হবার নয় কারণ তা অশেষ। তাঁর সম্পর্কে যত কথাই বলা হোক সবসময় না-বলা কথা অনেক বেশি থেকে যাবে। ফলে কথার ভারে আর ভারাক্রান্ত না করে শুধু একটি প্রার্থনা। আসুন আমরা তাঁর গুণমুগ্ধরা এক সুরে বলি,

ও আলোর পথযাত্রী
এ যে রাত্রি,
এখানে থেমো না।

যারা এখনো সত্যের দীপ জ্বালিয়ে আঁধারের রাত পেরোতে চায় তাদের তুমি আলো দেখাও।

সহায়ক পাঠ

1. Bhattacharji Sukumari : *The Indian Theogony.*
2. সুকুমারী ভট্টাচার্য : *মন্থন।*
3. স্বপ্না ভট্টাচার্য : *চোখের আলোয়* (অমৃতলোক)।
4. *দ্বিরালাপ* : ১০ ফেব্রুয়ারী ২০০৪, শিলচর।
5. An unpublished interview of Professor Sukumari Bhattacharji taken by Dr. Kumkum Roy.

Professor Sukumari Bhattacharji Felicitation Volume

অধ্যাপক সুকুমারী ভট্টাচার্য সম্মাননা গ্রন্থ

India and Indology

Past Present and Future

ভারত ও ভারততত্ত্ব

অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ

Editorial Board

Chairman

Bratindranath Mukhopadhyay

Editor

Dipak Bhattacharya

Co-Editors

Moinul Hassan, Kumkum Roy

and

Somnath Bhattacharya

Enquiring into the Past

Of Deities, Men and Women : Tracing Sukumari di's Writings through the Decades

Kumkum Roy

To say that introducing the work of an author who has produced over a dozen volumes in a span of three decades is a difficult task, is an understatement. When we also take into account that, apart from being amongst the most prolific scholars of her generation, Sukumari di has a range of interests and a deep sense of social commitment that informs her writings, the task appears even more daunting, to say the least.

What follows is necessarily selective, perhaps even idiosyncratic. But it will have served its purpose if it conveys a sense of the range of issues that have engaged Sukumari di's attention, the deep understanding of the Sanskritic tradition that she has brought to bear on these issues, and the concern about the present as well as the vision of the future that inspires so much of her writing. In the ultimate analysis, however, there is no substitute for reading her works in the original. It is impossible to capture the stylistic variations that render her writings challenging: the measured tones of her more academic works, where references follow each statement with meticulous precision, the passion that surfaces in her interventions through articles meant for a lay audience, and the ability to summarize or highlight issues with a touch that can be gentle or surprisingly sharp, varying from one context to the next.

My first encounter with Sukumari di's erudition was in the 70s. I was a student of ancient Indian history, and *The Indian Theogony* was prescribed reading for courses on religion and society. This was a book that left an indelible impression on those who read it: even as young students, we were overawed by the immense range of information that was encapsulated within the text. Each deity was subjected to careful scrutiny, his or her salient features delineated with painstaking precision, and the reader was led through a range of cross-cultural comparisons as the author established patterns of divine imagery. It was a fascinating, but demanding text.

The Indian Theogony appeared for the first time in 1970. Then, after several vicissitudes, it was re-incarnated, like many of the deities of the brahmanical pantheon, in 2000, bearing a sub-title alluding to the Puranic trinity of Brahma, Visnu and Siva. In the globalized culture of disposables, books, like many other things, tend to have very short life spans. The very fact that *The Indian Theogony* endures is a tribute to the irreplaceable weight of scholarship that it typifies. There are other, lighter introductions to Hinduism that are available, but if one wishes

to explore the range of texts within which deities figure, their complex inter-relationship, mutations in imagery and attributes, to move, in other words, beyond facile generalizations, *The Indian Theogony* remains indispensable. It is not addressed to the seekers of instant *moksa*, but those who are willing to traverse the rocky terrains of historical development, without expecting immediate gratification are more than rewarded by the detailed documentation that opens up possibilities of further exploration. In an age of fleeting academic fashions, the very survival of this text is an index of its lasting relevance.

What accounts for its enduring significance? Part of the answer probably lies in the sheer facility with which the author draws on a vast textual tradition. Each observation is bolstered with citations from a range of sources, from the *Rgveda*, the vast later Vedic corpus, the epics, and the Puranas, as well as other Sanskrit sources. The study is also enriched with discussions on parallels in other religious traditions: Chinese, Sumerian, Egyptian, Greco-Roman, Old Irish, to name a few. The wealth of information is often overwhelming, but it makes for an encyclopaedic work that repays careful reading.

Yet, the wealth of documentation is only part of the answer. Simultaneously, Sukumari di developed a framework within which to locate and understand these details. In fact, the detailed discussion elucidated an argument for understanding the Vedic and Puranic pantheons, through classifying deities in terms of their association with forces of darkness and light. This is a framework that allows us to understand the complex, varying relationship amongst deities, as well as the changing attributes of individual divinities. In other words, the divine world is subjected to analysis and demystification. In more ways than one, this pioneering work set the tone for many of her later writings.

In some senses, *The Indian Theogony* remains a distant, awe-inspiring work. By contrast, Sukumari di's writings in the 80s have a more accessible quality. These include her monumental surveys of Vedic literature (*Literature in the Vedic Age*, two volumes, 1984, 1986). As in the case of *The Indian Theogony*, these are near encyclopaedias, detailed reference works that explore a range of issues. For instance, we find discussions on the chronology of each text, with a careful delineation of possible dates and the logic of chronological assessments. While this may seem routine, on re-reading the books in the new millennium, one realizes just how valuable such scholarship is. The texts are not allowed to float in a timeless vacuum of eternity, into which they have unfortunately been pushed in much of the "scholarship" that has gained popularity in the nineties.

The reader is also provided with evidence for the localization of the texts, where available. Besides, questions of authorship are probed at length, with alternative suggestions being opened up for scrutiny. Once again, what is particularly valuable, with hindsight, is the constant insistence on diverse human origins. Here there is no room for obfuscation: we are introduced to the complex contexts of composition, use and transmission. In other words, the texts no longer remain suspended in the Vedic equivalent of cyberspace, to be absorbed through intuition. Instead, we are permitted to visualize them as carefully crafted creations,

the products of human endeavour. The author also focuses on the content, not only in terms of obvious ritual preoccupations, but also in terms of incidental information relating to socio-economic and political processes. These provide us with a glimpse of diverse contexts and their relationship with these unique literary creations.

At another level, what clearly inspired these surveys were Sukumari di's concerns as a teacher of literature. So, in the preface to *Literature in the Vedic Age*, Vol. 1, she notes how there has been an obsession with the religious content of Vedic literature, and far less concern with an appreciation of its literary qualities. Sukumari di redresses this situation with care, drawing our attention to nuances of style, vocabulary, rhythm in both poetic and prose compositions. This allows the reader to acquire a sense of the texture of the compositions. They no longer remain remote texts of haloed antiquity, but are rendered accessible to the reader. Focusing on these elements enables the author to historicize the texts, and to differentiate amongst various strands of composition. Further, instead of asserting that these variations exist, the author persuades us through detailed examples. She ensures that these do not remain esoteric issues with which specialists grapple. Her presentation allows the interested lay reader to follow and understand her argument, almost invariably enriched with illustrations from a range of texts. One has a sense of being led by the hand, step by step, pausing to observe and appreciate before moving ahead.

Just one example of this must suffice. In discussing some of the earliest prose compositions in Sanskrit, the Brahmanas, she explains how the texts are structured and developed using formulae. These may be phrases, clusters of words, clauses, or even sentences. The use of these formulae was tied to memorization, which was the mode of transmission of these bulky texts.

Yet, this sensitivity to the literary value of the texts does not lead to any undue romanticization of the past. It is combined with a constant awareness of the contexts of literary compositions, as well as contexts of use and transmission, as well as a scrupulous avoidance of chauvinism. In fact, as she asserts, chauvinism

> prevented a healthy probing into our cultural heritage which is really rich, and of which our people can truly be proud. But a sick vanity, a warped and unwarranted sense of superiority, a tendency to boast of everything in the Vedas clouded our vision and bragging became a substitute for research..... The result was disastrous for Vedic scholarship. (*Literature in the Vedic Age*, Vol. I, p ii).

However, critical evaluations of the Vedic tradition, even if undertaken with empathy, have not always been well-received, and Sukumari di has been subjected to both insidious and overt attacks for her positions. Sadly, these critiques do not deal with substantive issues, but stoop to branding her as Marxist or Christian. There is also a subterranean suspicion of a woman well-versed in Sanskrit.

It would have been easy to withdraw into isolation in the face of such charges with a sense of justifiable anguish. Yet, for those of us who have had the privilege

of knowing Sukumari di. this would have been entirely out of character. We can perhaps understand her prolific writing in the late eighties, and subsequently, as in part a response to such challenges. But what characterizes these responses is that they are not personal rejoinders. Instead, Sukumari di has broadened the debate in a variety of ways, and has bridged the gulf between the arcane world of Sanskrit scholarship and that of our daily existence in an increasingly complicated milieu through committed and persistent scholarly interventions.

One of the earliest examples of this endeavour was in the deservedly acclaimed *Prachin Bharat, Samaj O Sahitya* (1988), her first major anthology of essays in Bengali. This was explicitly addressed to the lay reader whose natural curiosity about the past was stifled because of the inaccessibility of the Sanskritic tradition. What is remarkable is how Sukumari di avoids a simplistic, condescending approach towards the reader. On the one hand, his/her path is rendered smooth, as the text is not burdened with footnotes. On the other hand, references to primary sources are invariably included, so as to permit cross-checking if the reader feels so inclined.

As noteworthy is the range of themes included. Readers are provided a glimpse of the richness of the Sanskrit literary tradition. There is a lucid introduction to the *Rgveda*, which ranges from the structure of the text to social norms and values. The Rgvedic people emerge not as supermen, but as flesh and blood people, with joys, sorrows, conflicts, fears and hopes. There is also an appreciation of the *Mahabharata*, arguably one of the greatest epics of all time. Sukumari di draws our attention to the wealth of poetic imagery, to the complexity of characterization, to the fact that it is concerned with the human condition. In yet another essay, we are led into the world of Kalidasa, the archetypes on which he drew, and the innovations that are the hallmark of literary creations. We are also provided with a detailed introduction to the *Mrcchakatika*, one of the most interesting Sanskrit plays. And there is a critical evaluation of Sanskrit poetry in the early medieval period, when inspiration was often smothered with displays of poetic prowess and dexterity, evident in excessive ornamentation.

While opening up Sanskrit texts to lay scrutiny was no doubt significant, what is equally noteworthy in this anthology is the sustained focus on the "woman question". This includes an essay devoted to demystifying the notion of the high status of women in antiquity, with an incisive use of citations from Vedic texts to demonstrate how women were objectified and marginalized. The stark picture of oppression that emerges made a questioning of commonsensical notions of a glorious past inevitable. As influential was her essay on prostitutes in early India, which focused on a detailed enumeration of references to the institution, drawing attention to the schizophrenic attitude towards sex-workers that marks most literary descriptions. And, in the last essay of the collection, she draws attention to representations of both women and sudras in early medieval textual traditions. Once again, there is an insistent reminder that texts do not develop in a spiritual or aesthetic vacuum: they are rooted in contexts that can often be deeply problematic.

Sukumari di has been extraordinarily prolific during the nineties, and the years of the new millennium. While there are obvious thematic continuities with her earlier works, her more recent writings are characterized by a sense of urgency, and an acute awareness of the contemporary context within which we are placed. Many of these works are marked with a deep concern with the short and long-term implications of globalization on the one hand, and of the rise of Hindu fundamentalism on the other. These concerns are by no means unusual. But what distinguishes Sukumari di's writings is that she rarely gives vent to despair or cynicism. Her interventions are intended to confront, challenge and unsettle the status quo; there is no question of resignation.

In the first major work produced during the nineties, *History of Classical Sanskrit Literature* (1993), she is, as in her earlier works on Vedic literature, concerned with contextualizing textual traditions, besides providing an introduction to a range of Sanskrit compositions. She uses a botanical analogy to describe the trajectory of literary developments, carrying the reader from the germination of poetic genres to the final wilting away, under the weight of ornate imagery. There is a reiteration of themes and ideas from her earlier work, but they are developed and illustrated with fresh examples.

The very next year (1994) saw the publication of *Women and Society in Ancient India*, a compilation of essays on a variety of themes, including motherhood, childhood, widowhood, and prostitution. Here we find Sukumari di excavating references to women's lives and attitudes towards women with painstaking care, delving into a range of Sanskrit texts. What emerges is a detailed documentation of one of the main strands of patriarchal ideology within the subcontinent. This is a de-glamorized account of the relationship between women and society: it is unromantic, down-to-earth, and sobering. Sukumari di makes a plea for "a full scale exploration and scrupulous examination of each formative factor" (p 12) and, as in many other instances, herself lays the foundation for such an exploration. What is also apparent is that here, as in many other instances, she combines academic insight with social concerns. The enquiry into dowry, for example, is prompted by the harsh modern reality of dowry deaths. This is just one instance of building bridges between the past and the present.

If there is a certain immediacy in the issues addressed in *Women and Society in Ancient India, Fatalism in Ancient India*, which appeared in 1995 explores the roots of some of the most enduring ideas in Indian philosophy. The ideas developed as well as the strategies of investigation have resonances with *Indian Theogony*, but what is distinctive is a focused examination of one of the dominant strands of Indian thought. This results in a range of insights: for instance, notions of fatalism are contextualized in terms of historical developments, and linked to the emergence of stratified society, and urban centres. What is more, the ideas that contributed to a sense of fatalism are carefully unravelled and historicized. Valuable distinctions are made between notions of rebirth, *karman* and fate. The reader is also encouraged to grapple with responses to fatalism, which ranged from acceptance, to multiple strategies to deflect the so-called inevitable. In other

words, we are taken beyond a simplistic, linear account to arrive at a more nuanced understanding of what is often taken for granted as part of our common sense. What emerges is an engrossing, complicated history of a powerful idea.

Bibaho Prasange, published in 1996, shifts the focus to the institution of marriage. Here, the concerns stem from years of involvement with the women's movement. What began in the newspapers is collated as a long, interesting essay on matters that touch our daily lives. This is not a simple history: Sukumari di deftly weaves together evidence from texts and anecdotes to sustain the readers' interest, address a range of concerns, and provide insights into a complex institution. We are offered interesting readings of apparently familiar stories. So Savitri, the epitome of wifely devotion, is also held up as someone capable of defying tradition and shaping her own future. At the same time, marriage is located within contexts of the economic dependence of women, and questions of control over reproduction and sexuality are faced squarely. Rituals are also dissected, so that they no longer remain esoteric, and their implications are carefully explained. As in many other instances, we find that while the critical importance of marriage is acknowledged, it is not romanticized: the problems it entails, economic, social, and psychological, are constantly kept in sight And, as may be expected, the way double standards of morality operate, is discussed at length. Finally, Sukumari di concludes with a plea for unions based on love and mutual respect.

The same year (1996) saw Sukumari di returning to one of her favourite themes in *Ramayan O Mahabharat, Anupatik Janapriyata*. She explores the question of the relative popularity of the two epics, developing on ideas that she had touched on in 1988. It is clear where her sympathies lie: the more complex, engrossing, even demanding epic draws her attention. She finds the simple linearity of the *Ramayan* less attractive. It is an epic of conformity to norms; it also takes recourse to the supernatural. Sukumari di retells and sharpens our understanding of critical episodes in the *Mahabharat*: the poignant story of Ekalavya, the dilemma of Sikhandin, and the life and death of the tragic hero Karna, amongst others. Characters such as Bhisma and Vyasa are the subject of detailed exploration.

The next year saw the publication of another anthology, *Hindu Sampradayikata* (1997). Most of the articles were a direct or indirect response to the destruction of the Babri Masjid. Sukumari di's stated objective was, amongst other things, to provide ammunition for those wishing to resist communalism. She accomplished this by historicizing communalism, focusing on inter-community relations in early India, the traditions associated with Bhakti and Sufi saints, and exploring the connections between political power and religious intolerance. She also demolished the notion that Muslims are, by definition, outsiders. Besides, we are provided with an outline of religious developments and changes, a sense of the complexity that is often lost when the existence of two monolithic communities is posited in terms of eternal opposition to one another. What is also significant is her attempt to widen the

debate by focusing on other marginalized groups, including women, and non-elite men, pointing out how they are inevitably oppressed within the definitions of *Ram rajya*, a supposedly idyllic state. There is also a detailed critique of the political agenda of the Bharatiya Janata Party.

Many of the articles written in the 90s reveal a preoccupation with providing an accessible account of the past. These culminated in a slender volume, meant once again for the lay reader. *Prachin Bharat* (1998) provides a lucid historical narrative, an invaluable introductory text for those who have not had the opportunity or the inclination to pursue the formal study of History. What is distinctive is the way the narrative outlines developments in the major spheres of human activity: economic, social, cultural, religious, and political.

The celebrations to commemorate fifty years of independence provided Sukumari di with an opportunity for introspection, for going beyond the obvious glitter and ostentation that marked the occasion. The result was *Beder Juge Khudha o Khadya* (1998). Here, she resorts to her characteristic strategy of meticulous documentation to set at rest another myth, that of unbounded prosperity in the past. Her logic is irrefutable: if the *Rgveda* and other Vedic texts contain (as they do) prayers and rituals to ward off hunger, and if they reflect an enormous anxiety about starvation, then, the context in which these compositions must be located is inevitably one of scarcity. In fact, even the philosophical speculations of the Upanisads are frequently couched in terms of analogies of food and hunger. She goes on to suggest that scarcity can have at least two different dimensions. One is a natural scarcity, the result of insufficient production or the absolute non-availability of food. The second, equally apparent in the textual tradition, is that of man-made scarcity, the result of the accumulation of resources in the hands of a few. Unfortunately, as she points out, the second situation remains a familiar one even after two millennia.

The turn of the millennium witnessed the publication of an anthology appropriately titled *Manthan*. Here we find Sukumari di outlining a variety of strategies to counter trends of communalism and fundamentalism. These include a re-examination of early textual traditions to excavate how the questions of "outsiders" were addressed, to argue that while hostile responses were plausible, other responses included those of accommodation, assimilation, and respect. Other essays are marked by a special concern for future generations subjected to the warped understanding of the past and traditions projected by the Sangh parivar. One can sense the anguish of a Sanskritist, passionately fond of the language, arguing against its compulsory imposition. And there is pain at the selective appropriation of the past that is part of the fundamentalist agenda. Yet, this does not degenerate into an angry emotional outburst. What we find instead is a detailed refutation of the agenda, a refutation that is effective because it rests on isolating specific components, subjecting them to critical scrutiny, and then arguing for their rejection. In the process, Sukumari di documents how lip service continues to be paid to the Vedas, while in reality, Hindutva has little that is Vedic. At another level, she focuses on the implications of war in general and nuclear

warfare in particular, pointing out their futility, particularly in a region where basic issues of human development remain unaddressed.

While *Beder Juge Khudha O Khadya* provided insight into material conditions and social relations, *Bede Samsay O Nastikya* (2000) examines evidence for scepticism and atheism within the Vedic tradition. Here, as elsewhere, Sukumari di reads against the grain of the texts, which condemned and marginalized thinkers who questioned accepted beliefs. At the same time, she recognizes that it is this heritage of doubt, questioning and argument that needs to be retrieved and acknowledged if we are to progress, suggesting that non-conformists hold the key to the future. Sukumari di traces the roots of scepticism in the inevitable "accidents" of failure and success that accompanied the performance of sacrifices. Besides, the very nature and existence of deities such as Indra is called into question. At a more fundamental level, questions about the process of creation surface within the tradition, in spite of their potentially unsettling possibilities. And then there are unresolved questions regarding death and its aftermath. The resolutions which are envisaged, apparent both within non-Vedic and Vedantic traditions, are delineated with care, their inconsistencies and ambiguities underlined. Once again, over-simplification is avoided: the distinction between doubt and disbelief is not allowed to collapse. And as always, Sukumari di reminds us of the changing material and social contexts that provide the backdrop for these ideas.

Myths: Vedic, Buddhist and Brahmanical, appeared in 2002. It consists of an anthology of essays and papers that were published and presented in various journals and conferences. The possible social underpinnings of myths are explored. For instance, it is suggested that the *deva-asura* conflict, a recurrent theme of Vedic mythology, may represent relations between conquering outsiders and the conquered indigenous population, part of a strategy of assimilation. Many of these essays are enriched with cross-cultural references, that on the sun -god being a case in point. In other instances, Sukumari di traces cross-cultural influences. Thus, the changes in the conceptualization of Yama, from the god of the dead to a god of death, are explained in terms of the influence of Chinese beliefs, which may have been absorbed through Buddhism. Equally interesting is the brief account of the accommodation, assimilation and marginalization of Vedic deities within the Buddhist pantheon. Another, somewhat different kind of interaction is traced through the myths of Dionysos and Siva, which have striking parallels.

Sukumari di has been battling chronic ill health for several years. Yet, this has not deterred her from continuing to probe into the past, analyse textual traditions with exemplary patience and communicate her findings well beyond the narrow circle of academic specialists. Her example will continue to inspire us. In *Prachin Bharat, Samaj O Sahitya*, she writes that her intention is not to pronounce a final verdict, but to share her thoughts with her readers. One hopes she will continue to share her ideas, original, thought-provoking, passionate, and committed, with us in the years to come.

References

The Indian Theogony: Brahma, Visnu & Siva. Penguin Books, New Delhi, 2000 (1970).

Literature in the Vedic Age. Vol. I. The Samhitas. K.P. Bagchi &Co, Kolkata, 1984.

Literature in the Vedic Age. Vol. II. Brahmanas, Aranyakas, Upanisads and Sutras. K.P. Bagchi &Co, Kolkata, 1986.

Prachin Bharat, Samaj O Sahitya. Ananda Publishers, Kolkata, 1988.

History of Classical Sanskrit Literature. Orient Longman, Hyderabad, 1993.

Women and Society in Ancient India. Basumati Corporation Ltd, Kolkata, 1994.

Fatalism in Ancient India. Baulmon Prakashan, Kolkata, 1995.

Bibaho Prasange. Camp, Kolkata, 1996.

Ramayan O Mahabharat: Anupatik Janapriyata. Camp, Kolkata, 1996.

Hindu Sampradayikata. Deep Prakashan, Calcutta, 1997.

Prachin Bharat. National Book Agency Private Limited, Kolkata, 1998.

Beder Juge Khudha O Khadya. Chirayata Prakashan, Kolkata, 1998.

Bede Samsay O Nastikya. Paschim Banga Bangla Academy, Kolkata, 2000.

Myths, Vedic, Buddhist and Brahmanical. Progressive Publishers, Kolkata, 2002.

July 2004.

The 'Indus-Sarasvati Civilisation' Concept

Suraj Bhan

The Indus-Sarasvati Civilisation is a comparatively recent concept. The new nomenclature was given to the Indus Civilisation/Harappa Culture towards the end of 1980s by the school of archaeologists/historians attempting to 'rewrite Indian History' on the basis of tradition, environmental approach and the perspective of cultural nationalism. It was a reaction against the scientific historical researches carried out in India during the colonial and post-Independence periods in the fields of historical linguistics, history of Sanskrit literature, archaeology and history.

The comparative study of Vedic Sanskrit, Old Iranian, Greek, Latin etc. in the 19th century by linguists led to the formulation of the concept of Indo-European family of languages, original home of their ancestors, advance of the Indo-Aryan speaking branch into north-western parts of the Indo-Pakistan subcontinent around c. 1500 BC.

The archaeological excavations at Harappa and Mohenjodaro in 1920s' brought to light the ruins of towns of the Chalcolithic age characterized by the use of burnt brick structures, planned lay out of settlements, streets and drainage system, seals, script, weights and measures and typical tools and weapons, pottery terracotta, sculptures etc. Sir John Marshall, the Surveyor General of the Archaeological Survey of India, termed the culture as the Indus Civilisation in view of its geographical context and urban character. The nomenclature soon received wide acceptance both in India and abroad. Marshall recognized its indigenous character and dated it to the 3rd-4th millennium BC. He distinguished the Indus civilization from the Rig vedic culture on account of its urban character, use of script, worship of Mother goddess, burial of the dead, and the absence of house, iron, fire worship and animal sacrifice etc. Thus the Indus civilization came to be recognized as pre-Aryan and non-Aryan.

Sir Mortimer Wheeler, one of the ablest archaeologists of the Archaeological Survey of India, defined in 1940s' the characteristic traits of the Indus civilization and dated it more precisely between 2500-1500 BC. He looked for the relics of the Rig vedic Aryans in the Cemetery H cultural remains overlying the Harappan citadel and the Cemetery R 37 and suggested the end of the Indus cities at their hands. What was more significant was the recognition of the Dark Age between the end of the Indus civilization and the Northern Black Polished Ware culture (C. 500-200 BC)

Protohistoric archaeology of Indian and Pakistan received great fillip in the post Independence period. The era was particularly marked by the discovery of

Late/Post Harappan regional cultures of Cemetery H is southern Punjab (Pakistan), Jhukhar in Sindh, and Late/Post Harappan in the Ghaggar basin, Ganga-Yamuna Doab and Gujarat, Saurashtra and Kutch which marked the end of the Indus cities. The decades of 1960s' and after saw the introduction of environmental approach to Indian archaeology. Factors like the climatic changes, floods, hydrological changes began to be emphasized for explaining the rise and fall of Indus civilization even to the exclusion of socio-economic and political factors. The late/ Post Harappa cultures were in turn replaced by the Gandhar Grey Ware culture in North- West Frontier province and northern Punjab of Pakistan, the Painted Grey Ware culture in the Ghaggar-Hakra basin, Beas-Sutlej Doab and the Ganga-Yamuna Doab, and the related Black Slipped Ware culture in eastern U.P. and western Bihar. This almost bridged the Protohistoric Dark Age gap. The researches further revealed the pre-Harappan/Early Harappan regional cultures, Kot Diji culture in northern Sindh and Pakistan Punjab, Amri-Nal culture in lower Sindh central Baluchistan and northern Gujarat, and Sothi- Siswal culture in Sutlej-Yamuna Divide. The extensive explorations pushed the extent of the Indus civilization beyond the Indus basin in Ganga-Yamuna Doab, Sirmaur district of Himachal, Gujarat and north- western Maharashtra particularly in the late/Post-Harappan period. This prompted the Archaeological Survey of India to prefer the nomenclature of Harappan culture after the type site where the culture was first recognized. Both the terms continued to be in use interchangeably in archaeological literature.

The basic assumptions of the concept of Indus- Sarasvati Civilisation may be summarized as under :

1. The Indus Civilisation/Harappa Culture was not the product of Indus alone. Vedic Sarasvati was a mighty perennial river parallel to the Indus system of the Indo-Gangetic Divide in the Rig Vedic era. It came down from the mountains and discharged into the Runn of Kutch after flowing through wide beds presently called the Sarsooti, Ghaggar-Hakra and Nara in the local tradition. Water was supplied to these otherwise seasonal streams by the ice fed rivers Yamuna and the Sutlej. But the Sarasvati dried up afterwards with the shifting of the perennial tributaries to their present courses.

2. The Vedic Saravati was the nucleus of the Indus Civilization. It flourished and came to an end with the flow and drying up of the Sarasvati. The Indus civilisation had an indigenous growth all over its extent and flowered till the environment permitted. Neither it had any foreign inspiration for its origin nor was it destroyed by any imagined Aryan invasion from outside India. It declined and in fact several of its cultural elements survived into the later Hindu tradition.

3. The discovery of new evidence from the excavated Harappan sites and the facts from the new interpretation of Rig Veda reveal that the Harappan Culture was no different from the Rig Vedic Culture.

It is necessary to discuss here the various issues raised by the protagonists of the Indus Sarasvati civilisation to assess the validity of their assumptions. Let us first examine the hypothesis that the Vedic Sarasvati was a mighty river system.

Was Sarasvati A Mighty River?

Sarasvati, literally means a river of lakes and has been deified as a goddess in the Rig Veda, a ritual text dated between 1500 B.C. and 1000 B.C. In the earlier portions of the text the Sarasvati is glorified as the best of the *nadis* and flowing from the mountains to the sea. But in a later portion of the Rig Veda (10th Mandala) Sarasvati is placed in between the Yamuna and the Sutlej. All *nadis* in the Sutlej Yamuna Divide originate in the Shivaliks and hence are only seasonal. It is this *nadi* which flowed past the early historic city of Thanesar in the Kurukshetra region in Sanskrit literature. In the later Vedic literature, Mahabharata and the Puranas the Sarasvati is known to have originated at Plaksha Prasravana under the Sivalik belt and disappeared at Vinasana in the desert By the time of the Puranas the Sarasvati became insignificant and the tradition travelled to Prayag, Pushkar, Abu, northern Gujarat, Gir forest in Saurashtra and Prabhasa near Somnath on the Arabian coast to give names to small streams.

The memory of Sarasvati of the Indo-Gangetic Divide was to be revived only after the Survey of India produced topographical Altas of the region in the later half of the 19th century. The survey revealed dry beds of Sarsooti (anc. Sarasvati) in Haryana, Ghaggar-Hakra in Punjab, north-western Rajasthan and Bahawalpur (Pakistan) and Nara in Sind. Other seasonal streams such as Chitang or Chautang in Haryana, and the Patiala, Sirhind and Naiwal in Punjab formed tributaries of the Ghaggar-Hakra river. Relying heavily on the Rig Vedic tradition C.F. Oldham came out with a hypothesis in 1893 that there existed a single wide desert river which comprised the dry beds of the Sarsooti (anc. Sarasvati), Ghaggar-Hakra and Nara along with its tributaries. This was no other than the mighty Sarasvati of the Rig Veda. But all these streams of the Sutlej-Yamuna Divide have their catchment area in the Sivaliks and are not ice-fed. He, therefore, imagined the supply of water in the desert river with 6-8 km. wide bed from the Sutlej which formed its tributary and flowed through the Sirhin and Naiwal before it joined the Sarasvati. The Rig Vedic Sarasvati earlier flowing from the mountains to the sea (*samudra*) dried up as a result of the shifting of Sutlej to its present course in historical times. But his contention was competently contradicted by Wilhelmy that the Sutlej had once flowed into the Ghaggar through eastern Punjab (India). He suggested that a branch of Sutlej did join the Hakra in Pakistan Punjab.

R.L. Raikes, and Italian hydrologist, on the basis of the discovery of grey sand of Yamuna while boring in the Ghaggar bed and observation of depression along the right bank of Yamuna near Indri, proposed in 1968 the periodical deflection of the Yamuna into the Ghaggar. And the reversal of the flow of Yamuna into its present bed around 1800 BC led to the desiccation of the Ghaggar valley and resulted in the death of the Harappan town of Kalibangan.

The hypothesis of R.L. Raikes could not be substantiated by the researches carried out by the Indo-French team lead by Frankfort. They dug bores in the Ghaggar and found typical Yamuna sand at a depth of more than 10 m. below the flood plain the Ghaggar. It helped them conclude that the Yamuna did not flow into the Ghaggar river at least during the last 10 thousand years. They also did not agree with Suraj Bhan that the Yamuna had left its old bed near Mitathal and Rohtak while shifting from Ghaggar to its present course near Delhi.

Yashpal studied the landsat imagery of the region and identified in it the palaeo-channel of Sarasvati-Ghaggar-Hakra river alongwith the tributaries traceable up to the Bahawalpur region of Pakistan in 1980. On the basis of proximity of the palaeo-channels to the Sutlej near Ropar and to the Yamuna in northern Haryana he inferred that the Sutlej and Yamuna once flowed into Sarasvati river. But the supposed palaeo-channel was not tested on the ground by examining geological evidence of silt and water contents of the Sarasvati-Ghaggar with that of the Yamuna and Sutlej. It was also not dated and examined whether the satellite images were of actual riverbeds or of the canals dug there by Ferozshah Tughluk in the 14th century.

More recently some geologists have tried to look for the upper course of Vedic Sarasvati in Tons river of Garhwal region in the Himalayas. V.K.M. Puri and B.S. Verma of the Geological Survey of India have studied the morphology and hydrology of Markanda (a tributary of Ghaggar) on Bata and the Tons (a tributary of Yamuna) in this region. Their hypothesis is that the Tons, a perennial river fed by the Bandar Poonch glacier of the central Himalayas in Garhwal region, once flowed westward through the Bata and Markanda valleys in the Sivaliks. It descended into the Haryana plains at Adbadri (a small late medieval shrine on the Somb Nadi a tributary of Yamuna) to flow through the now dry bed of Sarasvati along Kapalmochan, Bilaspur, Mustafabad, Bhagwanpura, Pipli, Kurukshetra, Pehova etc. in Haryana. They argued that metamorphic and quartzite stones deposited in T0 and T1 terraces in Bata and Markanda Valleys at a height of 600m. were brought by Tons from its catchment area. If flowed thought the Vedic Sarasvati before 2450 B.C. when the Tons and the Yamuna shifted to the east to flow through the Yamuna Tear into the Chitang supposed to be the ancient Drisadvati (a tributary of the Sarasvati). The Yamuna shifted to its present course around 1800-1900 B.C. The Sutlej to shifted to its present course about this time and joined the Beas. These hydrological changes resulted in the drying up of the Vedic Sarasvati around 1800 B.C. They, however, concurred with V.S. Wakankar to imagine that the Vedic Sarasvati passed through western Rajasthan and Gujarat to join the Gulf of Cambay with Luni as its tributary. Dholavira in Kutch and Lothal in Gujarat according to them were located on the vedic Sarasvati.

The view was first propounded by V.S. Wakankar who along with S.P. Gupta, undertook a project to search for the Vedic Sarasvati in 1985. This project was sponsored by the R.S.S. affiliated Baba Sahib Apte Samarak Samiti and the Bharatiya Itihas Sankalan Samiti. B.B. Lal agrees with the glacial source of the 'Vedic Sarasvati' with Tons forming its upper course. But he differs from them

about the lower course of the Vedic Sarasvati. He rather agrees with S.P. Gupta and V.N. Mishra.

But it is quite evident from Survey Atlas that the Sarasvati is a seasonal stream originating below the Sivaliks in the submontanous tract of northern Haryana. The name Sarasvati which literally means a river of lakes was first given by the Rig Vedic People. It flowed along Kurukshetra down to Sirsa (Sarasvati Nagar) as can be attested by the literary tradition, the Survey of India maps and the archaeological sites found along its dry bed. The main river of the Sutlej Yamuna Divide, however, is the seasonal steam of Ghaggar originating from the Sivaliks in the Kalka region. The Sarasvati joins the Ghaggar to the north of Sirsa only when there is heavy flow. The occurrence of P.G.W. and Rangmahal settlements of later cultures in the wide floodplain of the Ghaggar suggest that the flood water passed through this into the Bahawalpur territory beyond Anupgarh. Sir Aurel Stein refers to a periodical flood having reached beyond Bikaner as late as c. 1900 A.D. This shows that the Sarasvati (Ghaggar) was not altogether lost in the sands in the post Rig Vedic times. It was perhaps the damming of the streams for the irrigation of fields upstream which reduced the flow of seasonal and periodical flood in the channel. He also observed a Delta like formation in central Bahawalpur region in which the river disappeared. This suggests that the river did not flow into the Arabian sea and was not a mighty perennial river as imagined.

Wilhelmy has successfully argued that Sutlej never joined the Ghaggar in Indian part of the territory. Those who have been working in the Sutlej– Yamuna Divide know that Sutlej already flowed in its present course in the pre-Harappan and Harappan times. A limited survey carried out by me along the Sutlej near Faridkot brought to light pre-Harappan sites at Faridkot and Moga and Harappan site at Faridkot besides the known Harappan sites of Kotla Nihang Khan and Ropar. Similarly the Yamuna had already carried out its present valley before the Harappan times. Some late Siswal settlement of rural Harappan foci have been explored by Dr. Amar Singh in the khadar flood plain of Yamuna in the Panipat district besides already known Late/post Harappan sites in the Yamuna Valley below Yamunanagar and both on the north and south of Delhi. The Indo-French team after a thorough study of the Sarasvati-Ghaggar and Yamuna relationship has revealed that the Yamuna grey sand occurred in the Ghagger bed at a depth of 10m. Courty concluded on this basis that the Yamuna river did not flow into the Sarasvati-Ghaggar bed in the Holocene period. Hence the question of the Yamuna being the tributary of the Sarasvati-Ghaggar in the Harappan period makes no sense.

The thesis of Puri and Varma that the Tons, a tributary of Yamuna, formed the upper course of Sarasvati in the Himalayas in the Harappan period is also no more than a wild guess. The absence of any gorge of the Sarasvati in the Sivalik belt connecting the Bata valley with the Sarasvati preclude any possibility of Tons flowing into the Sarasvati at least in the Holocene period (during the last 10 thousand years).

Hence the thesis that the Sarasvati was a perennial river coming from the mountains and going to the sea in the Indus/Rig Vedic age and that it dried up in the post-Rig Vedic period resulting in the end of the Harappan Civilisation around C. 1800-1900 B.C. is nothing more than a myth.

Was Sarasvati Nucleus of Indus Civilisation?

V.N. Mishra, a pre-historian of the Deccan College, Pune, studied the rise and fall of the Indus Civilisation in the Rig Vedic Sarasvati basin. He largely relied on the arguments of C.F. Oldham, R.L. Raikes and Yashpal to prove that the Sutlej and Yamuna flowed into the Sarasvati as its tributaries during Harappan Period (3rd millennium B.C.). This justified the description of Sarasvati as a mighty river in the Rig Veda coming form the mountains and going to the Sea. He also agreed with J.P. Joshi who claimed on the basis of the distribution of the Indus sites prepared by them that it was the Ghaggar-Hakra (the Rig Vedic Sarasvati) which was the nucleus of the Harappa Culture and not the Indus. His concluded that it was the supply of water of the Sutlej and the Yamuna to the Rig Vedic Sarasvati that made the latter perennial and provided conducive environment for the emergence of Harappa Culture in the valley and the shifting of its ice fed tributaries to their present courses resulted in the desiccation of the Rig Vedic Sarasvati and consequently to the end of the Harappa Culture around c. 1900 B.C.

J.P. Joshi had asserted that there was a larger concentration of Indus sites in the Ghaggar-Hakra Valley than in the Indus Valley. This was supported by the discovery of 700 Harappan sites of all phases in the Sarasvati Valley as against 250 sites in the Indus Valley. On the basis of statistical assessment it was concluded that the Sarasvati– (Ghaggar-Hakra) Valley was the nucleus of Indus Civilisation. Both J.P. Josh and V.N. Mishra, forgot to understand that the Archaeological Survey of India took special interest in the discovery of Harappan sites in the Sutlej-Yamuna Divide and in Gujarat after India became independent to make up the loss of know Indus sites. Such a planned intensive survey was not carried out in Pakistan. Besides, the ancient sites in the dry tract of Ghaggar-Hakra basin have greater chance to survive in the absence of a perennial river than in the Indus Valley. What the scholars have lost sight of is the fact that it is in the central Indus Valley and further west that the formative stage of the Indus Civilisation has been set. The most trustworthy evidence of the early Harappan Culture comes from Harappa, Naušharo etc. But the late/post Harappa Culture is best represented in the Sutlej-Yamuna Divide and further east. Moreover, the largest and richest Harappan city sites of Mohenjodaro and Harappa are located in the Indus valley only. Thus, any glorification of the Vedic Sarasvati (Ghaggar-Hakra) for being the nucleus of Indus Civilization is not justified.

Was Indus Civilisation Rig-Vedic?

The correlation between the Indus civilisation and the Rig Vedic culture has been attempted mainly on three grounds– (1) that the Indus civilisation and the Rig Veda were coeval, (2) that the geography of the Indus civilisation and the Rig

Veda was coextensive, and (3) that the Indus civilisation and the Rig Vedic culture were not different. The above postulates are being examined below to find out the validity of the assumptions.

1. Were Indus Civilisation and the Rig Veda Coeval?

The chronology of the Indus civilisation has been soundly established between c. 2600 and c. 1900 BC on the basis of C. 14. But the protagonists of the Indus–Sarasvati civilisation date the Rig Veda is a peculiar way. They argue that in the Rig Veda the Sarasvati, was described as a mighty and perennial river which made the rise of the Indus Civilisation possible. But the Sarasvati is know to have dried up in the later Vedic period at Vinasana. This resulted in the desertion of Kalibangan, a Harappan site on the Sarasvati (Ghaggar) in north-western Rajasthan. Since the end of Kalibangan has been dated by C 14 around c. 1800-1900 B.C.; this was also the time when the Sarasvati dried up as the desertion of Kalibangan could be the result of the changed phenomena only. Thus the Rig Veda, according to this school, is to be placed before c. 1800-1900 B.C. when the Sarasvati was in full flow. Hence they argue that the Rig Veda and the Indus Civilisation were contemporary.

A still earlier date of the Rig Veda has been suggested by some of them who push back the age of Vedanga Jyotish, an astrological text and Aitreya Brahmana to c. 3500 B.C. on the basis of some disputed astronomical phenomena mentioned in these later Vedic texts. If believed this would place the Rig Veda as early as c.4500 B.C. when in fact the sarasvati Ghaggar plains were not even inhabited.

Much reliable work has been done on the relationship of the Rig Veda with other datable texts in West Asia. The tablets found at Boghazkoy (Turkey) bear Hurrian texts dating to the 14th century B C. There occur several words and names of Indo-Aryan language spoken by the Mitani in North Syria. This shows that the Mitani rule spoke a language very chose to the Rig Vedic. This proves that in the earlier period they must have lived together and came to be separated not more than a century or so earlier than 1400 B.C. Hence the Rig Veda cannot be placed in the 3rd millennium BC, the era of the Indus Civilisation.

Last but not the least the Rig Veda has close linguistic affinities to the vocabulary and grammar of Avesta, the earliest know Old Iranian text. The old Avesta has been dated between 1300 B.C. and 1000 B.C. on epigraphical and linguistic grounds. The Rig Veda may thus be reasonable dated between 1500-1000 B.C. and it can be placed earlier into the 3rd m. B.C. as suggested by the protagonists of the Indus Sarasvati Civilisation.

2. Did the geography of the Indus Civilisation and the Rig Veda Correspond?

The later portion of the Rig Veda (10th mandala) reveals that the Vedic Aryans lived in the region between the Ganges in the east and the Kabul river, a tributary of the Indus. The core of the tract has been rightly described as the Sapta-Sindhu region. The Rig Veda does not seem to be acquainted with large parts of the

geography of the Indus Civilisation, particularly the Sindh, South Baluchistan, Gujarat and north-western Maharashtra. Their acquaintance with samudra actually means the collection of water (lake or the confluence of rivers) as pointed out by Witzel. On the other hand the Indus Civilisation did not expand into the Gandhar region, the Kabul valley and Iran, the land of the Indo-Iranians through which Indo-Aryans, believed to be no different from the Indus people, moved out to Iran, Turkey, Greece etc. according to the protagonist of the new concept.

3. Were the Indus and the Rig Vedic culture similar?

The protagonists of the Indus-Sarasvati Civilisation have made superfluous claims to the Rig Vedic affinities of the Indus Civilisation. These are not tenable. We know for certain that the Indus civilisation had ultimately declined and come to an end. But the Vedic Aryans expanded further east and south and contributed to the rise of territorial states in the later vedic period. Secondly, the Late Kot Diji/ Indus Civilisation was succeeded by the Gandhara Grave Culture and the Pirak Culture around 1800 B.C. in north-western Pakistan and by a regional variant, the Painted Grey Ware culture in northern India (in the Kuru Panchal region) around c. 1100 B.C. marking a cultural break in the proto-history of northern India after the end of the Indus Civilisation. These cultures are distinguished by the agricultural pastoral socio-economic formation as against the urban formation of the Indus civilisation. It is these post late/post Harappan agrarian pastoral communities who helped the rise of the 2nd urbanization in India This had nothing to do with the Indus Civilisation and was distinguished by its characteristic Brahmi script, Punch Marked copper and silver coins and the Northern Black Polished Ware pottery.

The material cultural of the Indus civilisation was distinguished by the fortified urban settlement with monumental fired brick architecture, palaces, granaries, tanks, wells, drainage system and a planned lay out. Any comparison of the Rig Vedic purs with the typical Harappan fortified cities cannot be considered valid in the absence of any information on the types of the Rig Vedic purs. Same is also true about the so called Rig Vedic bhavanas or mansions. The absence of the script, standard weight and measures, specialized crafts, long distance trade particularly with West Asian cities further precludes the urban character of the Rig Vedic Aryans whose tribal character is fully borne out by the polytheistic religion deifying natural phenomena and giving communal feasts on the occasion of sacrifices etc.

The society and culture of the Rig Veda (the ritual text) and the Indus Civilisation can be best distinguished in the religious field. According to Irfan Habib the Indus deities were mostly zoomorphic as is evidence from their seals and copper amulets. Among the animals worshipped the most prominent was the unicorn bull. Others included bison, elephant, humped bull and rhinoceros. But the Rig Vedic gods and goddesses are human in form (anthropomorphic).

The Indus people perhaps attached greater sanctity to bull unicorn, elephant, rhinoceros, tiger and buffalo to cow unlike in the Rig Veda. There is no composite

deity in Rig Veda comparable with that on Indus seals (with Tiger's Body, bull's horns, elephant's trunk). Furthermore the figurines of Mother goddess, so popular in the Indus cities are not met within the Rig Veda. The mode of disposal of the dead also differs in the two cultures. The Indus sites had regular cemeteries outside the settlements but in the Rig Veda the dead was mainly cremated.

Much has been made of the so called fire altars from Lothal, Kalibangan II and Banawali II, and of the sacrificial pit in the citadel area at Kalibangan to find an evidence of Rig Vedic rituals in the Harappa Cultures. But it is strange that these so called ritual structures show no features of the Vedic tradition even in the citadel of the ruling elites at Kalibanga. The ethnographical study of animal sacrifice done in the Hedamba temple at Manali (Himachal) & Devi temple at Gurgaon reveal that the animal is sacrificed in front of the deity and blood drops of the sacrificial victim are sprinkled in the pit in front of the goddess. The dead body of the animal is carried away and shared by the priests and the sacrificer. It would be absurd to assume that animal parts of the body are deposited in the pit within the temple the allowed to decay there and spread bad small. The secular use of the fire pits as hearths and oven cannot be ruled out. Similarly the supposed sacrificial pit could have been a storage pit and the head of the slaughtered animal could be thrown there only after the desertion of the site.

Conclusion

In the light of the above discussion it is clear that the Indus Sarasvati Civilisation concept is not tenable. But then the question arises why are the protagonists of the theory doing archaeology the way they do. There is no doubt that the concept of Indus Sarasvati Civilisation is an integral of Hindutva Perspective of rewriting history to cultivate Brahmanical mindset devoid of sense of history and forgetting memory of events and struggle that made pluralistic and eclectic India so well known for its culture of co-existence and tolerance. The concept aims to communicate that the Indus Civilisation and Sarasvati centered Aryan culture, have indigenous origin and marked by continuity and change. It was the most ancient, most extensive and advanced of the earliest civilisations of the world.

The protagonists of the concept lacked interdisciplinary approach to archaeology. They looked for supporting their preconceived notions by using selective data produced by a number of archaeologists, geographers, geologists, and experts studying remote- sensing, hydrology, morphology and literature. If we ask why they study archaeology the why they do, one would be in a position to understand their motive. Their chef motive seems to be to kill rational discourse, universal outlook, understanding of the socio-cultural plurality and socio-economic and cultural changes in India's past. While imposing the idea of Riv Vedic Aryans on the Indus Civilisation they aim at appropriating the Indus heritage for the Brahmanical Tradition and to promote its revival. It will support the preconceived notions of Hundutva, ideology of RSS, rather than any relevance to the society a large.

Notes on the Fifth Book of the GĪTĀ

H. W. Bodewitz

The colophon calls this fifth chapter *karmasaṃnyāsayoga,* which may be translated with "the discipline of the renunciation of Karma" (as is done by Radhakrishnan). However, it does not teach actual Saṃnyāsa, let alone renunciation of all activity, but the getting rid of the results or effects of one's actions which are also called *karma.* As usual in the Gītā the titles of its books and the use of several technical terms are rather deceptive. One should not take these terms literally, but keep in mind that new (often paradoxical) interpretations are made of them.

The title may of course also be interpreted as "The Yoga of action and renunciation" (as is done by Zaehner). Actually *karmayoga* (the discipline, doctrine or method of action) is preferred to *saṃnyāsa,* as appears from vs. 2. The whole chapter mainly deals with *karmayoga*, the method or path of action (*karma*) which on account of the mental attitude of the performer does not result in Karma but in liberation from Karma (i.e. *mokṣa*). The Karmayogin, however, should not only perform his actions without interest in their results. He should also have a positive aim in life, Brahman, as appears from vs. 19 ff. In this connection an important role is reserved for *jñānam* (vs. 16–17).

*

In my commentary on this book (just as in my treatment of the books 2–4 (to be published elsewhere) I have taken into account only the following five translations :

S. = É. SENART, *La Bhagavadgītā,* Paris 1922

R. = S. RADHAKRISHNA, *The Bhagavadgītā,* London 1948.

Z. = R.C. ZAEHNER, *The Bhagavad-Gītā,* Oxford 1969.

M. = K. Mylius, *Die Bhagavadgītā,* Leipzig 1980

v.B. = J.A.B. VAN BUITENEN, *The Bhagavadgītā in the Mahābhārata,* Chicago 1981.

*

1. *saṃnyāsaṃ karmaṇāṃ kṛṣṇa punar yogaṃ ca śaṃsasi/*

In this verse Arjuna asks whether *saṃnyāsa karmaṇām* or *yoga* is better. He shows himself to be a rather bad pupil after having heard the teaching of books II-IV, but Arjuna's questions mostly function as an opportunity for Kṛṣṇa to express his ideas with different words.

The term *yoga* here is taken with the genitive *karmaṇām* (which also belongs to *saṃnyāsam*) by R., Z., M. and v.B. However, *yoga* means exertion and is never associated with this genitive in the preceding chapters. Nor does the verb *yuj* have *karma* or *karmāṇi* as object in these contexts; instead we read *kuru karma* in IV, 15.

The term *yoga* is often used as an independent concept denoting the activity prescribed by the Gītā'. Sec e.g. IV, 42 *Yogam* ātiāṣṭha. Sec also the reinterpretation of the concept of Yoga (which no longer refers to Yogic practices) in II, 50 *yogaḥ karmasu kauśalam.*

Therefore translations like "of works and their unselfish performance" (R.), "perform them" (Z.), "ihre Ausübung" (M.) and "the parctice of them" (v.B.) perhaps have to be rejected in spite of support from the Petrograd Dictionary of Böhtlingk and Roth s.v. *yoga* e) : "das Anstellen, Inswerksetzen, Ausfuhren, Anwendung, Gebrauch" (i.a. referring to the present verse).

Some of these meanings indeed are found sometimes, but mostly when *yoga* forms the second member of a compound. In the titles of the books of the Gītā as found in the colophons one might interpret *yoga* as 'application', e.g. *karmayoga* (third book) and *jñānayoga* (fourth book), but 'performance' or 'practice' of *jñāna* would be strange. In these compounds *yoga* rather denotes 'discipline, method, *mārga*'.

The compound *karmayoga* does not mean 'the performance of *karmāṇi*' in the third book, but refers to the method of 'activity'; i.e. *karma* represents a singular. As such it more or less coincides with concept of *yoga* in the Gītā, when used independently. See also III, 3, where the Yogins are associated with *karmayoga* and the Sāṃkhyas with *jñānayoga.*

The term *yoga* also means 'activity' in the compound *yogasaṃnyastakarmaṇām* (IV, 41), where the opposition of activity and Saṃnyāsa is bridged by the typical solution of the Gītā. Similarly *yoga* means 'exertion, activity' in the title of the second book *sāṃkhyayoga,* a Dvandva compound which does not express an opposition but two complementary methods : theory or philosophy and practice.

I am inclined to follow the interpretation of S. "tu loues le yoga qui est effort". However, the next verse indeed has the compound *karmayoga* in opposition to *saṃnyāsa* and not to *saṃnyāsayoga.* So *yoga* cannot be taken there as "the discipline of ..". Perhaps we should take the compound *karmayoga* as "exertion by actions", i.e. as a Tatpurṣa compound, though a Karmadhāraya compound ('yoga in the form of activity') is not to be excluded. S. translates the compound *karmahoga* with "yoga", whereas in the first verse he translates *yoga* with "action". Evidently he took *karmayoga* as a Karmadhāraya compound in his free translation and not as *karmaṇāṃ yoga.*

2. *saṃnyāsaḥ karmayogaś ca niḥśreyasakarāv ubhau/*
tayos tu karmasaṃnyāsāt karmayogo viśiṣyate//

This statement is much more positive about the Saṃnyāsa (of acts) than II, 47 *mā te sango 'stv akarmaṇi* and III, 4 *na ca saṃnyasanād eva siddhiṃ samadhigacchati.* In the present verse *karmayoga* is not coupled with *jñānayoga* as one of the two equal paths leading to Mokṣa, but with Saṃnyāsa. However, the latter is regarded as inferior. In a note R. incorrectly identifies Saṃnyāsa with Sāṃkhya. The problem is that the *jñānayoga* of Sāṃkhya need not be restricted to complete renouncement of acts. For my interpretation of *karmayoga* see the commentary on vs. 1.

3. The performer of *karmayoga* is called a *nityasaṃnyāsin* and implicitly regarded as a better *saṃnyāsin* than the man who once takes the decision to renounce, since the man in the world has to make his decision about renouncement (of the results of his activities) on every occasion. According to v. B.'s note "Kṛṣṇa lifts the notion of renunciation out of the nonaction vs. action controversy". One may also say that real Yoga is substituted by Karmayoga and that real Saṃnyāsa now is substituted by renouncement not of the acts but of their results (both being called *karman*). A similar substitution is found in a passage from the MBh. in which the real eater of the remnants is not the renouncer of the world who eats what is left by the animals of prey but the householder. See A. Wezler, *Die wahren 'Speiseresteesser' (Skt. vighasāśin)*, Wiesbaden 1977.

4. *sāṃkhyayogau pṛthag bālāḥ pravadanti na paṇḍitāḥ/*
ekam apy āsthitaḥ samyag ubhayor vindate phalam//

Kṛṣṇa confusingly shifts from the couple *saṃnyāsa and karmayoga* to that of *sāṃkhya* and *yoga* (=*karmayoga*). R. again identifies *sāṃkhya* and *saṃnyāsa* and does not realize that *sāṃkhya* is equal to yoga whereas *saṃnyāsa* is inferior. The same mistake was made by Z. in his commentary, though he correctly translated *sāṃkhyayogau* with "theory and practice".

M. may be right in associating *samyag* with *pṛthag* in an opposition ("...betrachten ... als ... verschieden. ... erlangt beider Frucht zusammen"). Other translators take *samyag* (with *āsthitaḥ*) as "vraiment" (S.), "well" (R.), "whole-heartedly" (Z.), whereas v.B. (like M.) takes the adverb with *vindate* in a free translation ("find the full truth of both"). One may also translate *samyag .. vindate* with "one finds at the same time".

6. *saṃnyāsas tu mahābāho duḥkham āptum ayogataḥ/*
yogayukto munir brahm nacireṇādhigacchati//

Here one might indeed be inclined to assume an indentification of *sāṃkhya and saṃnyāsa,* but *tu* seems to imply that something different from the contents of the preceding verses 4–5 is treated here. M. tries to find the solution by taking *yoga* differently from the *karmayoga* of the preceding verses (unlike v.B.) as "Versenkung" and observes : "Hier verlangt Yoga - an dieser Stelle nicht mehr im Zusammenhang mit Sāṃkhya stehend - eine solche oder ähnliche Deutung". Perhaps the text only states that without any further effort (*ayogatas*) the simple act of renouncement does not automatically produce liberation. Though *yoga* here

may only mean 'effort, exertion', it is not the same exertion as the *yoga* or *karmayoga* of the ideal man in the world according to the Gītā.

The translations take *ayogatas* as 'without *yoga*' and then an opposition with *yogayukta* 'with *yoga*' may be assumed. However, a more normal analysis of the compound with *-tas* results in a translation like "on the basis of *a-yoga*". This *a-yoga* may be compared with *a-karman* in II, 47 *mā te sango 'stv akarmaṇi*, IV, 16 *kiṃ karma kim akarma* and IV, 18 *karmaṇy akarma yaḥ paśyed akarmaṇi ca karma yaḥ*. Since *yoga* and *karman* often refer to the same in the Gītā, *ayoga* and *akarman* may likewise be more or less identical. This implies that in the present verse the text states that only on the basis of nonpresent verse the text states that only on the basis of nonactivity real *saṃnyāsa* cannot be obtained.

The *yogayukta* Muni in the second half of the versen is not "der Versenkung übende" (M.), let alone the one who is "well versed in spiritual exercise/integrated by spiritual exercise/ by integration integrated" (Z.), but someone who practises the *karmayoga* of the Gītā. If *ayogatas* would mean without 'Yoga' the term *yoga* refers to simple activity like eating and breathing which even for the Saṃnyāsin are indispensable.

7. *yogayukto viśuddhātmā vijitātmā jitendriyaḥ/*
sarvabhūtātmabhūtātmā kurvann api na lipyate//

Just as in III, 6. *vimūḍhātman* and IV, 21 *yatacittātman* the interpretation of *ātman* is problematic. It does not denote 'the self' but rather 'oneself' or 'himself' in the compounds of the first line. According to Z. it is "clearly the whole psychosomatic complex in which the 'higher self' (6. 7) inheres". However, the succession of *vijitātmā jitendriyaḥ* may indicate that the *indriyas* are not included in the *ātman* of the compound *vijitātmā* Perhaps *yatacittātman* means that one is master of oneself in as far as the *citta* is concerned and *vijitātman* "having subdued oneself" is further specified by *jitendriya* "having subdued one's senses"

The term *ātman* is differently translated in all the three compounds by v.B. : "pure of soul, master of self ... identifying himself with the selves of all creatures .. ", whereas other translators do not make any difference.

8–9. *naiva kiṃcit karomi is* explained by describing the activities as having the *indriyāṇi* as subjects and their *viṣayas* as objects, just as in III, 28 the *guṇas* act on (*vartante as in* V, 9) the *gunas*. The first five *indriyāṇi* are the well-known *buddhīndriyāṇi*. The participles *gacchan, pralapan, visṛjan* and *gṛhnan* refer to four of the five *karmendriyāṇi* (*pādau, vāc, apāna, hastau*). The sexual organ is missing. Texts like KauṣU. 1, 7 and 3, 5 add the vital powers *prāṇa* (in our verse *śvasan*) and *manas*. I cannot explain *svapan* and *unmiṣan nimiṣan* in this enumeration. Perhaps they denote activities of mouth and eyes other than the senses of taste and sight and therefore are regarded as *karmendriyāṇi*.

11. *kāyena manasā buddhyā kevalair indriyair api/*
yoginaḥ karma kurvanti sangaṃ tyaktvātmaśuddhaye//

In most translations the connection between *kevalair* and *ātmaśuddhaye* is not sufficiently expressed. S. correctly renders *kevalair* with "dégagés" (cf. v.B. "disengaged"), but does not make clear from what the corresponding instrumentals are isolated. R. translates with "merely", which looks strange after the enumeration of the instrumentals. See also M. ("allein"). Perhaps "dégagés" and "disengaged" is meant to indicate that the relations with the object and aim of the action is missing, which, however, is also expressed by *sangaṃ tyaktvā*. Probably Z. is right in translating "alone-and-isolated [from the self]". Actually the Ātman should become isolated from mind and body and their activities in order to purify it. Here the body and the mental organs are isolated from the Ātman for its purification. One may also take *ātmaśuddhi* as "self-purification", as S. does ("leur purification intérieur"). Then this purification should be connected with *lipyate na sa pāpena* in the preceding verse. The purification is then from the defilement of Karma and is based on the fact that one does not perform the actions oneself, but makes body, mind and senses the performers.

13. *sarvakarmāṇi manasā saṃnyasyāste sukhaṃ vaśī/*
navadvāre pure dehī naiva kurvan na kārayan//

Here *vaśin* on the one hand means "controlling oneself", on the other is also used in a comparison with a ruler (*vaśin*) or king who sits in his fortress (*pura*). In the first case *ās* is used in a periphrastic construction with *saṃnyasya* . "he remains controlling himself". In the second *ās should* be taken with *pure* : "he stays in his fortress". The difference with a king is that such a *vaśin* may be *na kurvan* but cannot be said to be *na kārayan.*

For the comparison with kingship and the fortress (also treated in ŚvetU. 3, 18 and KaṭhU. 5, 1) see Bodewitz, 'King Prāṇa', *Ritual, State and History in South Asia* (Felic. Vol. Hesterman), Leiden 1992, 50-64 (espc. p. 60).

14. *na kartṛtvam na karmāṇi lokasya sṛjati prabhuḥ/*
na karmaphalasaṃyogaṃ svabhāvas tu pravartate//

The *prabhu* in this verse is not the king/Ātman, but the Lord. However, R. takes *prabhu* as "the Sovereign Self of the knower" and Z. as " [the body's] lord" though the verb *sarj* clearly refers to a Creator. The genitive *lokasya* is taken with *prahuḥ* by S. and M., whereas R. and v.B. interpret *lokasya* as a genitive with the function of a dative, which looks preferable. Z. unconvincingly takes this genitive with *karmāṇi* ("worldly works").

On my doubt whether *karmāṇi* here simply means 'works, acts' as most translators assume, because, if the Lord does not make man a *kartṛ*, it would be superfluous to state that he does not create man's acts. R. tries to solve the problem by translating "nor does He act", but it is not clear in how far the subject of *sṛjati* is the Ātman or God in his interpretation. Perhaps *karmāṇi* occurring together with *kartṛtvam* should refer to the objects of the actions. Cf. vs. 9 *indriyāṇīndriyārtheṣu vartante* and III, 28 *guṇā guṇeṣu vartante* (in a verse dealing with the two elements of a *karma* (namely... *karmavibhāgayoḥ*, the subject and the object).

The last verse-quarter is misinterpreted by most translations: "c' est le domanine de la nature individuelle" (n. : "Donc de la 'prakṛiti'") (S.); " It is nature that works out (these)" (R.); "it is inherent Nature that initiates the action" (Z.); "die Natur vielmehr vollbringt (das)" (M.); "that is the doing of Nature" (n. : "*svabhāva* should here be taken in its technical sense of *prakṛti*) (v.B.). The verb form *pravartate* can not be used transitively, as was perhaps only realized by S. The term *svabhāva* should not simply be equated with the Sāṃkhyan term *prakṛti*. The *svabhāvavāda* originally was an independent doctrine, but admittedly the terms *svabhāva* and *prakṛti* later became confused in tradition. Z. 's translation "inherent Nature" is the most convincing. The *svabhāva* doctrine taught that "the effects are self-existent and are produced neither by different things as causes nor by themselves" and later "the rejection of the causal principle and of the good and evil consequences of actions formed its most important features" (D.R. Shastri, 'Materialists, sceptics and agnostics', *The Cultural Heritage of India* III (ed. H. Bhattacharyya), Calcutta (rev. ed.) 1953, 168-183, espec. 172. For this doctrine mentioned i.a. in ŚvetU. 1, 2 and Buddhacarita 9, 58 see further E.H. Jhonston, *Early Sāmkhya*, London 1937, 67 ff. I suggest as translation : "Inherent nature, however, plays a role". The point is not that *prakṛti / svabhāva* is the (material) cause or the *cause efficient* (= *kartṛ*), but that there is no specific cause of *kartṛ*, since developments take place *svabhāvatas*.

15. *nādatte kasyacit pāpaṃ na caiva sukṛtaṃ vibhuḥ/*

After *prabhu* in the preceding verse now *vibhu* is found. According to S. this would be "le Seigneur", whereas Ṛ. takes the term literally as "all-pervading" and makes it refer to the highest Spirit found in every body. Z. likewise interprets *vibhu* as "all-pervading". M. translates with "der Herr" and equates him with "das Brahman, die Weltseele", whereas v.B., who had translated *prabhu* with "the Lord", now renders *vibhu with* "the lord" and observes in a note that this refers to "lord of the body" i.e. "the soul/self". Indeed the embodied Lord is meant here, but perhaps an etymologizing translation is preferable.

If the genitive *kasyacit* should denote 'any human being', one might be inclined to take *vibhu* as the Lord outside the body. However, the Ātman (anyhow identical with the Lord) may be said to be free from the Karma of every being with whom he temporarily associated. S. does not translate *kasyacit* and v.B. supplies *karmaṇaḥ* to *kasyacit* "which the context requires", an unconvincing interpretation.

16. *jñānena tu tad ajñānaṃ nāśitam ātmanaḥ/*

The genitive *ātmanaḥ* is left untranslated by R. , taken with *ajñānam* by Z. and v.B., and with *jñānena* by. S. and M. I prefer the latter interpretation for stylistic reasons, since the first and the last word of a line sometimes belong together.

17. In the compound *jñāna-nirdhūta-kalmaṣāḥ* occurring at the end of this verse the participle *nirdhūta* has been misinterpreted by S. ("effacé"), R. and Z.

("washed away"), M. ("gereinigt") and v.B. ("cleansed away") as if derived from the root *dhāv* instead of *dhū*. It means "shaken off". However, the roots *dhāv* and *dhū* seem to be related; see T. Gotō, *Die 'I Präsensklasse' im Vedischen*, Vienna 1987, 186 f. and M. Mayrhofer, *Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen* I, 782 f. With the preverb *nir* the root always means 'to shake off' as far as I know.

19. *ihaiva tair jitaḥ sargo yeṣāṃ sāmye sthitam manaḥ/*

The term *sarga* has been variously interpreted. S. takes it together with *ihaiva* and translates with "tout retour en ce monde" (taking it as 'creation, birth, rebirth'). According to R. (who makes *ihaiva* refer to liberation during life on earth) the *sarga* would be "the created (world)"; cf. M. "die Schöpfung" and v B. "creation" (both without further comment). Z. is more specific : "[the process of] emanation [and decay]". Indeed, already on earth they have overcome their own rebirth.

The *sāmya* is interpreted as "l'impassiblité' (S.), "equality" (R.), "that-which-is-ever-the-same" (Z., making this refer to Brahman, called *samam* in the second half of the verse), "Gleichmut" (M.) and "disinterest" (v B.) I follow the latter two interpretations, in which *sāmya* agrees with *samadarśinah* in the preceding verse rather than with *samam brahma* in the second half of the present verse. See also vs. 20 which illustrates the Gītā concept of *samatva*.

21. *sa brahmayogayuktātmā sukham akṣayam aśnute//*

The compound *brahmayogayuktātmā* admits of several interpretations. S. freely translates "intimement uni à Brahman" (as if *yukta* would mean 'united with'), but cf. vs. 6 and 7 where *yukta* in the compound *yogayukta* refers to exertion. R. 's rendering "self-controlled in Yoga on God (Brahma)" more correctly interprets the participle *yukta*, but the connection with *(brahma) yoga* looks quite different from *yogayukta* in vs. 6 and 7 (where he translates "earnest in yoga (the way of works)" and "trained in the way of works"). Z. directly takes *yukta* with *brahman* and translates "[his] self in Brahman integrated by spiritual exercise", a doubtful analysis of the compound in which moreover the interpretation of *yukta* is hardly acceptable. Z. criticizes the rendering "uni" of S., but I do not see much difference with "integrated in". M. correctly interprets *yukta* as "bemüht", but his translation of *yoga* with "Vereinigung" does not convince : "Wer mit dem Selbst um die Vereiningung mit dem Brahman bemüht ist". In v.B. 's translation "his spirit yoked with the yoga of Ibrahman" the difficult terms *brahman* and *yoga* are taken together in Tatpurusa compound, as also appears from his note : "*Yoga* here in the sense of the unifying knowledge of the *brahman/ātman*" (which perhaps means that just like M. he takes *yoga* as unification).

So we see that some translators interpret *yoga as* 'becoming united with (Brahman)', whereas on the other hand *yoga* has also been taken as a particular method of salvation. The preceding and immediately following context deals with the central doctrine of the Gītā: *karmayoga + samatva.* So I think that *yogayukta* used in the compound of this verse should not be disconnected from *yogaykta* in vs. 6–7.

The term *yoga* then should be taken as a form of *karmayoga,* i.e. disinterested activity. The term *ātman* at the end of the compound should be taken with *yukta* and has a function similar to that in *viśuddhātmā* and *vijitātmā* in vs. 7: "having concentrated oneself". The object of this concentration is *brahmayoga,* a specification of the (*karma*) *yoga* of the Gītā. The compound *brahmayoga* more or less denotes the same as *brahmakarma* in IV, 24, since in the Gītā *karma* is *yoga* ("exertion, activity") as well as symbolic sacrifice aiming at Brahman rather than at the deities. The compound means : "having concentrated oneself on works aiming at Brahman".If *brahmakarmasamādhinā* (IV, 24) should be taken as an adjective, it forms a striking parallel with *brahmayogayuktātmā,* in which *yuktātman* = *samādhi* ("concentrated") and *yoga* = *karman.*

> 23. *śaknotīhaiva yaḥ soḍhum prāk śarīravimokṣanāt/*
> *kāmakrodbhodbhavaṃ vegaṃ sa yuktaḥ sa sukhī naraḥ/*

Most translators take *ihaiva* rather redundantly with *parāk śarīravimokṣaṇāt* as 'here on earth'. Though he interpreted *ihaiva* as "While yet in this world" in vs. 19, Z. may be right in taking *ihaiva here* as referring to the man in the world : "Only the man who [remains] in this world". Even such a man can be regarded as a Yogin : *sa yuktaḥ,* translated with "un homme intérieur" (S.), "a yogin" (R.), "[truly] integrated" (Z.), "(mit dem Brahman) vereint" (M.), "yoked" (v.B.). I follow R. 's translation which in combination with Z. 's interpretation of *ihaiva* gives the best sense : the man in the world who by his concentrated exertion (*yoga*) is the real Yogin (a term used in the next verse).

25. ... *sarvabhutahite ratāḥ//* might refer to compassion, and idea which does not suit the concepts of *samatva* and disinterest. S. translates "ne se passionnent que pour le bien de tous les êtres", as if compassion would be the only passion allowed. See also Z. 's note: "Total detachment from the world is not incompatible with a general benevolence. (...) The emphasis on compassion and benevolence is new, since in the Upanishads we hear rather more about transcending good and evil (...) and this may be due to Buddhist influence" However, *sarva* at the beginning of this compound excludes *saṅga* and implies *samatva.* See also XII, 4, where in one and the same verse *sarvabhūtahite ratāḥ* as well as *sarvatra samabuddhayaḥ* is found. Cf. also vs. 18 on the *paṇḍitāḥ samadarśinaḥ.*

25-28 seem to contain an enumeration of human beings other than the man in the world performing *karmayoga,* who are also qualified for *mokṣa* such as Ṛṣis (25), Yatis (26), performers of Yoga-exercises (27), Munis (28). On the other hand 23-24 may refer to the man in the world, though vs. 24 calls him a Yogin. Are the other terms like *ṛṣi, yati, auni* also symbolically used for denoting the ideal man in the world? Note that the Yatis (ascetics) of vs. 26 are called *yatacetas* and *kāmakrodhaviyukta,* qualifications which are not typical of ascetics, but may be used for the ideal man in the world according to the Gītā. The same may be observed on the Muni of vs. 28. The last verse of this book (29) even grants *mokṣa* to everyone who knows Kṛṣṇa to be the Lord the world, the friend of all beings and the enjoyer (or receiver of the effects) of sacrifices and asceticism. Perhaps

we should interpret 24-29 as mainly referring to the man in the world living according to the doctrine of the Gītā.

The genitive *yajñatapasām* (vs. 29, depending on *bhoktāram*) can only be taken as a Dvandva compound. So asceticism just like sacrifice forms one of the paths leading to God. In IV. 10 there is a reference to *bahavo jñānatapasā pūtā madbhāvam āgatāḥ* and the compound *jñānatapasā* is interpreted by some translators as a Tatpuruṣa or Karmadhāraya. Apparently *tapas* 'asceticism' can occur in contexts mainly dealing with the central theme of the Gītā : *karmayoga.*

The Enduring Story of Rāma

Harry M. Buck

"As long as the mountains and rivers shall endure, so long will the story of the Rāmāyana be told", was Lord Brahma's promise to Vālmīki. Indeed, from the Arabian Sea to the Pacific Ocean the Living *ayana* ['story'] of Rāma– not simply in canonical text– is acted, told, and danced in widely varying forms that meet human needs in diverse cultures. Thus the story has been told in many forms.

In the 3rd century Before Christian Era (B.C.E.) Emperor Asoka exported Buddhism to Sri Laṅkā (then called Ceylon). Along with stories of the Buddha, however, went Rāma's stories. Buddhist literature abounds with references to Rāma and his exploits, chiefly in the *Lalita-Vistāra*, the *Lankāvatāra-Sūtra*, and several *Jātaka* Tales. Aśvaghosa (1st and 2nd centuries C.E.), the famous Buddhist poet who produced the *Buddhacarita*, was inspired by the *Rāmāyana's* ornate form. In many of these writings, Rāvaṇa is hardly recognizable in the *rākṣasa* Vālmīki described. In the *Lankāvatāra Sūtra*, for example, the Buddha preaches of Rāvaṇa's benefit, and Rāvaṇa discusses duality and nonduality.

The *Sama Jātaka* explains why so much sorrow come to Daśaratha. The *Vessantara Jātaka* describes Rāma's departure to the forest, the basis of dramatic presentations, particularly in Myānmār (formerly Burma) and Tibet. The *Jayaddisa Jātaka* contains a verse that refers in Rāma's banishment in Dandaka forest. The *Sumbula Jātaka* and *Mahāpadaranga Jātaka* also include stories of Rāma. Among the *Jātaka* Tales the most elaborate story of Rāma is in the *Daśaratha Jātaka*.

In the story Daśaratha's wife bore two sons and a daughter: Rāma, Lakkhana, and Sītā. When the queen died, her successor bore Bharata. The king had granted her a boon, which, like Kaikeyī, she then demanded. Although the king persuaded his sons to go to the forest for the twelve years an astrologer had told him he would live, he died in nine. Bharata refused the crown and went to inform of these events. The central focus is Rāma's equanimity on hearing of these sad events, contrasting him with his brother and sister who fainted on hearing the news. The *Jātaka* concludes with a poem in which Rāma explains suffering and impermanence. Customary identifications are made : Daśaratha was Gautama's father; Sītā, the Buddha's wife; Bharat, Ānanda; and of course, Rāma, and the Buddha.

Other glimpses of Rāma are woven into Lankan life. At Kelaniya a Buddhist temple combines Hindu and Buddhist motifs, and there is a nearby shrine to Vibhīṣana, Rāvaṇa's brother, A Sinhalese healing ritual, the *Kohomba Kankariya*, depicts Sītā telling Rāvaṇa that she would be chaste for three months, after which

she would yield to him and recalls an incident in which she received the sentence of death from quite innocently drawing a sketch of Rāvaṇa. However, a commentary on the Buddhist *Majjhima-nikāya* (5th century C.E.) describes stories about Rāma as "frivolous and useless talk" that may keep common people from preferring Buddhist stories.

In Buddhist Thailand (Siam), Hindu influence, particularly the figure of Rāma, is strong. This legacy came primarily from the Tamil tradition. Tamil mantras were recited over the kings and used in other contexts. The story of Rāma legitimated the power of nine kings who bore his name, and the king was regularly presented with golden sandals, representing the *pāduka* ['sandals'] that Rāma's brother placed on the throne. For a time the capital was located in Ayodhyā, a city founded by King Rāmabodhi I, and the Thai *Rāmakien* ['Honor of Rāma'] prospered under royal patronage. Here an incarnation of Narayanan was sent from heaven by Siva to fight the powers of evil, lead by Totskan ['Rāvaṇa']. The Indian origin of the story largely ignored, it was considered a Thai story The poetic version of King Rāma I (1807), founder of Bangkok and the current dynasty, was particularly useful in legitimating royal power. Rāma is seen here not so much as a conqueror but more like a sage. Sītā is the daughter of Rāvaṇa, whose wife was the incarnation of Goddess Laksmi.

In this version Śiva, ruler of gods, giants, and men, created both the forces of good and evil, in conflict with each other. The royal hero, then, defeats evil and establishes good. However, the most prominent character is Hanumān, whose exploits, are detailed in elaborate murals– 178 panels– in the Temple of the Emerald Buddha in Bangkok, including the portrayal of Hanumān's tail as the bridge between India and Laṅkā. Artistic representation surpasses the power of literary versions, not only in these frescoes but also in drama, particularly the classic performances staged with leather puppets. In theatrical drama, actors portraying monkeys and demons wear masks; those portraying men and gods do not.

Indian culture spread to Laos from the first century C.E., and in 500 years the Rāma story gained so much popularity that Vālmīki was regarded as an *avatāra* of Viṣṇu, with temples erected in his honour. Here also, the story of Rāma is intertwined with the life of Buddha. Manuscripts from the seventh to the thirteenth centuries and illustrative frescoes on the walls of Buddhist temples add many elaborations, and the Buddha is represented as telling and commenting on the story. In some cases Rāma is seen as a previous Buddha, Rāvaṇa as Devadatta, and Sītā as Yashodārā. There is an explicitly Buddhist version, the *Rāma Jātaka*, in which Hanumān assumes human form sharing the throne with Rāma. The story takes place in Laos itself, and it is thus, not regarded as a foreign tale.

In Cambodia [Kāmpucheā], Hindu invaders formed a hierarchy later displaced by Buddhist from Siam. Syncretisms developed between Buddhist and Hindu ways of life and worship, and even between Siva and Viṣṇu. The Cambodian *Rāmakīrti* ['Glory of Rāma'] bears a close relationship to the Indonesian version, even though there is evidence that the Vālmīki version was known, and there is

even a temple of Vālmīki. In this telling, Sītā came not from a furrow but floated Venus-like down the Yamunā River. Rāma is not only an avatāra of Viṣṇu; he is also a *bodhisattva* and Buddha's precursor. In one scene, in the midst of a devastating drought, wherever Rāma steps life is restored because of his *bodhi* nature.

A crescent-shaped group of islands stretches from the tip of the Thai peninsula through the Philippines, including the diverse cultures of Mālaysiā, Sumatra, and Jāvā. By the sixth century C.E. the Rāma story was evident in Malaya, and some inscriptions and textural references could indicate its presence perhaps as early as the fourth century.

In Indonesia there seems to have been a conscious attempt to domesticate the story, severing it from its Indian connotations and references. As recently as 1961, a Jakarta publisher brought out a book entitled *Rāmāyana, Our National Reader*, the title of which suggest that the foreign origin of the story was completely forgotten. The Javanese *Rāmāyana Kakavin* from the early tenth century C.E. was probably derived in part from the Bhatti *Kāvya* (sixth or seventh century C.E.). In a version credited to *Yogiśvara*, Rāma is an avatāra of Viṣṇu. Rāvaṇa, however, is a devotee of Śiva, echoing the rivalry of the Śiva and Viṣṇu cults.

Shadow puppets and dance-drama in Jāvā and Bali spread the story of Rāma more effectively than books. But in time the *Hikayat Seri Rāma* appeared. This version pays prominent attention to Rāvaṇa, his austerities and genealogy. Islamic influences also appear, and Adam and Allah are mentioned. In Bāli there is also a famous dance routine, the *Ketjak*, a lively and fast-moving series of chanted sounds accompanying it, which can induce a trance, and is thought by some to be a kind of exorcism rite.

The *Serat Rāma*, a versified version from the nineteenth century C.E., is the source for most of the dramatic renditions. Of the 200 versions of the Rāma story, the most significant are the *Kakavin* and the *Uttara Kāṇḍa*. A more popular group consist of the *Rāma Kling*, the *Rāmāyana Sasak*, the *Rāma Nitas*, and the *Serat Kandam*, where Adam, Noah, and even Satan figure in the story. This is also a poetic version dating from the ninth century.

Indeed, as Vālmīki foretold, the "*story of the Rāmāyana*" has been told and retold throughout all of South-East Asia, in poetry, prose, drama, dance, sculpture and festivals.

The Four *varṇas* in the Yajurveda*

Uma Chakravarty

An attempt has been made in this article to ascertain the status of the four *varṇas*, i.e. *brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya* and *śūdra* in the society as reflected in the *Yajurveda* which belongs to the later Vedic literature. *Maitrāyaṇi, Taittirīya (Kṛṣṇa and Śukla), Kāṭhaka* and *Kapiṣṭhala* are the four branches of the *YV*. That this Veda chronologically follows the *ṚV* becomes evident from the fact that it often quotes from the *ṚV* but not vice-versa. Jan Gonda has rightly titled this Saṃhitā as 'Liturgical Saṃhitās' as the ritual forms the principal theme of it.

The geographical backdrop of this Saṃhitā literature proceeded from the west towards the east, i.e., from the bank of river Sindhu towards the river Yamuna: the Madhyadeṣa, i.e. the land of Kuru-Pañcāla[2]. In the mythological scene also one observes the rise of Prajāpati; the Ṛgvedic Rudra is named Śiva, Śaṇkara, Mahādeva[3]. One notices the rise of Viṣṇu in prominence; he is often identified with the sacrifice[4]. Though the language in this branch of literature represents a later stage, the mantra portion on the whole agrees with the *ṚV*[5]. Some *Yajurveda-mantras* are borrowed verbatim from the *ṚV*[6]. In this phase of the Vedic literature sacrifice earned more importance than the gods invoked in it. Correct performance of sacrifice became the most important point in the rituals[7]. Simultaneously, the officiating priests, the actual performers of the sacrifice, i.e. the *brāhmaṇas'* supremacy rose to the highest in the religious life. "Thus the ritual could not fail to become more and more of a mystery to all who did not belong to *Brāhmaṇa* caste".[8] The words *rājanya, vaiśya* and *śūdra* which occur only once in a late Ṛgvedic hymn (X.90.12) entered into regular vocabulary in the later Saṃhitās[9].

A scrutiny of the *YV*-related literature will enlighten us in the matter as to how the *varṇa* based society headed towards a *jāti* (caste)-based one through mixed marriages and other allied situations placing the *brāhmaṇa* at the uppermost position and the *śūdra* at the lowest rank.

A survey of the status of the four varnas :
BRĀHMAṆA : the supreme

According to the *TaiS* VI.6.1.3-4 *brāhmaṇa* a seer (*ṛṣi*) is born of a seer (*ārṣēya*) and a learned man[10]. *Brāhmaṇa* is right, honest, *brāhmaṇa* truth, so is Agnihotra. So, the Agnihotra rite is to be performed by a *brāhmaṇa*[11]. *TaiS* 11.5.11.9 : 'If a

* This article was prepared during the period of my fellowship (2002-2004) sponsored by the Indian Council of Historical Research. New Delhi. I express my thanks to the Council.

Brahman and non-Brahman have a litigation, one should support the Brahman'[12] *(Keith) According to the TaiS 1 7 3 1* the Vedic man believed in two types of gods the first type is delighted by the offerings offered to them in the sacrifice and they are invisible, the second type consists of the *brāhmanas* who are pleased with sacrificial fee They mend the rent in the sacrifice, they make that otherwise whatever is harsh or is injured [13] Similar idea is borne by *MaiS* (1 4 6), there are two types of gods the ones who eat oblations (*hutāda*), i e the gods who are invoked in the sacrifice and accept the oblations and the other who do not eat the oblations (*ahutāda*)[14], i e the human gods, the priests ' one should not revile a *Brahman* nor strike him for so great is his sin '[15] (Keith) The same Samhitā tells us (that the creator) makes a discrimination (*vibhaktim*) and he makes the holy power, i e , the *brahma* [16]

Brāhmaṇa raised to the status of divinity

The Vedic life flourished centering on their religious performances sacrifices in honour of the gods seeking material achievements like progeny, annihilation of enemy, achievement of sovereignty, the coronation of the king etc Many optional rites (*kāmyesti*) were also observed for the fulfillment of some specific desires The householders not belonging to the priestly class were not entitled to offer any oblation directly to the gods The priests who usually were *brāhmanas* were the mediators between the gods and the sacrificer Consequently, the priests played the most vital role in the Vedic religious life If the priests by their perfect performance of rituals could please the gods then only opened the path to the fulfillments of the sacrificer's desires Such was the belief of the Vedic man The priest was next to gods, or gods themselves

A few instances in this regard

Agni

agnir vai brāhmanah	*KāthS* VI 6
āgneyo vai brāhmanah	*ibid* VIII 10
Brāhmana belongs to Agni	
agnir vaiśvānaro yad brāhmanah[17]	*TaiS* V 2 8 2

Soma

saumyo vai brāhmanah	*MaiS* 1 9 5, 11 1 4[18]
The *brāhmana* belongs to Soma	

Brhaspati, Brahmanaspati[19]

Off all gods Brhaspati is the closest to the *brāhmana* and in maximum number he is identified with this deity *brahma vai brhaspatih* [20] We read this sentence in course of narration of the *ratnins* in a Rājasūya sacrifice The *ratnins*[21] from the word *ratna* are the strengtheners of the king Of the eleven *ratnins* the *brāhmana* is one As to the residences of the other *ratnins* the priest goes also to the *brāhmana's* residence with his share of oblation The *brāhmana's* oblation is

bārthaspatya caru because *brāhmaṇa* is Bṛhaspati : *brahma vai bṛhaspatiḥ (MaiS* IV.3.8). *Brahma is ṛc* (*brahma vāṛc ibid* III.2.5)

Prajāpati

Prajāpatiḥ prajā asṛjata brahmamukhā eva (*TaiS* V.2.7.1) 'Prajāpati created the creatures with the *Brahman* class at the foremost.' (Keith). According the *MaiS* IV.8.3 the *brāhmaṇa* belongs to Prajāpati. (*prājāpatyo vai brahmā*).

Brahma = Brahman (= Brahmā, the highest god)

In the process of an optional sacrifice (they) all hold the hand of the sacrificer (here a *brāhmaṇa*) and utters : *brahma vai brahmā* and thus lengthens the life of the *brāhmaṇa* (sacrificer)[22].

The gods of the brāhmaṇas

Five are the deities of the *brāhmaṇa*. This is not an usual phenomenon. Here lies the supremacy of *brāhmaṇa* : *panca vai brāhmaṇasya devata agniḥ somaḥ savitā bṛhaspatiḥ sarasvati* (*MaiS* IV.5.8). Here lies the reason for other people's following the *brāhmaṇa* : they have the maximum number of gods.

Centering on sacrifice the religious life of the Vedic society developed. Along with time the sacrificial processes became more and more complicated. Consequently, it became the monopoly of the priestly class, i.e. the *brāhmaṇas*, to administer the rituals. In the world of sacrifice the indispensability of the *brāhmaṇas* was firmly established.[23] Such a situation placed the *brāhmaṇas* at the topmost rank in the religious world. Even the royalty had to bow down to him for the fulfillment of his life as a king. They were also the composers of the scriptures.[24] So they strongly fortified their status and attempted to keep the royalty (*kṣatra*) next to them whose religious life was possible only through the supervision of them.[25]

Brahma-Kṣatra

Brāhmaṇa belongs to Brhaspati, the god of words, knowledge and spirituality and *kṣatra's* deity is Indra, Varuṇa, Soma. Indra is the paradigm of martial power : 'Thence verily arose both sanctity (*brahman*) and dominion (*kṣatra*); they said : Whom shall we enter? Let sanctity enter Bṛhaspati [and] dominion Indra : thus verity it was said'.[26] (Whitney)

Simultaneously with the progress of Aryan settlement in Indian soil the society also developed, especially, the higher two *varṇas* centering around their religious life which was rooted in ritual performances. The *kṣatra* was administrative authority and *brahma* the master of religious matter and spirituality. The belief of these two higher *varṇas* was : by dint of the rightful performance of rituals they achieve all ends of life : progency, heaven (*Tāṇḍ Br* XVI. 15.5 : *svargakāmo yajeta*) annihilation of enemy, prosperity and what not. And, the accurate performance of rituals was possible only through the supervision of priestly class. When such was the situation with most important function of life

so, naturally, the priestly class (i.e. the *brāhmaṇa*) was placed at the topmost position. On the other hand, the priestly class had to depend on the royalty (*kṣatra*) for their livelihood for a comfortable life. As a result, the royalty had to pay the priestly class gift (*dakṣiṇā*) in profuse. Consequently, a relationship of harmony and strain (tension) existed all long among them as it was rooted in vested interest.

A look at the *brhma-ksatra* relationship will make our point clear. The following goes about the Rājasūya sacrifice already referred to. The priest goes to the *brāhmaṇa ratnin's* residence on the day before the actual sacrifice and offers *caru* (an oblation of barley, rice and pulse boiled with butter and milk) to Bṛhaspati. Through this offering the kingdom prospers; the *brāhmaṇa* is in the forefront of the kingdom and the brahmanical power subordinates the kingdom (=royalty) (*brāhmaṇa eva rāṣṭram anukaṃ karoti*).[27] *MaiS* (11.4.2) illustrates in an interesting way the superiority of the *brāhmaṇa* to *kṣatriya* : Half of Prajāpati was patience (*dhairya*) and the other half foolishness (*mālya*). Patience was placed in the forefront and the foolishness at the rear. Patience is Soma, and Prajāpati created *brāhmaṇa* from Soma. Therefore the *brāhmaṇa* is calm and quiet and from *mālaya rājanya* was created. So, the senior, the junior, the daughter-in-law and the father-in-law drank *surā* together and talked wildly. That is however, sinful. Hence a *brāhmaṇa* should not drink *Surā*. If, however, a wise person drinks it that does not affect him.

We intend to have a look at the very close, friendly, mutually indispensable relationship between nobility and royalty.

As the different branches of the *Yajurveda* are abound with texts bearing testimony to the friendly, co-operative relationship between these higher two *varṇas* we intend just to give a hint to it for the sake of brevity. This relates to the Soma sacrifice. The *Aindrabārhaspatya* is to be offered with the desire that *brahma* and *kṣatra* function co-operatively.[28] *TaiS* III.3.1.1 states in connection with the supplementary cups of *Soma* : 'O Indra full of force, be thou full of force among the gods make me full of force, of long life, radiant among men; for the force of brahmanhood and royalty do I offer to thee.'[29] (Keith). An oft-quoted mantra praying for the well-being of *brahma* and *kṣatra*, of course with variation in language here and there, occurring in the liturgical Saṃhitās and the *AV* is :

Saṃśitam me brahma Saṃśitam vīryaṃ valaṃ
saṃśitaṃ kṣatraṃ jiṣṇu yasyāham asmi purohitaḥ /
ud eṣām bānū atiraṃ ud varca ud balam
kṣiṇomi brahmaṇā amitrān unnayāmi svam aham.//

TaiS IV.1.10.3

'Sharpened is my holy power,
Sharpened the strength and might,
Sharpened the conquering lordly power of him
Whose domestic priest I am.
Their arms have I uplifted.
Their radiance, their might;

With the holy power I waste the foes,
I support my own.'[30] (Keith.)

yatra brahma ca kṣatraṃ ca samyañcau carataḥ saha /
tal lokaṃ puṇyam prajñeśaṃ yatra devā sahāgninā //

ŚYV (M) XX.25

'Where priestly rank and princely power together in accordance move
Fain would I know the holy world where Deities with Agni dwell.'[31] (Griffith)

The following is an oft-quoted joint prayer for the well being and prosperity of *brahma* and *ksatra* :

brahmāvaniṃ tvā kṣatrāvaniṃ suprajāvaniṃ rāyaspoṣavaniṃ //
paryūhāmi brahma dṛṃha kṣatraṃ dṛṃha prajā dṛmha rāyaspoṣaṃ dṛṃha//

TaiS 1.3.1.2[32]

'Thee that art winner of *Brahmans*, winner of nobles, winner of fair offspring, winner of increase of wealth, I close in.

Strengthen the *Brahmans*, strengthen the nobles, strengthen the offspring, strengthen increase of wealth.' (Keith).

'Verily by means of the holy power-he quickens the kingly power, and by the kingly power the holy power; therfore a *Brahman* who has a princely person is superior to another *Brahman;* therefore a prince who has a *Brahman* is superior to another prince.'[33] (Keith). *Brahma* is established in *kṣatra* and kṣatra is established in *brahma*.[34]

So far we have noted a cordial, wholesome relationship between *brahma* and *kṣatra*. This, however, is not the picture of the *brahma-kṣatra* relationship in its totality. *MaiS* 11.2.3 manifests in clear terms the other side of this relationship. This goes about the piling of the *Gārhapatya* fire. The fire which after being arranged carried to the *Gārhapatya* fire, is *kṣatra* and that which is placed in the fire-pan with utterance of *yajus* is *brahma*, so *kṣatra* is united with *brahma* but is again separated. They became two tigers. Those ferocious two are capable of inflicting harm to the sacrificer Therefore, in order to pacify them, to make them function towards the well-being of the sacrificer *bhavataṃ naḥ samanasau samokasau sacetasu* etc. is to be recited.[35] In the Vedic hierarchy it was the convention to place the *brāhmaṇa* at the top to be followed by the other three *varṇas : rājanya, vaiśya* and *śūdra*. But in places, though very few, the *kṣatriya* is placed at the topmost position. In this regard we intend to refer to the *TaiS* text (II.5.10 1); this goes about an optional sacrifice belonging to New and Full moon Sacrifice : 'In the case of a Rājanya let him repeat the *tṛcas* thrice; three other sorts of men are there besides the warrior, the *Brahman, Vaiśya* and *Sūdra*; verily he makes them obedient to him.[36] (Keith).

VAIŚYA

Except for ṚV X.90.12 the word *vaisya* never occurs in the ṚV. The word *vis*, however, occurs many a time. In the later Saṃhitās like *MaiS, TaiS* etc. *vaiśya* became a part of the regular vocabulary,[37] meaning people, subjects etc. belonging

to the third category of the four *varṇas*. The *vaiśyas* were the Aryan general mass, the people, belonging to the working class mainly agriculturists, herdsmen, traders etc.[38] The Maruts, the group deities, the divine subjects (*devaviśaḥ*) were their gods.[39] They were materially prosperous[40]. *MaiS* (IV.2.10) tells us that not only the *vaiśyas* but the *śūdras* were also materially prosperous. The gist of the passage referred to is : if a *vaiśya* or a *śūdra* is materially highly prosperous (*bahupusta*) twenty-one cows are to be collected from their cow-shed and the same number of offerings are to be offered in the fire : twenty-one are the worlds of men (*manuṣyalōka*). So from the world of men the animals were to be obtained and offered in the fire.[41] The *MaiS* passage as narrated above leads us to think that the sacrificing people were at liberty to utilise the property of the lower two *varṇas* whenever they needed the same for the sacrificial purposes.

brahama-viś/vaiśya

MaiS (II.2.3) gives us a glimpse of desired relationship between *brahma* and *vaiśya*. This relates to a *kāmyēṣṭi* (optional sacrifice). If it is so desired that the *brahma* be full of strength then an offering should be offered to Brahmaṇasapati which should be accompanied by *marutvatī yājvā* and *anuvākyā*. *Brahma* (= *Brāhmaṇa*) is Bṛhaspati and the subjects/people are the Maruts. This ritual will make the people totally lost in the *brāhmaṇa* so that the *brahma* be strengthened and not slackened.[42]

kṣatra-viś

MaiS II.5.7 prescribes a *Kāmyēṣṭi* for *rājanya* (probably a king/chief) in order to subjugate the *viś* : to employ them in their service and to subjugate them (cf. the verb *upayunakti* in the text). *Rājanya* belongs to Indra and *viś* to the Maruts, the associates of Indra. In this rite an animal with spotted thigh is to be offered as oblation[43]. The relation between *kṣatra* and *viś* was desired to be like that of a *sajāta* ('kinsmen)[44]. The king is established in his subjects (*viśi rājā pratiṣṭhitah: MaiS* III.3.8)

brahma-kṣatra-viś

MaiS (IV.7.8) classifies the three *varṇas* : the higher two are the *brahma* and *kṣatra* and below them is *viś*. In the days of yore *brahma* was superior to all people. Others were his subordinates. *Kṣatra* is Indra and the *viś* are the Maruts. The *viś* were subordinated and were employed in the service of *kṣatra*. Indrāgnī is strength (*ojas*); through strength they possessed *viś* (*parigṛhṇāti*). *Brahma* and *kṣatra* function in co-operation. As Agni and Indra are the most revered among the gods so were the *brāhmaṇa* and the king (*rājā*). The *vaiśyas*, however, had a place in the ritual based society. They had even the right to the Rājasūya sacrifice.[45] The *brāhmaṇas* were excellent (*vasīyas*), the *ksatra* the splendid (*śreyas*)[46] and the *viś* prosperous (*bhūyas*).[47]

MaiS IV.9.9 is a joint prayer for the well-being of the three *varṇas* chanted during the time of Pravargya sacrifice : *dharmam asi dharmam asme brahmaṇi dhāraya kṣatraṃ dhāraya. viśaṃ dhāraya* .[48]

ŚYV (M) XXXVIII.14 (= *ŚYV [K]* XXXV.2.8) also prays for the three *varṇas* in the Pravargya rite :

'Overflow for food, Overflow for energy. Overflow for the Priesthood. Overflow for the Nobility. Overflow for Heaven and Earth. Thou, O Duteous one, art Duty, Innocent one, in us establish manly powers, establish the People'.[49] (Griffith.)

From the fore-going deliberation it becomes clear that the *vaiśyas* were in the third position from the point of social status in the epoch of the later Saṃhitāś of the Vedic age. But, simultaneously they held a not to be neglected status, as based on their riches, prosperity which they earned by their manual labour mainly, agriculture, cattle-rearing etc. the higher two *varṇas* led materially comfortable life. In the society under our discussion the *vaiśyas* were the only givers in the form of *bali* (cf. *balihṛtaḥ TaiS* 1.6.2.1 ; *MaiS.* 1.4.1 etc.). The higher two *varṇas*, i.e. the *brāhmaṇa* took in the form of gift (*dakṣiṇā*) and the *rājanya* received *bali*, i.e., tax from the *viś*.

ŚŪDRA

Following the Ṛgvedic tradition (X.90.12) *TaiS* VII.1.1.4-6 narrates a creation myth. The gist of the myth is : *brāhmaṇa* was created from Prajāpati's mouth along with many other related objects, *rājanya* form his breast and arms, *vaiśya* from the middle part of his body and from his feet was created *śūdra*. Along with the first three *varṇas* were created their respective gods, metres, animals etc. *Brāhmaṇa's* god was Agni. *rājanya's* Indra. *vaiśya's* Viśvedevāh. But for the *śūdras* no god was created. As the *śūdra* was not created after any god. (*śūdro yajña anavkaḷapta na hi devatā anvasṛjyata*) so he had no right to sacrifice.[50]

KāṭhS (XXXI.2) denies *śūdra* the right to milk the cow in the Agnihotra sacrifice because he is born of untruth (*asat*); by milking the cow he will violate Truth. The same Saṃhitā (XI.10), already referred to, debarred the *sudra* and the woman the right to *karīrēṣṭi*.[50a] *ŚYV (Kā)* XXV.6.11 states that if a deer eats barely plant, it does not grow well. Similarly, a *śūdra* paramour for an Aryan woman is not supportable.[51]

(*Puruṣa-medha*)

This hymn enumerates people belonging to different professions and also to different classes in its twenty-two verses. About eighty professions right from the priest to the *puṃścalu* (harlot) have been included in this list. All those people practising multifarious professions were brought to the sacrificial ground of the *Puruṣamedha* for a formal dedication. Some of the people practising different professions were; harlot (*puṃścalū*), public dancer (*śailūṣa*), car-builder (*rathakāra*), carpenter (*takṣan*), potter (*kulāla*), dog-leader (*śvanin*), physician (*bhiṣaja*), gambler (*kitava*)[52] so on and so forth. One is bound to wonder at the minute division of professions. To quote one example : the fishermen were classified according to the type of water they fished; *dāsa* (standing water), *vaiṃda*

(reed-beds), *śauskala* (for the opposite bank one who groped for fish), *kaivarta* (for this bank), *ānda* (for fords), *maināla* (for shallow water) etc. We wonder at the minuteness of their fishing skill by which they could discover what type of water was needed for growth, breeding etc. for what type of fish.[53]

These eighty or more professions practised by people belonging to different social groups and also the other related elements as present in this Saṃhitā indicate its late origin. especially, the last twenty-five hymns.[54]

Variety of professions, classification of people hint at mixed marriages in permutation and combination among the four *varṇas* and also marriages between the Aryans and earlier indigenous people (*niṣādas*) belonging to different tribes. The religious, social, ethnological conditions as reflected in the *YV* and especially in the *ŚYV* had immensely changed from those of the ṚV, particularly, the earlier texts of the ṚV.

In different branches of the *Yajurveda* literature one observes categorization of deities, metres, seasons, drinks, colour according to the status of the four *varṇas*:

DEITIES

Brāhmaṇa	Agni, Soma
Ksatriya / rājanya	Indra
Viś / vaiśya	Viśvedevāḥ, the Maruts
Śūdra	Pūṣan[55]

METRES

Brāhmaṇa	*Gāyatri*
Kṣatriya / rājanya	*Triṣṭubh*
Viś / Vaiśya	*Jagatī*
Śūdra	*Anuṣṭubh*[56]

SEASONS

Brāhmaṇa	Spring
Kṣatriya / rājanya	Summer
Viś / Vaiśya	Autumn[57]

DRINKS

Brāhmana	milk
Kṣatriya / rājanya	*yavāgū* (gruel)
Viś / Vaiśya	*āmikṣā* (curd)[58]

The colour white is attributed to the *brāhmana.*[59]

So far our knowledge goes *MaiS* IV.8.6 is the first Vedic literature to state in clear terms that there are four types of people *brāhmaṇa, rājanya, vaiṣya* and *śūdra* : *catvāro vai puruṣā brāhmaṇo rājanyo vaiṣyah śūdraḥ* / The same Saṃhitā (III.4.8 = *ŚYV* [M] XVIII.48) prays for the resplendence for these four type of people :

rucaṃ no dhehi brāhmaṇeṣu
ruccaṃ rājasu dhāraya /
rucaṃ viśveṣu śūdreṣu
mayi dhehi rucā rucam //[61]

'Give lustre to our holy priests, set lustre on our ruling chiefs : lustre to vaiśyas, Śūdras : give, through lustre; lustre into me.'

There was clear hierarchical differences among people in the society but they were not alienated from each other on the ground of commensality and connubiality which are considered to be the characteristic features of the caste (*jāti*).

SUMMING UP

The *Yajurveda* forms the contents of the later Saṃhitās. In this phase of Vedic literature we observe a change in the geographical, religious, mythological and social background from that of the ṚV. There is at the same time no denying the fact that the Ṛgvedic verses in places of this literature were quoted verbatim, sometimes of course with minor changes in diction. The gods occupied the topmost place in the Ṛgvedic text whereas in the Yajurvedic literature rituals and the priests : the actual performers of the rituals, became the most important topic. The belief that the accurate observance of the rituals materializes the sacrificer's religious ends attributed the highest importance to the priest, i.e. the *brāhmaṇa.*

The four *varṇas : brāhmaṇa, kṣatriya / rājanya, vaiśya* and *śūdra* were clearly placed in their hierarchical status. The words *vaiśya* and *śūdra* occurring only once in the *Ṛgveda* (X.90.12), now become a part of the regular vocabulary The place of *brāhmaṇa,* the actual performer of the rituals, was placed at the apex; they were often identified with gods like Agni, Soma, Bṛahaspati, Brahamaṇaspati, Prajāpati and Brahman. *Rājanyas* (i.e., the royalty) who were in most cases the sacrificer, depended on the priestly class for the achievement of their religious ends. They in return were bound to pay gifts (*dakṣhiṇā*) profusely in gratification. Both nobility (*brahma*) and royalty (*kṣatra*) became indispensable for each other. As this relationship was based on vested interest consequently, there prevailed a tension in it which was reflected in many places of the *YV* (*MaiS* II.2.3: *TaiS* V.2.4.5 et al).

Though *brāhmaṇa* occupied the highest status, however, instances are there that in places they were placed next to the *rājanya* (*TaiS* II.5.10.1) also. Of the four *varṇas* the *vaiśyas* were materially the most prosperous. It was the objective of the higher two *varṇas* to keep them under control and to have the benefit of their prosperity. They performed optional sacrifices (*Kāmyeṣṭi*) in order to achieve this end. The Vedic seers, notwithstanding, prayed for the well-being of all the four classes of people (*MaiS* III.4.8).

As the *śūdra* was born from the feet of the creator so he had no god, consequently, no right to sacrifice. He was destined to serve the higher *varṇas* being on his feet.

ŚYV (M) XXX supposedly belonging to a late period, gives a long list of people of different classes and professions in course of dealing with the *Puruṣamedha* sacrifice. About eighty types of profession practised by 184 classes of people have been enumerated. This speaks of intermixture of marriages. Sources of the emergence of *jāti* (caste) can be perceptibly traced in such mixed marriages Categorization of the deities, metres, seasons, colours, drinks etc according to the *varṇa* clearly suggest the hierarchical classification of people of the contemporary society.

A transition from the Ṛgvedic mythology to the Brahmanic ritualism is manifestly observable in the Yajurvedic texts. Presumably, the process of transition took considerably a long period.

Abbreviations :

AV (Ś)	*Atharva-veda*
KāṭhS	*Kāṭhka-Saṃhitā*
MaiS	*Maitrāyaṇī-Saṃhitā*
ṚV	*Ṛgveda*
ŚYV (K)	*Śukla-yajurveda (Kāṇva)*
ŚYV (M)	*Śukla-yajurveda (Mādhyandina)*
TaiS	*Taittirīya-Saṃhitā*
YV	*Yajurveda*
VājaS	*Vājasaneyi-Saṃhitā*

References

1. Jan Gonda 1975 pp. 313-337.
2. Macdonell 1966 (1st 1899)p. 146; Schroeder, L.von 1923 pp. XIX-XXI.
3. Cf *Śatarudriya TaiS* IV.5, *VājaS.* XVI.

   Winternitz comments on such hymns, i.e., the same deity invoked in different names : "In *Yajurveda* we find besides a mode of influencing the gods which prevailed very largely at later periods, and which consists of enumerating as many names and epithets as possible pertaining to a certain god and worshipping under all these names, in order to obtain something from him." 1927, p. 185.
4. Macdonell 1966 (1st 1899) pp. 152-153.
5. Gonda 1975 p. 324.
6. Bhattacharji 1984 p. 198.
7. Winternitz 1927 p. 177 :

   "The various readings, however, which the *Yajurveda* often presents are not indeed more ancient than the text found in the *Ṛgveda*, but they are mostly intentional more into line with the sacrificial acts."
8. macdonell. p. 154.

9. See *MaiS* IV.4.6 : *catvāro vai puruṣā brāhmano rājanya vaiśyaḥ śūdraḥl*

   Also see *MaiS* III. 4.8; *TaiS* II.5.10.1 : *ŚYV* XVIII, 48; *KāṭhS* XXXX. 12.

10. *TaiS* VI.6.1.3-4 : *brāhmaṇam adya rādhāsyam ṛṣir ārṇiṣeyam ity āha eṣa vai brāhmaṇaḥ ṛṣir ārṣeyo yaḥ śuśruvanl*

11. *MaiS* I.8.7 : *rtam vai satyam agnihotraṃ brāhmaṇa rtam tasmād brāhmaṇasy aiva hotavyaml.*

12. *TaiS* II.5.11.9 : *yad brāhmaṇaś ca 'brāhmanaś ca praśnam eyātāṃ brāhmaṇāyā' dhibrūyāt...*

13. *TaiS* I.7.3.1 : *parokṣaṃ vā anye devā ijyante pratyakṣam anye yad yajate ya eva devāḥ ijyante tān eva tad yajati yad anv aharyam aharty ete vai devāḥ pratyakṣaṃ yad brāhmaṇaś tān eva tena prīṇāty atho dakṣiṇaivā 'sya eśā' tho yajñasy aiva chidram api dadhati yad vai yajñasya krūraṃ yad viliṣṭham...*

14. In later Vedic literature the significance of the words *hutāda* and *ahutāda* changed.

15 *TaiS* II.6.10.2 : *brāhmaṇasya nāpagur eta na nihanyān na lohitaṃ kurvād etāvatā hainasā bhavati //*

16. *TAiS* II.6.10.2 : *vibhaktiṃ karoti brahaṇaiva tad akaḥ /*

17. Also see *TaiS* V.6.4.5; V.7.3.4.

18. Also see *MaiS* I.4.12; IV.4.3; *KāthS* XI.5; XXXVII.2.

19. It is difficult to distinguish the characteristic features of Bṛhaspati from Bramaṇaspati. As with *Bṛahaspati brāhmaṇa* is identified so also with Brahmaṇaspati. See *MaiS* II.2.3; 5.9; *ŚYV(K)* XXXIII.2.20 et al.

20. This sentence is repeated many a time in the later Samhitā literature. See *MaiS* II.1.7; 2.3; 4.6; III.3.4; 6.8; *KāṭhS* XI.8; *TaiS* II.6.8.7.

21. Following are the *ratnins* of the king: *brāhmaṇa, rājanya, mahiṣı* (the chief queen), *parivṛkti / parivṛtti* (the despised wife of the king), *senānī* (the army chief), *sūta* (court ministrel), *grāmaṇi* (the village headman), *kṣattṛ* (distributor of food), *saṃgrahitṛ* (charioteer), *bhāgadugha (distributor), akṣāvāpa* (the superindent of gambling table).

22. *MaiS* II.3.5 : *sarve evāsmā āyur dadhāti brahmaṇo hastam ālabhya paryāhur brahma vai brahmā brahmaṇaivā' smin brahmā āyur dadhāti./*

    Also see *ibid* II.2.2.

23. Same is the case in the Hindu religious life today. Without the ministration of the priest to perform a traditional Hindu marriage, rites to be observed at the initiation (*upanayana*) or *śrāddha* and the like is not possible.

24. Exceptions like Ailūṣa kavaśa, Satyakāma Jābāli, Aitareya Mahīdāsa and othes only prove the rule.

25. Dutt. N. K. 1968 (1st 1931)p. 42.

26. *AV(S)*XV.10.3:

    ato vai brahma ca kṣatraṃ codatiṣṭhatām te abrūtāṃ kaṃ praviṣāva iti. ato vai bṛhaspatim eva brahma prāviṣad indraṃ kṣatram/

27. *MaiS* IV.3.8.

28. *MaiSI II.2.3 : aindrabārhaspatyaṃ havir nirvapad brahma caiva kṣatraṃ ca savuiā akaḥ/* Also see *maiS* II.12.2.

29. *TaiS* III.3.1.1 : ...*indry jasvinn ojasvī tvaṃ deveṣu bhūyā ojasvantaṃ varcasvantaṃ manuṣyeṣu kuru brahmaṇaś cavā kṣatrasya ca ojase juhomi/*
30. Also see *AV* III.19.1; *MaiS* II.7.7; III.1.9; *ŚYV (M)* XI.81 et al.
31. Also see *ŚYV (M)* XVIII.44; *ŚYV (K)* XX.2.60-7; *AV (Ś)* II.15.4; *KāṭhS* XL.14.
32. Also see *TaiS* I.3.6.2; *ŚYV (M)* V.27; *ŚYV (K)* V.7.4; *MaiS* III.8.9; 9.3; 11.7; *KāṭhS* II.12; III.3 et al.

    This is to be noted here that the texts referred to may vary in minor points from each other. These off-quoted monotonous *yajus* mantras were probably composed for ritual purposes.
33. *TaiS* V.1.10.3 *vācayati bramaṇaiva kṣatraṃ saṃ śyati kṣatreṇa brahma tasmād brāhmaṇo rājanyavān atyantaṃ brāhmaṇaṃ tasmād rājanyo brāhmaṇavan atyantaṃ rājanyam...*
34. *KāṭhS* XXXVII.11 *brahmaṇi vai kṣatram pratiṣṭhithaṃ brahmana eva kṣatraṃ antar eti /*
35. Also see *TaiS* V.2.4.1.
36. *TaiS* II.5.10.1 *trīṃs tṛcān anu brūyāt rājanyasya trayo vā anye rājanyāt puruṣa brāhmaṇo vaiṣyaḥ śūdras tān evāsama anukān karoti /*
37. The same is applicable to the word *śūdra* also.
38. *MaiS* I.6.9; IV.2, 7; 10; *KāṭhS* VIII. 1 et al.
39. *MaiS* II.2.3 *viḍ marutaḥ*
40. *ŚYV (M)* X.12 *viḍ draviṇam /*
41. *MaiS* IV.2.10...*vaiśvaḥ śūdrao vā bahupusṭaḥ syāt tasya gavāṃ goṣṭhād ekaviṃśatakāny āhṛtya ekavimśatim āhutir juhuyād ekaviṃśatir vai manuṣyalokā manuṣyalokebhya evāsmai paśūn avarundha etair eva juhuyāt /*
42. *Ibid.* II.2.3 *brahma vai brahmaṇaspatir brahmaivā pāsarad brāhmaṇaspatyaṃ caruṃ nirvaped yatra kāmayeta brahma valaṃ syād iti tasya brāhmaṇaspatvai marutvati yājyānuvākye syātāṃ bṛahma vai bṛhaspatir viṇ marutaḥ brahmaṇi vā etad viśam adhi vināśayati draḍhimne asīthiratvāya /*
43. Ibid. II.5.7 ': *aindro vai rājanyo devatayā mārutī viḍ indriyeṇāvasmai viśam upayunakti pṛśnisaktho bhavati paścād evāsmai viśam upadadhāty anukām evāsmai viśam avivādiniṃ karoti /*

    Also see *KāṭhS* XI.1, XXIX.10.
44. See *KāṭhS* XI.1.
45. *MaiS* IV.4.9.·
46. It is, however, difficult to distinguish the meaning of *vasīyas* and *śreyas*.
47. *TaiS* III.5.7.2 describes *viś* as the food (*anna*). We hope to discusses on this point during our discussion based on the Brāhmana Literature in another article.
48. Also *see ŚYV (M)* XXXVIII. 19.
49. *iṣe pinvasvo 'rje pinvasva brahmaṇe pinvasva. ḍharmāsi sudharmā menyā' sme nṛmṇani dhāraya brahma dhāraya kṣatraṃ dhāraya viśaṃ dhārayal*

    Also see *ŚYV (M)* XXXVIII.19.
50. *Śat Br* XIV.4.2.25. however, attributes the deity Puṣan to *śūdra*. This *Brāhmaṇa* of

course belongs to a later date : *sa śaudraṃ varṇam asṛjata pūṣaṇam...* For creation-myth also see *MaiS* IV.7.8.

A little later we shall come to the point that the *KaṭhS* (XI.10) debarred woman and *śūdra* from the *Karīra* sacrifice : This statement, however, evidently says that they had the right to some other sacrifices. Do we not see here a contradiction between statements of *KaṭhS* XI.10 and *ŚatBr* XIV.4.2.25? The date of *ŚatBr* is much later than the *KaṭhS*. So we may presume that the rules and restrictions had changed during the long gap of time between Liturgical Saṃhitās and the late Brahmaṇa-period.

50a. *Karīrāṇi na striyai dadyan na śūdrāya /*

Ghoshal (1953, pp. 129-30) seems to have made a confusion between *Soma* and *Karīra*. He says, "Thus *KS* XI.10 disqualifies the Śūdra along with women for drinking *Soma*." Under footnote 168 in his book he quotes the text : *tasmāt karīrāṇi na striyaidadyān na śūdrāyāsomapītha iva hyeṣa /*

Our interpretation of the text : as he is debarred from Some-drink so he and woman should not be given *karīra*. *Karīra* is not *Soma*, it is a thorny shrub with no leaf on it, a favourite food of the camel in desert.

See Roth-Boethlingk, Mayrhofer, M. Mornier Williams

51 *ŚYV (Kā)* XXV.6.11:

vad hariṇo yavam atti na puṣṭam bahu manyate. śūdro yad āryāyaijāro no posam anu manyate /

52. *ŚYV (M)* XXX.16.

53. Contrary to our thought Wilhelm Rau (1957, p.24), however, thinks that these different names do not speak much about the details of the fishing profession, rather they speak more about the indigenous stock of people whose proffesion was fishing.

54. Macdoneli 1899, p 150; Winternitz 1927, p. 174; Gonda 1975, p 324; Bhattacharji 1984 pp. 211-12.

55. Already refered to. This categorization of the *varnas* according to the deities, metres etc. is followed in the Brāhmaṇa literature also, i.e. the next phase of the Vedic literature.

56. See *MaiS* III.1.5; 2.2; 4.41, *KāṭhS* VIII.3; *TaiS* V.1.4.5.

57. *MaiS* I.6.9; II.1.4 *KāṭhS* VIII.1.

58. *TaiS* VI.2.5.2-3.

59. *MaiS* II.5.1:7.

A clear logic also, is observed in this categorization of the deities. For example, *brāhmaṇa* were the authors of the scriptures and the most privileged class in the society. Quite naturally, spring the best of seasons was attributed to them. To associate (the tortuous heat of) the summer with the *kṣatriyas*, the warrior class the fighters is reasonable. Autumn is the season of harvest. Manifestly, the agriculturists the farmers have a tender, intimate relation with this season.

60. According L.von Schroeder, compared to the *Taittirīya Saṃhitā*, *Kāṭhakha Saṃhitā* and *Maitrāyaṇi Saṃhitā* are closed to each other and he considers these two *Saṃhitās* as the earliest literature of the Yajus-period. (ed. *Maitrāyaṇi Saṃhitā* 1923, p. XVIII). Keith, however, finds all these three works contemporaneous : "...the genearl texture

of the language of the three Saṃhitās is absolutely the same" (HOS 18 Veda of the Black Yajurveda, vol I, p xcvi)

61 Also see *SYV (M)* XXVI 2

Bibliography :

Atharvaveda (Saunaka) 4 Vols — Vishva Bandhu Hoshiyarpur Vishveshvarananda vedic Research Institute 1960-1962

Bhattacharji, Sukumari — *Literature in the Vedic Age* Vol I Calcutta 1984 *Firma K L Mukhopadhyaya*

Boethlingk Otto und Roth Rdolf — *Sanskrit Woerterbuch* (7 Vols) St Petersberg 1855-1875

Dutt, N K — *Origin and Growth of Caste in India* Vol I Calcutta Firma K L Mukhopadhyaya (1st 1931) 1968

Ghoshal U N — *A History of Hindu Public Life* Calcutta Ramesh Ghoshal 1953

Gonda, Jan — *A History of Hindu* vedic literature otto Harassowitz wiesbodan 1975

Grifith, R T H — *The Text of the White Yajurveda* (1st 1899) New Delhi Munshiram Manoharlal Publishers 1987

Kapisthala Samhita — ed Raghu Vira Delhi Meharchand Lacchamandas 1923

Kaṭhaka Samhita — ed S D Satavalekar Satara Svadhyāyamaṇḍala

Macdonell A A — *A History of Sanskrit Literature* New Delhi Motilal Banarasidass 1966 (1st 1899)

Mayrhofer, Manfred — *Kurzgafasstes etymologisches Woerterbuch des Altindischen* Carl Winter Universitatsverlag 1956-1963

Monier-Willams, M — *A Sanskrit English Dictionary* Motilal Banarasidass, Delhi 1976 (1st 1899)

Rau, Wilhelm — Staat und Gesellschaft Wisesbaden Otto Harrassowitz 1957

Rgveda-Saṃhita — Pune Vaidik Saṃśōdhana Manḍala 1995 (1st 1933)

Śatapatha Brahmaṇa (5 Vols.) New Delhi: The Research Institute of Ancient Scientific Studies. 1967.

Sharma R. S. *Political Aspects and Institution in Ancient India* Delhi Motilal Banarasidass. 1968. (1st 1959).

Śuklayajurvedīya Mādhyandina-Samhitā ed. Yudhisthira Mīmāmsaka Delhi: Kamal Printing Press. 1996.

Śuklayajurvedīya Kāṇva-Samhitā ed Satavalekar Satara.

Taittirīya-Saṃhitā Pune. Anandashrama Press

Winternitz, M. *History of Indian Literature.* 1927. (Eng. tr. by Mrs. S. Ketkar) Vol. I / Calcutta University.

A Foreign Word in Old Indo-Aryan: *tóya-*, *tū́ya-*

Abhijit Ghosh

Abstract

Proposal for an Austro-Asiatic etymology of the word. [Keywords: India, Vedic philology, non-Aryan elements in Sanskrit]

Abbreviations

BṛhDhP. = BṛhadDharmaPurāṇa, BṛhS. = BṛhatSaṁhitā, ep. = epic, Hemac. = Hemacandra, Kāvy. = Kāvya (literature), lex. = lexicon, MhBh. = MahāBhārata, Nigh. = Nighaṇṭu, Pur. = Purāṇa, TĀr. = TaittirīyĀraṇyaka, VṣṇP. = ViṣṇuPurāṇa

***tóya-*, *tū́ya-*, *toyā-*, etc.**

§1 *tóya-* n. 'water' (listed along with *tū́ya-* n. 'id.' at Nigh. 1. 12), TĀr. 10.1.1, 11.1, ep.+ (vd. Sen 1975: 152, 1981: 196 fn. 1), is used also in the senses of 'rain', 'river', 'sea', 'ocean', while *toyā-* f. occurs as the name of a river in Śālmala-dvīpa, VṣṇP., and of another in India, Monier-Williams: 456a (cf. *indra-°* f. 'cert. river', MhBh., *kara-°* f. 'id.' (in North Bengal), ib., VṣṇP., prob. = *kara-toyinī-* f. 'id.', MhBh.). Cf. perhaps *kattoya-* n. 'intoxicating drink; wine or vinous spirit', lex. (Mayrhofer 1956: 148, 1997: 53, with ref.).

Dravidian origin unconvincing

§2 Late occurrence of the word (vd. Kuiper 1948: 138) and the lack of a convincing Indo-European explanation (for the very doubtful Indo-European etymologies vd. Mayrhofer 1956: 527, 1992: 671, with ref.) led scholars to think of a non-Aryan origin of *tóya-* (like other OIA. 'water'-words, vd. Kuiper 1948: 138f., also Mayrhofer 1963: 173 [s.v. *nīrám*]). Kittel: xxvii entry 155, Bloch 1930: 739, Burrow 1948: 381 and Burrow & Emeneau: 312 no 3555 suggested a Dravidian etymology. Sen 1981: 196 reports that T.N. Srikanthaiya (Mysore) privately differed long ago from the former's derivation (1957: 50, 1975: 152, vd. also 1977: 169ff., 1996: 43) from Tibeto-Burman (Boro/Bodo) and stuck to the older view of Dravidian etymology in view of the phonetically similar Dravidian words for 'to bathe; become wet or moist; dip; soak, etc.' (Tamil *tōy*, Malayalam *tōyuka*, Kannada *tuy*, *toy*, Toda *twī-y*, etc.). Sen, howerver, rightly doubts (1981: 197f.) the propriety of postulating a Dravidian etymology for *tóya-*, insofar as the Dravidian words, contrary to the Indo-Tibetan ones cited by him, are never used to mean 'water' or any other 'liquids'. He argues that if *tóya-*, *tū́ya-* were really derived from Dravidian, they would have rather meant 'washing; bath; soaking; washerman, etc.' than 'water'; the close phonetic resemblance between the

Sanskrit and Dravidian words may, in the present state of knowledge, be explained as accidental. He even suspects if the borrowing, if any, be in the opposite direction (i.e. from Sanskrit to Dravidian); the fact that cognates of Tamil *tōy*, etc. are confined only to the Southern Dravidian languages highly influenced by Sanskrit, makes such a proposition worth considering.

Sino-Tibetan etymology doubtful

§3 Sen 1981: 196ff. tried to show with more evidences that *tóya-*, *tū́ya-* must have been loanwords from the Indo-Tibetan branch of Sino-Tibetan. He pointed out that practically all the Sino-Tibetan languages have the phonetically alike reflexes of the same proto-word for 'water', with which many compounds are formed to express other liquids and objects associated with water. Indeed, it appears that any member of the Sino-Tibetan family of languages will have a number of derivatives etc. from a cognate of the above; to take only one language, cf. from Lushai (Dulien dialect) *tui* 'water; juice; to melt', having a by-form *lui* 'stream; river', and the numerous compounds formed with it at Lorrain & Savidge: 117, 138, 144, 173, 214f., 274, 312, 316, 332, 341. According to Sen, this basic (and only) lexeme for 'water' is doubtless a native word, not a loan (e.g. Tibeto-Burman **t(w)iy*, cf. Benedict: 192, fn. 491).

§4 This, however, needs serious rethinking. Though an attempt was made by Lévi 1923: 35-46 (= 100-112 at Bagchi) to trace some Sanskrit words to Tibetan sources, q.v., Tibeto-Chinese loanwords in Sanskrit must be very late (vd. incidentally Burrow 1973: 376), since up to the 11th century A.D. Tibet was on the receiving side, and India's contact with Burma began from 3rd-4th centuries A.D. (cf. in general Chatterji 1950, passim). Influence of Tibeto-Burman on Indo-Aryan is evidenced only from a later period onward, and mostly on the vernaculars belonging to the eastern parts of India, viz., Asamiya, Bengali and Oriya (vd. Sen 1981: 198ff.); a section of a Tibeto-Chinese people migrated to Assam very late, whence the influence of their languages on Asamiya, Bengali, etc. (cf. e.g. Kakati 1962: 42, 46f.). So, a word attested in the TaittirīyĀraṇyaka or cited at the Nighaṇṭu cannot ordinarily be traced to this source.

Austro-Asiatic origin perferable

§5 Now, Skeat & Blagden: 2.752-753a W30 (with ref.) records the words for 'water' in the Malay peninsula: Sakai *tiu*, *tcu*, *téoh*, *tü*, *tô*, *túeh*, etc., Orang Tanjong *tiĕū*, Senoi *tê-u* (= Central Sakai), *täuh* (= Sakai of Ulu Gedang), besides Samre *toak*, *tiek*, Boloven *tiak*, Por *teak*, Xong, Chong *tak*, Proons *tok*, Khmer *tĭk (dīk)*, as well as Sakai *dooh*, Orang Hutan *diao*, *diau*, *dak*, Orang Benua *däu* (?), *d'hu*, Besisi *dĕu*, *diu*, *döō(h)*, etc., Orang Bukit *dū*, Mentera *du*, Bera, Serting (so-called Sakai), Beduanda *dak*, besides Stieng, Kuy Dek, Central and Southern Nicobar *dāk*, Mon *ḍai'* (*ḍāk*), Braou *dàk*, Ka, Bahnar *dak*, Cuoi, Phnong *dak*, Kaseng, Halang *dăk*, Chrau *da*ᵏ, Tareng, Churu *dà*, Churu, Kon Tu, Sue *dă*, Sedang *diak*, *deà*, Sue, Nanhang *do*, So *doi*, Prou *doak*, Singbhum Kol, Santali, Bhumij

dāh. This has a set of cognates with a prefix *ba-*, *bă-*, *be-*, *bĕ-*, *bi-*; thus, Semang *bateao*, *°iao*, *°eau*, *bătau*, *°ĕuh*, *betiu*, *bĕtĕ-ū*, *°ĕu* (or *°ĕyū*), *bitĕŭ*, Pangan *bateu* ⌊*tom*⌋ *bĕtĭöh*. Thus almost all the Austro-Asiatic languages have the reflexes of the same proto-word for 'water', also found in vocables expressing other liquids and objects associated with water, e.g. Sakai *tĕuḥ*, *téu*, *tiu*, *tü*, *tu*, *tö*, *doh*, Sakai, Tembi (= Northern Sakai), Senoi (= Central Sakai) *tê-u*, Besisi *dĕ-u*, Serting *dak* 'river', Orang Hutan id. 'sea', Kenaboi id. 'oil'. Numerous compounds are formed in different languages with this basic word in various senses of 'tears', 'sweat; perspiration', 'urine', 'sap', 'honey', 'wood-oil', 'dew', 'hot or cold or clear or transparent or dirty or muddy or brackish or salt or fresh (not salt) or drinking water', '(big or tributary) river', '(small or tributary) stream', 'brook', 'rivulet', 'mouth of (small or large) river', 'sources of stream; spring of water', 'confluence of streams', 'waterfall', 'eddy of water', 'headwaters (of river) (upstream)', 'head-springs or upper reaches of water', '(top of) flood tide', 'high water', 'ebb(ing of) tide', 'low water', 'shell-fish', 'water-snake', 'bank of river', 'slime; alluvial deposit', 'inland', 'sedge', 'to drink (water)', 'to bathe', 'to flow'. (It is likely that W27 o.c.: 751b, viz. *tŏm*, *tom* (pronounced *to*ᵇ*m*), *tom* in Semang, Pangan, Sakai etc. for 'water; river; stream', also the base of other words meaning 'rivulet; tributary stream; ebb; flow or flood-tide' in various dialects, may ultimately be related with the above.) Schmidt 1906: 66b, fn. 3= 1906a: 23, 24 fn. 1= 226, fn. 4 at Marouzeau was wrong in thinking that OIA. *daka-* 'water' had been borrowed into the Austro-Asiatic languages at an early time; the two sets of words are native in their respective families, with accidental phonetic and semantic similarities.

§6 In view of the greater antiquity of the contact between Indo-Aryan and Austric (numerous loans from Austro-Asiatic being attested in Old Indo-Aryan right from the ṚgVeda, for which vd. Kuiper 1955, passim, with ref.), it is more reasonable to accept *tóya-*, *tūya-* as a loan from the latter. The original Austro-Asiatic form could be something like **toyk'*, **doyk'*. The close phonetic resemblance between the Austric and Sino-Tibetan forms may in the present state of knowledge be explained as a mere coincidence, the more so because the words for such a basic concept as 'water' seem to be native in both the families, judging from the wide range of their occurrences in various positions and shades of meaning. This seems reasonable (inspite of the fact that on the eastern frontiers of India Sino-Tibetan peoples displaced earlier Austro-Asiatic populations), especially in view of Chinese (Mandarin) *Shui*3 (*shwei*3) 'water', Tibetan *chu* 'id.' (also 'river'), etc. (vd. Sen 1981: 197).

Incidentally, Kakati 1938: 261, 1941: 55, 1962: 50 rightly ascribed ⌊*kara*⌋-*toyā-* §1 and several vernacular names of rivers to the same Austro-Asiatic souce, but he treated the subject rather unmethodically. E.g., he (also at 1953: 13) appears to take, far-fetchedly, *lohita-*, MhBh. (also *lohitya-*, BṛhS., v.l. for *lauh°*, ep.+), m. 'Brahmaputra = principal river in Assam', as a c o m b i n a t i o n of W35 'clean water' at Skeat & Blagden: 2.753b (which is, moreover, rather isolated in Austric, only one word, Sakai *láu*, not *lao*, being listed therein) and W30 'water' o.c.: 752-753a, for which vd. §5 (perhaps from Sino-Tibetan, cf. *lui* 'stream; river' at §3?).

The final syllable of the river-names like *kāroṭī-*, *mañkutī-* [sic], perhaps *lūsatī-*, *dumatī-*, etc., as listed at Pinnow 1953: 233, may possibly also belong to the same source.

§7 The name of the river *dāmodar(a-)* (Hemac. 45), dialectally also pronounced °*udār* (Bandyopādhyāy: 1.1098a, Dās: 1.1063a, Mitra: 622b, Deb: 563a), °*udā* (cf. the spelling *Damooda* in the Statesman, a Calcutta daily, of 19.2.1988, p. 8, col. 7, in the 100 Years Ago column: Editorials), held sacred by the Santals, which originates in the Chhotanagpur plateau of Behar and flows through the Burdwan district of West Bengal, has been explained as 'water of Mundas', the first element being connected with the Munda word for 'water', viz. *dāh*, or as Sanskritised from Santali *dāmu dā* 'rain water' (Sen: 432 s.v. *dāmudar(a)*. Pinnow 1953: 233, 1954: 2f. likes to equate *-dā(k)-*, *-dag-*, *-ḍak-* etc. of *phalgu-dā-* f. 'cert. river', BṛhDhP., *bāhu-dā-* f. 'id.', ep.+, 'cert. other river', VṣṇP. (also *bāhudāsā-*, *budhudā-* f., due to folk etymology), *manda-gā-* (= *ma-n-dag-ā-*) f. 'cert. river', MhBh., *narma-dā-* f. 'id.' (modern Nerbudda = Narbada), ib.+, *gaṇḍakī-* f. 'cert. river in northern part of India = Gaṇḍak', MhBh.+, etc., with the Munda word (*)*dā(k')* 'water'; vd. also Mayrhofer 1950: 618 on *sidāku-* m. (according to some f.) 'river', lex. (with Munda prefix *si-*), Kuiper 1939: 17-20, 1948: 120 fn. 165, on *mandākinī* (*ma-n-dāk-inī-*) f. 'cert. arm of Ganges; cert. other rivers; (esp.) heavenly Ganges; cert. other river in heaven', ep., Pur., Kāvy.

Conclusion

§8 Late occurrence of the word and the lack of a convincing Indo-European explanation (Mayrhofer, KEWA.: 1.527, EWAia.: 1.671, with ref.) led scholars to think of a non-Aryan origin of *tóya-* TĀr., ep.+ (Nigh. also *tūya-*), n. 'water' (like other OIA. 'water'-words, vd. Kuiper, PMW.: 138f.). Kittel, Kannad Dict.: xxvii, Bloch, BSOS. 5.4: 739, Burrow, BSOAS. 12.2: 381 and Burrow & Emeneau, DED. 1984: 312a suggested a Dravidian etymology. Sen, IL. 17: 50, 38.3: 169ff., Chatterji Vol. 1981: 196ff. rightly doubted the propriety of the above postulate, and ascribed the word to the Indo-Tibetan branch of Sino-Tibetan (Bodo). But since the influence of Tibeto-Burman on Indo-Aryan is evidenced only from a later period onward, and mostly on the vernaculars belonging to the eastern parts of India (cf. Burrow, Skt. Lg. 1973: 376, Chatterji, JASBngl. 16.2, passim, vd. Sen 1981: 198ff.), and since numerous loans from Austro-Asiatic are attested right from the ṚgVeda (Kuiper, Kirfel Vol., passim, with ref.), it is more reasonable to accept *tóya-* as a loanword from the latter, where the phonetically alike reflexes of a basic lexeme for 'water' (a native proto-form like **toyk'*, **doyk'*) occur in almost all the languages, also in vocables expressing 'other liquids' and 'objects associated with water', and in numerous compounds in various senses connected with 'water' (Skeat & Blagden, Pagan Races: 2.752-753a W30). The element *dā(k)*, *dag*, *ḍak* of many Indian river-names has already rightly been ascribed to the same source (Munda (*)*dā(k')* 'water', vd. e.g. Kuiper, AO. 17.1: 17-20, PMW.: 120 fn. 165, Mayrhofer, ZDMG. 100: 618, Pinnow, BN. 4: 233, 5: 2f.). In short,

this substratum may best be assumed to explain the word, also rather than explaining it as a wandering word

Bibliography

Bagchi, Prabodh Chandra 1929 Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India, by Sylvain Lévi, Jean Przyluski and Jules Bloch Translated from French Calcutta

Bandyopādhyāv, Haricaran 1966 Bangiya SabdaKos Vol 1 New edn, Niu Dilli

Benedict, Paul K 1972 Sino-Tibetan A conspectus Princeton-Cambridge Studies in Chinese Linguistics II Contributing ed James A Matisoff Cambridge University Press, London(-New York)

Bloch, Jules 1930 "Some problems of Indo-Aryan philology" In Bulletin of the School of Oriental Studies, London, 5 (4) 719-56 (Forlong Lectures for 1929, no 2 "Indo-Aryan and Dravidian", pp 730-44)

Burrow, T[homas] 1948 "Dravidian studies VII" In Bulletin of the School of Oriental and African Studies, London, 12 (2) 365-96

— 1973 The Sanskrit Language New and revised edn, London

— and Emeneau, M[urray] B[arnson] 1984 A Dravidian Etymological Dictionary 2nd edn, Oxford

Chatterji, Suniti Kumar 1950 "Kirāta-jana-kṛti The Indo-Mongoloids their contribution to the history and culture of India" In Journal of the Asiatic Society of Bengal (Letters) Calcutta, 16 (2) (publ 1951) 143-235

Das, Jñānendramohan, comp and ed 1937 (actually 1938?) Bāngalā Bhasāi Abhidhān Vol 1 Revised and enlarged 2nd edn, reprint 1979, Kalikātā

Deb, Āsutoṣ 1937 Nūtan Bāngālā Abhidhān Kalikatā

Kakati, B (anikanta/ani Kanta) 1938 "Austric sub-stratum in the Assamese language' In New Indian Antiquary, Bombay, 1 4 (July 1938) 259-64

— 1941 Assamese, its Formation and Development A scientific treatise on the history and philology of the Assamese language, Gauhati, Assam 2nd edn, rev and ed Golock Chandra Goswami, 1962

— 1953 "The Assamese language" In Aspects of Early Assamese Literature, general ed Banikanta Kakati, Gauhati 1953 1-16

Kittel, F[erdinand] 1894 A Kannada-English Dictionary Mangalore

Kuiper, F[ransiscus] B[ernardus] J[acobus] 1939 "Indoiranica" (Schluß) In Acta Orientalia, Leiden, 17 (1) (Fortsetzung) 17-64

— 1948 Proto-Munda Words in Sanskrit Verhandeling der Koninklijke Neder-landsche Akademie van Wetenschappen, Afd Letterkunde, Nieuwe Reeks Deel 51, No 3, Amsterdam

— 1955 "Rigvedic loanwords" In Studia Indologica Festschrift fur Willibald Kirfel zur Vollendung seines 70 Lebensjahres, ed Otto Spies, Bonner Orientalistische Studien, Neue Serie Band 3, Bonn 137-85

Lévi, Sylvain 1923 "Pré-aryen et pré-dravidien dans l'Inde" In· Journal Asiatique, Paris, 203.2 (July-September 1923) 1-57 Tr ("Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India") at Bagchi 63-126

Lorrain, J.[ames] Herbert and Savidge, Fred.[erick] W. 1898. A Grammar and Dictionary of the Lushai Language (Dulien Dialect). Shillong

Mayrhofer, M.(anfred). 1950. "Altindisches". In: Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, Wiesbaden, 100: 618-20

—. 1956, 1963. Kurzgefaßtes Etymologisches Wörterbuch des Altindischen. A concise etymological Sanskrit dictionary. Vols. 1, 2. Heidelberg

—. 1992, 1997. Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. Heidelberg. Erster Teil: Ältere Sprache. Bd. 1 (Lief. 1-10). Zweiter Teil: Jüngere Sprache Bd. 3, Lief. 21

Mitra, Subal'candra, comp. 1928. Saral Bāṅgālā Abhidhān. 6th edn., Kalikātā

Monier-Williams, Monier. 1899. A Sanskṛit-English Dictionary. Etymologically and philologically arranged with special reference to cognate Indo-European languages. New edn., greatly enlarged and improved with the collaboration of E.[rnst] Leuman, C.[arl Johann Wilhelm] Cappeller and other scholars. Oxford

Pinnow, Heinz-Jürgen. 1953. "Zu den altindischen Gewässernamen". In: Beiträge zur Namenforschung, Heidelberg, 4.3: 217-34. [Vd. 1954]

—. 1954. "Zu den altindischen Gewässernamen". (Fortsetzung ..). In: Beiträge zur Namenforschung, Heidelberg, 5.1: 1-19. [Both = part of 1951 dissertation, Freie Universität, Berlin, with the title: Untersuchungen zu ..]

Schmidt, P.[ater] W.[ilhelm]. 1906. "Die Mon-Khmer-Völker, ein Bindeglied zwischen Völkern Zentralasiens und Austronesiens". In: Archiv für Anthropologie, Braunschweig, 33 (N.F. Bd. 5).1, 2: 59-109. Sonderabdruck 1906a, Die Mon-Khmer-Volker. Ein ..., Braunschweig, with independent pagination and no column-division as in 1906. French tr. ("Les peuples mon-khmêr[.] trait-d'union entre les peuples de l'Asie centrale et de l'Austronésie") [of 1906a] by (Ms.) J. Marouzeau in Bulletin de l'École Française d'Extrême-Orient, Hanoi, 7.(3, 4: July-December 1907): 213-63

Sen, Nilmadhav. 1957. "An etymology of *toya*". In: Indian Linguistics, Poona, 17 (= Taraporewala Memorial Volume): 50

—. 1975. "Some remarkable words and verb-forms from the Taittirīya Āraṇyaka". In: Bulletin of the Deccan College Research Institute, Poona, 35.(1, 2): 145-53

—. 1977. "Two Tibeto-Burman loan words in Old Indo-Aryan". In: Indian Linguistics, Poona, 38.3 (= Professor Suniti Kumar Chatterji Memorial Number: September 1977): 169-72

—. 1981. "Some mutual borrowings in Indo-Aryan and Indo-Tibetan". In: Suniti Kumar Chatterji Commemoration Volume, general ed. Bhakti P.[rasad] Mallik, University of Burdwan: 196-202

—. 1996. "Linguistics and Vedic studies : retrospect and prospect". In: Some Aspects of Vedic Studies, ed. Samiran Chandra Chakrabarti, School of Vedic Studies, Rabindra Bharati University, Calcutta 1996: 33-53

Sen = Sen, Sukumar. 1971. An Etymological Dictionary of Bengali : c. 1000-1800 A.D. Pt. 1. Calcutta

Skeat, Walter William and Blagden, Charles Otto. 1906. Pagan Races of the Malay Peninsula. Vol. 2. London

Colophon

An earlier version of the paper with the title "A Note on OIA. *tóya-*" was read in the 38th Session of All-India Oriental Conference, Calcutta 1996 (1997) and its summary published in Summaries of Papers presented thereat, in Indian Linguistics section, pt. B, p. 112.

Early Indian Buddhism and the Supernatural

Ian Mabbett

One of the major aspects of Professor Sukumari Bhattacharji's work is her contribution to the charting and understanding of traditional Indian cosmology, the systems of thought about the structure and functioning of the universe as embodied in early Sanskrit texts. Here I would like to pay respect to this contribution by adding a note on the ancient Indian view of cosmology underlying the values and attitudes of early Indian Buddhism. Buddhist teaching in some ways adopted the notions of the nature and working of the cosmos shared by Brahmanism and other schools (for example, in the acceptance of the notion of *Karmic Law*), and in other ways developed these notions in new ways peculiar to the Buddha's *dharma* (for example, in interpreting *karman* in a uniquely psychological sense that focused upon the intention behind deeds, not the deeds themselves).

The particular aspect of cosmological belief I wish to take up here is the treatment of the supernatural, though this term (as noted below) is culture-bound and needs to be reconceptualized in the context of ancient India. What I wish to bring out is a point not generally recognized – that the essentially *impersonal* character of Buddhist cosmology, which denied the essential reality of personal beings (even the Buddha, though this could eventually be qualified), produced a lasting tension between the view of supernatural events as natural effects of cosmic forces and the attribution of them to the power of individual persons possessed of special spiritual qualities. Both views existed, and the tension between them can be seen at play in the contrasting characterizations of magic and miracles found in Buddhist texts, sometimes approving and sometimes disapproving.

Early Buddhism in India is known about primarily from its canonical sources; these are most complete in Pāli, in the *Theravāda* tradition, which will be examined here.

Scholarship on the Pāli texts has been influenced by a tradition of rationalist interpretation which has often made it difficult for scholars to allow any integral role in Buddhism for belief in anything that might be called magic or the supernatural. Pāli scholars have not indeed neglected such topics, but these have been generally regarded as intrusions from outside real Buddhism; where magic has been impossible to separate from the doctrinal content, it has been almost customary nevertheless to marginalize its influence and to treat it as an altogether subordinate and negligible component in the teaching.[1]

This approach derives some sanction from the scholarly tradition which evolved quite within Buddhism as the community of monks gradually became

domesticated in monasteries where intellectual activities like learning and (eventually) writing could take root. Scholarly monks transmitted written texts and wrote commentaries on them which enshrined in the *Theravāda* tradition their own orthodox interpretations of the scriptures. In these interpretations, magical events and supernatural agencies were placed firmly within an ethical and didactic framework which commonly made of them symbols of abstract qualities.[2] This sort of interpretation has been congenial to the rationalist perspective of many western interpreters of Buddhist doctrine.

It is possible to identify the attitudes of this scholarly tradition and contrast them with those of the forest monks who persisted in living homeless wandering lives; Reginald Ray, in his work on the role of the *bodhisattva* ideal, has argued that magical displays were favoured by the forest ascetic tradition and frowned on by monastic domestication, and that the conflict between the two attitudes was coded in the texts.[3]

Here the interest is in the attitudes of the early Buddhist community, before such domestication set in. The isolation of anything that might be called 'the earliest form of Buddhism', and the stratification of influences upon it, are of course notoriously problematic.[4] These issues are not the focus here, though; my concern is with the assumptions and expectations operating during the first few centuries of Buddhism, the period in which the texts gradually took shape. What is in question is especially the ideas that developed through the contacts made between the early generations of monks, among whom the transmitted teachings acquired canonical form, and the early audiences in the lay world, the small communities close to nature where culture was shaped by local horizons and the universe was parochial. Let us not forget that, by and large, the monkhood itself was recruited in large part from among people who had grown up in the culture of the 'little tradition'.[5] Various other sorts of Buddhism certainly began developing very early, including those of the royal capital and of the monastic scholar, but in analysing the rise of Buddhism we cannot deny a very important role to the way in which the proponents of the *dhamma* interacted with the scattered populations of the villages and the forest hamlets.

From the very beginning, Buddhism had to come to terms with these populations' belief in special beings and special powers, of a sort that we normally call supernatural.

There is, however, a serious methodological problem in the very use of the word 'supernatural'. It belongs within a particular sort of world view where certain distinctions can be made between what is natural and what is not. Nature is regarded as the domain of a set of impersonal laws which, on being investigated, turn out to operate upon measurable quantities.

The domain is in fact, in a way which is easy to overlook because it has become so fundamental to modern thought, treated as fundamentally describable by mathematics; the entities and processes within it are conceived of as qualities of extension and movement rather than anything else; the flavours, colours and timbres of ordinary sensory experience are relegated to the status of epiphenomena

generated by wavelengths. It has been suggested that Locke's distinction between primary and secondary qualities in a way marks the institutionalization of the modern world view.[6]

Within this scheme, it is possible to identify as supernatural whatever cannot be accommodated in principle by, or reduced to the operation of, the laws of nature thus conceptualized. In the absence of such beliefs in the nature of the natural, there can be no obvious way of distinguishing a supernatural, and it is inappropriate to expect any demonstration of our own categories of thought from the Indian cosmology.

There can be no justification for the notion that, being detached and objective, the Buddha and his disciples must have dismissed such beliefs as false; 'objectivity' in their terms must have meant something different from what it means to us. The attitude of the *dhamma* to what we might call the supernatural was not one of outright rejection; Buddhist sources vary in their attitude to displays of magic, but nowhere deny that there could be such things as magic or miracles. An important study by Phyllis Granoff shows how in some contexts miracle-working was regarded as legitimate, while in others it was treated with suspicion or disdain, but the reason for the suspicion or disdain was not that magic does not happen – it was rather the opposite : magic happens frequently, and the problem with it as a tool for spreading the *dhamma* was that, when there were so many possible causes of supernatural events, it was not easy to show that any one such event could count as evidence of the special power of the Buddha or his teaching. It was then better to seek to convince people of the value of the *dhamma* by other means.[7]

What is in view here is the ways in which the Buddhist acceptance of magic and miracles reflected or adapted the cosmological ideas current in lay society. Perhaps the least well recognized of the various forms of Buddhism which developed historically is the one which grew out of, or was part of, the cultural world of ordinary unlettered people living in small communities. It would be wrong to suppose that this Buddhism was a mistake, a misunderstanding of a real Buddhism existing elsewhere, although it is also important to recognize that it has many features which have often (but not always) been disowned by the protagonists of other, more intellectual, versions of Buddhism.

Necessarily, the relationship between the aspirations of the holy man and the religious practices of villagers was problematic. Modern case-studies show how readily asceticism, or the profession of it, can slide into popular magic. A young self-ordained founder of an intendedly ascetic movement in Sri Lanka in the nineteen-fifties, Tapasa Himi, turned briefly into a popular legend, with rumour producing all manner of prodigies in his career : he 'could speak ten languages, he could fly, his face was seen in the moon, he was seen bursting through the moon', and credulous visitors were always ready to delude themselves that they had witnessed magic feats.[8]

Of course, this was not an authentic rigorous ascetic movement; but, as we shall notice later on, teachers of ascetic Buddhism are always liable to become

the subject of beliefs that assimilate them to the world of spirits and magic. The Thai forest monk Acharn Tate, like any other highly reputed monk, was believed by ordinary people (towns-folk at least as much as villagers) to have supernormal faculties on account of his holiness, and people flocked to see him in the hope of benefiting from them; as he reminisced, 'Most of my visitors only seemed interested in asking for lottery numbers.'[9] Further, it is important to recognize that, though forest monks may sometimes wage war on what they see as debased village cults, they do not do this in the name of scientific materialism – they do it in the name of skilful states and techniques conducive to spiritual advancement.

It therefore becomes difficult to chart accurately the relationship between some 'real' Buddhism and popular practice; they are not really distinct and different entities. As Tambiah notes, modern writers 'have variously treated [popular practice or 'animism'] both as incompatible with, and as combining with, Buddhism, he argues that the relationship involves 'opposition, complementarily, linkage and hierarchy', and describes local Thai spirit cults which stand in different relationships with Buddhism, opposed, uneasily related, or inverted; the exorcist is 'both a caricature and an inversion of the Buddhist monk'.[10] The world-denying values of the ascetic are alien and difficult for the villager, who is unable to integrate them within his own world view unchanged; he makes what connections he can.

Other scholars have described various ways in which authentic Buddhism has in modern times interacted with folk cultures, without being seriously compromised by it. Keyes has argued that in cases he has studied villagers did not well understand the high, literary, Buddhism very well, but were able to extract from it the ideal of abstention.[11] Collins has explored ways in which the sheer incommensurability of Buddhist ascetic doctrine with popular religion makes of the former a powerful symbol of the distinctiveness of Buddhism as a counter to the values of the Brahminical order.[12] Ling argues that Buddhism used popular religious ideas pragmatically as teaching devices, without losing distance from them. On this view, Buddhism and popular religion are related but still separate terms; there is a 'radical dissimilarity between the kind of attitude to life which underlies naturalistic religion, and that which is found at the heart of Buddhism'.[13]

We cannot ignore the emphasis in the canonical scriptures upon the career of the wandering ascetic who is always on the move from place to place, ideally alone or in a small group.[14] Such monks were expected to display enormous self-control and to live as holy men who would earn the respect of the local people upon whom they depended for subsistence.

But we must also remember that the growth in the strength of Buddhism depended a great deal also upon the patronage of the great men of the land. Respected monks (such as the Buddha himself), peripatetic as they were, made themselves familiar not only in the village but also in the royal capital, where we know at least from the time of Avoka that they could earn lavish endowments for their followers.

The images of the monk as an ascetic man of wisdom patronized by the great and as a figure of power within the horizons of local culture combine uneasily. It is a relationship fraught with ambivalence and tension. We cannot hope to recognize the ambivalence so long as we maintain only the perspective of the philosophical Great Tradition, within which the Buddha and other renowned teachers figure as aloof dispassionate beings, representing universal values and disdaining those of folk religion (loosely called 'animistic' or 'shamanic'). It is true some teachers who gain wide reputations evince just such disdain, but we must remember that they grew up in, and are surrounded by, communities in whose cultures it is taken for granted that the world is full of spirits and sacred energies which must be dealt with by the deployment of talismans, amulets and apotropaic magic.[15]

These cosmological beliefs must be recognized as part of the cultural legacy of the whole of society, not just of unlettered village folk. India had an elaborate cosmological science whose assumptions were accepted generally, and teachers of new religious ideas did not see it as their business to challenge such beliefs; they were simply accepted and adapted within the new teachings. For example, we should not imagine that, being 'rational', Buddhist monks had nothing to do with the cult of relics; most of the earliest sources may be preoccupied with other things, but there is good evidence from the comparison of relevant texts in different schools, as Gregory Schopen has shown, that monks took part in funerary rituals for their own dead, often for reasons that would now be described as superstitious by many; and inscriptions from the second century B.C. onwards show that (whatever the scriptures had to say about transience and absence of self), buried relics of locally important monks were honoured as living presences.[16]

Thus the relationship between the earliest identifiable orthodox Buddhist teachings and popular beliefs in magic and spirits was not simply one of austere intellectual rejection (as if the Buddha were brought up on nineteenth-century rationalism and Huxleyan atheism, like some of his modern apologists). It was not one of credulous acceptance either; indeed, many popular beliefs are consistently condemned in the canon, but it is easy to misunderstand the grounds of the condemnation.

In the first place, the Buddha himself was a powerful figure of (as we naturally tend to express it) supernatural power. It was not until several centuries after his lifetime that the doctrine of the *nirmāṇa-kāya* was elaborated into the *Mahāyāna* teaching that saw him as a divine emanation, but, so far as the evidence allows us to see, he was a figure of quasi-divine power for his followers from the beginning. In the *Mahāpadāna Suttanta* of the *Dīgha Nikāya*, for example, we find the myth of the Buddha as superhuman, with many divine attributes; super-normal events attended his birth, and he is credited with thirty-two marks of the Great man (*Mahāpuruṣa*).[17] This mythical concept was described by Rhys Davids as a brahmanical idea with only incidental usage in Buddhist tradition,[18] but we find these thirty-two magic marks cropping up in a number of places in the earliest

Nikāya texts. One repeated incident has the Buddha allowing a doubter to observe that he does indeed have all the marks, including two that are not normally visible – a large tongue which he can roll out to cover the whole of his forehead, and a genital organ in a sheath magically disclosed to the doubter.[19] Elsewhere we find all the marks listed in detail.[20]

Certain specific faculties are ascribed to a Buddha. Most of these are comprehended within a standard list of ten powers; these include perfect knowledge of the way things truly are : what is possible or impossible, the results of all actions, the paths leading to different conditions of rebirth, the world and the elements which make it up, the dispositions of all beings, the faculties of beings, the results of states of meditation, and the appearances and disappearances of beings through their actions; the tenth is the experience of release through suppressing all *Karmic* influences.[21]

Independently of this list of ten powers, specific claims occur in various contexts. With a Buddha's vision, he can see the rebirths of other people; he has enlightened knowledge (*vijjā*) of former births, of the deaths of other people, of occasions when people put an end to the poison of *saṃsāra*; he is in certain respects omniscient.[22] He can recollect his own past lives.[23] He has the power of levitation : he is represented in the *Dīgha Nikāya* as miraculously crossing the River Ganges, and as walking through the air to the Vulture Peak, Gṛdhrakūṭa.[24] He is possessed of clairaudience[25] and precognition (he predicts that in the future there will be a great trading city at the site of Pātaligāma).[26] The person of a Buddha is possessed of various super-normal attributes. His presence protects human beings from harm by non-human agents.[27] On the night of his enlightenment and on his decease, his skin radiates light.[28] Various miracles surround the birth of a Buddha in his last life.[29]

The Buddha may have condemned the practice of magical arts by ascetics, but in whatever way we understand the rationale for this condemnation we must take account of the various magical acts which the Buddha is reported as performing in the course of his career. On a visit to Sāvatthi, he created a magic mango tree.[30] He also rose in the air, and water came from his feet, fire from his shoulders; he multiplied his own figure, meanwhile assuring his disciples that there was no harm in what he was doing.[31] He visited the abode of the god *Baka Brahmā*, and demonstrated to him his own superior knowledge and power.[32] The *Sutta Nikāya* tells of an occasion when a Brahmin offered rice-milk to the Buddha, who advised him instead to pour it into a stream; being poured, it caused hissing and gave off smoke. The Brahmin, impressed, was converted.[33] The miracle contest with Purāṇa Kāsyapa, which the Buddha won, became firmly lodged in Buddhist lore.[34] In the *Majjhima Nikāya*, the Buddha magically prevents Algulimāla from catching up with him, and lights a fire without fuel.

Thus far, we see the Buddha approving of magical display. However, in various contexts we find that magic is strongly reprehended. In several canonical passages occurs the story of Bhāradvāja, who wins a bowl in a public contest by a show of magic. The Buddha rebukes him.

> How can you, Bhāradvāja, for the sake of a miserable wooden bowl, display to householders a superhuman condition (*uttarimānussa-dhamma*), a manifestation of magic power? Just as, O Bhāradvāja, some woman might exhibit her loin-cloth for the sake of a wretched stamped māsaka, even so you, Bhāradvāja, have displayed to householders a superhuman condition, a manifestation of magic power for the sake of a miserable wooden bowl.[35]

Clearly, the rebuke means not that the display of magic was spurious but that it was not proper for a monk to make it. On the face of it, this is hypocritical, given that the Buddha himself is supposed to have used such powers in certain competitive situations. As Basham has pointed out, the Buddha seemed to exempt himself from his own rule : he went to Savatthi and created there a magic mango tree.[36] In some places, the Buddha is described as vehemently disparaging magic, but in others he is described as practising it unashamedly.[37]

However we may wish to resolve such superficially apparent inconsistencies, it is clear that we must take account of the repeated condemnation of magic practices, which are frequently itemized among the 'low arts' forbidden to the ascetic. A monk is not to engage in practices involving the hymns of the *Athabbaṇa* (*Atharva Veda*), or various forms of divination or medical practices.[38] However these prohibitions are interpreted, the target is clearly in most cases the sort of village soothsaying which has always been part of the traditional scene in agrarian society. In the *Dīgha Nikāya* appears a long stock list of 'low arts' prohibited for the *bhikkhus*; it appears several times in the same *Nikāya* and in various other canonical passages, with a number of variations or omissions. These include all manner of divination practices, stirred in with exorcism, trickery, chanting and so forth, all belonging to the same universe of village divination, healing and witchcraft which may be observed through the ages and even today is not absent from the lives of monks in Buddhist societies.[39] The Buddha condemns any show of marvels without instructive value and criticizes about 250 forms of charlatanism; he excommunicates monks who falsely claim superhuman powers; and we have already noticed the case of a disciple making a display of magic, Bhāradvāja, who earned a stinging rebuke.[40] The use of psychic powers to impress a convert is condemned, because the use of such techniques misses the point of the *dhamma*, and a sceptic could always dismiss them as mere magical tricks. 'It is because I perceive danger in the practice of mystic wonders, that I loathe, and abhor, and am ashamed thereof.'[41]

Notably, in the Vinaya, the list of four major offences that can be committed by a monk includes, alongside abuse of property, unchastity, and killing, the vanity of false claims to the attainments of one who is enlightened (including various forms of psychic knowledge).[42] It is significant that the fault should be judged so heinous (suggesting that it was a real problem for those seeking to maintain the standards of the *saṃgha*). Clearly low arts were an integral part of the culture of the times. In the Mauryan period we have the testimony of Megasthenes that mendicants practised various mantic arts : '[Besides the forest-

dwelling brahmins] there are also diviners and enchanters, who are skilled in both rites and customs pertaining to the deceased, and go begging alms from village to village and from city to city'.[43]

Along with divination and the exercise of superhuman powers, certain medical practices incur the same sort of odium; these include herbal remedies conducing to virility or to impotence among other things.[44]

In various places, low arts to be avoided by the ascetic include the category of *iddhis* (Sanskrit *ṛddhi*), or false *iddhis* (*āmisā-ṛddhi*) which are stigmatized as belonging to the common folk, *pothujjanika;* the term can be defined as skill, power or majesty, but often in the canonical context designates vulgar practices not conducive to spiritual advance, such as divining and exorcism, although the super-normal powers acquired through the approach to enlightenment are sometimes called *iddhi.*[45] At one point an important distinction is made between two sorts of *iddhi*: those which are consistent with purely worldly purposes (a substantial list of magic tricks is given), and those which conduce to knowledge of things as they really are. The first are ignoble, the second noble.[46] Meisig, who calls *iddhis* 'Zauberkunst', attributes their currency to a later stratum.[47]

There is frequent criticism of superstitious Brahmins engaged in the sorts of low arts that are here stigmatized. Cases have been particularly examined by Fick, who saw them as having an important bearing on the concept of caste : Brahmins were expected, as Brahmins, to conform to a known set of standards, which in Buddhist eyes were violated by superstitious practices.[48] In many of these cases, part of the ground for disparaging the Brahmins appears to be that the superstitions have no basis in reality. An eastern Brahmin regards as a bad omen a mouse gnawing a garment in a box, but the *bodhisattva* is unworried and denies the validity of such superstitions.[49] In the *Dīgha Nikāya,* Brahmins described unfavourably are identified as diviners, predicting the future of newborn infants,[50] and the list of 'low arts' condemned at various points in the *Dīgha Nikāya* and elsewhere includes various practices such as palmistry and divination by omens and signs which were clearly resorted to often by Brahmins; the list includes sacrifices to Agni.[51] Brahmins of the time are disparaged because of their mindless mechanical ritual; they 'chant over again and rehearse, intoning or reciting exactly as has been intoned or recited...'[52] In the *Jātakas,* they are represented as causing a rain of jewels, or claiming power over spirits, or divining an auspicious building site (a science which is disparaged in the *Dīgha Nikāya* also[53]), or reciting a magic verse to exorcise a *yakkha* inside a hole, or interpreting the whims of a pregnant queen.[54] Not all these faculties are dismissed as spurious; the ground for disparagement is that the Brahmins should be making their livings in such ways. They have petty ambitions. An ascetic Brahmin patronised by a particular family expects to be consulted for a family wedding date and is angry when at first he is passed over.[55]

Involvement in any of the 'low arts' is strictly forbidden to the Buddha's followers. Brahmins are ridiculed for their involvement in such practices, often in such cases being described as Easterners, whereas good Brahmins of pure

character and great learning are described as Northerners. (This is a pointer to an important fact about cultural geography – the old home of Aryan pastoral tradition in the north and west was believed to maintain the good old ways, while the frontier society of the east was spawning a corrupt selfish ethic.) There appears to be an ambiguity. As Masson wrote, 'At some times, whether through inadvertence or powerlessness to prevent it, the elements of popular religion seem to receive unqualified acceptance, without discussion; but at others they are firmly rejected with scornful severity or with gentle irony. Often, they are accepted only provisionally, only in the end to be transformed, sublimated or spirited away.[56]

There may be various elements in the Buddhist condemnation of popular occult practices. Collins points to the way in which Buddhist cultivation calls for a gradual process of spiritual training, whereas magic involves a momentary act of will : '... the character development in Buddhist training is meant to work slowly, beneath the level of conscious perception. In a social perspective, this kind of attitude towards religious practice is perhaps intended to separate Buddhism from the ubiquitous magicians, astrologers and the like, with whom at the village level Buddhist monks have had to share the role of religious specialist.' Collins notes in this connection the seriousness among the offences a monk can commit of false claims to magic powers.[57] On this view, Buddhism has sought to promote a process of spiritual ripening, not skill in any mechanical performance.

Where medical procedures are concerned, the distinction appears to be between being able to do certain things (sometimes doing them as a free service) and making a living from doing them.[58] The motive is what counts.[59] Wijayaratna, referring to the Buddha's rebuke of *Bhāradvāja* for winning his magic contest, points to the fault in making an exhibition of one's powers for selfish reasons.[60] Waldschmidt, studying Chinese and Pāli versions of the miracle of Śrāvasti, concludes that the important distinction is one that the Buddha is supposed to have made – between knowing about magic and being a magician : the Buddha understands magic and can use it, but he does not use it for the purposes a magician would have.[61] This can be supported by an important story narrated in the *Saṃyutta Nikāya* : the Buddha is at pains to point out the all-important difference between knowing magic and practising the trickery involved in being a magician.[62]

These may all be correct in their contexts. The examples in the sources indicate that the early Buddhists were placing themselves in an ethical framework created by a perception of Brahmanical tradition; there were certain standards of behaviour recognized as appropriate for a holy man, and these were believed to be best preserved, among the Brahmins, in the north-west, but corrupted or forgotten in the east. The followers of the Buddha believed themselves to be upholding the best of these standards. Practices like divination and other magical arts were inconsistent with their goals, not because any belief in the efficacy of the 'low arts' was necessarily mistaken (though the Buddhists could recognize that charlatans abounded), but because it was degrading for a holy man to concern

himself with such things. In some places, the practice of any sort of magic is equated with trickery. That a monk should not only make public claims about his magical powers but make them falsely, out of sheer vanity, was seen as betraying an outlook totally incompatible with his calling. That this offence should be accounted so grave indicates that in fact, as in modern times, the weaker brethren could not always ignore the expectations of lay supporters that they should be good at healing and divination. Displays of magical powers by famous monks dot the record of later centuries in Buddhist countries.[63]

From all of this it appears that we must recognize a sort of cosmological counterpoint running through the history of Buddhism. For the scholarly monks, among whom the doctrine of non-self (*anatta*) was well understood and assiduously internalized, magical events took their place in a strictly impersonal universe in which forces such as *karman* could produce often wondrous phenomena; even more than *Karmic* virtues, however, the insight achieved by a Buddha or spiritually advanced being was a cosmic force capable of producing even more startling manifestations disruptive of the normal course of nature. On the other hand, for the ordinary man, who could not rid himself of the notion that persons or selves are ultimately real, the same manifestations were not so much evidences of the principles that govern an impersonal universe – they were highly personal actions or communications demonstrating the power inherent in a superior individual. In pure Buddhist doctrine, this latter attitude, based as it is upon an attachment to the notion of self, had in it elements that could be obstructive to spiritual progress. It is perhaps this ambivalence that has been most actively at work in producing apparent inconsistencies in the Buddhist treatment of the supernatural. What is not in question, however, is that in all pre-modern Buddhist communities it has been accepted, quite naturally, that wonderful events (which in modern culture would count as 'magic' or 'miracles') could occur perfectly naturally in the ordinary course of things, because there was no cosmological basis for any other belief.

ABBREVIATIONS

References to Pāli texts are to the editions of the Pāli Text Society, London

AV	*Atharva Veda*
D	*Dīgha Nikāya*
M	*Majjhima Nikāya*
S	*Saṃyutta Nikāya*
S.B.E.	Sacred Books of the East series
Sn	*Sutta Nipāta*
Vin	*Vinaya Piṭaka*

1. See for example T.W. Rhys Davids, trans., *Dialogues of the Buddha*, London (P.T.S.), vol.III (reprint, 1977), pp.132-6

The Sacrificing Animal

Charles Malamoud

According to the French historian of Greece Pierre Vidal-Naquet, the Hellenic world, from Homer to Alexander, can be defined as a 'civilisation of political speech.[1] Of course, for pointing out the contours of his object, Vidal-Naquet is quite often lead to show the background on which this configuration is drawn. Because he addresses himself to Hellenists or readers trained in classical humanities, he does not judge it necessary to underline the fact that in this formula he combines the two famous Aristotelian definitions of man : "man is by nature a political animal" (*Politics*, 1253 *a* 3) and "among the animals, man alone possesses speech" (*ibid.*, 1253 *a* 9). He will nevertheless allow me to insist and linger on what may be is obvious. The Greece of *The Black Hunter* is that civilisation which again adopts these two ways of distinguishing man among the other beings and perceives itself as a civilisation in so far as *logos* and 'politics" join together in combination and restrict each other in its institutions, its manner of living and thinking : Greek humanity is a civilisation, because its social life is materialised in groups where all the members, at least those who are fully men, participate through their speech in community affairs and because the faculty of language of which all men are endowed manifests itself in this public speech. Now what Pierre Vidal-Naquet shows is that this set of definitions does not suffice. The "civilisation of political speech" is framed in history. Doubly so : Greek thinkers endeavoured to construct a narrative of the events which had led to a construction of humanity and had led humanity to become what it is; these thinkers are themselves held in history, and their narratives have neither the same content, nor the same form nor the same scope in Hesiod and in Plato for instance. Another dynamic element which adds itself to this double history and complicates it : the tension between the acceptance of the actual status and the nostalgia for the golden age, or the temptation of a return to bestiality. The chapter called "the Platonic myth of *The Politic*" is a luminous explanation of this ambiguity. The two forms of transgression, it says, "were always susceptible to interfere with one another", for this reason, primarily, that the golden age is itself fundamentally ambiguous.

Reading *The Black Hunter* and, through the mediation of its author, reading Plato beyond Aristotle, the indologist turns towards his own domain and is reminded that ancient India also has a discourse on man. Is a comparison possible? In what way would it be valid? What would be the purport of it ?

First of all, we must multiply precautions and warnings, and recall the fundamental differences, in the first place those bearing on the size and status of the respective corpuses. In India, the nature and position of man and human society are particular themes in the Vedic revelation. These themes will be reprised in later religious texts, collections of myths and ritual prescriptions, but will not be approached and discussed in the "philosophical" doctrines. There is no really a history of Indian thought on man or humanity. All is concentrated in the Veda. In the Veda itself, the myths are narratives only by their form : the verbs are in the past indicative tense, but the tales relate the conditions in which the status of man was fixed and revealed, not the changes, the events which could constitute a history (undoubtedly mythic) of the human condition or the formation of humanity. True, the texts of post-Vedic Hinduism display a theory of the ages of the world, unknown in the Veda : cosmic time is made of cycles of cycles : each small cycle comprises four ages, *yuga*, the passage from one *yuga* to the following being described as a degradation, a weakening of the order of the world, and by a weakening of the virtues and capacities of man; but if it is more and more difficult for men to submit to a norm, and if each era is characterised by a specific way to submit to the norm, the norm itself does not change.

Let us come now to those Vedic texts which speak of man. First, a famous passage from the *Bṛhadāraṇyaka Upaniṣad V 2*, which by the way has drawn the attention of the psychoanalyst Jacques Lacan[2]. This *Upanisad*, is an appendix to the treatise on sacrifice entitled *Śatapatha- Brāhmaṇa*. Therefore it belongs, as much by its language as by its thought, to late Vedism (but one should note that while the periodisation of the Vedic texts is a problem which Western and Indian historians and philologists deal with, for the Brahmanic tradition, the Vedic corpus, in all its components, together forms a 'revelation", in which no chronological succession is relevant.

I give here a translation of the paragraph :

> "Three groups of creatures of Prajāpati dwelt as Brahmanic students at the home of their father Prajāpati : gods, men, and demons. After this period of Brahmanic studentship, the gods said : "Lord, speak to us " To them he said this syllable : *da* [and] "did you understand*?*" – "We did understand", they said, "You said to us : *dāmyata*, tame yourselves." "Yes", he said, "you did understand." Then men said : "Lord, speak to us." He said to them the same syllable : *da* [and] "did you understand?" – "We did understand", they said. "You said to us : *datta*, give." "Yes", he said, "you did understand." Then the demons said to him : "Lord,, speak to us." To them he said the same syllable : *da* [and] "did you understand?" –"We did understand", they said, "You said to us: *dayadhvam*, be compassionate." – "Yes", he said," yod did understand." That same this divine voice, thunder, repeats "*da, da, da*, tame yourselves, give, be compassionate." These are the three things that one must parctise, taming of the self, giving and compassion."

The commentary of Śaṅkara gives the following clues : 1. The doctrine that *Prajāpati taught in the original times is repeated by him today through the divine voice of thunder. In the thunder as we hear it, sounds are not restricted to a sequence of three da(s), but in these sounds one recognises this sequence made* of the three words uttered by Prajāpati. 2. Prajāpati's injunctions are the positive counterpart of what is taught in the Brahmanic tradition (*smṛti*) of socio-religious norms, namely that there are three doors to hell, desire (principally sexual desire (*kāma*), anger (*krodha*) and greed (*lobha*). 3. How had each group been able to interpret differently and still correctly each time the identical teaching of their master? The answer is that each group questions itself with concern and knows what is its specific weakness. Also in the enigmatic speech of the master each group senses well the injunction of a virtue which could only be practised if this flaw has been eliminated. 4 Although they form only one of the three groups of disciples and although only one of the three *da*(s) has been addressed to them at the time of this scene of the beginnings, men today must study and practice the complete triad. 5. Including the *da* that Prajāpati had stated for the Asura demons. In effect, by telling the demons that they should be capable of compassion, Prajāpati does not seek to confirm them in their demonic character. Men do not risk becoming demons by practising a virtue which has been recommended to demons. The three virtues are on the same level, they are equally virtuous, 6. Or maybe the whole discourse is actually about men. It is just that one calls "gods" those men whose principal weakness is lust, while men who are simply "men" are dominated by greed. The "demons", in this interpretation would be men taken to violence and cruelty. But all men have these three weaknesses and therefore they must practise the corresponding virtues.

To this psychological and moral commentary by Śankara, let us add this grammatical observation. The particular status of man is underlined by the very structure of the verb that describes his specific duty : of the three verbs, only *datta,* "give" can be constructed with a direct object complement or with a complement of attribution referring to another being than the subject himself Indeed in the injunction "tame yourselves" the action is directed towards the subject himself. When one knows how to control oneself, one is *åtmanvant,* "possessed of one's own self". "Be compassionate" means actually : transform yourself and try to acquire this personal quality of compassion. Only *da* "give" enjoins an action. In other words men are the only class of beings of which Prajāpati expects that they would act. Actually, according to the theory of *karman* (that is to say the theory of action and work, *karman* in the grammatical terminology meaning at the same time "verbal action" and "complement of the direct object"[3]), which took form in post-vedic Hinduism, only men really act, that is to say do acts that have consequences for their future lives. The gods and the animals only suffer or enjoy the consequences of the acts they have done when they were men, in some previous existence.

By trying to clarify the three Upaniṣadic injunctions, the three *da*(s), by the three "doors to hell", that is the three fundamental passions (of men), Śaṅkara

does not take into account the fact that men as a class of beings occupy a central position in a list of three terms, preceded by the gods and followed by the demons. That does not mean that men are intermediate between the gods and the demons by their status, their powers or their moral value. It so happens that the list is not hierarchical – a fact which, in Brahmanic India, deserves to be noted.

Nor is it possible. to discern a hierarchy that could be an unequivocal gradation in this other list of classes of beings (*bhūta*) we find in *Śatapatha-Brāhmaṇa* II 4, 2, 1-6. Here, there are the gods, then the "Fathers" (that is the deceased ancestors), then men, then the animals. All of them come to ask their creator Prajāpati : what are your instructions for us, what should be our rule of life? According to some, says the text, these four groups are followed by a fifth one, the group of the demons, separated from the preceding ones by a radical difference : they do not utter their question, they just come over. Prajāpati does not speak to them, he just assigns to them darkness (*tamas*) and illusion (*Māyā*).

Among the beings with whom Prajāpati does speak one must distinguish between the gods, the Fathers, and men on one side, the animals on the other : the status of the first is defined by their manner of eating and by their specific source of light, their luminary (*jyotis*), whereas the animals are taught only what their food should be. The gods, the Fathers, and men, but not the animals, have clothing and gestures in keeping with the place they occupy respectively within the ritual system. All these beings, although they do not know yet how they should live, already know the ritual conventions and decorum. This is a telling example of the Brahmanic way of thinking : the ritual frame precedes and makes possible and intelligible physical life.

Two points further to note. 1. The Fathers form a category of beings by themselves, at the same level as the gods and men although they are but the form under which men survive when they have accomplished their mortal destiny and left a progeny entitled to perform funeral rites fro them. 2. The gods and the Fathers are clothed and move the way men are clothed and move in the present world when they deal respectively with the gods and the Fathers (the gestures related to the cult of the Fathers being in many respects the reverse of the gestures related to the cult of the gods). The gods, therefore, wear their sacred cord passed over the left shoulder, and bend their right knee when approaching Prajāpati. The lord of creatures tells them that sacrifice (the oblations that men will offer them) will be their food; they will be immortal and the sun will be their luminary. The Fathers come to Prajāpati with their sacred cord passed over the right shoulder and their left knee bent; they learn that they will eat every month (indeed the cult of the fathers consists mainly of monthly oblations), their principal force in that they have "swiftness of mind" (*manojava*), the moon is their luminary. As for men, they are wrapped in their clothes, and prostrate themselves before Prajāpati. They learn that they will eat every night and morning, that they will be mortal but survive in their progeny and that their light is Agni, the (god of) fire, more precisely, the sacrificial fire[4]. To the animals, Prajāpati declares that they will eat as they like what they will find, "in season

and out of season". The distinctive feature of man is that among them some (*eke*) transgress (*atikramanti*) the rules devised for them : they are capable of eating more than is prescribed and at extra times; this makes them fragile, unable to walk and also untruthful, probably because the law which is imposed on them is at the same time an observance (*vrata*), a vow which they promise to follow. Conversely, men who obey these rules reach the full length of life (*āyus*) and are endowed with a speech of truth.

While the text expands on the harmful effects of incorrect eating – dangers to which man alone is exposed, it is silent on the mutual dependence of the gods, the Fathers and men. It is clear, however, that the gods and the Fathers eat only the food man gives them through sacrifice. It is more difficult to tell what living man receives from the gods and the Fathers : mainly blessing. Moreover since the gods and the Fathers are the recipients of man's offerings they make it possible and necessary for men to perform sacrifices : therefore they allow men to enjoy the fruits, the benefits produced by the sacrifice when it is properly executed.

If one tries to summarise what is taught in the narrative and what one gathers from the injunctions, one notices that man shares with the gods and the Fathers and the animals the status of interlocutor of Prajāpati, which the demons are not; with the gods and the Fathers only they have in common clothing and a ritual posture. Like the Fathers and the animals but unlike the gods, men are not immortal (what about the demons?). Unlike all the other classes of beings men have the power to transgress. One can also say that, alone among the non-immortals, man is declared mortal, subject to a death which is inseparable from his ability to procreate. It is certain that the animals, as they are not destined to become Fathers, do not really, that is ritually, have a progeny although they reproduce themselves. As for the Fathers, they must vanish after a while, but death as such, preceded by procreation, is necessarily behind them.

The singularity of men as a class of beings, therefore, is that they are mortal, capable of transgression and entitled to give.

In the two texts examined so far, what is translated by "man" is the term *manuṣya*. Another name for man is *puruṣa*. The distribution of the entries in Vedic Sanskrit has been clearly defined by Oldenberg long ago[5]. The *manuṣya* is man as different from the other classes of beings : the gods, the Fathers, the animals and the demons ; whereas the *puruṣa* is man as one of the species which constitute the class of animals as one of the *paśu*. Oldenberg also noticed that the world *manuṣya* is used more often in the plural, *puruṣa* in the singular[6].

Man (*puruṣa*) is a biped (*dvipād*) : this is the reason why some of the oblations one has to offer during the horse sacrifice must be accompanied by the recitation of a series of six stanzas of two verses each (*dvipadā*). Because these oblations are offered after those which are meant to glorify the sacrificial horse, man, the biped, is added in a kind of afterthought to the list of the *paśu*, the sacrificial victims, in order to be among them and dominate them.[7] While the class of men is not, as such superior to the class of animals, the human species is superior to other animal species.

Several features of the human animal are negative : he has neither claws nor hoofs; moreover his palms are devoid of hair. He wears in his body the trace of what happened to the creator god Prajāpati : as Agni threatened to devour him Prajāpati made this gesture of fear and dismay, he rubbed his hands (we would say : he twisted them) and the hair on his palms fell (*Śatapatha-Brahmaṇa* II 2, 4, 4). He is also devoid of skin, but it is because he had been skinned, and this distinctive mark also the sign of a close affinity with the *paśu* to the benefit of which he had been skinned. He is *atvac*, "without skin", because the gods have taken his skin (*tvac*) to give it to the cow (III 1, 2, 13-17; V 2, 1, 6) : this is why the slightest scratch makes him bleed and this is also why he needs clothes (his real skin now) especially when he is near cows : as they see him dressed the cows are delighted and feel safe; when they see him naked they are afraid lest he would take back what formerly was his property. The exegete of these texts would therefore be mistaken by simply contrasting the human artefact to the animal nature : the cow has also been re-clothed.

Man as *puruṣa* shares with the elephant and the monkey the privilege of having hands, the single hand of the elephant being of course its trunk (*Taittirīya-Saṃhitā* VI 4, 5, 7). One notices that in the Vedic texts the hand of man is not described as a tool to fashion things : it serves to take (while the other animals "take with the mouth"), to give, and also to measure.

It what consists the group of the *paśu*? As often in Sanskrit, the word *paśu* has a broad and a narrow meaning. The *paśu* are the animals in general (in fact, the biped and quadruped mammals), but more strictly the village animals (*grāmya*) as opposed to the *mṛga*, the animals of the forest (*vanya āraṇya*). Only "village" *paśu* are fit for being sacrificial victims, so that *paśu* is also the technical term for "victim" (the rites entailing the immolation of animals are called by the compulsory euphemism *paśubandha, "binding of the victim"*). In effect, apart from exceptional and perhaps fictitious cases, the only victims prescribed by the texts for Vedic sacrifice are the "village" animals; among them, as we will see, man. However this *paśu* that is man is not a village animal only. He has very narrow affinities with the elephant. Although it can be tamed by man and put to work, the elephant is not strictly speaking domestic : elephants have to be captured (with the aid of elephants especially trained for that). We learn from post-vedic treatises like Kautilya's *Arthaśāstra*, that the king keeps forest sanctuaries for elephants. Moreover a characteristic trait of the elephants – a common topic in Indian poetry– is the wild intoxication which grabs them at the time of rut. Now elephant and man are of the same stuff. We read in the Śatapatha-Brāhmaṇa III 1, 3, 2 *sq.* (that must be completed by *Taittirīya-Saṃhitā* VI 5,6,1): the goddess Aditi having offered a rice porridge to the ancient gods, the Śādhya, and having properly absorbed the remains, gave birth to the gods called Āditya after her name. She came to think that she would give birth to even stronger gods if instead of the remains, she would eat the principal, that is, in short, if she would make an offering to herself. Now (then), so she did, but what came out of her womb this time was a shapeless mass, an " aborted egg" or "that which comes from a dead

egg", (*mārtāṇḍa*), an indefinite conglomerate (*saṃdegha*[8]) as broad as high "which, according to some, however, is of the height of a man". The Āditya do not accept that "what was born after them" would be lost. They fashion this lump of flesh and they give it the form of man (*puruṣa*). The result of this sculpture, is the sun god, Vivasvant, the Āditya par excellence, who also retains his name of Mārtaṇḍa. He is the prototype and in some complicated way the ancestor of the human race. As to scraps, Āditya gather them and make the elephant (*hastin*, literally "the one with a *hasta*, a hand") with them."That is why one says that one does not have to accept the elephant [as a sacrificial fee?] because the elephant is derived from man [he is *puruṣājāna*]). Note the shortcut which allows our text to declare that men, the "creatures here", belong to Mārtaṇḍa, that is are derived from him. From other ancient myths we learn that it is Yama, son of this Vivaśvant Mārtaṇḍa, who being a god himself, has decided to submit himself to death, thus becoming mortal in a way in order to institute and govern if not directly create the race of men and to rule over the world of the dead. In assigning the origin of the human species not to Yama but to Mārtaṇḍa, the myth examined here leads one to think that death is not only what limits and defines the life of man, it is also the cause, the initial substance of this life. Note also that the figure of Aditi giving birth to the Āditya and more clearly the later narratives which present the sun god as the father of the god Yama, contradict the theological doctrine of the Brāhmaṇa according to which the gods being immortal by themselves are excluded of the immortality proper to men, procreation.

This animal, man, has therefore his place among the village species as well as among the forest species[9] The animality of man, under this double aspect, is in no way to be identified to what we call bestiality, and in no Vedic text the fact that man is an animal is used as an argument to explain the limits or the heaviness, the non-divinity of man.

It remains that, in the Vedic literature, in the sentence which most resembles a definition of man, and which Oldenberg has very aptly compared to the definition of man by Aristotle as a political animal[10], the term *paśu* is taken in the narrow sense of "sacrificial victim" : "among the animals [fit to be] sacrificial victims, only man offers sacrifices" : *puruṣa eva paśūnām yajate.* This phrase appears in *Śatapatha-Brāhmaṇa* VII 5, 2, 23 in the following context.

In the ceremony known as "piling [of the altar] of fire" (*agnicayana*), before one begins to lay down the layers of bricks which eventually will result in this construction, an image of the body of the god Prajāpati, it is necessary to prepare the foundations and especially to lay the heads of five victims (*paśu*) at the basis of this structure : horse, ox, ram, and goat, at the centre of this square, man On the man's head only the *ṛtivij* pours an (oblation) of clarified butter. "Thus he makes man, among the animals, a being fit for the sacrifice (*yajñīya*)". The adjective *yajñīya* signifies, "in state of to take place, to play a role in the sacrifice" (it is said in *Śatapatha-Brāhmaṇa* III 1, 1, 9 that only the Brahmins, the *kṣatriya and the viaṣya*, the members of the first three classes of society, are entitled to enter the sacrificial ground; they are the only ones that are *yajñīya*[11]). The meaning

appears more clearly in this other sentence : because an offering of clarified butter is poured on the man's head, only man, in difference to the other *paśu*, is able to be active in the sacrifice : he is not only the stuff of the offering, he is also the one who makes the offering gestures. It is of course humanity as a species who is able to hold this double role. Some men are victims, some are sacrificers. But one could ask if this duality does not also characterise the human individual as well. The man's head at the foundation of the altar is certainly not the head of the sacrificer. The juxtaposition of these two sentences : 1) among the victims, there is man, in the first place, 2) among the victims, only man offers (victims), does not allow us to conclude that when the sacrificial animal offers a sacrifice, it offers its own self. But on the other hand one should not forget or neglect the Vedic texts on *dīkṣā* the introductory phase of the sacrifice, the preliminary consecration of the sacrificer : during this initial phase of preparation, the sacrificer is supposed to transform himself into an offering; he acquires a new "self" he offers or vows to offer to the gods. Then, in a second phase of the ritual, that is in the process of the sacrifice proper, he redeems this self by offering some other victim or some other oblation, a substitute to his own self. That means that the initial, fundamental and genuine sacrifice is the sacrifice to which the individual (only the human species is composed of such individuals) commits himself as a victim. Sylvain Levi concludes quite correctly of these texts that "the only authentic sacrifice would be suicide"[12] The Brahmanic definition of man as a sacrificial victim / and at the same time as able to offer sacrifices implies also, as one can see, that each man (at least each man qualified as *yajñiya*) has to deal first with a "himself", an (*ātman*) from which he must necessarily part at some stage of the sacrificial process.

Considered as a passive and active sacrificial animal, man is also endowed with speech : the sacrifice could not be effective without the recitation (said to high voice, sang, murmured, or silently) of fragments of the revealed text. Some of these texts are to be uttered by the sacrificer himself. Moreover speech as such, conceived as a deity or as the vedic text personified is constantly invoked as an essential part of the sacrificial construction during the sacrificial process itself and in the treatises which explain how we have to perform and understand the ritual. A strong and bold metaphor defines the sacrificer's body as made of speech (*vāṅmaya*), more precisely : made of texts of the Veda and even of Vedic poetic metres (*chandomaya*). Is it the privilege of the human *paśu* to be possessed *with speech*? An enigmatic stanza of the *Ṛg-Veda* (I 164, 45), quite often quoted, says : "Four are the measured parts of Speech ... Three of these quarters lay in a secret place. They do not move. The fourth quarter is speech spoken by men, *menuṣya*". The *Śatapatha-Brāhmaṇa* interprets this stanza thus : only one quarter of speech is articulated, explicit, *Nirukta*. This is the language of man. The three other parts, inarticulate, not explicit, are spoken respectively by the animals (*paśu*) other than men, the birds and the insects[13].

The procedures of resumption and redemption to which the sacrificer resorts once the self offering in the initial consecration is accomplished must not be

considered just as artificial tricks or expedients. The sacrificial device of sacrifice construction, the correspondences between the elements of sacrifice and the objects of the world (correspondences which do not amount to mere representations), the system of the relationships between the sacrificer and the other components of the sacrifice, all that which form the constant motif of the discourse of the Brahmaṇa derives in last analysis from the will or the necessity of controlling the interplay of distance and coincidence between the sacrificer's self and his substitutes.

It is a part, one could say, of the nature of man according to the Veda, that he fulfills himself in a two phase process and needs a second time so to speak, In the doctrine of sacrifice as a two-phased process we see that man has to acquire a second self which would allow him to be true to his definition as a sacrificing animal victim.

This sacrificing animal, endowed with a speech which is hardly distinguishable from the corpus of the Vedic text, is quite different, no doubt, from the Greek political animal endowed with logos. But the fact that Vedic man has primarily to deal with the division and recomposition of his own must not prevent us to ask if men, *manuṣya* as well as *puruṣa*, are only a category or can be considered also as a community. It is again, no wonder, in the doctrine of sacrifice that we must look for an answer.

Next to the large sacrifice of the solemn cult and the rites of passage which marks the cycle of life, the Veda lets us know of a list of five daily duties called by antiphrasis, one would say, *mahāyajña* "large sacrifices". They are in fact minimal offerings which one must present daily to five receivers : the gods : the Fathers ; the "beings" (*bhūta*) who roam around the house day and night; the *brahman*, that is in this context, the very text of the Veda; and man (*manuṣya*). One has to the satisfy or to "delight" these five recipients by ritually giving them small quantities of the substances which are their specific food. The *brahmayajña* is meant to "satisfy" the Veda by the recitation of (Vedic) formulas deemed to restore its strength after one has exhausted it by using its *mantra* to accompany the movements and gestures of solemn sacrifice[14]. The *manuṣyayajña* is but the elementary form of hospitality : one has to welcome and feed a non expected guest. The *manuṣyayajña*, daily sacrifice to men, differs from the other four in that the sacrificer and the recipient here are on the same level and of the same nature; each is liable to occupy the place of the other. Every man (if one puts on one side the differences of *varṇa*, which is actually what the relevant texts do) is a man for man : each gives and receives hospitality. So one can understand, it seems to me, that Prajāpati's *da*, when directed to man, means "give" as men you must be givers to each other. There is therefore between men, in this tiny rite, a reciprocity of gift sacrificially formalised, which is the basis of a community without equivalent in the other classes of beings[15]. This is a minimal and abstract form of social link, horizontal in some respect. It displays its full meaning if one integrates it in the powerful system of congenital debts (*ṛṇa)*, a strongly dissymmetric system which I have discussed at length elsewhere.

When one examines this outline of community one is encouraged to go further in the contrastive comparison between the Aristotelian and the Brahmanic definitions of man. No doubt the Vedic reciprocical hospitality has but distant analogies with the principles of the *polis*. Vedic "speech", privilege of man is not to be put on the same level as the logos. The sacrificial stage is not the space of the city. Still between the sacrificial India, as we know it from the Vedic hymns and the Brāhmaṇas, and Greece as the "civilisation of political speech" some sort of comparison is possible. The question of a definition of man is posed with clarity in both worlds. In India as in Greece, thinkers tackle the specific difference of living humans. They look for what distinguishes them from (other) animals. In India as well as in Greece, the criteria for distinguishing man (under radically different modalities) are language and community (which does not imply in Brahmanic India at least that speech in considered, glorified as the means of a communication which would make community possible). On this precise topic basic similarities are clear enough to legitimate the attempt to give the differences the shape of significant contrasts.

References

1 Pierre Vidal-Naquet, *The Black Hunter*, Johns Hopkins University Press, 1986.

2 Jacques Lacan, *Ecrits*, Paris, Seuil 1966, p. 322.

3. Pāṇini I 3, 14, 49 Cf. Louis Renou, *Terminologie grammaticale due sanskrit*, Paris, Champion, 1957, p. 124,

4 It is said it the Kāṇva recension of *Śatapatha-Brahmaṇa* (III 1, 10, 2) that among the animals, only man is able to kindle fire Cf Armand Minard, *Trois Enigmes sur les Cent Chemins* II, Paris Editions De Boccard, 1956, par. 920 and 920a.

5 Hermann Oldenberg, *Vorwissenschaftliche Wissenschaft, Die Weltanschauung der Brahmana- Texte*, *Gottingen*, Vandenhoecke und Ruprecht, 1919, p. 43, Note 2.

6. Oldenberg, *ibid*. Let us notice an exception when the text has to say that men, as well as dogs and other digitigrad animals step directly on the ground without «any other help than themselves», that is without hoofs, the word for « man » is *manuṣya*, in the plural Cf. *Śatapatha-Brāhmaṇa* IV 2, 4 16 sq , quoted by Minard, op. cit. I, Paris, Belles Lettres, 1949, par. 155 One must connect the text with *Aitareya-Āraṇyaka* II 1, 4 · here what is contrasted with *paśu*, animals endowed with hoofs (*sapha*) or claws (*khura*) is man (*puruṣa*, in the singular) endowed with foot tips, (*prapada*) through which brahman, the Absolute, entered him (*prāpadvata*).

7. *Śatapatha-Brāhmaṇa* XIII 3,6 3 . *tasmat puruṣa uparitāt paśūn dhitiṣṭhati* .

8. Play on *sa ndegha* « conglomerate » and *sandeha*, much more frequent, which means both « conglomerate » and « uncertainty ».

9. On the alternance of *grāmya* and *araṇya* in the sacrifice, *Jaiminīya-Brāhmaṇa* II 183 sq. *Pañcaviṃśa-Brāhmaṇa* XVI 6, 1–10.

10. Oldenberg, *ibid*

11. Man comes from Prajāpati's *manas*, whereas the other *paśu's* are produced by his eyes, his breaths, his ears and his voice. This is why man is the first ans the

strongest of all the *paśu*, 's, he *is* actually all the *paśu* 's belong to him Cf *Śatapatha-Brāhmana* VII 5, 2,6.

12. Sylvain Lévi, *La Doctrine du sacrifice dans les Brāhmaṇas*, Paris 1898, second edition with a Preface by Louis Renou, Paris, Presses Universitaires de France, 1966, p. 132 sq.

13. *Nirukta* XIII 9 gives several other interpretations of this stanza. They reflect the point of view of the grammarians (*vaiyākaraṇa*), the etymologists (*nairukta*) and the ritualists (*vājñika*) respectively.

14. On *brahmayajña*, see Charles Malamoud, *Le Svādhyāya, récitation personnelle du Veda*, Paris Editions De Boccard, 1977 The main Vedic texts on the five *mahāyajña* are *Śatapatha-Brāhamana* XI 5, 6, 1sq. and *Taittirīya-araṇyaka*,II

15. The specifity and superiority of man are also taught from another point of view in *Aitareya-āraṇyaka* II 3, 2 sq. A.B. Keith, *The Aitareya āraṇyaka*, Oxford, Clarendon Press, 1909, p. 206, does not fail to compare this text with Aristotle's *On the Soul* II 4.

Rajāratnākara or Ocean of Kings: A Sanskrit Historical Work of Tripura

Jyotish Nath

Introduction

In a general sense, the term '*ratnakara*' means a vast collection of water. So, the name *Rājaratnākara* will figuratively mean a book containing a vast collection of information about the kings. The dual chroniclers, namely Bāṇeśvara and Sukreśvara too, endorsed the above view about the justification of the title of their book *Rajaratnākara*. Thus, it is said in the First Canto that just as the crescent of Moon, the tutelary deity of the royal clan of Tripura dwells in Siva's tuft and gets as well reflected in the heart of the Ganges, the god should equally be as graceful as to stay among the numerous descendants of his clan. The verse (*Rajaratnakara* I. 4), however, runs as follows.

> kalayā harasirasi vidho prativimbena vasasi gaṅgahṛdaye/
> tava kulajānām rāsau kṛpaya tiṣtha súhaṃ namaste//

The text of the Rajaratnakara has, however, come down to us in the two forms. A printed book of the same name was published in 1886 under the patronage of king Bira Candra Māṇikya We have, however, come into possession of the xerox copies of the identical book which still bears the impression of the seal dated 1306 T.E. (i.e. AD 1896) of Bira Chandra Library of Agartala. It is, however, evident both from the internal and external sources that this printed book underwent some editorial work before its publication. The commentaries of the first two panegyric verses and those of the three other verses (142, 143 and 153 of the Tenth Canto) -- all occurring in the printed book, seem to have been a kind of later editorial addition in the footnotes. Secondly, there is, however, a hand-written codex of the Rājaratnākara, which we are in possession of, and which, in contradistinction to its printed counterpart, is itself a pointer to the latters' being edited in a more accomplished manner. This hand-written codes, written in the Bengali scripts is, however, a collection of the Government Museum of Agartala; it has 69 pages, each of which contains about fifteen verses on average. Though there is no date of its composition, still it appears that it could have been written about a hundred years ago. Its size is 14" × 10" and is written in Sanskrit on thick papers. It is, hereinafter, called manuscript everywhere. Some of the peculiarities may be summed up as follows. The panegyric verses occurring in it are different

from those of the printed book. Though the manuscript contains a large number of variant readings both in the cases of the individual words and verses, it has however, fully avoided the episode of the svayamvara marriage between king Meghavarṇa and Sulaksaṇā, the princess of the kingdom of Cedi, which occurs in the Tenth Canto of the printed book of the *Rājaratnākara*.

Date of Composition

From the internal evidence of the Rājaratnākara one comes across the fact that king Dharmadeva, after ascending the throne in 1458 counselled the cantāi (i.e royal priest) Durlavendra and the two other ministers Bāṇeśvara and Śukreśvara to write down chronologically the events of his ancestors. If it is historically held that the chronicler collected and investigated a mass of details about the former kings and subsequently, rhymed their couplets before the king, then the period of the composition of the *Rājaratnākara* which consisted of the two volumes, namely, Pūrva-and Dakṣiṇavibhāgas, couldn't be protracted beyond 1462, the year of Dharmadeva's death[2]. So it transpires that the chroniclers had to accomplish their task in a great haste. There are however, some other pieces of internal evidence which, too, testify to the book's hasty composition. It is a fact that the authors of the *Rājaratnākara* borrowed excerpts from the various Purāṇas and *Mahābhārata* at many a place of their book. Though at some places they acknowledged the receipt of the debt from their predecessors, there are still other places where there is no acknowledgement for the use of the excerpts from the other books. The episode of Urvaśi-Purūravas of the Third Canto; the dialogue between the snake and Yudhiṣṭhira of the Fourth Canto, the love-episode of Yayāti'-Devayānī-Śarmiṣṭhā of the Fifth Canto etc. are the places where the predecessors names etc. are referred to. But at the following places the authors of the *Rājaratnākara* did not acknowledge the receipt of a number of excerpts, they quoted from the other older books. Thus in the Sixth Canto the sage Kapila is quoted as saying to Druhyu the same litanies of Viṣṇu, which he earlier said to his mother in the *Bhāgavata Purāṇa*; in the Seventh Canto, king Setu's preceptor quotes to the disciple the same elements of good habits, which Aurva narrated to king Sagara in the *Viṣṇu Purāṇa*, in the Eight Canto, the Fire-god imparts to king Gāndhāra the same knowledge of the archery, which he elaborated before the sage Vaśiṣṭha in the *Agni Purāṇa*; in the Ninth Canto the eulogy of the river Ganges contains the two certain verses which are identical with those of the *Viṣṇu Purāṇa* again in the same canto king Arijit quotes some verses in Kapila's praise, which are identical with those of the *Bhāgavata Purāṇa*. The birth of the river Brahmaputra as described in the *Kālikā Purāṇa*, is also found in the Twelfth Canto of the *Rājartnākara*. One should, however, keep in the mind that although plagiarism is a modern concept, the general indebtedness of the authors of the *Rājaratnākara* to their earlier studies in the field may be explained away on the basis of the fact that just as on the one hand the Purāṇas and epics used to induct in their corpora the popular stories and anecdotes, which were floating in the common memory of the people, they on the other, lent plots, ideas and even excerpts in some cases, to the

younger writers for their newer compositions. Thus the Purāṇic and epic literature played the significant role of the National Storehouse of knowledge both in letter and spirit of the term.

General Description

Now to shed some light on the contents of the twelve cantos of the Pūrvavibhāga of the Rājaratnākara. It is, however, seen that after the first four panegyric verses of the First Canto, the authors have skillfully brought about the introductory part of their book. It is true that in the first panegyric verse the two gods, namely, Śiva and Kriṣṇa are praised through a figure of speech called śleṣa, but their benediction at the beginning of the book could well be a trait of a special religious cult which might have emerged at some point of time in the royal family of Tripura. The well-worded commentaries of the first two verses of the printed book of the Rājaratnākara may well lend some support to our above contention. Though, on the one hand these commentaries accounted for an attempt to popularize the cult of these tutelary deities among the people, the first panegyric verse of the Manuscript containing the praises of Śiva, on the other, went unglossed. One may, however, conclude here that on account of these two cultic differences there might also emerged, side, by side two separate genres regarding the preservation of the condices of the Rājaratnākara. This point will, however be illustrated again at some other places in the following pages.

In this introductory part the authors have stated that they undertook an attempt to collect materials for the compilation of the annals of king Dharmadeva's ancestors. For this, they had to deal with the Purāṇas, Rājamālā (possibly in Sanskrit), *Yoginīmālikā*, *Lakṣmaṇamālā*, the tantric compositions like *Bhasmācala* etc. Rāmāyaṇa Mahābhārata and the books written by Gautama and Gālava, the inscriptions, cut on royal monuments, temples and other plates, the records of landgrants and of the conferring of titles etc. and the floating folk memories about the ancient kings of Tripura (Not only is the bulk of these source materials lost today, but also the Dakṣiṇa vibhāga of the *Rājaratnākara*, one of the resultant parts of the aforesaid investigation, too, vanished without trace.) It is also said here that the royal priest Durlavendra first composed the *Rājaratnākara* in the language of the people of Tripura, whereas Bāṇeśvara and Śukreśvara simply made its version in Sanskrit.

In the Second Canto there is a description to the births of Candra, the primal ancestor on the line of the kings of Tripura and of Budha and Purūravas. Following in the steps of the mythological description, the birth of both Budha and Purūravas are said to have resulted respectively from the union between Candra and Tārā on the one hand and Budha and Ilā on the other. The authors of the *Rājaratnākara*, probably, had no other option than to write down the conventionally accepted mythological events, primarily because of their currency among the people.

In the Third Canto, the love episode of Urvaśi and Purūravas, as found both in the *Mahābhārata* and *Bhāgavata Purāṇa* has been quoted, although with some necessary editorial work. Though the authors has before them the other versions

of this episode, the ones found in the *Rgveda, Atharvaveda, Śatapatha Brāhmaṇa, Padma Purāṇa* and even in the Vikramorvaśīya Kalidāsa, they might have been impressed so much so by the poetical beauty of the texts of the *Mahābhārata* and *Bhāgavata Purāṇa* that they very pleasingly accommodated their texts in the *Rājaratnākara*.

In the Fourth Canto, it is said that Āyu succeeded his father Purūravas and after him, his son Nahuṣa ascended the throne. The famous dialogue between the sanke i.e Nahuṣa's mutilated form due to a curse and Yudhiṣṭhira, occurring in the *Mahābhārata* has become the subject of this canto.

In the Fifth Canto, the famous episode of Yayāti, Devayānī and Śarmiṣṭhā of the Mahābhārata has been mentioned. The fact that Matsya Purāna also contains, more or less, the identical verses of this episode of the Māhābharata points out that the texts belonging to the aforesaid National Storehouse of knowledge could well be exchanged mutually among its beneficiaries.

In the Sixth Canto, it is stated that Druhyu, following his father Yayāti's command, set out in the south-eastern direction to establish a new kingdom somewhere along the confluence of the Ganges with the sea. At this place, the authors, however, seem to have emancipated themselves from the clutches of the Puranic as well as epic style of writing. This freedom of theirs has, however, been reflected in the lucid description of Druhyu's journey down the path from his ancestral city to the new-found land.

Druhyu had to walk on for the fifteen long days to reach the hermitage of sage Jahṇu; as the prince took a dip in the Ganges, his suffering from fatigue went away. He got blessings from the sage and started again for Kapila's hermitage that stood on the river Kapilā. The prince, armed with the moral support of sage Kapila, established there a kingdom, Trivega by name. Druhyu, in his old age, went to Kapila's hermitage to listen to the litanies for the god Viāṣṇu which the sage quoted from the Bhāgavata Purāṇa.

In the Seventh Canto, it is said that Druhyu was succeeded by his son Babhru and after Babhru, Setu ascended his father's throne. Setu's preceptor one day related to the king a long description about the elements of good habits, which already formed a part of the dialogue between Aurva and Sagara in the Viṣṇu Purāṇa. Anyway, Setu's successor was his son Āradvat and after Āradvat, Gāndhāra, his son became the king.

In the Eighth Canto, it is related that Gāndhāra obtained from Agni the skill in the archery. Though the Fire-god's lecture on the archery constitutes the entire subject of the canto, it is nothing but a replica of the same god's speech on the matter, which he earlier communicated to *Vaśiṣṭha* in the *Agni Purāṇa*.

In the Ninth Canto, it is stated that Gāndhāra's son Dharma ascended the throne. After him, his son Dhṛta became the king. He was succeeded by his son Durmada. One day this king went to visit Cyavana's hermitage on the bank of the Ganges, where he listened to the praise of the river Gangā from the sage. Though a number of stanzas are generally found in the praise of the river Ganga in many a Purāṇa and in the *Mahābhārata*, the text of the Rājaratnākara at this

place contains among other the two verses, which are identical with those of the Viṣṇu Purāṇa. After Durmada's death, his son Pracetas became the king. It is said that this king used to spend half the collection of taxes for the welfare of his subjects, the one-fourth for his sustenance and the remainder was deposited in the royal treasury. After his death, Parāci, the eldest of his one hundred sons, ascended the throne. It is also stated there that once this king went out on the conquest of the directions. Before he started for it, he handed over the charge of the kingdom to his son Parāvasu as he felt a sense of uncertainty of his return from the expedition. Parāvasu was generous king. He established his son Pariṣad on the throne before retiring to the life in the forest. After Pāriṣad, his son Arijit became the king. One day this king went to sage Kapila for a boon to get a son. He quoted two verses from the Bhāgavata Purāṇa in Kapila's praise. He got son Sujit through Kapila's boon. He retired to the forest after the coronation of his son in the throne. After Sujit, his son Purūravas became the king. It is said that this king established his son Vivarna on the throne and then, retired to the penance groove in Naimiṣa. After Vivarna his son Purusena ascended the throne. It is said that Prusena went to Ayodhyā on an invitation from king Daśaratha to attend a sacrificial ceremony.

The Tenth Canto exclusively deals with the career of Meghávarna, Purusena's son. At the beginning of the canto, there is a description of the capital of Trivega kingdom. It seems that a real description of a certain medieval city was poetically grafted on the ancient city of Meghavarna. In this canto, one, however, comes across a series of episodes whose central point is the Svayamvara marriage between Meghavarṇa and Sulakṣaṇā, the princess of the kingdom of Cedi. Though Virabāhu, the king of Cedi consented to arrange a choice marriage for his daughter of fascinating beauty, sage Yāvāli, the king's mentor meditated some plans and came all the way to create some love in Meghavarṇa's mind for Sulakṣaṇā. The young king accepted the sage's invitation and agreed to take part in the choice marriage. Thus, the choice marriage turned to be a manipulative one and yielded in the end some misfortune both for the bride and the bridegroom. At this point of the situation, sage Nārada, who is fond of diplomatic moves, appeared in the scene. He first of all, managed to endear himself to the king of Cedi. Though his interference in the choice marriage was quite uncalled for, he went out on a wild spree to offer invitation to the gods and the brahmins, he could lay his hands on. On the day of marriage, no sooner had the gods understood the barrenness of the choice marriage than the bride acting upon the covert instructions of Nārada, selected Meghavarṇa as the husband. The gods were offended at their being thoroughly outsmarted by Nārada. But, Indra's anger, however, knew no bounds when Nārada, out of his diplomatic design, showered praises upon Meghavarṇa, the victorious suitor in the choice marriage. In a combative mood he started hurling both abuses and weapons at Megahavarṇa. As the other gods timely interfered, the armed combat between the two was averted. But Indra threatened to kill Meghavarṇa some other day and left the place. The god was true to his words as he later killed Meghavarṇa with the thunderbolt.

The episode of Nārada, as found in the Tenth Canto of the printed book of the *Rājaratnākara*, however, contains a description of the dual gods Kṛṣna-Kālī's worship by the princess Sulakṣaṇā. But the Manuscript has completely avoided the episode of Nārada probably because of the fact that the cult of the dualité-unité Kṛṣṇa-Kālī was not accepted by the protagonists of the genre of the Manuscript of the *Rājaratnākara*.

In the Eleventh Canto, it is said that Meghavarṇa's queen wanted to do a 'satī' after the king's death: But her friends pleaded with her not to do this because she would have to look after the upbringing of her little son Vikarṇa. The son ascended the throne in the proper time. But, after his death, his son Vasumat became the king. He was succeeded by Kīrti, his son. Kīrti was a licentious king. After his premature death, his son Kanīyas became king. He was a very upright king. Pratisravas, his son, succeeded him. On being disillusioned with the royal pleasures in his old age, he made his son Prātiṣṭha the king of the country. Prātiṣṭha instituted many sacrifices, assumed the central position of the maṇḍala of the kings.[3] After his death, his son Śatrujit became the king; his son was Pratardana; the father sent his son to Viśvāmitra's penance grove for his training. On his way to Viśvāmitra's penance grove Pratardana made some pilgrimages to Lauhitya, Karatoya etc. After completing the training in the preceptor's house he came back to Trivega; the old king handed over the kingdom to his son and went out on the pilgrimage to Badarikā.

In the Twelfth Canto it is stated that when Pratardana was on the journey to his preceptor's house, he listened to what one brahmin told him in a place on the river Brahmaputra. He heard from the brahmin both about the Brahmaputra and Tripura. It was related to him that the land of Tripura, which lay outside the influence of the Aryan culture, was under the control of the Kirātas. God Śambhu and Goddess Śailendra-nandinī verily liked this place, as if was their favourite travel spot. The land was full of rivers; its rich soil produced plentiful crops. This land, which was stretched from the Himalayas to the sea had mines of gold and silver; its forests were full of medical herbs and various wild animals. It was also said that Goddess Tripurā-sundari and God Śiva too, dwelt in this country. After this, the source of the river Brahmaputra was also described at this place just on the lines on the *Kālikā Purāṇa*.

On hearing the description of Tripura from the brahmin, Pratardana made up his mind to conquer Tripura. After his father's reign, he, however, set out in the eastern direction for the conquest of Tripura. He crossed the river Brahmaputra and stationed his troops well within the territorial border of Tripura. From there, he sent to the leader of the Kirātas a messenger who carried to the place of the chief the king's message 'run away or fight'. The lord of the Kirātas turned down the proposal; he collected his troops and went out to fight the aggressor. After a fierce battle of fourteen long days the leader of the Kirātas, embracing defeat, ran away from the battlefield. Pratardana, the victorious king, conquered the minds of the people of Tripura, too. He consoled their minds, redressed their grievances and cast influence on the minds of those who still favoured the reign of the Kirātas.

He brought from Trivega the huge royal umbrella, a chowrie, the chief minister, officials and judges to set up an administration in the new kingdom. He also built a beautiful city there. A son was born to him. He is Pramatha. Though the young prince got education in the childhood, yet, he was haughty by nature. But, he was very skillful in the horse-and elephant-and chariot-rides and in the martial arts of bow and wrestling.

After this, the cantāyi gave a speech on the boundaries of the land of Tripura and ended the first volume (Pūrva-vibhāga) of the *Rājaratnākara.*

Depiction of Characters

The authors of the *Rājaratnākara* have displayed a superb skill in depicting the different characters in their composition. But, it appears that their deftness in this matter reached the zenith when they dealt with the characters outside the bounds of the influence of the Purāṇas and *Mahābhārata.* The character of sage Nārada, who appears in the episode of Nārada of the Tenth Canto, may, however, clinch this point.

Nārada was very much fond of various diplomatic moves. After he heard what the king Virabāhu of Cedi kingdom was going to do for his daughter Sulakṣaṇā's marriage, he not only wished the king all success, but also made some considerable inroads on the management of the marriage of the king's girl. He strengthened his position in this matter with the following words.

rājan tavābhailaṣitaṃ pūrṇatāṃ yāsyati dhruvaṃ/
satkarmaṇāṃ hi kāryeṣu sarve yānti sahāyatām//

(*Rajaratnakara* X.90)

'O King, all your hopes will surely go fulfilled. For, all extends help to them who accomplish good deeds'.

Nārada's resourcefulness is also visible when he sets out for heaven to invite the gods to this choice marriage. In the way while traversing a village of the brahmins he urged the inhabitants there to attend the marriage of the princess of Cedi. But the brahmins expressed their inability to comply with his request because he carried no valid invitation from the king. At this, Narada grudged their vanity by saying that it behoved the noble and intelligent ones to await an invitation, but the brahmins whose sustenance was begging, ought not to wait for any invitation. His sharp and pointed remarks in this regard runs thus.

nimantraṇam apeksante mānavanto manasvinaḥ/
bhiksopajīvino viprā nāpekṣante nimantraṇam//

(*Ibid.* 99)

It seems that Nārada was well informed about the princess Sulakṣanā's intellect and learning. He probably knew about the innermost feeling of her mind. So, he was able to echo successfully what the princess had in her mind when she was proceeding to select her husband at the place of the choice marriage. Nārada's play on words on this court is, however, as follows:

āyāto laghuvāhanaṃ parijahad yo labdhavarṇo mahan/
yo jiṣṇuḥ śatakoṭināyakatayā lokair alam gīyate//
vikhyāto vibudheśvaras tava krte yaś caikatāno bhavat/
bhaktyā bhāvini meghavāhanam amuṃ mālyena mānaya//

(*Ibid.* 153)

'O fair one, honour him (i.e Indra) with the garland, as he already came to you, him, the great, victorious and cloud-riding one, who has abandoned the other heavy vehicles, who has accepted the praises, who is verily praised by many because of his possession of the thunderbolt, who is of great fame and the king of the gods and whose heart is solely pointed towards you'.

(Another meaning) 'O fair one, do not accept (mā naya) this cloud-riding Indra: but select (mānaya) him (i.e Meghavarṇa), who, giving up the insignificant part of his name and endorsing the word 'varṇa' in the stead, came to you, who is great and victorious, who possesses immense wealth, who is of great fame and the protector of the learned men and whose heart is solely pointed towards you.

Nārada was Kṛṣṇa's protégé. Rising early in the morning he used to take a bath in the Ganges, marked his body with the deity's name. It is characteristic of him that he felt, as it were, an irresistible urge to disclose a secret to other It is said that once he disclosed to Meghavarna that Indra was thirsting for his blood and cautioned him as well, accordingly. Thus, this wandering sage danced almost all-be it the king of the gods or the poorest brahmin, to his own tune.

Meghavarna's is a tragic story. It seems that his capital, which was surrounded by the moats, beautified with the highrises, inhabited by the poets, siddhas and vidyādharas, guarded by the armed soldiers and endowed with the sounds of songs and dances, was not his real solace. When the whole country was humming with life, the king still remained a bachelor.

On such a day like this, sage Yāvāli came all the way from Cedi to convey a prior message of the choice marriage of the princess of theirs. It seems that Meghavarṇa, who was the valiant and upright king of Trivega, was made aware of the outcome of that manipulative choice marriage. Still, he readily agreed to go as suitor of the princess: whose fascinating beauty attracted not only the other powerful kings, but also the gods of heaven as well. But his destiny smiled a bitter smile.

Sage Yāvali, who was Hari's protégé, knew already that Indra and other gods would adorn the place of marriage. Sage Nārada, a devotee of Kṛṣṇa's, invited the gods to be present in the choice marriage, which never was a transparent one.

It, however, appears that on the day of marriage a tense atmosphere started prevailing between the followers of the two cults — Kṛṣṇa's devotees on the one hand and Indra's followers on the other. The situation however, got more tensed as soon as the princess Sulakṣaṇā, who was herself a devotee to Kṛṣṇa-Kālī, selected Meghavarṇa as the husband under the influence of Nārada's implicit instructions. Nārada added fuel to the fire when he sang out in the praise of

Meghavarna's victory, which apparently reduced Indra's glory in the hierarchy of the gods. Meghavarna was Indra's worshipper. But he was already entrapped both by Yāvāli and Nārada in such as a way that he had no other alternative than to incur his deity's wrath. Thus, a battle between Indra and him became inevitable. It is true that Meghavarna follwoing in the steps of a ksatriya king made so bold as to challenge Indra in the ensuing combat but he understood, as it were, that though the war was averted at the behest of the other gods, he would have to pay the penalty of the error, committed unknowingly by him in the assemblage of the choice marriage. Frustrations might have overpowered him when he committed another mistake which cost him his life. Though sage Narada cautioned him about Indra's threat, set out one day on a hunting excursion in a deep forest. Suddenly, the day turned cloudy and the king's companions left him alone in the wilds. Indra took the opportunity to hurl the thunderbolt at him. But Meghavarna was, able to gather some courage to offer the last song of life to Narāyana, his deity. It seems that his unflinching devotion to Narayana could well have been a result of his contact with Sulaksana, his beloved wife.

Pratardana's valiant struggles are described all through the concluding part of the Eleventh and the whole of the Twelfth Cantos. His father Satrujit sent him to Visvamitra's penance grove for his training. One day he came back home from the preceptor's house but he had already developed a mental faculty, with which he used to respond to the call of the far distance while going to his preceptor's house he made a pilgrimage on the river Lauhtya. There he met an Brahmin, who gave him an account of both Tripura and the river Brahmaputra, which started sounding to him as if it were a call of the far distance.

After returning home from his preceptor's house the young prince pleaded with his father to allow him to conquer the land of Tripura. But, the father was, perhaps, aware that his son's plans for conquering other countries smacked more of an adventure than a conquest of the direction. So, he wished that his son should give up these dangerous plans as such. Pratardana accepted his father's advice.

When Pratardana became king after his father, he started thinking to execute his earlier plan to conquer Tripura. One day he set out in the eastern direction with the army. He crossed the river Brahmaputra and stationed his troops well within the territorial border of Tripura. He sent to the ruler of the Kirātas the message 'either run away or fight' through a messenger. But the lord of the Kirātas turned down Pratardana's proposal and fought him vigorously. After the fierce battle of fourteen long days the leader of the Kirātas fled from the battlefield and the triumphant king conquered the land of Tripura. He consoled the fleeing people, brought them back to their settlements, granted general mercy to those who came over to his side and waived taxes for one year. And the people accepted him as their king.

To set up a good administration among his subjects of Tripura, he brought from Trivega the huge royal umbrella, chowrie, chief minister and other officials. He garrisoned the troops in forts and engaged them in the drill and other military exercises. Then he established a beautiful city at the request of his subjects

Pratardana was the first king to establish monarchy and kingship in Tripura. It is true that his excitement to conquer the far distant countries dragged him as far as Tripura and endowed him both with prosperity and fame. The authors of the *Rājaratnākara* said about him that just as the sons of Kuntī were the most meritorious among the Purus, the one of good fame was Pratardana, among the descendants of Druhyu–

pauravānāṃ yathā pārthāḥ śubhānām āspadaṃ kila/
drauhyavānāṃ tathā rājan puṇya-ślokaḥ pratardanaḥ//
(*Ibid* XII.103)

Rhetorical Appreciations

To evaluate the composition of the *Rājaratnākara* from the rhetorical point of view it may be said that the various metres used in it make the verses run in a very charming manner. In the samavṛtta type of verses almost all the popular metres are used while in the viṣamavṛtta type of verses it is only a particular metre, namely, anuṣṭubh that comes in handy for the authors. But, in the verses of the jāti type, the metre invariably is the āryā. Thus, in the first verse of the printed book of the *Rājaratnākara,* which is a samavrtta type of composition, the metre is śārdūlavikrīḍita, whereas in the Manuscript, the first verse is written with the metre sragdharā. One, however, comes across a number of samavṛtta verses containing many wellknown metres, in the episode of Nārada of the Tenth Canto.

In the matter of application of rasa (i.e sentiments) the authors of the *Rājaratnākara* have shown their poetical power to a great extent. The following verse, however, testifies to their ability in this aspect.

yuvāpi yo bhoga-sukhāni hitvā kandādibhuk tāpa-tuṣāra-soḍhā/
santyajya gehaṃ vinivṛttakāmo babhrāma tīrtheṣu ca kānaneṣu//
(*1 bid* 1.7)

—'He was a youth. Still, he gave up the comfort of mundane pleasure. He sustained himself by earing roots etc. and went on enduring the brunts of heat and coolness. He left the homestead and on being disillusioned of all desires, he wandered many holy places and groves'.

In the above verse, the ālambana vibhāva is the frailty of mundane pleasure. The uddīpana vibhāva manifests itself both in the holy places and penance grooves. The anubhāva is the ability to endure heat and coolness and the vyabhicāri-bhāva is the state of being disillusioned. So, the three bhavas, namely, vibhava, anubhava and vyabhicari-bhāva being linked with each other, have created the śānta rasa (i.e the sentiment of quietism) in a very charming manner.

About the figures of speech which multiply the beauty of the various verses of the *Rājaratnākara,* it may, however, be said that the authors displayed their dexterity in dealing with the matter. Thus, in the first verse of the printed book of the *Rājaratnākara* the figure of speech is sabhanga śleṣa, whereas in the next verse it is virodhābhāsa. The following verse of the Twelfth Canto contains the anumāna kind of the figure of speech.

meghavat sainyaghoṣeṇa bāṇānām varṣaṇena ca/
raktapicchilamārgeṇa jātaṃ durdinavad dinam//

(I bid. XII 80)

The soldiers were making sounds, as if, they were the clouds; the arrows were made to fall and the paths became slippery with blood; the day, as it were, turned into a bad day.' '

The Authors

About the personal life of the two brothers Bāṇeśvara and Śukreśvara, we know almost nothing. According to Kaliprasanna Sengupta, the two brothers were the brahmins from Sylhet.[4] He further says on the basis of the *Rājamālā* and the *Copper plate* of Dharmamāṇikya that Bāṇeśvara was one of the brahmins whom the king settled on the banks of a big tank, Dharmasāgara, by name, which he dug in 1458 in the middle of the town of Comilla[5].

We also know nothing about the life of Durlabhendra, the royal, priest (i.e Cantāi), who reducted the *Rājaratnākara* in the Tripura dialect. Kaliprasanna Sen holds that there was a time when the task of preservation of annals relating the successions of the kings of Tripura, was with the worshippers of the Fourteen Gods. But, at a later time, it was assigned to the courtiers of the kings[6]. Elsewhere, the scholar dwells upon the term 'cantāi' and says that the word 'cantāi' or 'cantāyi' is derived from the Kuki word 'cuyāntāi' which means the priest of the Halam community, a branch of the Kukis[7].

References

1. Cf. Kaliprasanna Sen Pūrvābhāsa, (in) Śrī rājamālā (First part) Ed. Agartala, 1926. p.1
2. Cf. Kaliprasanna Sen Psrīrājamālā (First part) (Ed) Agartala, 1926. pp.81-82

   Cf. Kaliprasanna Sengupta, Maharāja Dharamamāṇikya (in) Panchamāṇikya Agartala, 1941. p.8.

3. In ancient Indian polity, there however, emerged a theory of 'maṇḍala' which was based upon a conception of the balance of power. According to Kāmandaka, a maṇḍala was generally formed out of twelve kingdoms. One of them occupying the central position was called vijigīṣu. In his front there would, usually, have remained five other kings, namely ari 'mitra', 'arimitra', 'mitramitra' and 'arimitramitra'. In his rear, there would also have existed four other kings, namely, 'pārṣṇigrāha', 'ākranda', 'pārṣṇigrāhāsāra', and 'ākrandāsāra'. One who held the middle position between the 'vijigīṣu' and 'ari', was called 'madhyama' and the one, who remained indifferent about them was known as 'udāsīna'. The twelve kings, usually consituted a maṇḍala out of some political exigencies of their time. Mallınātha quotes the following verses of Kāmandaka in his commentary on *Raghuvamśa* IX. 15.
   arir mitram arer mitraṃ mitramitram ataḥ param/
   tathārimitramitraṃ ca vijigīṣoḥ puraḥsarāh//
   pārṣṇigāhas tataḥ paścād ākrandas tad anantaram/
   āsārāv anayoś caiva vijigīṣos tu pṛṣṭhataḥ//
   areśca vijigīṣoś ca madhyamo bhūmyanantaraḥ/

anugrahe saṃhatayoḥ samasta-vyastayor vadhe//
maṇḍalād bahir eteṣām udāsīno balādhikaḥ/
anugrahe saṃhatānāṃ vyastānāṃ ca vadhe prabhuḥ//

4. Kaliprasanna Sengupta, 'Māharāja Dharmamānikya' (in) *Pañcamāṇikya*, Agartala, 1941, p. 4-6.
5. Kaliprasanna Sen, 'Dharmamānikyakhaṇḍa' (in) *Srīrājamālā* (Second part), Ed. Agartala, 1927, p. 15.
6. Kaliprasanna Sen, 'Vaṃśa-vivaraṇa' *Ibid*, p. 15.
7. Kaliprasanna Sen, Tripurār kuladevatā (in) *Ravi*, Vol. II, Agartala, 1926, p. 124.

Bibliography

(a) *Texts*

Agni Purāṇa — Agnipurāṇam, Publisher, Jīvānanda Vidyāsagar, Calcutta, Saraswati Press.

Kālikā Purāṇa — *Kalika-Purāṇam*, Ed. Pañchānan Tarkaratna, Calcutta, 1384 (Bengali Era), Nava Bharata Publishers.

Matsya Purāṇa — *Matsya-Purāṇam*, Pub. Jivānanda Vidyāsagar, Calcutta, Saraswati Press.

Mahābhārata — *Mahābhāratam*, Ed. Haridās Siddhāntavāgīśa Bhattācharya, Calcutta, 1337 (Bengali Era)

Raghuvaṃśa — *The Raghuvaṃśa of Kālidāsa* (with commentaries of Mallinātha) Ed. Gopal Raghunath Nandargikar. First-Pub. Poona, 1897, Fourth edn., Delhi. 1971, Motilal Banarsidass.

Viṣṇu Purāṇa — *Visnu-Puranam* (with the Atmaprakasa commentary of Sridharasvamin and the footnotes arranged by Kalipada Tarkacarya) (in) *Sanatanasastram* (set up by Sitaramdas Onkarnath)

Bhagavata purana — *Śrīmad bhāgavata-mahā-purāṇam*, Pub. Ghanasyamadas Jalan, Gorakhpur, 2008 (Vikrama Era), Gita Press.

(b) *Reference books :*

Sen/Sengupta, Kaliprasanna, — *Śrīrājamāla* (First and Second parts) Ed. Agartala, 1336-37 (Tripura Era), Rājamālā Kāryālaya.

- Tripurār kuladevatā, *Ravi*, Vol. II, Agartala, 1336 (Tripura Era).

- *Pañcamāṇikya*, Agartala, 1351 (Tripura Era), Rājamālā Kāryālaya.

Psychological Readings of Religious Texts: Some Guidelines and Illustrations

Joseph T. O'Connell

Introduction

Religious texts have long been the subject of inquiry by those interested in the workings of the human mind and feelings, of the human psyche. This is hardly surprising, especially for inquirers interested in implicit, unconscious or unusual psychic factors affecting human behavior. Religious texts, some of them at least, are remarkably explicit or 'open' about what many would consider personal and private or, if made public, rather strange, uninhibited, even 'mad' modes of experience. Statements and behaviors that might seem paradoxical and mysterious, or on the other hand even trite or banal, in profane situations may in religious texts and contexts be highlighted, positively valorized and elaborated. Some religious autobiographic testimonies and prayers as well as sacred biographies and hagiographies deliberately lay bare (or aspire to) the subjective psychic experiences of the religious figures concerned, albeit from the perspective and in the language of a particular religious orientation. Even when no individual is its subject, a religious text may contain symbolic imagery and dramatic scenarios intended to reflect or elicit psychic states or behavioral patterns inviting psychological inquiry and interpretation. Not surprisingly then, religious texts are among the more basic sources for serious psychological study of religion.[1] Such texts also have provided grist for the mills of many poorly researched or casual—even arbitrary and sensational—forays into popular psychologizing about religion.

The objective of the present essay is to comment, from the perspective of academic study of religion, on the opportunities, problems and responsibilities facing those who would venture to do serious psychological research and interpretation of human religious phenomena based in whole or (preferably) in part on religious texts, especially those treating the lives of individuals deemed to be divine or saintly by their 'adherents', i.e., those persons who share the religious orientation articulated in those texts. As much of my own study and research has revolved around the Bengali religious figure known as Caitanya (1486-1533)[2] and the community of Vaisnava devotees that crystallized around him, most of the applications or illustrations herein are from Caitanya Vaisnava texts and related devotional practices. Though my own training has not been in psychology, it has not been possible to ignore the potential for psychological investigation posed by

the words and actions attributed to Caitanya and his followers in sacred biographies and hagiographic texts and by the system of spiritual formation or discipline (*sadhana*) employed by them.[3] The goal of their *sadhana* is precisely to transform one's personality so as to approach as closely as possible to the ideal of loving devotion (*prema-bhakti*) to Lord Krishna epitomized by Caitanya. The early (i.e., composed within about eighty years of his passing) sacred biographies of Caitanya, culminating in Krishnadasa Kaviraja's authoritative *Caitanya Caritamrta*, are remarkably informative sources for research on the beginnings of the Caitanya Vaisnava movement and community as well as on Caitanya himself.[4] Accordingly, in 1990 I prepared a set of lectures for the Indian Institute of Advanced Study at Shimla addressing the sacred biographies of Caitanya as sources for historical, sociological and psychological study of religion. A revision of the 'psychological' lecture was presented in Ottawa and subsequently published.[5] In both versions, I propose—as I do here—that psychologists collaborate with scholars of religion (and others as appropriate) for research into the psychological aspects and implications of human religious life. In the present essay I propose that for optimal results, such inter-disciplinary research on psychological implications of religious texts be coordinated, where feasible, with participant observation of contemporary devotional experience and include in the research team itself one or more articulate adherent to the religious orientation being studied. Also I propose some guidelines for such joint research in the interests of maximizing the perceptiveness, accuracy and effectiveness of such research and of minimizing needlessly upsetting adherents and occasioning controversies which may inhibit further legitimate research. Then I illustrate some topics and issues pertinent to psychological study of religion that are likely to arise in the course of research on Caitanya Vaisnava texts and related practices. But the proposed guidelines would apply *mutatis mutandis* to psychological research and interpretations based on religious texts and related practices of many sorts, not just Caitanya Vaisnava ones.

Sensitivity and controversy

Psychological research and writing based on religious texts and practices can contribute significantly to our understanding of human experience if done well. But this does involve sensitive matters and can aggravate tensions and conflict, especially if contemporary individuals or groups object to what they deem to be disrespectful to or distorting of the meaning of religious texts, persons or symbols they claim to hold dear and sacred. Controversy is all the more likely in the case of sexual-psychoanalytic interpretation of religious texts or of the religious figures whom the texts extol or of those adherents collectively who fashion their religious lives according to such texts and exemplary figures. Even within academic circles there are debates over the validity, propriety and appropriate methods and protocols of psychological probes into religious and literary texts, especially texts arising from cultural milieus other than that of the psychological theory being applied. A couple of decades ago there was an

especially lively academic debate over the alleged neurotic character of Hindu asceticism—with Jeffrey Masson arguing the affirmative and the late Agehananda Bharati arguing the negative.

Disputes more acrimonious than academic debates also may arise. Some may spring from spontaneous reactions of adherents offended by what they read or (as is more often the case) hear about second-hand. Religious organizations, ethnic groups or political communal interests may mobilize for a *cause celebre*. Nowadays one determined individual can orchestrate an Internet campaign of polemic against an allegedly offending scholar and sponsoring institution. There has been considerable negative reaction to Jeffrey Kripal's *Kali's Child*,[6] in which he analyzes what he considers sublimated homosexual aspects of Ramakrishna's behavior, an interpretation hotly contested by devotees of the celebrated saint or god-man. On the other hand, there has been no lack of scholars praising the book and its author. Paul Courtright's book on Ganesa also has come under fire nearly twenty years after its publication, thanks to an Internet campaign launched by a retired Hindu businessman in the United States.[7] One is tempted to dismiss such objections, especially the more strident, as motivated, misguided or unscholarly, all the more so if backed by institutions or pressure groups with vested interests at stake.

On the other hand, as the saying goes, 'Love thy enemies for they tell you your faults'. We as scholars may have something to learn from those who do not appreciate what we do or how we do it. Certainly we must address any valid criticisms. Nor should it hurt to be reminded to do in as careful and competent a way as possible any research or writing that is liable to be sensitive or controversial. In this essay I do not propose to assess the merits of Kripal's or Courtwright's work or of the widely disseminated publications of Wendy Doniger (erstwhile O'Flaherty)[8] highlighting, among other themes, the paradoxical sexuality and asceticism of Siva and an alleged bifurcation of female images in Hindu mythology (and by implication in the typical Hindu male psyche) or of the more outspokenly Freudian and sexually focused early studies of Masson[9] and others. Rather, as indicated above, I propose some basic guidelines for doing optimally effective but minimally offensive psychological research on religious texts and related practices. Then by way of illustration I draw attention to several aspects of Caitanya Vaisnava texts and related practices that would seem to be especially promising foci for psychological inquiry along the guidelines being proposed here.

Suggested guidelines

Affirm the legitimacy of psychological research and plausible interpretations of religious texts. All texts, including religious ones—whatever may be their ultimate origin or nature—bear the marks of proximate human agency in their historical composition, transmission and application to human life. Once made public they are part of the cultural heritage of humankind as a whole, not the exclusive property of any parties claiming sole custody of their interpretation. As such they

are legitimate subjects for being studied by whoever has the ability to do so for what they may disclose about human life.

2. *Reject any claim that psychological research or interpretation reveals the definitive or ultimate truth of human nature or experience.* Psychology has no privileged *a priori* claim to being true, valuable or valid (least of all exclusively valid) as an interpretation of human experience. Its truth, validity and value are as subject to substantiation, scrutiny and critique as any other interpretations, including the religious interpretations of adherents

3. *Acknowledge and address the distinctive meaning a religious text has for its adherents.* Any text or its subject, insofar as it is held to be revelatory or sacred by its adherents has a distinctive meaning and value for them that it does not have for others, including the researchers (unless they happen to be adherents). Researchers should acknowledge this, inquire into and seek to understand as best they can the adherents' distinctive engaged meanings (which may include emotional and volitional as well as cognitive aspects). Researchers in the psychology of religion should give those adherents' meanings due consideration when formulating interpretations of the adherents' psychological experience or behavior.

4. *Assess the sensitivity of proposed research and its publication and the risks it may entail for adherents, informants and researchers.* Researchers should be aware of the sensitivity of persons to psychological research and interpretations of religious and sexual matters affecting them directly or indirectly. Also they should consider what risks adherents and informants (and, for that matter, researchers and the research itself) may be exposed to by an anticipated project and its publication.[10] On the basis of such assessment, they should decide whether or not to proceed with the project or to modify it so as to minimize risks and forestall objections and reprisals.[11] I do not, however, propose that subjective appeals by some adherents (or those claiming to speak for them) that their religious 'feelings' are being 'hurt' or that they being 'hated' should have a veto over competent research on religious texts and/or practices. Nor do I endorse blasphemy laws or their equivalents. Such restrictive sanctions are all too easily manipulated by repressive religio-political vested interests. It is the religion scholars and psychologists themselves who should be most sensitive to the sensitivities of those they study and appreciate the religious and psychological significance of such sensitivities.[12]

5. *Consult and collaborate with adherents.* The most basic constructive way of being alert to sensitivities of adherents and of minimizing risk and hurt to them is to consult and collaborate with adherents before and during the project It would be even better, where feasible, to involve one or more competent adherent in the design and execution of the research itself, to engage him, her or them as member(s) of the research team. Over and above 'risk reduction', one major benefit for non-adherents on the research team would be rapid introduction to

what the adherents consciously mean and how they feel in relation to the religious texts and practices being studied.[13]

6. *Work as an inter-disciplinary research team.* It be may be attractive and convenient for the lone scholar of religion or psychologist to attempt solo research and publication on psychological aspects of religious texts and their adherents. But the complexity and sensitivity of such research—as well as its potential value if done really well—point to joint interdisciplinary research as the better way to go. The core research team then would consist of at least: 1) psychologist interested in religion and willing to inform him/herself about the socio-cultural milieu and explicit religious understanding of adherents; 2) scholar of religion knowledgeable about the texts, practices and history of the focal group of adherents; 3) one or more well-informed articulate adherent (who might or might not also fill one of the roles mentioned above or below). In the event that the above three core participants do not among themselves possess the requisite competences in language-literature and field research, the team should include either or both of: 4) language-literature scholar competent in the focal texts and their contexts; 5) social scientist (in cases where there are living adherents), preferably one who shares the language and culture of the focal group, to direct field research.[14]

6. *Presenting the research as heuristic rather than definitive.* Any 'conclusions' about religious psychology drawn from the texts, even when complemented or confirmed by participant observation, interviews etc., should be considered provisional, hypothetical, interpretive rather than definitive. The ways that different humans or the same person at different times may internalize the message of a text are extremely variable. Hence study of human religious psychology through religious texts may be considered instructive primarily for its suggestive or 'heuristic' (problem-defining / problem-solving) function rather than for its 'diagnostic' function.

The research team as a whole and the psychologist and religionist in particular should make clear to themselves and to others what are the theoretical and methodological orientations guiding the project. They should declare publicly that the theoretical orientations with which they are working are not being presented as ultimate truth, not as constituting 'reality' over against the 'unreality' ('fantasy', 'self-deception' etc.) of textual message or personal religious experience. The orientations of the researchers constitute parallel (and possibly complementary) alternatives to the religious orientation embedded in the focal texts and practices.

7. *Judgmental restraint and tact.* Researchers and writers should refrain from intruding value-judgments into their reports unless very carefully defined and explicitly noted. Especially, they should avoid premature, simplistic applications of that problematic category, 'pathological'. Declaring something or someone to be mentally 'pathological' involves a highly speculative and often subjective judgment relative to varying standards of 'health'. It is possible to be tactful

without being deceptive, to be respectful without being obsequious, to be cognizant of the sensitivities of the focal persons, the adherents, without being paralyzed or muted by them.

Applications to Caitanya Vaisnava texts and practices

With the above guidelines in mind, we may consider how psychological research and interpretation of texts might proceed if directed toward Caitanya Vaisnava texts and related devotional practices. The Caitanya Vaisnavas and their literature are especially suitable for psychological inquiry into religious experience for several reasons. Their overall conception of religious life involves explicit and detailed analysis and manipulation of emotions and psychic states with the goal of cultivating ever more intense and refined loving devotion (*prema-bhakti*) to Krishna as God. To teach and inspire their adherents they describe in profuse detail in sacred biographies and hagiographies the behavior of Caitanya and other exemplary Vaisnava devotees and comment on the interior devotional states being expressed by them in word and gesture. They also produce an elaborate literature analyzing according to their religio-psychological frame of reference the varieties of devotional states and the procedures for attaining them.[15] However, although advocating systematic psychological research based on Caitanya Vaisnava texts and practices. I am sobered by what has been till now a rather desultory and controversial series of attempts in that direction.

The primary subject of these texts, Caitanya, repeatedly has been the subject of psychological comment by critics and retorts by Vaisnava stalwarts. For instance, the late Bimanbehari Majumdar in his *Sricaitanya Cariter Upadan* took to task one such critic for claiming that Caitanya was mentally ill.[16] Amulya Candra Sen's *Itihaser Sri Caitanya*[17] was for some time banned in the late 1960s for offending the religious feelings of the Vaisnavas. He too, in the course of a generally revisionist assessment of Caitanya, opined that the latter's exuberant devotional outbursts, loss of consciousness and other abnormal behaviors were due to epilepsy and concluded that Caitanya in his late years at Puri was more or less insane. His assessment, if not his tone, seems to be shared by Dimock and Stewart in their introduction to Dimock's formidable translation of the *Caitanya Caritamrta*.[18] More restrained but still negative comments on Caitanya's mental health and suitability as a model for others have been voiced by so eminent an Indian scholar as S.K. De.[19] On the other hand, many scholars and detached observers, plus vast numbers of Caitanya Vaisnava seem not to have considered Caitanya pathological (or not *merely* pathological or not pathological as the term is commonly understood) but rather as experiencing and expressing in extreme form the characteristics of passionate loving devotion.

In view of recent scholarly and popular interest in socio-cultural and political construction of gender and personal identity along with concern for the rightful status and roles in society of gay, lesbian and bisexual persons, it is likely that Caitanya Vaisnava literature and practices will come under scrutiny in these contexts as well. They present for emulation a refined and distinctive religious (or

religio-psychological) conception of human identity. It is one that comprises distinctive ways for cultivating what are considered typically female devotional-emotional sentiments and explicitly female spiritual identities (*siddha-dehas*) and modes of devout service—even on the part of male devotees. The much-heralded conception of Caitanya as comprising the female feelings / persona (*bhava*) and fair appearance of Radha though inwardly being Lord Krishna invites psychological inquiry not only regarding the hypothetical bisexuality of Caitanya in his human aspect, but about how as paradigm he may affect the self-esteem and identity formation of devout Vaisnavas and others. If indeed Caitanya and the Vaisnava literature and practices he inspired are to be inquired into, as very likely they will, for what they may teach us about extraordinary mental states, gender formation and mutability—however sublimated or visualized as spiritual experiences or identities—then it is desirable that such inquiry be done with the sensitivity, competences and precautions as aimed at by the guidelines suggested above.

I do think that there is much of value to be learned from psychological investigation into Caitanya Vaisnava devotion—learned about underlying human religio-psychological potential and processes generally, not exclusively about Caitanya Vaisnavas. It may be advisable, however, not to focus on these most sensitive and potentially controversial factors at the outset, and certainly not to be preoccupied with them. Instead the broader topic of personal transformation through the process of devotional formation or discipline (called *sadhana*) may prove to be a more suitable focus for initial research. Not only would it be less sensitive and controversial, it would establish the broader framework within which Caitanya Vaisnava ideas and practices make sense to their adherents (and indirectly to outsider observers). Especially for a psychologist new to Caitanya Vaisnava devotion, it would be crucial that he or she understand as well as possible what the adherents mean and feel in their own terms of reference before exercising or applying a culturally exogenous system of psychological interpretation. In the course of research into Caitanya Vaisnava *sadhana,* the more sensitive (and more susceptible to sensationalizing) issues of abnormal ('mad') psychic states and visualized ('spiritual') gender modification and bi-sexuality (symbolic and/or physiological) will likely arise, but within a *prima facie* meaningful Vaisnava context. Likewise, consideration of any special tolerance or congeniality of Caitanya Vaisnava symbolism for persons of diverse gender orientations—gay, straight, bisexual, asexual etc.—may be addressed in that context and perhaps redefined more subtly and flexibly by recourse to Caitanya Vaisnava religio-psychological categories.

Caitanya Vaisnava *sadhana* has been studied well from theological, devotional and literary-dramatic perspectives in English language books by several Western scholars[20] and by many Indian scholars, mostly in Bengali, but also in English, Hindi and other languages.[21] But, to the best of my knowledge there has been little or no rigorous research in the psychology of religion addressing the Caitanya Vaisnavas in detail, apart from studies of conversion of Westerners to the Hare

Krishna movement (International Society for Krishna Consciousness, ISKCON) and some wrestling with the issues of alleged 'brainwashing' and countervailing 'deprogramming'. Whether recent efforts within ISKCON to detect, root out and redress the damage done through sexual and other molestation of children within their community have contributed to psychological research on traditional Caitanya Vaisnava *sadhana* I do not know.[22] In any event, Western convert-adherents to Caitanya Vaisnava *bhakti* would seem to be strategically poised to mediate between study of traditional Vaisnava devotional life and contemporary psychology of religion and psychotherapy.[23]

Sadhana

Caitanya Vaisnavas' devotional *sadhana* is their systematic process for transforming a person's mind, heart and behavior so that he or she may better conform to the religious ideal of *prema-bhakti*, loving devotion, to Krishna. *Sadhana* is the Vaisnava equivalent to what is called 'spiritual formation' or 'spiritual exercises' in some Christian contexts. It also exhibits some affinities with certain systems of psychotherapy. There is already a wealth of Western experience and literature on spiritual formation and on psychotherapies that may serve as points of departure for inquiry into Caitanya Vaisnava *sadhana*. There are many elements of *sadhana* and combinations of them from which selections are made to constitute the *sadhana* actually practiced by a particular devotee at various stages in his or her devotional development / transformation. How these elements function in the life of a devotee and how they relate to the devotee's psyche as a whole should prove to be of psychological interest. There should be ample opportunity for the research team members to observe and interview devotees engaged in *sadhana* and to discuss among themselves (including, if part of the research team, a *sadhana*-directing guru) what they are observing and interpreting. Gurus directing *sadhana* and their disciples may wish to keep confidential their own personal mantras, visualizations and spiritual identities (*siddha-dehas*). Still it should be possible to secure their cooperation and testimony as to the typical contours of the practices followed and experiences encountered during the *sadhana*.[24]

Vaidhi and raganuga sadhana: enjoined and spontaneous devotional formation

One fundamental characteristic of Caitanya Vaisnava *sadhana* is its division into two quite different types: enjoined *vaidhi*, in which the motivation is the command or advice of a Vaisnava text or teacher; and spontaneous *raganuga*, in which the motivation is innate longing (*lobha*) for the devotional experience. The psychological characteristics of the two paths would appear to be quite different. How if at all the one (*vaidhi*) may induce or transform itself into the other (*raganuga*) is but one of the more interesting psychological questions that arise from this basic contrast of enjoined and spontaneous *sadhana*.

A cluster of interesting issues for the psychologist arises from the distinctive Caitanya Vaisnava program of *raganuga sadhana*. This program calls for intensive

meditation constituted by 'visualizing' (literally 'remembering', *smarana*, as Vaisnava prefer to call it) scenes of Krishna's divine sports (*lila*) as though the devotee him/herself were actually participating in those sports. Indeed more advanced devotees are instructed to 'visualize' / 'remember' (*smarana*) themselves as having the spiritual body (*siddha-deha*) of a minor player (typically, but not necessarily, a young girl, *manjari*) in the transcendental *lilas* of Krishna. Visualization is a common enough practice in a number of religious and secular humanistic types of meditation and personal transformation. The Caitanya Vaisnavas, however, invest their visualization with an ontological reality and a devotional value not claimed for many other types of visualization. The psychological implications, to the extent ascertainable, of this claimed ontological reality and devotional value of the devotee's visualized 'spiritual body' should be of considerable interest and significance to psychologist, religionist and devoted adherent alike. It should be noted in this context that it is the devotional feelings for Krishna being nurtured and the pleasing service being rendered to him through the instrumentality of the visualized spiritual body (*siddha-deha*) that are of utmost importance to the devotee, not the spiritual body itself and certainly not the mundane physical body of the devotee.

Sadhu-sanga: associating with the holy

Among Caitanya Vaisnavas there is much stress on collective devotional activity, generically designated as *sadhu-sangha*, association with the holy / devout. This may take such forms as group singing (*samkirtana*), gathering to engage in talk of Krishna (*krishna-katha*), congregating for festivals (*mahotsava*), collectively sharing blessed food (*prasadam*), joining group pilgrimages and marches (*tirtha-yatra*), offering worship (*puja*) as a group of the deity etc. Even ostensibly reclusive devotees retiring from worldly life to live in Vrindaban or other sites sacred to the terrestrial *lilas* of Krishna rarely go into isolation. Rather they 'retire' to places where they will be surrounded by fellow devotees and denizens of Krishna's pastoral realm, Vraj. There they will join others in the daily and seasonal rounds of Vaisnava affairs and festivals, depend upon the alms (*madhukari*) of others and, as appropriate, provide spiritual guidance to fellow devotees. While stress on collective religious (or socio-religious) activity—including visualized solidarity with fellow devotees in a transcendental realm—may not be unique to Caitanya Vaisnavas, the densely inter-locking ways they effect and express their devotional solidarity, interdependence and mutual deference (*vaisnava-vinaya*) should be of some psychological interest, especially for social psychology.

Sensitive and potentially controversial topics

Topics of psychological interest but of considerable sensitivity that arise from scrutiny of Caitanya Vaisnava texts include, as mentioned above, Caitanya's devotional 'divine madness' and 'divine bisexuality' and male devotees' ideal of 'spiritual femaleness.' That the topics 'arise' from scrutiny of the text need not imply that Caitanya or other ecstatic devotees were mentally sick or were in

physiological terms other than heterosexual, though these might be plausible, if speculative, interpretations. Caitanya himself as a young man is reported to have been on the verge of taking his own life in despair over his apparently insane experiences and behavior. It was the assurance of an older confidant, explaining that his apparently pathological symptoms were actually signs of genuine devotion of a high order that dissuaded him from so drastic a deed. It is not, however, my intention to try to resolve in this essay the issues arising from Caitanya's oft-depicted and oft-discussed eruptions of devotional fervor, anguish and ecstasy.[25]

Nor do I attempt to resolve the yet more sensitive and much less discussed issues concerning what may be the physiological concomitants of Caitanya's divine bisexuality, of the devotional-erotic attraction of certain male devotees for Caitanya (or each other), or of the predilection of advanced devotees to visualize themselves as female in their devout love for Krishna. The scarcity of scholarly or popular discussion of the human (physiological) sexual orientations of Caitanya and other Caitanya Vaisnavas, whether heterosexual, homosexual, bisexual or otherwise, is worth noting.[26] There is, of course, the standard Caitanya Vaisnava doctrine that all humans are ontologically 'female' in relation to Krishna, the only real 'male' there is. This may foreclose theological inquiry, but still may not account for the human propensity of Caitanya and other Vaisnavas for experiencing and demonstrating so vividly the feminine Radha-bhava or sakhi-bhava or manjari-bhava or for being so unaffected by women's charms as some male devotees (e.g., Caitanya's intimate disciple, Ramananda Ray) are reputed to have been.[27] The intent of this essay is not to resolve the question of gender orientations of Caitanya or of his disciples any more than to resolve the issues of divine madness. Rather it is to suggest how these issues might be approached constructively from the perspectives of the academic study of religion and psychology of religion.

I would, however, hazard the observation that the distinctive way that Caitanya Vaisnavas, emboldened by the paradigmatic example of Caitanya, conceive of, experience and express the subtleties and mutability of human erotic tendencies and sensibilities has something significant to contribute to contemporary global understanding of human sexuality and gender formation in ways other than socio-political or physiological. We may never reach any 'clinical' or 'diagnostic' conclusions about the human sexual orientations of Caitanya and his contemporary disciples by studying the texts that celebrate them, nor need we. What we are likely to discover, however, are significant alternative ways and means by which human consciousness, affectivity and expressiveness—subtle and flexible phenomena as these are—may be shaped and directed toward creative religious and other humane ends.

Regardless of what the mundane sexual orientations of particular Vaisnavas may be or may have been, the textual symbolism and devotional practices of Caitanya Vaisnavas would seem to be such as to provide acceptance, respect and ample expressive scope for devotees whose mundane sexual orientation may be gay or lesbian or otherwise different from that of heterosexual men or women—

without, of course, alienating the latter. In various cultures we find a disproportionately high concentration of gay men and lesbian women among the most creative individuals in art, literature and religion. We should not expect it to be otherwise among Caitanya Vaisnavas. Indeed with the Caitanya Vaisnavas, in contrast to many other religious communities, the symbolism of their texts and the character of their practices do not denigrate, intimidate or erect barriers to the congenial participation of those whose sexual orientation differs from that of the wider 'straight' population. It is a commonplace to acknowledge the readiness of Caitanya Vaisnavas to share Krishna-*bhakti* and devotional solidarity with persons who tend to excluded, marginalized or disfavored in mainline socio-religious life, typically 'women, Shudras and sinners'. It would only be fitting that persons of alternative sexual orientation also be included within the catholicity of Krishna-Caitanya-*bhakti*. In all likelihood they joined readily and contributed heartily to the religious and aesthetic creativity so characteristic of Caitanya Vaisnava literature and devotional practice.

Concluding observation: heuristic use of Caitanya's biographies

The biographies of Caitanya stand midway between the direct-observation and notation by 'M' of Ramakrishna's actions and words and the *mangal-kabya*, the 'human' heroes of which are imaginary, not historical, figures. The Caitanya biographies present to us an actual historical figure (even if, as devoted adherents attest, he be ultimately or ontologically the divine Krishna graciously manifesting himself in human form). But they present him through the lens or grid of theological conceptions of Caitanya held by the respective authors and the accumulated distilled recollections of eye-witnesses and indirect informants.. While I am inclined to take the biographers' reports as more historically reliable than certain other scholars do, I realize that idealization, selection, exaggeration, stylization, mythologizing and the like permeate the several accounts. Fortunately we do have multiple accounts, so by their comparison and mutual correction we may come closer to the 'empirical Caitanya' or 'Caitanya of history' than most of the early biographies. Even so, any inquiry into the psychological aspects of Caitanya (or noted Vaisnavas associated with him) must remain approximate and tentative.

Though holding back from definitive or unduly strong speculative conclusions about Caitanya's human (or apparently human, as adherents might say) personality—which we know only through the theological language and devoted eyes of his disciples—still we may learn much. By examining with care the richly detailed 'image' or 'images' of Caitanya presented in that literature, we may hope to gain insights and formulate hypotheses concerning, among other things, the religious creativity attained and expressed through extremely intense psychic experiences. The detailed, psychologically revealing and finely etched images of Caitanya and of his relationships with fellow devotees may suggest what to look for—and how to interpret constructively—analogous religio-psychological phenomena encountered elsewhere but presented in less articulate and penetrating

forms. This amounts to a further significance of the Caitanya Vaisnava texts and practices, their 'heuristic' value, their potential for problem-defining and problem solving, across a wider comparative range of human religious experience.

The 'heuristic' effectiveness of Caitanya's sacred biographies and related texts is on the one hand a limitation as compared with a 'diagnostic' effectiveness that might permit us to resolve (or think we have resolved) 'clinical' questions about particular historical individuals. On the other hand, it may be a salutary limitation if it checks any tendency to claim or suggest undue finality of interpretations of particular cases. Such tentativeness or reserve imposed by the nature of the evidence, not by coercion or censorship, should serve to minimize indignant reactions from devotees who might otherwise have been aggrieved. It will not, most likely, satisfy all critics, least of those wielding well ground axes and spoiling for a fight. But it should deflect and blunt their criticism by clarifying the task and firming up the intellectual and moral ground of the researchers. To strike a yet more upbeat note, we might close by anticipating that such heuristic psychological reading of Caitanya Vaisnava texts (and probably texts of many other religious communities as well) would be welcomed by some thoughtful and conscientious adherents, in this case Vaisnava devotees. I think especially of those who are genuinely concerned that in their zeal to respond to the inspiration of Caitanya's extraordinary display of *prema-bhakti* they not slip unwarily into psychological traps that would be dysfunctional to their own devotional *sadhana* or that of devotees under their guidance. We still may be entering where angels fear to tread. But, if we do so respectfully, competently and with a cautious tread, we may hope to find them hovering above, if not quite on our side.

References

1. For a comprehensive and lucid survey of psychologies and psychologists of religion, see David M. Wulff, *Psychology of Religion: Classic and Contemporary Views* (New York: John Wiley & Sons, 1991).
2. A Brahman named Visvambhara Mishra, he took the religious name Krishna-Caitanya (Krishna-Consciousness) at his ascetic (*samnyasa*) initiation. He is more commonly spoken of as Caitanya or Gauranga. Vaisnavas are those Hindu devotees of God understood as Vishnu and Krishna.
3. I use 'sacred biography' (or 'biography' in that sense) for texts setting out in historical-cum-theological form the religiously significant life of a figure understood to be establishing the paradigm of a religious way of life and 'hagiography' for texts on the lives or deeds of saints or disciples who replicate or apply the religious ideal of the paradigmatic 'founder', 'prophet', 'incarnation', 'avatara'. See also the 'Introduction' in Frank E. Reynolds and Donald Capps, eds., *The Biographical Process: Studies in the History and Psychology of Religion* (The Hague: Mouton, 1976).
4. For brief descriptions and assessments of the 'early' sacred biographies of Caitanya, see: S.K. De, *Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal*, 2nd ed. (Calcutta: Firma K.L. Mukhopadhyaya, 1961). The most thorough critical study of

the textual sources for the life of Caitanya is (in Bangla, i.e., Bengali, language) Bimanbihari Majumdar, *Sricaitanya Carter Upadan* (Calcutta: University of Calcutta, 1959). There are several English translations of some the sacred biographies, the most important being Krishnadasa Kaviraja, *Caitanya Caritamrta*, trans. by Edward C. Dimock, Jr. with extensive 'Introduction' by Dimock and Tony K. Stewart (Cambridge, MA: Harvard Oriental Series, 1999). For detailed analyses of the relationship of 'historical' to 'theological-cum-mythical' elements in each of the early sacred biographies, see Tony K. Stewart, ' The Biographical Images of Krsna-Caitanya: A Study in the Perception of Divinity', Ph.D. thesis, University of Chicago, 1985.

5. 'Biographies of Caitanya as Sources for the Psychological Study of Religion' in *Enriched by South Asia*, edited by Elliot L. Tepper and John R. Wood. Montreal: South Asia Council, Canadian Asian Studies Association, 1994, pp. 371-83.
6. Jeffrey Kripal, *Kali's Child: The Mystical and the Erotic in the Life and Teachings of Ramakrishna* (Chicago: University of Chicago Press, 1995). Much of the opposition to Kripal's book comes from devotees in the tradition of Ramakrishna and Vivekananda, both from scholar-monks of the Ramakrishna Mission and from articulate lay devotees, many of whom are able to challenge Kripal on the basis of thorough knowledge (however much shaped by Vedanta Society orthodoxy) of the texts and traditions.
7. Paul Courtright, *Ganesa: Lord of Obstacles, Lord of Beginnings* (Oxford University Press, 1985). The author has received death threats by e-mail; Emory University has been importuned (unsuccessfully) to fire him; manuscripts in the venerable Bhandarkar Oriental Research Institute in Pune, Maharastra, India have been burned by fanatics! For a sketch of the controversy, see Shankar Vedantam , 'Wrath over a Hindu God: U.S. Scholars' Writings Draw Threats from Faithful' in *The Washington Post* (April 10, 2004) (Williams.edu/go/native/courtright.htm); and the polemic response by Rajiv Malhotra (www.sulekha.com/expressions/column.asp?cid=305929).
8. Wendy Doniger O'Flaherty, *Siva: the Erotic Ascetic* (Oxford University Press, 1981 [1973]), *Hindu Myths* (Hammondsworth Penguin, 1975), *Women, Androgynes and Other Mythical Beasts* (Chicago: University of Chicago Press, 1980) and many others.
9. J. Moussaieff Masson, *The Oceanic Feeling: The Origins of Religious Sentiment in Ancient India* (D. Reidel, c. 1980).
10. Risks to adherents (especially those serving as informants or members of a research team) might include: loss of religious faith (a risk offset perhaps by the expectation of more mature faith or understanding); undermining traditional influence of existing religious leadership (offset perhaps by greater freedom and influence for other adherents); embarrassment; violation of confidentiality; reprisals vs. informants'/participants; triggering or reviving disputes among adherents (offset perhaps by 'reform' or 'upgrading') or between adherents and outsiders. To resolve definitively some of these risk factors might require a research project of its own, which is hardly to be expected. Still it is important to consider them before striking out on a potentially sensitive and controversial project.
11. Considerations of this sort may well arise in the course of standard ethical reviews of research dealing with human subjects where such assessments are mandated, but

the responsibility for such consideration remains incumbent upon researchers with or without an external ethical review.

12. One post-research 'hazard' that any researcher or writer may face, but should resist, is promotional sensationalism ('sexing up' as the BBC might say) proposed by editor or publisher. One flashy picture or catchy title may offset the positive impact of a carefully crafted text, though it may sell more books.
13. This does not mean that the adherents consulted are presumed to have total comprehension of the meaning of a text (least of all its possible subconscious impact or its meaning to other adherents in other times and places). But it does mean that much preliminary, inconclusive and time-consuming guesswork by non-adherent researchers may be avoided and valid information and insights be volunteered by the adherents who participate.
14. The published results of such joint research should aim to be consensual. However, in the event of significant disagreement, rather than 'water down' the report to a 'lowest common denominator', it would be better for each member (or each dissenting member) of the team to prepare an addendum reflecting his/her conclusions. Indeed, even if there is overall agreement on the basic report, it still may be desirable for some or all of the researchers to prepare specific reports aimed at their respective constituencies: e.g., psychologists, religionists, social scientists, literary scholars, religious adherents.
15. Also their texts have much to say about topics of perennial interest in the psychology of religion: meditation techniques, mystical experience, conversion or personal transformation, sin/guilt vs. forgiveness/deliverance. They also describe possession, ecstasy and visualization and discuss what may be called 'divine madness' as distinguishable from 'profane madness'.
16. Bimanbehari Majumdar, *Sricaitanya Cariter Upadan* (Calcutta: University of Calcutta, 1956).
17. Amulya Candra Sen, *Itihaser Sri Caitanya* (Calcuutta: Sarasvat Library, 1965).
18. Edward C. Dimock, Jr. and Tony K. Stewart, 'Introduction' in Krishnadasa Kaviraja, *Caitanya Caritamrta*, trans. by Dimock (Cambridge, MA: Harvard Oriental Series, 1999), pp. 23, 607.
19. Sushil Kumar De, *The Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal* (1961), pp. 67-102.
20. Donna M. Wulff, *Drama as a Mode of Religious Realization* (Chico:CA: Scholars Press, 1984); David Haberman, *Acting as a Way of Salvation: A Study of Raganuga Bhakti Sadhana* (New York: Oxford University Press, 1988); Neal Delmonico, *.Gifts of Sacred Wonder* (Calcutta: Subarnarekha, 1986).
21. O.B.L. Kapoor, *The Philosophy and Religion of Sri Chaitanya* (New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1977) and Hindi version; Radha Govinda Nath, *Gaudiya Vaisnava Darsana*, 5 vols. (Calcutta: Pracyabani Mandir, 1957-60).
22. J. Stillson Judah, *Hare Krishna and the Counter-culture* (New York: John Wiley and Sons, 1974). See pertinent numbers of *Vaisnava Communications* for ongoing efforts of ISKCON members to deal with the molestation issue.
23. Some of the more intellectually / academically acute among ISKCON devotees regularly meet to discuss and write about sensitive issues including sexual orientation in relation to morality and religion. Several current and erstwhile ISKCON devotees

already have undertaken M A and Ph D programs in several types of religious and theological studies

24 Negotiating what is to be kept confidential between guru and devotees and what may be shared with the research team may be an essential aspect of such joint research

25 For thorough discussion of Indian conceptions of divine or saintly 'madness' in contrast to pathological or profane 'madness' see June McDaniel, *The Madness of the Saints Ecstatic Religion in Bengal* (Chicago University of Chicago Press, 1989) For textual passages and translator-editors comments on Caitanya's exhibitions of madness' consult the Subject Index in Dimock and Stewart, trans & eds *Caitanya Caritamrta*

26 There is the interesting if still speculative suggestion by Norvin Hein in his contribution to John S Hawley and Donna M Wulff eds , *The Divine Consort Radha and the Goddesses of India* (Berkeley Religious Studies Series, 1982) that the emphasis on the feminine (esp Radha and the gopis) in Krishna-focused Vaisnava *bhakti* may reflect Hindu frustrations over political-military dominance of India by Muslims in Bengal and North India

27 *Caitanya Caritamrta* 3 5 9 24

An Archaeologist Looks At Tradition

Shereen Ratnagar

Archaeological analysis in South Asia tends to distance itself from the theories of social structure, political organization, and pre-modern economies that have been constructed in the social science of anthropology. This is not because of any inconsistencies or deficiencies found to exist in the relevant theories. Instead, I have heard it said repeatedly in conferences and meetings that 'theory' is something that is 'imported from outside' and is redundant for us; that we can understand our past better by observing our own myriad surviving traditions. There is not a little irony here. On the one hand, theory is scorned, while on the other the persistence of tradition is posited even though the idea of traditional societies itself comes from a Western paradigm, largely Orientalist and nineteenth-century, which sought to distance eastern societies as traditional, bound to religion, etc., in contradistinction to Western civilization which is innovating and dynamic. Moreover, tradition is hardly the tangible sort of thing to be self-evident in the archaeological record, and is as much a matter of inference as are trading patterns and social structure. What, then, is tradition?

Let us begin with the basics. Social groups are heirs to cultures, to shared patterns of learned behaviour, and there is an overlap between the notions of culture and tradition. In the ancient period the Latin term *tradere* meant to hand on property down the generations. 'Tradition', we could say, refers to customs that are handed down the generations, or to continuing practices. Further, a belief or practice may, in its very continuity or persistence, become a norm (eating habits begin to be ascribed specific health benefits in specific cultures, for instance). This means that traditions carry value.

Everyone would agree, however, that tradition is not reducible to habit. We need to take a critical and nuanced approach to anything we call tradition. The history of the idea of tradition may help us to do this, and here we take recourse to the authoritative study by Shils, who explores the origins of the use of this term in the West (SHILS 1981 : 4-20). During and after the period of the Enlightenment in Europe, he says, things traditional came to be viewed as the antithesis to science, rationality, and progress. The French Revolution that overturned the dominance of the Church and its orthodoxy, and of the aristocracy, made casualties of many old customs. In the eighteenth and nineteenth centuries, European scholars interested in the peasantry and its folklore, its beliefs, and its oral narratives, cast these as traditional societies. Such social sections had no formal education systems or literary traditions, and were on the margins of the

modernizing mainstreams of the countries concerned. Thus the 'traditional' was the antithesis of the secular, progressive, scientific, and efficient 'modern'. The traditional society was archaic, obsolete, 'quaint' (ibid : 20). In other words, it appears that traditional society was to be understood mainly in its difference from the modern.

This dichotomy characterized thinking in the colonial period. In an attempt to understand why capitalism had not taken root in India, Marx sought explanations in a supposedly unchanging Indian village economy and society. Colonial rule was predicated on a number of conceptions of Indian civilization, one of these being its inherent traditionalism and the unchanging nature of the Indian village. This image persists in spite of clear arguments about its inadequacy (BREMAN 1987 ; SRINIVAS 1987) and in spite of the fact that scholars have found that colonial rule brought about marked change in the rural economy. As Fuller stated (FULLER 1977 : 107), the British revenue system was predicated on exclusive property rights in land, something that had not existed earlier; so that 'what anthropologists are prone to call "traditional India" is, in fact, British India.' As contributions to a volume edited by Breckenridge and van der Veer (1993) indicate, certain Orientalist ideas have persisted in the scholarship of the postcolonial period. The 'scientific' Indology of the colonial period that formed the basis of certain colonial administrative practices, became 'institutionally embedded in Indian political culture' (BRECKENRIDGE AND VAN DER VEER 1993 : 8-9) and gave 'a peculiar essentialist twist' to nationalist thinking (IBID : 11). With several Indian archaeologists claiming that their work is amenable to 'scientific proof, essentialist ideas are especially prevalent in archaeology.

Shils cautions that no society can be regarded as totally traditional : that scientific endeavour too has its traditions. We may experience for ourselves the many traditions that persist in modern Europe. Much evidence, besides, makes us wonder about tradition as the framework for viewing cultural practices in India. Consider, for instance, the *pols* of cities such as Surat and Ahmedabad. The *pol* has been viewed as an old and typically Indian form of urban layout. But in the course of research on the Mohenjo-daro housing I found that the *pol* cannot be used as an immutable reference point. There were more than 300 *pols* in late nineteenth-century Ahmedabad, long narrow houses with party walls with their neighbours, upper storeys, with single restricted entrances, and common meeting halls and wells to each house cluster (see DOSHI 1974; GILLION 1968). The British thought this pattern was a reflection of a preference for residing with kin, and of the absence of urban planning. Gillion (1968 : 124), however, states that in the Mughal period Ahmedabad had wide streets and only in the eighteenth century did "thoroughfares bec[o]me pols". In the Maratha period, life was so insecure that women and dyers hired armed guards to escort them to the river bank (IBID : 42). Doshi (1974 : 20-22), for his part, infers that it was in the eighteenth century that closed neighbourhoods on the *pol* plan came into being, as a response to security problems arising from constant raids on Ahmedabad by the Marathas, the Kolis, and the Kathis.

One could also question the notion of tradition as it is generally (often vaguely) used by archaeologists by reference to archaeological data. Fernand Braudel's concept of the *longue duree* is relevant to archaeology, as it refers to a time-scale in which change is slow and imperceptible : to the deep underlying structures of, say, a subsistence economy or house form in a particular landscape. Just as the rural histories written by historians of the Annales School could cover six-century spans, so too in archaeology we deal with units of time of several centuries each. Material culture changes very slowly, so that archaeological periods are not commensurate with dynastic periods. Thus the *longue duree* is certainly relevant to the concept of tradition (SHILS 1981 : 7), but at the same time carries an element of ecological logic and environmental constraints. The concept is applicable to, say, the range of choices of subsistence, roof type, village location, irrigation techniques, etc. available to people in a particular kind of geographical location—and this is thus not exactly the same thing as 'tradition'.

Again, the occurrence of similar kinds of artefacts at different sites and periods does not itself entitle us to speak about continuing traditions. While we expect traditions to be handed down the generations and there is in the continuity of tradition a phenomenon called filiation, with a sense of identity with earlier occurrences, we also come across large spaces and long time gaps between similar sorts of tools or beads, when we may be better advised to explore in what ways it was the dictates of the raw materials and tools concerned, and the intended functions, that were similar. Traditions cannot be shelved, irrespective of their practitioners; they do not endure unless their rationale continues to have meaning for their practioners. In short, traditions are 'not independently self-reproductive' (SHILS 1981 : 14-15). Actually, Shils (IBID : 20) makes a subtle point to which we could give attention. He suggests that pre-modern societies respected old institutions and old ways of doing things because they were known to work. There is, thus, a normative aspect to tradition. This is why I find it amazing that a great many scholars have repeatedly said that beads are today made at Khambat in the Harappan tradition even though there is no question of any continuity of aesthetic or of form, or social meaning, where the beads are concerned. It is not enough to say that the practice of making beads has endured.

Pottery Making Traditions?

We know that the garbage, the cached wealth, and the lost belongings left behind by those who share a culture tradition will reveal similarities of form and style. Pottery is an item of material culture that occurs in greatest quantity at archaeological sites. Once fired, earthenware acquires density and thereafter its material does not lose its shape. At the same time pots are particularly prone to shatter; besides, since their source material is infinitely replaceable—so pots are made and consumed in large quantities. Hence the disproportionately large quantity of pottery that we find at most sites, in contrast to stone or metal tools, figurative items, or ornaments. Fully aware that such tangible and shattered remains are a far cry from the oral traditions and gems of literature that Sukumari

Bhattacharji has so adeptly studied through her life, I shall stay with the subject of early pottery production and in the process try to inject some thinking on the notion of tradition.

In archaeology the pottery that forms a large part of our date base and is common to assemblages across sites in geographically coherent areas, is, almost inevitably, a signifier of particular archaeological 'cultures'. Each such category, e.g. the 'Painted Grey Ware' or 'Malwa Ware', is distinguished by a particular kind and treatment of clay, a particular range of shapes, and specific colours that arise from surface treatment and firing conditions. Thus the archaeologist speaks of 'the Painted Grey Ware culture' and 'the Malwa culture' and of particular pottery-making traditions such as the thick walled and well fired Harappan tradition with a pleasing red colour and often black painting, or the superbly lustrous Northern Black Polished Ware of the Ganga valley, or the black-and-red burial pottery of peninsular India in the iron age[1]. This is not invalid : the potters who made 'PGW' in the early first millennium BC would have (in one or other way) cut off the supply of oxygen in their kilns/bonfires after the pots were baked, in order that the pots would then turn grey or black; besides, all pots of this type occur in a limited range of eating and drinking vessels. Even so, the idea of pottery traditions is not without problems.

Let us take a simple example. The pottery of the chalcolithic village of Navdatoli on the Narmada (SANKALIA, SUBBARAO and DEO 1958; SANKALIA, DEO AND ANSARI 1971 : 79-241) has been classified into a number of different wares, Malwa, cream-slipped, black-and-red, Jorwe, etc. These differ sometimes in the nature of the slip, sometimes in the treatment of the clay, or in form, or the efficiency of firing, the use of the wheel, and so on, but sometimes they also have clay treatment or shapes in common. The point is that shreds of these different wares (a) occur together on the floors of the excavated single-room houses at the site, and (b) appear to have been made of the same, locally procured, clay (SANKALIA, DEO and ANSARI 1971:85). The archaeologists found that the differences could not be ascribed to imports. As Navdatoli was a village with a population of less than 200 persons (IBID : 75), it may not be appropriate to infer that the inhabitants had access to the pottery of several 'ceramic traditions'. Thus the question was asked, (IBID : 413-14), did the village potters of Navdatoli utilize different techniques in conjunction, on the same piece? In that case we are dealing not with ceramic traditions, but with patchworks of different *techniques* that cannot be isolated. On the other hand, it is not impossible that there were several potters in this protohistoric village; producing wares in their own method. My observations and discussions in a few village potters' homes-cum-workshops in Gujarat have revealed that pottery

1 Such pottery types were almost never the only pottery to be found at the respective sites in the relevant strata, but are what we find to be distinctive of particular periods and regions. Even the 'type' of Malwa or Harppan pottery varies, often at the same site, in details.

production on the wheel is truly a family endeavour. While a man is at the wheel (which determines the form of the vessel), someone else is seated close by, wedging clay balls of appropriate size (the way this was done would determine the 'fabric' of a ware). A third person gives the slip or painted decoration, and a minimum of three will set up the bonfire or kiln for the baking. So one and the same pot passes through many pairs of hands—including the hands of wives who may have learnt from their fathers in their natal villages—in the process of production. We have thus come to realize that archaeologists may often be confusing technique with 'tradition'.

Participation in the pottery-making course of a Mumbai based studio potter, Zareen R. Mistry, gave me a full realization of the fact that even when the properties and behaviour of clay are expertly communicated (in words) from teacher to novice, one has to experience these for oneself. One has to feel the plasticity of wet clay, watch and touch drying and shrinking clay over hours or days, and experience the function of its non-plastic components. Even the wedging of the clay requires what I would call an *avad* in Gujrati—a way with the clay, a small skill or knack—in order to pummel it, press it down, pull the ball apart and slam the pieces together, and so on. And so too one proceeds with the pinched pot, with slab work, and the coiled method. As for centering clay on the wheel and building up the walls of a pot, one soon becomes aware of the importance of muscular strength as also of the subtleties of hand movements and finger pressure required to accomplish this greatly difficult task. In my experience the most difficult aspect was to respond with light hand movements to the speed of the wheel. One has to work under close supervision, often allowing one's hands to be guided by the teacher's hands.

It is not just throwing and shaping on the wheel that require a skill born of repetition over a long period. Even the stacking of pots into a high dome in the kiln/bonfire, and in rows in the home (where space is always restricted), requires a skill that youngsters learn as they help their parents. At village Rangpur in Baroda District, Kiritbhai Varia, who works on the wheel, told me that it is the everted rim of the pot (as opposed to a featureless or incurved rim) that facilitates the stacking of globular *matkas* upside down, say, seven pots one over the other. Besides, as Kamleshbhai K. Varia explained to me in Tejgarh, the very turning of clay on the fast wheel gives a standard or uniform type of pot—because it is *accuracy* that is achieved on the wheel. Accuracy of rims and bases may be seen as standardization by the archaeologist, or as the product of a particular workshop tradition. In sum, given the need for intricacy and the development of skill, and the predictable (accurate) outcome of the rotating wheel, many practitioners in a certain place may end by using very similar methods of work.

Manual Skills, Technological Parameters, Socio-Economic Contexts, and Pottery Traditions

To what extent, however, are the repetitive acts mentioned above a matter of acquired habit, and to what extent do we say they are traditional? Anthony

Giddens (GIDDENS 1999) distinguished repetitive individual behaviour from tradition, saying that only the latter lies in the group. But scholars of pre-modern technology claim that learning techniques is indeed a matter of getting into habitual actions, under guidance, and that routine actions are the heart of cultural practice (DOBRES 1999 : 124-30), Perhaps this is not exactly the same as Bourdieu's 'habitus'. a mental or bodily disposition amongst a social class that has no explicit rules, but 'finely ingrained' within a social structure that induces certain regularities of practice (see BOURDIEU 1977). In other words, the way an individual in a particular group or class experiences the different facets of his work and social life, induce in him an understanding of a set of norms. Socialization and the conditioning of the individual are the key, not objective scientific facts about, say, the properties of clay, nor 'proof' that certain methods will work while others will fail.

In fact, Connerton (CONNERTON 1989 : 93-104) counts bodily practices as one available vehicle for cultural transmission and cultural repetition (the other being commemorative ceremonial). This, he says, refers to a way of transmitting the past without recourse to words or images. He refers to these as 'habits' and 'habit memories' rather than dispositions; they co-occur with one another, and are reinforced in their repetition. They are social phenomena. At the house of a 'non-professional' tribal potter who works without a wheel and produces a few items for home use and sale at periodic markets, I witnessed a seven-year-old playing with the clay and wooden mould that his father had been using to give me a 'demonstration'. We come close, then, to an idea of tradition that involves little conscious awareness. (One has only to witness the rhythm and skilled movements in the beating of pots to globular form, or the acquisition of a particular pottery skill by persistent repetition, to appreciate this.)

As Shils says (SHILS 1981 : 31-2), an industrial process concerns the transformation of raw materials for an intended purpose. This is not itself a tradition, but the process may be *transmitted as a tradition* : people enact the same bodily movements or actions and thereby produce similar products, because they have been so taught. Moreover, and more important, each generation values that model as something worthy of reproduction. Perhaps we could confidently speak of a megalithic *tradition* of black-and-red ware manufacture if we could discover that there was more than one method in existence, in iron-age Deccan, for producing pottery in dual colouring. For the moment, however, it appears that the main difficulty in inferring the existence of traditions of early pottery production is a purely technological one.

It is well known that village potters tend to adhere to set patterns of production—they are said to be conservative. At first thought one would wonder why this should be so, as their materials are not so scarce or expensive as to inhibit experimentation. Perhaps the reason is three-fold. First, there is the matter of manual skills that are hard to acquire, except by patient repetition, as we have discussed above.

Second, in contrast to stone tools or lengths of cloth or carved seals or beads, pots are never made singly. The production process is unique in that it consists of 'stages-and-batches'. No one makes one pot continuously from beginning to end, because it is necessary to halt at certain stages. The clay for dozens of pots is collected, cleaned, and sieved, and then mixed with water. At various stages, the clay must be allowed to dry gradually, so that it does not crack—e.g., after a pot is taken off the wheel, and after each round of beating. A potter will throw dozens of pots on the wheel in a day. Batches will be dried in the shade and then sometimes in the sun; at the right time, they will be slipped. The beating of pots out into globular shapes requires two or three stages, with halts for drying between them (see also MIRMIRA 1973 : 30-31). Other inputs in pre-industrial pottery production include large quantities of firewood and manure, which must be collected and then thoroughly dried. Perryman (2000 : 71) reports that buffalo dung, if used as a fuel, needs to age for a year before it is used in the pottery kiln or bonfire. In any workshop it may be hundreds of pots that are fired at a time, the output of a fortnight or even an entire month. In short, in the rhythm of the potter's workshop, it is only production in batches that makes sense. This means that if any experiment introduced at any one stage goes wrong, not only has the immediately-completed task gone to waste, but several days of earlier stages of work have come to nought—an error in the firing process may destroy a month's labour, for instance. Conversely, the success of each stage of work is necessary for the success of future stages.

The third factor is the enigmatic 'standardization' of pottery shapes. When pots have to be stacked for drying, for firing in the kiln/bonfire, for storage, and for transportation, the potter has to keep wall thickness, fabric hardness, base-and rim-forms and bass and rim diameters within a certain range. Thus it is not only 'mass production' on the wheel, the time factor, and production for large markets that makes for uniformity of form, as many archaeologists suggest. In this respect what is more convincing is Krishnan's suggestion (KRISHNAN 2000 : 353) that Harappan pottery of particular kinds was made at particular workshops, utilizing clays of remarkable uniformity.

I would also like to add that a technological tradition may itself be irrevocably entrenched in a socio-economic context. In Baroda district I have visited tribal families making pottery with the slab technique in small villages. They do not follow the wheel-production technique of caste potters in the large villages and towns and in a way it is not wrong to talk about two separate traditions. (In each, the forms produced are different, except for the *tava* which is common to both; the brick kiln is unique to the caste potter's workshop but the choice of clay and fuel and the methods of stacking are not vastly different.) Tribal people produce very few pottery shapes, by hand, for their own use and take three or four days' output for sale at weekly *haats* that are accessible on foot. One pot can fetch two pots full of rice or maize. They have no scope to be 'professional potters' on a larger scale. Essential to the definition of being tribal is the avoidance of monetary transactions and the immorality of considerations of profit between kinsmen. Thus

the tribal 'pottery tradition' has a logic within a distinctive economic system This, then, is a prime instance, teaching us that a technological tradition is neither autonomous nor immutable not self-explanatory

In this brief note I have questioned the validity of some of our archaeological classifications of prehistoric pottery traditions' at least with regard to their co-occurrence at prehistoric Navdatoli I have also suggested (but only that) that not all similarities in archaeological finds are ascribable to that vague catch all called tradition There are ecological constraints there is habitus (which may or may not be equated with tradition) and quite importantly I think there are certain technological factors (manual skills and actual processes of production) to which we must give attention The fact that certain kinds of pottery were produced for centuries in protohistoric times needs to be explained with a more fine tuned approach to tradition than we have hitherto conceded to the problem Overall it has also emerged that we must be cautious in contrasting all aspects of traditional technologies as the antithesis of modern mass production

Endurance over time is not the key defining feature of tradition or of its more diffuse cousin custom The distinguishing characteristics of tradition are ritual and repetition Traditions are always properties of groups communities or collectives Individuals may follow traditions and customs but traditions are not a quality of individual behaviour in the way habits are

What is distinctive about tradition is that it defines a kind of truth For someone following a traditional practice questions don t have to be asked about alternatives (GIDDENS 1999)

References

BOURDIEU P 1999 *Outline of a Theory of Practice* Transl R Nice Cambridge University Press

BRECKENRIDGE C A and VAN DER VEER P ed 1993 Orientalism and the Postcolonial Predicament in *Orientalism and the Postcolonial Predicament* Philadelphia University of Pennsylvania Press pp 1 19

BREMAN J 1987 *The Shattered Image Construction and Deconstruction of the Village in Colonial Asia* Amsterdam Centre fo Asian Studies

BRIL B and ROUX V 2002 Comment on D Stout Skill and Cognition in Stone Tool Production *Current Anthropology* 43 5 715 16

CONNERTION P 1989 *How Societies Remember* Cambridge Cambridge University Press

DOBRES M A 1999 Technology s Links and *Chaines* in M A Dobres and C R Hoffman eds *The Social Dynamics of Technology* Washington Smithsonian Institution

DOSHI HARISH 1974 *Traditional Neighbourhood in a Modern City* Delhi Abhinav Publications

FULLER, C J 1977 British India or Traditional India? *Ethnos* 3 4 95-121

GIDDENS A 1999 The Reith Lectures 1999 BBC Online Network and lse uk/Giddens/reith_99/week3

GILLION, K 1968 *Ahmedabad A Study in Indian Urban History*, Berkeley University of California

KRISHNAN K 2000 Studies in Harappan Technology A Review in K Paddayya ed *Recent Studies in Indian Archaeology* Delhi Munshiram Manoharlal, pp 349 66

MIRMIRA, S K 1973 *Indian Pottery* Bhadrawati Gramodaya Sangh

PERRYMAN J 2000 *Traditional Indian Pottery* London A & C Black

SANKALIA H D SUBBARAO B and DEO S B 1958 *The Excavations at Maheshwar and Navdatoli 1952 53* Poona and Baroda Deccan College and MS University

SANKALIA H D DEO S B and ANSARI Z A 1971 *Chalcolithic Navdatoli* Baroda and Poona MS University and Deccan College

SHILS E 1981 *Tradition* London Faber and Faber

SRINIVAS M N 1987 The Indian Village Myth and Reality in *The Dominant Caste and Other Essays* Delhi Orient Longman pp 20 59

From Jana to Janapadaniveśa (A note on polity and settlement)

Ram Sharan Sharma

A

Jana

The term *Jana* occurs 234 times in the *Rig Veda*. It means people, band or tribe. No other term in this sense appears in the earliest Veda so many times. The term *vis* which means tribe or dwelling occurs 170 times. Probably the *jana* was a wider and the *vis* a smaller unit. We repeatedly hear of five peoples, that is, Anu, Yadu, Druhyu, Puru and Turvasa. They are frequently called *pancajanah* (*Aspects* 160[1]; V.I. I. 467) or sometimes *pancakrstayah*. The later term indicates that some tribal people practised agriculture. The *Rig Veda* refers frequently to cattle rearing but much less to agriculture. It appears that the earliest Vedic people were primarily cattle keepers and therefore mainly semi nomadic. But a few who were agriculturists had to be sedentary. Archaeologically these people may be placed in the Gandhara area.

Janapada

But the term *janapada* which indicates tribal settlement does not occur in the *Rig Veda*. It seems that many of the earliest Vedic people were organised in bands of various types not based on kinship but on collective efforts needed for hunting, food gathering and cattle rearing.

The term *janapada* which denotes tribal or territorial settlement, does not occur in the *Rig Veda*. It first appears in later Vedic texts comprising the Brahmanas (V.I. I. 273), which were composed in the upper Gangetic plains around the eighth seventh centuries B.C. Recently settlements found in this area have been studied archaeologically and classified according to their sizes[2]. The *janapadas* may represent the later Vedic settlements belonging to the Painted Grey Ware phase when iron weapons were used for war and hunting. Most probably the ruling class in the *janapadas* used these weapons. But the Vedic texts do not use any term for the head of the *janapada*.

We find various terms for the heads of the *janapada* in post-Vedic times when many *janapadas* appear. The post-Vedic *janapada* was a political unit with its own dialect and culture. These *janapadas* were mostly Indo-Aryan speaking. The grammarian Pāṇini, who lived in the Gandhara area around 450 B.C.

according to V.S. Agrawala[3], mentions 19 *ekaraja* (single-ruler) *janapadas*. They cover not only a good part of north India but also include parts of Afghanistan and south Central Asia. The *mahājanpada* called Kamboja in Pali texts represents modern Tajikistan lying in south Central Asia. It lies in the Pamir plateau area, which mainly covers Tajikistan. Between 1500 and 1000 B.C. Tajikistan shows remains of horse, chariots and spoked wheels, cremation and swastika, all associated with the Indo-Aryan speakers. Around 500 B.C. both Sanskrit and Pali were spoken in Kamboja, which was connected with Pataliputra by the *uttarapatha* or northern route.

Pānini mentions two types of *janapadas* or territorial units. He calls the head of the *janapada janpadin* which means the holder of the *janapada*. (The epics also mention some titles for headship of the *janapada*). The *Mahābhārata* speaks of *janapadeśvara* and *janapadasya īśā*, and the *Rāmāyaṇa* mentions *janapadādhipa* (*Aspects*, p.189). These titles may have been in use around 400 B.C. Although we find several terms used for the head of the *janapada*, we do not find any term for the head of the *mahājanpada*

Janapadin

Pāṇini notices two types of rules in the territorial settlement called *janapada* They are called *ekaraja*[4] and *sangha*[5]. The *ekaraja* number 19[6]. There were many *ayudhajivi sanghas*, but their number is not known. We have no clear idea about the number of the ancient *janapadas*. Ancient texts mention 32 *janapadas*, but the Purāṇas enumerate 175 *janapadas*. However their dates cannot be given[8].

Generally some territorial units or *janapadas* were managed by a single ruler, and others by multi-rulers similar to the republic of Vaishali.

Mahājanapada

The *janapadas* or territorial states were made possible because of the use of the low carbon steel from about the sixth century B.C. onwards. Iron tools caused the clearance of forests and promoted cultivation and settlement in the Gangetic plains on a wide scale. Because of the use of iron weapons and collection from agriculturists some kings of the *janapada* conquered other kings, and this process produced sixteen *mahājanapadas*. Although we find several terms used for the head of the *janapada*, we do not notice any such term for the head of the *mahājanapada*.

The sixteen *mahājanapadas* covered almost the whole of northern India, north-western India, a part of the Deccan and even parts of Afghanistan and south Central Asia. Eventually a *mahājanapada* called Magadha conquered several other large counterparts including Kosala and Avanti and turned into a tax and tribute collecting empire. This empire developed almost all the organs of the state which are first discussed by Kautilya. These organs included seven elements such as kingship, army, territory, taxation, fortification, etc. (*Aspects*, Ch. 3). Though treasure or *kosa* and *danda* or army are considered the essentials of polity, the first is seen as more important than the second.

Janapadaniveśa

It seems that the *janapada* system continued under the Mauryas, for it is mentioned in Asokan inscriptions and placed under rāṣṭṛikas or heads of districts called rāṣṭras. But the existing *janapadas* did not provide adequate tolls, taxes, tithes and tributes to the rulers. Therefore Kautilya, who is ascribed to this period, recommends the policy of founding new settlements in the countryside. This is called *janapadaviniveśa* (AŚ, I.2.1). Since his main objective was to enrich the treasury, Kautilya lays down various measures for increasing production. According to him the new *janapada* should consist primarily of *śūdra* and *karṣaka* (cultivator) settlers (AS, II. 1.2)[9]. It means that the sudras would have served as slaves and labourers, and the *karṣakas* would work as agriculturists. Kauṭilya states that the king should allot arable land to taxpayers for life, and unarable land should not be taken away from those who are making it arable (AS, II. 1.8). The settlement should be inhabited by families ranging from 100 to 500 *kulas*. *Kula* generally means family, but it also means field. This would imply that a *janapada* should cultivate an area comprising 100 to 500 fields, but the *janapada* was really a much larger unit comprising many villages.

Those who do not cultivate should be deprived of their fields which should be given to others. Cultivation should be carried on by village labourers and merchants. Those who do not till should meet the loss of the treasury (Ibid., 12). Kautilya discards such settlers as have renounced active life and turned ascetics (*vanaprastha*). They are considered a liability for production. Similarly he also does not welcome people who are engaged in various types of entertainments. He says that actors, dancers, singers, musicians, and professional story tellers, etc., should not obstruct the work of the people; he does not like parks or recreation halls in the *janapada* (AS II, 1. 83-84). Only people who are engaged in the field work add to the treasury (*koṣa*), forced labour, metallic money, food grains and various types of liquids (Ibid., 85).

The whole idea behind founding a new *janapada* lies in attaining *koṣavṛdhikara* or in arranging taxes raised for increasing the treasury. Kautilya advises the king to help the cultivators with grains, cattle and money, which should be paid back when possible. The king should bestow such favours and exemptions as would add to the treasury and not diminish it. (AS, II. 1. 13-15). The king is asked to protect agriculture against the troubles caused by fines, and by taxes on labourers. He should also save herds of cattle oppressed by thieves, wild animals, crocodiles, poison and diseases (AS. II. 1.37). He is also asked to keep the trade routes free from the difficulties created by royal favourites, robbers, frontier chiefs and even by herds of cattle (Ibid. II. 1.38).

Administrative arrangements for the *janapada* are recommended by Kauṭilya. According to him the king should establish a *sthāniya* in the middle of 800 villages, a *dronamukha* in 400 villages, a *karvatika* in 200 villages, and a *samgrahana* in a group of 10 villages (AS, III. 1.4). These hierarchical offices seem to be located in towns for revenue collection. It is estimated that altogether a *janapada* consisted of 3200 villages (Aspects, p. 200). Thus it was a fairly large

territorial unit, and many such units formed a *mahajanapada* The *Janapadanivesa* gives an idea of administration, but this may not have been all pervasive in the Maurya dominions

The social structure in the *janapada* seems to be caste oriented Priests preceptors and those learned in the Vedas (srotriyas), etc are to be welcomed in the *janapada* and granted tax-free land without the right of sale and mortgage (AS 1 7) The concession made to the brahmanas is also recommended for heads of departments, accountants, local officer called *sthanika* horse trainers, persons looking after cattle (*gopa*), physician and some other employees (Ibid) But in the country as a whole Kautilya provides for general payment of the employees in cash We may recall that sūdras and vaisvas are the main inhabitants Others including the chandalas are settled on the frontier of the *janapada* fortification outside the main settlement In addition to the chandalas these include some tribals, called Sabras, Pulindas, and forest people who are asked to defend the settled territory

A person with means is held responsible for the support of his parents widows, children and other non working members of his family He is fined if he cannot support them (AS, II 1 28) However rise in production was the main objective The king was expected to make people work Kautilya states that slaves persons kept under pledge and even kinsmen should be made by the king to work (AS, II 1 25)[10] It was his responsibility to check the loss in agricultural production Thus the tribal character of the *janapada* had been completely undermined by Kautilya s time By his time the proto-state had become a full fledged state with its seven organs The early *janapada* or the territorial state did not have much of inequities in terms of gender and social classes But all this became prominent by the time of Kautilya

Conclusion

Though several terms such as *jana vis gana vrata sarddha krsti*, etc occur in RV, only *jana* came to the associated with a territorial unit The term *janapada* is used even in the sense of community in later Vedic times, but generally it came to be used in the sense of an organised political unit, which meaning is given to it even now in north India The term *rāstra* occurs in the *Rig Veda* and later vedic texts, and is called 'kingdom in the *Vedic Index but* it could not be as current as *janapada* in post-Vedic texts

The early Buddhist *janapada* or territorial state of Pānini s times was transformed into a full-fledged state by Kautilya's time But the state was called *mandala* which included several *janapadas* By Maurya times production had increased so much that the king could afford to provide food grains, cattle and money to new cultivators for founding settlements in the countryside The *janapadanivesa* plan was intended to add to the treasury which was considered the basis of polity and society People were asked to follow the rules of patriarchal family system They were fined it they did not On the other hand slaves, labourers, pledgemen and even non-working kinsmen were punished for

negligence of their duties in the new *janapada* Thus the *janapadanivesa* may represent a tax-based and caste-based pre-capitalist colonisation

References

1 R S Sharma *Aspects of Political Ideas and Institutions in Ancient India*, Delhi 1996

2 George Erdosy *Urbanisation in Early Historic India* Oxford 1988

Makkhan Lal *Settlement History and the Rise of Civilisation in the Ganga Yamuna Doab* Delhi 1984

3 Vasudevsharan Agrawal first wrote in English *India as known to Panini* Lucknow 1953 Then he wrote in Hindi a larger book *Paninikalina Bharatavarsa* Varanasi 1969 which has been used in this article

4 Agrawal, p 429

5 Ibid

6 Ibid

7 Ibid p 57

8 Ibid p 413

9 The Sanskrit term is *sudrakarsakapr ayam* Since the Dharamasutra attributed to 500 200 BC do not represent sudras as cultivators the term used by Kautilya may be treated as *dvandva samasa*

10 All reference to AS in this article belong to R P Kangle *The Kautilya Arthasastra*, part II University of Bombay 1963

The Ṛgveda — an earliest specimen of oral poetry

Nilanjana Sikdar Datta

In oral poetry a bard tells stories in orally composed verses. As an heir to a long tradition he finds at his disposal a number of "formulae" or common phrases or word units, expressive of certain ideas which he utilizes in his own compositions He may also invent few new formulae that become a part of the common stock He does not use the traditional formula indiscriminately, but employs them in suitable places by inserting single words and phrases to suit the thematic, prosodic and emotional exigencies. Thus, the evaluation of oral literature involves a sifting of inherited word blocks, their arrangement and the general organization, presentation and innovation of the theme through the creative genius of the poet[1] In the oral tradition a line or phrase or word-bloc, once popular and considered expressive, remains no longer a private possession of the poet but becomes a part of the tradition. A new poet uses it in his composition, sometimes adjusting it slightly to his own needs, sometimes modifying it substantially. The familiarity of the basic patterns that had been assimilated in his subconscious, suggests certain phrases to express particular ideas. This is how the formula habit is acquired by a creative oral poet[2]. Oral composition with its concomitant characteristics, viz word-blocs, repetitions, alliterations, assonance and other mnemonic devices constitutes the basic difference between it and written literature · for there the authors could use single words as units and dispense with the other devices. They were free to opt for the appropriate expressions and they carefully avoided easy repetitions.

Ancient narrative poetry from different parts of the world represents common characteristics such as thematic and stylisitc similarities. H.M. Chadwick[3] and Mrs. Nora Chadwick[4] noted these specialities. Sir C. M. Bowra developed this approach further[5] Millaman Parry[6] was the outstanding pioneer in this field of analysing oral epic poetry and his pupil A.B. Lord ably followed him.[7]

To distinguish between a literary and an oral text. A.B. Lord suggested three kinds of tests According to him, the first criterion is :

> An oral text will yield a predominance of clearly demonstrable formulas with the bulk of the remainder 'formulaic' and a small number of non-formulaic expressions. A literary text will show a predominance of non-formulaic expressions with some formulaic expressions and very few clear formulas.[8]

Secondly, the oral text will yield a predominance of non-periodic enjambment, and a literary text a predominance of periodic[9]. Thirdly, he says, "The oral epic poet needs well established themes for rapid compositions[10]." But Lord himself makes an exception to every rule in case of especially talented singers; hence, it is difficult to determine how to test an ancient text like the Ṛg Veda, because it is an anthology of hymns by many poets of unequal talent. Also, not all the themes call for inspired composition. Some are catalogues (of gifts etc.), some lists of supplications, some are records of the gods' feats and achievements, while some are really inspired prayers. Hence, it is difficult to apply Lord's categories for judgement here. Millman Parry, on the other hand, defined a formula as "a group of words which is regularly employed under the same metrical conditions to express a given essential idea"[11] and Lord means "a line or half-line constructed on the pattern of formulas"[12] by formulaic expressions. G.S. Kirk says :

> Even single words have definite formulaic tendencies, since they gravitate strongly to certain positions in the verse according to their metrical value:— the fixity of position of individual words within the line is indeed remarkable... the longer the word the less remarkable the fixity becomes[13]

These 'formulaic expressions' are employed to relate particular happenings. Lord and Parry called them **themes**. These themes are not fixed sets of words but groupings of ideas expressed differently. An oral poet is steeped in the rich tradition that he hears and when he himseif composes a poem, the familiar ideas occur to him simultaneously and lead him to take help of those known ideas occurring one after another. Although the Ṛg Vedic verses, unlike the Yugoslav oral ballads and epics, were presumably not composed rapidly, given the inheritance of repertoire of oral poetry, it is extremely possible that successive poets would draw upon this common fund. A significant number of formulae, formulaic expressions and line constructions are noticeable in the structural mode of the Ṛg Veda, namely :

1) Most hymns are family hymns and (a) certain phrase blocs are repeated in certain family hymns; (b) use of a particular metre or rhythm in particular family-hymns.
2) Use of a particular metre to suit a particular deity (eg. Gāyatrī for Agni, Triṣṭubh for Indra etc.
3) Phrases from received blocs are altered slightly to suit the needs of different metres.
4) Entire single stanzas are repeated as refrains or otherwise.
5) Pādas single or more than one are repeated.
6) Metrial variations, as a result of addition or subtraction of verbal changes in repeated pādas, e.g., interchange between Triṣṭubh and Jagatī.

The character of truly oral compositions is sure to bear marks of heavy borrowings. Songs in RV X were composed and compiled much later than the

earlier hymns; their borrowings of the early poetic formulae are, therefore, more obvious and sometimes more easily detectable. In the Ṛg Veda, about 8000 pādas are repeated in about 40,100 pādas. "Here are to be seen fixed epithets, formulaic expressions confined to certain connections, rhetorical adornments, idioms and whole passages which repeatedly reoccur unchanged or with slight variations"[14] Gonda regards repetitions as magic[15] for it is supposed to give power, natural to a primitive person, as he was anxious to preserve and use what was proved to be adequate or efficacious before, useful in the early stages of human development for securing easy memorizing and understanding.

Not only magic but the very process of oral tradition is responsible for such repetitions. A careful analysis shows that oral structural patterns cutting across family tradition, and also widely accepted among all the seer-families are present therein. J.S. Klein correctly states :

> It is reasonable to speak of an original poetic language which underlines the Ṛgveda and which precedes the stylistic idiosyncrasies of the individual families of poets... in a text . where borrowings of entire lines or parts of lines often with slight variations, play such an important role phonological similarity and structural parallelism between passages can be evidenced for the influence of one passage upon another.[16]

Applying this approach to the Ṛg Veda has obvious drawbacks. Since Sanskrit metres are more flexible than the Homeric hexametre, the Vedic poets found it easier to vary the formulaic languages, and "the extent of formula usage varies according to the metre."[17] Again in a flexible language like Sanskrit, the abundant supply of prefixes such as *abhi, hi, su, pra* ; adjective and conjunctives like *tada, tatha, api, ca, hi, tu,* auxiliaries like *ha, sma,* and suffixes can easily be used according to their metrical value to fill up the lacuna without affecting the statement much. For the convenient rules of euphonic combinations and compounds and comparative freedom of syntax, word combinations of any length can be used as nouns or epithets to fit the thought into a metrical pattern. Nabaneeta Sen also affirms this point of view :

> This type of grammatical advantages makes rapid composition much easier and freer; helping to avoid exact repetition of whole phrases... these short syllabic words themselves are imperceptibly and strongly formulaic in character and handy as such for rapid composition.[18]

In spite of all this, a method can be noticed in the Ṛg Vedic repetitions that may be attributed to the oral mode of composition based on traditional phrases. These repetitions helped the Vedic priests to memorize the bulk of verses although religious belief served to maintain the accuracy of orally transmitted verses. Again, repetition at cardinal positions generated an incantatory effect, a kind of hypnotic lulling of the audience. Benedictory phrases, when repeated, offer a psychological help to the supplicant to take an illusory leap to the wish-fulfillment of his desire, just as repeated invocations to a god create the illusion of his presence and active

response to the supplicant's prayer[19] Moreover the Rgveda itself confirms the manner of its composition when it tell its poets to compose many long verses (tatanah) of praise and prayer orally (isye) like the rain god pouring his showers, to sing praise in the Gāyatri metre (mimihi slokam isye parjanya iva tatanah/gaya gayatram ukthyam) I 38 14

In narrative oral poetry deeds of heroes gods or legendary figures are sung with a uniform metrical pattern [ ] The Rg Veda also sings of gods heroes of the vast (India) kings (danastutis) although not in one single metre Battle songs, legends and myths, riddles mysterious and famous historical incidents lend themselves to the narrative ballad forms Consequently in spite of its religious and liturgical character the form in many hymns bears a strong resemblance to ballads [ ]

Some phrases and sentences have an incantatory effect When a single word is repeated several times within a single stanza it becomes pivotal to the thought pattern in that stanza other words are pushed somewhat into the background and it creates a sort of hypnotic word magic where the mind registers the idea of the keyword emphatically and other ideas are dimmed by it All charms and spells throughout the world contain frequent repetitions of certain key-words invested with magical power in the poetic imagination Also god names are particularly auspicious and imbued with mystic power [ ]

The Vedic people like others of primitive culture believed that some supernatural force was responsible for regulation of the world around Certain hymns contain magical intent a practice for achieving the desired object by constant repetition of those prayers The patient s fugitive soul is called back or searched for — *mano jagama durakam tat ta a vartayamasi iha ksayaya jivase* (X 58 1—12) Here the refrain brings out the intensity of the singer s desire for the magico-mesmeric effect in a hymn to drive away *yaksman* (X 97) The term osadhi is repeated fifteen times in twenty three verses and *ya osadhih samrajnu* is used twice in the beginning of verses 18 19 in X 159 an eulogy of self *aha* is used seven times within six verses, *mam* and *me* each appears twice In X 163 the third line in each verse begins with *yaksma* and the fourth line ends with *vi vrhāmi te* Moreover in the third line, after *vaksma* the next words are *sursenyam* and *yonibhyam* The verses 163 5 and 163 6 are common— *vaksmam sarvasmādātmanastamidam vi vrham te* This explains clearly the structural repetition which helps the poet in his oral method of composition

The Rgveda has a tendency of repeating occasional cluster of words like *toka* and *tanaya* repeated together mainly in connection with the idea of prosperity for the extended family of *tokam tanayam tokasya tanayasya' toke tanaye' tokāya tanayāya*'etc[24] The different case endings in use of these two words are to suit different modes of expression and it proves that the poets were in the habit of using these words together Another popular word-cluster is *visvabhir utibhih*[25] '*Dyumna*' 'glory' has an inherent connection with *usma*' 'valour' especially in the context of conquering Aryan hordes Thus one word naturally calls up the other and frequently they are grouped together, because they are heard together –

'*śuṣmintamo hi te mado dyumnintama ... uta kratuḥ*' (I. 175.5; 1.127.9); '*dyumantaṁ...śuṣmaṁ*'[26] '*dyumnāva...śuṣmiṇe*'(I.37.4). 'Ṛta' the famous Vedic word denoting truth very often combined with a dy-syllabic suffix and fills up four syllables of an octosyllabic line; other four syllables are, thus, easily supplied by the oral poet— as '*ṛtāvān ṛtāvṛdhaḥ*' (X.154.4); '*ṛtāvṛdhaḥ ṛtāvānā jane jane*' (V.65.2); '*ṛtaspṛśa ṛtāvano janejane*' (V.67.4); *ṛtāvāna ṛtājāta ṛtāvṛdhaḥ* VII.66. 13; '*ṛtāvānaṁ vicetasaṁ*'(IV. 7.3); '*ṛtāvṛdhā ṛtaspṛśa*' (I. 2. 8.). When the other half of the line contains five syllables it is shortened as '*ṛtāvā*'... '*ṛtāvā parṣati dviṣaḥ*' (V.25.1); '*ṛtāvā yasya rodasī*' (III. 13.2). Another word-unit is formed by *śuci* and *pāvaka*. We have '*śuci pāvaka iḍyah*' (VII. 15.10) '*śuciṁ pāvakaṁ..*' (V.4.3; VI 15.7) about Agni and *śucayah pāvakāḥ*' (VII. 57.5; 56.12) is applied to the Maruts Also Śvetāśvatara Upaniṣad (II. 316, 317) and Taittiriya Saṁhitā (13. 14. 5) show us the use of *śuci pāvaka*.

These formulai expressions are employed to relate particular happenings or 'themes' i.e. groupings of ideas expressed differently, suitable for several different situations. Some fixed description of a particular deity or his achievements or a stereotyped formulaic prayer can help the poet to take some rest in composing the hymn and at the same time to concentrate on new developments.[27] In composing a complete poem an oral poet follows some elements of order and balance within themes.[28] In the Ṛgvedic hymns we find a pattern in the arrangement— a particular god is invoked to the ritual to drink the soma-juice and to enjoy the hymns which are made acceptable for him and is approached for prosperity, off-spring etc. It should be remembered here that an oral poet builds his song on the skeleton of a fixed narrative but the words and their arrangements are not fixed. In oral poems of Central Asia also, we find common themes like single combats (cf. Indra -Vṛtra fight), theft of large herds (cf. Paṇi-Saramā dialogue), revenge and counter-attack (cf. prayers for victory over various enemies), wooing (cf. Uṣas-Sūrya) and marriages, sundry adventures of nomadic life.[29]

In his monumental work, *Ṛgveda Repetitions* (1916), Maurice Bloomfield has classified the Ṛgvedic repetitions into ten categories dealing mainly with its structural aspect such as repetition of groups of stanzas, of single and unchanged stanzas as refrains or not as refrains, of changed distiches or of unchanged distiches, of single pādas with an added word or words etc. But the present attempt of accounting for the structural mode is largely different. Dr. Mainkar[30] classified the various themes of the Ṛgvedic repetitions under three headings : religious, philosophical and ritualistic.

The concept of the Ṛg Vedic repetitions is mainly connected with different gods— Agni, Indra, Varuṇa etc, the only exceptions being those in a few secular or philosophical hymns. The thematic arrangement is less concerned to whom the hymn is addressed. The themes of these hymns can be classified under these categories :

1) Description of gods, i.e. of their physical features, dress and ornaments, weapons, carriages etc;

2) Achievements of gods, i.e. their performances, such as Agni is described as oblation-bearer, Indra as the chief warrior, Pūṣan as a pastoral god etc. In case of their general activities like bestowing booties and cosmic activities, the same repeated portions are used for different gods.
3) Repeated prayers to gods for social well-being, political order, ritual success etc. in an identical manner.

Certain ideas are repeated in descriptive word-blocs but the expressions are left to individual poets. The luminous fire attracted their imagination. Thus, Agni is described as *śocikeśaḥ* (III 14.1; 17.1; 27.4; V.41.14) or *śocikeśaṃ* (I. 127.2; 45.6; V. 8.2) and we find *harikeśaḥ* (III.2. 13), similar in meaning. Again the brilliance of the sun brings out the parallelism with that of the fire when a later poet borrows the phrase *śocikeśaḥ* (I.50.8) about the sun. Agni is *śukravarṇaṁ* (I.140.1) and *śucivarṇaṁ* (V.2.3). Scorching flames are imagined as sharp teeth of omnivorous fire— *tigmajambhaḥ* (I.79.6.), *jambhaiḥ tigitaiḥ* (I 143.5.), *tapurjambhaḥ* (I.58.5), *śucidan* (V.7.7.) and *ayodaṃṣṭraḥ* (X.87.2.) and the adjective is altered according to the poet's mood and metrical need. Vedic seers used the epithet *hiraṇya*—'golden, bright' in connection with various gods. While Indra is said to be *hiranyavāhuḥ* (VII.34.4), *hiraṇyavaḥ* (I 7.2), the god Savitar is appropriately termed as *hiraṇyapāṇiḥ* (VI. 71.4; 50.8; VII.38.2; I.35.9; III 54.11) and very poetically he is described as *hiranyastupaḥ* (X.149.5) and *hiraṇyākṣaḥ* (1.35.8). The cardinal idea here is the brilliance of the rays and *hiranya* is the fixed formulaic expression in the first part of the word-combination while the other part varies according to the poetic predilection of different composers.

As regards the achievement of gods, Bloomfield notices that about two hundred repeated lines are used in hymns to Agni and these well-known formulaic patterns present a fairly complete character of the god. Agni is requested to lead other gods to the sacrifice; *Agne devā ihā vaha* (1.12.3, 10; X. 15.4) or *devā̃ ā vītaye vaha* (V.26.2; VII. 16.4). The constructive as well as thematic imitation is evident in *sa devā̃ eha vakṣati* (1.1.2; IV. 8.2), *ā devān vakṣi yakṣi ca (V.26.1; VI.16.2; VIII.10.16.) Deva* associated with some form of the root *vah* covers four to five syllables of an octosyllabic line, a common device known both to the poet and the audience so that they could concentrate on the remaining portions. When we find *ā vaha somapītaye deva* and *ā devāñ somapitaye.. vaha* the interdependence of the compositions is casually seen. Agni is the messenger between the heaven and the earth — *Agne dūto viśām asi* (1.36.5;44.9); *yad Agne yāsi dūtyam* (1.12.4;74.7); *dūtaṁ kṛṇvānā ayajanto havyaih* (V.3.8) is retold *in dūtam kṛṇvānā ayajanto mānuṣāḥ* (X.122.7). *Tvaṁ viśve sajoṣaso devāso dūtaṁ akrata (V.21.3—anuṣṭubh)* and *tvaṁ viśve hi tvā sajoṣaso devāso dūtam akrata (VIII.23.18 uṣṇih)* varies only in few syllables due to the variation of metre.

The hymns to Indra sing about his supreme power and combativeness again and again. He is the mighty slayer of Vṛtra— the demon. So we find the line *Indraṁ vṛtrāya hantave* (III. 37.5; VIII. 12.22; IX 61.22); *vadhīd vṛtraṁ vajreṇa*

mandasānaḥ (IV.17.3) or *vadhīm...* (X. 28.7). Again there is *vṛtraṁ jaghanvā̃ asṛjat* (I.80.10; IV.18.7; 19.9). But when we find *Indro vṛtrānyaprati jaghāna* (VI. 44.14) and '*Indro vṛtrānyaprati jaghanvā* (VII. 23.3) we realise that Vṛtra, in due time has become the Aryan's enemy par excellence, that he is the generalised concept of all the forces hostile to the Aryans and subdued by Indra. The lines are from different maṇḍalas or by different sages but the cardinal idea of Indra as a killer of Vṛtra remains the same. We find *ava tmanā dhṛṣatā śambaraṁ bhinat* (I.54.4) and *ava tmanā bṛhataḥ śambaraṁ bhet* (VII. 18.20); only difference between these lines is regarding formation of the verb, and 'dhṛṣatā' substitutes 'bṛhata'. In *vi dviṣo vi mṛdho jahi* (VIII.61.13) and ... *rakṣo vi mṛdho jahi* (X.152.3) *dviṣo* and *rakṣo* substitute each other. The hymns inform us about his addiction to soma— *Indra somasya pītaye* (VIII.12.12); *Indram somasya pītaye (I.16.3;III. 42.4;VIII.17.15); Indrah somasya pītaye vṛṣāyate (I.55.2; 92.5; 97.11; IX 12.2); vṛtrahā somapītaye* (I.16.8; VIII. 8.93.20); *vahantu somapītaye* (IV. 46.3; VIII. 1.24) The close resemblance of all these lines leads to the assumption that the habit of borrowing was very much in vogue due to oral method of composition.

A line or a half-line is often applied in connection with different gods as the functions of the gods were thought to have some common aspects. This proves only the floating nature of oral word-blocs that the poets adopted readily form their repertoire of inherited lines.[31] Agni and Indra share a good deal of repetitions. Thus *devebhyo havyavāhana* (III.9.6; X. 118.5; 150.1) which describes essentially Agni's function as oblation-bearer is deliberately used about Indra (X.119.13). Both of them are described as the supreme power in *samrajam carṣaṇīṇam* (to Agni in V.21.4 and to Indra X. 134.1). Most of the Vedic gods were imagined to be the regulators of the universe. We see *yo asya pare rājāso* is used about Agni (X.187.5) and about Indra (X.27.7); *devo na yah pṛthivīṁ viśvadhāyā upakṣeti* is a line about Agni (I. 173.3) while a parallel *imaṁ ca nah* ... etc (III.55.21) is about Indra. The aspect of brilliance brings Agni in a natural connection with the sun; *ūrdhaṁ bhanum savitā devo āsret* (Iv.13.2; 14.2; VII 72.4) is abut Savitar and '... *saviteva āsret* '(IV.6.2) is a fine simile about Agni. *Agnim pade parame tasthivansam* (I.72.4) bears skilful resemblance to *asmin pade parame tasthivansam* (II. 35.4) about Apam napat. *Visvam a bhati rocanam* is applied about Indra (III. 44.4) and about the luminous sun (I.50.4) and as *visvam a bhasi rocanam* about Usas (149.4)[32] *Vi yas tatambha rodasi* is ascribed to Soma (IX. 101.15) as well as to Varuṇa (VII. 86.1).

The third category of repeated prayers reveals that same prayers for protection are addressed to almost each and every god. '*Yena vansāma pṛtanāsu śardhataḥ* is towards Agni (VIII. 60 12) and to Indra (VI. 19 8 Sātruṇ). '*Jahi rakṣānsi* sukrato' is to Agni (VI. 16.29) and to Soma (IX. 63.28). Prayer for plenty in wealth and manpower is a common theme. '*Sumṛlīko bhavatu jātavedāh*' to Agni (IV. 1.20) is altered in *sumṛlīko bhavatu viśvavedāh* to suit Indra (VI.47.12; X 131.6) '*rayiṁ gomantaṁ aśvinaṁ* 'is a word-bloc repeatedly used in soma-hymns (IX. 62. 12; 63.12; 67.6) and also in an Indra hymn (VIII. 6.9). A similar theme

is expressed in '*asvavad gomad yavamat*' in an Indra-hymn (VIII 93 3) and in an Soma-hymn (IX 69 8) *Yena tokanca tanayanca dhāmahe* this prayer is addressed both to Soma (IX 74 5) and to Usas (I 92 13)

Invocation to the gods is a popular theme Thus *abhitva pūrvapitaye* is used in an Agni-hymn (I 19 9) and in an Indra-hymn (VII 3 7) Almost a parallel is found in *visvebhih somapitaye* to Agni (I 14 1) and to Indra (VIII 21 4) *Agna ayāhi vitaye* (VI 16 10) has its identical in *yavaya yahi vitaye* (VI 16 10) has its identical in *yavaya yahi vitaye* (V 51 5) A prayer to Indra (VIII 4 14) is used with a pronoun in singular number *arvancam tva saptayodhvarasriyah vahantu savanedupa* but when the same prayer is addressed to the Asvins, we have a pronoun in dual accordingly — *arvancā vam* etc (I 47 8) These cited examples prove that the Rgvedic poets did not imitate blindly but they made necessary changes to the inherited word-blocs to suit their purpose So the Rgvedic hymns some definite pattern of ideas around which the poetic expressions crystallised The poets generally attribute the hymns to certain divinities whom they praise with superlative epithets and whom they approach for favour protection and wealth whom they invoke to enjoy the oblations and libations in their sacrifices The poets know the name of different deities their apparel their appearance as also the nature of blessings and punishments they meted out This traditionally inherited structure of the themes helped the poets to develop their compositions [33] Even if the hymn is of a secular nature a *danastuti* or a philosophical hymn still the poet shows the sense of inherent structural pattern of the themes

An analysis of the repetitive lines or half lines in hymns of a particular poet or a particular poet family reveals that they had been modified according to family patterns as a junior poet always looked up to his seniors for readymade expressions prescribed by the tradition Obviously an aspiring poet in a family would first listen to the compositions of his family members, again and again, for those were easily available to him Thus imitation is quite expected here by virtue of being in constant touch with these lines

On the other hand quite a mass of repetitions was interchanged within the families proving the possibility of oral transmission of popular phrases outside the definite family circle This was possible because all the clans could have been present in the rituals where these orally composed hymns were performed Through constant repetition certain phrases or lines would impress the audience there and generate formulaic expressions in other s minds from whichever family they might belong V G Rahurkar [34] has shown that most of these seer families were inter-related or at least, closely associated This assumption supports more strongly the theory of intermixing of repetitions within the poet-families Gritsamada, the main seer of the second book is clearly stated to be an Añgirasa, hence both the families must have been well acquainted Again these Gritsamadas make special reference to Saraswati (II 42 16 — 18 30 8 32 8) which emphasises the importance of the river in their community-life The Bharadvājas also lived in the regions of Saraswati (Rahurkar 1964 p10 RV VI 61, VII

95;96). We have details of the feud between Vasiṣṭha and Viśvāmitra (III. 53.15—16; VII.104), that bear witness to the contemporaneity and acquaintance of these two families.

Jamadagni and Viśvāmitra also belong to the same family (Rahurkar : 1964, p250). From early Indian documents[35] we come to know that Jamadagni was an authority in magically efficacious mantras and that other seers adopted his style[36]. This is an evident proof that one poet imitated the style of other which was but only natural in the oral compositional tradition. We also find that the Atris had very close relations with the Kāṇvas, Gotamas, Kākṣīvatas and Priyamedhas.[37] There is common occurrence of names of patrons in the fifth and the eighth maṇḍala. i.e. in the compositions of the Atris and of the Kāṇnvas.[38]

Relation between the Atris and the Bharadvājas as well as between the Kānva and the Kākṣivat families are traceable (RV. X 39.9; 143.1; 1.116.8; 117.3; 118.7 and VIII 4.10; 1.18.1). Bṛahaddevatā (V. 102.103) clearly describes Bharadvāja as son of Bṛhaspati and grandson of Aṅgirasa. Mankad tried to show Gṛtsamada, Viśvāmitra, Vāmadeva, Atri, Bharadvāja, Vasiṣṭha, Kāṇnva,[39] Kāśyapa even Agastya belong in someway or other to the Aṅgirasa family. Several longer hymns of RV book X appear as artificial combinations of independent shorter hymns. There are several shorter hymns also on the same theme that can be tied together as longer hymns because of the homogeneity of their content. Dr. Rahurkar observes that "perhaps they could take such liberty in respect of this hymnal material because the tradition of authorship .... had either become indistinct or was altogether lost.[40] Hence in can be pointed out that all these were possible due to the peculiar process of borrowing phrases and ideas.

In the limited span of this article it is not possible to cite details of the repeated portions, but a careful analysis will show that quite a bulk of repeated lines or word-blocs are limited within the boundary of certain families and at the same time we must admit that the real mass is far greater in number and quite irrespective of family-limits. A later poet of a particular family could imitate a previous poet of another family very easily. In oral method of composition, any personal or family-possession of word-units or lines could not exist, for a performance would have been orally presented in front of a group of listeners most of whom would be members of other families. So, we think that the profuse use of repetitions in an inter-family way supports only the sifting of lines orally within different groups of poets. In analysing the songs of primitive culture we observe that in primitive tribes such as the Africans or the Eskimos expressions would have been possessed by the tribe or community and were transmitted to the junior poets through the oral tradition.[41] Prof. Rahurkar thinks that :

> In the *mantra* period, the Vedic prose must have lived a kind of communal life and they must have then always thought in terms of the community as a whole. When the Aryans settled in the *Saptasindhu* region, their communal consciousness gave place to family-consciousness and the stray *mantras* were organized in the *Samhitas*[42].

This communal feeling also could have inspired the borrowing of same traditional phrases by different families.

As some repetitions are alliterative, they subtly provide an additional embellishment to the verses, thus making them more acceptable to the audience and presumably to the gods invoked. Dr. T. G. Mainkar rightly observes that the Ṛgvedic poetry has very close affinity to some European heroic poetry. i.e. the Homeric poetry and has the germs of the same.[43] He further says,

"The Ṛgvedic poets themselves speak of the composition of their prayers in term of cutting the grass or fashioning the chariot, or, at least, composed in imitation of the earlier poets."[44] A. Kaegi noticed that the dialect of the RV

> "is like the language of Homer... a popular artistic or poetic speech derived in the guilds of singers, and the many conventional turns of expression in it plainly prove that the art of song had long been fostered and practiced among the people."[45]

The imagery of the Ṛg Vedic poetry comes out of the daily lives of the poets. Once an image had proved to be appealing to the audience, it became a part of the poetic convention. "*Jāyeva patya uśatī suvāsāḥ*" (1.124.7; IV.3.2; X. 71.4; 91.13) is a standard expression of love and longing. The cattle breeding Aryans were well acquainted with the relation between the cow and calf. Even Agni and Indra are invoked as the cows call their calves. *Vatsaṁ na svasareṣu dhenavaḥ* (II.2.2; VIII.88.1). A similar line is *vatsaṁ gavo na dhenavaḥ* (VI.45.28) which reminds of *vatsaṁ jātaṁ na dhenavaḥ* (IX.100.7) and *gāvo vatsaṁ na mātaraḥ* (IX.12.2) is rebuilt with same traditional elements of both idea and language.

The verbal form of the Ṛgvedic poetry is beautified by applying many devices such as alliteration and assonance[46]. *Vīrebhiḥ vīrān vanavad vanuṣyataḥ* (II.25.2)... here *vanavad vanuṣyataḥ is* borrowed from the previous verses to make it sound better with *vīrebhivīran*. In are asmat amatim are amha are" (IV 11.6) are is stressed by repetition and it emphasizes the idea of driving away all kinds of sins; a and ma have and alliterative effect also. Arrangement of words is also very remarkable in *sahaḥ sahiṣṭha turatas turasya / ugram ugrasya tavasas tavīyo aradhrasya radhraturaḥ* (VI. 18.4). The poet's keen sense of sound repetition is admirable.. Again we find *viśvajite dhanajite svarjite satrājite nṛjite urvarājite / asvajite gojite abjite* ... (II.21.1) Here the poet wants to highlight Indra's achievements as a conquering and plundering leader of the troops, so *jite* is repeatedly combined with the list of desired objects. A similar formation can be found with tuvi— *tuvidyumna, tuvirādhas, tuvikūrmi, tuvideṣṇa, tuvimagha, tuvimātra, tuvigarbha, tuviṣman, tuvimanyu, tuvījāta* and *tuviṇṛmna.* (IV.21.2; VI.22.5; 31.5; VII.58.1, 2; 66.1; VIII.81.2).

Another remarkable type of repetitions is the refrains. Either the earnestness behind the requests to accept their votive offerings or to preach the superiority of the divinity and the intention to produce the desired effect accounted for these refrains.[47] The hymns were sung during sacrifices, so refrains were needed to be sung either by the entire community present, or by the priests in chorus. These

repetitions bring out some aspects of the relationship between the priests and the common people.[48] They also reflect the common belief that some magic was inherent in them; cf. the refrain in R. V.I 82. 1—5. "*yojā nu Indra te hai*". Apparently, the sacrificer desires the god to hurry to the sacrifice and this particular phrase is believed to contain a magic power that will prompt the god to hurry to the ritual, hence the repetition. In II. 12 the poets emphasize the greatness of Indra— *sa janāsa Indraḥ*. Similarly, *asmabhyaṁ citraṁ vṛṣaṇaṁ rayiṁ dāḥ* (X.47) this prayer for wealth is a refrain so that the entire community of votaries can join in. Moreover, the repetition of the appropriate kind of sounds. suggestive words with judicious arrangements of vowels and consonants shape the psychological mood of the community.

Thus in each and every section of the Ṛg Veda we have clusters of repeated words, phrases, lines or even whole verses. These are not merely mechanical repetitions but a vital and indispensable part of their poetic diction. These repeated clauses, phrases and word blocs did not require much attention for being realized due to their familiarity. Due to these repetitions, the concentration of the poet and his compatriots was left free to follow the rituals. In the Ṛgveda, priests vied with one another for producing effective and powerful hymns. Much of the Vedic poetry was quite pragmatic, not promoted by inspiration. While priests consciously tried to compose ritually useful verses, many spontaneously composed lyrical songs were also used ritually. The poets actively believed such use to be potent to sway the gods and earn their favour. This was the psychological reason of repetitions in these hymns.

The analysis carried on so far leads us to believe that the criterion of modern researches will throw light on the composition of the Ṛg Veda. John D. Smith questions Lord's theory whether it can be applicable to epics that are of fundamentally different character and are non-improvisatory in nature. [49] Even if his argument stands, still we want to point out that Lord's oral theory is definitely applicable to the Ṛgveda, one of the earliest specimens of oral literature.

Notes and References

1. "His art consists ... in the ability to compose and recompose the phrases for the idea of the moment on the pattern established by the basic formulas" Lord, A.B : *The Singer of tales* Cambridge. Mass 1960 p-5
2. The traditional bard in oral poetry is only but a link in a long tradition and the mods of his audience force him to improvise on the spot. Antoine, R : *Journal of Jadavpur, Comparative Literature* vol 20 21 1983 pp 1—25
3. Chadwick, H : *The Heroic Age* Cambridge 1912
4. Chadwick, H.M : and N.K. *The Growth of Literature*. Vol I—III, Cambridge 1932—40
5. *Bowra, C.M : Heroic Poetry*. London 1952.
6. Parry Milman. *L' Epithete Traditionnele Lans Homere Paris 1928*
7. Lord, A.B. op.cit. 1960

8. Lord, op.cit : p130
9. Lord, op.cit : p 131
10. Lord, op. cit : p131
11. Parry *In Harvard Studies in Clasical Philology* 41 (1930). p 80
12. Lord: op. cit p 4
13. Krik, G.S . *The Songs of Homer.* Cambridge 1962 p67.
14. Kaegi, Adolf. *Der Rg Veda Die Alteste Literature Der Inder Liepzieg* 1878 Tr. New Delhi. 1972.
15. Gonda, J : *Stylistic Repetitions in the Veda.* Amsterdam. 1959
16. Klein, J. S : *The Diachronic syntax of the particle 'U' in the Rgveda.* JA OS vol.98 no 3 July. 1978.
17. Sen, Nabaneeta: *'Comparative Studies in Oral Epic and the Valmiki Ramayana'* JAOS. Vol 86 1966 p 399.
18. Sen, Nabaneeta: Op. cit. p 400
19. Agni and Indra are frequently invoked at the beginning of the stanza or line; in VII. 52 each stanza begins with Aditya. Repeated phrases like *Marudbhiragna a gahi* as in I.19.1-- 9 sound like formulas chanted collectively. Verses where number are used in an ascending order remind us of similar practices in the Kalevalal and we wonder whether it is an inherited Indo-European style-habit.
20. Kirk op. cit. p 56
21. Shastri, P. S : *RgVedic Ballads* Poona Orientalist. No. 10 PP 92—100.
22. In 1.90.9 the use of the word *sam;* In V.51. *svasti* thirteen times etc.
23. Note the same attitude regarding the god names in the Egyptian mythology.
24. respectively II.25.2; I.64.14; II.305; VI.44.18; VI.25.4; 66.8; IV.41.6; and I.114.6;
25. VIII.32.12; 61.5; 12.5; X 134.3; VII.24.4; VIII.81; 87.3; 8.18:
26. IX. 29.6; 63.2, 9; 106.4; 67.3; I.64. 14;
27. Cf The arming scene of Alexandros in *Illiad* book III, lines 330—338; parallel arming of Achilles in XIX lines 369—391; parallel arming of Patroclass in XVI 131—144.
28. J. Cooper finds similarity in vernacular Chinese story-patterns. See Cooper, J.A: *The Parry-Lord Theory applied to vernacular Chinese stories. J.A.O.s. Vol.95. 1975. pp 508—12*
29. Zhirmunsky, V: And Chadwick N K. *Oral Epics in Central Asia* Cambridge 1969.
30. Mainkar T.G. *Some Poetical Aspects of The RgVedic Repetitions* Poona 1966
31. Generally speaking, the gods share the same attributes of might, light goodness and wisdom. Keith, A.B: *The Religion and Philosophy of the Veda and the Upanisada.* 1925. p 87
32. While listing the similar phrases about Agni and Soma, Bloomfield remarks that they imply a development in the concepts of different gods ultimately leading to their oneness. Op. cit. pp 583—592.
33. "Any one who reads through a collection of oral epics from any country is soon aware that the same basic incidents and descriptions are met with time and again" Lord. op.cit. p 68.

34. Rahurkar, V.G: *The Seers of Rg Veda.* University of Poona 1964.

35. Taittiriya Saṁhitā I.7.3; Mahābhārata Adiparvan 61, Vanaparvan 115.

36. Cf. RV. VIII. 96.3; 101.8; IX 62.2; 65 25; 97.51

37. RV.145.3; 139.9; AV. VIII.22; RV.X. 150; V. 41.4; Rahurkar. op. cit. p 75.

38. cf. V.61.9 = VIII. 71.11; V.30.12 = VIII.3.12; V.30.11, 14 = VIII.22.10; V.87.4 = VIII. 68. 15.16 Rakurkar suggests that those two families must have been originally one. Op. cit p 76 Brough, J. C: *The Early History of the Gotras* Camb. Univ. Press, 1953.

39. Mankad: *Date of the Rg Veda.* University of Poona. Pp 86—88.

40. Rahurkar: op. cit. p 242

41. Bowra, C. M. *Primitive Songs* Weidenfeld and Nicholson. London 1962

42. Rahurkar, op. cit. p 210

43. Mainkar, T.G. : *Some Poetical Aspects of the ṚgVedic Repetitions* Poona 1966. p12

44. Mainkar, T.G. : *Mysicism in the ṚgVeda* Bombay 1961. p6

45. Kaegi, Adolf: op. cit. p 33

46. Oldenberg: *Die Literatur Des Alten Indians,* Stuttgart 1908 p208

47. These refrains assert the communal character of the poetry and are found in almost all poetry through the world. Bowra : *Primitive songs.* P 41—43

48. Bhattacharji, Sukumari . Literature in the Vedic Age Vol I; I; K. P. Bagchi, Calcutta 1983.

49. Smith, J. D : The Singer or the Song? A reassessment of Lord's Oral theory. Man (N. S. 12. 1977) pp 141—53.

The *Vamsavali* From Chamba : Reflections Of A Historical Tradition

Romila Thapar

From the time of the early Orientalists in the late eighteenth century, it was maintained that Indian civilisation lacked a sense of history since there were no histories of India in Sanskrit. But few attempts were made to explain why this was so, if in fact it was so. There was a search for histories that would conform to post-Enlightenment history, emphasising a chronological frame, a sequential narrative of mainly political events and some attempt at evaluating sources and drawing out causes. Such histories were not found. The one exception that was always quoted was the *Rajatarangini*. The insistence on Indian civilisation being a-historical facilitated the writing of a history determined by colonial interpretations.

Other explanations were related to the colonial emphases on Indian society having been static and unchanging, and therefore not registering any change. It was a common belief that only societies such as the Judaeo-Christian with a strong eschatology of a definitive beginning and end, and of change determined by a sense of linear progress, had a concept of history. India it was said, knew only a cyclic concept of time that emphasised repetition, whereas a historical sense required linear time to emphasise the uniqueness of historical events.

I would like to argue that there were histories of regions, dynasties and sects, which were overlooked, even though they did conform to the kind of history familiar to Europe, such as that in medieval European chronicles. These were held to be narratives of the past, at some levels historical but not devoid of elements of fiction. As it happens these texts have provided much information that we have used to reconstruct the past. They display perceptions of the past and therefore reflect a consciousness of history. Such histories date from the turn of the late first, early second millennium AD and are often in the form of *vamsavalis*, literally paths of succession, and in effect, chronicles.

The critical enquiry into texts pertaining to the past that we associate today with history, has of course emerged only from the extensive discussion on the past in the last century or two and we cannot therefore expect earlier texts to reflect this. What is of interest is not so much the question of how closely these texts approximate to our modern notions of history, but rather why they were written and what were they intending to say; as also the extent to which these histories refer back to the records of an earlier past. In other words were the later texts consciously drawing on the earlier with the intention of creating a historical narrative?

The historical tradition in early India was expressed in various genres of texts–genealogies, biographies claiming to be historical, chronicles, and annals in the form of inscriptions frequently reflecting the official versions of events. The oral tradition was also present although it was largely confined to genealogies and to epic poems also claiming to be historical. *Vamsavalis* were intended as historical narratives and a number were written in various parts of the sub-continent. Their format and content reflect some selective continuities from earlier genres of texts.

It has repeatedly been said that there was only one text in early India that could be regarded as history, and this was the *Rajatarangini*, a history of Kashmir written by Kalhana in the twelfth century.[1] It is not my intention here to dwell on the *Rajatarangini* since so much has already been written on it. I would like to draw attention to the prevalent tradition of chronicles, of which genre the *Rajatarangini* is one, and certainly the most impressive. I would like to examine the structure of a lesser one and comment on its relation to what is called the *itihasa-purana* tradition : *itihasa* meaning 'thus it was' and *purana* being that which is old— the compound phrase suggesting a historical tradition. Lesser chronicles, maintained locally, provide a view of happenings sometimes alternate to those depicted in the major ones.

I would like to take as an example, the *vamsavali* from Chamba, a small hill state in the western Himalaya on the banks of the upper and middle Ravi river.[2] Its style is by no means as sophisticated or elegant as that of the *Rajatarangini*, and it is a fraction of the length of the latter, but the text illustrates the points I wish to make about early Indian chronicles. It relates the history of a small kingdom, hemmed in by larger ones. Spatially the territory is well-defined. The Ravi rises in the Pir Panjal range, is proximate to the Mani Mahesh area and flows through the broad Chamba valley. It has a number of tributaries and the confluences are often locations of importance. In the upper reaches the Budhil river provided meadows close to Brahmor and was an area initially given over to pastoralism, with animal herds being taken to the higher mountain pastures in the summer.[3] There are many more tributaries in the middle reaches around Chamba.

There are three significant aspects characteristic of such chronicles. These relate to the emergence of the state, to the legitimation of rulers, and to the process of acculturation that became part of historical change. Multiple groups living in a region had to be welded into a state which took the form of a kingdom. The record of this change was the chronicle written in a format constructed around a linear chronology with a sequential narrative pertaining to the events that involved the community of the region. Most of these events revolved around the establishment of kingdoms and dynasties. Consequently, the legitimation of these dynasties drew on a connection with the past. Therefore links with the past were woven into the present, as for instance, providing ancient ancestors for local rulers. As part of the transition to a kingdom, the region underwent a process of acculturation to enable those in a dominant position to acquire and maintain their dominance. This acculturation often took the form of introducing caste as a form of social organisation, of changing the economies of the area, and of bringing in

a new religion or firming up an existing religion. Patronising a particular religion was a historical choice.

Chronicles had a recognisable format that characterises them as a genre. There is generally an initial section that is concerned with cosmology and mythology, providing the context to the descent lists of early heroes which are then connected to the origins of local clans and lineages. This is followed by a rather garbled history of early rulers in the area and sometimes of the dominant neighbour to whom local history is linked— in this case Kashmir. Chamba lay in the shadow of Kashmir but it was also accessible to the plains of the Punjab, the routes being along the rivers. There was therefore a vacillation between closeness to the kingdom of Kashmir and those of the Northern Indian plains, in the politics and alliances of Chamba. Finally, in the third section, the history of dynastic succession is narrated at much greater length and often coincides with the epigraphic evidence on which it may have been partially based.

Access to the plains meant that the initial introduction of Puranic Hinduism into the region came through the encroachment of Sakta, Saiva and Vaisnava sects. These eventually became the established religions supported by royal patronage, their distribution being largely in the middle reaches of the mountain rivers associated with fertile plains and the lower Himalaya. Nevertheless despite the overlay of Puranic Hinduism, local religious beliefs and practices continued as a substratum religion throughout the centuries. Buddhism was the more commonly established religion beyond the mountain passes and into the higher Himalaya. Given the flexibility of frontiers there was much interface between various religious groups.

Many regional chronicles have similar formats. These similarities require a historical explanation drawing on reasons that encouraged the writing of chronicles, the currency of which was not accidental. From the late first millennium AD the historical scene in northern India underwent a mutation.[4] Historical change registered an increase in the number of small kingdoms. Aspiration to and competition for political power among tributary rulers, was widespread and the competition also became a means of containing power. This inevitably meant even more attention than before to campaigns, marriage alliances and the establishing of status— in short, the basic data for inclusion in chronicles.

In the late first millennium AD, individuals sought opportunities for upward mobility that frequently took the form of establishing principalities and claiming *ksatriya* status. Such persons are sometimes associated with Rajputs. The commonly held explanation for this is that the Rajputs were threatened by the Turkish invasions and fled to safer places. But these movements began prior to the Turkish invasions, and the *Chamba Vamsavali* for instance, makes no reference to the Turuska or the Yavana at the start of the narrative of rulers. It is more likely that the fertile, uncultivated valleys of the lower Himalaya attracted adventurers.

Control over an area was often established through conquering it. Conquest and heroism, therefore, became significant idioms reinforced by evoking past heroes. Alternatively, forested areas and waste lands of which there were plenty,

could be colonised, by making extensive grants of land or even villages. These were made to *brahmanas* or religious institutions as gifts and to a lesser extent to administrators in lieu of salaries, the grantee in every case appropriating the revenue. Eventually the appropriation was extended to the property itself. Grants as a agency of state formation are reflected in indications of how an area was gradually acculturated to mainstream norms.

Grants to religious beneficiaries had multiple purposes. They accumulated religious merit for the king. They assured him legitimacy by providing a genealogy, which, even if fabricated, covered up obscure origins and allowed new groups to latch onto *ksatriya* genealogies. Such grants established a network of centres supporting the mainstream culture. Above all the grant became the starting point for opening up waste land to cultivation and tapping resources from a rich environment with a scanty population. *Brahmanas* for example, as recipients of such grants, were often pioneers in agriculture despite this not being a recommended activity for them. Kingdoms required a developed agrarian economy and/or substantial commerce to support the administration of the state. Conversion of the forest dwellers into tax-paying peasants was a source of revenue although often as an adjunct to coercion.

Puranic Hinduism spread from the north Indian plains to the lower Himalaya through a variety of sects and facilitated the conversion of local clan-based societies to *jatis* / castes, reflected in a number of new caste names that occur in inscriptions and references to *varna* identities. This process of conversion from clan to caste included the mutual assimilation of customary practices and beliefs, reflected in the new forms that entered Puranic Hinduism at this time. These may have encouraged the inclusion of a locally remembered tradition in the reconstructed versions of the past. The essentials of caste society and state systems were replicated in these changes. Migrations, therefore, of professionals at the upper social levels were frequent, as among learned *brahamanas* and *kayasthas* who sought employment in the new kingdoms. This enhanced literacy in Sanskrit and in the culture-ways encapsulated in the language. But the migration did not stop at this social level. Stone masons and metal workers would have been employed to supervise the construction of temples in accordance with the current Nagara style of temple architecture prevalent in northern India. It has been argued that the Chamba stone temples bear the imprint of some elements of the Gurjara-Pratihara style.[5]

The court poet and the royal priest emerge as the authors of the chronicles. This new authorship of the tradition does not terminate the viability and role of the local bards continuing to record genealogies, marriage alliances and minimal property relations at the local level even if these records are second order to the court chronicles. The coming of literacy in Sanskrit converted some of the local oral tradition into a literate tradition and each language showed the imprint of the other. In the light of these changes it became necessary to reformulate the tradition and those that now became its authors controlled this source of royal validation. The attempt was to authenticate it by reference to what was believed to be past tradition.

Other recipients of such grants were administrators, ministers and senior officials, often of the upper caste receiving land as remuneration. Administrative office could become hereditary on occasion and this tendency would have increased, where remuneration was in the form of land. In the absence of an impersonal system of recruitment it was common to appoint local persons to administrative office. This further encouraged a power base at the local level, accounting in part for the proliferation of texts dealing with what was believed to be local history, tradition and practice. Recipients of grants of land were potential founders of dynasties. State formation therefore, was not confined to being based on conquest. Internal confrontations could also result in a reshuffling of social groups. Some emerged as far more powerful than before. But the rhetoric of conquest remained a necessary part of the heroic and courtly image. The relation of the individual to a deity was one where devotion to the deity brought liberation from rebirth. For the king, therefore, legitimacy could be further endorsed by claiming to be an incarnation of the deity. This also served to attract the loyalty of his subjects, although an excess of incarnations would have weakened this form of validation. Even where incarnation was not claimed, the king in the court and the deity in the temple became counterpoints of power, extending political strategies. The royal temple receiving patronage from the king, was additionally symbolic of the political authority of the patron, and incorporated some of the local religious idiom.

Acculturation was expressed in changing styles of temple architecture and in icons, among other things. The local shrine, was often built of wood because it was the traditional medium in the hills and the patrons were people of lesser status in the community. Such temples were superseded in the capital by the royal temple built of stone. The latter observed the established architectural norms common to many centres of power, apart from focusing on the conventional iconographic representations of deities. Religious icons with their encrustation of symbols are among the more sensitive reflections of acculturation.

These changes, sometimes mentioned directly and sometimes having to be inferred, are evident in the genre of the *vamsavali* or the chronicle. The chronicles borrow from earlier texts, such as the *Puranas* which allow them to make lineage connections. But another source of information was inscriptions of the same period, issued as the official record of some royal activities, and likely to have been consulted by chroniclers And where chronicles are absent, inscriptions often read as annals.

Many inscriptions focussed on the king and the court, but in their function and intention they reached out to a wider audience than the chronicle. They were located at places frequented by the public such as temples where they are inscribed on temple walls and on pedestals of images. Inscriptions that were legal documents recording a grant for instance, tended to be inscribed on copper-plates and were kept safely by the family of the recipient. The names of the grantees reflect an interesting change in the *brahmana varna.* Early grants, perhaps pointing to migrant *brahamanas* from well-established *agraharas* in the northern plains, (refer

for example, to Manika Sarman of the Kasyapa *gotra*), whereas later grants refer, for example, to *badu* Legha and to Cipu, son of Rasi, son of Jin and said to be of the Bharadvaja *gotra*. *Badu* was the Chambayali for *brahmana*. The names could suggest a recruitment of local priests into the *brahmana varna*. The precise dating of inscriptions provided a skeletal chronology for the chronicles as well. Their location and content was also useful in setting out the geography of events.

Specific to Chamba and neighbouring Lahul are what have been called "fountain inscriptions".[6] Stone slabs with a spout were placed at right angles to the flow of water in a channel or stream. An opening in the slab directed the flow, and the system was crucial to the distribution of water in the hills. These slabs were inscribed largely by feudatories and members of the elite, often as records of acts of piety contributing to the merit of their parents.

The *Chamba Vamsavali* (hencefoth *CV*), is in many ways typical of the regional chronicles.[7] It was updated to about the seventeenth century in the version that survives, authored it is said by Chamba *brahmanas* attached to the royal court. It is written in Sanskrit, but not of the best quality and it is thought that there might have been a version in the local Chambayali language.[8] The use of inscriptions as a source would have been more frequent when the script of the epigraphs and the texts was mutually intelligible. Elements of Chambayali are recorded in the later epigraphs suggesting the gradual forging of a local identity– a fusion of local culture with the cultural idioms used by the elite and drawn perhaps from elsewhere.

As with most such texts, it is not a completely reliable history in the earlier part but it becomes more dependable– in terms of comparison with evidence from inscriptions–from the time of Sahilavarman. The format is based on the *Puranas* and as a source for the first part it quotes the *Bhagavata Purana*. This is a list of the succession of early heroes from whom the later rulers of Chamba claimed descent. The Chamba kings sought connections with the heroes of the Solar line, the Suryavamsa. The first part of the *vamsavali* provides a list of ancestors in successive order and is obviously taken form the *Puranas* with some emendations. Descent is traced from deities to human ancestors, form Narayana to Brahma, Kasyapa, Manu, and to Iksvaku, the ancestor of the Suryavamsa lineage, and eventually to the *ksatriya* hero, Rama, in accordance with the pattern of descent in the earlier text, the *Purana*. Names are bunched together either with common suffixes such as *-asva*, or taken as a group from Puranic sources. Their is also an attempt to link ancestors to known events from the past. One ancestor is said to have been killed by Abhimanyu in the war at Kuruksetra.[9] The last of the ancestors died childless, thus bringing the succession to an end.[10] The ancestors, despite some being in a line of patrilineal succession, did not establish a dynasty but are listed as individuals. The narration of origins ends the first part of the chronicle.[11]

There is an apparent break at this point. The succession lists based on the Puranic genealogies that have little link with local history, come to an end. What follows is a narrative of local rulers with some background material on those seen as the more important ones. The precise status of the earlier among these is

somewhat ambiguous and the ambiguity gives way subsequently to dynastic history.

The narrative continues with the statement that after many years the raja Maru established a succession.[12] Maru was both a yogi and is said to have re-established the Suryavamsa that had faded out in the Kaliyuga. This enabled him to marry the daughter of a king and presumably claim *ksatriya* status. Yet his territorial base was the Kalapa *grama*, technically a village. Such rajas were more likely chiefs of clans, where the root meaning of the word raja is 'the one who shines'. The transition to raja meaning king would assume the existence of a state system to support the title that may have come later. His having to go to Kashmir with his eldest son, Jayastambha suggests that he was actually a subordinate intermediary. The family established itself at Varmapura – possibly what is later referred to as Brahmapura, the present day Brahmor which was the first town of importance in the valley, located in the upper reaches of the Ravi valley. Jayastambha was brought up in Kashmir and therefore Chamba may have been part of the territory of Kashmir at this time. The reference to Maru being a yogi is suggestive of possible shaman connections common to the early religious articulation in the Himalayan region. Maru anointed his son as king and departed to practice his yoga. This can be read as a cover-up for Maru having been superseded. The departure of rulers given to *tapas* and yoga, in favour of successors, occurs at various points in the narrative. Although it may have been a legitimate pre-occupation of some, it could also have been used to signify an enforced dynastic or generational change. There is a shift now from ancestors to dynasties.

After a few successors we are told that because a particular heir-apparent was devoted to yogic practice, the reigning king appointed Meruvarman as his successor This is explained as being for the good of the state/*rajya siddhaye*.[13] With Meruvarman the history of the kingdom comes to the forefront. The suffix-*varman* perhaps suggests a claim to *ksatriya* caste. He is said to be the tenth in succession after Jayastambha but his relationship to the previous king remains ambiguous. He may not have been the eldest son or perhaps a kinsman. Meruvarman in his inscriptions claims to belong to the *mosuna gotra*, which had not been mentioned up to this point, and the Adityavamsa, which would be an alternate name for Suryavamsa. Was the *gotra* introduced at this point?

Meruvarman's act of what might be called 'sanskritisation' or upward social mobility, was to do what was required of *ksatriya* rulers. He installed images of deities such as Narasimha, Durga, Ganesa and Nandi – both Saiva and Vaisnava deities. The image of Nandi had a *rajasasana* written on the pedestal, in somewhat faulty Sanskrit, paleographically dating to about the late ninth century AD. These images are still in worship.

Meruvarman's grandson, Laksmivarman, was killed in an attack by the Kiras, the neighbouring people of the mountains.[14] The story about the birth of his son, Musanavarman, is stereo-typical, narrated in chronicles from various parts of the sub-continent. The widowed Queen being pregnant was rescued by the minister

and went into hiding in the mountains, taken care of by the *brahmana* guru of the family. (The appurtenances of a kingdom in the form of ministers and *rajagurus* are present). Here she gave birth to a son, who when he came of age faced both alliances and hostility. Eventually he regained the lost throne, and ruled independently as Musanavarman. This story seems to emphasise a link with Meruvarman with the taking of his *gotra* name as a personal name, but could also be suggesting a break. It is the origin myth of this segment of the chronicle and serves to introduce the third section of the text. This echoes the pattern of dynastic descent in the Puranic tradition where legitimacy in the case of dynasties came through political power and not necessarily through genealogical connections, as in the case of lineage heroes.

From the inscriptions of Musanavarman's successors it would seem that the name had a special significance. They refer to themselves as belonging to the Adityavamsa and the *mosuna/musuna gotra,* or the *mausana kula* or the *musana vamsa.*[15] Vogel suggested that in a couple of instances *mausana* could be read as *pausana,* linking it to Pusan. But he recognised the grammatical problem in doing so.[16] The instances that would allow of such a reading are limited since in most inscriptions where the word occurs the alternate reading is not called for. Recently this reading has been put forward again but with no new arguments other than what Vogel stated : that the *ma* and the *pa* could be mistaken for each other in a couple of cases. Furthermore, the variations on the word would hardly hold if the word had an initial *pa*. The problem also remains that *pausana* is an unlikely *gotra* name, nor is it likely that Pusan and Aditya would be used as *gotra* and *vamsa* names in the same title.

The root for the name is *musa,* meaning a rat or a mouse. Vogel mentions that the popular explanation for the name Musanavarman is associated with the child in exile being guarded by a mouse.[17] The mouse could have been a totem animal of the clan and the word later linked to other meanings. It could also be associated with Ganesa, who is sometimes referred to as *musavahana* in mythology.

As a dynastic name, *musaka/musika,* is also know from other more illustrious dynasties.[18] The stories are similar and may reflect a stereo-type in origin myths, or some borrowing between migrant authors. There is often a play in such stories on who is perceived as powerful and who as weak, and the meaning of each. The young prince and heir is said to have grown up among the *mlecchas,* and these were people outside caste society, and often people of the forest. Obscure origins can be disguised as exile. The gaining or regaining of a kingdom would have involved raids, looting, and violent confrontations. The spatial scale seems small in the Chamba version since Musanavarman is said to have used the village of Pangi, granted to him by his father-in-law as the base of his operations.

The words *musaka* and *musana* also mean a thief or a plunderer. Was this then a memory of how local people viewed the intrusion of a new family where intervention is seen as plunder? Or does it indicate a local family claiming greater rights in an erstwhile system of reciprocity, which action was viewed as theft? The establishment of the state sharpens the divide between those who produce and

those who appropriate. The existing order could have been disrupted and control over land obtained through violent means. The mouse in the ancestral myth may have been invented to provide a possibly more acceptable explanation of the word when its meaning of plunder or theft had receded.

A few generations later, the king Sahilavarman was granted a boon of ten sons by the eighty-four *siddhas*, who appeared and blessed the king.[19] Their presence points to the continuing importance of earlier religious idioms and sources of religious power alternate to the Bhagavata sect. The Natha yogi, Carpata, is said to have accompanied the king and queen when they went to do *tapas*, and blessed the king to ensure his victory against other *ksatriyas*. These were presumably the feudatories. The Yoga Siddhas remained a source of power and the association of Carpata underlines the arrival of the Natha religion in the Himalaya as well as increasing contact between this region and the northern plains Possible it was also a concession to non-sanskritic culture since yogis and *siddhas* related more closely to the popular religion.

Judging by the *Vamsavali*, Sahilavarman was active in the evolving of the state of Chamba. He founded the city of Champa on the Iravati which is said to have been protected by the goddess Champavati who slew the demon Mahisa. Temples were built to house the *lingams* that had appeared miraculously prior to the reign of Meruvarman, doubtless viewed as a benediction from Siva. Further temples were required to house Vaisnava deities. A royal capital would be the seat of the court and of the administration supporting the kingdom, both of which presuppose prosperity. The location of Chamba meant a shift from the higher, narrower valley of Brahmor, to a fertile plateau at a lower altitude providing more land for cultivation and access to other valleys where agriculture could be introduced through grants of land. The location was also more accessible to the trading networks that were emerging in the lower Himalaya. The state of Chamba was taking shape.

But validation was also required from the ideology of Puranic Hinduism to support the king and his kingdom. The king was anxious to install an image of Visnu to be carved from a special stone only available in the Vindhya mountains in central India. [20] He sent his nine sons but they were unsuccessful in obtaining an unsullied stone– the one they brought had a frog in it - and they died in the process. The tenth son brought back the stone and the image was installed in the royal temple.[21]

This story marks another phase. The image from central India would confer another kind of status on the Chamba ruling family. The Bhagavata religion focusing on the worship of Visnu, was assimilative and incorporated local social groups and their varied practices and beliefs. This facilitated the trend towards political centralisation. His successors take the exalted title of *paramabhattaraka maharajadhijiraja paramesvara*. Substantial grants of land date from this period and refer to a range of officials, indicating a more complex administration than before. The *vamsavali* mentions kings granting land to *brahmanas* together with seed, rent and so on.[22] The coming of Bhagvatism helped integrate social groups and linked Chamba with wider geographical networks as the story of the stone suggests.

An interesting episode is narrated regarding the restoration of the Laksmi-Narayana temple in Chamba, the symbol of royal sovereignty.[23] The king Anadavarman required finances but did not wish to overly tax his subjects. Such taxes were common and most rulers had little hesitation in extracting them from the populace, so much so, that the tax itself was referred to as *pida*. One night the deity appeared to him with an assurance that wealth for the purpose would be provided. The next day villagers arrived bearing copper and announced that a copper mine had been discovered in their village. This was a profitable commodity and the wealth it produced was used on the temple.

The subsequent period was one of campaigns against Kangra and other hill-states with varying degrees of success. [24] Hostilities against Kashmir were not always to the advantage of Chamba as recorded in the *Rajatrangini*.[25] The *Vamsavali* continues the history but pares it down to a list of local rulers, who were by now in effect feudatories rather than independent rulers, and narrates their campaigns, marriage alliances and religious benefactions. These were indicators of status rather than records of actual power. Among the later kings, Janardana is mentioned as a considerable hero and is compared to Arjuna in archery. Nevertheless he lost his kingdoms to the Yavanas now ruling in Kashmir. His son avenged his father's defeat and retrieved the kingdom after many bloody battles, and eventually made an alliance with the lord of the Yavanas. The campaign against the state of Nurpur was a major event in the closing section of the *Vamsavali*. The later rulers of Chamba gradually replaced the suffix - *varman* in their names by *-singh*, perhaps because the Rajputs were using this suffix and had political clout given their association with the Mughal court.

Other sources inform us that subsequently Chamba was attacked by Kashmir and the reigning king replaced.[26] This event inaugurated intermittent periods of the subordination of Chamba to Kashmir and not surprisingly there is little mention of this in the chronicle. Perhaps this was due to embarrassment at being subjected to attacks, or else it could have been unimportant to the history of Chamba. If the rulers of Kashmir creamed off some of the revenue but otherwise left things largely alone, with local intermediaries still in control, as seems to have been the case, the change would not have been seen as a disjuncture. Independence was reasserted when Kashmir itself failed to withstand the power of Delhi.

The *Chamba Vamsavali* is the chronicle of a relatively unimportant state. Nevertheless it illustrates the kind of record maintained in such states. The focus is on the kingdom itself with little interest in the wider world except when it impinges on the kingdom. This may have been in part because the author, or the succession of authors, were closely associated with the royal court. The imprint of what might be called a historical tradition encapsulated initially in the *Puranas* and subsequently based on other sources, is evident. There is not only a consciousness of incorporating the past– however it was seen – but also using sources believed to record the past. The narrative registers historical change. Succession is not a continuous descent. A change from lineage to dynastic form is recorded, as also the changes of dynasties. Founders of dynasties could have

been adventurers from elsewhere or a local chief asserting himself more forcefully than others. The structure of kingship is supported by territorial expansion, the hierarchy of landed intermediaries and the presence of administrative functionaries. Society organised according to the rules of caste becomes another characteristic of change.

There is a shift from local cultural forms to those associated with the cultural mainstream as represented in the more powerful kingdoms of Kashmir and of the northern plains, forms that are adopted locally by those of higher social status. This is noticeable in visual artifacts such as temple architecture and iconography. In the latter, images of a local style, different from the mainstream forms,[27] tend to reappear with the return to the lesser status of the kingdom in the later period. The introduction of Puranic Hinduism becomes a manifestation of the initial change to a kingdom, but loyalty to the earlier sects, perhaps more localised and with a sufficiently impressive following is not discarded. There are three religious strands that weave through the narrative– the Natha Yogis, the Saivas and the Vaisnavas, each suggesting a different form of acculturation. The yogis represent an initial movement towards mainstream religion, associated with the references to *lingams* some of which spring up miraculously resulting from the *tapas* of the king. The establishment and validation of the state seems to be more closely linked to Vaisnava benediction. The proximity of the Laksmi-Narayana temple to the King's Palace at Chamba, also makes a statement about this relationship.

Status is asserted through genealogies– fabricated if need be, matrimonial alliances, the granting of land to *brahmanas* and the building of temples to Puranic deities. That the chronicle was maintained in a small kingdom may be because marginal states require greater validation, at least in their initial stages. The more powerful states articulated their history in other forms as well, such as in the *caritas* or historical biographies and frequent lengthy official inscriptions.

There is a purposeful selection from the past of what was thought to be relevant and worth reformulating, and there is a concern that there be a sequential narrative in chronological order The attempt is to bind groups together and provide identities that may be new but are relevant to the times.

The time frame of cosmic, cyclic time set out in some *Puranas* with its grand theory of the *yugas* — the four immensely long cycles of time, is known. Nevertheless it is by no means central to the chronology recorded in the *Vamsavali*. The focus in these is on the more limited span of generations of earlier heroes followed by dynasties. The use of regnal years in the *Vamsavali* and calculations based on eras in the inscriptions indicates an alternative linear sense of time, additional to the cyclic. Linear time was closely tied to the historical tradition.

If the historical tradition of early India is read as I have attempted to read it, then we have to look for a dialectic of early Indian history in terms of the central concerns of Indian society at that time, rather than only a narrative of political events. Enveloping its many concerns is not only the recourse to drawing upon the earlier and by now established perception of the past, but also an awareness of historical change. This would encapsulate a sense of history.

References

1. M.A. Stein, *Kalhana's Rajatarangini or Chronicle of the Kings of Kashmir,* Delhi 1960 (reprint)
2. J.Ph. Vogel, *Antiquities of Chamba State,* Vol.I, ASI New Imperial Series, Vol. 36, Calcutta 1911, has the text of the *vamsavali.* B. Ch. Chhabra, *Antiquities of Chamba State,* Vol.II, Delhi 1957, is substantially a collection of the later inscriptions from the area starting in the fourteenth century AD. See also, *Chamba District Gazetteer,* 1963
3. Brahmor is referred to as Gaderan or the habitat of the Gaddi shepherds.
4. R. Thapar, *Early India,* p. 405 ff
5. M. Postel, A. Neven, and K. Mankodi, *Antiquities of Himachal,* Bombay 1985 p. 111
6. Vogel, op. cit., p. 172 ff
7. Vogel, op. cit., p. 78 ff
8. Vogel, op. cit., p. 78 ff
9. *CV,* v. 27
10. *CV,* v. 34
11. *CV,* vs. 1-34
12. *CV,* vs. 35-43
13. *CV,* vs. 43-48
14. *CV,* vs. 49-60
15. Vogel, op.cit., pp. 141 ff; 164 ; 197
16. Vogel, op. cit., pp. 97–98
17. Vogel, op. cit., pp. 97-98
18. e.g. the Guhilas of Marwar and the Musaka-vamsa of the Ay kingdom of north Malabar. *Epigraphia Indica* XXXIX, p. 191ff.; Ganapati Rao, "Extracts from the Musaka-vamsam", Travancore Archaeological Series, II.1.10, pp. 87-113
19. *CV,* vs. 63-72
20. *CV,* vs. 73-81
21. The travel of an image in the reverse direction is narrated in a tenth century Candella inscription from Khajuraho. *Epigrahia Indica,* I, p. 122 ff, p. 129 v. 43. An image originating in Tibet, passes through many hands – as a token of diplomacy or sometimes as booty in a campaign – and is installed in a temple at Khajuraho.
22. *CV,* v. 90
23. *CV,* vs. 98-102
24. *CV,* vs. 104-120
25. VII. 218; VIII.323, 538, 1443
26. *Rajaturangini,* VII. 218
27. M. Postel et. al., op.cit. p. 113 ff.

Contemporary Topics

The Making of India

Aijaz Ahmad

When I was given the title, 'The Making of India', I was first intrigued by the word 'making', because it is not a noun but a verb and therefore refers to human action and intention; and it is a verb of *process*, referring not an origin or a result but something ongoing and therefore unfinished. Which moment in this long process of making should I address in this brief exposition? But then I got intrigued by the other word, which was not a verb but a noun, India. I was struck by the ambiguity of it because it refers, simultaneously, to a geographical space which has waxed and waned over time; to a *civilization* that is admittedly very old; a *society* that is by any sociological criteria the most diverse and heterogeneous in the world; but also a *nation-state* which is very young, younger than me in fact. I could not figure out what to do with this whole range of meanings in the two words, so I just started typing; and the mosaic of fragments that came out is what I should now want to share with you.

We could begin by reflecting, for example, upon the very prolonged and highly complex processes of material productions and cultural formations, over great many centuries, that have gone into the making of a singular civilization which is recognisably *Indian* even though it is held together neither by a common language nor a shared religion nor a primordial racial myth. Elite theories tend to think of India's civilizational *unity* in terms of a 'Great Tradition' whose essence resides in the Barhminical underpinnings of the trans-Indic Hindu social order and the normative texts of Sanskrit classicism. And, these elite theories think of *diversity* within this civilization as infinite play of so many 'little traditions' which are seen as local, transient and mutually discontinuous. This idealised image, so common in Orientalist scholarship and upper-caste Indology, thinks of this 'Great Tradition' as calmly hegemonic throughout Early and early Medieval India, commanding broad social acceptance, powerful enough to fight off all major dissents and yet benign enough to accommodate the local variants of the plethora of 'little traditions'. A corollary of this argument is that while the 'Great Tradition' could accommodate dissents that arose within India, from Buddhism to Sikhism, religious belief systems that came from outside India, notably Islam and Christianity, could not be reconciled with this Great Tradition and would thus always remain foreign elements in Indian society. As one can see, this idealised notion of the Great tradition' can easily narrow itself into a modern communalist position.

Even in relation to Early and early medieval India, much modern scholarship seems to challenge this idea of a broad acceptance and seamless hegemony of the Brahminical social order and Sanskrit classicism A remarkable feature of this civilization, from the earliest times, seems to have been the level and persistence of

protest against the dominant systems of spiritual hegemony. The ideological underpinnings for *varnashram*, so crucial to the Brahminical metaphysic, seems to have had a hold mainly among the dominant Brahmin and Kshatriya units of society in early India. Numerous strata of artisans and cultivators as well as pastoral and tribal groups seem to have persisted below those privileged classes, and their sacred world view was shaped by quite different belief systems, and who therefore seem to have been more responsive to the kind of materialist philosophies represented by the *Lokayatas* about which, unfortunately, we know much too little. We do know enough about the historical conditions for the rise of Buddhism, however, to conjecture credibly that whatever some of its teachings may have shared with some aspects of Brahminism, such as the notions of *karma* and transmigration of souls, its radical rejection of varnashram was possibly part of a head-on collision between the tribals and the shudra-atishudras on the one hand, and, on the other, the faltering hegemony of Brahminism which served at the time as the legitimising ideology of the division of labour required by a tribute-gathering personalised kingship. As we think more carefully about what might account for the unity of a civilization which attaches so much value to diversity, we may find that this peculiar willingness to provide space for non-hegemonic forms of power may well be owed to the role of *radical dissent*— the persistence and multiplicity of *resistance*— the will and action of various kinds of the shudraatishudras who simply refuse to walk out of a history which has been made at their cost.

Something similar can perhaps be said of the social reach of Sanskrit classicism For all the achievements and power of Sanskrit classics in domains spiritual as well as profane, one can say that prohibition of the study of the vedas, hence of Sanskrit, by the women and the Shudras meant that Sanskrit was no one's mother tongue and that it was even the father-tongue only for the dominant castes. It Is thus significant that women and the shudras speak in prakrits even inside the tradition of Sanskrit drama itself. The rise and magisterial history of the Bhakti-Sufi-Sant tradition, which begins in Tamil Nadu in the 6th century or so and culminates in upper North India about a millennium later seems crucial in this regard. In one region after another, across much of India, this tradition accounted, in the first place, for the rise and consolidation of the various mother-tongues as the legitimate languages of sense and sensibility, song and belief, replacing the father-tongue of the upper castes while taking from the father-tongue whatever was found useful and combining that with elements of the unauthorised and forbidden. But these mother-tongues were also the universal tongues of the lower and middle castes, hence repositories of a variety of suppressed knowledges and belief systems, closer to speech than to the authorised text, closer also to the tribal past, the pastoral community, the artisanal guild, the female experience, and closer even to the original forms of the great dissenting systems of Buddhism and Jainism.

One cannot say that every strand of this very complex Bhakti-Sufi-Sanet tradition was or remained, equally oppositional or defiant in relation to the dominant Brahminical order: many were prone to otherworldly quietism and even conservatism, some reconciled themselves quite substantially with the myths and preachings of that order. Some aspects, though, became permanent. The shift from the language of the

fathers to the mother tongues proved irreversible, as did a certain implacable hostility toward the varnashram. In sharp contrast to the traditions of 'High Brahminism', traditions of the anti-caste devotional theism which arose from inside Hinduism opened up themselves, profoundly, to strands of transgressive devotionalism in certain dissents within Islam; *advaita* resonated rather well with *vahdat-al-vajood* and the Sufi's hatred of the sharia seemed familiar to the anti-Brahminical Sant, so that historically novel kinds of syncretism were born out of that encounter. Unlike Sanskrit, which had the status of a singular classical language on a trans-Indic plain, in literature or philosophy as much as in normative religious texts, the maintenance of a multiplicity of languages was intrinsic to the Bhakti-Sufi tradition, the bulk of which sought neither a doctrinal unity nor a normative conduct nor the imposition of anyone language above the rest. Yet, the tradition itself had arisen in opposition to a fairly unified system of cultural and religious dominance: it therefore acquired not a doctrinal unity but a broadly shared culture or sense and sensibility, song and dance, belief and practice, across the various languages. As this tradition spread through these various languages, helping them consolidate themselves, the cultural communities associated with these various languages also acquired a shared idiom, a system of mutual recognitions, without sharing either a common language or a common doctrine. It is in this sense that the Bhakti-Sufi tradition seems to have played a large, trans-Indic role in the making of a certain world-view, a certain culture which one could now call *Indian*, rather than something that was particular to this or that region or religion.

Thus, what we know as the *diversity* of India, despite the cruelties and rigidities of the caste system, is thus not an attribute of the dominant upper caste culture but is owed, rather, to the permanence of dissent among the oppressed strata and the failure of Brahminism to even become hegemonic and transform itself successfully into a Universal Church on the model of Catholic Christendom.

That is one way of reflecting upon certain, earlier moments of our cultural history. We could reflect, equally, on 'The Making of India' into a modern nation. There are different ways of thinking about that too. The British-administrators as well as well as scholars claimed that it was only the Raj itself that had unified India for the first time in its history, which was otherwise an exasperating mosaic of conflicting communities, religions, sects and "races." We would argue, in stead, that it was the anti-colonial movement, rather than the fact of colonial occupation, which put into motion the process through which a pre-modern civilization could make a transition to modern nationhood. As we look back upon even the earliest phase in the embryonic development of the national movement, from the 1880s onwards, when it was far from being a movement for national independence and was still very much an upper class phenomenon, two features stand out.

One is struck, first, by an early and abiding concern that the national movement, in order to be truly national, had to be as inclusive as possible, taking into its fold people from different religions, regions and linguistic backgrounds i.e., a *unified* national movement which was nevertheless *internally* accommodative and heterogenous. Secularism was an inherent tendency in this nationalism, even when

commitment to it was not clearly articulated as an ideological position, precisely because the society that was sought to be transformed into a modern nation was religiously and denominationally so very heterogenous. One of the very many ill effects of the Partition of India is that one forgets that Muslims in pre-Partition India constituted roughly a quarter of the population and were the majority in India's two largest provinces, namely Bengal and Punjab. The ideology of secularism, or at least multi-denominational tolerance, arose in India as an intrinsic part of the ideology of nationalism itself; and the idea of secularism arose also as a mechanism of fundamental defence against varieties of communalism within society itself as well as against the imperialist policies of 'Divide and Rule'. This was an objective requirement, independent of any particular leader's personal predilections, be it the agnostic and 'socialistic' Mr. Nehru, or the Sanatani Mahatma Gandhi, or the pietistic Maulana Azad, or the rightwing Sardar Patel whose personal political culture was not far from that of Hindu communalism. So, between the founding of the national movement toward the end of the 19th century and (let us say) 1970s when decline of the Indian National Congress begins, ideas of secularism and inter-faith toleration became *more and more* a constituent element in the ideology of Indian nationalism. I do not at all mean that bourgeois nationalism in India was always true to these ideas or that the main nationalist organisations, such as the Congress, were free of communal elements even among its leaders. I actually think that the main reason why the national movement failed to prevent the Partition and the creation of Pakistan was that it had within its own ranks a very substantial rightwing which was itself much too implicated in the politics of Hindu communalism, *and was so perceived by large sections of the politically active Muslims*. What I do mean, however, is that the leading core of the national movement always thought of secularism as a necessary ingredient in the making of a modern nationhood for India, and that this core perceived the lack of secularism among many of its own ranks as a weakness and a deficit in the power and legitimacy of the movement as a whole.

Multi-lingual and multi-regional character of the national movement likewise arose out of the objectively perceptible historical and civilizational character of India. Unlike Africa or the Arab world, which colonialism had chopped up into numerous states, large and small, India had been integrated into a vast colony that spoke in numerous tongues. Most provinces of British India were larger than most countries of Europe. Speakers of Bengali in pre-Partition India were as numerous as speakers of French in Europe, anti they understood as little of Tamil as the French might have understood of Serbo-Croatian, while Tamil was older — by far– than any of the modern European languages, including English and French. This multiplicity of consolidated languages, hence of cultural attributes that grow alongside each particular language, was Intrinsic to the very nature of Indian society long before colonialism ever arrived on our shores, so that, in this concrete historical context, a modern Indian nation had to be fundamentally different, internally much more diversified, than the kind of mono-lingual, mono-cultural nation which is so typical of Europe and of advanced capitalism in general. The upshot was that English undoubtedly became a link language among the literate sections of the various regions, and there were of course moments of

unbearable zeal and stupidity when Hindi was sought to be imposed as a 'national language'– the so-called *rashtra bhasha* — upon all the peoples of India, but retreat front that latter position was also quick and there was, most of the time, a perfect recognition of the obvious fact that the 'Indian nation' whose unity was so ardently sought shall continue to speak in a couple of dozen tongues in its larger units, and many more tongues, in fact, beyond the larger ones.

This recognition surely corresponded to an objective fact, but the wide *acceptance* of this fact was owed, I believe, to the much older *civilizational* fact that we had been speaking a large number of languages through all those pre-national centuries in which something resembling a civilizational unity had come into being. This easy acceptance of a multi-lingual nationhood was remarkable enough. What was even more remarkable, considering that ethnicity and language has been so central in the history of the great majority of nationalisms, especially in Europe, is that India has displayed an astonishing lack of ethno-linguistic nationalisms. At no point in the course of the anti-colonial nationalism did there develop in India powerful linguistically-based separatist movement, on the model, say, of the communally-based separatist movement that led to the creation of Pakistan. In stead, we have seen large number of movements for the creation of linguistically-based states within the Union. Multiplicity of languages, hence cultural diversity, is something that is simply taken for granted. This fact does not seem very remarkable to us only because we have grown up in a social milieu and a civilizational space that has given rise to this fact. We could, however, compare this situation with a country like the United States, the most resourceful in the world, where the citizenry consists of migrants (and children of former slaves) who originally belonged to some two hundred different linguistic groups but who are then required to forget those languages and are subjected to the mono-lingual dictatorship of the English language, which refuses to concede any constitutional status to any other language in the life of that uniglot nation.

This recognition of the great diversity of religions, denominations, languages and regional cultures was one major aspect of the anti-colonial movement. One is equally struck by the great preoccupation with *reform* of Indian society itself and the virtual explosion of movements for many kinds of reform — of the upper caste society itself in Bengal, among Muslims in Northern India, in pursuit of social justice for the oppressed castes in Maharashtra, and so on. One could even say that movements for social reform actually *preceded*, by several decades, the rise of the anti-colonial movement, in the proper-sense of that word. There was a prolonged period of gestation, spanning much of the 19th century, when the colonial authority itself was frequently seen as the agency through which reform and modernization of Indian society was to be achieved. As the colonial state made clear that it was less than eager to introduce reforms that would offend the upper castes and the property-holding classes, there was a prolonged period, spanning (roughly) the last quarter of the 19th century and the first quarter of the 20th, when the 'national movement' saw itself as essentially a pressure group for persuading the colonial state to reform its own policies so as to more effectively reform the Indian society that it ruled. Meanwhile, throughout the 19th century and right up to Independence in the middle of the 20th century, we also

witness the rise of countless movements and organisations that were devoted to obtaining social reform rather than political liberty.

Not all social reform movements were progressive or modernizing, however. Great many of them were deeply conservative, communal and sectarian; in some 'modern' education was deeply connected with social conservatism, caste and religious identity; and quite a few fed powerfully into the rise of a variety of communalism, Hindu, Muslim and Sikh; even the RSS considers itself a reform movement. Here, I am reminded of Antonio Gramsci's observation that 'reform' frequently meant 'restoration' in ideologies of bourgeois nationalism in late 19th century Italy. So, one need not lump together all 'reform' movements as being uniformly progressive. Two things can be said, however. One is that the early history of Indian communism is replete with instances of people who abandoned bourgeois nationalism and joined the then developing communist movement because they were disaffected with the inconsistencies of that kind of nationalism as regards the questions of radical redistribution of economic power and social prestige that could truly benefit the oppressed castes and classes. In other words, the pursuit of reform took not only liberal and conservative forms but also led to radical and revolutionary politics. Secondly, it needs also to be said that among the more progressive elements in Indian bourgeois nationalism there was a common perception that India could not really become a modern nation without profoundly changing itself and renouncing some of the worst aspects of its own past, and that the battle of modern nationhood for India was a battle not only against the colonial oppressors but also against the anachronism and cruelties of many of its own social structures and practices. One positive result of this commitment to progressive reform was that, unlike so many colonies oppressed by the arrogance and racism of colonial rulers, revivalist tendencies never became dominant in the anti-colonial movement.

It is quite remarkable how uneasy the reformist and nationalist consciences were on the question of caste, and how sharp the perception that a society so profoundly divided along the lines of caste division can hardly call itself a nation, which presumes at least a horizontal social equality among members of a nation. Witness Vivekanada's famous quip that a Hinduism in which Hindus of different castes could not even eat together was, as he put it, merely a "kitchen religion." Or Tagore's observation, in his Lectures on Nationalism, that where people are free neither to dine together nor marry freely into each other's families can hardly be called a nation. Or Gandhi's declaration, on the eve of his Poona Pact with Ambedkar, that he would rather wish that Hinduism dies that caste may live.

The centrality of caste among the countless projects of reform during the colonial period is undeniable. Why so? The first reason of course is that the question of caste has been the great unresolved question— but also the irrepressible question— in the history of Indian civilization and society since the grand confrontation between Brahminism and the Buddha. That the question has never been resolved, despite struggles ranging over millennia, testifies to the force of the Brahminical order and the systems of power and property associated with that order. But that the question has been irrepressible across millennia and constantly erupts into great social crises,

testifies to the fact that regardless of the brute power of the dominant order, broad popular acceptance of that order breaks down constantly, so that the repressed returns punctually, refusing to be repressed, and the finest, the most progressive elements in our society have kept that question alive. My own sense is that the Bhakti-Sufi tradition, with its ideology of anti-caste social egalitarianism spreading over virtually every region and language in India, has contributed a great deal to aggravating that crisis of belief in the dominant social order and its justifications for itself. This past— with its history of oppression, but also its history of protest and opposition— weighed on the conscience of the principal reformers within the national movement, quite in addition to their perception that a really unified nation cannot possibly arise out of caste-based society. But what made caste so central in the politics of the age was neither the inheritance of the traditions of protest nor the guilty conscience of the nationalist leadership but the actual fact of the rise of the anti-caste movements of the modern type, which arose much before the 'national movement' (Phule's *Satyashodhak Samaj* was established in 1873, virtually a generation before the founding of the Indian National Congress in 1885). The nationalist simply could not evade this question.

As the national movement became truly a mass movement from 1919 onward and gradually transformed itself into a clear-cut anti-imperialist movement over the next decade or so, both those emphases— that the national movement be culturally composite and denominationally inclusive; and virtually every aspect of Indian society needed to be reformed in pursuit of a more unified and egalitarian India— were to be greatly strengthened. This essentially liberal make-up of the national movement of course provoked a right-wing backlash, notable from such organisations as the RSS and the Hindu Mahasabha, but this right-wing remained a very marginal element in Indian society throughout the anti-colonial struggle. Far more significant was increase in the working class militancy and the rise of the communist movement, from the 1920s onwards. Whereas the RSS etc were known for their fascist sympathies and collaborated actively with the colonial authorities, the notable feature of the communist movement in India was that it attracted many militant sections of Indian society which were disillusioned by the limitations of liberal nationalism, and that it arose in the perspective of a world-wide anti-fascist struggle as well as a rising anti-colonial movement within the country of which it remained an intrinsic part. This accounts for the fact that whereas the far right remained utterly isolated in Indian politics in the early decades of the Republic after Independence, the communist left was widely perceived as the main ideological alternative to liberal bourgeois nationalism at that time, while, at the same time, the communist left and the Nehruvian state shared the secular and democratic values of the Indian Constitution.

Let me now turn to the character of that state as it arose out of Independence movement.

First, India became a secular republic, not a Hindu Rashtra, despite the communal holocaust that had enveloped the Partition itself, and in sharp contrast to neighboring Pakistan;

Second, the Republic was conceived not as a unitary nation-state which has been the norm in Western Europe but as a 'union of nationalities'; state boundaries had

been drawn during the colonial period for administrative convenience and were now redrawn according to the principle of nationally;

Third, a 'union of nationalities' can only be a federation with considerable powers vested in the federating units; However, and fourthly, the effort to transform a highly exploited and impoverished colony into a modern industrializing society, a strong *national state*, above the federating units, for long-term economic planning, for widespread social reform, balanced regional development, protection of the national economy against foreign capital, and so on.

Fifth, this orientation toward religious pluralism, regional diversity, radical social reform, commitment to science and modernity, and the curbing of private greed for the sake of common public good were in fact values that got written into the constitution and a number of auxiliary documents of that period. For key terms— democracy, secularism, socialism and non-alignment— came to symbolize the aspiration of modern India as it arose out of colonialism.

One cannot say that all the state policies of that initial period— the first quarter century after independence, let us say— were actually formulated in light of those principles but so powerful was the articulation of principles and so widespread the affiliation with them, that policies were nevertheless *judged* in the light of those principles. In other words, one is talking here not of a state that was consistent in its policies but of a widespread popular consciousness for which secularism, democracy, pluralism, redistributive justice and national independence became the *normative* aspirations of Indian polity.

This is not the place to analyze why and how these normative principles got increasingly dissociated from the actual state policies; the Congress itself contributed to that decline over the past at least three decades. However, it is only within the last decade or so, as the RSS/VHP/BJP combine went from strength to strength that *all* the normative principles of the republic have been abandoned.

Not just secularism but even the doctrinal plurality of Hindu creeds is sought to be dissolved through the invention of a very hysterical kind of trans-Indic religious consciousness, and the RSS is the first politico-religious movement in modern Indian history which seeks to be Church and State simultaneously. Its parivar constantly invents new kinds of trans-Indic rituals in an attempt to transform a highly segmented Hindu society into a monolith that it can control. Among dalits and adivasis its projects seek to undermine the anti-Brahminical movements, assimilate these victims of caste society into its own sanskritizing projects and, indeed, to use as many of them as possible as footsoldiers in program of the Muslim and Christian religious minorities. The threat that the RSS poses to the secular values of the republic is thus a threat to the entirety of Indian society, be it the religious pluralism of the liberal elements in Hindu society, or the anti-caste aspirations of dalits and adivasis, or the religious minorities, or, in deed, those of us who derive our secular and egalitarian values not from the world of religion and caste but from the modern revolutionary traditions.

The threat to norms of modern, rational life extends then to the undermining of public life in general. The most elementary protocols of academic research are abandoned in the writing of history textbooks and introduction of new syllabi across

disciplines, as readily as elementary criterion of scientific investigation are abandoned in archaeological investigations in the service of the Hindutva project. The same motivation is now appearing with alarming frequency even in pronouncement from some benches of the judiciary, not to speak of the barbarisation of the electoral process itself, as witnessed in Gujarat and elsewhere.

This sea-change in spheres of politics and society is supplemented then by equally gruesome policies of extreme neoliberalism which is fast dismantling the public sector, and all protections for Indian industry, Indian farmers, even the great variety of species of the organic natural life in the country. In the process, India is fast becoming a client not just of the leading imperial power but also of second-order minor powers like Israel.

In conclusion, let me make two points. One is that we are faced today not just with a contest between secularism and communalism but also with a much wider, more fundament conflict in which the ascendant forces of the far right have aligned themselves with external imperialism in a joint and comprehensive attack on the founding principles of the Indian Republic. The India they wish to make shall *un-make* the India that had been made in the course of our struggle against colonialism. My second point is that in the making of our Republic there was a certain *structural* relation among various principles of democracy, secularism, independent national economy and foreign policy, protection for religious minorities, and the right to historical redress for the oppressed castes and classes. It is only logical that those who are opposed to any one aspect of that project are also opposed to the project as a whole, all parts of it. By the same token, then, we too need to build a broad unity in defense of that national project against domestic reaction and foreign imperialism alike *That* will amount, in effect, to making a new India— an India that we have glimpsed time and again at various points in our past history, but an India, really, that belongs to our common future. Something resembling the second installment of our incomplete national liberation movement.

Alternative Imaginations : A note on Critiques of Caste and Gender Relations in Pre-Colonial Indian Society

Uma Chakravarti

A central question in the context of analysing structures of inequality in India— caste, class and gender, has been the pertinence of using the framework of equality and inequality to early Indian society. Seminar presentations on inequality in ancient India have often been regarded as irrelevant, anachronistic and a derivative of a western framework. It is argued that such a framework should not be used in the context of early India because the 'indigenous' ways of thinking cannot be subjected to the equality paradigm. This is a fraudulent argument that should rightly be dismissed, but while doing so it might be useful to look at the sources closely and examine what such sources tell us about inequality and how this was understood by marginalized people— dāsas and dāsis, men and women from the lower castes subjected to class and caste oppression, as well as women who experienced patriarchal dominance. References in these sources make it abundantly clear that those who were subjected to various forms of power recognised the workings of power in their lives and sometimes identified the social bases of such power over them. For example, a dāsa is depicted as trying to understand the difference between himself and the king in an early Pāli text :

> Here is Ajātasattu, the king of Magadha. He is a man so am I. But the king lives in the full enjoyment of his senses— a very God methinks— and here am I a slave, working for him, rising before him and retiring later to rest, keen to carry out his pleasure, anxious to make myself agreeable in deed and word, watching his very looks.[1]

There is a further recognition that in the Buddhist sangha where social differences are erased, the erstwhile slave can not only become an equal of the king but also surpass him in terms of respect and honour in the eyes of the people.

Another example of the recognition that ordinary people, such as dāsas and dāsīs, labour strenuously but the credit for their skilled labour goes to their employers is contained in the following anecdote :

A particular woman was famed for her gentle temper. One day her dāsī named Kālī began to ruminate, 'Now does my mistress have an inward ill temper that she does not show because I do my work so carefully?' She proceeded to test her

hypothesis about the mistress's real temperament. She got up later and later in the morning on three successive days. The mistress's temper began to crack under the strain of the dāsīs 'self indulgent' and unslave-like behaviour and she began to abuse and threaten the latter. 'Now Kālī, why did you get up late today' she said on the third day to which the unperturbed Kālī replied, 'that's nothing mistress!' The infuriated mistress's temper cracked at this response and she hit Kālī with the iron bolt of the door. Kālī then displayed her blood-spattered head to the neighbourhood and that effectively put an end the myth of the gentle temper of the mistress. The key feature of the anecdote is Kālīs recognition that it is her meek and submissive behaviour, and her own skill at work, that is the basis of the mistress's good nature and not the innate goodness of her heart.

Consciousness of exploitation is also evident in the recognition by a master that the surplus that he controls is the fruit of the labour of his dāsa-karmakāras[2]. Coercion and physical violence too is described as part of the power of some men over other. The atmosphere of fear and intimidation is graphically described in the Mahābhārata :

> Men acquire other men as slaves, and by beating and otherwise subjugating them make them work day and night These people are not ignorant of the pain that is caused by beating and chains.[3]

In the last quarter of the 20th century the field of social history expanded and a number of works have been written exploring various dimensions of caste, class and gender inequalities. These have effectively demonstrated that the tools of critical analysis can be applied to ancient Indian history.[4] Further the existence of a distinctive viewpoint to counter the hegemonic top-down view of society, so evident in the prescriptive Brahmancial texts, is beginning to be documented. But it is also necessary to document the fact that even as the processes of the formation of hierarchies were unfolding, and throughout the centuries when the caste system was proliferating, there were critiques of the caste system and of unequal gender relations. What need to be stressed then is that critiques of inequalities are as old as the formation of these structures of inequalities. From a number of diverse references we know that not everyone was willing to accept these unequal social relations and the hegemonic ideology was contested in a variety of ways as people at the lower end of the caste hierarchy tried to find ways to escape, or resist, their degradations. The Buddhist tradition, in particular, kept alive the critique of caste : among a number of Jātaka stories (Buddhist popular narratives with an ethical content circa 1st-5th century A.D.). Two may be cited here : in one Punnā the dāsī of a rich household contests the brāhmanas claim to defining rituals. In the other a bhikku who was drawn from the 'low and 'impure' caṇḍāla caste not only teases a passing brāhamaṇa for his obsession with purity but also defeats him in a discussion on the finer points of philosophy. Anti-Brahmanism as a way of thinking has a long ancestry as the accounts here will show.

> A famous teacher had a brāmaṇa pupil who was very proud of his high caste status. One day he saw a caṇḍāla and, fearing that the

> wind after striking the caṇḍāla's body would proceed to strike against his own body and pollute him, cried out, 'Curse you! you ill omened caṇḍāla! Get to leeward immediately,' and he quickly went to windward himself. The caṇḍāla, however, was too quick for the brāhmaṇa and stood so that the wind would pass his body on the way to the brāhmaṇa's body and thus defied the brāhmaṇa to end his ordeal. If the brāhmaṇa could defeat the caṇḍāla in philosophical debate he would change his location. The proud brāhmaṇa accepted the offer as he believed that no one, specially one who was a caṇḍāla, could defeat him in a philosophical debate. The caṇḍāla's question, however, was so well formulated that the proud brāhmaṇa could not answer it and had to accept his defeat and publicly acknowledge the superiority of the caṇḍāla's intellect.[5]

Punnā was a dāsī who went down to the river to fetch water for her master's family every morning whatever the weather. She found a brāhamaṇa also coming to the river every morning and performing ablutions even as he shivered in the cold. So she said :

> *Drawer of water i [go] down to the stream*
> *Even in winter in fear of blows*
> *Harassed by fear of blame from mistresses*
> *What brāhmaṇa fearest thou that ever thus*
> *Thou goest to the river?*
> *Why with shivering limbs dost [thou] suffer bitter cold?*

The brāhmaṇa replied that he was trying to wash off his sins and accumulate merit. Punnā then replied :

> *Nay now, who hath told thee this that water baptism*
> *From evil karma can avail to free?*
> *Why, then the fishes and the tortoises*
> *And all that haunt the water*
> *straight to heaven will go!*
> *[But] the water would bear away thy merit too*
> *Leaving thee stripped and bare*
> *to bathe and shiver here*
> *That, even that leave thou undone*
> *And save thy skin from. frost.*[6]

Even in her poverty and misery, Punnā in a quiet and dignified way demolishes the claims of the brāhmaṇa's as a caste to inherent superiority, and their monopoly over knowledge. Clearly the humbly placed dāsī can perform drudge labour as well as think for herself!

In this context the *Vajraśuci* is an important text which documents the critique of caste. Attributed in the popular tradition to the Buddhist monk Aśvaghoṣa— circa

2nd century A D — a documented version of the text is said to go back at least to the 10th century and was kept alive in Maharashtra in particular through the Bhakti poets Later it was an important resource for the non brahmana movement and even for some of the less radical 19th century reformers in Maharashtra The *Vajrasuci* took arguments from the 'Hindu texts to rebut the evaluative characteristics of the brahmanical theory of caste divisions by which the brāhmanas claimed the highest status for themselves It drew upon the older tradition, evident in the early Buddhist texts, in which the Buddha points to the same biological processes of birth for all of mankind and thereby effectively rebuts and dismisses the claims of the brāhmanas to inherent superiority

The Buddhist texts have also provided us with an account of the way women perceived the unequal relations between men and women and sought to achieve an identity outside of domestic roles Women struggled to enter the sangha against a great deal of misogynism from the Buddha himself as founder of the sangha However, once they were in they carved out a niche for themselves despite a gender-based inequality within the sangha at the structural level as the bhikkhunis were placed firmly under the authority of the bhikkus Some of the earliest expressions of women s perceptions of the limitations of the roles allotted to them by a patriarchal society are available to us in the poems left behind by the bhikkhunīs in the corpus called the Therigathī They make it clear that the search for identity outside domesticity in the case of women goes back to the 6th century B C It is not a product of western influences as the critics of feminism like to posit but a very indigenous and ancient search for a self identity outside of patriarchal structures In these poems women spoke of their joy at leaving behind the drudgery of the kitchen, and the brutality of husbands They also spoke of the space they found for themselves as they entered the sangha and practised self awareness Take, for example this graphic account of a bhikkhuni who challenges the limitations imposed upon women through imprisoning them in domesticity – in what is called 'two-finger consciousness the capacity to take a grain of rice from the cooking pot between their two fingers and testing whether it was sufficiently cooked The bhikkhuni chastised Mara who was mocking at her sitting in meditation and telling her that all she needed was two finger consciousness (the other consciousness— the 'higher' consciousness— was a privilege of the male sage which women were not competent to gain') with the following retort

What should a woman s nature do to them
Whose hearts are firmly set who ever move
With growing knowledge in the path
Am I a woman in these matters or
Am I a man, or what not am I then'
I seek okasa [literally space][7]

As we shall see later, entry into the sangha did provide women with an important resource through which they succeeded partially in escaping patriarchal structures, this resource was missing in many of the bhakti traditions that we will discuss

below. Where available, as in the Vaishnava cult of Bengal, women continued to use it to critique both caste and gender inequalities.

A significant challenge to the caste system came through some— not all— of the various strands of the Bhakti movement. Four major regions have witnessed the Bhakti tradition at different periods spanning what is popularly called the early medieval and late medieval period : the Tamil region from circa 700 to 1200 A.D.; Maharashtra from circa 1200 to circa 1700; north India from circa 1400 to 1700 and eastern India from circa 1600 to 1800. There are many differences within these traditions of Bhakti and in varying degrees the bhaktas and bhaktins were drawn from non–brāhmaṇa and the lower castes and/or critiques of caste hierarchies were mounted. All strands of Bhakti provided democratic access to God to people belonging to different segments of society and this was an important space that opened up for the lower castes. At least at the level of a deeply personalised faith— that was the essence of the Bhakti tradition— the lowly found means by which they countered their exclusion from the ritual order and escaped the stigma that they were otherwise forced to live with. For these reasons the Bhakti movement has been celebrated in Indian tradition as an expression of the egalitarian impulses in our society and it is important for us to recognise this aspect of Bhakti. But there were severe structural limitations too as we can see from the life of Nandanar. The Periyapurāṇam provides a moving account of how he longed to go to the Cidambaram Siva temple but dared not because of his polluting status : each day he postponed it to the next and was nicknamed Tirunalaipovar— he who would go the next day. One day he actually dared to go, and danced in ecstasy but the priests would not let him enter the temple. As he wept in despair Siva appeared and ordered the priests to let him in through a fire— he got through unharmed into the inner sanctum and disappeared under the raised foot of the dancing Siva. Nandanar achieved equality only in the domain of mythology, not in the real world.

In order to assess the lasting impact of Bhakti in our society and *its capacity to alter the social relations of caste* we need therefore to take a close and critical look at Bhakti. The best way to do this is to examine in depth the Bhakti tradition in one region and here we shall do so in the context of Maharashtra.

Evidence for the Brahmanisation of western India— that is the Maharashtra region — goes back to the 1st century B.C., but caste as a dominant ideology was not necessarily an uncontested or uniform presence since that time : thus although the Sātavāhana kings, 1st century B.C. to 3rd century A.D., did claim to have stopped the dreaded 'contamination' of society through the mixing of *varṇas* and patronised Sanskrit over Prakrit, both Buddhism and Jainism had a strong presence in this region well into the early medieval times. From the 12th century the attempts of Brahmanic ideology to establish hegemonic control are discernible when the Brāhmaṇa chancellor of the Yādava king Heāadri wrote a text concerned with Brahmanic rites. At the same time the tensions between textual prescriptions for upholding caste were undercut by local custom and this tension continued to manifest itself well into the 18th century. Further, the history

of brahmanism in the region was accompanied by a strong critique of the caste system in the Bhakti tradition of Maharashtra. There were two major traditions within Maharashtrian Bhakti : the first was Mahānubhav which was the earlier of the two traditions and according to Kosambi went back to very ancient primitive communal traditions; the second was the Varkari tradition which was concentrated in the cult of Viṭhoba. The Mahanubhavs were the more radical of the two traditions, prescribed certain codes, made a sharp distinction between the householder and renouncer as the Buddhists had, and rejected the caste system. The Mahanubhav form of Bhakti was therefore popular amon the 'untouchables', and it also admitted women into their renunciate order. In fact women are said to have outnumbered men in the order, indicating the deeply felt desire to escape the sole role of domesticity that women were allotted in the caste based Brahmanic social order. When doubts were raised by misogynist critics of women in the order, Cakradhar is reputed to have said, 'why should these women not come here for the sake of religion? Is there any difference between your soul and their souls?' The radical potential of the order brought them under attack and Cakradhar was assassinated in 1274 after Demati, the wife of Hemadri the powerful Brahmana minister of the Yadava king of Deogiri, deserted her husband to join the Mahanubhava order[9].

The Varkari cult was centred around the seasonal pilgrimage to Pandharpur and according to some scholars was an attempt to blunt the radical critique of Brahmanism through a modified devotionalism within the boundaries of caste. Ultimately it was the Varkari tradition that survived in Maharashtra and is commonly perceived as Bhakti.

The Varkari tradition contains within itself the main features of Bhakti : on the one hand it transformed the ritualistic basis of the worship of Viṭhoba by an interiorised devotion that transcended the brahmana priesthood and on the other it drew its *sants* from a wide range of social locations; there were brāhmaṇa *sants* no doubt like Eknath, but there were others like Namdev, and Tukaram from peasant and artisanal communities and Cokhamela, the most celebrated of the lower caste sants, was a Māhar. There were also a number of women *sants*, Muktābai, Bhainābai, Soyrābai, Kanhopatra and Janābai. What is significant is that although there are many references to caste and gender discrimination in the abhaṅgas and poems written by these *sants*, the traditional responsibilities/ obligations of the lower castes and women continued as before. Janābai, a dāsī, continued to be economically exploited by her master's family even though Namdev, another *sant* was the son of Janābai's master. The family was thus part of the Bhakti tradition themselves and Janābai often signed off her abhaṅgas with the line 'Namadev's Jani says... Thus her identity even in her abhangas remained that of a dāsī.

Even more striking is the example of the celebrated poet of the Bhakti tradition of Maharashtra, Cokhamela, who died performing his labour obligations as a Māhar. It was then left to Cokhamela's son Karmamela to carry on the critique of caste as he cried out in agony.

Are you not ashamed
To have created us low creatures
Forcing us to eat
The leftovers of others?

Cokhamela's wife Cokhyaci Māharī as she called herself, too echoed the sentiments of the Māhars in one of her abhaṅgas : Her words indicate the despair of unchanged social taboos, where some are unclean, others regarded as pure. She attempts to recover some space at least in the world of devotion if not in the world of social relations :

The body alone can be pure or polluted
The soul is ever clean ànd pure...
Pollution remains in the body
The Soul is untouched by it

The ambivalences in the transformatory potential of Bhakti in the context of gender relations is equally noticeable as it is in the case of caste. Despite a deep engagement with Bhakti, some women like the brāhmaāṇa Bahinābai, who experienced violence at the hands of her husband, proclaimed sentiments in the mode of a pativratā in one of her abhaṇgs :

My duty is to serve my husband
For he is god to me
My husband is the supreme Brahmā
The water in which my husband's feet are washed
Is the most holy of sacred waters...

From a different social location, Kanhopatra, the lowly prostitute also seeks the redemption of God :

O Lord, I beg you
Keep to your word
My caste is impure
I lack loving faith
My nature and acts are vile
Fallen Kanhopatra
Offers herself at your feet
A challenge to your claims of mercy![10]

Thus it is clear that the lowly, humble and marginalised proponents of Bhakti while critiquing caste in the domain of religious tradition did not, or were not able to, mount a serious challenge to the caste system *as a structure of social relations.* Nor were its women devotees able to escape the patriarchal and caste relations of their times, as there was no order for them to escape into. Further, endogamous and compulsory marriage, dominated women's lives except in the case of Janābai the dāsī, in whose case it was her labour obligations that determined her social identity. Her status as a married or non-married woman is thus not revealed to us.

Finally, Rāmdās provided the resolution to the caste question in Bhakti in the 18th century. A Brāhmaṇa himself, he restored the superiority of the brāhmaṇas as a group even within bhakti : his elitist and conservative formulations are evident in his sayings :

Brahminhood ought to be preserved with due reverence.

Making his standpoint even clearer he says :

It would be wrong to bestow upon even the most studious of the untouchables the honour and respect that is due to the brahmanas.[11]

The varṇāśrama dharma was back even in the Bhakti tradition and it is this strand that has survived in Maharashtra into the 19th and 20th centuries. An important aspect of the inability of the Bhakti tradition to alter the hierarchical social relations, despite the explicit references to the humiliations experienced by the low caste Bhaktas in their abhaṅgas, is an account of the annual pilgrimage of the followers of Vitḥoba to Pandharpur, provided by the anthropologist Irawati Karve. She describes how the followers, drawn from different castes, walk together for fifteen days.[12] The brāhmaṇa group of pilgrims of which Irawati was part sang the abhaṅgas of Cokhamela in which he drew attention to the inner essence of the devotee rather than his outward lowly form, but cooked and ate separately from the other pilgrims. The distinctions of caste society thus remained unchanged and the practices of caste faced no major onslaught, at least in Maharashtra. The caste system as a hierarchy of social groups each bounded and marked of from the other though endogamous marriages, and the caste system as a form of organising labour and surplus appropriation, was unaffected by the Bhakti cults.

Another example of the way the ideology of the Bhakti tradition and the dissenting potential of a reformist tradition was blunted and ultimately came to be absorbed into the fold of the caste system is provided by the Vīraśaivite or Ligāyat *sants* of Northern Karnataka. A number of women strongly marked the Vīraśaivite movement with their presence and took a radical stance against caste. For example Liṅgammā, a low caste woman said in one of her *vacanas* :

Among the lowest was I born
Among the highest did I grow
and held the feel of real saranas
and holding them I saw
Guru Liṅga and Jangamma

And Akkā Mahādevī said :

O brother why do you talk to me
Who has given up caste and sex
Having united with the Lord Cennamalikārjuna

Kalavve made an even sharper critique of Brahmanism and its curious logic

Those who eat cock, fish or parrot
are regarded as high caste,

but those Madigas who eat beef
of that cow whose milk is offered
by Brahmanas to Siva
Why are they alone polluting?

And Bonta Devi drawing attention to the essence of sameness between people at the level of philosophy says :

Within the village where Brāhmanas live, same sūnyatā [emptiness]
Without the village where Holeyas live, same sūnyatā
Where then lies the difference?[13]

This amazingly strong anti-Brahmanical tradition of the Vīrāśaivites, providing a basis from which an alternative imagination could emerge in shaping social relations, however was unable to destroy the caste system in Karnataka. Over the centuries the Vīraśaivites lost the critical edge of their anti-caste position; unable to change the social relations of the society in which they were located, they became a sect which practised their own beliefs and reproduced themselves as a community by marrying among themselves : ironically through endogamous marriages— in a manner of speaking— they ultimately became a caste, or a caste like sect themselves. (Even conversion to Islam or Christianity has not led to an escape form iniquitous social relations for those who may have sought such an exit.) The case of the satnamis who arose in the 17th century and owed allegiance to Kabir, the great Bhakti *sant*, is also significant. They forbade caste distinctions within the newly forged community and drew their support from a number of lower castes, but became an endogamous community as they married among themselves : the net result was that although they critiqued the caste framework they ultimately returned to that framework but at a higher rank than when they had left it.[14]

To sum up, the enduring legacy of Bhakti has been that it provides women and men today who are possessed of democratic and egalitarian aspirations with a rich cultural repertoire to dip into. However we need to keep in mind that the Bhakti tradition gave the underprivileged an arena to express their social aspirations, a transformed self-identity in a limited sphere, but not a new social identity in the world of social relations. Resistance and struggle cannot be restricted to the field of ideology or faith alone if we want to change social relations in the world we all live in, and that is what we need to remember as socialists and feminists when we dip into the reservoir of Bhakti. However, it is equally important to recall how women resisted the normative structures that sought their compliance to patriarchal structures; historical sources indicate that by expanding the field of their social experience, some women at least have left us a rich heritage upon which we can build. The search for non-hierarchical and democratic social relations has been an important feature of our traditions : they work as a horizon that we seek to achieve now as we did at earlier times in our pasts.

References

1. T.W. Rhys Davids (tr.), (1973), p. 76, Dialogues of the Buddha, *Dīgha nikāya Vol. I*, Pali Text Society, London.
2. *Samyutta Nikāya, I,* (1959), p. 91, Nalanda University, Nalanda.
3. *Mahābhārata, XII,* 262.38.
4. See for example the works of R.S. Sharma (*Sudras in Early India*, Delhi, Motilal Banarasidass, 1958) Devraj Chanana (*Slavery in Ancient India*, Delhi, People's Publishing House, 1960) Sukumari Bhattacharji (*Women and Society in Ancient India*, Kolkata, Basumati Corporation, 1994), Kumkum Roy (*The Emergence of Monarchy in Northern India*, Delhi, Oxford University Press, 1994) among many others.
5. E.B. Cowell, (ed.), (1957), Setaketu Jātaka, *The Jātakas, Vol. I,* Pali Text Society, London.
6. C.A.F. Rhys Davids, (tr.), (1932), *Therīgāthā*, as *Psalms of the Early Sisters*, pp. 116-19, Pali Text Society, London,
7. *Ibid.*, pp. 181-82.
8. D.D. Kosambi, (1962), *Myth and reality : Studies in the Formation of Indian Culture*, pp. 32. ff. Popular Prakashan, Bombay.
9. Vijaya Ramaswamy, (1997), *Walking Naked : Women, Society, Spirituality in South India*, p. 213, Indian Institute of Advanced Study, Shimla.
10. The poetry in the section above draws a great deal from Vijaya Ramaswamy, (1997), *Walking Naked : Women, Society, Spirituality in South India*, p. 213, chs. 5 & 6, Indian Institute of Advanced Study, Shimla.
11. *Ibid.*, p 209.
12. Irawati Karve, (1962), 'On the Road : A Maharashtrian Pilgrimage.' *The journal of Asian Studies*, 22, 1 pp. 13-29.
13. Ramaswamy, *Walking Naked*, p. 186.
14. Irfan Habib, (1995), *Essays in Indian History : Towards a Marxist Perception*, p 176, Tulika, Delhi.

Gandhiji, Secularism and Communalism

Bipan Chandra

Gandhiji was a many splendoured personality : an intensely political person who observed the highest standards of morality in politics; a great political strategist who led a prolonged non-violent mass movement for the overthrow of colonial domination and the capture of state power; an orthodox religious person, who stood for the social liberation of women and the ending of caste discrimination and caste oppression and, ultimately; the caste system itself, and pleaded in general for the application of reason to all aspects of social life; a person who had the vision of a world in which all conflicts would be settled without the use of violence.*

Still, there are many facets of his personality and politics which are not well-known : for example, his total commitment to civil liberties and democratic functioning; or his understanding of the relationship between leaders and masses in a mass movement. In this paper, I will discuss an area in which he performed brilliantly and yet met with only partial success – viz., secularism and communalism. Gandhiji's major political failure lay on the communal front : totally committed to secularism in general and Hindu-Muslim unity in particular, he could not successfully oppose those who stood for communal hatred and communal division.

I

Before I take up Gandhiji's approach to secularism and the communal problem, it is necessary to grasp one great quality of his which is quite often missed by both his admirers and his critics as both see him as an unchanging person. But, in fact, he constantly 'experimented with truth' and changed and developed his understanding of society, politics and social change. His thought and activity in these and other aspects were in constant evolution.

Many quote his statements on the caste system, inter-caste and inter-religious dining and marriages, doctrine of trusteeship, landlord-peasant relations, capitalism, socialism, parliamentary system, relationship between religion and politics, use of machinery and so on, from his early writings. But the fact is that, while his basic commitment to human values, truth and non-violence remained constant, his opinions on all these and other issues underwent changes – sometimes drastic – and, invariably, in more radical directions. This point is often missed because many of his critics regard any quotation as good enough to liberate and belittle him, while many of his followers regard every word he wrote as sacrosanct. Both could learn something from the statement made by him in 1933 :[1]

> In my search after Truth I have discarded many ideas and learnt many new things... and, therefore, when anybody finds any inconsistency between any two writings of mine, if he has still faith in my sanity, he would do well to choose the later of the two on the same subject.

He wrote on the same lines in 1938 :[2]

> During my student days... I learnt a saying of Emerson's which I never forgot. 'Foolish consistency is the hobgoblin of little minds', said the sage. I cannot be a little mind, for foolish consistency has never been my hobgoblin..., my recent writings must be held as cancelling my comparatively remote sayings and doings. Though my body is deteriorating through age, no such law of deterioration, I hope, operates against wisdom which I trust is not only not deteriorating but even growing.

And, of course, mistakes regarding his views are also often made because many don't read him extensively to get at his views – a difficult task anyway in case of one who wrote and spoke so much as to fill hundred volumes of his Collected Works.

II

Gandhiji's uncompromising opposition to and fight against communalism is well-known. Moreover, he opposed communalism in all its variants : Hindu, Muslim or Sikh. As he wrote in January 1942 : "I hold it to be utterly wrong thus to divide man from man by reason of religion..."[3] He also refuted the basic communal assumption that the political economic interests of Hindus and Muslims were different because of their following different religions. He wrote in 1942 : "What conflict of interest can there be between Hindus and Muslims in the matter of revenue, sanitation, police, justice, or the use of public conveniences? The differences can only be in religious usage and observances with which a secular State has no concern."[4] He added : "We must get out of the miasma of religious majorities and minorities. Why is a Parsi's interest different from a Hindu's or Muslim's, so far as the state is concerned?"[5] Also, refuting the two-nation theory, he observed in 1940 : "A Bengali Muslim speaks the same tongue that a Bengali Hindu does, eats the same food, has the same amusements as his Hindu neighbour. They dress alike... The same phenomenon is observable more or less in the South among the poor who constitute the masses of India."[6] One reason why he was critical of colonial electoral bodies such as municipal committees and legislatures was because in them "Hindu and Muslim interests are falsely regarded as separate and even antagonistic."[7]

Gandhiji was totally committed to civil liberties. I may quote two of his statements in this regard. He wrote in January 1922 : "We must first make good the right of free speech and free association before we can make any further progress towards our goal... We must defend these elementary rights with our lives." He then went on to explain what these rights meant : "Liberty of speech

means that it is unassailed even when the speech hurts; liberty of the Press can be said to be truly respected only when the Press can comment in the severest terms upon and even misrepresent matters.... Freedom of association is truly respected when assemblies of people can discuss even revolutionary projects.... The fight for swaraj, the khilafat, the Punjab means fight for this threefold freedom before all else."[8] And, in June 1939, he wrote : "Civil liberty consistent with the observance of non-violence is the first step towards swaraj. It is the breath of political and social life. It is the foundation of freedom. There is no room there for dilution or compromise. It is the water of life. I have never heard of water being diluted."[9]

Yet, Gandhiji made one exception in this regard. He advocated restrictions on the freedom of speech and writing of those who spread communal hatred. Addressing the Akhil Bharatiya Sahitya Parishad he wrote in 1936 : "If I had the power I should taboo all literature calculated to promote communalism, fanaticism, and ill-will and hatred between individuals, classes or races."[10] And in 1947, referring to Hindu communal propaganda in a newspaper, he wondered if such a newspaper should exist in independent India. Was liberty of the Press, he asked, "to amount to poison the public mind?"[11]

Communalism was, Gandhiji asserted, not only anti-national but also anti-Hinduism in the case of Hindu communalism and anti-Islam in the case of Muslim communalism. For example, referring to Mohammad Ali Jinnah's communal propaganda on the basis of the two-nation theory, he wrote in April 1940 : "He (Jinnah) and those who think like him are rendering no service to Islam; they are misinterpreting the message inherent in the very word Islam."[12] In March 1947, he said : "Muslims will not serve Islam if they annihilate the Hindus; rather they would thereby destroy Islam. And if the Hindus believe that they would be able to annihilate Islam it means they would be annihilating Hindu dharma."[13]

As is well-known, during 1946 and 1947, Gandhiji stood like a rock in opposition to the prevailing communal mentality, popular communal pressure, and the barbarous communal killings, and waged an incessant campaign against communalism and for Hindu-Muslim-Sikh unity. His work in hate-torn Noakhali, Bihar, Calcutta and Delhi is now a legend.

III

There are many aspects of Gandhiji's approach towards and the understanding of communalism. I will take up only a few of them here. First I will deal with an aspect of his work and thought which is grossly misunderstood and misinterpreted, namely his understanding of secularism – the obverse of communalism.

That Gandhiji was basically and fully secular despite being deeply religious is well-known, as also that he wanted India to be a secular democratic state. For example, he said in 1947 that "the state was bound to be wholly secular" and that "the state of our conception must be a secular, democratic state."[14] And he asserted on 9 August 1942 : "Free India will be no Hindu Raj, it will be Indian Raj based not on the majority of any religious sect or community but on the representatives

of the whole people without distinction of religion."[15] And regarding his vision of free India he wrote in 1940 : "India is a big country, a big nation composed of different cultures, which are tending to blend with one another, each complementing the rest."[16] And he had already written in 1909 in the *Hind Swaraj* : "In no part of the world are one nationality and one religion synonymous terms; nor has it ever been so in India."[17]

Gandhiji had, moreover, a holistic, modern understanding of secularism. In India, as elsewhere, secularism has come to be defined in four terms. *First* : Religion should not intrude into politics; there should be separation of religion from politics, economy, education and large areas of social life and culture; and religion should be treated as a private or personal affair of the individual. To talk of any other, so-called Indian, definition of secularism, which would repudiate this, would be to deny secularism. At the same time, secularism does not, of course, mean removing religion from life itself or antagonism to religion. Nor does a secular state mean a state where religion is discouraged.

Second : In a multi-religious society, secularism also means that the state should be neutral towards all faiths or, as many religious persons would put it, the state should show equal regard for all faiths, including atheism.

Third : Secularism further means that the state must treat all citizens as equal and must not discriminate in favour of or against citizens on grounds of their religion.

Fourth : Secularism has another feature specific to India. In India secularism arose as the ideology of uniting all the Indian people *vis-à-vis* colonialism and as a part of the process of nation-making. Simultaneously, communalism developed as the most divisive social and political force. Consequently, secularism also came to mean a clear-cut opposition to communalism.

It is well-known that the social vision of the Indian national movement encompassed a secular society and a secular state. The movement also defined secularism in the same comprehensive manner as discussed in the previous paragraph. It was as a result of this vision and the resulting commitment to it that independent India succeeded in framing a secular constitution and laying the foundations of a secular state and society despite the Partition and the Partition riots.

It is, however, on Gandhiji's understanding of secularism that some people raise questions regarding the positive value as also the accepted definition of secularism. But, in fact, Gandhiji, along with many other deeply religious persons, such as Maulana Abul Kalam Azad, too defined and lived secularism in the same manner as the national movement.

Gandhiji's definition of, as also his commitment to, secularism can be easily brought out. But I may be forgiven the use of a great many quotations because without them it may be difficult to convince many since Gandhiji's views on this subject have been thoroughly obfuscated.

All would agree that Gandhiji, following the second aspect of the definition of secularism, held that the individual, the Congress and the state must show equal

respect for all religions. But he did not differentiate between this formulation or *Sarva-dharma-samabhava* and observing neutrality towards all religions, for the famous Karachi Resolution on Fundamental Rights, redrafted and moved at the Congress session of 1931 by Gandhiji, declared : "The state shall observe neutrality in regard to all religions."[18] Moreover, Gandhiji's regard for the followers of all religions included equal respect for atheists. This is brought out in his interviews with two of his atheistic followers and admirers, namely, D. Ramaswamy and G. Ramachandra Rao (popularly known as Prof. Gora) in the 1940s.[19] As. K. G. Mashruwala, one of Gandhiji's closest collaborators, pointed out in 1950, Gandhiji's change of the proposition 'God is Truth' to 'Truth is God' enabled him "to give an equal place to them (atheists) in his Congress of All Religions. Atheists, provided they accepted Truth as the Supreme End, had an equal place in his *Sarva-dharma-samabhava* with a 'theists."[20]

Interestingly, in 1946, Gandhiji agreed to perform the wedding of the daughter of the atheist Prof. Gora to a Harijan youth and to do so 'in the name of Truth' instead of 'in the name of God' – a promise that Gandhiji's Ashram mates at Wardha fulfilled after his death when the two young persons were married there with that invocation.

Earlier, in 1925, Gandhiji had evolved the Congress pledge in which blessings of God were invoked. But when this was objected to, he readily admitted : "So far as the conscientious objection is concerned the mention of God may be removed if required from the Congress pledge of which I am proud to think I was the author. Had such an objection been raised at the time, I would have yielded at once."[21]

It is also interesting to note that two persons Gandhiji loved and respected most – one Gopal Krishna Gokhale, his acknowledged political guru, and the other, Jawaharlal Nehru, his publicly anointed political heir – were agnostics.

So far as the third aspect of secularism is concerned, the 1931 Karachi Resolution also declared that in free India "every citizen shall enjoy freedom of conscience and the right freely to profess and practise his religion", that all citizens would be equal before the law, "irrespective of caste, creed or sex", that no disability would attach to any citizen on ground of religion, caste, creed or sex "in regard to public employment, office of power or honour, and in the exercise of any trade or calling."[22]

So far as the fourth aspect of secularism is concerned, I have already brought out his opposition to communalism.

IV

It is, however, on Gandhiji's oft-repeated formulation that politics could not be divorced from religion that the anti-secularists or those who attack the universal definition of secularism or differentiate between Gandhiji and Jawaharlal Nehru on this point most depend. They assert that the definition of secularism as separation of religion and politics was not acceptable to Gandhiji. Since nobody can deny that Gandhiji was fully secular or can reject secularism as such, it is

the meaning of secularism, as held by Gandhiji, which is sought to be contested. But, in fact, as pointed out earlier, as gross misunderstanding and misinterpretation of his earlier views and ignorance of his later pronouncements is involved here.

Gandhiji did, throughout his life, emphasize the close connection between religion and politics. In his case, his patriotism, his work in the public and political field, his deep social commitment and strong sense of the moral were based on and inspired by deeply held religious beliefs. He derived his values from religion. As he put it at the end of his autobiography, *The Story of My Experiments with Truth* : "My devotion to Truth has drawn me into the field of politics... those, who say that religion has nothing to do with politics, do not know what religion means."[23] Earlier, in January 1921, he had declared : "I certainly do introduce religion into politics. It is my humble view that not a single activity in the world should be independent of religion."[24] There could be, he repeatedly said, no politics without religion. In April 1924, he asserted : "for me there are no politics devoid of religion. They subserve religion. Politics bereft of religion are a death-trap because they kill the soul."[25] As late as July 1946 he wrote : "religion is the basis on which all life structure has to be erected, if life is to be real."[26] During 1920-21, he repeatedly referred to the Non-Cooperation Movement as "a religious, purifying movement"[27] and as "a religious effort".[28]

But, for Gandhiji, this close connection between religion and politics was because, to him, politics had to be moral, had to be based on morality. And religion to him was the source of morality – it was, in fact, itself morality in the Indian sense of *dharma.*

To get a clear picture of Gandhiji's position in this respect, we have to start with, we have to understand what Gandhiji meant by religion. He often used the word religion in two different senses : one in its denominational or sectarian sense, that is, in terms of Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, etc., and the other in the traditional Indian sense of *dharma,* that is, the moral code which guides a person's life and the social order. In asserting that politics should be based on religion, he clearly meant that it should have a moral foundation in *dharma* or a code of conduct, or usually for Gandhiji, in Truth and non-violence, and not in religion in the denominational or sectarian form or in terms of sectional or sectarian beliefs. He made this clear almost every time that he asserted that there could be no politics without religion. For example, he told a questioner on 4 February 1940 : "Yes, I still hold the view that I cannot conceive politics as divorced from religion. Indeed, religion should pervade every one of our actions. Here religion does not mean sectarianism. It means a belief in ordered moral government of the universe... This religion transcends Hinduism, Islam, Christianity, etc."[29] Even earlier, in South Africa, he had said : "By religion, I do not mean formal religion, or customary religion, but that religion which underlines all religions, which brings us face to face with our Maker."[30] Similarly, he wrote in May 1920 : "I have been experimenting with myself and my friends by introducing religion into politics. Let me explain what I mean by religion. It is not

the Hindu religion, which I certainly prize above all other religions, but the religion which transcends Hinduism, which changes one's very nature."[31]

More positively put, religion in the context of political and social life meant ethics, or the moral-ethical component of life. As he put it in August 1920, the entire objective was for people to realize "the practicality of the spiritual life in the political world."[32] And, then, in 1931 : "I cannot isolate politics from the deepest things of my life, for the simple reason that my politics are not corrupt, they are inextricably bound up with non-violence and truth."[33] In defining God, he wrote in March 1925 : "To me God is truth and love; God is ethics and morality; God is fearlessness. God is the source of Light and Life and yet He is above and beyond all these. God is conscience. He is even the atheism of the atheist."[34] Also, to Gandhiji, religious distinctions in terms of denominations or 'labelled' religions, did not matter, for he also believed that "the fundamental ethics were common to all religions".[35] And it is this ethics, this morality or religion in its moral form, which had to be an intrinsic part of politics. Seeing religion and morality as interchangeable terms, he wrote in November 1924 : "For me there is no politics without religion – not the religion of the superstitious and the blind, religion that hates and fights, but the universal Religion of Toleration. Politics without morality is to be avoided."[36]

This is also the sense in which he observed in January 1946 : "There are many religions, but Religion is only one. You should follow that one Religion."[37] Or in 1934 : "Religion is one tree with many branches. As branches you may say religions are many; as tree Religion is one."[38] Or in 1937 : "For me the different religions are beautiful flowers from the same garden, or they are branches of the same, majestic tree."[39] It was in part to emphasize the commonness of all religions that he changed his earlier formulation 'God is Truth' to 'Truth is God'.[40]

No secular person, religious or non-religious, would argue against the view that politics should be moral and that this sense of the moral can be imbibed in various ways and from diverse sources, religious as well as non-religious.

V

What is equally important, Gandhiji began to change during the 1940s his linguistic formulation regarding the relationship between religion and politics when He realized that in order to propagate communal politics and to promote a communal divide, to demand religion-based states, to propagate the two-nation theory, and to raise the cry of Islam or Hinduism or Sikhism in danger, in place of the earlier slogan of the interests of the Hindus, or Muslims or Sikhs being in danger, the communalists were using the belonging to a system of religious beliefs, to religion in its organized, denominational form, or to what K. G. Mashruwala described as 'labelled religion', or to religion, not as *dharma* or a code of morality, but in the form of Hinduism, Islam, Sikhism, etc. Gandhiji *now* began to assert that religion – meaning denominational religion – and politics should be kept separate and that religion should be treated as a private or personal concern of the individual. This he did umpteen number of times in the 1940s.

Let me give a few of the many quotations from his speeches and writings :

(i) In June 1940 : "If religion is allowed to be, as it is, a personal concern and a matter between God and man, there are many dominating factors between the two (Hindus and Muslims) which will compel common life and common action."[41]

(ii) In August 1942 : "Religion is a personal matter which should have no place in politics."[42]

(iii) In September 1946, Gandhiji told a missionary : "If I were a dictator, religion and state would be separate. I swear by my religion. I will die for it. But it is my personal affair. The State has nothing to do with it."[43]

(iv) In October 1946 : "In the Central and Provincial Governments, there is or should be no Hindu, Muslim or any other communal distinctions. All are Indians. Religion is a personal matter."[44]

(v) In February 1947 : "Religion was a purely personal matter."[45]

(vi) In August 1947 : "Religion was a personal matter and if we succeeded in confining it to the personal plane, all would be well in our political life."[46]

(vii) In November 1947 : "Religion is a personal affair of each individual, it must not be mixed up with politics or national affairs."[47]

(viii) D. G. Tendulkar reports that in a prayer meeting on 11 January 1948, Gandhiji said that "he wanted all the nationalists not to mix religion with politics. They were Indians first and last in all secular matters. Religion was a personal affair of the individual concerned."[48]

(ix) In June 1947 : "Religion is no test of nationality but a personal matter between man and God".[49] As pointed out above, already in the *Hind Swaraj* he had writen : "In no part of the world are one nationality and one religion synonymous terms, nor has it ever been so in India."

In fact, as early as November 1936, while discussing conversion and equality of all religions with C. F. Andrews, Gandhiji had declared : "Religion is a very personal matter".[50]

Also, in August 1947, asserting that "the State was bound to be wholly secular", Gandhiji said that "no denominational educational institution in it should enjoy State patronage."[51] He also opposed religious instruction as part of school curriculum as approved by the state. He would oppose this "even though the whole community had one religion."[52] He told Dr. Zakir Husain in April 1947 : "I do not agree that the Government should provide religious education.... If you try to do so, the result can only be bad. Those who want to give religious education may do so on their own, so long as it is not subversive of law and order, or morals. The Government can only teach ethics based on the main principles common to all religions and agreed to by all parties. In fact ours is a secular state."[53] Similarly, earlier, in February 1947, he had written : "I do not believe that the State can

concern itself or cope with religious education. I believe that religious education must be the sole concern of religious institutions."[54] In this context, Gandhiji also made the distinction between his two usages of the term religion clear. While saying that "fundamental ethics is common to all religions," he urged : "Do not mix up religion and ethics." And then he clarified : "By religion I have not in mind fundamental ethics but what goes by the name of denominationalism."[55]

Gandhiji was also opposed to any state aid to religious bodies.[56]

There was another important reason why, to Gandhiji, religion had to be "a purely personal matter". There were, he said in February 1947 : "in reality as many religions as minds. Each mind had a different conception of God from the other."[57] He repeated in August 1947 : India "was perhaps one nation in the ancient world, which had recognized cultural democracy, whereby it was held that the roads to God were many, but the goal was one, because God was one and same. In fact the roads were as many as there were individuals in the world."[58] Or, again in January 1946, "You should absorb the best that is in each denominational religion such as Christianity, Hinduism, Islam, Zoroastrianism and so on without fettering your choice and form your own religion."[59] Even earlier, he had written in *Hind Swaraj* : "In reality there are as many religions as there are individuals."[60] In other words, every individual chooses his religion according to his thought, his mind, his intellect; in other words, religion had to be a personal matter; it could not be imposed by the state or society.

VI

I may draw attention to certain other aspects of Gandhiji's thinking on the problems of communalism and secularism. While regarding all communalism as bad, he held that the religious majority's communalism was especially so because of "the intoxication that power gave them."[61] Moreover, while he consistently critiqued minority communalism too, he adopted a supportive and protective attitude towards minorities, because of their minority status. For example, he said in August 1947 : "If a minority in India, minority on the score of its religious profession, was made to feel small on that account, he could only say that this India was not the India of his dramas."[62] He made every effort to understand and assuage the anxieties of the minorities. In particular, he was sensitive to the woes, feelings, and the overall psychology of the Muslim minority, especially after the Partition. He felt the pain and anxieties that the Muslims in India, deserted by the Muslim League, were undergoing after 1947.

VII

I may add that the way Gandhiji argued for separation of religion from politics was equivalent to the 19th century effort in Europe to secularize religion. This effort at the secularization of religion was strengthened by his strong advocacy of the application of reason to religion. He argued that reason and morality should supercede tradition and scriptures, that reason and not dogma should be the final arbiter not only in regard to secular issues but also in respect of

religion, and that no element of religion or religious authority or tradition bereft of rationality should be accepted by an individual. As usual, he can be quoted *ad infinitum* on this question. For example, he said in July 1920 : "I reject any religious doctrine that does not appeal to reason and is in conflict with morality."[63] In January 1921: "The devil has always quoted scriptures. But scriptures cannot transcend reason and truth."[64] In February 1925 : "Every formula of every religion has, in this age of reason, to submit to the acid test of reason and universal justice if it is to ask for universal assent. Error can claim no exemption even if it can be supported by the scriptures of the world."[65] In October 1927 : "Let us not deceive ourselves into the belief that everything that is written in Sanskrit and printed in Shastra has a binding effect upon us. That which is opposed to the fundamental maxims of morality, that which is opposed to trained reason, cannot be claimed as Shastra no matter how ancient it may be."[66] In December 1936 : "I exercise my judgement about every scripture, including the *Gita*. I cannot let a scriptural text supercede my reason."[67] And in May 1947 : "No man should yield except to reason."[68] It may also be pointed out that Gandhiji applied the test of reason to the scriptures of all religions. In 1925, he was sent the news of the stoning to death in Afghanistan of two members of the Ahmediya sect for being apostates. His comment was that "this particular form of penalty cannot be defended on the mere ground of its mention in the Koran." When some Muslim leaders criticized him for his comment, he replied that "even the teachings of the Koran cannot be exempt from criticism". And he concluded the debate with the wider assertion : "I no more defend on the mere ground of authority a single text in the Hindu scriptures that I can defend one from Koran. Everything has to submit to the test of reason."[69]

VIII

Even when couched in the language of religion in the 1920s, Gandhiji's social, economic and political appeal was to modern, secular, economic, political, moral and social principles and was never based on religious grounds. Not once did he say that the fight for freedom was a religious duty. He did not use religion in the ideological definition of nationalism or its programme. Nor did he criticize the rulers for their religion or use the Christianity of the rulers to attack them. Except for the Khilafat question, he never took up a religious issue for agitation or as a political demand.

Some persons have argued that by often using terms from Hindu scriptures and mythology in his speeches, articles and other writings, etc., Gandhiji was catering to Hindu religious or even communal sentiments. Most often, this criticism is directed against his use of the term *Ram Rajya* to define Swaraj in India. In fact, he was using the term because in Indian mythology Ram stands for forces of good and Ravan, his vanquished adversary, for forces of evil. Ram Rajya stood for a reign of goodness and justice. Gandhiji, deeply rooted in Hindu religion and philosophy, was using the term to reach out to the common people of India, especially the peasants, both Hindu and Muslim. There was no religious

or Hindu content in his use of the term. Thus when at the end of the 1920s, Muslim communalists tried to arouse fear and suspicion of the national movement in the minds of the Muslims by propagating the view that by talking of *Ram Rajya* Gandhiji was planning to introduce Hindu Raj and create a Hindu-dominated state, Gandhiji replied : "I warn my Musalman friends against misunderstanding me in my use of the word '*Ramarajya*'. By '*Ramarajya*' I do not mean Hindu Raj. I mean by '*Ramrajya*' Divine Raj, the Kingdom of God. For me Rama and Rahim are one and the same deity. I acknowledge no other God but the one God of Truth and righteousness."[70] And he clarified further several times; for example, in August 1946 : "As to the use of the phrase '*Rama-Rajya*', why should it offend after my having defined its meaning many times? It is convenient and expressive phrase, the meaning of which no alternative can so fully express to millions. When I visit the Frontier Province or address predominantly Muslim audiences I would express my meaning to them by calling it Khudai Raj, while to a Christian audience I would describe it as the Kingdom of God on earth." And he added : "Any other mode would, for me, be self-suppression and hypocrisy."[71] Even earlier in January 1925, he had said in his Presidential Address at Kathiawar Political Conference : "Such *Ramarajya* is possible even today. The race of Rama is not extinct. In modern times the first Caliphs may be said to have established *Ramarajya*. Abubaker and Hazrat Umar collected revenue running into crores and yet personally they were as good as fakirs."[72]

Moreover, Gandhiji used *Ramarajya* to propagate new ideas and inculcate new values and not to convey traditional ideas and values. Thus, he said in 1929 that *Ramarajya* stand for "true democracy in which the meanest citizen could be sure of swift justice;"[73] in 1934 : "The *Ramarajya* of my dream ensures the equal rights alike of prince and pauper;"[74] in January 1937 : *Ramarajya* stands for "sovereignty of the people based on pure moral authority."[75] In May 1947, he said: "There can be no *Ramarajya* in the present state of iniquitous inequalities in which a few roll in riches and the masses do not get even enough to eat."[76] He clarified the position in greater detail in 1945 in answering the specific question: What is *Ramarajya*? "It can be religiously translated as Kingdom of God on Earth; politically translated it is perfect democracy in which inequalities based on possession and non-possession, colour, race, or creed or sex vanish; in it, land and State belong to the people, justice is prompt, perfect and cheap and, therefore, there is freedom of worship, speech and the Press – all this because of the reign of the self-imposed law of moral restraint. Such a State must be based on truth and Non-violence, and must consist of prosperous, happy and self-contained villages and village communities."[77]

It is significant that despite his vast popularity and eventual martyrdom Gandhiji has not been worshipped as a religious prophet or *avatar or* even *guru* whose benediction could help in personal salvation or worldly success and no temples have been erected around him. The non-political part of his appeal to the people was not to their religious but to their moral sense. He was revered as a *mahatma* and not as an *avatar* or a *swami*.

IX

It was because of Gandhiji's total opposition to communalism and strong commitment to secularism that both Hindu and Muslim communalists hated him and conducted a virulent and venomous campaign against him, leading in the end to his assassination by a communal fanatic.

The extreme Hindu communalists denounced him for being pro-Muslim and as a virtual traitor to what they called the 'Hindu nation' and the Muslim communalists denounced him as the enemy of Muslims and Islam, who was out to subjugate Muslims and suppress their culture and to revive Hinduism and establish Hindu Raj.

Thus, in 1939, M. S. Golwalkar, the head of the RSS, wrote : "Strange, very strange that traitors should be enthroned as national leaders and patriots heaped with ignominy."[78] Obviously referring to Gandhiji, Golwakar said in 1947 : "Those who declared 'No *Swaraj* without Hindu-Muslim unity' have thus perpetrated the greatest treason in our society. They have committed the most heinous sin of killing the life-spirit of a great and ancient people."[79] He also accused Gandhiji of declaring that "the simplest way in which this (Hindu or Muslim) unity can be achieved is for all Hindus to become Muslims."[80] Similarly, in 1947, Golwalkar accused Gandhiji and other Congress leaders of asking the Hindu "to ignore, even submit meekly to the vandalism and atrocities of the Muslims. In effect, he (the Hindu) was told : 'Forget all that the Muslims have done in the past and all that they are now doing to you. If your worshipping in the temple, your taking out Gods in procession in the streets irritates the Muslims, then don't do it. If they carry away your wives and daughters, let them. Do not obstruct them. That would be violence."[81] Criticism of Gandhiji on similar grounds was repeated by other Hindu communal leaders.[82]

Nor did the Muslim communalists lag behind. In his presidential address to the Muslim League in 1938, Mohammed Ali Jinnah described Gandhiji as "the one man responsible for turning the Congress into an instrument for the revival of Hinduism. His ideal is to revive Hindu religion and establish Hindu raj in this country."[83] In March 1940, he told the Aligarh students : "Mr. Gandhi's hope is to subjugate and vassalize the Muslims under a Hindu Raj."[84] At a more extreme level, Z. A. Suleri, Jinnah's secretary and biographer, wrote in the heavily publicized *My Leader* that Gandhiji was "an enemy of Islam" while Jinnah was "the greatest living architect of Islam."[85]

It was the incendiary propaganda of hate and the resulting provocative communal atmosphere that was responsible for the assassination of Gandhiji, who pulled the trigger and to which specific party or group or religious community the assassin belonged is of little importance.

X

If Gandhiji's greatest success lay in leading a non-violent mass movement to overthrow colonial rule and establish a secular democratic republic, his greatest failure, his great sorrow and source of personal frustration, was on the communal

frontal, in his inability in checking the growth of communalism and preventing the partition of the country on its basis, even though secularism ultimately won out in post-1947 India.

But, unlike many other nationalist leaders, he did not underrate or belittle or underplay communalism. He fully recognized the strategic importance of eliminating communalism. He did not, however, know how to go about the task, how to 'solve' the communal problem. His failure, as also that of the other nationalists, lay in their inability to evolve a clear *understanding* of communalism and an effective strategy to oppose or fight it. At one point, in March 1938, he said: "I have only one way of attaining independence as well as Hindu-Muslim unity, and that is *satyagraha*."[86] But while he knew how to use the weapon of *satyagraha* against the colonial rule, he did not know how to do so against communalism. He did use one element of *satyagraha*, i.e., fasting, in situations of acute and violent communal conflict; and his fasts did invariably ease the prevailing tension, control the conflict, and restore peace. But the relief was temporary, The fasts did not resolve the communal problem or prevent the recurrence of communal violence.[87]

Believing throughout his life, but especially during the 1920s, that the communal divide was the product of perceived religious differences, religious bigotry, and mutual distrust, he consistently attacked religious narrow-mindedness and intolerance and made every attempt to promote mutual trust and tolerance among Hindus, Muslims and Sikhs. In the 1920s, realizing the importance of the issues of cow-killing and music before mosques and later *Shudhi* and *Tabligh* as causes of communal tension, he put a great deal of emphasis on the necessity of their resolution through mutual trust and give and take. For example, he wrote in June 1924 : "Hindus must not imagine they can force the Mussalmans to give up cow-sacrifice. They must trust, by befriending Mussalmans, that the latter will, of their own accord, give up cow-sacrifice out of regard for their Hindu neighbours. Nor must Mussalmans imagine they can force Hindus to stop music or *arati* before mosques. They must befriend the Hindus and trust them to pay heed to reasonable Mussalman sentiment."[88] And up to the end, he held that "it is obviously wrong legally to enforce one's religious practice on those who do not share that religion."[89]

Gandhiji emphasized the goodness of all religions and the capacity of their followers to resolve diverse religious issues, which led to conflict, by awakening the true spirit and unifying power of all religions and by developing mutual toleration and trust and respect and a 'union of hearts'.[90] As brought out earlier, he emphasized that all religions had common features and also that all religions were equally true. In particular, he opposed an intolerant and sectarian approach towards religion. For example, he said on 21 November 1947 : "I feel proud to belong to (that) Hinduism which embraces all religions and is very tolerant."[91] And in April 1938 : "My Hinduism is not sectarian. It includes all that I know to be best in Islam, Christianity, Buddhism and Zoroastrianism."[92] He considered this to be true of all religions.

Gandhiji often argued that the communalists and their intolerant actions were opposed to, and against the spirit of, their own religions. For example, he said at an RSS rally on 16 September 1947 : "If the Hindus felt that in India there was no place for anyone else except the Hindus and if non-Hindus, especially Muslims, wished to live here, they had to live as the slaves of the Hindus, they would kill Hinduism. Similarly if Pakistan believed that in Pakistan only the Muslims had a rightful place and the non-Muslims had to live there on sufferance and as their slaves, it would be the death-knell of Islam."[93] Similarly, referring in November 1947 to the destruction and desecration of mosques in India and temples in Pakistan, he said that "any such act can only destroy religion, whether it is Hinduism, Sikhism or Islam."[94] And, referring in his prayer meeting of 30 November 1947 to the installing of idols in mosques in India and to Sardar Patel's announcement that either the people should remove the idols or the police would do so and that the government would restore the mosques and repair the damage, Gandhiji said : "Forcible possession of a Mosque disgraced Hinduism and Sikhism. It was the duty of the Hindus to remove the idols from the Mosques and repair the damage."[95] Earlier, in September 1946, he had described the Muslim League's communal attitude as "un-Islamic".[96]

Gandhiji also had some understanding of the middle-class roots of communalism. He showed an awareness of the fact that communal tension was also to a certain extent the product of the rivalry between Hindu and Muslim middle classes for government jobs and seats in elected bodies such as municipal corporations and legislatures.[97] This was one reason why, in the 1920s, he opposed participation in such bodies.[98]

XI

To solve the communal problem and bring about Hindu-Muslim unity, Gandhiji, along with other Congress leaders, followed during the 1920s what may be described as the strategy of bringing about unity at the top. They promoted negotiations among the Hindu and Muslim communal leaders through unity conferences, with Gandhiji and the Congress acting as mediators or intermediaries between them, instead of acting as the advance-guard and active organizers of the forces of secular nationalism. Later, too, in the 1930s and 1940s, their effort was to arrive at a compromise on the Muslim communal demands through top-level negotiations with and winning over Muslim communal leaders, who were virtually accepted as the leaders of the Muslims. Once these leaders were won over, it was hoped that they would bring the Muslim masses and middle classes into the national movement and thus produce Hindu-Muslim unity. As Gandhiji wrote in May 1924, in a widely publicized article on "Hindu-Muslim Tension : Its Causes and Cure" : "I am convinced that the masses do not want to fight, if the leaders do not. If, therefore, the leaders agree that mutual rows should be, as in all advanced countries, erased out of our public life as being barbarous and irreligious I have no doubt that the masses will quickly follow them."[99]

Gandhiji's joining the leaders of the Khilafat Movement was the most successful effort at Hindu-Muslim unity in the course of the national struggle. It was, moreover, not devoid of the mass element. It was inspired by the motive of bringing the Muslim masses and lower middle classes into the mass non-cooperation movement and to cement Hindu-Muslim unity.[100] And, Gandhiji did succeed to a certain extent. As he was to write later in May 1924 : "Had I been a prophet and foreseen all that has happened, I should have still thrown myself into the Khilafat agitation. In spite of the present strained relations between the two communities, both have gained. The awakening among the masses was a necessary part of the training. It is itself a tremendous gain. I would do nothing to put the people to sleep again. Our wisdom consists now in directing the awakening in the proper channel."[101]

However, despite Gandhiji's good intentions, the Khilafat Movement failed in the long run in its main expectation of Gandhiji bridging the existing divide among the Hindu and Muslim middle classes and cementing Hindu-Muslim unity. It was not Gandhiji's fault that Kemal Pasha made the Khilafat a non-issue, that Mappila violence took place in Malabar at that particular juncture and that the violent atmosphere in the country and among the non-cooperation movement's cadre in general went against his strategic framework and forced him to call off the movement. But the Khilafat Movement had a broader negative consequence which he might not have foreseen.

Since the Muslim masses and lower middle classes were brought into the anti-imperialist struggle through an agreement with the top leaders and on a religious question most of them joined the movement as a result of religiosity and not for the advancement of their democratic and national rights; their existing consciousness continued to be intact. What is even more important, the very terms of the agreement prevented Gandhiji and other nationalist leaders from using this opportunity to impart to the Muslim masses a modern, secular, democratic outlook and anti-imperialist consciousness. Instead, following this agreement, the intrusion of religious outlook into politics was legitimized and perpetuated.[102] When the Khilafat movement was withdrawn, hardly any nationalist residue was left. At the most, a handful of sturdy secular Muslim nationalist leaders, such as Hakim Ajmal Khan, M. A. Ansari, Maulana Abul Kalam Azad and T. A. K. Sherwani, emerged.

This strategy of unity at the top did, however, prove useful during periods of communal riots when it was often successful in reducing communal tension.

Gandhian strategy of dealing with communalism underwent a shift during 1930-1934 and again in 1942. From 1930, Gandhiji began to argue that the communal problem could not be solved through negotiations at the top and what was needed, instead, was a direct approach to the masses and active political work among them. He had glimmering of this approach even earlier. Referring to Motilal Nehru's effort at forming a Hindu-Muslim *Sangathan* in order to bring about unity from below, starting with students and people in *muhallas*, he had written in December 1924 : "And if he succeeds in forming genuine Hindu-Muslim *sangathan*, he will have done service of a first class order to the country.

His decision to work from the bottom, instead of through middlemen, must result in nothing but better relations between Hindu and Mussalman masses."[103] And in January 1925 : "Fortunately Hindu-Muslim unity does not finally depend upon religious or political leaders. It depends upon the enlightened selfishness of the masses belonging to both the comunities."[104]

In 1930, Dr. Ansari asked Gandhiji to postpone the coming civil disobedience movement till Hindu-Muslim unity was achieved.[105] Gandhiji refused to halt the movement and argued that the mass anti-imperialist movement itself would result in Hindu-Muslim unity.[106] He told Yusuf Meherally that it was not necessary to go over the heads of leaders and approach the masses directly to bring about unity. "The masses are sound at heart", he said, "they only require a correct and courageous lead."[107] Participation in a common struggle for common demands would convince the people of the need and value of unity. The civil disobedience campaign would "take the attention of the nation off the communal problem and to rivet it on the things that are common to all Indians, no matter to what religion or sect they may belong."[108] He also asked the people to join the coming movement not as Hindus, Muslims, Sikhs, Parsis, Christians and Jews but as "Indians first and Indians last."[109]

Gandhiji reverted to the negotiations-at-the-top strategy when he agreed to attend the Round Table Conference. But all his efforts to arrive at an agreement with the communal leaders failed. He went back to his belief that communal problem could be solved "only by the Congress and it is doing all that it can to solve it." "The remedy", he added, "is to serve all classes and communities."[110] Similarly, realizing during 1941-42 that no agreement with the Muslim League was possible, he again fell back on the proposition that it was necessary to bring together the masses in common efforts through constructive work and common struggle. He wrote in January 1942 that "communal pacts, whilst they are good if they can be had, are valueless unless they are backed by the union of hearts. Without it there can be no peace in the land. Even Pakistan can bring no peace, if there is no union of hearts. This union can come only by mutual service and cooperative work."[111] Consequently, he launched two mass campaigns, one near the end of 1940 and the other in August 1942, without waiting for a pact with the Muslim League in the hope that participation in mass movements would also bring about Hindu-Muslim unity in addition to political independence.

However, the effort to solve the command problem through the medium of anti-imperialist struggle was also not successful. Though there were very few communal riots during 1930-1933 and 1942-1943 and in several parts of the country Muslims participated in the Civil Disobedience Movement during 1930-1933 and gave shelter to the 1942 revolutionaries in hiding as a whole the communal forces remained and even grew during 1942-1944.

As Sucheta Mahajan has pointed out, by 1947 it was clear that a popular mass movement was no *Ganga Jal* (water from the Ganges) which could by itself cleanse the communal dirt.[112] On the other hand, Gandhiji did realize that no mass movement could be organized in the face of the prevailing violence. This was the

major reason why he rejected the suggestion that he should initiate a mass anti-imperialist struggle in 1947 to avoid the partition.[113] *Communalism had gone to o far in the minds of the people in northern India for this remedy to work.*[114]

Consequently, not knowing what to do to reach the Muslim masses and unable to implement 'mass-contact' and common-struggle strategy, he went back again and again to the strategy of negotiations at the top and its different variants. Immediately after the Civil Disobedience Movement in 1930, he carried on top-level negotiations at the Round Table Conference and intense negotiations with Jinnah during 1944-45.

Quite often, Gandhiji was baffled, did not know what to do and felt helpless. The repeated failures of negotiations at the top tended to create further communal distrust and bitterness and a feeling of helplessness, if not despair, regarding the solution of the communal problem. Nor did the mass movements and constructive work go far in that direction, even though they lessened communal tension for the time being. Nor could the mass movements be carried on all the time.[115] The only way, it sometimes seemed to Gandhiji, was to rely on God to find a way. As he put it in July 1939, explaining why he was not concentrating fully on Hindu-Muslim unity : "May I assure you that if I do not *seem* to be doing that today, it is not because my passion for Hindu-Muslim unity has grown less. But I have realized, as I had never done before, my own imperfection as an instrument for this high mission and the inadequacy of mere external means for the attainment of big objects. I have learnt more and more to resign myself utterly to His grace."[116] In September 1939 : "I have not lost hope that I shall live to see real unity between the two (Hindus and Muslims).... If I knew the way to achieve it today, I know that I have the will and the strength to take it, however difficult or thorny it may be.... I have no shadow of a doubt that our hearts will meet some day. What seems impossible today for us God will make possible. For that day I work, live and pray."[117] And again in 1942 : "I sincerely want unity among Hindus and Muslims, but I do not know how it is to be brought about."[118]

Of only one thing Gandhiji was sure : that the communal problem would be solved only through non-violence and satyagraha. But he did not know as to how that would happen. As he told a correspondent in August 1946, he had not been able "to test my non-violence in the face of communal riots."[119] As J. B. Kripalani put it in June 1947 in his concluding speech at the All India Congress Committee, "I have been with Gandhiji for the last thirty years. I joined him in Champaran. I have never swayed in my loyalty to him.... Why then am I not with him now? It is because I feel that he has as yet found no way of tackling the problem on a mass basis. When he taught us non-violent non-co-operation, he showed us a definite method which we had at least mechanically followed. Today he himself is groping in the dark.... He says he is solving the problem of Hindu-Muslim unity for the whole of India in Bihar. May be it is difficult to see how that is being done. There are no definite steps, as in non-violent non-co-operation, that leads to the desired goal."[120]

I, however, feel that what was involved here basically was Gandhiji's failure to understand the problem itself. To fight communalism successfully it was necessary to have a deep comprehension of communalism in all its complexity and opacity – its ideological elements, its sources and social roots, its social base, reasons for its growth and stubbornness in the face of the nationalist attack. On the whole Gandhiji and other nationalist leaders as well as the nationalist intellectuals failed to meet adequately the intellectual challenge in this respect. Even Gandhiji's usually inspired political understanding proved to be shallow where communalism was concerned – though it was constantly growing and deepening. Throughout his political career he was baffled by communalism so much so that in the end he could counterpoise to it only his personal, moral and physical courage at Calcutta, Noakhali, Bihar or Delhi.

At the level of comprehension, there was the inability or failure to see communalism as an ideology.[121] After all, communalism was above all an ideology, a belief system through which society, economy and polity are viewed, a way of looking at society and politics. The answer to it lay, therefore, in an all-out ideological struggle against it. Not seeing it as an ideology, Gandhiji too, along with other nationalists, failed to carry out a long-term and consistent ideological struggle against communalism – to fight it at the level of ideas.[122] At the most his comments on the communality of all religions, religious toleration. etc. may be seen as elements of such struggle in an indirect fashion.

No amount of common political and economic struggle, or humanist appeals would change a person's ideological leanings or beliefs. Communalism could also not be overcome in the long run through appeasement or concessions and accommodation. These might produce a momentary effect. But, in the long run, they only whetted the appetite of the communalists – their demands arose higher and still higher. Negotiations with communal leaders enabled them to emerge in the public eye as the champions of the 'interests' of their respective 'communities', and legitimized the two notions that such 'interests' and 'communities' existed. The communal leaders were thus made respectable.

Nor could social conditions, fuelling communalism, have been changed without the overthrow of colonialism. State power could also not be used to curb communalism and communal violence. for the state was the colonial state, interested in fuelling communalism. Gandhiji also did not find a way of using the weapon of *satyagraha* against the communalists. The only effective weapon that the nationalists could have wielded against communalism was ideological struggle.

Gandhiji did realise that an ideological struggle was critical *vis a vis* colonialism and caste oppression, and he carried on a vigorous ideological struggle against the two, leading to political success in the first case and partial success in the second. At least, by 1947, few could openly defend colonialism or untouchability and caste oppression.

I may note in the end that, despite his failure in meeting the communal challenge, Gandhiji was the one to wage, however inadequately, a personal, life-long campaign for Hindu-Muslim unity. His secularism and his moral fervour

against communalism to his last dying day were no small part of the thought and commitment of perhaps the greatest man India has produced in its long history.

References

This paper was delivered at Jawaharlal Nehru University on 27 August 2003. Its earlier versions were read at Martyr's Memorial and Freedom Struggle Research Centre, Lucknow, Sri Venkateswara College, New Delhi. Centre for Research in Rural and Industrial Development, Chandigarh, and at a meeting organized by Delhi Historians Group. JNU, New Delhi.

1. *Harijan*, 29.41933, in *CW*, vol.55, p.61.
2. *Harijan*, 27.8.1938, in *CW*, vol.67, p.284.
3. *Harijan*, 25.1.1942, in *CW*, vol.75 p.237. Earlier, in 1930, he had written : "In the Congress we must cease to be exclusive Hindus or Mussalmans or Sikhs, Parsis, Christians, Jews. Whilst we may staunchly adhere to our respective faiths, we must be in the Congress Indians first and Indians last." *Young India*, 9.1.1930, in *CW*, vol.42, p.379.
4. *Harijan*, 25.1.1942, in *CW*, vol.75, p.237
5. *Ibid.*, p.238.
6. *Harijan*, 6.4.40, in *CW*, vol.41, p.388.
7. *Harijan*, 25.1.1942, in *CW*, vol.75, p.238.
8. *Young India*, 5.1.1922 and 12.1.1922, in *CW*, vol.22, pp.142 and 176-7.
9. *Harijan*, 24.6.1939, in *CW*, vol.69m, p.356.
10. *Harijan*, 2.5.1936, in *CW*, vol 62, p.347.
11. D. G. Tendulkar, *Mahatma – Life of Mohandas Karamchand Gandhi*, New Delhi, 1969 reprint, vol.8, p.132.
12. *Harijan*, 6.4.1940, in *CW*, vol.71, p.390. Similarly, in 1946, he described the Muslim League's attitude of hostility towards the Hindus as 'un-Islamic". D. G. Tendulkar, note 11, vol.7, p.200.
13. *Harijan*, 23.3.1947, in *CW*, 87, p.45.
14. *Harijan*, 31.8.1947, in *CW*, vol.89, p.56; and M. K. Gandhi, *The Way to Communal Harmony*, edited by U. R. Rao, Ahmedabad, 1963, p.396.
15. *Harijan*, 9.8.1942, in *CW*, vol.76, p.402.
16. *Harijan*, 4.5.1940, in *CW*, vol.72, p.27.
17. *Hind Swaraj*, Ahmedabad, 1984 reprint, p.49.
18. In B. Pattabhi Sitaramayya, *The History of Indian National Congress (1885-1935)*, Madras, 1935, p.780.
19. Even earlier, in 1891, after attending Bradlaugh's funeral, he had remarked: "For atheists like Bradlaugh, truth held the same place as God for other." Quoted in D. G. Tendulkar, note 11, vol.1, p.32.
20. Introduction by K. G. Mashruwala to Gora (G. Ramachandra Rao), *An Atheist with Gandhi, Ahmedabad*, 1951, p.14.
21. *Young India*, 5.3.1925, in *CW*, vol.26, p.223.

22. In B. Pattabhi Sitaramayya, note 18, pp.779-80. Also, in 1947 : "The State in bound to be wholly secular.... All subjects would be free equal in the eye of the law. But every single individual would be free to pursue his own religion without let or hinderance so long as it did not transgress the common law." *Harijan*, 31.8.1947, in *CW*, vol.89, p.56. For even an earlier view on the same lines, see his *Hind Swaraj*, Ahmedabad, 1984, reprint, p.49.
23. M. K. Gandhi, *The Story of My Experiments with Truth*, Ahmedabad, 1929, p.591.
24. *Navajivan*, 30.1.1921, in *CW*, vol.19, p.300 Also see *Harijan*, 2.3.1934, in *CW*, vol.57. p.199.
25. *Young India*, 3.4.1924, in *CW*, vol.23, p.349, p.349. And again in 1925 : "Politics separated from religion stinks, religion detached from politics is meaningless." *Navajivan*, 21.6.1925, in *CW*, vol.27, p.204.
26. *Harijan*, 21.7.1946, in *CW*, vol.84, p.441; *Harijan*, 10.2.1940, in *CW*, vol.71 p.177.
27. *Young India*, 9.2.1921, in *CW*, vol.19, p.312. Also see, *Navajivan*, 27.1.1921, in *CW*, vol.19, p.250; and *Navajivan*, 3.11.1920, in *CW*, vol.18, p.388.
28. *Young India*, 20.4.1921, in *CW*, vol.20., p.14.
29. *Harijan*, 10.2.40, in *CW*, vol.71, pp.177-8. Similarly, he said in July 1946: "In my opinion, political education is nothing worth, if it is not backed by a sound grounding in religion by which is not meant sectional or sectarian belief." *Harijan*, 21.7.1946, in *CW*, vol.84, p.441.
30. Quoted by J. J. Doke, *M. K. Gandhi : An Indian Patriot in South Africa*, London, 1909, p.7, as cited in U. S. Mohan Rao, compiler and editor, *The Message of Mahatma Gandhi*, Publications Division, New Delhi, 1968, p.34.
31. *Young India*, 12.5.1920, in *CW*, vol.17, p.406.
32. *Young India*, 11.8.1920, in *CW*, vol.18, pp.133-4.
33. *Young India*, 1.10.1931, in R. K. Prabhu and U. R. Rao, editors, *The Mind of Mahatma Gandhi*, Ahmedabad, 4th reprint, 1996, p.102.
34. *Young India*, 5.3.1925, in 5.3 1925, in *CW*, vol.26, p.224.
35. Report of a speech at a prayer meeting at Kamalapur on 21.2.1947 in the *Harijan*, 16.3.1947, in *CW*, vol.87, p.5.
36. *Young India*. 27.11.1924, in *CW*, vol.25, p.356.
37. D. G. Tendulkar, note 11, vol.7, p.45. Also *Harijan*, 24.2.1946, in *CW*, vol.83, p.11. Also, "Though religions are many, Religion is one," *CW*, vol.51, p.349 (statement issued on 5 November 1932).
38. *Harijan*, 26.1.1934, in *CW*, vol.57, p.18.
39. *Harijan*, 30.11937, in *CW*, vol.64, p.326. Also see *Harijan*, 28.11 1936, in *CW*, vol.25, pp.179, 180; *Young India*, 20.2.1930, in *CW*, vol.42, p.488; *Harijan*, 16.2.1934, in *CW*, vol.57, p.147.
40. Speech at a Meeting in Lausamne, 8 December 1931, in *CW*, vo.48, p.404.
41. *Harijan*, 8.6.1940, in *CW*, vol.72, p.134.
42. *Harijan*, 9.8.1942, in *CW*, vol.76, p.402. In this context, he also said that Hindustan "belongs to Parsis, Beni Israels, to Indian Christians, Muslims and other non-Hindus as much as to Hindus. Free India will be no Hindu *raj*, it will be India *raj* based on the representatives of the whole people without distinction of religion." *Ibid.*

In Defence of Orientalism – Critical Notes on Edward Said

Irfan Habib

It was in 1978 that the late Edward W. Said published his enormously influential work, *Orientalism.* He subtitled it *Western Conceptions of the Orient,* thereby calling for and altogether new conception of Orientalism. 'Orientalism', as understood till then, meant scholarship and learning in eastern languages and cultures (*OED,* s.v. 'orientalism'). Such learning was not necessarily confined to western scholarship of the Orient, as Said assumes. Moreover, Orientalism went much further that a mere body of conceptions; it chiefly encompassed, in Said's own words (p. 203), "the work of innumerable devoted scholars who edited texts and translated them, codified grammars, wrote dictionaries, reconstructed dead epochs, [and] produced positivistically verifiable learning."

But such basic work is only incidental to Said's definition of Orientalism which has its scope enlarged to take in the discourse of anyone "who teaches about, or researches the Orient — and this applies whether the person is an anthropologist, sociologist, historian or philologist — either in its specific or general aspects," and such a person is deemed "an Orientalist, and what he or she does is Orientalism" (p.2). Soon enough, Said forgets the professional boundaries of teacher and researcher. Journalists, novelists and politicians appear with quiet ease on his pages as 'Orientalists' wherever they have a statement to make that Said wishes to attribute to 'Orientalism'. (Henceforth in these notes, the words 'orientalism' and 'orientalist' as understood by Said appear within single inverted commas; without these marks, the words represent their ordinary, or pre-Said, senses.) And, then, of course, there is the restriction which by a curious slip he forgets in the definition just quoted. The 'orientalist' is exclusively a western person, and it is thus assumed that there are no corresponding teachers and researchers in subjects oriental within the Orient itself. This being so, Said does not have to face the embarrassment of considering how western and eastern orientalists interact with each other; and how this interaction could influence the thought of both. Indeed, he assumes — and selects only such orientalists as fulfil this requirement — that orientalists write only for western audiences ('Afterword', P. 336).

There is, yet another, and an equally less justifiable, restriction. Said limits his study of 'Orientalism' to the British and French tradition, and German and other European orientalists are excluded (pp.3-4). The reason given for this exclusion is that since Britain and France had major colonial engagements with the East, their orientalist scholarship was different from that of other European

countries. But such *a priori* slicing up of European Orientalism need to be given a better and more convincing reason. For the part of Orientalism said closes his eyes to includes such extremely influential figures as I. Goldziher (a Hungarian, incidentally, not a German – *contra* Said, p.18) who would hardly fit Said's perception of on 'orientalist'. Classical master of *hadis*-criticism, Godziher was an anti-zionist Jew, who received his 'post-graduate' education at al-Azhar and professed the same critical respect for Islam as for Judaism and Christianity. Where would such a man be placed in Said's scheme? But, then, by what definition, has James Needham been excluded from Said's ranks of Orientalists? He was, after all, British; and his *Science and Civilization in China* volumes have not only focused of China's scientific and technological achievements, but are rich on similar achievements of the Arab-Islamic civilization and of India. There is no hint in his work too of any intrinsic superiority of the West over the East— the presence of which said regards as central to 'orientalism'.

I would not take more space to press the point that Said's concept to 'orientalism' is both far too general and far too restricted, and the limits of his definition are so set and the actual selection so executed that his conclusions are thereby simply pre-determined. I would also not go into the other fundamental questions that Aijaz Ahmad has raised about Said's method in his essay, '*Orientalism* and After' (*In Theory*, Delhi, 1994, pp. 159-220). But one further problem with Said that needs certainly to be taken up is his notable lack of rigour in terms of documentation and logic; and I illustrate this by the treatment he metes out to Karl Marx.

On a preliminary page of his *Orientalism*, Said puts two short quotations, the first of which is from Marx : "They cannot represent themselves; they must be represented." An innocent reader will surely assume that Marx is here implying that Oriental peoples are incapable of representing themselves, and so Europeans (better still, European Orientalists) must speak for them. And, indeed, on p.21 quoting Marx's words in original German, Said explicitly furnishes this precise context for his words.

There is a double sense in which this use of the quotation is unethical and irresponsible. The quoted words are taken from a passage in Marx's 'Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte', where he speaks not of the position of Eastern peoples, but of the poverty-stricken small-holding peasants of France at a particular juncture in mid-nineteenth century. Since these peasants could not unite, they were "incapable of enforcing their class interest in their own name, whether through a parliament or through a convention. They cannot represent themselves, they must be represented. Their representative must be represented. Their representative must at the same time appear as their master..." (Karl Marx and Frederick Engels, *Selected Works*, Moscow, 1950, I, P. 303)

Not only does Said thus coolly substitute eastern people for French peasants; by a sleight of hand he also converts Marx's word 'representation', meaning political representation, into 'depiction' (The oriental people cannot depict themselves, and so the Orientalists' "representation does the job"— p.21).

The exploitation of Marx's quotation does not even end with this double misuse. On p. 293, he makes the still more audacious statement that Marx had used the quoted phrase "for Louis Napoleon", as if Louis Napolean had made any claims to represent or depict Orientals, Further on quite forgetting what context he had given to Marx's quotation on p. 21, Said alleges in the 'Afterword' to the 1995 edition (p.335), that by putting the quotation as one of the book's epigraphs he, on his part, meant to refer to "the subjective truth insinuated by Marx ... which is that if you feel you have been denied the chance to speak your truth, you will try extremely hard to get that chance!" One fears to voice the suspicion that Said had never cared to read the original passage of the *Eighteenth Brumaire,* and had just picked up the quotation from some secondary source. Even so, the range of manifestly wrong meanings so confidently ascribed to the same words, on different spurs of the moment, is incredible.

So much for the short 'epigraph'. Marx as a subject of Said's study (pp. 153-56) also offers further examples of the cavalier way in which Said can just stuff anyone he dislikes or wishes to belittle into his nasty basket of 'Orientalists'. Much has already been said on his matter by Aijaz Ahmad in his essay, 'Marx on India : Clarification', *In Theory,* pp. 221-42. He shows that Said builds his interpretation on just two passage taken from Marx's two articles published in the *New York Tribune* in 1853, and seems to be unacquainted with what Marx wrote elsewhere on India. Here it must be added that while Marx necessarily relied on (the quite extensive) European reports of India, the social and economic devastation that British rule caused in India, was largely his own – and this was hardly an 'Orientalist' enterprise under Said's definition. Moreover even in Marx's second essay, apparently consulted by Said, there is a passage looking forward to the Indians overthrowing "the English yoke" (Marx and Engels, *Collected Works,* Vol. 12, Moscow, 1979, p. 221). Marx also writes in the very same article (ibid.) of "the profound hypocrisy and inherent barbarism of bourgeois civilization [which] lies unveiled before our eyes, turning from its home where it assumes respectable forms, to the colonies where it goes naked." And yet, again and again in his book, Said sneers at Marx as being, at the end of the day, a pro-colonial 'Orientalist'. So we are told, "*This Orientalism* can accommodate Aeschylus, say, and Victor Hugo, Dante and Karl Marx" (p.3). The view that "Indians were civilizationally, if not racially, inferior" is indirectly ascribed to Marx on p. 14. On p. 102 said goes so far as to put Marx among those writers who could use all the following "generalities unquestioningly" : "An Oriental lives in the Orient, *he lives a life of Oriental ease,* in a state of Oriental despotism, and *sensuality,* imbued with a *feeling of Oriental fatalism.*" The italicised words constitute a fantastic misrepresentation of Karl Marx's writings on Asia. But Said does not still stop here. On p. 231 he puts Marx among those who held that "an Oriental man was first an Oriental and only second a man" - a meaningless formula seemingly coined simply to belittle Marx.

Such reckless rhetoric cannot but create grave suspicious about Said's general credibility. Here it must be made clear that it cannot be any serious critic's case

that colonialism and Imperialism have not promoted a particular kind of writing about the East; the real point of criticism is that not only does Said unreasonably use the term 'Orientalism' to represent only this particulars class of writing, but he also goes on to tar with the same brush the entire corpus of learned writing on the Orient, which in common parlance is Orientalism. This is a clever device and verve and verbosity tend to conceal its resort to a verbal confusion pure and simple. Said himself tells us ('Afterword', pp. 341-42) that the late Professor Albert Hourani, while agreeing with much of his criticism of a part of the writing on the Orient, protested that the criticism was not applicable to a large part of Orientalist writing, and yet now after Said's *Orientalism*, the very word Orientalism has "become a term of abuse". How much Said has been successful here was borne upon me while reading a recent article by a western 'orientalist' Carl W. Ernst. The author claims credit, without any sense of embarrassment, for "foreign scholars who *alone* had the resources *and the motivation*" to analyses and Islamicised Yogic text. The claim has all the marks of a self-satisfied sense of western superiority that Said treats as the trade-mark of 'orientalism'. Yet Ernst himself dubs early theories of a possible Indian origin of Sufism as " early *Orientalist* theories " (The Islamicisation of Yoga in the Amrtakunda translations', *Journal of Royal Asiatic Society*, 3rd series, Vol. 13, Part 2, London, 2003, P. 226 italics mine). 'Orientalist' her just does duty for what one thinks is wrong : otherwise, how can there be any indication of western superiority in a theory that places the source of Islamic sufism in early India beliefs rather than, say, Christian mysticism? 'Orientalism' as a word has thus been so degraded that anyone can use it for anything one disapproves of, even when the disapprover may himself be a dyed-in-the wool 'orientalist'!

Despite Said's denials that it was not his intention to protect chauvinistic or conservative beliefs in Asia, especially in relation to Islam, one could see that any critical or historical view of any aspect of Islam by any western scholar is yet taken by him as reflective of a sense of western superiority and so a kind of 'orientalist' colonial discourse. The hypersensitivity goes to such an extent that the word "Mohammedan", used in place of "Islamic", as in "Mohammedan Law", is held to be an "insulting" designation (p.66) : Said obviously forgets that innumerable Muslim scholars down the centuries have also spoken (in Persian) of *Din-i Muhammadi* (Muhammadan faith), or *Shari'at-i Muhammadi* (Muhammadan law), without at all being conscious of any insult implied in such use of the Prophet's name. But with the aggressive stance of modern Islamic "orthodoxy", the word "Muhammadan" is quickly disappearing form books, and even from titles of works by authors long dead : thus Goldziher's *Mohammedanische Studien* and H.A.R. Gibb's *Mohammedanism* now reappear in print respectively as *Muslim Studies* (English translation) and *Islam* in editions by established academic publishers. An innocent designation now becomes disreputable the moment it is found to be tainted through association with that pernicious weed, 'orientalism'.

One should not naturally be greatly concerned about the fate of individual words, but the substance of the theory that has brought about their downfall needs

attention. The essential weakness of Edward Said and those who follow him and speak of 'orientalism' and 'colonial discourse' in the same breath, lies in the failure to see that colonialism (including imperialism, neo-colonialism, etc.) does not from the *only* major influence over oriental scholarship in the west or in the Orient. There is too easy a readiness on their part to assume that such ideas as those of gender and racial equality, and of nation and democracy, that arose in the West in modern times, and obtained popular acceptance through upheavals like the French Revolution of 1789 and the Soviet Revolution of 1917, have exercised no influence at all on modern studies of Oriental societies. Yet who can read Wellhausen's *Arab Kingdom and its Fall,* without being convinced that his analysis of the Umayyid Caliphate as structured on distinct classes based on political and economic dominance and subjugation, is derived from ideas that Social Democracy had introduced in the Germany of his time. In India D.D Kosambi, drawing quite firmly on the orientalist tradition of scholarship, aimed at reconstructing ancient Indian history through the application of Marxist concepts. Modern democratic, as against colonial, notions have thus created an increasing belief that oriental societies, like all human societies, are susceptible to the same methods of study – indeed, with the same essential assumptions - as the history of western societies. There has accordingly developed within oriental learning almost parallel, but ultimately conflicting, trends based respectively on colonial and what may be called universalist approaches. The dichotomy can be seen even in individuals. We can see this in the voluminous writings of A. B. Keith, for example, as when he did duty as a semi-official expert on the constitutional history of British India and when he wrote as a critical but sympathetic scholar on the religion and philosophy of the Vedas or on the history of Sanskrit literature.

There is also a third element within modern oriental learning that cannot be dismissed as casually as Said and his followers tend to do : the application of increasingly complex scientific methods to expand our knowledge. When on p. 203, Said concedes that the work of "innumerable" orientalists has consisted in editing and translating texts, codifying grammars, establishing lexical meanings, and reconstructing "dead epochs", he fails to recognise that this very work irrespective of the conservative or liberal views of the individual scholars concerned, results in continuously altering our fundamental notions of the past as well as present. What were hitherto regarded as unchanging or insular societies may by archaeological discoveries or closer studies of sources, or intensive field-work turn into changing and outward looking ones. One cannot simply imagine how much our understanding of historical ancient India has been influenced by the discovery and decipherment of Asoka's inscriptions, including those of this king in Aramaic and Greek, That such expansion of "positivistically verifiable" knowledge of the Orient should make no difference to the currency of prior prejudices is in itself prejudice pure and simple. Said can cite no better authority in running down the impact of such discoveries on our mind than Nietzsche, the father of Fascism, with his notions of "truths" as "illusions" (p. 203). Between the time Said wrote his book and his 'Afterword', western archaeologists and

geneticists established that Africa is the most likely original homeland of succeeding hominid species, including the Anatomically Modern Man. No racial "truths" of Nietzsche & Co., however deeply rooted in one's mind, can possibly accommodate this discovery created out of the work of persons many of whom individually possibly had no great motivation to undermine the widespread racial prejudice against African peoples.

It is true that colonialism does not cease to be an influence on authors' ideas just because oriental learning receives other ideological influences as well and continuously develops through scientific discoveries. In many ways, one fears, Said's rhetoric and sweep itself has brought into discredit the rigour and precision of older scholarship and so opened the doors to new scholarly fashions susceptible to new forms of colonial influences. Such scholars might indeed put themselves forward as critics of 'Eurocentrism', of 'orientalist appropriations', and of 'colonial discourse' but this rhetoric is often found to be of little relevance when the actual substance of their work is considered. A trend of this kind, which Said greatly applauds in his 'Afterword', is that of the Subaltern group, whose main target of attack has been Indian nationalism. Indeed, Said himself acknowledges the possibility that the Subalterns' "mostly (!) academic work" is "easily cooptable and complicit with 'transnational' neo-colonialism" (p.352). One cannot improve on this insight into the historiographic situation of Subalternism; but surely said should have considered why neo-colonialism cannot as easily coopt old-fashioned anti-imperialist writing, whether bourgeois or Marxist. If he had pondered on it, he might have found that there is much more to Orientalist tradition of scholarship than can be detected through selective literary criticism. As we have said, ideas of nationalism and democracy wrestle, within oriental scholarship, with colonialism and neocolonialism, and science gradually but surely reduces the area of bias and prejudice. Good robust orientalism with reason and rigour guiding it, may still have the last laugh, when many on the present post-modernist fashions, with their fuzzy terminologies and neo-colonial potentialities, have departed.

Stepping across Lines : Transnational Activism And The Promise of Peace In India and Pakistan[1]

Zoya Hasan

Introduction

According to America, September 11, 2001 attacks changed the world dramatically. There is no doubt that the 9/11 atrocities were an event of historic importance, and an event that strongly affected South Asia. The collapse of the World Trade Centre and the attack on Pentagon and its aftermath focused America's attention on the unremitting quarrels in South Asia and its primary goal of ridding the region of Al Qaeda.[2] Before the attacks, the Bush administration had downgraded Pakistan to the category of a 'rogue state' because of its military dictatorship, its support for the Taliban regime in Afghanistan and involvement in the insurgency in Kashmir. The after effects of 9/11 were a complete turnaround in America's approach to Pakistan in a manner reminiscent of its embrace of Pakistan after the 1979 invasion of Afghanistan. Pakistan was suddenly elevated to a pivotal position because the United States sought to use Pakistani territory and military bases as staging areas in the prosecution of the war against terrorism. Even with the diminishing of America's tilt toward India after Bill Clinton's visit in earl 2000 and the American reliance on Pakistan and misgivings about its role in Kashmir, the Indian government was eager to joint the US-led war on terror. This signaled a striking shift in India's policy orientation towards the US and a greater dependence on US to act on its behalf against Pakistan. Following the attack on Parliament in December 2001, India mobilized around half a million troops along the border to pressurize Pakistan to end its support for cross-border terrorism. Pakistan, rather than be intimidated by India's military might, responded to a counter-mobilization. The escalating conflicts in South Asia brought India-Pakistan to the centre-stage of international politics even as the relations between the two old enemies have been more strained culminating in repeated threats of violence or the actual use of violence by the government and extremists in the region. The strong American military presence in South Asia is one major outcome of this. Across South Asia the aftermath of the war in Afghanistan has led to growing US military and political presence and instability and domestic political crises in every country with very little prospect of peace.

This is the context in which this paper looks at the three distinct but interconnected issue of war and peace in the conflict between India and

Pakistan : the increasingly antagonistic relationship between India and Pakistan and the coming to the fore of militant nationalism in both countries; the growth of political activism on national and transnational levels in the 1990s; and the role of civil society and citizens groups to help promote trans-border dialogue, tolerance and peaceful resolution of conflicts. The main purpose is to explore the relationship between national and transnational activism and the linkages between activitism, civil society and state while drawing on the category of women's activism's impact on social and political life in the Indian subcontinent.

Activism is a broad concept, which encompasses collective efforts to change power relations at all levels from interpersonal to transnational.[3] Examples of such activism are women's activism (both women's movement and feminism), labour, peasant, environmental and peace movements. Single-issue based actions and movements, the *Right To Information* in Rajasthan, the *Narmada Bachao Andolan* against big dams, *Chipko* struggle against the felling of forests, are cases in point Global or transnational activism refers to the links between varieties of women's organizations an feminist groups around the world. Local and transnational activism prioritize an agenda of peace or emphasize a protest programme. And this includes many cross-border networks informed by a commitment to social and political transformation. Women's potential as a global force for such transformation is the driving force behind the recent growth of alliances 'across state boundaries.'[4]

However, the theoretical tradition, which broadly frames this paper, is the literature on political activism and civil society that has grown out of South Asia's experience, especially India.[5] There are at least three clearly identifiable strands in contemporary activism and discussions in which the idea of civil society figures prominently: identity-based movements (Hindu nationalism and Islamicist actions); women's and anti-nuclear movements; and issue-based social movements. People to people dialogues and social movements working for the normalization of India-Pakistan relationship such as women's rights, civil rights and anti-nuclear movements are rooted in a transformative social vision and are keen on expanding the space for civil society independent of the state and provide relief to the oppressed groups. Behind these civil society initiative and dialogues lies the architecture of desire– a desire to live in peace and in a spirit of accommodation.

In India the earliest discussions of political activism were set against the backdrop of the internal emergency (1975-77). The experience of and opposition to the emergency saw a groundswell of popular assertions across the country challenging the state and the economic and social injustices suffered by subjugated groups like women, slum and pavement dwellers and unorganized labours.[6] In the past decade there has been a much greater acknowledgment of the important roles women's movements or movements like the *Narmada Bachao Andolan* play in the processes of democracy.

Although women's activism has a long history in India, it was in the late 1970s and 1980s that it gathered momentum with a specific feminist focus through

campaigns against rape, dowry deaths and sex selection tests etc.[7] More noticeably, the women's movement has been radicalized by the activism of poor women who have raised employment and wage demands and fought against domestic violence. This period saw the growth of new urban-based autonomous groups on a range of issues– work, environment, ecology, civil rights, health. It has also witnessed the emergence of alliances and a network of women's organizations at the national level which encompasses party-based, professional and independent groups.

India and Pakistan were the two independent states that emerged after decolonization in South Asia. The disintegration of the 'two-nation theory' after the 1971 dismemberment of Pakistan propelled its national identity in the direction of a global Muslim identity leaning on Islamic countries rather than South Asia.[8] Finding a positive response in state and society, it provided justification for the creation of a new collective identity as a result of a deliberate reorientation from South Asia to the Middle East which became an important culture referent and in may respects politically and economically more significant than the Indian subcontinent.[9] This discourse grounded in Islamization acquired a renewed legitimacy under Zia-ul-Haq's Martial Law regime, which suspended the Constitution and fundamental rights, banned political parties and demonstrations, and together with this reversed a modicum of the advances that had been made by women in Pakistan. The Family Law Ordinance (1961) provided some space within the family, and higher education and remunerative work became more acceptable.[10] Conversely Hudood Ordinances 1979, Law a Evidence 1984 and the Enforcement of Shariah Ordinance 1988 restricted women's rights.[11] Women had to bear the brunt of these discriminatory laws, .and backed by state authority patriarchal control over women received a big boost. Specifically the symbolic and legal changes reduced women to the state of lesser citizens in Pakistan, they were denied the protection of the state, and the door was opened to further exploitation.[12] Faced with their secondary status and convinced that they were the main targets of the Islamization campaign, women in cities spearheaded the opposition to right-wing religious politics. The Women's Action Forum, formed in 1978, joined openly in activism against discriminatory laws, in fact women's groups and women's movement led public protest against the Martial Law regime. Legal issues and legislative changes dominated activism. However, the women's movement has lost its intensity over the last few years and the human rights movement has come to the forefront instead. Yet, the most significant contribution of women's groups has been in catalyzing ideas and groups, especially the civil rights movements for the establishment of democracy.

The wide-ranging political activism within and across countries has however made no significant difference to the five decades of unrelenting hostility between India and Pakistan. During the 1990s, hostility between Indian and Pakistan further deepened. The origins of the conflict have been traced to many sources : the antagonism between Hindus and Muslims, the communal problem, partition of India in 1947, and the Kashmir dispute remains the principal cause

of enmity and mistrust.[13] Pakistan claimed it in accordance with the principal basis of partition, i.e. religion of the majority of the population. India's claims to it follow another principle : rulers were given the option of joining India or Pakistan and this was the basis on which hundreds of princely states were integrated into the successor state. The Hindu monarch of the predominantly Muslim state chose India, prompted partly by a Pakistan-sponsored tribal rebellion in the state. India's claim derives from the centrality of Kashmir to India's secularism. The two countries have fought three wars and several smaller ones over this territory and despite mounting international pressure for a peaceful settlement of the long-standing dispute, have failed to settle it, and repeatedly raised the pitch of the conflict. Although Pakistani policy makers know the problem to be basically political, since 1948 they have approached it in military terms and have nurtured the idea and strategy that military means (*jihad*) will resolve the issue.

Even though Kashmir's rampant economic troubles, rigged elections and the National Conference's monopoly of politics fuelled widespread opposition in the 1980s, the rigged 1987 state assembly election was the final straw, igniting militancy and Kashmiri separatism. By 1992, Pakistan supported Islamist extremists to replace Kashmiri militants in the fight to bring all of Kashmir under Pakistani control. Thus what started as an indigenous, secular movement has become an increasingly Islamist crusade backed by Pakistan-based militant groups — the Laskar-I-Taiba and Harkat-ul-Mujahidin for "liberating" Kashmir, which they believe was seized by India illegally. It is estimated that in this conflict 60,000 to 70,000 people have died, about 4000 are believed to be missing or in illegal detention, more than a million people have been displaced, and the number of widows and half widows is more than 15000 [14] India-Pakistan tensions were heightened in 1999 after regular and irregular forces from Pakistan crossed the Line of Control and infiltrated Kashmir. American diplomatic pressure on Pakistan forced the withdrawal of Pakistani backed intruders in Kargil but left the Pakistani military leadership extremely bitter and frustrated, and this contributed to the military coup and the replacement of the civilian government of Prime Minister Nawaz Sharif with a military government headed by General Parvez Musharaff the principal architect of the Kargil misadventure.

The never-ending conflicts and limited wars spawned by the Kashmir dispute draws its energy from entrenched distrust and insecurity. As a result, it has been difficult for either side to make concession on even minor issues. This relentless hostility has been aggravated by nuclearisation and the tit-for-tat nuclear tests of May 1998. The war of words between the two governments since 9/11 against the background of America's current war on terrorism and the massive build up of troops on the border after the terrorist attack on the Indian Parliament on 12/13 is by no means the only example of mutual belligerence and war mongering. That this is a real danger became evident when the implacable enemies were restrained by American pressure, to come back from the brink, sobered by how close the two nuclear powers came to full-fledged war. The latest crisis demonstrates that the

two States' appetite for confrontation is far from exhausted, even if large sections of civil society want peace and resolution of hostilities.

The protracted India-Pakistan hostility has had extensive ramifications for both countries– most evident in the sharply escalating defence budgets, military activity and militarisation of everyday life and work. In this region ethnic, religious and social conflict is widespread, poverty, illiteracy and unemployment are rampant, and discrimination against women as well as ethnic and religious minorities is entrenched. Women have been the chief victims and sufferers of the Kashmir conflict, for example.[15] Yet, militarisation and demonisation dominate foreign and domestic policies although most of their people yearn for economic opportunities, food, shelter and bare survival.[16]

Women's Activism and the India-Pakistan Dialogue on War and Peace

The general failure of both states to settle their conflicts has from time to time seen growing efforts to promote better understanding between the two countries. Over the past ten years several programmes and dialogues have attempted to bring together students, artists, journalists, politicians, strategists, intellectuals and retired generals from both countries. However, most of the Track II dialogues intended to promote understanding ended up stressing the legitimacy of the one's own side and emphasizing the misguided policies of the other. Much of the goodwill created by these efforts was washed away by the Kargil war in the summer of 1999 and furthermore by the Indian anger at Pakistan when Pakistan-based militants hijacked an Indian Airlines plane on a flight from Kathmandu, Nepal, to Delhi in December 1999. The hijackers demanded and won the release of three terrorists.

Several non-state activists and organizations have made alternative efforts to promote people to people dialogue and exchange of ideas. With the growing influence of right-wing politics in India and the failure of democracy to take root in Pakistan, a variety of activists have aspired to radicalize civil society.[17] There are at least two strands of activism in India and Pakistan that are keen to develop and strengthen social movements, for reason that are only partially comparable. Some political activists in India, after the retreat of the state in the 1990s and the growth of conservatism, wish to revitalize and strengthen pluralism in society and polity. While in Pakistan there was an urgent need for encouraging the growth of institutions of civil society outside the state as carriers of democracy. Evidently, there is a similarity between pluralist and democratic arguments, but the direction is different. The first is directed at the failures of statism, the second is directed at Islamism and militarism. Nevertheless, there is an affinity. Society movements, women's groups, and anti-nuclear activists question the assumptions underlying the persistent hostility between the two countries and demand instead a space for people's intervention in the normalization of relations between India and Pakistan. Political activists, feminists, anti-nuclear campaigners, journalists, representatives of people's movements and mass organizations have started dialogues aimed at

developing common strategies to combat militerization, nuclearisation, communal violence and violations of human rights by the ruling elites and the state by bringing questions of local, national and regional political and economic security into the dialogue.

Today, there is a noticeable political opposition to nuclearisation, religious fundamentalism and communal politics. Large numbers of people are strongly opposed to both trends. A politics of reconciliation and peace has been underway for almost a decade through civil society projects and social movements. Popular aspiration for normalized India-Pakistan relations find expression in the growing peace movement and the broad-based mobilization for nuclear disarmament and peace. *Established in 1994, a major aim of the Pakistan India Forum for Peace and* Democracy (PIFPD) was to open up space for people to people initiatives and bean open forum between citizens of India and Pakistan. The main objective of these meetings is to discuss the threats to peace and democracy in the Indian subcontinent and as the Kashmir dispute is the major cause of tension between India and Pakistan special attention had to be given to this issue. PIPFD has organized national conventions of several hundred people in both countries in the last five years. The first convention was held in Lahore followed by conventions in New Delhi, Bangalore, Calcutta and Karachi. These conventions deliberated on four themes: Demilitarization and denuclearisation, Kashmir, religious intolerance, governance and transborder democracy.[18] In July 2001 Pakistan-India People's Solidarity Conference was held just before the inconclusive Agra Summit. Nearly 40,000 Pakistani and 2000 Indian peace-seekers assembled on August 14-15 candle-lighting ceremony at Wagah border. This was endorsed by Coalition for Disarmament, Women's Initiative for Peace in South Asia (WIPSA), PIPFD, Pakistan Peace Coalition and 250 NGOs and grassroots bodies and Left parties supported it.[19]

Significantly, the impulse and momentum for transnational linkages has come from women's groups. Women's political initiatives to forge cross border ties were a precursor to the dialogue at the citizen level. Women's transnational activism coincides with their disillusionment with state system in the region and militarisation. Hence it was not surprising that the women have taken the initiative for peace. They have been the pioneers in the movement to change the nature of the India-Pakistan relationship. The WIPSA was established in 1999 and since its formation has been engaged in the promotion of visits of Pakistani and Indian women to both countries and solidarity conferences.[20] Their demands are: demilitarize the region, marginalize militant forces, facilitate travel and exchange of newspapers, magazines and books and support a dialogue between India and Pakistan. On March 8, 2000, a busload of women activists from different walks of life traveled to Lahore in a gesture of solidarity and bridge building.[21] The following month, two busloads of Pakistani women teachers, journalists, lawyers, theatre people, politicians and students arrived in Delhi in affirmation of that gesture. The women's peace bus was a big boost to people-to-people diplomacy and the peace process. Asma Jahangir, organizer of that initiative said, in response

to a question by the press, that if the border at Wagah (Punjab) had been thrown open, there would be queues of people on either side, waiting in line to cross over.[22] WIPSA has also organized all India human chains for peace and sent an all women team to Kashmir to report on the impact of the prolonged conflict on the status of women.[23] Two important organizations are WISCOMP: Women in Security, Conflict Management and Peace and SANGAT: The South Asian Network of Gender Activists and Trainers. These are efforts to address what WISCOMP calls human security from a gendered perspective, through a range of activities, including seminars, workshops and fellowship programmes. Several other transnational networks have also come up over the past decade. These include Gandhian peace initiatives led by Nirmala Desphande and the Kinaird College alumni network in Lahore.

There is also a significant opposition to nuclearisation and the dangerous situation created by competitive nuclearisation in South Asia. After the nuclear tests there were a number of demonstrations and meetings in several Indian cities, involving a cross-section of people such as academic, scientists, human right campaigners, feminists, trade unionists and environmentalists, besides political activists of the Left Parties. Some former Generals and Admirals have also joined the mobilization. Women activists are a vital part of this growing mobilization and momentum for peace. Because women, already disadvantaged in the existing social and familial structures, will have to bear a larger social cost of nuclearisation in terms of reduced access to resources, education services, reduction in physical and social mobility, and increase in violence and valorization of ideologies that justify and maintain the existing status of women in society.[24] As Smitu Kothari and Zia Mian say in the introduction to their book, *Out of the Nuclear Shadow*, nuclear abolition will require confronting and transforming the fundamental structures of injustice within and between states that are the causes of insecurity, conflict and war'[25]. Some feminists have argued in the same vein: 'Nuclearisation produces social consent for increasing levels of violence. It legitimizes male aggression, and in India the masculinist rhetoric of nuclearisation has been combined with false patriotism and Hindutva ideologies'.[26] They conclude that: 'There can, however, be no development without peace, without eliminating the different, interrelated types of violence to which women are subjected– in the military and political sphere, in home, in neighbourhoods and workplaces.'[27] Women's groups fundamentally question perpetual hostility and the ideologies and structures that sustain them. They aim at strengthening democracy, developing common strategies and mechanisms to combat militarisation, nuclearisation, religious fundamentalism and the politics of intolerance, violation of human right and settlement of the Kashmir dispute.[28]

Women's Activism on Hindu and Muslim Fundamentalism

No discussion of transnational women's activism would be complete without a reference to the growth of the religious right and its influence among women. In the past two decades women have engaged in activism within and against religious

movements and politics. Contrary to optimistic expectations of feminists, women have actively participated in fundamentalist and communal politics. Politicized religion is inimical to women's interests and yet many Hindu and Muslim women have been busy in supporting it. Evidence from Pakistan shows that in the 1980s and 1990s, women actively associated with the Jamaat-I-Islami, supported sexual segregation and opposed women's organizations for eroding it. Similarly a striking feature of Hindu nationalism in the 1990s has been the active participation of women in communal politics as well as the violence against minorities. Both fundamentalism and communalism are responses to modernity and symbol of a larger clash between fundamentalism and modernity. Yet there are differences in the strength and opposition to religious forces in both countries according to political context. Fundamentalist movements reject the separation of religion and state, Hindu communalism accepts this separation in principle and rejects theocratic state but in practice excludes minorities because they are considered outsiders.[29] Thus Hindu nationalism focuses its energies against internal enemies, that is, minorities. Both are similar in stressing religion and conservative behavior for women and in wanting to replace secularism and secular ideologies even as they differ in point of origin and strategy.[30] Both place a central emphasis on traditional ideologies that affect women and the family, and call for a return to patriarchal structures and limits on women's control over their bodies and activity in the public sphere. The fusion of religious politics and militarism in varying degrees has aggravated inter-regional tensions, and the conflicts arising from these are increasingly approached and attempts made to settle them by the direct use of force. Women in India and Pakistan have borne the brunt of mutual tensions and competitive national security perceptions, and this combined with religious politics and national chauvinism has reinforced patriarchal controls and oppression.[31]

Efforts have been made to forge links with women's groups across borders to make common cause on rising fundamentalism and intolerance. Women's rights and civil rights groups are in the forefront of campaigns against religious politics. In India these groups have documented riots, formed local support groups for riots victims and approached the judiciary to bring rioters to justice in addition to supporting secular and humanitarian efforts. The All India Democratic Women's Association and the National Federation of Women are actively involved in the struggle against communalism and in mobilizing women in slums, factory belts and rural areas. The experience of oppression and violence in Kashmir provides the strongest impetus to women's peace activism. On this Rita Manachanda says, 'Women's construction of the legitimacy or illegitimacy of conflict is a critical factor in women turning their backs on it. In Kashmir, a turning point in the armed struggle came when Kashmiri women began to shut the door to militants'[32] Even as the dangers of communal and religious politics figure prominently in discussions and resolutions passed in meetings and conventions of theatre groups, media women, civil rights and democratic rights groups, there has been a lesser amount of transnational activism on this than militarisation and nuclearisation. This is not to say there is no feminist opposition to religious politics, indeed there

is, but the opposition and activism is concentrated in their respective countries rather than across borders.

Through the 1990s, transnational groups and cross-border activism emerged as legitimate institutions that can address political and economic security, as well as offer humanistic alternatives to the reshaping of India-Pakistan relationship The links between economic inequalities, militarism, consequences of nuclear proliferation and the Kashmir dispute are now beginning to be widely recognized The advantage of such activism is its responsiveness to both local and national issues, which makes it potentially indispensable.[33] Yet, in the face of flagrant violation of human rights in Kashmir and the worsening conditions for women, organized involvement of the women's movement has been slow and limited. For activists on both sides, the difficulty comes from a feeling of ambivalence towards nationalism and nation state. Most of the activist work has been limited to women who are victims of the excesses of security forces, and to a lesser extent of militants.[34]

Transnational activism has stagnated and made little impact on India-Pakistan relations. 'It has neither reached sufficiently downwards, to draw in numbers, nor is it reaching upwards, to influence policies. It has not reached a critical mass to become self-propelling', remark Praful Bidwai and Beena Sarwar.[35] Asma Jahangir, human rights campaigner and women's movement activist, makes a similar point when she argues that the difficulty about 'the India-Pakistan relationship and about any movement that is started by civil society is that it can move to a certain point, but to move beyond that they must keep public opinion in mind'.[36] Transnational activism has had very little political effects and implications beyond the immediate feminist or anti-nuclear audiences. It has not managed to break the stalemate between the two antagonistic nations or contributed significantly to improving the prospects of peace between them. Meetings and dialogues are not extensive and have never lasted long enough for systematic discussion of the differences between the two sides and how these differences might be reconciled. Although India-Pakistan rapprochement has evoked a strong response from constituencies as diverse as the Left parties and large-scale industry, it has failed to marshal support of opinion makers-the media, intelligentsia and middle classes-who remain skeptical and unconvinced about each other's reciprocity. For this to happen peace activism must transform itself from small group interactions to mass level activity and organization.[37] Then they can move towards influencing opinions and policies.

To understand this we need to first examine the nature of state and the differences and similarities in politics and society in India and Pakistan upon which hinges transnational activism. Important preconditions relevant to the development of human capacities associated with association and movements for rights and justice are : a shared conceptual map which describes a collectivity of citizens and provides them with conceptual categories such as rights, duties, parties interests, secularism, to shape dealings with one another and the presence of individual and self that is mutable and able to conceive of interests as transient

and able to change political affiliations and loyalties.38 Obviously there is no such common conceptual frame of reference in the associational life of India and Pakistan, and between dominant and dominated within and between countries. In the absence of shared conceptual maps, the possibility of devising united political capabilities is difficult and challenging. Moreover an important factor in any cross-border alliance is openness of identity. Indemnities cannot be essentialised and there must be willingness on every one's part to believe that identities are changeable and shaped through many attachments.[39] This again has proved difficult in the insidious atmosphere of suspicion and mistrust and the pervasive national perceptions that the two rival nations were born in hostility.

Two opposed conceptions of state-society relations circulate in these countries, a secular-liberal and a Hindu and Islamic communal one, and they do not stand in equal relationship with each other and democracy. Associational life is often highly undemocratic in character; moreover, civil society is immersed in a social context of general political passivity. Indifference to political parties and political issues has grown over recent years in the belief that politicians are not bothered about people's welfare. Though potentially agents of democratization and social transformation, social movements are often the province of the middle class and sensibilities characteristic of these groups within contemporary India and Pakistan. The fact that most members of transnational groups belonged to the urban educated middle classes predisposed the orientation of activism of the late 1990s and early 2000s. More generally, the disunities of class, community, ethnicity and gender no doubt serve as sources of identities, desires and reform, which generates social and political difference that may enrich democracy, but it can also debilitate democratic processes. An example of this is the case with which politicians on both sides of the border sway the mood of the masses for their own short-term interests demonstrated by the political rhetoric of anti-terrorism in India or the support for the so-called freedom struggle in Kashmir in Pakistan. People are cynical about these issues, and yet hesitant to discuss and debate them because it is presented under the veil of national security.

Women's Activism and the Development of Feminist Critiques of Popular and State Discourses

The failure of state actors to find a negotiated settlement of disputes has made women's activism especially important. Amid an escalation of religious politics in South Asia women's activism has sought to emphasize tolerance, pluralism and non-violence supported by feminist critiques of state-driven notions of national security and cultivating a culture of peace and living with difference.[40] Evidently, two discourses are at work here : the popular discourse and the discourse of the state. The two discourses signify two different and antagonistic paradigms. The first seeks security and dignity through peace, development and equity. The second state-centric approach conceives peace through national security and the exercise of force or at least the threat to exercise it.[41] Peace and women activists imagine reconciliation principally in terms of the first approach, emphasize cooperation

and social pluralism, and therefore think that the business of peace cannot be left to governments alone. However, for women's movement and feminists the complicatedness comes from ambiguity that attaches to a simultaneous dealing with, and opposition to the state. While the state has been an important aspect of much of the activism of the women's movement, and many claims and demands have been directed at the state, feminists have not engaged in a full-scale analysis of the state, especially in situations of conflict such as in Kashmir.[42]

Underlying the popular discourse is the assumption of women as a coherent group with identical interests and desires regardless of class, ethnic or cultural location or contradictions. It implies a notion of gender that can be applied cross-nationally and cross-culturally. These assumptions are made on the basis of privileging of a particular group or position as the norm or the referent.[43] The assumption that all of us of the same gender across classes and cultures, are somehow socially constituted as a homogeneous group', which characterizes much of feminist discourse, is even more problematic in the context of peace activism Islamism or political Hinduism or militarisation affects all women in the same way regardless of their positions within societies and nation-state. In Kashmir, women's activists have involved themselves with women who are victims of excesses of security forces, and to some extent of militants Thus commonalities in the position of women across conflicts and across borders have been the driving force behind women's activism.

What binds these women together is the notion of the sameness of their oppression of fundamentalism/communalism and militarisation and militancy. This is a discursively constructed homogeneity of women as a group and it cannot be mistaken for a historically specific material and political reality of different groups of women and their varied responses to situations of conflict.[44] If women are constituted as women through the complex interaction between classes, cultures, religion and national institutions and frameworks then mobilization of women must relate to the complexities of political interests which women of different nations and cultures represent. The difficulties of crossborder activism thus, crop up in situations where there is a clash between national loyalties and the values and politics they hold dear. Activists who agree on nuclearisation, militarisation, democracy and so on have had to confront a strong divergency of opinion of Kashmir based on feelings as an Indian' or Pakistani', in essence approaching Kashmir from a national angle.

Despite distinctions and contradictions between the two discourses, nationalism and state remains the crucial part of the puzzle. To focus on civil society initiatives, which exist outside the nation-state and party system as the crucial agent for democratization and change, yields a partial perspective. Civil society movements are sectoral and their impact is often localized. Furthermore, the autonomy of civil society is connected to the state, in particular because the India-Pakistan conflict is essentially a state level conflict. Both states have pursued inflexible strategies. For the most part, the non-state initiatives have been ineffective in trying to minimize inflexibility and find ways to reduce the conflict.

The crucial question is whether political parties could or would respond in a positive fashion and be willing to mobilize in support of a negotiated long-term settlement of the Kashmir dispute. Political parties have shown little willingness to rise above narrow political considerations and have not constructed a mass base for peace. Nor have they responded adequately to transborder initiatives. Yet, they continue to be a crucial point of mediation between civil society and the state and remain essential to any plausible version of representation and only with their active involvement cross-border initiatives can break the current stalemate to develop durable forms of public intervention in support of peace and democracy. Advocates of India-Pakistan peace eschew involvement and association with political processes in favor of independent civil society and social movements. Lastly, civil society goals are sustained in conditions of good governance and effective rule based on democratic institutions and supported by a system of rights. Only in these conditions civil society can be a staging ground for efforts to influence state policy and practice. If not, the idea of civil society and transnational activism is hardly a self-sufficing one, let alone a significant key to unraveling India-Pakistan disagreements and disputes.

Difference of Self-Perceptions

A primary question that has not been addressed by transborder activism revolves around the two nations' understanding of each other, with activists invariably laying emphasis on similarities, rather than a strategy of accepting similarities and differences, that is, living peacefully separately. In part this argument originates from secular leftwing intellectuals who want to argue that the differences between Hindus and Muslims have been exaggerated and have led people to underestimate the commonalities in civil societies. While this may be true, long-term understanding calls for attempts to confront both the past and present and the recognition that societies are not exactly "the same". The focus is always on commonalities : shared past, shared culture, but not its diversity and differences. 'Both countries live with the assumption that *they know* the other. The other is, after all, a former aspect of the self; hence, there is no room for curiosity that foreignness normally awakens. Physical vicinity compounds this feeling. [45] The process of interrogation must begin with the state ideologies of nationalism. In the dominant construction of history in India, Partition is a betrayal. They blame India for Bangladesh; we blame them for Kashmir. They raise the bogey of RAW whenever trouble erupts, we see ISI lurking everywhere. There is so little contact between the two countries that ignorance and stereotypes run deep. The divisions of fifty years make each society a mystery to the other. A young Pakistani who visited India with great trepidation returned with all stereotypes shattered. He then wrote an article, which began : I have met the enemy, they are human like us'. Most Indians say the same thing after their encounter with the enemy.'[46]

Yet the fact remains that the constitutive principles of the two nations are different, as is the character of their states and societies. No reconciliation is possible without recognizing these differences and addressing the political and

Structural differences in society, economy and political processes. Ayesha Jalal describes the state in Pakistan as a structure imposed from above with weak links to society. She draws attention to the weakness of the institutions of the state and civil society and the ideological contradictions in the self-perceptions of the Pakistani state. Political parties and party system is not well developed, while those in command of the highly developed bureaucratic and military structures have remained in a position of dominance in much of Pakistan's turbulent history.[47] Economic and social inequality is very sharp and aggravated by the absence of democracy. Democracy never took root in Pakistan, political Islam holds a grip, and society is still feudal and hierarchical and deeply polarized' between secular democratic parties and Islamic groups haunting the nation. Pakistan's army, because of the long history of praetorian rule, is unarguably the most powerful institution in the country. Military governments and elites have refused to share power with any significant opposition. We in India can well imagine the consequences of such an anti-democratic situation should the secular parties come together to ban the BJP and prevent it from participating in elections.

Indian politics, on the other hand, is rooted in a flourishing democracy and shaped by social and cultural diversity; it remains an open and pluralist society even as its society and economy have increasingly come under elitist domination and influence since the current impetus towards economic liberalization began in the early 1990s. Democracy has taken roots, most noticeably among historically marginal groups. Democratic and liberal values have become entrenched among the intellectual elites. Investigative reporting has exposed corruption, and forced a measure of accountability. The Election Commission has assured free and fair elections, Judicial activism has led to the prosecution of elected politicians and public interest litigation has aided the cause of protecting civil liberties.

Right-wing ideologies and politics dominate in both countries marked by a stress on overarching and homogenized national identity. Both states face a crisis of legitimacy and national identities just as pluralism is being rapidly replaced by savage polarization. In India the eclipse of the Nehruvian paradigm entailed the shrinking of the project of secularism, pluralism and distributive justice. However, Hindu nationalism's effort to redefine secular nationalism faces considerable opposition. However, there is no gainsaying the fact that secular voices with reference to Pakistan remain feeble and indistinct from its critics, if not identical to the Hindu revivalists.[48] Pakistan remains deeply embedded not only in official discourse but also in popular thinking. India feels encircled and insecure regardless of the fact that it is seven times more populous and five times larger. India dwarfs Pakistan in population, economic strength, and military might. India spent about two per cent of its $469 billion GDP on defence, including an active armed force of more than 1.1 million personnel. Pakistan spent about five per cent of its $ 61 billion GDP on defence with an active armed force half the size of India. Nevertheless, Pakistan looms large and the very nature of the Pakistani state is said to pose a threat to India, because it still

claims that Partition was imperfectly carried out and continues to adhere to the two-nation theory, especially in the past decade since it began to provide open support for the separatist movements in Kashmir.[49]

Pakistan's national identity has proved to be a volatile issue in the half-century of its existence and consequently hostage to the belief that India had never accepted Pakistan. Its leaders distrust India and the latter's assurances that it accepts the existence of Pakistan. This perception of persecution has resulted in the institutionalized distrust of India. Asymmetry between the two countries dominates Pakistani Leadership, which feels threatened by a powerful India. Any attempt to provide a positive foundation to Pakistani identity has floundered. After its breakup in 1971, Pakistan could have abandoned the two-nation theory in favour of a territorial conception of national identity. Instead, it chose a distinctly Islamic identity to distinguish it from 'Hindu' India. Thus Pakistan defines nationalism principally in opposition to India.[50] Pakistani national identity is principally religio-cultural, and the majority religion, Sunni Islam, defines the contours of its identity. For the Hindu Right, rivalry with Pakistan provides validation of their theory of cultural nationalism and of the proposition that Muslims and Pakistan can never live in harmony with Hindus and India. Similarly, for the Pakistani Islamicists, India-Pakistan hostility provides proof of irreconcilable differences and the radical impossibility of peaceful coexistence between Muslims and Hindus. The ideological contradiction of national self-perceptions is difficult to resolve, yet, any resolution of the conflict must take into account the national identity of parties concerned and the tremendous disparity in the strength and resources of the two countries.

The new surge in support for the Right and the growing presence of religious politics in state and civil society has made it more difficult to sort out differences. The important point to note is that the India-Pakistan conflict has an ideological dimension, which is every bit as significant for states as it is for civil society activists seeking to change the relationship between the two neighbours. The Kashmir issue is much more than a territorial dispute because it is rooted in the constitutive ideologies and national identities of both states. At the heart of the dispute is the fundamental opposition of Indian and Pakistani self-perceptions as nations. Just as no Indian leader can give away the Kashmir valley, no Pakistani leader can survive if he renounces his claims to it. Elaborating on the pitfalls for the Pakistani leaders who abandon the Kashmir issue, Pakistan President Parvez Musharraf said, "No leader, no government in Pakistan can leave or abandon the issue of Kashmir. It is not possible. Nobody can do it. He'll be eliminated. He'll be out of government. He'll be defeated. His government will be defeated."[51] From this it should be clear that Pakistani leaders have compounded the Kashmir problem and have in fact built institutionalized ideological obstacles to the settlement of the dispute. On the other hand, India's concern with cross-border terrorism and its image as the aggrieved party has become stronger since 9/11 on account of the American war on terrorism, thus, underlining the difficulty of describing Kashmiri militancy as freedom struggle.

In the ultimate analysis, neither India nor Pakistan has seriously tried the option of a negotiated settlement. Neither was prepared to recognize that the Kashmir situation has changed completely since India decided to go nuclear. India's refusal to focus on anything other than cross border terrorism and Pakistan on state repression cannot convince anyone that this was the only problem in Kashmir. The BJP-led government wants to redefine the Kashmir problem from a territorial dispute into a terrorism problem, whereas General Musharraf wants to curb fundamentalism in Pakistan even while keeping some form of jihad alive in Kashmir.

The US war on terrorism has brought no respite for India. Post-Cold War alliances are changing dramatically with Washington having strong military links with most countries in the region. Indian no longer has any objection to a US military presence in the region. The single-minded focus of the Indian strategy was to expand support in its own war on terrorism from America's. It has been making loud appeals to Washington to help combat state-sponsored terrorism', in Kashmir. In a widely publicized letter. Prime Minister Vajpayee urged Washington to restrain Pakistan from backing international terrorism. Critics of the BJP argued this was a direct invitation to the US to intervene in the name of fighting international terrorism. The rhetoric from both countries on the willingness to use unclear weapons is compelling American intervention to bring about de-escalation of tensions.[52] The Indian government's decision to resort to a policy of brinkmanship' in the summer of 2002 so as to isolate Pakistan was frustrated simply because Pakistan for reasons of geographical proximity was considered more vital for US attack on Afghanistan and therefore a reliable ally in the war against terrorism and extremism. However, the present impasse is not only a result of specifically unyielding polices of the BJP government. A longer view reveals that American stakes in central and west Asia especially central Asian oil and pipelines renewed the centrality of Kashmir and Pakistan to US policy. Even though India is the preeminent and pivotal power in South Asia, Pakistan's ability to acquire sophisticated weapons from the US has led it to believe that it can acquire virtual parity with India. This subdued India's push for regional dominance, and the Indian sub-continent subject to a state of arrested unipolarity' because of Pakistan's claims to parity with India based on 'externally induced factors'.[53]

That goes a long way in explaining the alacrity with which both nations are doing the US bidding in the war against terrorism. Even after stepping back from the brink of nuclear conflict in the summer of 2002 political leadership made no attempt at offering solutions of peace plans. Part of the problem lies in the instability that war mongering and war talk has introduced into the world's interstate system. If the US national security and military doctrines can argue for the option of pre-emption and pre-emptive attack as a strategy of dealing with threats that might be coming at the US attack then India can entertain the idea of crossing international borders on similar grounds. This apprehension finds expression in the clarification sought from Secretary Colin Powell by the Senate

Foreign Relations Committee Chairman : 'I know you don't want to set a precedent that allows India to say, by the way, Pakistan has done the following, we reserve the right to pre-emptively...'[54] It is an irony of this situation – asymmetry in the military balance within the region and increasing unilateralism in US strategies – that both India and Pakistan which were poised to resume summit-level dialogue in September 2001, today find it difficult even to consider talking, and relapse into bellicosity and insinuation.

Concluding remarks

Compliance with America's dominant role in the region combined with an increased dependence on Washington to broker peace has made civil society initiatives even more crucial for building public opinion and a space for dialogue and tolerance. Their importance has grown because of the failure of the two governments to reduce tension and mutual rivalry, which is one of the major obstacles to democratic and equitable development in the region. Transnational political activism has made a modest beginning towards defining the agenda and underlining the interlinked issues of peace, equity, and development. Despite enormous difficulties women's groups have endeavored to shift the terms of debate and have chosen to express their concern with the state strategies, militarisation and the ascendancy of religious politics through cross-border peace initiatives that support a common politics of understanding on the fundamental right of women, civic dignity and equality. Above all, it has drawn attention to the dreadful costs of mutual hostility between India and Pakistan, and the self-inflicted damage manifest in the lack of development, persistence of social hierarchies, disparities and poverty, and a deepening social and political crises of ruling ideologies. One can only hope that people-to-people contacts will eventually overwhelm the government-to-government hostility. The presence of women, whether as victims, agents or activists can no longer be ignored. Any resolution of India-Pakistan conflict must consider women and involve them centrally in finding a solution

References

1. This Paper was presented at a conference on *Women's Activism in Afghanistan and Beyond*, New Hampshire College, March 2002. I am grateful to Praful Bidwai, Ritu Menon and Achin Vanaik for sharing their experiences of India-Pakistan dialogues and citizen's initiatives and Amrita Basu for her comments on an earlier draft of the paper.
2. Even before the WTC attack, in March 2000 Bill Clinton in his trip to South Asia referred to the region as "the most dangerous place" on earth. His comment was inspired by the perception that rising tensions between India and Pakistan the world's latest nuclear powers over Kashmir could escalate into a nuclear war. In Spring of 2000 the US State Department reported that South Asia has replaced the Middle East as the leading locus of terrorism. See Jessica Stern, 'Pakistan's Jihad Culture', *Foreign Affairs*, November 2000.

45. Krishna Kumar, *Prejudice and Pride : School histories of the freedom struggle in India and Pakistan*, Viking Penguin India, New Delhi, 2001, p. 3.

46. Cited in Ram Manohar Reddy, 'Behind 'enemy' Lines', *Hindu*, 3 March 2002.

47. Ayesha Jalal, *The State of Martial Rule : The Origins of Pakistan's Political Economy of Defence*, Cambridge University Press, Cambridge, 1990.

48. Kumar, Ibid. pp. 38-9

49. Stephen Cohen, *Emerging Power : India*, p. 203.

50. Conversations with Achin Vanaik, Visiting Fellow Mohammed Ali Academy of Third World Studies, Jamia Millia Islamia, New Delhi and founder member of PIPFD and MIND, January, 2002, New Delhi.

51. Pakistan President Parvez Musharraf's address to the Asia Society, New York *Hindu*, September 15, 2002.

52. Pentagon came out with the assessment on the impact of a nuclear showdown in South Asia - at least 12 million casualties initially and perhaps seven more million, to be added later. Quoted in *Frontline*, (Chennai), July 5, 2002.

53. Mohammed Ayoob, 'South Asia's Dangers and US Foreign Policy' , *Orbis*, Winter 2001, Vol 45, No. 1.

54. Hearings of the Senate Foreign Relations Committee reported in *Hindu* (Chennai), September 28, 2002.

Of Hindutva and its Cows

D.N. Jha

The cow has tended to become a political instrument at the hand of rulers over time. The Mughal emperors (e.g. Babar, Akbar, Jahangir and Aurangzeb etc) are said to have imposed a restricted ban on cow slaughter to accommodate the Jaina or Brahmanical feeling of respect and veneration of the cow[1]. Similarly Shivaji, sometimes viewed as an incarnation of God who descended on earth for the deliverance of the cow and brahmin, is described as proclaiming : "We are Hindus and the rightful lords of the realm. It is not proper for us to witness cow slaughter and the oppression of brahmanas".

But the cow became a tool of mass political mobilization when the organized Hindu cow protection movement, beginning with the Sikh Kuka (or Namdhari) sect in the Punjab around 1870 and later strengthened by the foundation of the first Gorakshini Sabha in 1882 by Dayananda Saraswati, made this animal a symbol to unite a wide ranging people, challenged the Muslim practice of its slaughter and provoked a series of serious communal riots in the 1880s and 1890s. Since then the cow issue has figured from time to time in Indian politics But in recent years, with a fresh assertion of Hindutva forces, the supposed veneration and unslayability of the cow have assumed unprecedented importance for the numerous Hindu fundamentalist organizations as well as the government of India backed by them.

The veneration of cow has been converted into a symbol of communal identity of the Hindus and the obscurantist and fundamentalist forces obdurately refuse to appreciate that the 'sacred' cow was not always all that sacred in the Vedic and subsequent Brahmanical and non-Brahmanical traditions and that its flesh, along with other varieties of meat, was quite often a part of the *haute cuisine* in early India. Although the Shin, Muslims of Dardistan in Pakistan, look on the cow as other Muslims do the pig, avoid direct contact with cows, refuse to drink cow's milk or use cow dung as fuel and reject beef as food,[2] the self-styled custodian of non-existent 'monolithic' Hinduism assert that the practice of beef eating was first introduced in India by the followers of Islam who came from outside and were foreigners in this country, little realising that their Vedic ancestors were also foreigners who ate the flesh of the cow and various other animals. Fanaticism getting precedence over fact, it is not surprising that the Rashtriya Svayamsevak Sangha (RSS), the Vishwa Hindu Parisad, the Bajrang Dal and their numerous outfits have been demanding a national ban on cow slaughter. Nearly two years ago a Bajrang Dal leader threatened to enroll 30 lakh volunteers to agitate against

cow slaughter during the month of Bakrid in 2002[3] and in the following year saw the Indian government introduce in Parliament a legislation to ban cow killing throughout the country, though this could not be passed. So high-geared has been the propaganda about abstention from beef eating as a characteristic trait of 'Hinduism' that when the RSS tried to claim Sikhs as Hindus, it led to vehement opposition from them and one of the Sikh youth leaders proposed. "Why not slaughter a cow and serve beef in a gurudwara *langar*?"[4]

The response of historical scholarship to the communal perception of Indian food culture, however, has been sober and scholars have drawn attention to the textual evidence of beef eating which, in fact, begins to be available from the oldest Indian religious text Rigveda, supposedly of divine origin. From the first half of the nineteenth century onwards several scholars of unquestionable academic integrity like H.H. Wilson, Rajendralal Mitra, Willam Crooke, L.L. Sundara Ram, P.V. Kane, H.D. Sankalia, and Laxman Shastri Joshi, have drawn attention to the Vedic references to beef-eating which were deleted recently from the school textbooks by the Indian government. Curious though it may seem, the Sangh Parivar, which carries a heavy burden of "civilisational illiteracy", has never turned its guns towards them but against historians who have mostly relied on the researches of the above-mentioned distinguished scholars.

While the contribution of the scholars mentioned above cannot be minimised, the limitation of their work lies in the fact that they have referred to isolated bits of information on beef eating concentrating mainly on the Vedic texts without treating it as part of the flesh eating tradition prevalent in India. Unlike their works, therefore, the present paper seeks to draw attention to the Indian textual evidence of cattle killing and beef eating widely dispersed over time, so as to indicate its continuity for a long time in the Brahmanical society and to suggest that the idea of the cow's supposed holiness does not tie up with practices current in Indian society and therefore abstention from beef consumption cannot be treated as a distinctive mark of Hindu identity.

The early Aryans, who migrated to India from outside, brought along with them their earlier cultural traits. Therefore pastoralism, nomadism and animal sacrifice remained characteristic features of their life for several centuries till sedentary field agriculture became the mainstay of their livelihood in India. Animal sacrifices were very common, and in the *agnadheya*, which was a preparatory rite preceding all public sacrifices, a cow was required to be killed.[5] In the *asvamedha*, the most important of public sacrifices, first mentioned in the *Rigveda* and discussed in the *Brahmanas*, more than 600 animals (including wild ones like boars) and birds were killed and its finale was marked by the sacrifice of 21 cows, which, according to the dominant opinion were sterile ones.[6] In the *gosava*, an important component of the public sacrifice like the *rajasuya* and *vajapeya*, a sterile spotted cow was offered to Maruts and seventeen 'dwarf heifers under three' were done to death in the *pancasaradiyasava*.[7] The killing of animals including cattle figures in several other *yajnas* including *caturmasya*, *sautramani* and independent animal sacrifice called *pasubandha* or *nirudhapasubandha*.[8]

These and several other major sacrifices involved killing of animals including cattle, which constituted the chief form of the wealth of the early Aryans. They, not surprisingly, prayed for cattle and sacrificed them to propitiate their gods.

The Vedic gods, for whom the various sacrifices were performed, had no fixed menu of food. Milk, butter, barley, oxen, goats and sheep were offered to them and these were their usual food though some of them seem to have had their special preferences. Indra had a special liking for bulls (RV, V.29.7ab; VI.17.11b; VIII. 12.8ab X.27.2c; X. 28.3c; X .86.14ab). Agni was not a tippler like Indra, but was fond of animal food including the flesh of horses, bulls and cows (RV, VIII. 43.11; X. 91.14ab). The toothless Pusan, the guardian of the roads, ate mush as a Hobson's choice. Soma was the name of a heady drink but, equally importantly, of a god and killing of animals including cattle for him (RV. X.91 14ab) was basic to most of Rigvedic *yajnas*. The Maruts and the Asvins were also offered cows. The Vedas mention about 250 animals out of which at least 50 were deemed fit for sacrifice and by implication for divine as well as human consumption. The animal food occupied a place of importance in the Vedic sacrifices and dietetics and the general preference for the flesh of the cow is undeniable. The *Taittiriya Brahmana* (III.9.8) categorically tells us: "Verily the cow is food" (*atho annam vai gauh*) and the *Satapatha Brahmana* (III.1.2.21) refers to Yajnavalkya's stubborn insistence on eating the tender (*amsala*) flesh of the cow.

According to the subsequent Brahmanical texts (e.g. *Grhyasutras* and *Dharmasutras*) the killing of animals and eating of beef was very much *de rigeur*. The ceremony of guest-reception (known as *arghya* in the *Rgveda* but generally as *madhuparka* in subsequent texts) consisted not only of a meal of a mixture of curds and honey but also of the flesh of a cow or bull. Early lawgivers go to the extent of making flesh food mandatory in *madhuparka*– an injunction more or less dittoed by several later legal texts (AsGS, 1.24.33; KathaGS, 24,20; SankhGS, II.15.2; ParGS, 1.3.29). A guest therefore came to be described by Panini as a *goghna* (one for whom the cow is slain). The sacred thread ceremony was not all that sacred; for it was necessary for a *snataka* to wear an upper garment of cowhide (ParGS, II.5.17-20).

The slaughter of animals formed an important component of the cult of the dead in the Vedic texts as well as in later Dharmasastra works. The thick fat of the cow was used to cover the dead body (*RV*, X.14-18) and a bull was burnt along with the corpse to enable the departed to ride with in the nether world. The funerary rites included feeding of the brahmins after the prescribed period and quite often the flesh of the cow/ox was offered to the dead (*AV*, XII.2, 48). The textual prescriptions indicated the degree of satisfaction obtained by the Manes depending upon the animal offered– the cow's flesh could keep them contented for at least a year! The Vedic and the post-Vedic texts also often mention the killing of animals including the kin in several other ritual contexts. The *gavamayana*, a sessional sacrifice performed by the brahmins was, for example, marked by animal slaughter culminating in an extravagant bacchanalian communal festival (*mahavrata*) in which cattle were slaughtered. There was therefore a

relationship between the sacrifice and sustenance. But this need not necessarily mean that different meat types were eaten only if offered in a sacrifice. Thus in the *grhamedha*, which has been discussed it several *Srautasutras*, an unspecified number of cows were slain not in the strict ritual manner but in the crude and profane manner.[9] Archaeological evidence also suggests non-ritual killing of cattle This is indicative of the fact that beef and other animal flesh formed part of the dietary habits of the people and that the edible flesh was not always ritually consecrated, though some scholars have argued to the contrary.[10] Despite the overwhelming evidence of cattle killing, several scholars have obdurately held that the Vedic cow was sacred and inviolable on the basis of the occurrence of the word *aghnya/aghnya* in the *Atharvaveda* and the use of words for cow as epithet or in simile and metaphor with reference to entities of highest religious significance. But it has been convincingly proved that if the Vedic cow was at all inviolable, it was so only when it belonged to a brahmin who received cows as sacrificial fee (*daksina*).[11] But this cannot be taken to be an index of the animal's inherent sanctity and inviolability in the Vedic period or even later.

Nor can one make too much of the doctrine of non-killing (*ahimsa*) in relation to the cow. Gautama Buddha and Mahavira emphasized the ideas of non-violence, which seems to have made its first appearance in the Upanisadic thought and literature. But despite their vehement opposition of the Vedic animal sacrifice, neither they nor their followers were averse to the eating of meat. The Buddha is known to have eaten beef and pork and the texts amply indicate that meat very well suited the Buddhist palate. Asoka, whose compassion for animals is undeniable, allowed certain specified animals to be killed for his kitchen. In fact, neither Asoka's list of animals exempted from slaughter nor the *Arthasastra* of Kautilya specifically mentions cow as unslayable. The cattle were killed for food throughout the Mauryan period.

Like Buddhism, Jainism also enthusiastically took up cudgels for non-violence. But meat eating was so common in Vedic and post-Vedic times that even Mahavira, the founder of Jainism, is said to have eaten the meat of a cockerel on one occasion.[12] Perhaps the early Jainas were not strict vegetarians. A great Jaina logician of the eight century, Haridhadrasuri, tells us that the monks did not have objection to eating flesh and fish, which were given to them by householders, though there is irrefutable textual evidence to show that meat eating became a strong taboo among the followers of Jainism. The inflexibility of the Jaina attitude to meat eating is deeply rooted in the basic tenets of Jaina philosophy, which, at least in theory, is impartial in its respect for all forms of life without according any special status to the cow. Thus, although both Buddhism and Jainism contributed to the growth of the *ahimsa* doctrine, neither seems to have developed the sacred cow concept independently.

Despite the Upanisadic, Buddhist and Jaina advocacy of *ahimsa*, the practice of ritual and random killing of animals, including cattle, continued in the post-Mauryan centuries. The law book of Manu (200 BC-AD 200), which is the most representative of the legal texts and has much to say on the lawful and forbidden

food, contains several passages on flesh eating, which have much in common with earlier and later Brahamanic juridical works. Like the earlier law books, it mentioned the animals whose flesh could be eaten. Manu's list includes the porcupine, hedgehog, iguana, rhinoceros, tortoise and the hare and all those domestic animals having teeth in one jaw only the only exception being the camel (V. 18); and, it is significant that the cow is not excluded from the list of edible animals. Eating meat on sacrificial occasions, Manu tells us, is a divine rule (*daivo vidhih smrtah*), but doing so on other occasions is a demoniac practice (V. 31). Accordingly one does not do any wrong by eating meat while honouring the gods, the Manes and guests (*madhuparka ca yajne ca pitrdaivatakarmani*), irrespective of the way in which the meat was procured (V.32, 41). Manu asserts that animals were created for the sake of sacrifice, that killing on ritual occasions in non-killing (V.39) and injury (*himsa*) as enjoined by the Veda (*vedavihitahimsa*) is known to be non-injury (V.44). In the section dealing with rules for times of distress, Manu recalls the legendary examples of the most virtuous brahmins of the days of yore who ate oxen and dogs to escape starvation (X.105-9). Manu's latitudinarian attitude is clear from his recognition of the natural human tendency of eating meat, drinking spirituous liquor and indulging in sexual intercourse, even if abstention brings great rewards (V.56). He further breaks loose the constraints when he says: "The Lord of creatures (Prajapti) created this whole world to be the sustenance of the vital spirit; both the immovable and the movable (creation is) the food of the vital spirit. What is destitute of motion is the food of those endowed with locomotion; (animals) without fangs (are the food) of those with fangs, those without hands of those who possess hands, and the timid of the bold. The eater who daily even devours those destined to be his food, commits no sin; for the creator himself created both the eaters and those who are to be eaten" (V.28-30). This injunction removes all restriction on flesh eating and gives an unlimited freedom to all desiring to eat animal flesh and since Manu does not mention beef eating as taboo one can infer that he did not treat the cow as sacrosanct. Manu contradicts his own statements by extolling *ahimsa* (X.63), but there is no doubt that he permitted meat eating at least on ritual occasions (*madhuparka, sraddha* etc) when the killing of the cow and other cattle, according to his commentator Medhatithi (9[th] century), was in keeping with the Vedic and post-Vedic practice (*govyajamamsamaproksitambhaksyed... madhuparkovyakhyatah tatra govadhovihitah*).[13]

Yajnavalkya (AD 100-300), like Manu, discusses the rules regarding lawful and forbidden food. Although his treatment of the subject is less detailed, he does not differ radically from him. Yajnavalkya mentions the specific animals (deer, sheep, goat, boar, rhinoceros etc) and birds (e.g. partridge) whose flesh could satisfy the Manes (1.258-61). According to him a student, teacher, king, close friend and son-in-law should be offered *arghya* every year and a priest should be offered *madhuparka* on all ritual occasions (I. 110). He further enjoins that a learned brahmin (*srotriya*) should be welcomed with a big ox or goat (*mahoksam va mahajam va srotriyayopakalpayet*) delicious food and sweet words. This

indicates his endorsement of the earlier practice of killing cattle at the reception of illustrious guests. Yajnavalkya, like Manu, permits eating of meat when life is in danger, or when it is offered in sacrifices and funerary rites (i. 179). But unconsecrated meat (*vrthamamsam, anupakrtamamsani*), according to him, is a taboo (I. 167, 171) and any one killing animals solely for his own food and not in accordance with the Vedic practice is doomed to go to hell for as many days as the number of hair on the body of the victim (I. 180). Similarly Brhaspati (AD 300-500), like Manu, recommends abstention from liquor (*madya*), flesh (*mamsa*) and sexual intercourse only if they are not lawfully ordained[14] which implies that whatever was lawful was permitted. The lawgivers generally accept as lawful all those sacrifices, which, according to them, have Vedic sanction. The sacrificial slaughter of animals and domesticated bovines, as we have seen, was a Vedic practice and therefore may have been fairly common among the Brahmanical circles during the early Christan centuries and even well into the later half of the first millennium AD. If would be, however, unrealistic to assume that the dharmic precept of restricting animal slaughter to ritual occasions was always taken seriously either by brahmins for whom the legal injunctions were meant or by other sections of society.[15] It is not surprising, therefore, the Brhaspati, while discussing the importance of local customs, says that in Madhyadesa the artisans eat cows (*madhyadese karmakarah silpinasca gavasinah*).[16]

The evidence from the epics is quite eloquent. Most of the characters in the *Mahabharata* are meat eaters and it makes a laudatory reference to King Rantideva in whose kitchen two thousand cows were butchered everyday, their flesh, along with grains, being distributed among the brahmins (III.208.8-9)[17]. Similarly the *Ramayana* of Valmiki makes frequent reference to the killing of animals including the cow for sacrifice as well as food. Rama was born after his father Dasaratha performed a big sacrifice involving the slaughter of a large number of animals declared edible by the Dharmasastras, which, as we have seen, sanction ritual killing of the kine. Sita, while crossing the Yamuna, assures her that she would worship her with thousand cows and a hundred jars of wine when Rama accomplishes his vow. Her fondness for deer meat drives her husband crazy enough to kill Marici, a deer in disguise. Bharadvaja welcomes Rama by slaughtering a fatted calf in his honour.[18]

The non-vegetarian dietary practices find an important place in the early Indian medical treatises, whose chronology broadly coincides with that of the law books of Manu and Yajnavalkya, and the two epics. Caraka (1st-2nd century). Susruta (3rd-4th century) and Vagbhata (7th century) provide an impressive list of the variety of fish and flesh and all three of them speak of the therapeutic uses of beef[19]. The continuity of the tradition of eating flesh including that of the cattle is also echoed in early Indian secular literature till late times. In the Gupta period, Kalidas alludes to the story of Rantideva who killed numerous cows every day in his kitchen.[20] More than two centuries later, Bhavabhuti (AD 700) refers to two instances of guest reception, which included the killing of a heifer[21]. In the 10th century Rajasekhara mentions the practice of killing an ox or a goat in honour of

a guest[22]. In the subsequent century Kathasaritsagar of Somedeva narrates the story of seven brahmin boys who ate a cow.[23] In the 12th century Sriharsa mentions a variety of non-vegetarian delicacies served at a dazzling marriage feast and refers to two interesting instances of cow killing[24], though, in the same century Somesvara shows clear preference for pig flesh over other meat types and does not mention beef at all.

While the above references, albeit limited in number, indicate that the ancient practice of killing the kine for food continued till about the 12th century, there is considerable evidence in the commentaries on the kavya literature and the earlier Dharmasastra texts to show that the Brahmanical writers retained its memory till very late times. Among the commentators on the secular literature, Candupandita (late 13th century) from Gujarat, Narahari[25] (14th century) from Telengana in Andhra Predesh, and Mallinatha[26] (14th-15th century), who is associated with the king Devaraya II of Vidyanagara (Vijayanagara), clearly indicate that, in earlier times, the cow was done to death for rituals and hence for food. As late as the 18th century Ghanasyama, a minister of a Tanjore ruler, states that the killing of cow in honour of a guest was the ancient rule.[27]

Similarly the authors of Dharmasastra commentaries and religious digests from the 9th century onwards keep alive the memory of the archaic practice of beef eating and some of them even go so far as to permit eating beef in specific circumstances. For example, Medhatithi (9th century), probably a Kashmirian brahmin, says that a bull or ox was killed in honour of a ruler or any one deserving to be honoured and unambiguously allows eating the flesh of cow (*govyajanamsam*) on ritual occasions[28]. Several other writers of exegetical works seem to lend support to this view, though some times indirectly. Visvarupa[29] (9th century), a brahmin from Malwa and probably a pupil of Sankara, Vijnanesvara[30] (11th century), who may have lived not far from Kalyana in modern Karnataka, Haradatta[31] (12th century), also a southerner (*daksinatya*), Laksmidhara[32] (12th century), a minister of the Gahadwala king, Hemadri[33] (late 13th century), a minister of the Yadavas of Devagiri, Narasimha/Nrsimha[34] (14th century), possibly from southern India, and Mitra Misra[35] (17th century) from Gopacala (Gwalior) support the practice of killing a cow on occasions like guest-reception and *sraddha* in ancient times. As recently as the early 20th century, Madana Upadhyava from Mithila refers to the ritual slaughter of milch cattle in the days of yore.[36] Thus even when the Dharmasastra commentators view cow killing with disfavour, they generally admit that it was an ancient practice and that it was to be avoided in the *kali* age.

While the above evidence is indicative of the continuity of the practice of beef eating, the lawgivers had already begun to discourage it around the middle of the first millennium when the Indian society began to be gradually feudalized leading to major socio-cultural transformation. This phase of transition, first described in the epic and Puranic passages as *kaliyuga*, saw many changes and modification in social norms and customs. The Brahmanical religious texts now begin to speak of many earlier practices as forbidden in the *kaliyuga*– practices which came to be

know as *kalivarjyas*. While the number of *kalivarjyas* swelled up over time, most of the relevant texts mention cow killing as forbidden in the *kali*. According to some early medieval lawgivers a cow killer was an untouchable and one incurred sin even by talking to him. They increasingly associated cow slaughter and beef eating with the proliferating number of untouchable castes. It is, however, interesting that some of them consider these acts as no more than minor behavioural aberrations like cleaning one's teeth with one's fingers and eating only salt or soil.[37]

Equally interesting is the fact that almost all the prescriptive texts enumerate cow killing as a minor sin (*upapataka*) and none of them describe it as a major offence (*mahapataka*). Moreover the Smrti texts provide easy escape routes by laying down expiatory procedures for intentional as well as inadvertent killing of the cow. This may imply that cattle killing may not have been uncommon in society and the atonements were prescribed merely to discourage eating of cattle flesh.

Although cow killing and beef eating gradually came to be viewed as a sin and a source of pollution from the early medieval period, the cow and its products (milk, curds, clarified butter, dung and urine) or their mixture called *pancagavya* had been assuming a purificatory role from much earlier times. The Vedic texts attest to the ritual use of cow's milk and milk products, but the term *pancagavya* occurs for the first time in the *Baudhayana Dharmasutra*. The law books of Manu, Visnu, Vasistha, Yajnavalkya and those of several later lawgivers like Atri, Devala and Parasara mention the use of the mixture of the five products of the cow for both purification and expiation. The commentaries and religious digests, most of which belong to the medieval period, abound in references to the purificatory role of the *pancagavya*. The underlying assumption in all these cases is that the *pancagavya* in pure. But several Dharmasastra texts forbid its use by women and the lower castes. If a sudra drinks *pancagavya*, we are told, he goes to hell.[38]

It is curious that the prescriptive texts, which repeatedly refer to the purificatory role of the cow, also provide much evidence of the notion of pollution and impurity associated with this animal. According to Manu (V. 125) the food smelt by the cow has to be purified. Other early lawgivers like Visnu (XXIII. 38) and Yajnavalkya (I. 189) also express similar views. The latter in fact says that while the mouth of the goat and horse is pure that of the cow is not. Among the later juridical texts, those of Angirasa, Parasara, Vyasa and so on, support the idea of the cow's mouth being impure. The lawgiver Sankha categorically states that all limbs of the cow are pure except her mouth. The commentaries on different Dharmasastra texts reinforce the notion of impurity of the cow's mouth. All this runs counter to the ideas about the purificatory role of the cow.

Needless to say, then, that the image of the cow projected by Indian textual traditions, especially the Brahmanical-Dharmasastric works, over the centuries is polymorphic. Its story through the millennia is full of inconsistencies and has not always been in conformity with dietary practices prevalent in society. It was killed and yet the killing was not killing. When it was not slain, mere remembering the

old practice of butchery satisfied the brahmins. Its five products including faeces and urine have been pure but its mouth has not been so. Yet through these incongruous attitudes and puzzling paradoxes the Indian cow has struggled its way to sanctity. But its holiness is elusive. For, there is no cowgoddess, nor any temple in her honour.[39]

Despite the ambiguous and contradictory statements about the inviolability of the cow, the Hindutva forces have been trumpeting the idea of its veneration as a characteristic trait of modern day non-existent monolithic 'Hinduism'. While the effectiveness of Dharmasastric injunctions remains largely a matter of speculation, the possibility of at least some members of society eating beef on the sly cannot be ruled out. As recently as the late 19th century Swami Vivekananda was alleged to have eaten beef during his stay in America, though he vehemently defended his action.[40] And in early twentieth century Mahatma Gandhi spoke of the hypocrisy of the orthodox Hindus who "do not so much as hesitate or inquire when during illness the doctor.... prescribes them beef tea."[41] Even today the practice of eating beef is quite common among the Dalits throughout the country which is why the members of upper castes in many parts of the country view it as impure and polluting. But beef is a common dietary item in most parts of the north-eastern India where it is not considered a source of pollution. Similarly, in the southernmost state of Kerala nearly 80% of the people including 72 Hindu communities (except the brahmins) eat beef in preference to the expensive mutton and lamb, despite the fact that the Hindutva forces have been persuading them to go easy on it.[42] Recent statistics show that the meat India produces most is beef (1.44 million tonnes beef, 2000) and buffalo meat (1.42 million tonnes in the same year) and the per capita consumption of cow/buffalo meat in India is 2.8 kg, which is more than twice the average intake of other types of meat. This is indicative of the fact that beef eating must be quite common among meat-eaters of all religions, including the Hindus[43]– a fact also supported by the surveys of butchers in different parts of the country.[44] Admittedly the above data cannot be considered adequate but if it is read against the background of the diverse opinions expressed in the normative texts the notion of Hindu identity based on beef prohibition remains as elusive as the sacredness of the cow.

References

1. L. L. Sundara Ram, *Cow Protection in India*, The South Indian Humanitarian League, George Town, Madras 1027, pp 122-123, 179-190.
2. Frederick J. Simoons, "Questions in the Sacred-Cow Controversy". *Current Anthropology*, 20(3), September 1979, p.468
3. *Frontline*, 13 April 2001
4. Rajesh Ramachandran, "A Crisis of Identity", *The Hindustan Times*, 7 May 2000.
5. J.C. Heesterman translates a passage of the *Kathaka Samhita* (8.7:90.10) relating to the *agnadheya* as: 'they kill a cow, they play a dice for [shares in] her, they serve her up to those seated in the assembly hall' : *Broken World of Sacrifice*, Chicago : University of Chicago Press, 1993, p.283, note 33.

Cultural Pasts and National Identity

K. N. Panikkar

That the making of national identity is a complex process is generally acknowledged, but the relative significance of different constitutive elements–political, social, economic and cultural–is a matter of fierce disagreement. Privileging any one of these elements can only lead to a partial view; in fact all of them are implicated, not in isolation, but as a part of an inter-related totality. In characterizing the national identity, however, culture is often foregrounded as the most significant factor, for nations may share common political institutions and economic organizations, but their cultural characteristics are generally distinct.

In articulating the relationship between culture and national identity culture of either the dominant or of the religious majority is often universalized as that of the nation. The nationalist icons are culled out from the pantheon of the 'cultured' or from the tradition of the majority. The popular motifs of the Indian nation, for instance, are invariably invoked from the classical art or the texts of upper caste religion. Such an identity excludes the cultural practices of the marginalized. An exclusivist view of cultural identity is thus foregrounded, which given the immense variety in cultural practices in India, leads to a disjunction between the national and the popular. Moreover, whichever form the exclusion takes–class, caste or religious–tends to violate the culture of other sections of society, leading to cultural oppression and denial. This is particularly true of the ongoing attempt to construct a national identity based on Hindu religious cultural past.

With the emergence of communalism as an ideology of political mobilisation, the concepts of nation and nationalism have become matters of contention. Their meaning is being reordered and their character is redefined, thereby raising the question about the relationship between the cultural past and national identity. The era of enlightenment, the coming of modernity and the early phase of the national liberation struggle had witnessed a critical introspection about this relationship. Both individuals and society were then engaged in identifying their cultural location, which was largely recognised within the context of the plural and composite cultural legacy. The quest then was to create a nation out of the diverse groups owing allegiance to different racial, linguistic and religious affiliations.

These culturally distinct groups are the 4635 communities identified by the Anthropological Survey of India, diverse in biological traits, dress, language,

forms of worship, occupation, food habits and kinship patterns. They belong to a variety of races, drawing from almost every stock in the world. The followers of several religions and their sects co-exist in India, pursuing their distinct worship patterns and belief systems. The number of dialects and languages in use also reflect the social and cultural plurality. Apart from thousands of dialects there are as many as 325 languages and 25 scripts derived from various linguistic families. The identity of India as a nation is a consequence of the coming together of people with such diverse social and cultural traits.

The coming together, however, is a long historical process in which the evolution of political institutions, social relations, economic production, cultural practices and intellectual engagements are implicated. Without these objective conditions, which enable the people to relate with each other the nation can neither be 'imagined' nor its character constructed. Among these objective conditions the cultural past or more accurately, cultural pasts, are often overlooked, as in the case of the politics centered analysis of anti-colonial struggle, or privileged as in the culture centered interpretation of nationalism. The latter has a particularly powerful *avatar* in the currently popular notion of cultural nationalism. It is undeniable that the identity of the nation can not be divorced from its cultural past, but given the internal cultural differentiation and the convergence of various cultural streams in Indian society the cultural past is not monochromatic in its make up. Attributing to it a monochromatic character, drawing upon religious, caste or class practices, is likely to negate the assimilative tendencies present in the cultural life of the past which in turn would lead to an identity that is not national but sectarian.

Nation in Search of Itself

The formation of national identity is not an event, but a process, a process which Fernand Braudel described as follows:

> A nation can have its *being* only at the price of being for ever in search of itself, for ever transforming itself in the direction of its logical development, always measuring itself against others and identifying itself with the best, the most essential part of its being; a nation will consequently recognise itself in certain stock images, in certain passwords known to the initiated (whether the latter are the elite or a mass of people, which is not always the case); it will recognise itself in a thousand touchstones, beliefs, ways of speech, excuses, in an unbounded subconscious, in the following together of many obscure currents, in a shared ideology, shared myths, shared fantasies. And any national identity necessarily implies a degree of national unity, of which it is in some sense the reflection, the transposition and the condition[1].

The 'nation ever in search of itself', Braudel suggests, is bound up with a variety of factors, which contribute to the making of its identity. It is a complex process in which the conception of the people about themselves and their environment, the

organization of their social life and the constitution of their ideological world are important ingredients. In other words, how people perceive themselves as belonging to an identifiable entity, in relation to others, possessing certain essential qualities and recognizable through widely shared images. Such a perception of the nation is intrinsically linked with historical experience, changing over a period of time according to the realities of social existence. The formation of national identity is therefore a process by which the people come to share, imagine and believe in certain common interests and traits. The nation is not born, it evolves In this process, culture conceived as a dynamic, ever changing entity, is a crucial element.

The Setting: Geographical and Historical

Even if a nation can exist and survive without territory, a nation can come to its own only in the context of its territory. The territory of a nation, however, is not given; it is both culturally conceived and politically constituted[2]. The former is intrinsically interlinked with geographical knowledge and cultural experience whereas the latter is related to the control of the territory and the organization of administration. The knowledge of territory depends upon social experience; ever changing according to man's engagement with nature and his access to new technologies. During ancient periods of history, his social horizon was confined to his immediate surroundings and therefore he could hardly conceive of a large landmass as a unit to which he belonged. Only when such local knowledge coalesces due to social and political experience a geographically earmarked territory is conceived as a single unit. In the same territory that forms the limits of a nation, historically speaking, highly fragmented knowledge of geography exists.

The knowledge of the territory constituting India as a nation has also evolved over a period of time. This evolution can be understood in two ways. First, the different stages through which the subcontinent was identified as a territorial unit as spelt out in different texts, produced by elite groups or individuals. Second, is a more difficult and demanding effort: mapping the understanding of the variety of people who inhabited different parts of India.

The earliest expression of the knowledge of the territory of the subcontinent can be traced to the Vedic period. At that time the territorial conception, as evident from the river hymn, did not embrace the whole subcontinent.[3] The Rig Veda contains references to twenty-five streams, most of which belong to the Indus river system. On the basis of the geographical information available in the Rig Veda it is reasonable to assume that the Aryans did not know the country beyond the Vindhya Range and the Narmada. The concept of Aryavarta was confined to the territory between the Himalayas and the Vindhyas. The unfamiliarity with the southern part of India continued till the early Buddhist period. Therefore, it is doubtful, as Radha Kumud Mukherji holds,[4] that the river hymn of the Rig Veda 'presents the first national conception of Indian unity'. The Prithvi Sutra in Atharva Veda, as evident from the homage to the rivers, does not take any further.[5]

The southern part of the subcontinent came into reckoning only during the later Vedic period. Aitreya Brahmana refers to different people of the South as living on the borders of the Aryan settlements.[6] The Ramayana and the Mahabharata further extends the territorial limits. The Kishkhinda Kandha in Ramayana contains a fairly broad conception of India as a whole, setting it off from the surrounding countries.[7] A more intimate and elaborate knowledge of the territory is in Mahabharata. The Bhishmaparva lists 200 rivers, among which are mentioned the rivers in south India such as Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, Narmada, Krishnaveni, Vena and Tunga-vena. It also mentions 157 peoples belonging to northern India and 50 peoples to the south.[8] This detailed information is significant enough, but more important is the conception of the subcontinent as a geographical unit, by envisioning it as an equilateral triangle, divided into four smaller equal triangles, the apex of which is Kanya Kumari and the base formed by the line of the Himalaya Mountains.

By the time of the Maurayan rulers the notion of the subcontinent as a territorial unit was well marked. The Arthasastra, which contains considerable information about the economic products of the various parts of India, is a good index of this development. So are the edicts and inscriptions of Ashokà, which has information about the states in the south, the west, the northwest, and the Deccan[9]. A view has therefore prevailed that by the end of the first millennium BC the 'knowledge of all parts of India was a common possession, a content of the popular geographical consciousness'.[10]

Such a view about 'popular geographical consciousness' raises several questions. Firstly, being arrived at from an Indo-Gangetic centered perspective whether it reflects the knowledge of the territory among the people inhabiting other parts of the subcontinent. The conception of the territory developed by the people of South India, for instance, was neither simultaneous with that of the people of the North nor did they receive and internalize the knowledge generated elsewhere. The early notices in the Sangam literature, just like the Rig Veda, point to a geographical knowledge limited to the immediate surroundings. However, the knowledge of the subcontinent as a territorial unit does not seem to be part of the Tamil consciousness before the seventh century.[11] If that is so, the territory of the subcontinent entered the historical consciousness of the people at different points of time and therefore not a part of uniform national memory.

However, without subscribing to a theory of geographical determinism, it is possible to suggest that the conception of the subcontinent as a territorial unit had an abiding influence on political vision and practice. 'There is no country', observes historian Beniprasad, 'marked out by the sea and the mountains so clearly to be a single whole as India. This geographical wholeness explains one of the central features of Indian history, the urge to political unification in defiance of vast distances and immense difficulties of transport and communication'. This does not imply that political organization always coincided with the territorial limits of the subcontinent. On the contrary, it hardly happened till the colonial subjugation when the entire subcontinent was brought under one political

authority, either through direct or indirect rule. Nevertheless, the political tendencies have been to integrate the entire subcontinent under a single authority. The political history of India is characterized by a continuous cyclical process, centrifugal on the one hand and centripetal, on the other.

The sixteen janapadas in the north and several *nadus* in the south can be reckoned as the early political formation of significance. The empire established by Ashoka incorporated the janapadas and extended its limits to the south, bringing into being for the first time a political formation that sought to reach out to major parts of the subcontinent. The Mauryan Empire was so vast that it could hardly sustain its control for long and was soon replaced by smaller states. Under the Guptas the limit of the empire was again stretched to approximate the territory of the subcontinent, through the conquest of Chandra Gupta and Samudra Gupta. The empire of the Guptas suffered the same fate of disintegration that had earlier beset the Mauryan. Such a process of integration and disintegration continued to mark the political history thereafter, as evident from the way in which the map of India was drawn and redrawn during the Sultanate, the Mughal and the British rule.

The cultural make up of the nation is enmeshed with this political process. For, the integrative-disintegrative tendencies of Indian polity, cyclically manifested for two thousand years, brought about 'regional' cultural formations as well as inter-regional cultural transactions. The empires, however, tended to be strong centripetal forces, culturally and socially, enabling diverse elements to come together and interact with each other. Such a tendency was not reflected in the convergence of artistic talent in the courts of powerful emperors alone, but more so in the assimilative cultural ambience that developed in capital cities where patronage was available.

The disintegration of empires and the consequent formation of 'regional' states opened up channels of inter-regional social and cultural penetration. The decentralization of patronage facilitated the process, as represented by miniature painting and architecture during the decline of the Mughal Empire. As a result, social and cultural life in India incorporated within it a multi-regional and multi-religious form and content. This interpenetration of cultural influences was neither uniform nor equally intense in all regions. Yet their presence is marked all over. As a result, although historically cultural transactions and social negotiations embraced the entire sub-continent, they led to variety and plurality rather than to uniformity and homogeneity. In almost all realms of cultural production-music, drama, painting, architecture, literature and so on–as well as religion, different influences made their mark, imparting to them a composite character. As a result, historically India developed as a colourful cultural mosaic and not as the manifestation of cultural practices inspired by a single source. The dynamism of Indian culture is derived from this diversity, which moulded the cultural practices of the people. It is in this sense that culture was embedded in national identity.

The cultural implication of this historical process is not limited to diversity and plurality at the national level, but within each region itself. The followers of

the same religion observe vastly different rituals and worship patterns in the same region. There is hardly anything common in the rituals at the time of marriage and death among different communities belonging to the same religion. Their modes of worship also differ. That is also true of the creative realm. In fact, each community has different cultural practices, even if they belong to the same religious denomination. Culture and religion after all is not synonymous in any society, even if they draw upon each other. This is particularly so in India where the differentiation within Hinduism has given rise to very sharp social distinctions.

The coming together of people of diverse cultural moorings and traditions had several cultural consequences. They have been variously conceived as synthesis, assimilation, acculturation and eclecticism. It is argued that any one of them can hardly be privileged, as all of them have contributed in varying degrees to the cultural identity of the nation. A contrary view, currently gaining currency, posits a sharp contradiction between different cultural streams, which has nothing in common except mutual antagonism. The indigenous culture, it is held, has been engaged in resisting the adverse effects of external intrusion and preserving its identity without any change. Whether India developed as a melting pot of cultures, creating a new cultural personality or has it remained a salad bowl is no more the issue. The crucial question is whether Indian culture is conceived as a static phenomenon, tracing its identity to a single unchanging source or a dynamic phenomenon, critically and creatively interrogating with all that is new.

What is new, however, was very many in Indian cultural experience. From the time of the invasion of Alexander in 327BC till the British colonial rule various cultures of the world marked their presence. The Greeks, the Huns, the Khusans, the Arabs, the Turks, the Mongols and the Europeans reached India in pursuit of power and pelf, but carrying with them their cultural baggage. The interaction that followed embraced almost all aspects of life, be it religious practices, food habits, dress codes, architecture, painting music or scientific knowledge. The nature and result of this interaction has been a very decisive factor in the making of the cultural identity of the nation. The indigenous culture did not remain isolated; it internalized various streams from outside, enriching and transforming its own cultural practices.

The nationalist interpretation of history, reflecting the aspirations and interest of the national liberation struggle, underlined synthesis as the main character of this interaction. The most representative of this view is that of Tarachand who was selected by Jawaharlal Nehru to project the Indian version of history, opposed to the colonial view in British universities and who later wrote the multi-volume history of the Indian national movement. Tracing the impact of the interaction in art and religion Tarachand comes to the following conclusion:

> The Muslims who came to India made it their home. They lived surrounded by the Hindu people and a state of perennial hostility was not possible. Mutual intercourse led to mutual understanding. Many who had changed their faith differed little from those whom they had left. Thus

> after the first shock of conquest was over, the Hindus and Muslims prepared to find a *via media* whereby to live as neighbours. The effort to seek a new life led to the development of a new culture, which was neither exclusively Hindu nor purely Muslim. It was indeed a Muslim-Hindu culture. Not only did Hindu religion, Hindu art, Hindu literature and Hindu science absorb Muslim elements, but the very spirit of Hindu culture and the very stuff of Hindu mind were also altered, and the Muslim reciprocated by responding to the change in every department of life.[12]

Such a view was generally shared by the nationalist intelligentsia, engaged at that time in search of a common denominator in a multi religious society, which they identified in a composite culture historically evolved through continuous interaction and mutual influence. Jawaharlal Nehru, for instance, described Indian culture as a palimpsest, on which the imprint of succeeding generations have unrecognizably merged.[13] Such a view of ideal synthesis have many skeptics, yet it is true that the cultural life of the people did comprehend different tendencies from a variety of sources. As Humayun Kabir has observed, 'anybody who prides today in the unadulterated purity of his Hindu culture or his Muslim heritage shows a lamentable lack of historical knowledge and insight'.[14] No other area reflects the significance of mutual influence than the religious movements during the medieval times.

Religious Ideas and Movements

Much of the ideas advanced by the religious movements in the medieval times are derived from a multi-religious context. They reflect the intellectual response in the wake of the coming of Islam to India and the social, cultural and intellectual interaction it occasioned. In almost all spheres of social existence the impact of this coming together has been experienced. The result has been conceptualised as synthesis by many..

The case for cultural synthesis is often overstated as a part of nationalist romanticisation necessary for a people to close their ranks at the face of colonial subjection. Nevertheless, the multi-religious presence gave rise to a serious engagement with the universal, which in some form or the other already existed in all religions. The Upanishad provides an early articulation of this: 'As the different streams having their sources in different places all mingle their water in the sea, so, O lord, the different paths men take through different tendencies, various though they appear, crooked or straight, all lead to thee.' Quran says it in different words: 'O mankind! We have created you from a single pair of male and female, constituted into diverse peoples and nations that you may know and cooperate with one another.' Both Bhakti and Sufi movements were anchored in such a universalist perspective, and sought to incorporate common elements from different religions. As a result they attempted to erase the distinctions that separate religions as irreconcilable systems with incompatible structures of belief.

The Sufi orders in India made substantial contribution in this direction by reaching out and incorporating the religious ideas from the Hindu philosophical system. The translation of Hindu religious texts were undertaken from the time of Al-Beruni in the eleventh century and pursued extensively under royal patronage during the Mughal rule. Among the many who helped the dissemination of Hindu religious ideas among the Muslims the contribution of Dara Shikoh who translated the Ramayana, the Gita, the Upanishads and Yogavasihta is the most well known. But there were several others who pursued the universalist path by trying to understand the essence of Hinduism. For instance, Mirza Jan-I- Janan Mazhar who received the robe of permission from three different orders commended the religious ideas in Hindu scriptures to his disciples:

> You should know that it appears from the ancient book of the Indians that the divine Mercy, in the beginning of the creation of human species, sent a book, named the Beda (Veda) which is in four parts, in order to regulate the duties of this as well as the next world, containing the news of the past and the future, through an angel and divine spirit by the name of Brahma who is omnipotent and outside the creation of the universe.[15]
> If Sufism brought Islamic thought to become sensitive to Hinduism Bhakti movement explored the universal spirit in religious philosophy and practice. In doing so it transgressed all forms of particularism to explore the truth inherent in all religions. The concept of impersonal God which the nirguna Bhaktas shared with the vedantins enabled them to underline the unity rather than differences. However, unlike the vedantins the nirguna Bhaktas like Kabir opposed the worship of personal deities and disapproved of idol worship and all rituals connected with it They sought religious truth not through religious practices, but through submission to an impersonal god. Therefore they looked beyond the existing religious practices to achieve communion with god who is omnipresent and not confined within the places of worship[16].

Raising devotion to a high level of spirituality and recognizing the significance of submission, devoid of rituals and superstitions, the Bhakti movement tried to redeem the relation of the true seeker with God. In doing so the Bakhtas tried to overcome all religious differences and invoked a true universal belief. Therein lies the significance of the Bhakhti movement as an important marker in the construction of national identity. The universalist ideas inherent, in the Bhakti movement found rearticulation thereafter, though not as a linear development. Akbar, even if unsuccessfully, tried to bring together the essence of all religions and to initiate a new faith in Din-I-Ilahi. The nineteenth century reformers with a deep interest in comparative religion believed in the unity of godhead and advocated that all religions are true as an expression of one universal truth. Brahma Samaj founded by Rammohan Roy was intended to be a universal theistic church that his successor, Keshab Chandra Sen institutionalized as Nabha Bidhan with the symbols of Hinduism, Islam and Christianity on its masthead. In

our own times Gandhi articulated it most emphatically: 'I believe with my whole soul that the God of Koran is also the God of Gita, and that we are all, no matter by what name designated, children of the same God.' A sense of religious universalism was not only a part of Indian intellectual tradition, but was also integral to the religious practices of the common folk, as testified by the worship of deities and saints by people belonging to different faiths. As a consequence syncretic practices have flourished all over the country, bringing the Hindu and Muslim religious beliefs and practices closer. Such a perspective contributed to religious reconciliation and respect, which form the basis of Indian secularism and of national identity.

Whether the national is popular, to borrow a terminology from Antonio Gramci, would depend the nature of identity of a nation. Generally the nation is the preserve of the dominant and therefore identified with the culture of the dominant. Thus the culture of the dominant caste or religion becomes the marker of national identity. A change can occur only with the democratisation of society, which can effect the emancipation of social institutions and cultural practices from domination. The Bakhti movement represented such a process in as much as it contributed to the cultural empowerment of the non-elite sections of society by vernacularisation on the one hand and championing the emancipation from the caste restrictions on the other. The language they employed was accessible to the common man compared to the earlier sanskritised diction, both in literature and philosophical discourses. Such a tendency was prevalent in the Bhakti compositions all over India – in Basava in Karnataka, Namdev in Maharashtra, Kabir in Uttarpradesh and Poonthanam in Kerala. The legend that Lord Krishna preferred the devotion of Poonthanam who wrote in the vernacular to the scholarship of Meppathur Bhattatiripad, a Sanskrit scholar, was an expression of the emergent literary culture. Vernacularisation, however, was not purely a shift in the mode of communication, but the representation of social assertion. It brought into being a new idiom through which protest, dissent and resistance could be effectively articulated. For the language of the dominant can hardly be an effective weapon to challenge the dominance itself.

The internal differentiation within the society represented by caste division was a concern, in both concept and practice, of the Bhakti movement, engaged as it was in the creation of an egalitarian order. Rejecting caste as a principle of social organization, the Bhaktas questioned its social relevance and sought to undermine it in practice. Let no one ask a man's caste was a slogan shared by many. In practice they transcended all barriers and practices and renounced all rituals and superstitions. Rejecting caste distinctions they emphasised equality and commonness[17].

The creation of casteless communities, either temporary or permanent, in which the followers of Bhakti saints congregated, was the practical manifestation of the attitude towards caste. The Kabir Panthis, for instance, had a casteless existence in their *chaurahas*; so did the followers of Dadu, Raidas and Nank. The heterodox sects like the Satnami, Appapanthi and Shivnarayan sects in

Uttarpradesh, the Karthabhajas and Balramis in Bengal, the Charandasis in Rajasthan and Virabhramas in Andhra Pradesh were strongly opposed to all caste distinctions. The Karthabajas met in congregations twice a year in which no caste distinctions were observed: they ate together as equals and addressed one another as brother and sister. The nineteenth century reform movements carried the tradition forward. The anti-casteism was an important agenda of almost all reformers, even if compromises were not unusual in actual practice. As A.R. Desai has argued the movement against caste distinctions was the earliest expression of democratisation in Indian society[18].

The medieval religious movements had two significant legacies: religious universalism and social egalitarianism, developed in the context of a multi religious society. Both found further articulation and elaboration in the religious and social thought during the colonial period. However, the movements generated by these ideas developed within them mutually contradictory tendencies. Initially all of them were reformist in nature, seeking to change the cultural practices, which were not in conformity with reason and humanism. As a result worship patterns, marriage procedures and death rituals of religious and caste communities were substantially altered. The reform agenda of Brahmo Samaj, Arya Samaj, Nair Service society and a host of other movements incorporated these changes. Over a period of time, however, these movements became increasingly inward looking leading to internal solidarity and cohesion and the consciousness they generated remained within the boundaries of caste and religion. This transformation within social movements facilitated the construction of homogenous communities, attempting in the process to erase the internal cultural differences within the community.

Community as the Site of Identity

The community has proved to be a useful tool for a variety of political and ideological interests. Colonialism invoked it to deny the national identity of the colonized. If the society is made up of well-defined communities, mutually antagonistic and in a state of perpetual conflict, national identity is hardly possible. The constant refrain of the colonial writings, from James Mill to Valentine Chirol, invariably harped on this theme. To Chirol, for instance, India was an antithesis to what the word national implies, for the population of India consisted of 'the variegated jumble of races and peoples, castes and creeds'[19] ' The nationalist view of communal ideologues is remarkably similar to that of the colonial in their conception of the composition of Indian society. They make a distinction between those who were 'born from the womb and those who were adopted', suggesting two categories of citizens on the basis of birth. The notion of Hindutva which V.D. Savarkar invented and currently pursued by the Hindu communalists is an elaboration of this distinction[20]. A communitarian view also informs the post – modern paradigm, without sharing the assumption of the communal and the colonial. They tend to valorize the pre-modern and indigenous communities, regarding them as 'given, fixed, definitely structured and bounded groups' and

attribute to them certain autonomy, which deserves to be nourished and given latitude for making decisions in matters internal[21]. The notion of homogenous communities straddles the colonial, the communal and the post-modern. It is used by the colonial to deny national identity, the communal to construct religious nationalism and the post-modern to discount the relevance of the nation state.

The history of communities, either of caste or religious, does not testify to a unilinear and uninterrupted progress from the time of their formation to the present day. The communities were constantly in a state of flex, constituting and reconstituting themselves, with changes in their social composition and cultural practices. Moreover, the solidarity of communities were fractured by internal movements as in the case of the Brahmo Samaj and Arya Samaj among the Hindus and the Wahabis and the Farazis among the Muslims or the innumerable heterodox sects which made their appearance in different parts of the country. More importantly, even within a community differences of language, dress, food and social customs tended to create fragmented consciousness within overarching ideological belonging. Such cultural consciousness might remain muted or suppressed for a long time, but do find articulation at different historical moments. Such moments appear in the history of every nation, particularly of those constructed on the basis of a single identity, leading to the undoing of the nation itself. It is rather difficult to erase the memory of cultural identities by solidarities created by religious or racial loyalties.

The internal fissures, both economic and cultural, however, did not prevent the process of integration and consolidation of the communities. Among the Hindus it can be traced to a search for shared intellectual and cultural sources through philosophical 'conquests' as in the case of Adi Sankara's *digvijaya*. The significance of Sankara's 'conquest' was not limited to the sectarian triumph or the establishment of monism as a superior system, but of providing a common point of reference and intellectual rationale for forging a Hindu identity. 'He had put into general circulation', as stated by Radhakrishnan, a vast body of important knowledge and formative ideas which, though contained in the Upanishads, were forgotten by the people, and thus recreated for us the distant past'[22]. The latter lawgivers and religious commentators furthered the process by elaborating and disseminating the religious ideas. Such efforts were given emotional support by religious institutions and pilgrimage centres and social support was derived from the patronage of the rulers and social elite. The neo-Hinduism of the nineteenth century which attempted religious revival and consolidation by privileging the hegemonic texts of the Hindus and thus constructing a common cultural and intellectual heritage was a continuation of this tradition. The contemporary religious resurgence not only draws upon this past, but also seeks to resurrect institutions and cultural practices from that past. In the process a highly differentiated 'community' is being turned into a homogenous entity. The Hinduisation of the adivasis and dalits by incorporating them into upper caste worship patterns and religious rituals is a part of this project. The increasing influence of Hindutva among the Adivasis and Dalits indicates that they have not

become sufficiently sensitive to the possible loss of their cultural identity.

Similar tendencies are manifest among the Muslims as well. A highly differentiated community, particularly because of its formation through conversions, has been put through a process of Islamisation. As a result a common identity based on religion is gaining precedence. It is reflected in all cultural practices, ranging from dress to architecture. The skullcap and burqa have appeared in regions were they were not earlier prevalent. The style of mosque architecture has undergone fundamental changes during the last few years: the influence of the local has been renounced in favour of the pan Islamic. Such a shift is a reflection of a general move towards conservatism and fundamentalism from the early modernizing reform movements. As a result internal cultural differences have been considerably erased and an identity between culture and religion constructed in popular mind.

No society, least of all a society as diverse as that of India, is amenable to a single cultural denominator, either of caste or of religion. Superimposing an identity drawn from a single source by a 'nation in search of itself' is pregnant with peril, as any exclusion would lead to cultural denial and oppression and consequent resistance and protest, endangering thereby the well being of the nation itself. Such a prospects looms large on the Indian horizon, as the communal forces are currently engaged in recasting the identity of the nation in religious terms. This militates against the historical experience of India, which has paved the way for the assimilation of different religious faiths and cultural practices. A reverse process is currently on the anvil : to flush out all external accretions in order to resurrect an authentic and ideal cultural past. Hence the romanticisation of Vedic culture and knowledge. No nation can face the future, as Tagore said, with the notion that a 'social system has been perfected for all times to come by our ancestors who had the super human vision of all eternity, and supernatural power for making infinite provision for future ages'[21]. The fear expressed by Tagore is a contemporary reality, as the social and ideological project of the Hindutva is anchored on such a view of the past which is likely to lead the society to obscurantism, despite the promises of modernity that globalisation holds out at least to a section of the society.

The evolution of national identity in India is a result of a long process of inclusion of cultural practices, either internally generated or originating from outside. The cultural past of India is therefore a celebration of the consequent variety and plurality, although there were tendencies, which tried to negate them. The Renaissance and the national movement recognised the positive significance of cultural plurality for national identity and sought to further the syncretic tendencies already prevalent in the social and religious life. Hence the nationalist notion of unity in diversity. In contrast, the religious revivalism promoted by the advocates of neo Hinduism in the nineteenth century and the cultural nationalism of the Hindutva attributes an exclusively Hindu religious affiliation to Indian culture The national identity and nationalism, in this conception, are therefore rooted in an essentially religious in character of culture. It is indeed true that

national identity neither evolves nor exists without a cultural basis. Yet, it is not an exclusively cultural phenomenon either, nor is culture identical with religion. Therefore a rearticulation of the meaning of the relationship between culture and national identity, at the face of the serious threat paused by cultural nationalism to the identity of the nation is called for. This is perhaps one among the many constructive tasks ahead of secularism, if the Indian Republic is to preserve its democratic character.

Notes and References

1. Fernand Braudel, *The Identity of France*, London, 1989, Vol.1, p.23.
2. For an insightful analysis of the complex way in which the territory is constituted see Jacques Revel, 'Knowledge of the Territory', *Science in Context*,4,1 (1991), pp.133-161
3. The river hymn states as follows: Ye Ganga, Yamuna, Saraswati, Sutudri and Parushini, receive ye, my prayers! O ye Marudvidha, joined by the Asikin, Vitatsa and Arjikiya joined by the Sushoma, hear ye my prayers.
4. Radha Kumud Mukherji, *The Fundamental Unity of India*, p. 35, Bombay, 1954
5. Radha Kumud Mukherji, *Nationalism in Hindu Culture*, London, 1921, p.20
6. Ibid.,p.68
7. Ibid.,p.75
8. Ibid., pp.74-76
9. Romila Thapar, Asoka and the Decline of the Mauryas, Delhi, 1973.
10. Ibid
11. N.Subramanian, *Pre-Pallavan Tamil Index*, Madras 1966
12. Tarachand, *Influence of Islam on Indian Culture*, Allahabad, 1963, p.137
13. Jawaharlal Nehru, The Discovery of India, London,1956,p.46.
14. Humayun Kabir, *The Indian Heritage*, New Delhi, 1946, p.82.
15. Quoted in John A Subhan, *Sufism, Its Saints and Shrines*, New Delhi, 1999, p.138.
16. Kabir gave forceful expression to this:
    Where does thee seek me, oh slave
    I am indeed near thee,
    I am not in the temple, nor in the mosque,
    Neither in Kabha nor in Kailash
    If thou art a true seeker
    I shall meet thee immediately, in a moment's search.
17. Kabir, for instance, rejected the very notion of caste distinction;
    Same is the semen, skin, urine
    Same is the blood and bone
    From single source we all are born
    How one is Sudra, the other a Brahman?
    All are born as human beings
    That is what we all know
18. A.R.Desai, *Social Background of Indian Nationalism*

19. Valentine Chirol, *The Indian Unrest,* London,1911,p.6

20. Savarkar Wrote: ' The Hindus are not only a nation but also a race–a jati. The word Jati derived from the root Jan to produce, means a brotherhood, a race determined by a common origin-possessing a common blood. All Hindus claim to have in their veins the blood of the mighty race incorporated with and descended from the Vedic fathers, the Sindhus.' *Hindutva,* New Delhi, 1939, pp. 84-85

21. See Partha Chatterji, 'Secularism and Toleration' and Akeel Bilgrami, 'Two Concepts of Secularism' in Economic and Political Weekly, xxix, 28 July, 1994. For a critique of this view see Sumit Sarkar, ' The Anti-Secularist Critique of Hindutva: Problems of a shared Discursive Space, Germinal Vol.1,1994,pp101 10

22. S.Radhakrishnan, Indian Philosophy, Vol.2. New Delhi, 1999, p.658

23. *The English Works of Rabindranath Tagore*, Vol.2, p.462, New Delhi 1996

Historicism And Revolution

Prabhat Patnaik

I shall attempt in this paper to raise some issues which used to be much in vogue in my student days. Even though these issues may not be very fashionable among historians today, I do believe that they are of considerable theoretical importance, at least for those who have not given up the dream of building a better society, where the acute deprivations of today would have disappeared. To my mind such a society cannot but be a socialist society, and hence I use the term "revolution", which occurs in the title of my address, to refer to the process of transition to a socialist society, entailing very different property relations from what we have today. I shall not be concerned, however, with the precise nature of the struggles that would constitute this revolution, or the precise contours of the socialist society that we should attempt to build in the light of the historical experience of socialism; my concern in this paper is with theoretical issues of a very different kind.

I

The term "historicism", as is well-known, has been used in two very different, and indeed almost diametrically opposite, senses. There is the sense in which Karl Popper (1957) used it, to refer to the view, which he attributed to Hegel and Marx, "that history has a pattern and a meaning that, if grasped, can be used in the present to predict and fashion the future"[1]. Popper saw historicism as a progenitor of totalitarian politics, and its proponents as "enemies of the open society", whose attempt to push society into a mould which they believe to be historically inevitable could not but lead to dictatorship.

There is, however, a second sense in which the term "historicism" has been used. And this refers to the view, held by number of "Western Marxists" such as Gramsci (1973), Lukacs (1971) and Korsch (1970), that theoretical development is itself conditioned by the historically changing context. There is only one history, from which there is no stepping out, which shapes both material conditions as well as ideas deriving from them and in turn acting upon them. Historicism in this sense should not be confused with a crude historical materialism; it is very much in conformity with a materialism that recognizes the primacy of praxis.

These two notions of historicism are in a sense opposed to one another. The second makes ideas historically relative, while the first, by insisting on a pattern in history, makes the idea which comprehends this pattern a not-relative one. If one believed in the second conception then even the conception of a pattern in history would be a historically relative conception, something which is thrown up at a particular juncture and has no validity transcending that juncture.

I shall not, however, dwell further on these divergent meanings attributed to the term. In my view, "historicism" in either sense is different from a "science of history", "historicism" in neither sense is essential to the argument about the necessity or the imminence of a revolution against the bourgeois order; and it is only a non — "historicist" perspective that can possibly underlie theoretically the kind of revolution that is on the agenda in the under-developed societies. I shall devote the present lecture to developing these propositions.

II

Let me discuss briefly the first notion of historicism before moving on to the second. Popper's critique of what he called historicism has been much critiqued, in the sense that his absolute insistence that there *can* be no pattern but only a set of separate, independent developments, on a reading of which one can advocate not a revolution but piecemeal social engineering, has called forth powerful rejoinders. E. H. Carr's *What is History?* (1964) is one such rejoinder. More recently, Professor Irfan Habib (2003) has argued, with a great deal of persuasiveness, that discerning a pattern in history, treating history not as one incident after another, but as something which becomes explicable, is methodologically a perfectly sound procedure.

There are at least three levels at which one can join issue with Popper. First, Popper's notion of a scientific proposition, with which his critique of "historicism" (in his sense) is closely tied up, is too narrow, and does not correspond to actual theoretical practice in science. "Refutability", the criterion which he insists upon in a scientific proposition, is itself a complex concept. It is not like a weighing machine on the basis of which one can immediately assess the scientific content of particular theories. Rather, the precise meaning of "refutability" in the context of any theory, which is a set of inter-linked propositions, has got to be worked out, so that passing judgements on whether a theory is "refutable" or not, is itself highly problematical. Indeed on Popper's criterion, not only Marxism which attempts to develop a science of history, but psychoanalysis, astronomy and several other disciplines would simply not qualify as science. Consequently, Popper's rejection of "historicism" which implies a rejection of any science of history, should not be given much credence.

Secondly, there is a fundamental difference between Hegel and Marx which the Popperian perspective, because of its own inherent limitations, illegitimately obliterates. Seeing an abstract pattern in history as Hegel did is not the same as opening up history in its totality for scientific analysis which was Marx's project. The Popperian perspective, by obliterating this basic difference, also obliterates a whole range of other differences bound up with it. For instance it obliterates the distinction between not-directly-observed structural concepts and metaphysical concepts, by calling both sets of concepts "metaphysical". Marx's concept of labour values is a concept of the former kind. It is not directly observed, but, according to Marx, it is a structural concept, which underlies the prices of production, which in turn constitute the "centre of gravity" for the

directly observable market prices. Now, whether Marx was right or wrong in saying what he did about "labour values" can be debated as indeed in has been, but "labour values" as a concept is fundamentally different from "absolute spirit" as a concept: it is a tangible, quantifiable, precise, and even though not directly observed, is theoretically observable (e.g. under simple commodity production). To call both of them indiscriminately as "metaphysical" is both indefensible and indicative of an extraordinary narrowness of conception.

Thirdly, and most pertinently from my point of view here, the case for a revolution does not necessarily rest upon an acceptance of "historicism" as Popper imagined. Let us for a moment assume that there is indeed no pattern whatsoever in history. Nonetheless if it can be shown that the quest for freedom by the people at large cannot be satisfied as long as the property relations that characterize "modern society" are not transcended, then a sufficient case for revolution would have been made[2] In other words, the belief that history moves in a certain fashion leading to a *denouement* in the shape of throwing up a proletariat, which, rather like Prometheus, has the historical task of delivering mankind from the cycle of class conflicts, enabling it to make a transition from its own "pre-history" (which is the entire recorded history till now) to its authentic "history" (where it consciously makes its own history in the sense that its intentions and outcome increasingly coincide) is not necessarily the only theoretical case for a revolution. The case for a revolution in "modern" times[3] arises from the fact that capitalism as a mode of production is not only based on exploitation, but is also a *spontaneous*, non-malleable, "non-reformable" system.

For a long time after the second world war, however, this particular view had receded into the background. With Keynesian demand management it appeared that capitalism had overcome its tendency towards over-production crises; with "welfare state" measures it appeared that capitalism had become more humane; with near-full employment in the metropolitan capitalist countries, it appeared that capitalism's need to have a large reserve army of labour, on the basis of which Marx had argued that capitalist development produced growing wealth at one pole and growing poverty at another, had been overcome; with decolonization it appeared that capitalism could live without imperialist control over the "outlying regions"; and with the rapid growth of some countries belonging to the "outlying regions" it appeared that capitalism's tendency for producing development and underdevelopment as dialectically-related phenomena, as the "new" theories of imperialism had postulated, had also been rendered irrelevant. In short, virtually every weapon in the armoury of the theories which postulated capitalism as a "non-reformable" system, appeared to have become blunted by the developments in post-war capitalism. True, as long as the Vietnam War continued, the stigma of predatoriness attached to capitalism could not be fully overcome. But that war appeared to many as a problem left over from an earlier epoch, a decolonization delayed by inherited fears that still haunted the system, rather than a portent of things to come.

All these "achievements" now appear to be a chimera[4]. The welfare state has been progressively enfeebled in the metropolis; "globalization" has meant the "rolling back" of all attempts by third world countries to pursue a relatively autonomous trajectory of development, and, a re-assimilation of their economies into metropolitan hegemony, with devastating implications for employment and poverty; the East Asian crisis, dealing a massive blow to the prospects of the most rapidly growing part of the third world, has belied all expectations of a diffusion of development from the metropolis to the "outlying regions"; the worldwide economic slow-down which has lingered for decades, has destroyed the myth of a near-full employment, demand-managed, dynamic capitalism; and the espousal of the doctrine of "preventive wars", initially by the U.S. and the U.K., and now even by France, upon which the actions in the Middle East are based, now constitutes a threat to mankind that is comparable only to what Hitler had posed.

But it is not just these empirical developments, momentous though they are, which are relevant in the present context. What is relevant is that these developments constituting precisely a failure of "piecemeal social engineering", *arise because of the immanent tendencies of the system.* The immanent tendencies of the capitalist system, arising from its economic working, do not, save in exceptional circumstances, reveal themselves in their pristine purity; they always appear refracted through concrete struggles, including political struggles : they may be delayed, temporarily halted, and, in exceptional circumstances even partially reversed. In short what is actually observed is the result of concrete struggles, themselves stimulated by the immanent tendencies of the capitalist system, acting upon these tendencies. But these tendencies can never be permanently stopped as long as the system lasts.

Viewed in this light, the second world war, which itself owed its origin to the immanent tendencies of the capitalist system, also brought about a significant shift in the balance of world social forces. The expansion of the socialist system, the Chinese Revolution, the process of decolonization, the assumption of power by social democratic governments in several European countries on the basis of working class revulsion against the "old days", all these were reflective of the shift. And in that ethos, capitalism, even within the metropolitan economies, could not function in the old way. The acceptance of Keynesian demand management policies and the adoption of certain welfare state measures owed much to this fact.

In short, what had appeared as a basic and permanent shift in the character of capitalism was merely a temporary phase brought about by the war and the enhanced socialist threat. But starting, as it were, from a new point of origin (which represented a displacement from its earlier position), capitalism once again witnessed the working out of its inner tendencies, which led progressively to a gradual reappearance (though in a different form which was in keeping with the changed context) of many of its older characteristics, which belied the promise of "piecemeal social engineering".

Let me elaborate. Centralization of capital, a basic feature of capitalism, gives rise eventually to monopolies out of free competition. But monopoly capitalism,

as Lenin had argued, is also associated with the rise to dominance of finance capital. Greater control over the production of social output in the hands of the monopolists is also accompanied by an increase in the role of finance. Post-war finance capital however, unlike that to the pre-war years, was necessarily supra-national to start with (since large concentrations of such capital had been created *inter alia* from the US budget deficits flooding Europe and from OPEC surpluses deposited with the metropolitan banks, both of which arose from a transcendence of national boundaries). The fact of the emergence of globalized finance capital therefore was a playing out of the immanent tendencies of capitalism on a world scale and in a new context. The entire post-war scenario of "changed" and "humane" capitalism however was predicated upon the active intervention within each metropolitan economy by its own nation-State. And globalization of finance capital necessarily meant that any intervention by the nation-States, other than in the interests of globalized finance, became impossible.

Finance capital is always opposed to State intervention in demand management anyway, as was made clear during the Great Depression of the 1930s when all plans for getting the capitalist world out of the Depression through State intervention floundered on the opposition of finance capital and its spokesmen[5] But when finance capital gets globalized, its opposition acquires a spontaneous effectiveness, since finance capital can always move to other destinations if a particular State acts intrasigent, thereby pushing its economy into a financial crisis which any bourgeois State would find it impossible to resolve.

In short, the immanent tendencies of capitalism carried the system beyond the stage where it had appeared "humane" and "reformed". Since the nation-State is the only agency available in capitalism for effecting any reforms in a "humane" direction, and since the globalization of finance, an outcome of the immanent tendencies of capitalism, has negated everywhere the "reforming" capacity (in a humane direction) of the nation States, the only way to build a humane society, it follows, is by transcending capitalism itself.

III

Let me now come to the second notion of "historicism". Gramsci (1973, 406) expressed it as a theoretical affirmation that "every 'truth' believed to be eternal and absolute has had practical origins, and has represented a 'provisional' value ('historicity' of every conception of the world and of life...)", which according to him was the position of the "philosophy of praxis" (by which he meant Marxism).

He also said : "That the philosophy of praxis thinks of itself in a historicist manner, that is as a transitory phase of philosophical thought, is not only implicit in its entire system, but is made quite explicit in the well-known thesis that historical development will at a certain point be characterized by the passage from the reign of necessity to the reign of freedom, All hitherto existing philosophies (philosophical systems) have been manifestations of the intimate contradictions by which society is lacerated. But each philosophical system taken by itself has not been the conscious expression of these contradictions..."; by contrast, philosophy

of praxis "is consciousness full of contradictions, in which the philosopher himself, understood both individually and as an entire social group, not only grasps the contradictions, but posits himself as an element of the contradiction and elevates this element to a principle of knowledge and therefore of action." It followed that if "contradictions will disappear, it is also demonstrated implicitly that the philosophy of praxis too will disappear, or be superseded" (1973, 404-5). For this reason Gramsci refers to the philosophy of praxis as "absolute historicism".

"Western Marxism" sees Marx in close relationship with Hegel. It envisions, in the tradition of Classical Marxism, a Proletarian Revolution centred in the advanced capitalist countries, in particular a European Revolution. Of course when the outstanding figures of "Western Marxism" wrote, the hopes of a proletarian revolution in Europe had not yet receded, despite the series of setbacks which the revolutionary project had suffered in Western Europe in the years after the end of the First World War : Lukacs' *History and Class Consciousness* was published in 1923, and so was Korsch's *Marxism and Philosophy;* Gramsci's *Prison Notebooks* were written during the years 1929-35 in a fascist prison, where his incarceration was a symbol as much of the defeat of the revolution as of its inevitable forward march when the dark fascist days would be over, as they were bound to be. "Western Marxism" in other words reflected the mood of the times. The revolution in Europe might have been defeated temporarily, but it was very much on the agenda.

More to the point, however, is the fact that the theoretical rationale of the "historicism" of "Western Marxism" lay in the conception of a European Proletarian Revolution. But then this throws up a problem : if the practical truth of Marxism is linked to the revolutionary praxis of the proletariat, then what relevance does Marxism have in societies where the proletariat is a minuscule social force? The only relevance it could possibly have is through the progress that these societies can make *as a result of the proletarian revolution in the metropolis,* but this is not of any direct relevance as far as praxis in these particular societies is concerned. In other words, if "historicism" makes Marxism a product *temporally* of a certain epoch, then why should it not, by the same token, be considered to be a product, *spatially,* of a certain context, certain specific societies where the proletariat is sufficiently significant to convert itself, in Lukacs' language, into a "subject-object"? The universal truth of Marxism then must inhere in something different from its mere self-conscious location within a world of contradictions, as a world-view of the proletariat; it must inhere rather in its capacity to analyze structures as an aid to praxis of large masses of the oppressed people, in short in its *scientific* content which, in common with all science, goes beyond relativism without claiming "absolute truth". (Its life is short in so far as it would eventually get absorbed into a more comprehensive theory).

This alternative perspective on Marxism as a science of history has of course been developed in our time most systematically by Althusser who referred to "historicism" as a "variant" of empiricism[6]. But it goes back to Lenin , who

talked of the development of theoretical knowledge and of the historical conditions for the emergence of the proletariat as a potent revolutionary force, as *separate* and *parallel* phenomena. True, this development of theoretical knowledge gets immensely accelerated under capitalism, so that there is some objective basis for the two phenomena, the development of a science of history and the emergence of the proletariat as a decisive historical agent, to coincide. But the phenomena nonetheless are separate.

In Lenin's words (1977, 114), "in Russia, the theoretical doctrine of Social Democracy arose altogether independently of the spontaneous growth of the working class movement : it arose as a *natural and inevitable outcome of the development of thought among the revolutionary socialist intelligentsia*" (emphasis added-P.P.) Or as Althusser expressed it, "theoretical practice" like other *genres* of practice requires its own tools, namely concepts and theories bequeathed from an earlier period, and hence operates in relative autonomy from the development of the sphere of social production. Taking his cue from Engels' remark that the "economic" was determinate only "in the last instance", Althusser wrote : "From the first to the last, the loneliness of the last instance never comes."

To talk of "theoretical practice", to talk of the "relative autonomy' of the development of ideas, to talk of the distinction between the "object of thought" and the "real object" (a distinction whose obliteration, Althusser (1970) argued, constitutes the basis of both empiricism and idealism), does not of course mean a promotion of scholasticism, of the notion that ideas develop in a universe of tranquillity unsullied by struggles of any sort. Ideas are shaped through struggles, not only struggles in the realm of ideas themselves, but also, in an indirect and refracted manner (e.g. through the opening up of intellectual avenues that the rising tide of a social revolution brings about), by the social struggles as well. But the latter do not determine in any direct fashion the trajectory of development of ideas. And the life of any particular set of ideas does not derive from the length of the particular period whose struggles coincide with their development.

The separateness of the two trajectories, of social development and of the development of ideas (though of course the development of ideas, while using earlier ideas as its means of production, necessarily engages with the unfolding trajectory of social development), was central to Lenin's thought. He was emphatic that socialist ideology arises in the realm of knowledge and has to be carried to the proletariat : "The theory of socialism however grew out of the philosophic, historical, and economic theories elaborated by the educated representatives of the propertied classes, by intellectuals" (1977, 114). Since the theory of socialism stands on its own, since the class analysis upon which it is based has a general (though concrete) applicability not circumscribed by the particular class-configurations of a particular society or set of societies, in short, since it constitutes a method of *scientific* analysis of *any* society, it has a universal applicability, irrespective how close the societies in question are to a socialist revolution.

A historicist approach, in this second sense in which I have been using the term, is thus not only not necessary for the argument for a revolution, but it might even restrict the sweep of the revolution, by focussing too closely on proletarian struggles in the metropolis.

IV

A number of implications follow from a non-historicist approach to revolution. First, it underscores the vital importance of an outside agency, a Party, for bringing the idea of socialism and of revolution to the working class, and to other classes which, theory would suggest, might be allies of the working class at that juncture. Many have reacted strongly to this view, and have located the dictatorial features of the erstwhile socialist regimes in this tendency of putting the Party above the class(es). In this debate however it is usually forgotten that even if the revolutionary project is eschewed and "piecemeal social engineering" is promoted in its place, then that too would be as much an extraneous imposition on society. If a revolution constitutes an imposition on society, then "piecemeal social engineering" cannot be exonerated form this charge. Indeed *any* attempt at changing society must *ipso facto* constitute an imposition. The point at issue therefore is not the fact of imposition *per se*, but whether such imposition, by being an imposition, might subvert the journey to the new society that is being attempted. But such subversion, if it occurs, would indicate retrospectively, a theoretical failure on the part of the outside agency, and not a problem with imposition as such. It would indicate in other words a limitation of theoretical understanding rather than the fact this understanding came "from outside"

Secondly, it is not as if there is a *choice* between "piecemeal social engineering" and a social revolution. The necessity for revolution arises precisely because the scope for "piecemeal social engineering" has got exhausted. The occurrence of revolutions is not a result of some Marxist conspiracy (for had it been so there would have been many more revolutions than have actually occurred); it arises when contradictions in society have reached a point where their resolution becomes necessary but cannot happen in any other way. A caveat however is in order here. When "piecemeal social engineering" appears to have been successful in some context, it is often the case that this success has been achieved at the expense some other society, in which case the non-occurrence of a revolution in this particular context does not indicate an obviation of the necessity for revolution in every context. The fact that Western Europe has not had a successful socialist revolution is not an indication of some intrinsic strength of social engineering in the European context; it is a consequence of the capacity of Western European countries to manipulate, through their imperialist control over "outlying regions", their internal contradictions in a manner that obviates the need for a revolution.

Linked to this is a second issue. Many historians express their distrust of "grand narratives" and focus instead on some particular aspects of the domain of

their interest, without relating it to broader issues. Of course how a historian chooses to conduct his craft is her or his business, and nothing need be said about it. But when "Grand narratives" are critiqued not on their scientific merits but merely on the grounds that they are "grand", when a virtue is sought to be seen in *petit* narratives as such, then clearly there is a methodological flaw in the critique. The matter again is not one of *choosing* between one kind of narrative and another, but one of scientific merit, whether a "Grand narrative" is scientifically valid or not, for if it is, then a myriad replications of *petit* investigations which do not add up to any "grand narrative" would leave the discipline scientifically impoverished.

Thirdly, implicit in the notion of a science of history with universal applicability is the notion of a "democratic revolution". The task of transforming societies, armed with an understanding of social contradictions and their interplay, cannot remain confined to Europe alone. But once non-European societies are analyzed, where capitalism remains underdeveloped despite their being under the imperialist yoke of metropolitan capitalism which has its local allies among the landed and comprador interests, what comes on the agenda is not a socialist revolution but a "Democratic revolution". This concept, which made an appearance in Engels' *The Peasant War in Germany,* was enshrined in the programme of the Bolshevik Party prior to the October Revolution (the task of the revolution was supposed to be the establishment of a "revolutionary democratic dictatorship of workers and peasants") and was to be, in various different shades, the revolutionary objective in the programmes of the Communist Parties in the third world. The "Peoples' Democratic Revolution" (to distinguish it from the usual "democratic revolution" led by the bourgeoisie), or the "New Democratic Revolution" (as the term was used in China) was a remarkable theoretical innovation, which made possible the assimilation of the third world situation within the Marxist framework.

It was also a complex concept. It refers to a situation where forces committed to the objective of building a socialist society carry out a revolution whose immediate task is to create the conditions for the most broad-based development of capitalism (by sweeping away colonial and feudal bondage), *without in any way compromising with, or jeopardizing the achievement of, the goal of socialism.* We know in retrospect that the progress towards socialism via a peoples' democratic revolution in underdeveloped third world societies, which have successfully essayed such a revolution, has not been an easy one. But the point of relevance in the present context is this : since the working class in such societies is small, the concept of a "peoples' democratic revolution" necessarily places a greater emphasis on the role of the "revolutionary socialist intelligentsia" and hence upon the correctness of "theoretical practice". The epistemological precondition for such correctness is a science of history, the view that history can be a terrain of scientific investigation to yield conclusions that can buttress the correctness of political praxis.

V

Let me recapitulate the argument that I have been advancing in this paper. There is a basic distinction between historicism on the one hand and the science of history on the other. The historicist tradition within Marxism does not see it as constituting a science of history, and is generally hostile to the idea of a science of history. On the other hand, "historicism" as understood by Popper, while supposedly referring to a science of history, subsumes under it diverse currents, all of which it indiscriminately, and hence illegitimately, debunks. The revolutionary perspective in the "modern society" does not need "historicism" in either of the two senses. It is based on a science of history which the revolutionary intelligentsia carries to the people, and which forms the basis of praxis. It is this aspect of a science of history which makes Marxism relevant for diverse societies, including especially underdeveloped ones where the proletariat has a minuscule presence. Of course any talk of a science of history gives rise to fears of a totalitarian order justified in the name of absolute truths, such as those which science is supposed to yield. But the degeneration of the revolution into totalitarianism calls not for an abandonment of the scientific perspective, but rather a refinement of it. In the context we are discussing, all repression, all use of gratuitous and excessive violence by a socialist State, constitutes above all a theoretical failure, signifying the insufficient development of the scientific perspective.

The question may well be asked : why should we bother about these issues which were debated so long ago by people long dead and gone? The answer is simple : important issues do not go away unless they are resolved. In intellectual activity fashion cannot be the decisive factor in the choice of issues to discuss. In particular, questions of exploitation and hegemony under capitalism are still with us. If anything they have become extremely acute of late, and thrust themselves into our consciousness after the war waged by the United States on Iraq. Unless these issues are discussed properly, resistance to such hegemony cannot be put up in an effective and organized manner. And any discussion of such issues of hegemony would once again bring into the entire question of revolution versus piecemeal social engineering, the entire question of a vanguard organization, the role of a revolutionary intelligentsia etc., which were debated long ago and which I have tried to touch upon in this paper. But if these issues are shut out of the terrain of discourse, then anti-imperialist praxis will continue to take the destructive and unproductive forms, such a terrorism, which we are seeing before us today.

References

Althusser Louis (1970) *Reading Capital*, NLB, London.

Althusser Louis (1971) *For Marx*, Allen Lane, The Penguin Press, London

Carr E.H. (1964) *What is History?*, Penguin Paperback, Harmondsworth.

Gramsci Antonio (1973) *Selections from the Prison Notebooks*, Lawrence and Wishart, London.

Habid I (2003) "What Makes the World Change : The Long View". *Social Scientist*, July-August.

Keynes J.M. (1949) *The general Theory of Employment, Interest and Money*, Macmillan, London.

Kiernan V.G. (1983) "Historicism" in Tom Bottomore et al. Ed. *A Dictionary of Marxist Thought*, Blackwell, Oxford.

Korsch K. (1970) *Marxism and Philosophy*, Paper back edition, Allen lane, London.

Lenin V.I. (1977) *Selected Works (Three Volumes)*, Volume 1, Progress Publishers, Moscow.

Lukacs G. (1971) *History and Class Consciousness*, Merlin Press, London.

Marx K. (1977) *Capital* Volume 1, Vintage Books paperback, New York.

Patnik P. (2000) "The Future of Marxism" in Romila Thapar ed. *India : Another Millennium*, Penguin India, New Delhi.

Patnaik P. (2003) *The Retreat to Unfreedom*, Tulika Books, New Delhi

Popper K. (1957) *The Poverty of Historicism*, RKP, London.

---

1. I take this expression from Victor Kiernan (1983)
2. This point has been discussed at greater length in Patnaik (2000)
3. I use the word "modern" here as synonymous with capitalism, taking my cue from Marx's identification of the capitalist mode of production with the "modern society" in his Preface to the first Edition of *Das Kapital*. See Marx (1977), p. 92..
4. For a more elaborate discussion of many of the points raised in this paragraph see Patnaik (2003)
5. This opposition was expressed in the form of an opposition to fiscal deficits and an assertion of belief in the principles of "sound finance". The Keynesian Revolution which started with an attack by Keynes' pupil R.F. Kahn on the British Treasury's views upholding "sound finance", was to fight this hostility of finance capital to State intervention in demand management. Its thrust, as Keynes (1949) put it, was "socialization of investment" and a "euthanasia of the rentier" (Since finance capital is the main representative of rentier interests, Keynes' target of attack is quite clear).
6. See Althusser (1971), P. 12 for this particular remark.

Gender Issues in Early South Indian History

Vijaya Ramaswamy

And if one asked her, longing to pin down the moment with date and season, 'but what were you doing on the fifth of April, 1868, or the second of November, 1875, she would look vague and say that she could remember nothing. For all the dinners are cooked, the plates and cups washed; the children sent to school and gone into the world. Nothing remains of it. No biography or history has a word to say about it.

Virginia Woolf, *A Room of One's Own*, Hogarth Press, 1974, 134

Indian History till the 1970's is mostly silent on all gender based issues. History was unequivocally **male history**. It seems as if nearly 50% of the population was in a state of atrophy and largely absent from the historical canvas. In the specific context of South Indian history, pioneering scholars wrote lengthy histories in which the only references to women could be compressed into a single page. Alternately women were pushed to the end of the text, literally locating them in the periphery of social history. Subrahmanian's *Sangam Polity*[1] established a pattern which is replicated in the early historiography on South India. Usually a brief section and sometimes a chapter is sandwiched at the end of the book between an account of 'Dress and Ornaments' and another on 'Games and Amusements' Needless to add that the representation of women was an entirely homogenised one ignoring issues of caste and class[2]. The bulk of the text was largely devoted to 'male' concerns and enterprises especially politics and war. If women were to figure here at all it would have to be "Kingly queens" like Rani Rudramma or Rani Chinnamma.

Pioneering women historians, who looked at South Indian history, did so largely through the prism of the male epistemological framework. The best example would be Dr. C Minakshi, known for her landmark contribution : *Administration and Social Life under the Pallavas.*[3] Minakshi was Nilakanta Sastri's student and the first woman recipient of a doctorate in history from Madras University. Not only does her book contain the most cursory references to women but significantly 'women' do not figure in her extensive index.

The task before a historian examining gender issues in early South India is therefore a daunting one of putting women back into the historical canvas. This enterprise had been defined by 'feminist' historians as 'salvage' or 'retrieval' history. By and large, this is being done by re-opening male texts, examining the

sub-texts and bringing women who are in the periphery and therefore 'subaltern' in terms of their historical positioning, centre-stage. The kind of hazards involved in such an exercise can be perceived in N. Subrahmanian's book on *Tamil Social History*. After describing the position of women as miserable and oppressed, he writes :

> "Even as the untouchables in that society had no consciousness of their lowly condition, the **women had no feeling of subjection**[4]." (emphasis mine)

Subrahmanian's history indicates two things: a. It represented not 'the male' view point but the ideological perspective of the elite male in Tamil Society which means the Sanskritized social groups and b. both depressed classes and women get represented in history as objects rather than living, suffering 'subjects'. Women have to re-create their own histories by penetrating through and beyond such opaque representations of women's history.

Women in the Social Domain

The issue of gender inequality began right from the time of birth. The canonical texts laud the birth only of the male child. In the context of South India an inscription from Karnataka is worth citing as an example how feminists have to read silences in history in order to establish gender bias. Two inscriptions from Chennapatna and Nagamangala taluqus dated in the eleventh and twelfth centuries A.D[5]. state : *'suputrah kuladeepakah'* meaning 'a good son is the lamp of the family' just as 'the sun is the lamp of the day, moon is the lamp of the night and *dharma* is the lamp of the three worlds. On the usefulness of daughters one encounters eloquent silence!

The birth of a daughter was unwelcome because she was a source of expense, trouble and anxiety to her parents under whose custody she normally stayed till her marriage. Proverbs in Tamil, Telugu and Kannada indicate the preference for boys and bias against girls. Although being 'soft' evidence, it is not possible to locate these proverbs within a time-frame, they would logically belong to the post seventh century when Brahmadeya and Brahmanical domination came to characterise the South Indian landscape. Thus *chān pillai ānālum ānpillai* ('even if he measures but an arm's length the child is a male child') indicates the value placed on boys. Conversely, it is said *'anju pen pirandāl arasanum āndi āvan* (even a king would become a beggar if he had five daughters) suggests that girls constitute an economic drain because without any prospect of material returns, one has to spend on their upbringing and give dowry at the time of marriage. It is noteworthy that dowry system became entrenched in South Indian society only as a result of Sanskritisation[6]. The negative attitude towards girl babies may have been less strong among the lower strata[7]. It is likely that this is a carry over from Tamil traditions in the Sangam age when girl babies do not seem to have been unwelcome.

Women were excluded from acquiring any formal education. While those of the lower classes had exposure to what is called folk knowledge in matters like

agriculture or domestic crafts, upper caste women, by and large, were both unlettered and home bound. The twelfth century commentator from the Chalukyan State (Karnataka) Vijnanesvara states in the Mitakshara, his commentary upon the Yajnavalkya Smriti that for women, marriage stands in the place of *upanayana*, which marks a boy's entry point into education. He adds that being uneducated, women, like Shudras, possess no capacity for performance of spiritual practices like japa and tapa[8]. An exception to this rule occurs in the statement of Ibn Battta (1333-1345 AD), "I saw in Hanavur [Karnataka] thirteen schools for the instruction of girls and twenty three for boys, a thing I have not seen anywhere else."[9]

The pattern of marriages had changed from what they are supposed to have been in the Sangam period, although this change had begun even around the late-Sangam - post-Sangam times. Much of Sangam literature is replete with references to pre-marital courtship, women's right to choose partners and parisam or bride-price. Pre-puberty marriages, in which the child-bride would hardly have been aware of the significance of marriage let alone the choice of husband, became the norm in early medieval South India. The norm of child-brides is best reflected in the hagiography of Andal, the seventh century Azhwar saint. While her playmates observed the 'pavai nonbu' to pray for a good husband, Andal 'playfully' put on the Lord's garland and observed the nonbu for 31 days to pray that Lord Ranganatha should accept her as his wife. This is the theme of the celebrated *Tiruppavai*, composed by Andal.[10] Therefore Andal could subvert the existing partriarchal norms only by adopting the spiritual stance of bridal mysticism.

The centrality of *'karpu'* or chastity in the lives of women appears to have been a carry over from the Sangam period. George Hart links it to the Tamil term *'ananku'* he interprets as dangerous female energy controlled by *'karpu'*.[11] *'Karpu'* in fact extends beyond the Western notion of chastity and embodies a whole register of social/moral codes for women, including self-sacrifice, uncomplaining service and loyalty to the husband and the marital home. *'Karpu'*, expressed in the almost ascetic control of her sexuality by the woman, is said to have endowed her with supernatural powers. Kannagi in the epic *Silappadikaram* burnt the city of Madurai by the power of her *karpu*. Kannagi today is widely worshipped in South India (especially Kerala where Seran Senguttavan is said to have built the first temple to her and Tamil Nadu) as *'pattini daivam'*.

In early medieval times *'karpu'* is reflected in different genres of literature : canonical literature like *Naladiyar* and post-Sangam texts; in social literature like *Jivakachintamani* and in oral and hagiographical traditions. These texts not only reinforce the notion of *'karpu'* but simultaneously *provide social sanction to the* practice of polygamy and the commodification of women. Whether it is Jivakan, the hero of *Jivaka chintamani* (a tenth century text) or Tiruneelakanta Nayanar from the *Periyapuranam*, (a twelfth century hagiographical work), more than one marriage for men was as established a social practice as chastity within the marriage for women.

The twelfth century hagiographical work, *Periyapuranam*, abounds in references to women being sold, bartered or made use of without any

consideration for their personal preferences. Nayanar Iyarppagaiyar would never say no to any Saivite mendicant and was therefore considered a great devotee. When Lord Siva came in the guise of a mendicant and asked for his wife, he immediately offered her to him as his humble gift. The wife's permission for this transaction was clearly considered unnecessary. Kaliyar Nayanar attempted to sell his wife in the open market in order to buy oil lamps for the temple. In all these instances the devotional fervour of the male Nayanars has been highlighted at the expense of the women who have been depicted as objects rather than as persons.

For a women, to die as a *sumangali* (the auspicious married woman) was the best thing. The next best was to die on hearing of her husband's death, which is said to have been the glorious end of the queen Vanavan Madevi, the mother of Rajaraja Chola I. This is defined as *'mudal karpu'* or the highest form of *karpu*. The third alternative was to live lifelong as a pious widow, self-effacing, self-sacrificing and socially invisible.

Gender issues in history have invariably centred around two major themes :

a. the practice of Sati (self-immolation of the widow on the funeral pyre of her husband) and b. treatment of widows. Scholars have tended to believe, on the basis of very sparse evidence, that the practice of Sati was prevalent in the South. However at least before the fourteenth century the evidence for this can be counted on one's fingers.[12] In a rare instance, a Kannada poem dated A.D. 1057 narrates the passionate appeal for self-immolation by Dekabbe, the daughter of a chieftain of Nunganad.[13] Although the practice may have acquired a status symbol among communities influenced by Brahmanism and Sanskritisation, it does not seem to have enjoyed popular sanction in the Chola period. In an inscription from South Arcot belonging to the reign of Vira Rajendra, the widow rants against those who seek to prevent her from committing Sati.[14] However, canonical literature like the *Kamba Ramayanam* extols Sati to such an extent that not only the Kshatriya kula Dasaratha's queens but even the wives of the Rakshasas in Lanka are said to have committed Sati on their husband's death and covered themselves with glory![15] It is clear that the issue of Sati in early South India has to be looked at from several levels. It was glorified in canonical literature but does not seem to have had much social sanction. In oral traditions there is no reflection of Sati whatsoever. One would therefore agree with Neelakanta Sastri's observation : "the references (to Sati) are so few that it can hardly be regarded as a common practice in the Tamil country."[16]

There is, however, no ambiguity in the position of widows. Even the Purananuru provides a graphic description of the socially outcast widow and the lot of widows seems to have worsened with growing Brahmanical influence from the seventh century onwards.[17] The Kamba Ramayanam provides descriptions of widowhood, at the same time extolling the performance of Sati by Dasaratha's queens and saying that they entered the fire as if it was the beautiful Poygai full of blooming lotuses. Kambar also describes Tara in the garb of a widow after the killing of Vaali by Rama. She is said to be without the vermillion mark, bereft of

all ornaments, covered completely almost as if with a sack cloth etc.[18] The *Periyapuranam* eulogises Tilakavatiyar for having adopted the path of widowhood when she hears of the death of her betrothed, a curious situation of an unmarried women wearing the trappings of a widow.

Medieval literature provides innumerable examples of the miserable lot of widows. Mallanna, the author of Rukmangada *Charitramu says* : "A widow's blessings are poison, none should accept them". The Dasar poetry from Karnataka (the famous Dasar being Purandara Dasa and Kanaka Dasa) exhorts widows to turn to God because "a woman without husband is like Mari, an evil goddess" her life is "like a knife held at the throat..."[19]

Hitherto accepted historical sources however reflect only the lives of the upper caste or Sanskritised social groups. Such sources are almost wholly silent about life at the grass roots. For information about the women belonging to these social groups one has to explore 'alternative' histories founded in folk traditions, especially folk songs. These clearly show that 'parisam' or bride price and when divorce existed among the lower castes/classes. A divorce could be obtained by the payment of 30 *panams* (the then prevalent local currency) to the local community court. Although space does not permit a detailed exposition of these aspects within the framework of this article, it must be kept in mind that South Indian women are not to be treated as a homogenous category in the exploration of gender issues.[20]

While gender issues within the marital framework have revolved around issues like chastity, sati and widowhood in contrast to polygamy and re-marriage for men, women outside the structure of marriage seem to have formed the trope of 'public women'. The result has been the ludicrous clubbing together of wholly disparate social groups. The widows are identified with spiritual women in many areas like Benaras and Mathura. At the same time in certain parts of Northern India the term 'kulta',[21] used for a woman spiritual aspirant, is also used for a fallen woman, the common link between these two categories being their existence outside patriarchal role models.

The Devaradiyar, Padiyilar or Ishtabhattaliyar, occupied the highest status within this category. The ordinary prostitutes came at the extreme end of this spectrum. The Devaradiyar were literally 'servants of God'. These women performed services in the temple, especially singing and dancing before the deity. Since they were unmarried, they came to be called padiyilar meaning 'those without husbands'. However the two terms are not synonymous and we do have inscriptional evidence of Devaradiyar getting married. A record from Tiruvorriyur (Chingleput district) dated 1049 AD, describes Chatyral Chaturi, a Devaradiyar as the 'ahamudaiyal' or 'wife' of Nagar Perunagadan.[22] The marriage of another Devaradiyar is recorded from Tanjavur during the reign of Kulottunga III.[23] There is a striking contrast between the high status enjoyed by these women in early medieval times and even up to the Vijayanagara period and their deterioration into mere prostitutes in the later-medieval period when they lost royal patronage and the temple building era came to an end.

The eleventh century inscription of Rajaraja Chola is seminal in understanding the position that these so called dancing girls occupied in the society. The king settled 400 of these Devaradiyar in the Tanjavur Brahadisvara temple (Periya Koyil) offering them land sites, houses and monetary inducements.[24] A recent study of the Chola period looks at 658 inscriptions which refer to the dancing girl community. Out of these the honorific 'Nakkan' is used in 597 inscriptions while in the rest they are referred to as Devaradiyar. The suffixes or titles 'Manickam' and 'takaikoli' also seem to have been bestowed on some of them.[25] Devaradiyar were women of property and seem to have made large donations to temples, evidence for which is provided in several Chola inscriptions. Devaradiyars' access to land resources and their association with the temple economy in the context of early medieval Andhra Pradesh, has been discussed in an article by Aloka Parashar.[26] A close relationship existed between the Kaikkola (weaver) community and the Devaradiyar since women of these castes were attached to temples.[27]

Women in the Eco-Political Domain

If one were to examine the South Indian historiographical tradition, it is self-evident that women were part of the 'domestic' and men essentially a part of the 'public' (the appropriate term would be 'puram' domain, although they figure in the 'aham' or the context of the 'interior' as the controlling patriarchal force). The first break in this kind of historiography came from a woman (naturally!) - Mary Frances Billington. In her book on 'Indian Women' written in 1895, apart from predictable chapters like 'Her Marriage', 'Embroidery and Needlecraft' and 'Jewellery and Ornaments', she has a chapter on 'Female Work in Field and Factory'. Since Billington, women's studies has come a long way and the presence of women in the 'eco-political' domain, especially the economy, has become a serious pre-occupation of feminists. Recovering women's presence in the economy is a part of 'retrieval' or 'salvage' history while 'women and the domestic' is a theme much better explored.

Women's active participation in the agricultural sector is a time-established fact. This has been well documented in Sangam literature, where certain literary genres pertain entirely to women's participation in farm work. Alolam songs relate to the guarding of crops by young girls, who kept pests away by swirling a simple device called 'tattai' or 'tazhal'. A ninth century sculpture at the Vallimalai temple in the North Arcot district of Tamil Nadu, shows Valli (the tribal consort of Lord Murugan) whirling the 'tazhal' in the act of guarding the crops. The *Mullai pattu* related to conversational songs between women as they husked paddy and pounded the grain. These practices not only continued in post-Sangam South India but continue to be exclusively women's work even today. Another agricultural activity which was and continues to be woman's work is the sowing of crops as well as transplantation, which women do standing in rows. The genre of folk songs related to this activity is called 'nattru padal' or 'sowing songs'.[28] The *Silappadikaram* contains some interesting references to farming women. It says that people passing

by the fields (here Kovalan and Kannagi, the protagonists of the epic) could see the women who had imbibed liquor, singing and working in the fields. It says that these women wore no flowers in their hair but only the tender stalks of grain.[29]

Women also participated in irrigation activities. Women were given the tedious job of walking up and down a plank in order to move the 'nauria' (also called Persian wheel') which puts the water buckets into systematic motion. The irrigation songs or 'etra padal' are punctuated by the rhythm of the buckets being drawn up. For example a woman so employed, sings :

> If I become an old hag
> Where is the fragrance (in me?)
> For him there will be one without the home
> And one within.
> Forty six, forty seven, forty eight (indicating the bucket count)[30]

The marginalization of women within the domain of the 'public' is obvious from the fact that historical sources for the period are silent about women's participation in agricultural activities. Women's continued participation in farm work has to be inferred through living traditions in agriculture in South India. Once in a while literature provides a passing glimpse of women's role. For example in the *Periyapuranam,* the story of saint Nandanar contains an account of the paraicheri or dwelling place of the untouchables. It describes a Pulatti woman singing while engaged in the task of husking paddy, while her husband worked in the fields.[31] Here the word used to denote the Pulaiyar is 'kadaiyanar' or 'lowest', confirming that they worked as agricultural laborers. In fact, the Shudra saint Nandanar himself was a Pariah who worked for a Brahmin landlord.

A pastoral economy existed side by side with agriculture in South India. In Sangam typology this eco-region was referred to as *mullai.* It can be said that women played a leading, possibly even a dominant role in the pastoral economy. Sangam literature like the *Perumpanatruppadai* gives a detailed account of women doing dairy farming including churning butter, ghee and buttermilk and hawking these from door to door in the other eco-zones like *Marudam* and *Neydal.*[32] For early medieval South India the most graphic descriptions of shepherdesses and life in the 'ayarpadi', literally the 'shepherds' colony', comes from the composition of the seventh century woman saint Andal in her Tiruppavai. Here the image of the dusky shepherdess, with her heavy chains and clinking bracelets, churning the curds at dawn, occurs repeatedly, In the eleventh song of the *Tiruppavai,*m Andal says :

> Thou slim maiden,
> Born into the blameless family of kovalar (shephereds)
> Milking the many cows.
> The company of your friends
> Singing the name of the Lord...
> Stand in your courtyard...
> Do not tarry
> Wake up!

This is a very loose rendering of the song which begins with a description of the milking of the cows by the milkmaids.

Among the domestic industries, the most important was the handloom industry. Spinning in South India was done, and is still done, entirely by women while in the hill areas of Northern India, men can also be seen spinning on a spindle. While the spinning of yarn was also done by housewives, it was by and large, the sole occupation of widows and unmarried or destitute women. Such female spinners are referred to in Sangam literature as *parutti pendugal.*[33] References to women spinners continue to occur in medieval literature especially Virasaivism, a twelfth century religious movement, which provided space for self-expression to many crafts persons and lower order professionals. It is said of the saint Jedara (weaver caste inhabiting Andhra-Karnatka regions) Dasimayya that his wife Duggali spun the yarn which he wove into cloth. Some of the most powerful vachanas come from two Shiva Sharanes who were 'spinsters.[34] Kadire Remmavve and Kadire Kayakada Kalavve were both professional spinners since their name is prefixed with the term *'kadire'* meaning 'spinner' and the term *kayakade* means 'work'. Kadire Kalavve writes that the spindle of spirituality will break if one mixes with *'vrataheena'* meaning persons without faith or devotion. A vachana by Remmavve uses the imagery of the spinning wheel to describe her spiritual experience as well as the situation of domestic violence in which she lived and worked. Remmavve wrote :

> Fast turning spinning wheel
> Listen to the caste and lineage (kula Jati)
> Of the spinning wheel I turn.
> The plank below is Brahma.
> The torana is Vishnu.
> The wooden idol (bobbin winder) Maha Rudra.
> The two threads that pass through constitute intellect.
> Awareness is the spindle.
> You turn the wheel by the handle called devotion
> The threads turn and the bobbin is filled
> I cannot turn the spinning wheel
> Because my husband has beaten me.
> What can be done, my Lord Gummisvara (fearful aspect of Siva)[35]

In the context of the handloom industry, the washing and bleaching of cloth was also done by women and the *Periyapuranam* refers to these Pulatti women and says that they used to indulge in drunken dancing. It is noteworthy that 'possession' by spirits is also associated with these women and people would placate them in order to ward off evil.

Liquor distilling seems to have been predominantly in the hands of women of the lower castes. Liquor was brewed from rice, fruits etc. The door to door selling of toddy was also in the hands of women. It was perhaps their close involvement with the liquor industry which led these women to become hard drinkers.

Women have been involved in a subordinate capacity in most crafts like pot making, gold smithy etc although women participated equally with men in basket weaving and mat making. The medieval Telugu text *Kreedabhiramamu* refers to the involvement of women in many of the crafts. It suggests that basket weavers were very poorly paid because the *Kreedabhiramamu* states that many of these medara women took to prostitution out of compulsion.[36]

Women then as now, largely worked in the unorganized sector. There is some evidence that they worked for daily wages (usually paid in terms of grain or cooked rice) in the temples and at construction sites. An eleventh century inscription from Tiruvamattur which refers to activity by unorganized labour such as lifting water, irrigating fields and making garlands, says that while the men received eight nalis of paddy per day as their wages, women workers were paid much less than men.[37] Another Chola inscription which refers to men and women working as daily wage workers says that the women were to be paid exactly half of what their male counterparts received.[38] Women of the Valaiyar caste seem to have earned a living as professional mourners. An inscription from the Pudukottai State says that when death occurred in any household, the Valachchi women were called and they put a cloth over their heads and mourned the dead with loud wails.[39]

Does the existence of working women indicate any king of economic self-sufficiency for women? In other words, were women propertied? It is clear that women from different strata occupied very different positions vis-à-vis the crucial issue of property rights. Therefore the issue of property rights has to be looked at both in terms of its theoretical underpinnings and the actual social reality

For South India the evidence in this regard is so scanty that one can only make extremely limited conjectures in this regard. The theoretical stance is best stated by Vijnanesvara's *Mitakshara* which is a twelfth century commentary on the *Yajnavalkya Smrity*. He states that women have the right to a share in property as their rightful inheritance but they do have any right to divide or share property.[40] The Dayabhaga school of Bengal, in contra-distinction to Vijnanesvara, recognized the right of women to hold, buy and sell property. One of the earliest piece of evidence giving the widow the right to inherit her husband's landed property, comes from the reign of Kumarupala of Gujarat vide an inscription dated 1150 AD. It is noteworthy that the king is compared to illustrious Suryavamshi ancestors like Raghu, Nahusha and Nabhaga for his verdict in favour of the hapless widow. It is likely that verdict was given in the absence of male heirs. However the widow's right to inherit is substantiated even more strongly in an inscription from Achchalpuram (North Arcot district of Tamil Nadu) which records the decision of the Sabha of Kulottunga Cholan Chaturvedimangalam, to allow a widow to inherit the lands, slaves and other articles of her dead husband.[41] The *Saraswativilasa*, a legal/canonical text, most probably authored by Lolla Lakshmidhara but credited to his patron Prataparudra Gajapati, states that a woman's claim to property was strengthened if she had a grandson. This text also makes it clear that the widow was the natural inheritor of her husband's property. To quote the text :

"In sacred tradition...the wife is declared to be the half of his body...Of him whose wife is not dead, the half of the body lives : how can another inherit while the half of this body is alive? Though his kinsmen, his father, brothers, or uterine sisters be alive, the wife of deceased sonless man is his heir."[4]

Dr. Minakshi assumes women's right to property from the fairly abundant references to the charities and gifts to temples made by women. The majority of these were by royal personages. Interestingly, the only other category of women most visible in inscriptions as donors is the Devaradiyar. A survey of Chola inscriptions in this context has come out with the following figures with Table A relating to categories of donations made by women in the early medieval period and Table B giving a hierarchical break up of the women donors.[43]

Table A

Land donations	81
Donations other than land	331
Land Sale	16
Other social works	331

Table B

Social Strata	*Land*	*Gold*	*Goat*	*Coins*	*Perpetual Lamp*
Royal Ladies	41	50	23	14	12
Ordinary Women	21	54	42	22	11
Devaradiyar	7	8	3	3	1

Mitakshara, Saraswativilasa and other canonical texts are agreed on the point that *streedhana* or *manjakani* was legally the exclusive property of the woman. According to the *Saraswativilasa* :

"Neither a husband, nor a son, nor a father, nor brothers, have power over streedhana, either to receive it, or to dispose of it. If any one of these shall forcibly consume streedhana, he shall repay it with interest and he shall also receive punishment."[44]

The oft-debated question among feminist historians is - how absolute was women's right over the manjakani (referred to as pasupu kumkumamu in Andhra country)? Inscriptional evidence on this point is thin. A piece of inscriptional evidence dated circa 1270 AD refers to two Brahmin widows who were forced to sell their lands since they had no sons. It is noteworthy that the sale transactions in both cases were conducted by the father and son-in-law of the windows.[45] This suggests that in the case of all landed property including manjakani, controlling power was with the male and the widow either could not or was not allowed to manage her

property. The best reflection of ground reality in terms of women's property rights is however found in folk songs which clearly show the patriarchal stranglehold over property, whether it is streedhana or otherwise. The songs obviously cannot be dated, but when read in conjunction with the limited inscriptional evidence and the continuing deprivation of widows' properties, we can regard these songs as historically probable. I quote below two lamentation songs (*Oppari*) from the Tamil country :

> It used to rain pearls
> The fresh waters used to gush through the fields.
> The fields watered thus
> Would rustle with *chamba* grain.
> Of all this wealth of fields and grain
> I was the mistress.
> Then my Swami was taken from me
> a short while ago.
> And now, for a fistful of rice
> I am famine stricken.[46]

****

> If a son had been born in my womb
> the son would have got his rightful share
> We would have had justice
> in the courts of Madurai.
> But I bore no son
> so there was no son's share
> I could not go for appeal
> to the courts of Madurai.[47]

The significance of this and other related songs which lament the absence of a son in the case of a property dispute, proves that even where the widow may have been the legal heir, a woman without a male child was usually deprived of her property and rendered destitute.

One began this section with the question whether the participation and involvement of women in the economy suggested economic self-sufficiency. In trying to probe this issue, it became increasingly clear that any monolithic representation of women's social situation would be highly misleading. The picture that emerges is highly fragmented and complex. The non-working upper class women as well as the socially marginalized 'dancing girls' were both propertied and prosperous while the women of the lower class/caste suffered wage discrimination as well as economic/property deprivation.

The multiple representations of women vis-à-vis work and property situations continue in the sphere of the public domain. There are images of women as militant warriors such as Rudramma, the Hoysala ruler[48] or as high officials. It is noteworthy that psycho-analysts use the term 'castrated male' to describe those

women who have created a space for themselves within patriarchal structures by assuming roles, traditionally considered a male preserve. The early medieval period also throws up the name of Akkadevi, the sister of the Chalukyan king Jayasimha, who ruled over Kusukadu, Banavasi, Torgale, Masiyavadi and a few other divisions. One of her epithets was 'Rana Bhairavi' meaning one who is most proficient in battle. Among her famous victories was the defeat of the rebel chief of Gokak in Belgaum district of Karnataka.[49] Mailadevi, the wife of Chalukyan king Somesvara I was another ruler who made a mark in the political domain. The bravery of women in the battlefield is also referred to in some early medieval inscriptions.[50]

For the early medieval period there are a few instances of women administrators, especially justices of peace. An inscription from Manamai, near Kannattur, speaks of a woman who served on the judicial committee of the village assembly.[51] In the time of Sundara Pandya, the lady Perunkarunaiyatti alias Devargalammai was one of the Nyayattar of Uttaramattur.[52] The reference to Lakkadevi as head (Mahapravini) of a village and Revakabbarasi as an officer in the royal household comes from the Karnataka region. Another lady, Jekkiabbe, who was the widow of Sattarasa Nagarjuna, the chief administrator of the Nalgonda region, was given his post. The Inscription dated 918 AD states that she ably administered the region which had seventy villages and was in due course succeeded by her daughter.[53] It can therefore be said that the presence of women in the public domain, especially officialdom, was rare but not wholly unknown.[54]

Summing Up

Given the vastness of the canvas and the limitations of the historian, this article has made an effort to salvage some parts of women's history in early medieval South India. The intention has been to raise crucial issues which in themselves offer openings to scholars interested in restoring gender balance to the historical canvas. From the historical sources it is evident that by and large the imaging of women has been in the sphere of the 'domestic'. The agency is predominantly male and therefore women in this kind of history tend to move between bi-polarities : housewife versus prostitute, the public woman versus the private women, the pious 'good' woman versus the scheming, 'bad' woman. Women in the domain of the 'public' who figure in conventional histories are mostly 'female kings' or warrior women who ideally approximated to male behavior and male concerns. Conversely, working women and spiritual women both of whom belong to categories which shatter conventional role models, figure but rarely in the stereotypical historical canvas. This article is therefore one more step in the ongoing exercise by feminist historians to salvage those facets of women's history which have been either ignored or intentionally hidden in South Indian historiography. This has largely been attempted by re-opening existing texts, analyzing the sub-text of canonical literature and by using alternative histories found within oral tradition, especially folk songs.

References

1. N. Subrahmanian, *Sangam Polity,* Asia Publishing House, 1966.
2. The best example I could find of the homogenisation of women ws my discovery that at a leading library in Delhi, in a rack devoted to 'women', under the section on 'Women's Biographis', the hagiographical account of the seventh century Tamil saint Andal was jostling for space with a recent biography of Indira Gandhi!
3. C. Minakshi, *Administration and Social Life Under the Pallavas*, Madras, University of Madras, 1977.
4. N. Subrahmanian, *Tamil Social History,* 2 vols., Institute of Asian Studies, Chemmancherry, Chennai, 1999, vol. II, p. 206.
5. Epigraphia Carnatica ed. B. Lewis Rice (Mysore Archaeological Series, Mysore, 12 vols, 1889-1955), vol. IV, Nagulapadu, No. 57 dated A.D. 1181 and vol. VI, Chamarajanagar, No. 94 dated circa A.D. 1060.
6. Inthe major part of Sangam corpus of literature one comes across 'parisam' or 'bride-price' rather than dowry. The positio of women in ancient South India is dealt with in any article, 'The Kudi in Early Tamilaham and Tamil Women from Tribe to Caste' in Dev Nathan ed. From *Tribe To Caste* (Indian Institute of Advanced Study, Shimla 1997), pp. 223-247 where similar issues have been addressed
7. One comes across a comment by Chekkizhar in the *Periyapuranam* lauding the birth of a girl born to Manikkavachagar's wife saying that she helping him in getting rid of his cycle of births and deaths. The text contains other similar references - vide my article, 'Anklets on the Feet', *Indian Historical Revies*, vol. XVII, Nos. 1 and 2, p.75.
8. Mitakshara of Vijnanesvara, tr. end ed. J. R. Gharpure (Taraporewala, Bombay, 1936-42) vol. I, verse : 15.
9. Ibn Batuta's Travels vide Nilakanta Sastri, A History of South India, University of Madras, Madras, 1975, p.321.
10. The location of Andal within the social context of early medieval Tamizhagam and her use of bridal mysticism to subvert existing patriarchal norms is discussed in my book : *Walking Naked : Women, Society, Spirituality in South India'*, (Indian Institute of Advanced Study, Shimla. 1997). pp.121-128
11. George Hart discusses the term *'ananku' in his article* 'Women and the sacred in Ancient Tamiland', Journal of Asian Studies, No. 32, 1973, pp.233-250. A polemical note on Hart's interpretation can be found in my text *Walking Naked'* on pp.48 49ff.
12. The evidence of Sati for the Vijayanagara period is plentiful. The favous Vijayanagara poet Srinatha states in his *Palnattu Viracharitra* that seven generations would benefit from the Sati's supreme sacrifice.
13. Annual Report of Epigraphy (ARE), 141 of 1998. Another example of Sati is to be found in Epigraphia Carnatica, vol. IV, Hg 18.
14. ARE, 156 of 1906, pt. II (1907) Para-41.
15. Kamba Ramayanam, Sandara Kandam : Death of Rakshasa Prince : 978 vide Prema Arunachalam, *Pattini Daivangalum, Parattaiyar Veedigalum,* South Asian Books, Chennai, 1993, pp.144-5.
16. *The Colas,* University of Madras, Madras, 1975, p.53.

50. The presence of women rulers and officials has been discussed in my article 'Aspects of Women and Work', op. cit., pp.97-88.
51. ARE 259 of 1909.
52. ARE 1910, part II, Para 35.
53. Epigraphia Carnatica, vol. VII, Sk. 219.
54. These and other such examples are given in J. K. Kamat, *Social Life in Medieval Karnataka*, New Delhi, 1980, p. 106ff.

সুকুমারী ভট্টাচার্য-র প্রকাশিত গ্রন্থ

The Indian Theogony, Cambridge University Press, 1970, Penguin, 2000

মৃচ্ছকটিক (সংস্কৃত নাটকের বঙ্গানুবাদ), সাহিত্য আকাদেমি, 1973

Literature in the Vedic Age (In 2 Volumes), K. P. Bagchi and Co. 1984, 1986

প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স 1988

Classical Sanskrit Literature, Orient Longman, 1990

Buddhist Hybrid Sanskrit Literature, Asiatic Society, 1992

Religion Culture Government, Orient Longman, 1993

Women and Society in Ancient India, Basumati Corporation Ltd., 1994

Fatalism in Ancient India, Baulman Prakashan, 1994

নিয়তিবাদ : উদ্ভব ও বিকাশ, ক্যাম্প, 1995

Legends of Devi, Orient Longman, 1995

বিবাহ প্রসঙ্গ, ক্যাম্প, 1995

রামায়ণ ও মহাভারত : আনুপাতিক জনপ্রিয়তা, ক্যাম্প, 1996

হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা, দীপ প্রকাশন, 1997

প্রাচীন ভারত, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, 1998

বেদের যুগে ক্ষুধা ও খাদ্য, চিরায়ত, 1998

উত্তরাধিকার, ছাত্রসংগ্রাম, 1999

মন্থন, নয়া উদ্যোগ, 2000

বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, 2000

In Those Days : Essays on Vedic Epic and Classical, Camp, 2001

বাল্মীকির রাম : ফিরে দেখা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, 2002

অপসংস্কৃতি, ক্যাম্প, 2003

Some Thoughts on Tagore, Draupadi, 2003

এয়োতি এবং, ক্যাম্প, বইমেলা 2004

ধর্ম এই সময়ে, ক্যাম্প, মে 2004

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

লেখক পরিচিতি / About Authors

তপোধীর ভট্টাচার্য	: আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (শিলচর) স্কুল অব ল্যাঙ্গুয়েজেস-এর ডিন। ভারত।
অমলেন্দু দে	: সভাপতি, এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা, ভারত।
গৌরীশ্বর ভট্টাচার্য	: প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ। ইন্ডোলজিক্যাল ইন্সটিটিউট অব প্রি-ইউনিভার্সিটি অব বার্লিন-এর শিক্ষক, বার্লিন, জার্মানী।
জ্যোতিভূষণ চাকী	: বিশিষ্ট ভাষারসিক। ২০০২ সালে বিদ্যাসাগর পুরস্কার পান। কলকাতা, ভারত।
দীধিতি বিশ্বাস	: সংস্কৃত বিভাগ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত।
দীপক ভট্টাচার্য	: খ্যাতিমান ভারততত্ত্ববিদ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-পালি-প্রাকৃত বিভাগের অধ্যাপক, শান্তিনিকেতন, ভারত।
নীলাঞ্জনা সিকদার দত্ত	: সংস্কৃত বিভাগ, দমদম মতিঝিল কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি	: সংস্কৃত বিভাগ, গুরুদাস কলেজ, কলকাতা, ভারত।
প্রীতিকুমার মিত্র	: রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রফেসর (অবসরপ্রাপ্ত) এবং ইন্সটিটিউট অফ বাংলাদেশ স্টাডিজ-এর প্রাক্তন পরিচালক, বাংলাদেশ।
বিজয়া গোস্বামী	: সংস্কৃত বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত।
রঞ্জিত পাল	: পেশায় বিজ্ঞানী, নেশা ভারততত্ত্বের গবেষণা, কলকাতা, ভারত।
রণবীর চক্রবর্তী	: প্রফেসর, সেন্টার ফর হিস্টরিকাল স্টাডিজ, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, নতুন দিল্লি, ভারত।
রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়	: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রফেসর, ভারত।
রমেন্দ্রনাথ ঘোষ	: দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।
রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য	: ইংরেজি বিভাগ, আনন্দমোহন কলেজ, কলকাতা, ভারত।
শাহানারা হোসেন	: প্রফেসর (অবসরপ্রাপ্ত) ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।
সনৎকুমার সাহা	: খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ, বিশিষ্ট সাহিত্যবেত্তা, বাংলাদেশ।
সুজিত আচার্য	: সু-প্রাবন্ধিক, প্রাচীন ভারত সম্পর্কিত গবেষণায় বিশেষ আগ্রহী।
অমিয়কুমার বাগচী	: প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, অধিকর্তা, ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, কলকাতা, ভারত।

আবুল মোমেন	:	বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, বিখ্যাত পত্রিকা *প্রথম আলো*-র অন্যতম সংগঠক। চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
উৎসা পট্টনায়ক	:	অধ্যাপক, সেন্টার ফর ইকনমিক স্টাডিজ এন্ড প্ল্যানিং, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, নতুন দিল্লী, ভারত।
কাজুও আজুমা	:	বিশিষ্ট রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ, জাপানী ভাষায় রবীন্দ্রচর্চার অন্যতম পথিকৃত।
নূরুল হোসেন চৌধুরী	:	অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।
ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	:	প্রখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ, কলকাতা, ভারত।
ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক	:	স্বনামধন্য ভাষাতাত্ত্বিক এবং সংখ্যাতাত্ত্বিক, কলকাতা, ভারত।
মইনুল হাসান	:	প্রাবন্ধিক, কলকাতা, ভারত।
মালিনী ভট্টাচার্য	:	ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় (অবসরপ্রাপ্ত), অধিকর্তা, মানবীবিদ্যা কেন্দ্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ভারত।
রমাকান্ত চক্রবর্তী	:	প্রাক্তন অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়। সম্পাদক, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
সব্যসাচী ভট্টাচার্য	:	প্রাক্তন উপাচার্য, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, সেন্টার ফর হিস্টরিকাল স্টাডিজ, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, নতুন দিল্লী, ভারত।
সুধীর চক্রবর্তী	:	খ্যাতিমান গবেষক এবং স্বনামধন্য ধ্রুবপদ পত্রিকার সম্পাদক।
সোমনাথ ভট্টাচার্য	:	প্রাবন্ধিক, কলকাতা, ভারত।
Bipan Chandra	:	Professor Emeritus in History, Jawharlal Nehru University, New Delhi; Chairman, National Book Trust, India.
Ian Mabbett	:	Professor, Department of History, Monash University, Australia.
Harry M. Buck	:	Emeritus Professor at Wilson College, USA.
Romila Thapar	:	Eminent Historian and Emeritus Professor of History at Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India.
D N Jha	:	Professor of History at Delhi University, India.
Suraj Bhan	:	Professor Bhan taught in the Department of Ancient History and Archaeology, University of Kurukshetra, Haryana, India.
Shereen Ratnagar	:	Renowned Archaeologist & formerly Professor, Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, India.

Ram Sharan Sharma	:	Eminent Marxist Historian, formerly Professor and Head of History Department, Delhi University, Former Chairman of Indian Council for Historical Research (ICHR), India.
Uma Chakravarty	:	Dr. Chakravarty teaches at Delhi University, India.
Prabhat Patnaik	:	Eminent Economist, Professor, Centre for Economic Studies and Planning, Jawaharlal Nehru University, New Delhi. India.
Klaus Mylius	:	Eminent Indologist Professor Dr. Dr. Klaus Mylius teaches at Frankfurt University, Germany.
Vijaya Ramaswamy	:	Associate Professor, Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India.
Uma Chakravarti	:	Teaches at Bhanderkar Institute, Pune India.
Charles Malamoud	:	Renowned Indologist, Paris, France.
Zoya Hasan	:	Professor Centre for Political Studies Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India
Aijaz Ahmad	:	Renowned Indian intellectual, taught at City University, New York; Rutgers University, New Jersy and York University, Canada.
H. W. Bodewitz	:	Eminent Indologist, taught at Rijk Universitiet, Leiden, Netherlands.
Joseph T. O'Connell	:	Professor Emeritus in the Study of Religion, South Asian Studies, University of Toronto, Canada.
K. N. Panikkar	:	Vice-chancellor, Sree Sankaracharya University of Sanskrit, Kaladi, Kerala, India & former Professor at Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India
Abhijit Ghosh	:	Teacher of Sanskrit, Jadavpur University, Kolkata, India
Jyotish Nath	:	Professor, Department of Sanskrit, Tripura University, Tripura, India
Irfan Habib	:	Eminent Historian & formerly Professor of History, The Aligarh Muslim University, Aligarh. India.
Kumkum Roy	:	Associate Professor, Centre for Historical Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi, India.

নির্ঘণ্ট / Index

morality 456, 512, 552, 614, 619, 620, 622, 623

ভারতবর্ষ ও ভারততত্ত্ব নিয়ে অর্ধশতকের বেশী প্রবন্ধের সংকলন India and Indology : Past Present and Future ❑ ভারত ও ভারততত্ত্ব : অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ। সুকুমারী ভট্টাচার্য-র উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশের লেখকরা উপহার পাঠিয়েছেন তাঁদের পছন্দমত বিষয়ের একগুচ্ছ তরতাজা রচনা। দেশ দেশান্তরের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ লিখেছেন এই সংকলনে। তাঁদের নানা ভাষা, নানা মত, নানা পথ। এতদ্‌সত্ত্বেও সাদৃশ্য দুটো বিষয়ে। প্রথমত প্রায় সকলেই বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীতে নিজের রচনাকে গ্রথিত করেছেন। আর দ্বিতীয়ত প্রত্যেকেই সুকুমারী ভট্টাচার্য-র প্রতি অপার শ্রদ্ধায় সৃষ্টি করেছেন একটি করে শ্রেষ্ঠ রচনা।